পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্-প্রবর্তিত উচ্চতর, মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়সমূহের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য
[*Vide Notification No. II.S./1/58 dated 7. 3. 58*]

আধুনিক গৃহবিজ্ঞান

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীশোভনা ঘোষ, এম.এ., বি.টি., এম.এড.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডমেস্টিক সায়েন্স বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষা

এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

'বিজ্ঞান অধুনা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পরিব, সমাজ ও দেশের দিক হইতে সুগৃহিণীর দায়িত্ব গুরুপূর্ণ। গৃহের সুষ্ঠু পরিবেশের ভিতর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধি হয়। গৃহ দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ চারে ও সর্বদিকে মানুষের জীবন গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। গৃহই এক মানুষের শ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। ইহাই তাহাকে ব্যস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে ও নিরাপত্তা অর্জন করিতে সহায়তা করে। গৃে সুখ-শান্তি, শুভ-অশুভ নির্ভর করে গৃহের অধিবাসীদের জীধারার মধ্যে। সেই জীবনধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করাই গৃহজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কি ভাবে পরিবারের সকলের দৈনন্দিন জীবনের অভাব মোচন কতে হয় সেই বিষয়ে সুগৃহিণীর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। অহলিত শিশু তাহার পরবর্তী জীবনে কোনদিনই পূর্ণ নাগরিকরূপে গয়া উঠে না। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবন যাতে উন্নত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুর পোশাক-পাচ্ছদ, আহার-বিহার, শিক্ষা-দীক্ষা, শ্রম-বিশ্রাম সকল দিকেই সুহিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সেইজন্যেই তাঁহার দায়িত্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ। পরিবারের নিকট তিনি একাধারে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী, মনস্তত্ত্ববিদ্, অর্থনীতিবিদ্, ব্যাঙ্কার, দর্জি, পাচিকা, মালনী ও শিক্ষিকা।

আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্য গার্হস্থ্যজীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এইজন্য

জীবনকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে আমাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও প্রয়োজন। আমাদের দেশের মেয়েরা যাতে শিল্প-বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থোপার্জন করিয়া সংসারে ও সমাজে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে সংসারের দায়িত্ব বহনে সমর্থ হন—গৃহবিজ্ঞান শিক্ষার ইহাও অন্যতম উদ্দেশ্য। এইজন্যই গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রতি ঘরে ঘরে সুগৃহিণীর ও প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিকার প্রয়োজনের তাগিদে গৃহবিজ্ঞান আমাদের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

তাড়াতাড়ির জন্য হয়তো ইহার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়িলে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইলে সুখী হইব।

ডমেস্টিক সায়েন্স ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
হেস্টিংস হাউস কম্পাউণ্ড
আলিপুর, কলিকাতা

শোভনা ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

নবম শ্রেণী

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

দশম শ্রেণী

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

———

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

একাদশ শ্রেণী

বিষয় **পৃষ্ঠা**

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HIGHER SECONDARY SYLLABUS

ELEMENTS OF HOME SCIENCE

Class IX

PAPER I

Health and Household Management.

GROUP A—HEALTH

Theoretical—Good health—what it is. Importance of personal hygiene and cleanliness and fresh air and sunshine. Importance of developing good habits with regard to exercise, rest, sleep, bath and food. Study of proper heights and weights according to age.

Practical—Keeping records of heights, weights and incidences of sickness in the class. Making charts and posters on health. Demonstrations on correct posture. Making a health album.

GROUP B—HOUSEHOLD MANAGEMENT

Theoretical—Study of the house—site, locality, structure, ventilation, lighting, drainage, water supply and sanitation. Household furnishings—selection and arrangement of suitable furniture, fittings and simple articles for decoration in different rooms—colour combination, selection, care and storage of household equipment—brass, glass, porcelain, aluminium, enamel, copper, iron, bellmetal (Kansa), silver and earthenware vessels—Their cost and suitability for Indian homes. Cleaning of the house and household

equipment—cleaning of metals, glass, cane, wood and leather. Essential qualities for good management in home makers and their duties. Human relationship—with other family members and domestic helpers. The girl in her family, her duties and responsibilities. Choosing friends and maintaining them.

Practical—Arrangement of the various rooms in Indian style adapted to the modern conditions of living—arrangement of furniture in various rooms, cleaning of the house and its equipments—use of different types of brooms, brushes, mops and dusters. Use of cleaning substances like soap, washing soda, lime, sand, ash, chalk, oil cake, tamarind, lemon, brasso, silvo, vimpowder etc.

PAPER II

GROUP A—Food, Nutrition and Cookery

GROUP B—Textiles, Clothing and Laundry

GROUP A—FOOD, NUTRITION AND COOKERY

Theoretical—Food—its importance and functions. The kitchen—arrangement of well equipped kitchen—safety in the kitchen—Cooking utensils—different types of fuels and ovens—smokeless chula. Use of weight and measures required for cooking. Reasons for cooking food and simple methods of cooking—boiling, steaming, stewing, frying, roasting and baking. Cleanliness in food handing. Planning of recipes for simple dishes like rice, dal, luchi, puri, chapati, khitchadi, bhaja and a vegetable curry. The principles and the art of serving food. Kitchen garden.

Practical—Demonstration of various types of cookers, ovens and fuels. Arrangements of the kitchen and of the store room. Cooking and serving the simple dishes as planned in the Theory Class. Kitchen gardening wherever possible.

GROUP B—TEXTILES, CLOTHING AND LAUNDRY

Theoretical—Classification of fibres—their origin, sources, supply and nature.

Laundry—The laundry room and equipments necessary for laundry and their care.

Practical—Observation of fibres under microscope or magnifying glass. Arrangement of the laundry room—cleaning and care of laundry equipments. Processes in sewing—tacking, running, hemming, back stitching and top sewing. Darning and patching. Various seams—run and fell, french and flat, hems, buttonholes and fastenings. Sorting, marking and mending of clothes.

BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HIGHER SECONDARY SYLLABUS

ELEMENTS OF HOME SCIENCE

Class X

PAPER I

Health and Household Management

GROUP A—HEALTH

Theoretical—An elementary study of community sanitation. Dangers of spitting and throwing garbage everywhere. Protection against infection—inoculation, vaccination and segregation or isolation. Causes and prevention of diarrhoea and malaria and of common contagious and infectious diseases like measles, chicken-pox, small-pox, tuberculosis, dysentery, cholera, typhoid, influenza, scabies, ringworm and other similar infectious skin diseases.

Principles of home nursing—qualities essential for nursing the sick, and duties of the nurse. The sick room and its equipments. Details of nursing and taking care of the sick, including principles of feeding the sick.

GROUP B—HOUSEHOLD MANAGEMENT

Theoretical—Household accounts and budget. Planning the use of income to meet the requirements for food, clothing, house rent, health, education, recreation, taxes and saving. Method of saving and benefits of savings. Hobbies for supplementing family income and wise use of leisure.

PAPER II

GROUP A—FOOD, NUTRITION AND COOKERY
GROUP B—TEXTILES, CLOTHING AND LAUNDRY

Group A—FOOD, NUTRITION AND COOKERY

Theoretical—Classification of food—their values and sources. Daily requirement of each food constituent. Calory value of food. Balanced diet. Effects of cooking on food.

Group B—TEXTILES, CLOTHING AND LAUNDRY

Theoretical—Water—hard and soft water—Methods of softening hard water. Cleansing agents—soaps, flakes, soap powders, detergents, washing soda, rita nuts. Removal of stains—(1) vegetable, (2) animal and (3) mineral—and methods. Washing and finishing of articles—cotton, linen, silk, rayon (artificial silk), woollens—Rubbing, rinsing, starching, blueing, drying, ironing, folding and storing. Care of the sewing machine—oiling and cleaning it.

BOARD OF SECONDARY EDUCATION

HIGHER SECONDARY SYLLABUS

Class XI

ELEMENTS OF HOME SCIENCE

PAPER I

Health and Household Management.

GROUP A—HEALTH

Theoretical—Study of household pests and how to get rid of them—mosquitoes, bed bugs, lice, rats, fleas, cockroaches, silver fish, moths and white ants. Purification of drinking water. First-aid—burns, cuts and bruises, shocks, drowning, convulsions, bleeding, injuries, sprains and strains, fractures, artificial respiration, bites and stings, fits and faintings, foreign bodies.

GROUP B—HOUSEHOLD MANAGEMENT

Theoretical—Planning for good management—division of work among family members. Labour-saving devices —Saving of time, effort and movement by planning—a knowledge of the use of various types of mechanical devices.

PAPER II

GROUP A—FOOD, NUTRITION AND COOKERY

Theoretical—Planning of balanced diets for different age levels. Planning of meals for morning, midday and evening—Planning for tea and tiffin. Principles of food preservation in the home—causes of food deterioration.

GROUP B—TEXTILES, CLOTHING AND LAUNDRY

Theoretical—Simple identification tests of textiles—Physical and Chemical properties, such as, elasticity, shrinkage, durability—finish and colour fastness. Nature of artificial silk. Simple dry cleaning methods in the home.

আধুনিক গৃহবিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

গৃহবিজ্ঞানের তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য

গৃহরচনা মানুষের একটি স্বভাবজাত শিল্প। কোন্ অতীতে ইহার পরিকল্পনা হইয়াছিল কেহ বলিতে পারে না। গৃহরচনার স্বপ্ন লইয়াই মানুষ জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। গৃহ তাহাদের অনুপ্রেরণা যোগায়, কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করে। গুহাবাসের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত গৃহরচনার কত রকম পরিকল্পনাই না মানুষ করিতেছে! গৃহকে সাজাইয়া-গুছাইয়া মনোরম করিয়া নিজের মনোমত করিবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা, আদর্শবাদ ও কর্মপ্রচেষ্টার রূপ বদলাইয়াছে সত্য, কিন্তু মানুষের সকল কর্মের, সকল চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে সেই গৃহ।

আমরা দেখিতে পাই আমাদের পূর্বপুরুষ মনু তাঁহার শাস্ত্রে বিবাহিতা নারীদের বিবাহিত জীবনের উপযুক্ত যোগ্যতা লাভের জন্য চৌষট্টিটি শিল্পে নৈপুণ্যলাভের কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় আমাদের পূর্বপুরুষগণ গৃহ-শিল্পকে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, কতখানি উচ্চে স্থান দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে মেয়েরা মায়েদের এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের সহিত কাজ করিয়াই হাতে কলমে গৃহস্থালীর কাজ শিক্ষা করিত। তখন বিশদভাবে গৃহরচনা শিক্ষা দিবার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক

প্রতিষ্ঠান ছিল না। তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় অপরের অনুকরণ এবং অভ্যাসের দ্বারা গৃহকার্যে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা হইত।

বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে এবং আর্থিক অনটনের চাপে গৃহরচনার ভিত্তির কিছুটা পরিবর্তন হইলেও গৃহের মূল কাঠামো প্রাচীন কালের মতই আছে। আজও গৃহই একমাত্র সামাজিক সম্মেলনের স্থান, আজও সুগৃহিণী সর্বত্র সমাদৃতা। এই গৃহকে সুসজ্জিত, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্যই গৃহ-বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

গৃহজীবনের স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ ভাবধারা, আদর্শবাদ এবং প্রয়োগাত্মক বিজ্ঞানের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনকে উন্নত করাই গৃহবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাগতিক পরিবেশের সহজ সরল ভাব, গৃহের ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী স্বার্থের জন্য কাজ করার মনোভাব তৈয়ারী করা, ঐতিহ্য যাহাতে বর্তমানের আদর্শে গৃহরচনায় বাধা স্বরূপ না হইয়া অগ্রগতিতে সাহায্য করে গৃহবিজ্ঞান শিক্ষার ইহাই লক্ষ্য। সুতরাং মেয়েদের শান্তস্নিগ্ধ সুখের নীড় গড়িতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক এবং শিল্প-সংক্রান্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার দ্বারা উন্নত জীবনযাপন-প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার সময় আসিয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগে যথেষ্ট অবসর পাওয়ায় এবং আর্থিক প্রয়োজনে মেয়েরা অবসর বিনোদন ও প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গৃহের বাহিরে কর্মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, গৃহ-পরিচালনা ও বাহিরের কর্ম এই দ্বিবিধ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যও জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কালে যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া ছোট পরিবার হইয়াছে, কর্তার কাজ অনেক কমিয়াছে, স্ত্রী-স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে—এইগুলি মিলিয়া গৃহে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। গৃহবিজ্ঞান এই সব সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইতেছে। আদর্শ গৃহরচনার উদ্দেশ্য হইতেই গৃহবিজ্ঞান আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গৃহবিজ্ঞান আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়—

(১) গৃহ-পরিকল্পনা, (২) স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও প্রাথমিক চিকিৎসা, (৩) শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিশুপরিচর্যা, (৪) গৃহসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী, (৫) সমাজ-সেবা, (৬) আয়ব্যয়ের সুষ্ঠু বণ্টন, (৭) রন্ধন ও খাদ্যতত্ত্ব, (৮) আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানে সাধারণ জ্ঞান।

এই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে গার্হস্থ্যজীবন সহজ সুন্দর ও সমৃদ্ধ হইবে। ইহা গৃহিণীকে আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে, অনর্থক অপচয় নিবারণে এবং গৃহের অন্যান্য পরিজনদের তৃপ্তি ও আনন্দ পরিবেশনে সাহায্য করিবে।

সার্থক গৃহরচনা প্রধানতঃ সুযোগ্য গৃহ-পরিচালনা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। গৃহ-পরিচালনার সাফল্য আর্থিক ও মানবিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও সুযোগ-সুবিধা প্রয়োগের কৌশলের উপর নির্ভর করে। পারিবারিক জীবনে সাফল্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য পরিবারের সকলের সহযোগিতা আবশ্যক। পরিবারের সকলে মিলিয়া গৃহজীবনের লক্ষ্য ঠিক করা, পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন। কি ভাবে পরস্পরের সহযোগিতা লাভ করা যায়, গৃহবিজ্ঞান তাহাও শিক্ষা দেয়। পুষ্টিকর খাদ্য কি ভাবে রুচিসম্মত করিয়া পরিবেশন করা যায়, কি ভাবে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সুঅভ্যাস গঠন করিতে হয়, কি উপায়ে পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন ও তাহাদের যত্ন করিতে হয় ইত্যাদি গৃহবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু।

পরিবারের সকলের আর্থিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিল কিনা, পরিবারের প্রত্যেকের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হইল কিনা ইত্যাদি সবই গৃহিণীর সুপরিচালনার উপর নির্ভর করে।

ব্যক্তিবিশেষের তুইটি সত্তা আছে—ঘরোয়া এবং সামাজিক। সে যেমন ঘরের তেমনি বাহিরের। গৃহবিজ্ঞান ঘর আর বাহির এই তুইয়ের সমন্বয়ে জীবন উপভোগ করিবার শিক্ষা দেয়। ঘরের মানুষকে ব্যবহারিক, সামাজিক, নৈতিক দিক হইতে উন্নত করিয়া বাহিরের সহিত সমন্বয় সাধনের শিক্ষা দেওয়াই গৃহবিজ্ঞানের শিক্ষা।

আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধনেই আমাদের শিক্ষা ও জীবনধারা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। গৃহবিজ্ঞান এই তুইয়ের সমন্বয় সাধনের শিক্ষাই প্রদান করে।

আজকালকার অভাব-অনটনের দিনে প্রয়োজনমত আথিক চাহিদা মিটাইবার জন্য নারীদেরও কর্মক্ষেত্রে নামিতে হইতেছে। গৃহবিজ্ঞান মেয়েদের এইদিকেও নানা ভাবে পথ দেখাইতেছে। ইহা নারীকে শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে নানা পথের ও কর্মের সন্ধান দিতেছে এবং তাহার জন্য যোগ্যতা অর্জনেও সাহায্য করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে গৃহবিজ্ঞান নারীর বিভিন্ন প্রকার উন্নতি ও অগ্রগতির নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া তাহার জীবনে বৈচিত্র্য আনিয়াছে।

গৃহিণীর কর্তব্য ও দায়িত্ব বহু এবং বিচিত্র, কিন্তু সর্বোপরি তিনি স্নেহময়ী জননী ও জায়া—ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। গৃহবিজ্ঞান এই পরিচয়ের গৌরব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে নারীকে শক্তি যোগাইবে।

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য

আদর্শ স্বাস্থ্য

আদর্শ স্বাস্থ্য বলিতে শুধু রোগমুক্ত দেহকেই বুঝায় না, দেহযন্ত্রকে সুনিয়মে পরিচালনা করিয়া ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যে দৈহিক অবস্থা কর্মের উদ্দীপনা জাগায় এবং আনন্দের সঞ্চার করে তাহাকে আদর্শ স্বাস্থ্য বলে। আদর্শ স্বাস্থ্যের অধিকারীর দেহের গঠনতন্ত্রের স্বাভাবিকভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা, আনন্দপূর্ণ মানসিক ঔৎকর্ষ্য ও উদ্দীপনাময় কর্মশক্তির পরিচয় প্রভৃতি গুণগুলি থাকা প্রয়োজন। কর্মশক্তির উদ্দীপনা ও মানসিক ঔৎকর্ষ্যকে সজীব করিয়া রাখাই আদর্শ স্বাস্থ্যের প্রধান লক্ষ্য। সুন্দর শারীরিক গঠন, মসৃণ চর্ম, নিখুঁত দৃষ্টিশক্তি, দৃঢ় দন্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কেশরাশি, বলিষ্ঠ পেশী, সচেতন স্নায়ু প্রভৃতি আদর্শ স্বাস্থ্যের পরিচয় প্রদান করে।

কর্মশক্তির উদ্দীপনা—মানুষের কর্মের অন্ত নাই। সকালে গৃহকর্ম, দুপুরে জীবিকার জন্য ব্যস্ততা, অবসর সময়ে অন্যান্য কাজ—সামাজিক, পারিবারিক বা উন্নয়নমূলক ইত্যাদি। আদর্শস্বাস্থ্য ব্যক্তি ক্লান্তিহীনভাবে একটানা উদ্দীপনাময় সকল প্রকার কাজ হাসিমুখে করিবার ক্ষমতা রাখে। অল্প পরিশ্রমেই সেই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে না, দীর্ঘ সময় নানা পরিশ্রমে ও কাজে ব্যস্ত থাকিলেও সেই স্বাস্থ্যে অবসন্নতার ছাপ পড়িতে পারে না।

মানসিক উৎকর্ষ—ক্লান্তি ও অবসাদ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মনের প্রফুল্লতা ও ঔৎকর্ষ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। সাধারণতঃ দেখা যায় পরিশ্রান্ত মানুষ গৃহে সামান্য কারণেই অধৈর্য হইয়া পড়ে; মেজাজ রুক্ষ হয়। কিন্তু মানসিক

ঔৎকর্ষ্য যাহাদের আছে তাহাদের এই অবস্থা হয় না। আদর্শ স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি সংসারের ছোটখাট দায়িত্ব হইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন করিয়াও মনের সজীবতা হারাইয়া ফেলেন না। তিনি সরল ও সুমিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা পরিবারের সকলের মন জয় করিতে পারেন।

বৃহত্তর পরিবেশের সহিত খুশিমনে চলিবার ক্ষমতা সকলের নাই। শুধু আদর্শ স্বাস্থ্য যাঁহার আছে তিনিই জীবন-যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়াও সর্বস্তরের মানুষের সকল আয়োজন ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করিবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁহার উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে না, কর্মশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে না।

আদর্শ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবার উপায়—শুধু জানা, ভাবা বা ইচ্ছা দ্বারা কেহ আদর্শ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারে না। অভ্যাস ও চর্চার মাধ্যমে আদর্শ স্বাস্থ্য অর্জন করিতে হয়। শিল্পী যেমন মনের সব রুচি ও কল্পনা দিয়া ছবি আঁকেন, সেইরূপ একাগ্রমনে কর্মের অভ্যাস ও চর্চার মাধ্যমে যিনি স্বাস্থ্য গড়িবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই হইবেন আদর্শ স্বাস্থ্যের অধিকারী। (ক) স্বাস্থ্যচর্চার অনুশীলনী অভ্যাস করিয়া, (খ) স্বাস্থ্য অর্জনকে শিক্ষা ও কর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়া এবং (গ) ব্যায়ামের অনুশীলন করিয়া আদর্শ স্বাস্থ্য গঠন করিতে হয়।

শুধু স্বাস্থ্যের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। প্রাত্যহিক কাজকর্মের ভিতর কি ভাবে তাহা অনুশীলন করা যায় সেজন্য সচেষ্ট থাকাই স্বাস্থ্য অর্জনের উপায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রায় সকলেরই দেহ-মন সুস্থ থাকে, চালচলনের দোষে পরে তাহা নষ্ট হয়। তাই স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগঠনের অনুশীলনী ইত্যাদি প্রতিদিন সজাগ হইয়া আয়ত্ত করিলে আদর্শ স্বাস্থ্য গড়িয়া উঠে।

জীবনধারণের জন্য প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করা আদর্শ স্বাস্থ্য অর্জনের পথ। মাছি-পড়া আহার্য বস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়, ঘামে-ভিজা জামা গায়ে দেওয়া ঠিক নয়—এইরূপ ছোটখাট নিত্য-প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য বস্তুকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিবার মত স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টি আদর্শ স্বাস্থ্য গঠনের বিশেষ সহায়ক। প্রাত্যহিক জীবনে কখন কি আহার্য গ্রহণ করা উচিত, কতটা সূর্যকিরণ শরীরের পক্ষে উপযুক্ত, কোন্ জল বিশুদ্ধ, প্রত্যহ কি পরিমাণ জল পান করা উচিত, এইসব বিবেচনা আদর্শ স্বাস্থ্য গঠনের প্রাথমিক কাজ। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি আদর্শ স্বাস্থ্য গঠনের উপযুক্ত মনোভাব নয়। কাজেই সংস্কার ও গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্যকর অনুশীলনী অভ্যাস—অতি শৈশবকাল হইতেই স্বাস্থ্যকে আদর্শ ও আকর্ষণীয় করিয়া গড়িবার জন্য স্বাস্থ্যের অনুকূল কিছু কিছু ব্যায়াম ও নিয়ম পালন করা উচিত। সকালে শয্যা ত্যাগ করা, ব্যায়াম করা, ভোরের বাতাস ও সূর্যের আলো গায়ে লাগান, তেল মাখিয়া আলট্রা-ভায়োলেট-রে সেবন করা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু কিছু ব্যায়াম করা, খাদ্যমূল্য বিচার করিয়া আহার্য গ্রহণ করিবার অভ্যাস আদর্শ স্বাস্থ্য লাভের উপায়।

স্বাস্থ্যকে শিক্ষা ও কর্মের অঙ্গ মনে করা—আমাদের দেশ এখনও স্বাস্থ্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে বুঝিতে পারে নাই। স্বাস্থ্যের জন্য যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন হইল দীর্ঘ সময়ের। তাই যদি শিক্ষা ও কর্মের অঙ্গ ভাবিয়া সাধনা করা যায় তবে আদর্শ স্বাস্থ্য গঠন করা কঠিন কাজ হইবে না।

আঞ্চলিক ব্যায়ামাগারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ—স্বাস্থ্য গঠনের জন্য বাড়ীতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা সম্ভব নয়। ব্যায়ামাগারে দৈনিক স্বাস্থ্যচর্চার বিধানই স্বাস্থ্যগঠনের পক্ষে প্রশস্ত। কোন্ অঙ্গের পুষ্টি সাধন করিবার জন্য কিরূপ ব্যায়াম করা উচিত, কি ভাবে তাহা করিতে হয়—এইসব কথা ব্যায়ামাগারের উপদেষ্টার নিকট সহজেই পাওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া ব্যায়ামের সাজসরঞ্জাম যোগাড় করাও বড় রকমের অসুবিধা, যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন। ব্যায়ামাগারের সহিত যুক্ত থাকিলে সেই ঝুঁকি লইবার প্রশ্নই আসে না। সেই কারণেই স্বাস্থ্য চর্চা করিবার জন্য ব্যায়ামাগারের সহিত যুক্ত থাকিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিদিন ব্যায়াম চর্চা করা ও শরীরের আবশ্যক যত্ন লওয়া প্রয়োজন। তাহা না করিলে কঠিন পরিশ্রমে গড়া স্বাস্থ্য যে কোন সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কথা

সকলেরই ব্যক্তিগত জীবন আছে। সেখানে তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব লইয়া কারবার। এখন প্রশ্ন উঠে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝায়?

যে স্বাস্থ্যের গঠন, বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যক্তির হাতেই সম্পূর্ণভাবে থাকে তাহাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলা হয়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতি সাধারণ নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া উহার উন্নতির জন্য কোথাও সাধারণ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করিতে হয়, কোথাও বা কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। কাহারও শরীরে 'এ' ভিটামিনের অভাব আছে, কাহারও নাই। যাহার শরীরে 'এ' ভিটামিন নাই তাহার জন্য খাদ্য-ব্যবস্থায়

'এ' ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু যাহার আছে তাহার জন্য সেই ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই

প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্যের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয়পূরণের সব কথা পর্যালোচনা করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাকে কি উপায়ে উন্নত করা যায়—পথ্যের পরিবর্তন করিয়া, না বিশেষ ধরনের ব্যায়াম অনুশীলন করিয়া, না হাওয়া পরিবর্তনে যাইতে বলিয়া—সেই ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা Personal Hygieneএর কাজ। সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের হয়তো আরও কিছু কিছু নূতন নিয়ম পালন করিতে হয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য হইল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-সৌষ্ঠবকে সুন্দর ও উপযুক্ত করা।

কোন্ খাদ্য গ্রহণ করিয়া, কতটা সূর্যকিরণ ও কিরূপ বায়ু সেবন করিয়া এবং কোন্ ব্যায়াম কি পরিমাণ করিয়া মানুষ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় সাধারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তাহাই বলিয়া দেয়। কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্যের বিধান মানিয়া কেন একজনের স্বাস্থ্য ঠিক হইতেছে না তাহা লইয়া গবেষণা করা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কাজ।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বুঝিবার উপায়—ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা না বলিলে আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু না বলিলেও পর্যবেক্ষণ-প্রণালীর (Law of observation) দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য কথায় যত প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকাশ পায় পর্যবেক্ষণে।

দৈহিক যোগ্যতা, সংযত ভাবাবেগ এবং সকলের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা নিম্নলিখিত রূপ হওয়া উচিত :

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	যেরূপ হওয়া উচিত
বক্ষ	— সমান আকৃতি ; কোন অসামঞ্জস্য নাই।
ঘাড়	— সমান আকৃতি ; কোন দিকে বাঁকান নয়।
গলার স্বর	— পরিষ্কার ; মিষ্টি, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নয়।
হাত	— পরিষ্কার ; ছোট এবং পরিষ্কার নখ।
মুখ ও ঠোঁট	— আনন্দোজ্জ্বল, কোমল, হাসিহাসি, লাল ও কোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি।
দাঁত ও মাড়ি	— পরিষ্কার ; সমান ও ঘন সন্নিবিষ্ট ; ক্ষয়-যুক্ত নয় ; মাড়ি সুদৃঢ়, লাল।
নাক	— পরিষ্কার : স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
চক্ষু	— তীক্ষ্ণ, পরিষ্কার, জল পড়ে না।
চুল	— চক্‌চকে ও মসৃণ, পরিষ্কার।
চর্ম	— পরিষ্কার, মসৃণ, দৃঢ়।
তলপেট	— নরম ; আকৃতি ও গঠন স্বাভাবিক, ব্যথাবেদনাহীন
পা ও পায়ের পাতা	— স্বাভাবিক গঠন ও সমান লম্বা এবং সহজে রোগ সংক্রমণ হয় না।
মেরুদণ্ড	— সোজা ও সুগঠিত।
দেহভঙ্গি	— মাথা সুগোল ও সুগঠিত ; থুতনি কাঁধের সমান্তরাল ; কর্মঠ বাহু।
ওজন	— উচ্চতা অনুপাতে এবং পারিবারিক গঠন অনুযায়ী।

মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা এবং অসুস্থ হইলে তাহাদের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় :

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	সুস্থ	অসুস্থ
হার্ট	নাড়ীর গতি নিয়মিত ; মিনিটে ৬০—৮০।	নাড়ীর গতি অতি দ্রুত অথবা অতি ধীর ; অনিয়মিত।
	সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, মিনিটে ১০—২৫ বার।	প্রায় সর্বদাই সর্দিকাশি।
চক্ষু	স্বাভাবিক দৃষ্টি	জল নিঃসরণ ; সাধারণ দূরে দেখিতে ও পড়িতে কষ্ট হয় ; চোখের পাতা ফোলা ফোলা।
কান	সাধারণ কথা বার্তা স্বাভাবিক শুনিতে পায়।	ব্যথাবেদনা, পুঁজ নিঃসরণ।
তলপেট	কোমল, ব্যথাবেদনাহীন, কোন চাপ নাই।	কর্কশ, শক্ত, বেদনাদায়ক।

নির্দিষ্ট মান পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা স্বাস্থ্যের ভাল-মন্দের বিচার করিতে পারি। আর তাহা হইতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে তাহাও বাহির করিতে পারি।

যৌবনে বালিকাদের স্বাস্থ্যেব মান নিম্নরূপ হওয়া উচিত।

বিষয়	স্বাভাবিক মান
লম্বা	৫'৪" ইঞ্চি
বুকের প্রসারতা	৩৬" ,,
কোমব	২৮" ,,
ওজন	১০৯ পাউণ্ড

ইহাই স্বাস্থ্যের সব কথা নয়। মানসিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়া স্বাস্থ্যেব বিচার সম্পূর্ণ হইতে পাবে না। তাই সম্পূর্ণ বিচার কবিতে হইলে বাহিরের আকৃতি ও গঠনের সঙ্গে মনেব প্রকৃতিকেও বুঝিতে হইবে। কাহাবও মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা কবিতে হইলে তাহাব মনের কার্যকলাপ সেই বয়সের স্বাভাবিক মেয়েব মত কিনা তাহা গভীবভাবে অনুধাবন কবিতে হইবে।

নিবিষ্ট হইবার ক্ষমতা (Ability to concentrate)—মনেব ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য কবিলে দেখা যাইবে বাল্যকালে মন ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্যে ভবা থাকে। নূতন নূতন বস্তুকে জানিবার জন্যই তাহার এই ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য। কিন্তু বয়স বাড়িবাব সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থা কাটিয়া যায়। যুক্তিতর্ক, ভালমন্দ ইত্যাদি বিচাব কবিয়া মনকে বশে আনিতে আব কষ্ট হয় না। সকল কথা ভুলিয়া কোন কাজে তন্ময় হইয়া থাকিবার নাম নিবিষ্টতা।

সকলের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার প্রবণতা—সমাজ-বিজ্ঞান অনুসারে দেখা গিয়াছে মানুষ সামাজিক জীব। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকাই তাহার স্বভাবধর্ম। যে তাহা পাবে না তাহার মানসিক স্বাস্থ্যকে উপযুক্ত ও স্বাভাবিক বলা চলে না।

দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতা—সংসারে অভাব-অনটন, দায়-দায়িত্ব হইতে অহরহ কত দুশ্চিন্তা মানুষের মনে ভীড় করিতেছে

এবং তাহাকে বিব্রতও করিতেছে। মানসিক শক্তির বলে কেহ তাহা অতিক্রম করিতেছে, আবার কেহ তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই ভাবে চিন্তায় ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন হইয়া পড়া সুস্থমনের লক্ষণ নয়। সুস্থ সজীব মন ভালমন্দ বিচার করিয়া চট্ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। আর সেই ক্ষমতা-বলে সে সহজেই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পায়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের গুরুত্ব—ব্যক্তি শুধু আপনার মধ্যেই নাই, সংসার, সমাজ ও দেশের ভিতর সে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে একত্রিত করিয়া হয় পারিবারিক স্বাস্থ্য, বিভিন্ন পারিবারিক স্বাস্থ্যকে একত্রিত করিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য, আবার কতকগুলি সামাজিক স্বাস্থ্যকে একত্রিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য গড়িয়া উঠিতেছে। তাই স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের গুরুত্বও তত বেশী হইবে।

দেশের স্বাস্থ্যকে উন্নত করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে উন্নত করিতেই হইবে। এই কারণেই পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের দিকে এত ঝুঁকিয়াছে। বর্তমানে সোভিয়েট দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্বাস্থ্যহীন বালক-বলিকাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতির বিধান দেওয়া হয়। এইজন্য প্রত্যেক ছাত্রের একটি করিয়া হেল্‌থ-চার্ট রাখিতে হয়। সেখানে বিদ্যালয় শুধু পুঁথি পড়াইবার স্থান নয়, স্বাস্থ্য গড়িবার স্থানও বটে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেসব বালক-বালিকার দাঁত ও চোখ সুস্থ নয় তাহাদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যই দেশের মূলধন ; সুস্থ শিশু দেশের ভরসাস্থল। তাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি এত গুরুত্ব, সেইজন্য এত ব্যয়।

ব্যক্তিরও আরম্ভ শিশুকাল হইতে। গোড়া হইতে নীরোগ স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট শিশুর দল গড়িয়া তুলিতে পারিলে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দ্রুত উন্নতির দিকে চলিবে। ব্যক্তিগতভাবে মাতাপিতা যাহাতে শিশুর স্বাস্থ্য গড়িবার জন্য যত্ন নেন এবং আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইজন্য অনেক রাষ্ট্রে শিশু প্রদর্শনীর (Baby show) ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন রাষ্ট্রে পুরস্কারের ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে।

এখন কোন্ রাষ্ট্রে মৃত্যুর হার কত কম, শ্রমিকগণ কত পরিশ্রমী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য কত উন্নত, কোন্ দেশে প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা কম ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা-মূলক উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। এইজন্য প্রত্যেকে রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেছে—কেহ পরোক্ষভাবে, কেহ প্রত্যক্ষভাবে।

রোগ সংক্রমণে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের গুরুত্ব—রোগগ্রস্ত লোক সুস্থ মানুষের সঙ্গে চলাফেরা বা মেলামেশা করিলে, সেই রোগ অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। বহু রোগ দূরদেশ হইতে আগত নাবিক হইতে এদেশে সংক্রমিত হইয়াছে। সেইজন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াই সন্দেহজনক ব্যক্তিকে সমাজে মেলামেশা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তির শরীরে কঠিন রোগ সংক্রমিত হইয়াছে, অথবা যে লোক সেইরূপ রোগীর সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাকে রোগের লক্ষণ প্রকাশের সম্ভাব্যকাল পর্যন্ত বিশেষ একটি স্থানে আবদ্ধ রাখা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থাকে Quarantine বলা হয়।

আজকাল স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করিয়া জাহাজ হইতে নাবিক বা যাত্রীকে বন্দরে নামিতে দেওয়া হয় না। যদি কোন বিদেশী নাবিক বা যাত্রীর শরীর সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে তবে বন্দরে আসিলে তাহাকে আলাদা করা হয়। এই সঙ্গরোধকে

আন্তর্জাতিক সঙ্গরোধ (International Quarantine)বলা হয়। সমাজ ও দেশকে সংক্রামক রোগের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

উন্নততর জীবনের বিকাশ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের মূল্য—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য যত উচ্চস্তরের হইবে জাতীয় জীবনের মান তত উন্নত হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের স্বাস্থ্যের মান আমাদের চেয়ে উচ্চ। সেইজন্য তাহাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মান আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চ। সেখানকার কৃষকের বুদ্ধি, পরিশ্রমের দক্ষতা ও কর্মশক্তি, ছাত্রদের একাগ্রতা ও দুঃসাহসিক মনোভাব এদেশের মানকে ছাড়াইয়া অনেক উর্ধ্বে গিয়াছে। সর্বস্তরের মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা—উত্তম স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে। বিশেষ একটি উপাদান স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কতটা প্রয়োজনীয়, সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব কতটা, কি ভাবে ও কোন্ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন, আর কি পরিমাণ প্রয়োজন—এই ভাবে উদ্দেশ্য, পরিমাণ ও প্রয়োগ ব্যাপারে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টির জন্য (ক) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, (খ) মুক্ত বায়ু ও (গ) সূর্যকিরণ অতি প্রয়োজনীয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যের শত্রু রোগজীবাণু অপরিষ্কার পরিবেশেই থাকে। সুতরাং উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে গৃহ-পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসও অনুশীলন করিতে হইবে।

শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে নিয়মিত ভাবে স্নান করা প্রয়োজন। গায়ে সাবান মাখিয়া স্নান করিলে ধূলা, বালি, ঘাম ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ চর্ম হইতে দূর হয়। স্নানের সময় মৃদুভাবে গা রগড়ান বিশেষ উপকারী। ইহাতে শরীর ও চর্ম পরিষ্কার হয়। শরীর রগড়াইবার সময় চর্মের ঠিক তলদেশে কিছু বাড়তি রক্ত আসিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ রগড়ানর ফলে সেই রক্ত চর্মের স্নায়ুতন্ত্রকে অধিকতর সজীব করিয়া আরও সক্রিয় করিয়া তোলে। অবগাহন স্নান শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জলে স্নান করাই ভাল। তবে শরীর অসুস্থ হইলে উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত। স্নানের সময় প্রত্যেকে নিজের গামছা ব্যবহার করিবে। অপরের গামছা ব্যবহার করা কোন কারণেই সঙ্গত নয়। গ্রীষ্মকালে কয়েক বার স্নান করাই ভাল। কারণ সেই সময় শরীরের দূষিত পদার্থ বেশী বাহির হয়। শুধু স্নান করিলেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সব কাজ করা হইল না, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হইবে।

শরীরের বহিরঙ্গ সমূহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—

দাঁত ও মাড়ি—ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই আমাদের মাড়ির ভিতর দাঁতগুলি থাকে; কিন্তু দেখা যায় না। সাধারণতঃ পাঁচ-ছয়

মাস পরে দন্তোদগম হয়। এই সময়কার দাঁতকে দুধের দাঁত বলা হয়। দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই ঐ দাঁত পড়িয়া যায়। তারপর দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যে দন্তোদগম আরম্ভ হয় তাহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী। ক্যাল্‌সিয়াম-যুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত ব্যায়াম এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দাঁত ভাল রাখিবার পক্ষে প্রয়োজন। যে খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত হইয়া থাকে তাহাই ল্যাক্‌টো-ব্যাসিলাস্‌ এসিডোফিলাস নামক দন্তধ্বংসী জীবাণুকে বাড়িতে সাহায্য করে। এই জীবাণুগুলি
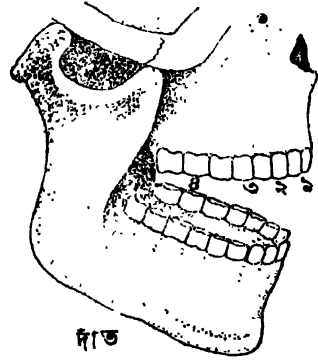
দাঁত

১ কৃন্তক, ২ ছেদক, ৩ চর্বক, ৪ পেচক
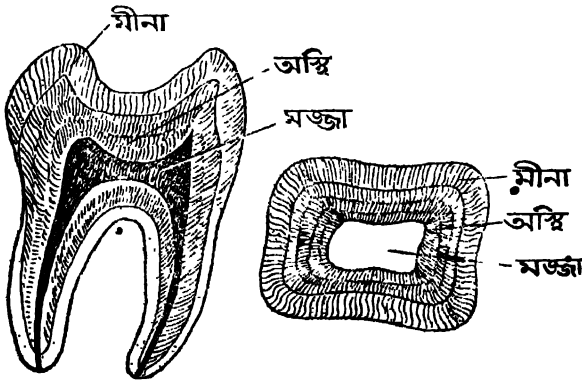
দাঁতের বিভিন্ন উপাদান

(লম্বভাবে ও আড়াআড়ি ভাবে দেখান হইয়াছে)

এক প্রকার অ্যাসিড তৈয়ারী করিয়া দাঁতের এনামেলের ক্ষতিসাধন করে। খাদ্যাংশের কণাগুলি দন্ত ও মাড়ির সংযোগস্থলে জমিয়া

পচিতে থাকে। এই পচনের ফলে মাড়ি আর দৃঢ় ও সতেজ থাকে না। উহাতে পুঁজ সঞ্চিত হইয়া মাড়ি ফুলিতে থাকে। এই রোগকে 'প্যাইওরিয়া' বলে।

পাইওরিয়ার পুঁজ খাদ্যদ্রব্যের সহিত পেটে যাইবার জন্য অজীর্ণ, আমাশয়, উদরাময়, বাত, হৃদ্-দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। পরে এনামেল ভাঙ্গিয়া যায় এবং দাঁতে গর্ত হয়, ইহাকে দন্তক্ষয় রোগ বলে।

কোন কোন বিজ্ঞানী অনুমান করেন যে স্টার্চ এবং চিনি অল্প গ্রহণ করিলে দাঁত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

দাঁত ভাল রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে পালন ও প্রয়োগ করিতে হইবে ঃ—

* প্রত্যেক বার আহারের পর ভাল করিয়া কুলকুচি করিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে খাদ্যকণা বাহির করিতে হইবে।

* ঘুম হইতে উঠিয়া, ঘুমাইতে যাইবার পূর্বে এবং আহারের পরে বিশেষ যত্ন সহকারে দাঁতন দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিবে।

* দাঁত দিয়া খুব শক্ত জিনিস ভাঙ্গিবার কু-অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত।

* টুথপেস্ট অথবা দাঁতন ভিন্ন ছাই, ঘুঁটে ও কাঠকয়লা দিয়া দাঁত মাজিবার অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিবে।

* উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য, বরফ ও আইসক্রীম দাঁতের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

* মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। জীবাণুনাশক দ্রব্য (যেমন—পারম্যাঙ্গানেট সলিউশন কিংবা কয়েক ফোঁটা ডেটল) গরম জলে মিশাইয়া উহার দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরিয়া কুলকুচি করিলে জীবাণুগুলি বিনষ্ট হইবে।

টাটকা ফলের ভিতর এমন এক প্রকার অ্যাসিড আছে যাহা প্রাকৃতিক গুণ অনুসারে দাঁতকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে।, তাই আহারের শেষে কিছু ফল খাওয়া দাঁতের পক্ষে ভাল।

চুল—নারীর কেশ যে সৌন্দর্য ও লাবণ্য সৃষ্টির প্রধান উপকরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেশের যত্ন লইয়া সৌন্দর্যকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। যাহা প্রকৃতি-প্রদত্ত সৌন্দর্য, তাহার মূল্য কৃত্রিম সৌন্দর্য অপেক্ষা অনেক বেশী। কি করিয়া চুলের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া তাহাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

মিলিত কেশগুচ্ছ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। চুলের একেবারে মূলদেশে ছোট ছোট স্নায়ু, পেশী, তৈলগ্রন্থি ও প্যাপিলা আছে। প্যাপিলা হইতেই চুলের উদ্গম হয়। একগাছি চুলের আয়ু সাধারণতঃ দুই হইতে চারি বৎসর। ঋতুবিশেষে মানুষের চুল-ধারণ-শক্তি যখন কমিয়া আসে তখন চুল ঝরিতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা শীতের শেষে এই পরিবর্তন দেখা যায়।

সুষম আহার করিলে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর দিলে চুলের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। প্রত্যহ চুল আঁচড়ান এবং বেশ কয়েক বার চুল বুরুশ করা প্রয়োজন। ইহা চুলের নোংরা, ধূলা ও ময়লা পরিষ্কার করে এবং কেশ উৎপাদনের স্নায়ুতন্ত্রকে সজীব করে। এইরূপ প্রসাধন চুলকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুন্দর করিয়া তোলে। চুল ভাল রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে শ্যাম্পু করা ভাল অভ্যাস। তবে অতিরিক্ত শ্যাম্পু করিবার ফলে চুলের গোড়ার স্বাভাবিক তৈলাক্ত পদার্থ উঠিয়া যায়।

চুল ভাল রাখিবার জন্য যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা প্রয়োজন, তাহাদের কথা বলা হইতেছে।

সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া চুল ঘসিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ক্ষার জাতীয় পদার্থ বেশী ব্যবহার করা ভাল নয়, বরং স্যাম্পু করাই ভাল।

উকুন ও মরামাস থাকিলে তাহা ধ্বংস করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহারা কেশের শত্রু। ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা ঃ—

চোখ কাপড় দিয়া ভালভাবে ঢাকিয়া লইতে হইবে। তারপর সম্পূর্ণ চুলকে কয়েক গুচ্ছে ভাগ করিয়া প্রতি কেশগুচ্ছের ভিতর ডি. ডি. টি. কিংবা বেঞ্জিল বেঞ্জয়েট প্রভৃতি উকুন ও মরামাস-ধ্বংসী পদাথ ব্যবহার করিতে হইবে। পরে মৃদু-গরম জলে সাবান ও ভিনিগারের সংমিশ্রণে চুল ঘসিয়া পরিষ্কার করিবে। ইহা ছাড়া বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি মাঝে মাঝে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে কেশ বৃদ্ধি পায়, সজীব থাকে এবং ইহার সৌন্দর্য রক্ষা করাও সম্ভবপর হয়।

* তেল, জল, সাবান ও স্যাম্পু ব্যবহার করিয়া নিয়মিত ভাবে চুলের যত্ন লইবে। প্রতিদিন চিরুনি ও ব্রাশের সাহায্যে চুল আঁচড়াইতে হইবে।

* .উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং চুলবৃদ্ধির সহায়ক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া কেশরাশিকে বাড়িতে দিবে। মাথায় তেল দিবার সময় চুলের গোড়ায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তাহাকে মাথায় বসাইতে হইবে।

* ইউরোপের মহিলারা হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে যাইয়া সুন্দর ভাবে মাথা ম্যাসাজ করাইয়া লন। ম্যাসাজ করিবার ফলে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং রক্তসঞ্চালনও বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থা চুলের পক্ষে মহা উপকারী।

মনের অকারণ উদ্বেগ ও চিন্তা চুলের স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইলে চুলের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনে ব্যাঘাত হয়। কাজেই মাথায় টুপি, পাগড়ি প্রভৃতি ব্যবহার না করাই ভাল। ইহাতে স্বাভাবিক ভাবে রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না, তাহার ফলে চুল উঠিয়া যায়। অনেক সময় মাথায় টাকও পড়ে।

চুল ভিজাইয়া স্নান করিলে তাহাকে ঝরঝরে করিয়া শুকাইবার পর বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা না করিলে চুলের গোড়া পচিয়া উহা নষ্ট হইয়া যায়। চুলের জন্য পরিমিত সূর্যকিরণ বিশেষ উপকারী। কাজেই পরিমিত সূর্যকিরণ যাহাতে চুলে আসিয়া পড়ে সেইদিকে বিশেষ নজর রাখিবে।

হাত-- হাত শরীরের অপর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমরা অধিকাংশ কাজই হস্তচালনা করিয়া করি। ব্যবহারিক জীবনে হাতের প্রয়োজন খুবই বেশী। কাজেই হাতকে সক্রিয় ও স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা হাতের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারি :—

* বাহির হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া হাত, পা ও মুখ সাবান দিয়া পরিষ্কার করা উচিত। খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিবার পূর্বে ভাল করিয়া হাত ধুইয়া ফেলিবে। অফিস, স্কুল, কলেজ বা খেলার মাঠ হইতে ফিরিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে হইলে ডেটল-মিশ্রিত জলে হাত পরিষ্কার করিয়া লওয়া একান্ত কর্তব্য।

* হাতের আঙ্গুলে খুব বড় নখ রাখা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ইহাতে আহারের সময় নখের ময়লা খাদ্যের সহিত পেটে প্রবেশ করিয়া অনেক কঠিন রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। তাই আঙ্গুলের নখ সমান করিয়া কাটা অভ্যাস করিবে।

* প্রতি বার মল ও মূত্র ত্যাগ করিবার পর সাবান দিয়া

ভালভাবে হাত-পা পরিষ্কার করা উচিত। পায়খানার সঙ্গে অনেক সময় নানা প্রকার রোগজীবাণু বাহির হয়। সেই জন্য হাত ধুইবার সময় সাবান ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে হাতের দুর্গন্ধ দূর হইবে এবং মনও শুচিতায় পূর্ণ হইবে।

* হাতে করিয়া বাড়ীর আবর্জনা পরিষ্কার করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। সংক্রামক রোগীর সেবা করিবার পর ডেটল বা বেঞ্জিটল দিয়া হাত পরিষ্কার করা উচিত।

চক্ষু—চোখ আমাদের বড় প্রয়োজনীয় অঙ্গ। চক্ষু না থাকিলে এই শোভা-সৌন্দর্যপূর্ণ পৃথিবী আমাদের নিকট অর্থহীন হইয়া
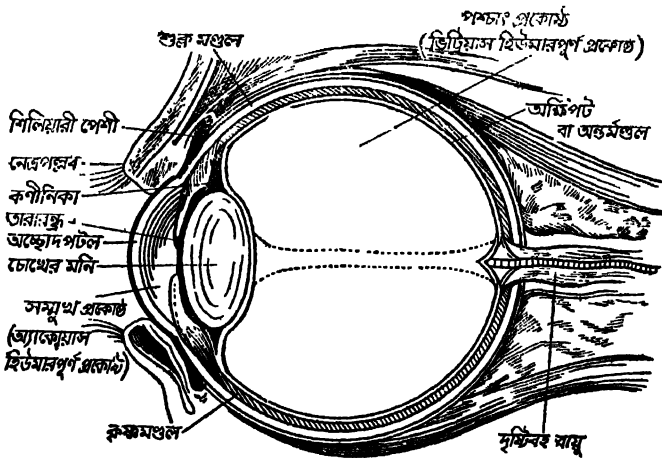
নেত্রগোলক ও মাঝে উহার লেন্স

পড়িত। চক্ষু চারিটি অংশ লইয়া গঠিত—(১) চক্ষুগোলক (Eye-ball), (২) চক্ষুপল্লব (Eye-lids), (৩) চক্ষুপেশী (Eye-muscles), (৪) অশ্রুগ্রন্থি (Lachrymal glands and ducts)।

চোখের মত প্রয়োজনীয় অঙ্গ একবার নষ্ট হইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই চোখের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিসাধনের

জন্য সজাগ হওয়া প্রয়োজন। চোখের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত :—

* একটানা এবং অধিকক্ষণ চোখের পরিশ্রম করা উচিত নয়। ইহাতে শুধু দৃষ্টিশক্তিই ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইবে না, তাহার সহিত মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য ও গা-বমি প্রভৃতি নানা উপসর্গও দেখা দিবে। সেইজন্য মাঝে মাঝে চোখকে একটানা পরিশ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।

* মৃদু বা জোরালো যে কোন কৃত্রিম আলো চোখের পক্ষে ভাল নয়। সূর্যের আলোই চোখের উপযুক্ত। তাই সকল প্রকার চোখের কাজ দিনের আলোতেই করা ভাল। চোখের স্বাস্থ্যের জন্য চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম, উলের কাজ প্রভৃতি সূক্ষ্মকাজ কখনও রাত্রে করা উচিত নয়।

* খুব উজ্জ্বল গাঢ় রঙ চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহাতে অল্প-ক্ষণের মধ্যেই চোখ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য ঘরের দেওয়ালের ও পর্দার রঙ মৃদু ও স্নিগ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে চোখের উপর কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঘটে না। সবুজ রঙ চোখকে স্নিগ্ধ করে। ঘর ডিস্‌টেম্পার করিলে ও বাড়ীর সম্মুখে সবুজ-গাছপালা-শোভিত বাগান রাখিলে সেই স্নিগ্ধ সবুজ রঙে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

* মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিলে ক্লান্ত চোখ স্নিগ্ধ হয়। চোখকে বিশ্রাম দিবার জন্য নীল আকাশের দিকে, শ্যামল বনভূমির দিকে, নদীর নির্মল জলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইবার অভ্যাস করিতে হয়।

* চোখের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ও স্বাভাবিক রাখিতে হইলে উপযুক্ত খাদ্যও গ্রহণ করা উচিত। ভিটামিন 'এ' ও স্নেহপদার্থ চোখের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর। এই সকল পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ

করিবার পর একটানা দীর্ঘ সময় কাজের অভ্যাস না করিয়া মাঝে মাঝে চোখকে বিশ্রাম দিয়া কাজ করিবার অভ্যাস করিলে চোখের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কর্ণ—শব্দ শোনা বা উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রভৃতির কাজে কর্ণই আমাদের একমাত্র সহায়। চক্ষুর মত কর্ণও আমাদের অতি প্রয়োজনীয়
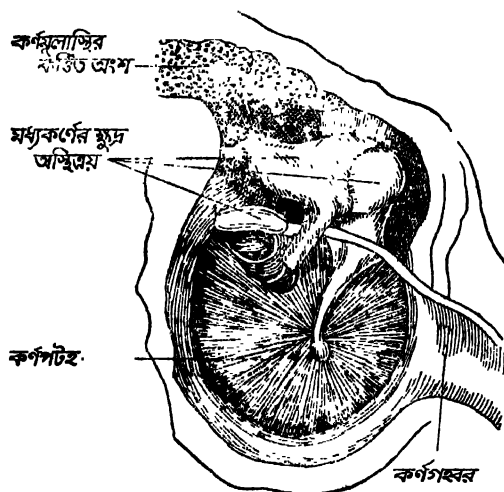
মধ্যকর্ণ, কর্ণপটহ ও কর্ণগহ্বর

ইন্দ্রিয়। (১) বহিঃকর্ণ, (২) কর্ণকুহর বা কর্ণগহ্বর, (৩) কর্ণপটহ, (৪) মধ্যকর্ণ, (৫) অন্তঃকর্ণ ও (৬) শ্রুতিনালী—এই ছয়টি অংশ লইয়া কর্ণ গঠিত।

বায়ুমণ্ডলে কোন বস্তুর স্পন্দন বা আন্দোলন হইলে বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই শব্দতরঙ্গ সোজা কর্ণকুহরের মাধ্যমে কর্ণপটহে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন কর্ণপটহ স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দন-বেগ মধ্যকর্ণের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করিয়া ককলিয়া বা শব্দগ্রাহী যন্ত্রকে কম্পিত করে। তখন শ্রবণ-স্নায়ু আজ্ঞাবাহীর মত মস্তিষ্কে সেই স্পন্দন প্রেরণ করে। এই ভাবে

শ্রবণকার্য সম্পন্ন হয়। কর্ণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সচেতন হওয়া উচিত।

নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা কর্ণের যত্ন লইতে পারি :—

* অত্যন্ত কর্কশ ও তীব্র শব্দ কর্ণের পীড়াদায়ক ও অসহ্য হইয়া উঠে। সুতরাং কর্কশ বা তীব্র শব্দ যাহাতে কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে সে-বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। অপরিমিত শব্দ-চাপ কর্ণপটহকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে।

* কানে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগা, জল প্রবেশ করা ভাল নয়। কান হইতে পুঁজ পড়িলে, কান পাকিলে বা অন্য কোন প্রকার
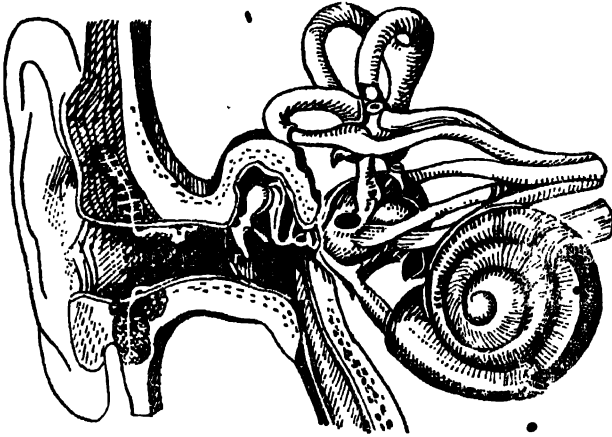
কর্ণের শ্রবণযন্ত্র বা ককলিয়া

পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড্ দিয়া বরিক তুলার সাহায্যে মাঝে মাঝে কান পরিষ্কার করা ভাল।

* কানে যাহাতে খইল না জমে কিংবা কোন ময়লা সঞ্চিত না হয় সেই জন্য তুলাতে সামান্য গ্লিসারিন মাখাইয়া কান পরিষ্কারের অভ্যাস করিবে। গলা ও মুখবিবরের সহিত কানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। অনেক সময় গল-গ্রন্থিতে প্রদাহের সৃষ্টি হইলে বা টনসিল এবং শ্লেষ্মার বৃদ্ধি ঘটিলে শ্রবণশক্তি ব্যাহত হয়।

জিহ্বা—জিহ্বাকে আমরা রসনেন্দ্রিয় বলি। রসনা দ্বারা স্বাদগ্রহণক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। মাংসপেশীর দ্বারা ইহা গঠিত; পেশীগুলি প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা ইহা আবৃত জিহ্বার নিম্নাংশ মসৃণ হইলেও উপরিভাগ অমসৃণ, উপরিভাগে সূক্ষ্ম দানার মত গুটি আছে। এইগুলিকে স্বাদযন্ত্র বলে। ইহাদের সাহায্যে খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা সহজ হয়। জিহ্বার দ্বারা (১) খাদ্যের স্বাদগ্রহণ, (২) উচ্চারণ-কার্যে সাহায্যদান ও (৩) খাদ্যবস্তুকে লালা মিশ্রিত করা প্রভৃতি কাযগুলি সম্পাদিত হয়। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত স্বাস্থ্যের জন্য জিহ্বার বিশেষ যত্ন লওয়া প্রয়োজন। জিহ্বা অসুস্থ থাকিলে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যের উপর প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া স্বাস্থ্যের দারুণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।
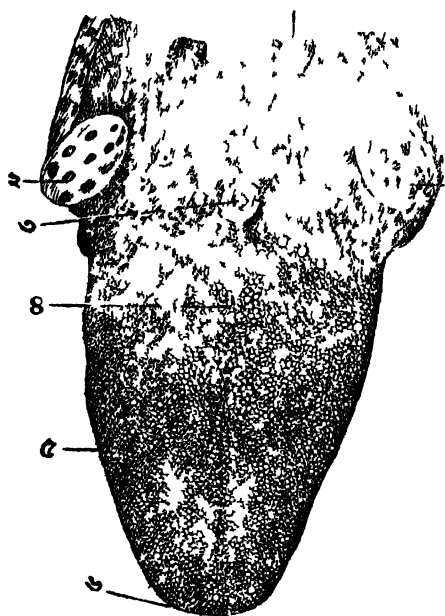
জিহ্বা
১ আলজিভ, ২ টন্‌সিল, ৩ তিক্ত, ৪ স্পর্শ, ৫ অম্ল ও লবণ, ৬ মিষ্ট স্বাদ বোধের স্থান

নিম্নোক্ত উপায়ে জিহ্বার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা যাইতে পারে:—

* প্রত্যহ দাঁত মাজিবার সময় জিব-ছোলা বা দাঁতন-কাঠি অর্ধগোলাকার করিয়া জিহ্বার উপরিভাগ পরিষ্কার করিতে হইবে।

* জিহ্বার উপরিভাগে কোন প্রকার ঘা হইলে ঝাল, লবণ ও তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহাতে যে শুধু খাদ্যগ্রহণে কষ্ট হয় তাহাই নয়, তাহার ফলে রোগ বাড়িয়া যায় এবং জিহ্বারও বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। ঐ অবস্থায় দুধভাত খাওয়াই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

* জিহ্বায় ঘা হইলে সাধারণ গৃহচিকিৎসা হিসাবে মধু দিয়া সোহাগার খৈ বা বরিক পাউডার সেখানে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে উপকার না হইলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখান প্রয়োজন।

নাসিকা—নাসিকা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহার সাহায্যে সকল বস্তুর ঘ্রাণ লইতে পারি এবং ইহার সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়। কাজেই নাসিকা সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

নাসিকা ও কয়েকটি উপাঙ্গ
১ নাসাপথ, ২ নাসারন্ধ্র, ৩ গলবিল, ৪ গলাধন, ৫ উপজিহ্বা, ৬ শ্বাসনালী

নাসিকা পরিষ্কার ও সুস্থ রাখিবার উপায় :—

* নাসিকা বন্ধ হইয়া গেলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকার্যে ব্যাঘাত ঘটে। তখন মুখ দিয়া ঐ কাজ করিতে হয়। কিন্তু ইহা খুব স্বাস্থ্যসম্মত উপায় নয়। সেইজন্য নাসারন্ধ্রে তৈল দিয়া বা লবণ-জল দ্বারা নাস লইয়া নাসাপথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। স্নানের পূর্বে নাসাপথ

দিয়া তৈল টানিবাব যে নিযম প্রচলিত আছে তাহা বিশেষ স্বাস্থ্যকব ব্যবস্থা।

* নাসিকার ভিতব সর্দি জমিযা এক প্রকাব ময়লা সঞ্চিত হয। উহা হইতে নাসিকাকে মুক্ত বাখা প্রয়োজন। নখ দিযা খুঁটিযা তাহা বাহিব কবা উচিত। নখ যাহাতে ছোট ও পবিষ্কাব থাকে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য বাখিতে হইবে।

* নাকে নস্য দেওযা স্বাস্থ্যেব পক্ষে ভাল নয। এই অভ্যাস নোংবা এবং ক্ষতিকব। শ্লেষ্মা বাহিব কবিবাব জন্য নাক ঝাড়িয়া ফেলাই ভাল। নাকেব শ্লেষ্মা মুখ দিয়া টানিয়া গিলিযা ফেলা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয।

শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—

শুধু বাহিবেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সযত্নে পবিষ্কাব কবিলেই স্বাস্থ্যবক্ষাব সকল বিধি-নিয়ম পালন কবা হয না ; আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও পবিষ্কাব কবিবাব জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রযোজন। আভ্যন্তবীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিষ্কাব এবং সুস্থ বাখিতে না পাবিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা। শবীবেব গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসাবে শবীবেব ভিতবের দূষিত পদার্থ স্বাভাবিকভাবে বাহিব হইযা আসিলেও সেই ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে সক্রিয বাখিবাব জন্য আমাদেবও সহযোগিতা কবিতে হইবে।

(ক) মলমূত্রত্যাগ ও (খ) ঘর্ম নির্গমন—এই দুই প্রক্রিয়াব ভিতব দিয়া আমাদের দেহেব আভ্যন্তবীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিষ্কৃত হয। শবীবেব ভিতবেব ময়লা বাহিব কবাই আভ্যন্তবীণ পবিষ্কাব-পরিচ্ছন্নতাব প্রধান উদ্দেশ্য।

মলত্যাগ—শৈশবকাল হইতে প্রত্যহ নিযমিতভাবে একই সময়ে

মলত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। এইরূপ অভ্যাস করিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ হইতে পারে না। যে সব খাদ্যে আঁশ আছে, অথবা তৈলাক্ত পদার্থ এবং স্নেহ পদার্থ আছে সেই সব খাদ্যদ্রব্য মল নিষ্কাশনে বিশেষ সাহায্য করে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে প্রত্যহ ১২ আউন্স মল ত্যাগ করে। মলের ভিতর শতকরা ৬৫ ভাগ জল, ৩৫ ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ জল পান না করিলে স্বাভাবিক মল ত্যাগ করা কঠিন হইয়া পড়ে। নিদ্রা ত্যাগ করা মাত্রই গ্লাসভর্তি ঠাণ্ডাজল পান করিলে মল সহজেই বাহির হইতে পারে। বেশীর ভাগ মানুষ পরিমিত জল পান করে না। পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রত্যহ ছয় হইতে আট গ্লাস কিংবা তাহারও বেশী পরিমাণ জল পান করা উচিত।

কথায় কথায় জোলাপ গ্রহণ করা উচিত নয়, তাহাতে স্বাভাবিক মলত্যাগ করিবার অভ্যাস নষ্ট হইয়া যায়। প্রয়োজন হইলে মধ্যচ্ছদা ও উদরপেশীকে সঙ্কুচিত করিয়া অধোগামী কোলনের উপর চাপ দিয়া মল নির্গমনের চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ শরীর চালনা এক প্রকারের ব্যায়াম। ইহা মল নির্গমনের বিশেষ সহায়ক।

মূত্রত্যাগ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষ সাধারণতঃ প্রায় ৫০ আউন্স মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। অবশ্য বয়স ও অন্যান্য কারণে ইহার তারতম্য ঘটে। তাপ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ত্বকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মূত্রের পরিমাণকে মাত্রায় কমবেশী করিতে পারে। মূত্রত্যাগে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, স্বাভাবিক মাত্রা যাহাতে কমিয়া না যায় সেইজন্য প্রচুর জল পান করা আবশ্যক। অনেক সময় সূর্যকিরণের প্রচণ্ডতা এবং জলপানের মাত্রার স্বল্পতা হেতু শরীর কষিয়া যায়। সেই সময় হলুদ রঙের মূত্র বাহির হয়। মূত্র নির্গমনের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টও হয়।

এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে মিছরির সরবৎ, জল ও ডাবের জল পান করিতে হয়।

ঘর্ম—ঘর্মের সহিত আমাদের দেহের দূষিত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বাহির হয়। দেহের আভ্যন্তরীণ দূষিত তরল পদার্থ ঘর্ম-রূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ত্বকের ভিতর যে অসংখ্য ছিদ্র আছে তাহাকে রোমকূপ বা লোমকূপ বলে। এই লোমকূপের সাহায্যে দূষিত পদার্থ বাহির হয়।

প্রতিদিন ২ হইতে ২০ পাউণ্ড পরিমাণ দূষিত তরল পদার্থ আমাদের দেহের ভিতর হইতে ঘর্ম এবং অন্যান্য আকারে বাহির হইতেছে। সেইজন্য ত্বককে প্রত্যহ পরিষ্কার করা উচিত। ত্বক পরিষ্কার না রাখিলে ঘর্ম বাহির হইতে পারে না।

লোমকূপ বন্ধ হইয়া যদি দূষিত পদার্থ ঘর্মরূপে বাহির হইতে না পারে তবে দাদ, কাউর, খোসপাঁচড়া, ব্রণ প্রভৃতি নানা প্রকারের চর্মরোগ দেখা দেয়।

ঘর্মনির্গমন-কার্যকে সক্রিয় রাখিতে হইলে মুক্তবায়ু ও সূর্যকিরণ সেবন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা বিশেষ প্রয়োজন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যরক্ষার মূল বুনিয়াদ। পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে জলবায়ু, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া উচিত। আবার মুখগহ্বর, চক্ষু, নাক, কান, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

পরিপুষ্ট এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সুস্থ মন আদর্শ স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মুক্ত বায়ু

জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির সবচেয়ে মূল্যবান দান হইল বায়ু। বায়ু ব্যতীত স্বাস্থ্য ও শরীর কখনও টিকিতে পারে না। বায়ু বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন এক প্রকার সঞ্চরণশীল বাষ্পীয় পদার্থ। উত্তাপে ইহা প্রসারিত হয়, আবার শৈত্যে সঙ্কুচিত হয়।

আমাদের শরীরের উপর বায়ুর চাপ ২ মণ ২৫ সের বা ১৪।১৫ স্টোন। শীতকালে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস কাহারও ভাল লাগে না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে মলয় সমীরণ কাহার না ভাল লাগে? স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী (ক) উষ্ণতা (Temperature), (খ) আর্দ্রতা (Humidity), (গ) চাপ (Pressure), (ঘ) প্রবাহ বা গতি (Movement), এই চারিটি বৈশিষ্ট্য বায়ুর ভিতর রহিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে যে বায়ুপ্রবাহ হয়, তাহা শরীরে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এই উষ্ণবায়ুতে অক্সিজেন খুব অল্পই থাকে। ফলে শ্বাসকার্যে ব্যাঘাত ঘটে, ক্ষুধা নষ্ট হয়, কর্মশক্তি হ্রাস পায়, স্নায়ুতন্ত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। শুধু অক্সিজেনের মাত্রা কমিবার জন্য এই বিপর্যয় ঘটে। আবহাওয়ার উষ্ণতা ৫০ ডিগ্রী হইতে ৬০ ডিগ্রীর ভিতর থাকিলে পরিমিত অক্সিজেন গ্যাস কম হয় না। এই মাত্রার বায়ুপ্রবাহ সুখকর, বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলে সেই বায়ুপ্রবাহকে আর্দ্রবায়ু বলা হয়। বায়ুর ভিতর আর্দ্রতার মাত্রা যদি শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ হয় তবে তাহা স্বাস্থ্যকর, বিশুদ্ধ ও আরামদায়ক হয়। কিন্তু এই মাত্রা ছাড়াইয়া আর্দ্রতার পরিমাণ যদি শতকরা ৭৪ ভাগের বেশী হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ ও আরামদায়ক হইতে পারে না।

তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রীর বেশী হইলে আবহাওয়া শুষ্ক হইবে এবং ৪০ ডিগ্রীর কম হইলে তাহা অত্যন্ত আর্দ্র হইবে। অত্যন্ত শুষ্ক কিংবা অত্যন্ত আর্দ্র বায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

আর্দ্রতা ও উষ্ণতার মাত্রার উপর বায়ুর চাপ কমে অথবা বাড়ে। সাধারণতঃ বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৭½ সের। বায়ুর চাপ অসম্ভব রকম কমিলে বা বাড়িলে স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।

মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ বায়ুপ্রবাহ আরামদায়ক। ঐ প্রবাহের দ্বারা জীবাণু, ধূলি, দূষিত গ্যাস সাময়িক ভাবে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। উষ্ণতা, আর্দ্রতা এবং চাপ যখন বায়ুতে স্বাস্থ্যের পক্ষে নির্ধারিত উপযুক্ত মাত্রায় অবস্থান করে, এবং বায়ু যখন ইহার সঠিক প্রবাহ বজায় রাখে তখনই তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ বলা হয়।

যে সব গ্যাসের সংমিশ্রণে বায়ুর সৃষ্টি তাহাদের প্রভাবেই বায়ুর মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অবস্থান করে। কোন্ গ্যাস বায়ুতে কোন্ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে তাহা জানিবার জন্য তোমাদের বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইবে।

প্রতি ১০০ ভাগ বায়ুতে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি থাকিবে: অক্সিজেন ২০.৯৬ ভাগ, নাইট্রোজেন ৭৯.০০ ভাগ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ০.০৪ ভাগ। এই উপাদানগুলি ছাড়াও ওজোন, এমোনিয়া, জলীয় বাষ্প, ভাসমান ধূলিকণা, আর্গন, নিয়ন, জেনন, ক্রুপটন, হিলিয়ম প্রভৃতি উপাদান কিছু কিছু পরিমাণে থাকে।

অম্লজান বা অক্সিজেন—ইহা বাতাসে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ থাকে। ইহা দেহকে গরম রাখে, কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও স্বাস্থ্য অটুট রাখে। ইহার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়। কেবল অম্লজান বা অক্সিজেন ব্যবহার করিলে শরীর অসুস্থ হয়। তাই

বায়ুতে অক্সিজেনের চারিগুণ বেশী নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। বায়ুতে সঠিক অনুপাতে গ্যাস দুইটি মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলিতে পারি।

নাইট্রোজেন—ইহা দাহ্য পদার্থ নয়, নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুতে ইহার পরিমাণ অক্সিজেনের প্রায় ৪ গুণ। ইহা অক্সিজেনের দহন-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অক্সিজেন গ্যাসকে শ্বাসকার্যে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড—সমস্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর ভিতর প্রতিনিয়ত দহনকার্য চলিতেছে। এই দহনের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ইহাকে আমরা নানা ভাবে পাইয়া থাকি।

(১) জীব-জন্তুর নিঃশ্বাস, (২) পচা উদ্ভিজ্জ পদার্থ, প্রাণিজ পদার্থ, ডোবা ও কয়লার খনি, (৩) শুষ্ক ঘাস ও খড় এবং যে কোন দহনকার্য হইতে এই গ্যাস পাওয়া যায়।

ওজোন—মুক্ত প্রান্তরে, সমুদ্রের ধারে, লোকালয় হইতে দূরে ওজোন পাওয়া যায়। ইহা বাতাসে বেশী মিশ্রিত হইলে সুনিদ্রা হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

যে বায়ু মানব-স্বাস্থ্যের উপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলির মাত্রা রক্ষা করিয়া তাহার সকল উপাদানসহ প্রবাহিত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনধারণে সাহায্য করে তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু বলে।

বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা—বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের নিকট নিম্ন-লিখিত কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয়:—

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহের পুষ্টিসাধনে ইহার অবদান অশেষ; (২) ইহা ক্লান্ত দেহ ও মনে শান্তি ও প্রফুল্লতা দান করে; (৩) ইহা ফুস্‌ফুসের শোণিতে অম্লজান প্রেরণ করে; দূষিত জীবাণু দূর করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করাও ইহার অন্যতম কাজ।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহের পুষ্টিসাধন—স্বাস্থ্যের জন্য যত প্রাকৃতিক উপাদানের প্রয়োজন, তাহার মধ্যে বায়ুই প্রধান। বায়ুর ভিতর এমন কিছু গ্যাসীয় পদার্থ আছে শরীর গঠন ও পরিচালনার জন্য যাহাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। অক্সিজেন ভিন্ন আমরা বাঁচিতে পারি না। এই গ্যাস প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহকে উষ্ণ করে এবং কার্যক্ষমতা অটুট রাখে। ইহা ফুস্‌ফুসের ভিতরে গিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ রাখিতে সাহায্য করে, এবং লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সহিত মিলিয়া অক্সি-হিমোগ্লোবিন-এ পরিণত হয়। এই অবস্থায় ইহা দেহের সমস্ত কোষে সঞ্চারিত হইতে থাকে। শুধু অক্সিজেন কিন্তু স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে কল্যাণকর নয়, ইহার সহিত শতকরা ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকিলে তবে ইহা স্বাস্থ্যকর ও ব্যবহারোপযোগী হয়।

ক্লান্ত দেহ-মনে শান্তি ও প্রফুল্লতা দান—অত্যধিক পরিশ্রম এবং আবহাওয়ায় উষ্ণতার পরিমাণ অধিক হইলে জীবজগতে এক অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। উষ্ণ বায়ুতে অক্সিজেন পরিমিত মাত্রায় থাকে না। তাই সারা দেহে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। উষ্ণ বায়ুতে শ্বাসকার্য ও হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ মন্থর হইয়া পড়ে। ক্ষুধা কমিয়া যায়, পরিপাকশক্তি নষ্ট হয়, যকৃৎ, অন্ত্র প্রভৃতির কার্যও স্বাভাবিক থাকে না, স্নায়ুতন্ত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই সময় ৫০° ডিগ্রী হইতে ৬০° ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতা লইয়া যদি বায়ু প্রবাহিত হয় তবে তাহা দেহের সকল ক্লান্তি ও গ্লানি দূর করে। মনে প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসে এবং মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটে। কাজেই দেহ ও মনের ক্লান্তি দূর করিয়া তাহাকে সজীব করিবার জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

ফুস্‌ফুসের সহিত সহযোগিতা করিয়া রক্ত ও দেহকোষকে সক্রিয় করা—অক্সিজেনপূর্ণ বায়ুকে আমরা নাসিকার সাহায্যে গ্রহণ করি। নাসাপথের সূক্ষ্ম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উহাকে শোধিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া দেহযন্ত্রের নানা অলিগলির ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসে লইয়া যায়। ফুস্‌ফুসের বায়ুস্থলীতে বায়ু ভিন্ন কোন তরল পদার্থ অনায়াসে চলিতে পারে না। কাজেই রক্তের লোহিতকণা সমূহের হিমোগ্লোবিন যখন বায়ুকোষের সংস্পর্শে আসে তখন অক্সিজেনকে টানিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে লইয়া যায় এবং ইহা দেহকোষের অঙ্গারের কিছু
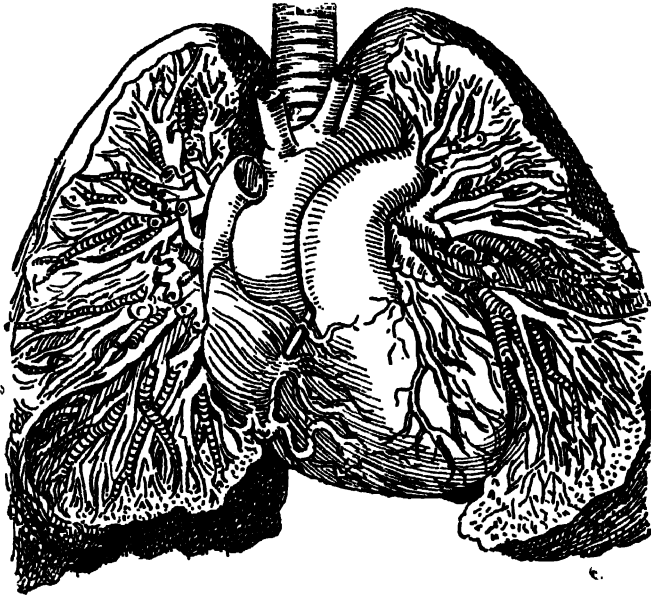
ফুস্‌ফুস

অংশের সহিত মিলিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায়। এই ভাবে বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের দেহকোষ ও রক্তসঞ্চালন-ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখে এবং দেহের কোষকে সঞ্জীব ও পুষ্ট করিয়া তোলে।

দূষিত বায়ুর রোগজীবাণু প্রভৃতি দূর করা—দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার মত স্বভাবজাত ক্ষমতা বায়ুপ্রবাহের আছে। বায়ু কখনও নিশ্চল থাকে না। সকল সময় ইহা সঞ্চালিত হয়—কখনও প্রবলবেগে, কখনও বা ধীরে প্রবাহিত হয়। সেই কারণে বায়ুস্থিত দূষিত গ্যাস, রোগজীবাণু ও ধূলিকণা বিশেষ অঞ্চল-কেন্দ্রিক (localised) হইতে পারে না, চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে উহার শক্তিও অনেক ক্ষীণ হয়। ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু তাহার সহিত মিশিয়া ঐ বায়ুকে অনেক পরিশুদ্ধ করে।

অনেক পরীক্ষার পর প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি ঘণ্টায় শিশুদের জন্য ১৫০০—২০০০ ঘনফুট, অলস প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৩০০০ ঘনফুট, অল্প পরিশ্রমীদের জন্য ৪৭৫০ ঘনফুট, কঠোর পরিশ্রমীদের জন্য ৬০০০—৯০০০ ঘনফুট, এবং পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য ৩৭৫০ ঘনফুট, বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয়।

দূষিত বায়ুর কথা ঃ

বিশুদ্ধ বায়ু কি, তাহার গুণ কি, মানুষের স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব কতখানি ইত্যাদি অনেক কথা তোমরা জানিয়াছ। দূষিত বায়ু কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ কি, মানুষের স্বাস্থ্যের উপরই বা সেই বায়ু কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করে এখন সেই সব বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে।

বিয়োজন-জাত দ্রব্য—কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণী বিয়োজিত হইয়া নানা প্রকার গ্যাসের সৃষ্টি করে। তাহার ফলে বায়ু দূষিত হয়। বিয়োজন-জাত দ্রব্য (Decomposed Products) হইতে সৃষ্ট গ্যাসের ভিতর (১) সালফুরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphuretted Hydrogen, H_2S), (২) মার্শগ্যাস (Marsh gas, CH_4), (৩) কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide, CO_2), (৪) কার্বন মনোক্সাইড

(Carbon monoxide, CO) ও (৫) অ্যামোনিয়া (Ammonia, NH_3) প্রভৃতি গ্যাসগুলি বায়ুকে নানা প্রকারে দূষিত করে। ইহা ভিন্ন ধূলিকণা এবং রোগজীবাণুর দ্বারাও বায়ু দূষিত হইতে পারে।

বায়ুতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান কঠিন পদার্থ থাকে তাহাই ধূলি। রোগজীবাণু ধূলির ভিতরকার বস্তু। স্বাস্থ্যে ধূলি কথাটি রোগজীবাণুকেও বুঝাইয়া থাকে। ধূলি তিন প্রকার পদার্থ হইতে সৃষ্ট হয়ঃ (ক) জৈব পদার্থ (organic matter), যেমন—পশম, রেশম, চুল, পালক, চামড়া, পোকামাকড়ের দেহের অংশ, রক্ত, পুঁজ, মল, পাট, ঘাস, ফুলের পাপড়ি, তুলার রোঁয়া ইত্যাদি; (খ) অজৈব পদার্থ, যেমন—মৃত্তিকা, বালি, পাথর, সীসা, লৌহ, দস্তা প্রভৃতি; (গ) বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু।

বায়ুতে ঐসব রোগজীবাণু মিশ্রিত হইয়া নানা ভাবে বায়ু দূষিত করে ও রোগ বিস্তার করে। ইহা ছাড়াও নিঃশ্বাসজাত পদার্থের দ্বারাও বায়ু দূষিত হইতে পারে।

দহন ও বিয়োজন প্রক্রিয়ায় বায়ু কি ভাবে দূষিত হয়—বায়ু প্রথমেই দূষিত হইয়া প্রবাহিত হয় না। বহু দূর, বহু পথ প্রবাহিত হইতে হইতে নানা প্রকার অস্বাস্থ্যকর বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু দূষিত হইতে আরম্ভ করে। দহন ও বিয়োজন প্রক্রিয়ার সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু অতি দ্রুত দূষিত হইতে থাকে। যে কোন বস্তুকে দগ্ধ করিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড নামে দুইটি গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই দুইটি গ্যাস স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। বদ্ধ ঘরে কেরোসিন-বাতি জ্বালাইয়া শয়ন করিলে তাহা বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে। কয়লার গ্যাসও বায়ুকে দূষিত করে। দহনকার্যের ভিতর বায়ু যখন দূষিত হয় তখন বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। গৃহের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যদি ডোবা, সংস্কারহীন নালা,

বৃষ্টির জলে পচা বৃক্ষ কিংবা জীবজন্তুর পচা দেহ থাকে তবে বিয়োজন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, এবং আঞ্চলিক বায়ু ও গৃহের বায়ু দূষিত হইতে আরম্ভ করে।

অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও অভ্যাস—প্রত্যেকের রুচি ও সংসার চালনার ব্যবস্থা এক রকম নয়। অনেকের অস্বাস্থ্যকর উপায়ে গৃহ পরিচালনার অভ্যাস থাকে। এই পরিবেশে বায়ু অতি সহজেই দূষিত হয়। শয়নঘরে প্রচুর আসবাব, গৃহপালিত পশুপক্ষী থাকিলে এবং গৃহ-পরিসর স্বল্প হইলে বায়ু তাড়াতাড়ি দূষিত হইয়া পড়ে। আবার যেখানে সেখানে শিশুদের মলমূত্র ত্যাগ করাইলে, দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে দিলে, বাড়ীর ভিতর অপরিষ্কার নালা, পায়খানা ও গাছের ঝোপ থাকিলে বায়ু অতি শীঘ্রই দূষিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। বাড়ীর নিকট কলকারখানা—বিশেষতঃ রাসায়নিক কারখানা থাকিলে নানা প্রকার গ্যাসের সংমিশ্রণে বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হইয়া পড়ে।

নিঃশ্বাসজাত পদার্থের দ্বারা—সুস্থ মানুষের নিঃশ্বাস হইতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী নাই, কিন্তু অসুস্থ মানুষের নিঃশ্বাস হইতে বায়ু দূষিত হইতে পারে। রোগীর হাঁচি, কাশি ও নিঃশ্বাসবায়ুর সহিত জীবাণু বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণুসমূহ এই ভাবে বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে দূষিত করে।

বিস্ফোরণ—বিস্ফোরণের জন্যও বায়ু দূষিত হয়। দেওয়ালীর সময় তোমরা যে বাজী পোড়াও সেগুলি গন্ধক ও বারুদ দিয়া তৈয়ারী। ইহা ভিন্ন অন্য বস্তুও আছে। বিস্ফোরণ ঘটিলে ঐসব জিনিস সহজেই বায়ুর সহিত মিশিয়া তাহাকে দূষিত করে। আধুনিক কালে সবাই অ্যাটম্ বোমের কথা শুনিয়াছ। এই বোমের বিস্ফোরণ ঘটিলে তাহা বায়ুকে ব্যাপকভাবে দূষিত করে। এইজন্য

সকলেই এই পরীক্ষার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে চাহিতেছেন।

দূষিত বায়ু ও বিভিন্ন রোগের কথা ঃ

বায়ু দূষিত হইলে স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দূষিত বায়ু হইতে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। যে সকল গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুকে দূষিত করে তাহাদের প্রভাবে যে সব রোগ হইতে পারে প্রথমে তাহাদের আলোচনা করা হইবে।

* নর্দমা, ডোবা ও খাল হইতে নানা বস্তুর পচনকার্যের ফলে বায়ু দূষিত গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়। তখন এই বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার পরিবর্তে স্বাস্থ্যহানি করিয়া থাকে। এইরূপ বায়ুর জন্য ক্ষুধামান্দ্য, গা-বমি ভাব, উদরাময়, ফেরিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে পারে।

* গৃহের কাছে সাবানের কারখানা থাকিলে হাইড্রোক্লোরিক গ্যাস বায়ুকে দূষিত করে। সেই গ্যাস হইতে চক্ষু ও ফুস্‌ফুসের পীড়া হয়।

* বাড়ীর কাছে রবারের কারখানা থাকিলে কার্বন ডাই-সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া তাহাকে দূষিত করে। এইরূপ বায়ু সেবন করিলে মাথা ধরা, পেশীর ব্যথা ও স্নায়ুর অবসাদ প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। এসব গ্যাস বায়ুপ্রবাহের সহিত সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়া রোগজীবাণু সংক্রমিত করে। রোগ সংক্রমিত হয় রোগজীবাণু দ্বারা, দূষিত বায়ু তাহাকে সাহায্য করে মাত্র। বায়ু-তাড়িত হইয়া জীবাণু চারিদিকে ছড়াইয়া মানবদেহে যেসব রোগ সংক্রমিত করে তাহাদিগকে বায়ুবাহিত পীড়া বা Air-borne diseases বলে। পূর্বোক্ত রোগগুলি সেই শ্রেণীর রোগ।

চারিটি উপায়ে বায়ুবাহিত রোগ সংক্রমিত হইতে পারে :— (১) রোগজীবাণুর সংক্রমণ দ্বারা, (২) দহনক্রিয়ার সাহায্যে, (৩) ধূলিকণা ও (৪) বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা।

জীবাণু-সংক্রমিত রোগ—ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, টনসিলাইটিস্, যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া ও হুপিং কাশ প্রভৃতি রোগ বায়ু-বাহিত রোগজীবাণুর দ্বারা মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। এসব রোগকে জীবাণু-সংক্রমিত রোগ বলা হয়।

দহনক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগ—কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। এইগুলি প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, চক্ষুর্দাহ রোগ সৃষ্টি করে এবং পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়।

ধূলিকণার দ্বারা সৃষ্ট রোগ—যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানী প্রভৃতি রোগ বায়ুস্থ ধূলিকণার দ্বারাই সংক্রমিত হয়। হাম ও বসন্ত রোগও এই ভাবে ছড়ায়।

বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা সৃষ্ট রোগ—বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা বায়ু দূষিত হইলে কোন্ রোগ কি ভাবে সংক্রমিত হয় তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

জনবহুল স্থানে বাস করিবার পরিণাম—ঘরে বসবাসকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সে ঘর স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নয়। মেলা, কোন জমায়েৎ প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ জনসংখ্যা অত্যধিক হয়। সেইসব স্থানও স্বাস্থ্যের দিক হইতে মোটেই ভাল নয়। প্রতি ঘনফুটে কি পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু থাকিতে পারে এবং ঐ বায়ু কি পরিমাণ লোকের সুস্থ থাকার পক্ষে উপযোগী তাহার একটি নির্ধারিত মান আছে। তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকসংখ্যা বর্ধিত করিলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

কলিকাতার মত জনবহুল স্থানে গৃহসমস্যার জন্য কত লোককেই না একই কক্ষে বাস করিতে হয়। এইরূপ বসবাস-ব্যবস্থার পশ্চাতে স্বাস্থ্যকর কোন পরিকল্পনা নাই, শুধু আশ্রয়লাভের গ্লানি আছে। একটি ঘরের আয়তন ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের সম্ভাব্য পরিমাণ অগ্রাহ্য করিয়া বেশী সংখ্যক লোক বাস করিলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে এবং দেহের উপর অনেক রোগের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। এই ভাবে বসবাস করিবার ফলে শ্বাসবায়ুর (১) উষ্ণতা, (২) আর্দ্রতা, (৩) জৈব পদার্থ, (৪) কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়িয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কমিতে থাকে। সেইজন্য অনেক সময় খুব ভীড়ের ভিতর ঢুকিলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। তীর্থস্থান, প্রদর্শনী কিংবা সিনেমা-গৃহের অত্যধিক ভীড়ে প্রবেশ করিয়া তোমরা অনেকেই এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছ। এই অবস্থা সৃষ্টির প্রকৃত কারণ হইতেছে বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব।

ঘরে কেরোসিন-বাতি জ্বালাইয়া শয়ন করিলে বায়ুতে অক্সিজেন কমিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মানুষের শ্বাসত্যাগের ফলে বায়ুর আর্দ্রতা (humidity) বাড়িয়া যায় এবং গৃহের ভিতরের লোকেরা অস্বস্তি অনুভব করে। এইরূপ বদ্ধঘরে থাকিলে সুস্থ ব্যক্তি মাথাধরা, মাথাঘোরা, বমির ভাব, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। ইহাতে মনের প্রসারতা কমিয়া যায়, মেজাজও খিটখিটে হইয়া উঠে।

ফুস্‌ফুস সংক্রান্ত রোগগুলির মূল কারণই হইল দীর্ঘদিন দূষিত বায়ু সেবন। আবার বায়ুবাহিত রোগে কেহ আক্রান্ত হইয়া থাকিলে হাঁচি, কাশি প্রভৃতির জন্য Droplet infection দ্বারা তাহা সহজেই অন্যের দেহে সংক্রমিত হইতে পারে।

বদ্ধ স্থানের দূষিত বায়ু মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ পরিপন্থী। কর্মক্লান্ত মানুষ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শুধু স্বাস্থ্যকর উপাদানই সঞ্চয় করে না, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মনকে সজীব করিয়াও তোলে। বদ্ধ স্থানে থাকিলে তাহা সম্ভব হয় না। মন নিষ্ক্রিয় ও খিটখিটে হইয়া উঠে।

বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার উপায়ঃ

মানুষ আপনার স্বাস্থ্য-সম্পদের সব দায়িত্ব প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দেয় নাই। জল, বায়ু, সূর্যকিরণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদানকে মানুষ যখন বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইয়াছে তখন বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নানা প্রাকৃতিক কারণে অথবা অন্য প্রকারে যখন তাহা দূষিত হয় তখন মানুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়া সেই দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া সুখী ও সুস্থ জীবন গড়িবার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে।

(১) প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় ও (২) কৃত্রিম উপায়ে আমরা বায়ুকে বিশুদ্ধ করিতে পারি।

বায়ু বিশুদ্ধ করিবার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা—

সূর্যকিরণ—সূর্যকিরণের রোগজীবাণু নষ্ট করিবার একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। বায়ুপ্রবাহের ভিতর ভাসমান রোগজীবাণু তীব্র সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুর স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী বায়ু যতই উত্তপ্ত হইবে ততই তাহা পূর্বের স্থান ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই সময় ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া ঐ পরিত্যক্ত স্থানটিকে বিশুদ্ধ বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তোলে।

বৃষ্টি—বায়ু ধুম, ধূলিকণা, তুলার আঁশ, অনেক প্রকার শুষ্ক জঞ্জালের সূক্ষ্ম পদার্থ, কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি

পদার্থকে ভাসমান অবস্থায় ধারণ করিয়া বহুদূর প্রবাহিত হয়। কিন্তু যদি বৃষ্টির ধারা প্রবলবেগে নামে তবে যে সব গ্যাস জলে দ্রবণীয় তাহারা মাটিতে পড়িয়া যায়। অন্য বস্তুগুলি জলের সংস্পর্শে ভারী হইয়া বাতাসে অবস্থান করিতে পারে না, তাহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। এই ভাবে বৃষ্টিপাতের ফলে দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

বৃক্ষলতা—সবুজ শ্যামল বনপ্রান্তরের সহিত মানুষের শুধু মনের সম্পর্কই নাই, স্বাস্থ্যেরও সম্পর্ক আছে। বৃক্ষলতা নীরবে বায়ুকে বিশুদ্ধ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া মানুষ তাহা বুঝিয়াছে। আগে শহরে যেখানে গাছপালার কোন প্রাধান্যই ছিল না, শুধু দীর্ঘ প্রসারিত রাস্তাঘাট, অট্টালিকা আর যানবাহন ছিল প্রধান—আজ সেখানে বৃক্ষলতা প্রাধান্য পাইতেছে। তাই Garden city বা উদ্যান-নগরীর পরিকল্পনা হইতেছে।

বৃক্ষলতার সবুজ অংশে ক্লোরোফিল নামে এক সবুজ পদার্থ আছে। উহা সূর্যকিরণের সাহায্যে বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়া নেয়। কিন্তু শেষে নিজ স্বার্থে শুধু কার্বনকে গ্রহণ করিয়া অক্সিজেনকে ত্যাগ করে। এই ভাবে বায়ুতে অক্সিজেন মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়। এই অক্সিজেন গ্যাস চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া গাছপালা বায়ুকে বিশোধিত করে।

বায়ুসঞ্চালন—বায়ুসঞ্চালন (ventilation) দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বায়ুস্তরে ধূলিকণা, রোগজীবাণু ও গ্যাসীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়। যদি বায়ুর বেগ বা সঞ্চালন-শক্তি না থাকে তবে বায়ু নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে, আর দূষিত বায়ু বিশেষ বিশেষ অঞ্চল-কেন্দ্রিক (localised) হইয়া পড়িবে। কিন্তু বায়ু সঞ্চালনে তাহা সম্ভব হয় না। ঐসব দূষিত পদার্থ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রতি ঘনফুটের উপর উহাদের প্রভাব কমিতে থাকে।

আবার ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ করে।

বাসগৃহের বায়ু বিশুদ্ধ করিবার উপায়—বায়ু বিশুদ্ধ করিবার প্রাকৃতিক উপায় আলোচনা করা হইল। গৃহের বায়ু বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় যতটা সম্ভব করিয়া কৃত্রিম উপায়েও তাহা বিশুদ্ধ করিতে হয়।

* শহরের গৃহগুলি ফাঁকা ভাবে নির্মাণ করিয়া বায়ুপ্রবাহের পথ সহজ করিয়া দিতে হইবে। বাড়ীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেন কোন প্রকার রাসায়নিক কারখানা না থাকে।

* রাস্তাঘাটগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। ধূলিকণা যাহাতে বায়ুতে মিশ্রিত হইতে না পারে সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের দুইবেলা রাস্তা পরিষ্কার করিয়া রাস্তায় নিয়মিত-ভাবে জল দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

* প্রতি গৃহে ছোট বাগান রাখিয়া বৃক্ষলতার সাহায্যে বায়ু বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত।

* শহরের গৃহের কাছে কলকারখানা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসকে দূষিত করিতে পারে।

এইগুলিকে গৃহের বায়ুপ্রবাহ বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পথ বলিয়া ধরা হয়।

বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার কৃত্রিম উপায়—

বদ্ধ বায়ুকে বিতাড়ন করিয়া সেই স্থানে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইয়া বায়ুসঞ্চালনের যে ব্যবস্থা তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু বিশুদ্ধ-করণ বলা হয়। কোন কোন গৃহে, সভা-সমিতিতে এবং প্রদর্শনীতে বিশুদ্ধ বায়ু কয়েকটি কৃত্রিম উপায়ে সরবরাহ করা হয়। ইহাদিগকে তিনটি পদ্ধতিতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) বায়ুনিষ্কাশন পদ্ধতি (Extraction System), (২) বায়ু-বিতাড়ন পদ্ধতি (Propulsion System), (৩) সুষম পদ্ধতি (Balanced System)।

বায়ুনিষ্কাশন পদ্ধতি—ঘরের দূষিত বায়ুকে তাড়াইয়া তাহার পরিবর্তে বিশুদ্ধ বায়ুর দ্বারা ঐ স্থানকে পূর্ণ করিবার ব্যবস্থাকে বায়ুনিষ্কাশন পদ্ধতি বলে। ইহা কৃত্রিম ব্যবস্থায় হইয়া থাকে। (ক) বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে ঘরের দূষিত বায়ুকে বিতাড়িত করিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বাতাসে সেই ঘর পূর্ণ করা যায়। (খ) ঘরে চুল্লীর ব্যবস্থা করিয়া উহার ঠিক উপরে চিম্‌নি স্থাপন করিতে হয়। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি ঘুলঘুলি রাখা প্রয়োজন। তাপের জন্য বায়ু উত্তপ্ত হইলে উহা চিম্‌নি অথবা ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আর ঘরের শূন্য স্থানকে পূর্ণ করিবার জন্য ঐ একই পথে বাহির হইতে শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু আসিবে।

উপরিউক্ত উপায়ে গৃহের দূষিত ও বদ্ধ বায়ুকে সহজে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে।

বায়ুবিতাড়ন পদ্ধতি—বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে আরও বায়ু সঞ্চার করিয়া এবং ঘরের দূষিত বায়ুকে ঠেলিয়া দিয়া সেই ঘরকে বিশুদ্ধ বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করাকে বায়ুবিতাড়ন পদ্ধতি বলে। খুব শক্তিশালী পাখা, স্টীমজেট, কোন যন্ত্র অথবা পাম্পের সাহায্যে এই ব্যবস্থা হইতে পারে।

সুষম পদ্ধতি—ইহাতে দূষিত বায়ু বিতাড়ন ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন—এই দুইটি কাজ একই সঙ্গে হইবে। এই ভাবে সামঞ্জস্য-পূর্ণ উপায়ে বায়ুনিষ্কাশন ও সঞ্চালন পদ্ধতিকে আমরা সুষম পদ্ধতি বলি। প্রশস্ত হলঘরে এই ব্যবস্থা সুন্দরভাবে কার্যকরী হয়।

এই ভাবে প্রাকৃতিক ও নানা প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার ভিতর দিয়া আমরা গৃহের দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিতে পারি।

বায়ুর শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা—এইবার তোমাদিগকে বায়ুর শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলিব। ইংরেজীতে এই ব্যবস্থাকে Air-conditioning বলা হয়। আমাদের দেশে এখনও ইহার বেশী প্রচলন হয় নাই। কোন কোন থিয়েটার-গৃহ, সিনেমা-হল, বড় বড় অফিস, ট্রেন, জাহাজ প্রভৃতিতে ইহা প্রচলিত আছে, আর আছে ধনীর গৃহে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে এই ব্যবস্থা সাধারণ গৃহের প্রয়োজনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে নিঃসন্দেহে। বায়ুর আর্দ্রতা, উষ্ণতা ও বিশুদ্ধতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হইতেছে বায়ুর শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য। উষ্ণতার ও আর্দ্রতার সমতা বজায় রাখিয়া শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত বায়ু সঞ্চালন সম্ভবপর। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ইচ্ছামত অবস্থায় রাখা যায়। ঐ যন্ত্রটি কতকগুলি ব্যবস্থার দ্বারা বায়ুপ্রবাহের তাপ ও আর্দ্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাকেই শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণকরণ বলা হয়।

শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত (Air conditioned) বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক। এই ব্যবস্থায় পাখা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

গ্রীষ্মকালে অসহ্য উত্তাপ মানুষের স্নায়ুকে নিষ্ক্রিয় করিয়া তোলে। তখন কেহই মন দিয়া কাজ করিতে পারে না। কিন্তু শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পায়।

এই ব্যবস্থা ভাল সংরক্ষণের (cold storage) কাজও করে। ঠাণ্ডা ঘরে বই, আতসী কাচ, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, সিরাম, ভ্যাক্‌সিন প্রভৃতি ঔষধ এবং জিনিসপত্র সাধারণ ঘরের চেয়ে অনেক ভালভাবে রক্ষিত হয়। কারণ শৈত্যের সংরক্ষণ-ক্ষমতা উষ্ণতার চেয়ে বেশী।

সূর্যকিরণ

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মুক্ত বায়ুর মত সূর্যকিরণও আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রাণীর দেহে ও উদ্ভিদে যে পরিমিত তেজ ও জীবনী শক্তির প্রয়োজন তাহা সূর্যকিরণ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পাওয়া সম্ভবপর হইত না। সূর্যের আলো ও তাপ হইতেই জীবজগৎ বেশীর ভাগ তেজ ও শক্তি সংগ্রহ করে। সূর্যালোক স্বাস্থ্য দান করিতেছে, ব্যাধি নিবারণের ক্ষমতা যোগাইতেছে, রোগজীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিতেছে। রোগের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষের অবলম্বিত ব্যবস্থায় যেসব ত্রুটি থাকিতেছে সূর্যালোক তাহা পূরণ করিয়া দেয়। সূর্যালোকের অভাব ঘটিলে জীবনের কোন লক্ষণই এ পৃথিবীতে থাকিত না।

মানুষ ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য (ক) অনাক্রম্যণ (Immunization), (খ) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), (গ) সঙ্গরোধ (Quarantine), ইত্যাদি কত ব্যবস্থাই না করিয়াছে এবং করিতেছে, কিন্তু জীবনধারণের পক্ষে সেই ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রতুল। এই যে বিপুল জলধারা, অনন্ত বায়ুপ্রবাহ—যেগুলি জীবন ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই মানুষ তাহা বিশোধিত করিতে পারে।

এখনও পল্লীগ্রামের জীবন ও স্বাস্থ্য (Rural Health) সূর্যকিরণের উপর নির্ভরশীল। সেখানে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য বিভাগ করেন নাই। জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুগুলি সূর্যকিরণের সাহায্যে বিশুদ্ধ হইয়া জীবনের উপযোগী হইতেছে। সূর্যকিরণের যে জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে তাহাই প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে বিশোধিত করিতেছে। সুতরাং সূর্যকিরণ না থাকিলে পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

গ্রামে যখন বায়ুবাহিত অথবা জলবাহিত রোগ বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন মানুষ সামান্য ব্যবস্থা ও উপাদান লইয়া তাহাকে আয়ত্তে আনিতে পারে না। রোগ নিবারণী বিধি-ব্যবস্থা সেখানে অপ্রতুল। তাই আজও গ্রাম্য মানুষকে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। পানীয় জল, বায়ু আর রোগজীবাণুর আবাসস্থল নালা, খাল, ডোবা ইত্যাদির উপর সূর্যের কিরণ পতিত হইয়া অলক্ষ্যে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে।

শহরের গণস্বাস্থ্যের জন্য যে সূর্যকিরণ কিছু কম কাজ করিতেছে তাহা নয়। শহরে কলকারখানা বায়ুপ্রবাহকে দূষিত করিতেছে, সূর্যালোক বায়ুস্তরের উপর পতিত হইয়া তাহাকে বিশোধিত করিতেছে। রাস্তায় থুথু, কফ এবং অন্যান্য নোংরা জিনিস অহরহ ফেলা হইতেছে। সূর্যকিরণ ঐসব নোংরা জিনিসকে বিশুষ্ক এবং জীবাণুমুক্ত করিয়া জনস্বাস্থ্যকে পরোক্ষভাবে সুস্থ রাখিতে সাহায্য করিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার যত ভাল ব্যবস্থাই শহরে থাকুক না কেন সূর্যকিরণ না থাকিলে তাহাতে ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আমাদের জীবন ধারণের জন্য যে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন, যাহা না হইলে জীবন অচল হয় তাহাদেরও উৎস এই সূর্যালোক। এই কারণেই আমরা সূর্যরশ্মিকে জীবনদায়িনী ও ব্যাধিনাশিনী বলিতে পারি।

সূর্যালোক সাতটি রঙের সমষ্টি। একটি ত্রিশির কাচ বা প্রিজমের মধ্য দিয়া সূর্যালোক প্রবেশ করাইলে উহা পর পর সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। বেগুনি (Violet), গাঢ় নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), জরদ (Orange) ও লোহিত (Red), এই সপ্তবর্ণের মিলনস্থল হইল সূর্যালোক।

অবশ্য এই সাত রঙের রশ্মি ভিন্ন আরও অদৃশ্য রশ্মি সূর্যালোকে আছে ; তাহাদের একটি বেগুনি রঙের আগে, অপরটি লোহিত রঙের পরে। প্রথমটিকে অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra-Violet ray) এবং অপরটিকে অবলোহিত রশ্মি (Infra-Red ray) বলা হয়।

সূর্যকিরণের প্রত্যক্ষ উপকারিতা—সূর্যকিরণ (১) উত্তাপ, (২) আলোক ও (৩) স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া মানুষের ও জীবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

উত্তাপপ্রদ রশ্মি—উত্তাপপ্রদ রশ্মি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের নিম্নোক্ত উপকার সাধন করে—

(ক) উত্তাপের সাহায্যে আমরা শুধু জীবনধারণের শক্তিসামর্থ্যই সঞ্চয় করি না, দেহরক্ষার জন্য আরও কিছু পাই। পরিমিত রৌদ্র-সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। আবার সূর্যের প্রখর কিরণে ঘর্ম নির্গত হওয়ায় শরীরের ক্লেদ বাহির হইয়া দেহের যন্ত্রগুলি সক্রিয় হয় ও পরিষ্কার থাকে। আমাদের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(খ) ইহার জীবাণুনাশক ক্ষমতা অসাধারণ। ইহা দেহকে রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা দান করে। প্রখর সূর্যকিরণের খর তাপে টাইফয়েড্, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু অতি সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(গ) জল, বায়ু, মাটি প্রভৃতি নানা কারণে দূষিত হইয়া উঠে। সূর্যের তাপ দূষিত জল, বায়ু ও মাটিকে পরিশুদ্ধ করিয়া জীবনের আবেষ্টনী স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে।

(ঘ) খাল, বিল, ডোবা, নালা ও নানা প্রকার আবর্জনার পচন-প্রক্রিয়ার ভিতর যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় উত্তাপপ্রদ রশ্মি তাহা ধ্বংস করে, অস্বাস্থ্যকর আর্দ্রতাকেও নিবারণ করে। এই দুর্গন্ধনাশক ও আর্দ্রতা-নিবারক ক্ষমতা স্বাস্থ্যের উপযোগী ক্ষেত্র রচনা করে।

(ঙ) ইহা দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(চ) ভিটামিনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যও উত্তাপপ্রদ রশ্মির প্রয়োজন। ইহা আমাদের শরীরে ভিটামিন 'ডি' প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে এবং ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অসম্যক সমতার নিয়ন্ত্রণ করে।

অতিরিক্ত উত্তাপপ্রদ রশ্মি গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ; সেই কারণে ইহা পরিমিত ভাবে গ্রহণ করা উচিত। অপরিমিত সূর্যরশ্মি স্বাস্থ্যের নিম্নোক্ত ক্ষতিসাধন করিতে পারে :—

(ক) সূর্যের তীব্র কিরণে অধিক ঘর্ম নির্গত হইয়া শরীরে অস্বস্তির সৃষ্টি করে এবং মন বিষণ্ণ করিয়া তোলে।

(খ) তীব্র সূর্যকিরণের ফলে রক্তাল্পতা রোগের সৃষ্টি হয়। সর্দিগর্মি, বমি ভাব ও মাথাধরার সৃষ্টি হয়। শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন ও অলস হইয়া পড়ে।

(গ) ত্বক্ অমসৃণ ও সঙ্কুচিত হয় এবং রঙ ঈষৎ তামাটে হইয়া যায়।

আলোকপ্রদ রশ্মি—সূর্যালোকের সহিত মনের সম্পর্কও যথেষ্ট। ইহা মানসিক, স্ফূর্তি ও আনন্দ অটুট রাখে। জড়তা দূর করিয়া মানুষকে কার্য করিবার ক্ষমতা ও উৎসাহ দেয়।

স্বাস্থ্যপ্রদ রশ্মি—সূর্যকিরণের অতিবেগুনি (Ultra-Violet) ও অবলোহিত (Infra-Red) রশ্মির স্বাস্থ্য গঠন ও রক্ষণ কার্যে প্রচুর প্রভাব আছে। বিশুদ্ধ বায়ুতে অতিবেগুনি রশ্মি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সমভূমির বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা পাহাড়ী অঞ্চলের বিশুদ্ধ বায়ুতে এই রশ্মি প্রায় দ্বিগুণের মত বেশী থাকে। যে সব পদার্থ বায়ুকে দূষিত করে তাহারা বায়ুস্তরে মিশিয়া থাকিলে অতিবেগুনি রশ্মি সূর্যালোকের ভিতর দিয়া অসিবার সময় অনেক

গুণ হারাইয়া ফেলে। সকাল এবং বিকালের স্নিগ্ধ কিরণের ভিতর ইহা বেশী থাকে ; মধ্যাহ্নের তীব্র কিরণে ইহার অস্তিত্ব খুব বেশী থাকে না।

স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিবেগুনি রশ্মির উপকারিতা : অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের বহিস্ত্বকের উপরে নানাবিধ প্রভাবের সৃষ্টি করে। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরভাগে 'অর্গোস্টেরল' নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। অতিবগুনি রশ্মি দেহত্বকের উপর পতিত হইয়া ঐ অর্গোস্টেরল পদার্থটিকে প্রভাবান্বিত করে এবং একটি রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করিয়া ভিটামিন 'ডি'তে পরিণত হয়। এই ভিটামিন 'ডি' ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের সাহায্যে অস্থিকে পুষ্ট এবং দৃঢ় করে। এই রশ্মির দ্বারা রিকেট রোগের নিরাময় হয়।

শরীরের গ্রন্থি হইতে রস নিঃসরণকার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া ইহা শরীরের বৃদ্ধিসাধন ও কর্মশক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে। ইহা যক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন রোগ প্রতিরোধ করে, আরোগ্যও করে এবং পুরাতন চর্মরোগ ও ত্বকের দুষ্ট ক্ষতস্থানকে নিরাময় করিয়া তোলে। গেঁটে বাত, পেশী বাত প্রভৃতি রোগে এই রশ্মি বিশেষ উপকারী। দেহের অবসন্নতা ও স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করিয়া এই রশ্মি মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে সৌরস্নান (Sun-bath) ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সকল বয়সের মানুষই অতি বেগুনি রশ্মি গ্রহণ বরিবার জন্য সজাগ থাকে।

শৈশব কাল হইতে সৌরস্নান করিতে অভ্যস্ত করিয়া তোলা উচিত। তবেই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার অনুশীলন করিতে করিতে শিশু সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে।

শরীর রক্ষার বিবিধ অভ্যাস ও অনুশীলনের কথা

একটি প্রবাদ আছে "মানুষ অভ্যাসের দাস"। মানুষের জীবন বিকাশের ও স্বাস্থ্য অর্জনের সম্ভাবনাকে নানা অভ্যাসের ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে হয়। অভ্যাস ও একনিষ্ঠ অনুশীলনকে সার্থকতায় পৌঁছাইবার সোপান বলা হয়। এখন সু-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস কাহাকে বলে তাহা পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন।

আমাদের অজ্ঞাতসারে অনেক অসঙ্গত অভ্যাস আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইসব অভ্যাসকে আমরা কু-অভ্যাস বলিব।

জীবনগঠন, স্বাস্থ্যগঠন আর মানসিক জীবন গঠনে সু-অভ্যাসের অবদান প্রচুর।

একটি সৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা মানুষ যে আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করে, পরে আর সচেতন ভাবে অনুশীলন না করা সত্ত্বেও যাহা স্বভাবে পরিণত হয়, তাহাকেই সু-অভ্যাস বলা যায়। যেমন প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া দাঁত মাজিবার অনুশীলন করা হইল স্বাস্থ্য অর্জন করিবার অভিপ্রায়। শিশুকে ইহা ক্রমাগত অনুশীলন করাইতে করাইতে ইহা তাহার অভ্যাসে দাঁড়ায়। কেহ মুখ না ধুইয়া সকালে কিছুই আহার করিতে পারেন না। কেহ আবার বাসি মুখে চা (Bed-Tea) না খাইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই পারেন না। দিনের পর দিন ক্রমাগত অনুশীলন করিতে করিতে দুই জনের দুই ভিন্ন অভ্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। অভ্যাস সৃষ্টি করিতে হইলে (ক) সচেতন ভাবে ইহার অনুশীলন করা অথবা করানর প্রয়োজন; (খ) দীর্ঘকাল অনুশীলন দ্বারা স্বভাবের সহিত উহাকে মিশাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ব্যায়ামের কথা ঃ

শরীরকে পরিপুষ্ট করিয়া গঠন করিতে হইলে কিছু কিছু স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস আয়ত্ত না করিলে স্বাস্থ্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ প্রয়োজনীয় অভ্যাসের মধ্যে ব্যায়ামচর্চা প্রধান।

সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম—শরীরকে সুস্থ, সবল ও রোগ প্রতিরোধের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীর সঞ্চালনের (Physical Exercise) অভ্যাস করা উচিত। মানুষের পেশা, শারীরিক অবস্থা ও রোগের কথা স্মরণ করিয়াই ব্যায়ামের মাত্রা ও প্রয়োজনীয়তা বাছিয়া লইতে হয়। উপযুক্ত ব্যায়াম নির্বাচন করিতে না পারিলে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ থাকিলে যে ব্যায়াম উদরপেশীর পরিচালনায় সহায়ক তাহাই অনুশীলন করা প্রয়োজন। আমাদের আসন চর্চায় এইরূপ অনেক ব্যায়াম আছে।

দিনরাত্রি যাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের লঘু ব্যায়াম করা প্রয়োজন। তাহারা ব্যাডমিণ্টন, টেনিস প্রভৃতি খেলা এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিতে পারে। আদর্শ ব্যায়াম দেহ মন উভয়েরই পুষ্টিসাধন করে। কিন্তু যাহারা শুধু মস্তিষ্কের পরিশ্রম করে এইরূপ ব্যায়ামই তাহাদের করা উচিত যাহার ফলে সকল অঙ্গ পরিচালনার সুযোগ হয়। মুগুরভাঁজা, ডন-বৈঠক, নৌকার দাঁড় টানা, কুস্তি করা, দৌড় এবং বারবেল ইত্যাদির সাহায্যে ব্যায়াম তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত। এইরূপ ব্যায়ামে হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস প্রভৃতি আন্দোলিত হইয়া শরীরের আবর্জনা দূর করিয়া দেয়। আবার বৃদ্ধ মানুষের পক্ষে বেশী পরিশ্রমের ব্যায়াম মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। মুক্ত হাওয়ায় সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভ্রমণ করাই হইল তাহাদের আদর্শ ব্যায়াম।

বালক-বালিকাদের উপযুক্ত ব্যায়াম—যেখানে আনন্দ নাই ছোট বালক-বালিকাদের সেইখানে কোন আকর্ষণও নাই। তাই তাহাদের ব্যায়ামের জন্য আনন্দ ও খেলাধুলার মাধ্যমে অঙ্গপরিচালনা শিক্ষা দিতে হইবে। এইদিক দিয়া বহু প্রচলিত দেশীয় খেলাধূলাই তাহাদের উপযুক্ত ব্যায়াম। কানামাছি খেলা, কুমীর কুমীর খেলা, লুকোচুরি খেলা—শিশুদের উপযুক্ত এইরূপ খেলাগুলিই তাহাদের আদর্শ ব্যায়াম। এই ব্যায়ামে তাহারা যে পরিমাণ অঙ্গচালনা করে তাহাই দেহের গঠনকার্যের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। খেলাধূলা-প্রধান ব্যায়ামে যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। এই ব্যায়ামের সঙ্গে আনন্দও যথেষ্ট থাকে।

* শিশুকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ব্যায়াম করিবার সুযোগ দিলে অন্যকে অনুকরণ করিয়া সে আপনার চলাফেরার দোষত্রুটি সংশোধন করিতে পারে।

* শিশুর ব্যায়াম পরিকল্পনা করিবার পূর্বে উহার দ্বারা সে মনে আনন্দ পায় কিনা তাহা বিশেষভাবে ভাবিতে হইবে।

* খেলায় এবং ব্যায়ামে শিশুর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যাহাতে সঞ্চালিত হইয়া দেহের সকল অঙ্গের পুষ্টি হয়, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

কচি শিশুদের উপযুক্ত ব্যায়াম—কচি শিশু পা ছড়াইয়া, হাত আছড়াইয়া আর কান্নাকাটি করিয়া যে সব কাজ করিয়া চলে তাহাই তাহার ব্যায়াম।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জামাকাপড় ব্যবহার এবং শয্যা পাতিবার ত্রুটিতে তাহার অঙ্গচালনায় যেন বাধা না পড়ে। স্নানের ঠিক পূর্বে ঘরের পরিষ্কৃত মেঝেতে শিশুকে খালি গায়ে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে অবাধে পা আছড়াইবার সুযোগ দিতে হয়। সস্নেহ ডাকে,

ইশারায় ও স্নেহময় মুখভঙ্গী করিয়া এই ব্যায়ামের সময়টুকু বেশ আনন্দদায়ক করিয়া তুলিতে হয়। তবে বেশীক্ষণ এই ভাবে খেলান উচিত নয়।

শিশু যখন হামাগুড়ি দিতে অভ্যস্ত হইবে তখন একটি খোলামেলা অথচ ঘেরা জায়গায় তাহাকে তাহার ইচ্ছা অনুসারে খেলিতে দিবে। আরও বড় হইলে দলীয় মনোভাব সৃষ্টি হইলে তাহাকে দলের ভিতর ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেইখানে সঙ্গীদের সহিত খেলাধূলা করিয়া সে স্বাস্থ্য গঠন করিবে। কিন্তু বাচ্চা অবস্থায় মাকেই শিশুর অঙ্গচালনার অভ্যাস করাইতে হইবে।

মেয়েদের উপযুক্ত ব্যায়াম—নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠনের বিভিন্নতার জন্য নারীর ব্যায়াম পুরুষের অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। অত্যধিক শ্রমসাপেক্ষ ব্যায়াম নারীর অনুকূল নয়। নারীর ব্যায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেহকে সুগঠিত করা এবং প্রতি অঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া কমনীয়তা ও লাবণ্য রক্ষা করা। সুতরাং কঠিন ব্যায়াম তাহার দৈহিক গঠন ও দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। এমন কি ভবিষ্যতে মাতৃত্ব অর্জনের পক্ষেও এই অভ্যাস বিশেষ অন্তরায় হইতে পারে।

একটানা ব্যায়ামচর্চায় তাহার প্রকৃতিগত অনেক অসুবিধা আছে। কখনও কখনও এমন সময় তাহার আসে যখন শরীর ও মনের সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতির এই বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নারীর ব্যায়াম চর্চা করা কখনই সঙ্গত নয়।

দেহকে লঘু করিবার জন্য যদি ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় তবে দ্রুতপদে ভ্রমণ, দৌড়ান ও স্কিপিং মেয়েদের উপযোগী ব্যায়াম। এই ধরনের ব্যায়ামে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিলে পরে দেহের সৌন্দর্য ও নিখুঁত গঠন রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম
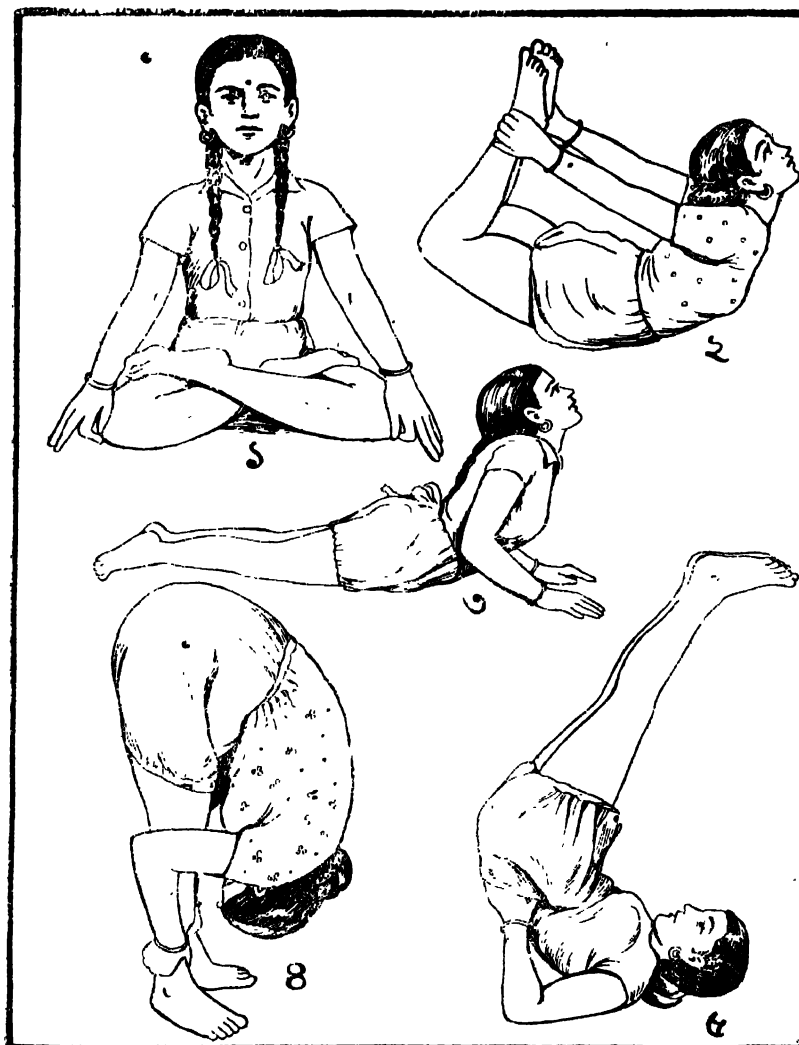
মেয়েদের উপযোগী কয়েকটি আসন : ১। পদ্মাসন ২। ধনুরাসন ৩। ভুজঙ্গাসন ৪। পদ-হস্তাসন ৫। বিপরীত করণী মুদ্রা

চর্চা করা যাইতে পারে। অঙ্গচর্চার সময় দৈহিক গঠনে কোথায় কি ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়।

ব্যায়ামের ভিতর বাইচ খেলাও নারীর পক্ষে উপযুক্ত। পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যায়াম নারীদের বিশেষ প্রিয় ও উৎসাহজনক। গৃহের যাবতীয় কাজকর্মে এদেশের নারীদের যে পরিশ্রম হইয়া থাকে তাহা ব্যায়ামের মতই কাজ করে। সংসারে যাহাদের পরিশ্রমের কাজ করিতে হয় তাহাদের হাল্কা ধরনের ব্যায়ামই উপযুক্ত। সন্ধ্যার বিশুদ্ধ বাতাসে ভ্রমণ করা আদর্শ ব্যায়াম। পুরুষের ব্যায়ামের মূল লক্ষ্য পেশীকে দৃঢ় করিয়া শক্তিসঞ্চয় করা; কিন্তু নারীর ব্যায়ামের মূল লক্ষ্য দেহের শক্তি ও কমনীয়তা বৃদ্ধি করিয়া দেহসৌষ্ঠবকে সুন্দর করিয়া তোলা।

ব্যায়ামের সাধারণ নিয়ম—দেহ ও মনের পুষ্টিসাধনের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুসারে যে দৈহিক পরিশ্রম করা হয় তাহাই ব্যায়াম। ব্যায়াম করিবার সময় নিম্নলিখিত বিধান মানিয়া চলা উচিত :—

* ব্যায়াম নিয়মিতভাবে করা উচিত। স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়। তাহাতে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

* খুব নিয়মনিষ্ঠ ও সংযমী জীবন যাপন করা প্রয়োজন। সংযমী ও নিয়মনিষ্ঠ না হইলে কোন সাধনাই সার্থক হয় না। আহারের, স্নানের ও নিদ্রার সময় এবং পরিমাণ সর্বদা ঠিক রাখা উচিত।

* যাঁহারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করেন তাঁহারা হাল্কা ব্যায়াম করিবেন; কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিজীবী তাঁহারা শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করিবেন।

* ব্যায়াম করিবার সময় যথাসম্ভব সরল, অনাড়ম্বর ও ঢিলা পোশাক পরিধান করা উচিত। তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

* ব্যায়াম করিবার সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ দ্রুত চলিতে থাকে। শরীর হইতে প্রচুর ঘাম বাহির হয়। ঐ সব দূষিত পদার্থ যাহাতে সহজে বাহির হইতে পারে এবং অক্সিজেন যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে কোন বাধা না পায়—সেইজন্যও ব্যায়ামের উপযোগী সাধারণ পোশাক ব্যবহার করাই উচিত।

* ব্যায়ামের জন্য ব্যবহৃত পোশাক ব্যায়ামের শেষে ভালভাবে কাচিয়া পরিষ্কার করা উচিত। ঘামের সহিত বিভিন্ন দূষিত পদার্থ সেখানে সঞ্চিত হয়। পরদিন সেই পোশাক পরিধান করিয়া ব্যায়াম করা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পরিষ্কার পোশাক এবং দেহ ও মনের শুচিতা ব্যায়ামের জন্য অপরিহার্য।

* ব্যায়ামকে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করিতে হয়। ঘোড়ায় চড়া, বাইচ খেলা প্রভৃতি এই ধরনের চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম। মেয়েদের পক্ষে সাঁওতালী নাচ, মণিপুরী নাচ প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম।

* ব্যায়ামের পর মুক্ত বাতাসে বিশ্রাম করিতে হয়। ব্যায়ামের শেষে ম্যাসেজ বা মালিশের ব্যবস্থা খুবই উপযোগী ও আরামপ্রদ। ইহাতে পরিশ্রান্ত পেশীর ক্লান্তি দূর হয়, রক্ত সঞ্চালনের বিশেষ উন্নতি হয়। এইসব সুবিধার জন্য এককভাবে ব্যায়াম না করিয়া ব্যায়ামাগারে গিয়া যৌথভাবে ব্যায়াম করাই ভাল।

* ব্যায়াম করিলে খাদ্য-তালিকা বেশ উন্নত হওয়া প্রয়োজন। তাহার অর্থ এই নয় যে, খাদ্য-তালিকাকে বিশেষ মূল্যবান দ্রব্যের তালিকা হইতে হইবে। খাদ্য-মূল্য বিবেচনা করিয়াই আহারের

তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে ব্যায়ামের জন্য শরীরের যে ক্ষয় হইবে তাহার পূরণ হইবে না, শেষে শরীর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইবে।

* প্রত্যূষে অথবা বৈকালে ব্যায়ামচর্চা করা উচিত। প্রখর সূর্যকিরণের ভিতর ব্যায়াম করা মোটেই কর্তব্য নয়। স্নিগ্ধ এবং শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশেই ব্যায়ামের স্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

বিশ্রামের কথা :

ক্লান্তি, পরিশ্রম ও অঙ্গ-সঞ্চালনের পরে মানুষের জীবনে বিশ্রাম, শান্তি ও আরামের প্রয়োজন।

অনেক কারণে বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে সমস্ত দেহ ও স্নায়ু ক্লান্তি ও অবসাদে ভরিয়া উঠে। তখন আমাদের পেশী ও স্নায়ুতে এক প্রকার অম্লাত্মক গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই অম্লাত্মক গ্যাস যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় তখন অবসাদ আসে।

বহুদিন যদি এই ভাবে দেহ অবসন্ন হইয়া থাকে তবে পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইংরেজীতে ইহাকে Loss of Vitality বলা হয়। দেহের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রাম আবশ্যক। তাই কর্মের পর বিরাম ও আরামের প্রয়োজন।

নানা কর্মে ব্যস্ত শরীরের ক্লান্ত পেশী ও স্নায়ুকে বিশ্রাম দিতে হয়। তাহার ফলে স্নায়ু ও পেশী কর্মক্ষম হইয়া উঠে। পরিশ্রমের জন্যই শরীরে অম্লাত্মক গ্যাস সঞ্চিত হয়, আর বিশ্রামে ঐ গ্যাস বাহির হইয়া যায়। শরীর যখন এই গ্যাসের প্রভাবমুক্ত হয় তখন স্নায়ু ও পেশীগুলি সতেজ হইয়া উঠে।

দেহের ক্ষয় পূরণের জন্যও বিশ্রামের প্রয়োজন। একটানা কর্মের

ফলে আমাদের শরীরের যন্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দেহের বিশ্রাম ও কর্মের বিরতি সেই ক্ষয় পূরণ করিতে সাহায্য করে। আবার মানসিক দিক হইতেও বিশ্রামের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে মনে অবসাদের সৃষ্টি হয়। বিশ্রাম মনকে আবার সতেজ করিতে পারে। মনের ভিতর নানা কারণে যে ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক হয়, নানা আকর্ষণীয় পথে মনকে সেই চিন্তার নাগপাশ হইতে মুক্তি দিতে হয়।

ক্লান্ত মনকে সক্রিয় ও কার্যক্ষম করিবার জন্য মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন।

বিশ্রামের নিয়ম—নিম্নোক্ত ভাবে আমরা ক্লান্ত দেহ ও মনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে পারি—

* গতানুগতিক জীবনের ধারা পরিবর্তন করিয়া।
* কর্মের ও পরিবেশের রূপান্তর ঘটাইয়া।
* সাধারণ আমোদ-প্রমোদের সাহায্যে মানসিক তৃপ্তি সাধন করিয়া।

এই তিনটি পথে বিশ্রামকে আমরা সার্থক, স্বাস্থ্যকর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারি।

একটানা কাজ ও একঘেয়ে পরিবেশ জীবনকে অনেক সময় দুর্বহ করিয়া তোলে। সাধারণ পদ্ধতির বিশ্রাম সেই মনকে পরিপুষ্ট করিতে পারে না। তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই সময় একঘেয়ে পরিবেশ ও কাজ হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জায়গায় প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে কিছুদিন বিশ্রাম করিলে শরীর ও মনের অসাড়তা কাটিয়া আবার সতেজ কর্মঠ ভাব ফুটিয়া উঠিবে। শহরের লোক গ্রামে গেলে তাহার জীবনধারার পরিবর্তন হয় এবং তাহার ফলে মনে আনন্দ ও উৎসাহ আসে।

কর্মের রূপান্তর ঘটাইয়াও বিশ্রামের পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করা যায়। একঘেয়ে কর্ম আনন্দের খোরাক দিতে পারে না, এজন্য উহা মানুষের নিকট প্রাণহীন ও নিরানন্দময় (dull) বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কর্মের রূপান্তর ঘটিলেই মানুষ পরিপূর্ণ উৎসাহে পূর্ণশক্তি লইয়া নূতন কাজে মাতিয়া পড়ে।

মানসিক তৃপ্তিসাধন বিশ্রাম করিবার আর একটি সহজ পথ। আধুনিক জগতে ইহা সহজলভ্য হইয়াছে। মানুষ চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী, খেলাধুলা বা সিনেমা দেখিয়া মানসিক ক্লান্তি দূর করিতে পারে। ইহাতে মনের অবসাদ কাটিয়া যায়, শরীরও সতেজ হয়। তবে সারারাত্রি জাগিয়া সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতিতে মত্ত থাকিলে বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়। শরীর ও মন আরও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ঘুমের কথা ঃ

সারাদিন নানা কাজে শরীরের ক্ষয় হয়, স্নায়ু ও পেশী পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। ঘুম যদি না থাকিত তবে এই দেহযন্ত্র অচল হইয়া পড়িত। ঘুম আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, শরীরের যন্ত্র সচল আছে।

সারাদিনের নানা কাজে শরীরের যন্ত্রসমূহের যে ক্ষয় হয়, রাত্রে ঘুমের ফলে সেই ক্ষতি পূরণ হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ঘুমের একান্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যের জন্য পরিমিত ও গাঢ় ঘুমই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে আলো, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু যেমন শরীর রক্ষার জন্য দরকার, সেইরূপ বিশ্রাম, শয়ন, ঘুম প্রভৃতি স্বভাবগত অভ্যাসগুলিও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঘুমের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত কিছু অভ্যাস আয়ত্ত করা উচিত। এই

অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করিলে ঘুম প্রগাঢ় হইবে। শরীরের ক্ষয় পূরণ করিতে তাহা ব্যাপকভাবে কার্যকরী হইবে।

বয়স অনুযায়ী যতটা ঘুমের প্রয়োজন

বয়স	কতটা ঘুম প্রয়োজন	কেন প্রয়োজন
জন্ম হইতে ১ মাস	২০ — ২২ ঘণ্টা	এ-সময়ে তাড়াতাড়ি
১ মাস „ ১ বৎসর	১৬ — ২০ „	দেহের বৃদ্ধি হয় বলিয়া
২বৎসর „ ৩ „	১৪ — ১৬ „	দেহের রাসায়নিক
৩ „ „ ৫ „	১৩ — ১৪ „	রূপান্তর ও বৃদ্ধির
৫ „ „ ১০ „	১২ — ১৩ „	সমন্বয় সমাধানের জন্য
১০ ১৫ „	১০ — ১২ „	কর্মশক্তির পুনরুদ্ধার
১৫	৮ — ১০ „	এবং সমগ্র দেহের
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি	৮ — ৯ „	বিশ্রামের জন্য।

নিম্নলিখিত বিধানগুলি মানিয়া চলিলে ঠিকমত ঘুম হইবে।

(ক) ঘুমের পুর্বে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম ত্যাগ করা—রাত্রি জাগিয়া মানসিক পরিশ্রম করিলে মস্তিষ্কে অধিক রক্ত চলাচল আরম্ভ হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহা সহজে শান্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহে না। স্নায়ু ও মস্তিষ্কের এই উত্তেজিত অবস্থা সুনিদ্রার পক্ষে মোটেই অনুকুল নয়। কাজেই শয়ন করিবার বহু পূর্বেই সকল প্রকার মানসিক পরিশ্রম হইতে মুক্ত হইবার অভ্যাস করিবে। সুনিদ্রার পক্ষে এইরূপ অভ্যাস বিশেষ অনুকূল।

(খ) পরিপাককার্যের প্রতি সজাগ থাকা—নিদ্রিত অবস্থায় শরীর-যন্ত্র কি ভাবে কাজ করে, তাহার জন্য আমাদের সাধারণ

কাজকর্মের কোন পরিবর্তন করা উচিত কিনা, এইসব কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। নিদ্রিত অবস্থায় মাথার রক্ত-চলাচল মন্থর হইয়া আসে, কিন্তু দেহের রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পায়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও মন্থর হয়, পরিপাক-ক্ষমতাও হ্রাস পায়। কাজেই রাত্রিকালে আহার শেষ করিয়াই ঘুমাইতে গেলে হজমের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এজন্য ঘুমের বহু পূর্বেই আহারের অভ্যাস করিবে। ইহাতে হজমও হইবে, নিদ্রাও হইবে।

(গ) **শরীর স্নিগ্ধ রাখা ও রক্ত-চলাচলের সুব্যবস্থা**—নিদ্রার পক্ষে শরীরের স্নিগ্ধ অবস্থা অত্যন্ত উপযোগী। কাজেই সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে গা ধুইবার অভ্যাস পালন করা উচিত। শুইবার পূর্বে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়া ভিজা তোয়ালে দ্বারা সমস্ত দেহ ও মুখ মুছিয়া ফেলিলে ভাল হয়। শয়নের পূর্বে গরম দুগ্ধ পান করা একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। এই গরম জিনিসের প্রভাব শরীরের ভিতর রক্ত-চলাচলকে দ্রুততর করিয়া মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচলকে অনেক মন্থর ও মৃদু করিবে। শরীরের এইরূপ অভ্যন্তরীণ অবস্থা গাঢ় ঘুমের পক্ষে ভাল। কাজেই ঘুমের জন্য উপরি উক্ত নিয়ম অভ্যাস করা উচিত।

শয়নের ভঙ্গিমা—যেমন তেমন ভাবে শুইবার অভ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত নয়। চিৎ হইয়া উপরদিকে মুখ করিয়া সটান ভাবে ঘুমাইবার অভ্যাস করা উচিত। পাশ ফিরিয়া শুইতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের ডানদিকে ফিরিয়া শোয়াই যুক্তিসঙ্গত। বামদিকে ফিরিয়া শুইলে হৃৎপিণ্ডের উপর দেহের চাপ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। উহাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ও সহজ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। চিৎ হইয়া শুইলেও কখনও বুকের উপর হাত দিয়া শয়ন করা উচিত নয়।

শয়নগৃহের পরিবেশ—শয়নগৃহ খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। শয়নঘর নিরিবিলি এবং আসবাব-বহুল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘরে যাহাতে স্নিগ্ধ ও শান্ত পরিবেশ থাকে তাহা দেখিতে হইবে। শোয়ার সময় ঘরে বাতি না রাখাই ভাল। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে স্নিগ্ধ ও মৃদু আলোর ব্যবস্থা থাকিতে পারে। আলো তীব্র হইলে তাহা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে, ইহাতে ঘুমেরও ব্যাঘাত হইবে।

বদ্ধঘরে শয়নের অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে। আমরা নিঃশ্বাস-বায়ুর ভিতর দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। দূষিত বায়ু বদ্ধ ঘরে সারারাত্রি সঞ্চিত হয়। আর ঐ বায়ুর সাহায্যে সারাক্ষণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চলিতে থাকিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে। সেই জন্য ঘুমাইবার পূর্বে ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া বায়ু সঞ্চালনকে সহজ ও স্বাভাবিক করিতে হয়।

উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সংগ্রহ করার জন্য শয়নঘরে বড় বড় জানালা রাখা উচিত। বায়ুপ্রবাহের গতিপথ যাহাতে কোন প্রকারে অবরুদ্ধ না হয় তাহাই দেখিতে হইবে। শয়নঘরে নিরিবিলি আবহাওয়া, স্নিগ্ধ ম্লান আলো এবং বিশুদ্ধ বায়ু অত্যন্ত আরামদায়ক।

শুইবার ভঙ্গি যেমন সহজ ও স্বাভাবিক হইবে বিছানাও তেমনি খুব সাদাসিধা হওয়া উচিত। নোংরা ও অমসৃণ বিছানা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমের সময় বিছানার আবরণসমূহ সাদা থাকা ভাল। সাদা রঙের স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করিবার ক্ষমতা বেশী। গাঢ় রঙের শয্যাবরণ দিয়া দিনের বেলায় বিছানা ঢাকিলেও রাত্রে তাহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঘুমের সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ—ঘুমাইবার সময় কখনও মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে নাই। ইহাতে বায়ু দূষিত অবস্থায় শরীরের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ফলে ফুস্‌ফুস অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। ঘুমের সময়ে নাক দিয়া শ্বাস লইবার অভ্যাস করাই স্বাস্থ্যসম্মত। নাসিকার অভ্যন্তরের ঝিল্লীপথে বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া শরীরে প্রবেশ করে। ইহাতে স্বাস্থ্যহানির কোন ভয় থাকে না। শ্বাস গভীরভাবে টানিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে ফুসফুস সক্রিয় থাকে। তাহা না করিলে ফুস্‌ফুসের কর্মশক্তি কমিয়া যায়। কখনও মুখ ঢাকিয়া শয়ন করিতে নাই। শীতকালে অনেকেই মুখ ঢাকিয়া শয়ন করে। ইহাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে এবং যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না।

শয়নের সময় গায়ে জামা না থাকাই ভাল। পরনের কাপড়ও ঢিলা করিয়া শয়নের অভ্যাস করা উচিত।

আহার ঃ

শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য আমাদিগকে আহার করিতে হয়। খাদ্যাভাবই শুধু শরীরের ক্ষতিসাধন করে না, কুখাদ্য গ্রহণ করিলে অথবা অপরিমিত আহার করিলেও নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। অত্যধিক আহারের ফলে নিদ্রালুতা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও অরুচি রোগের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় নিমন্ত্রণে যাইয়া আমরা অধিক মাত্রায় আহার করিয়া থাকি। ইহা স্বাস্থ্য-বিরোধী। সকল ক্ষেত্রে পরিমিত আহার গ্রহণ করাই স্বাস্থ্যসম্মত।

আহারের নির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। প্রত্যহ কত বার, কত ঘণ্টা অন্তর আহার গ্রহণ করিতে হয় এবং বয়সানুসারে বিভিন্ন সময় কাহাকে কি প্রকার ও কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

দুইটি প্রধান আহারের পর চার-পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে

জলযোগের ব্যবস্থা করিবে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জলযোগের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ চার-পাঁচ ঘণ্টার পূর্বে কখনও পরিপাককার্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জলযোগের সময় হাল্কা ধরনের খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। দুধ, ফল, মিষ্টি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করাই স্বাস্থ্যসম্মত। খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় জলপান না করিয়া খাদ্যগ্রহণ শেষ হইলে, কিছু সময় পরে জলপান করাই বিধেয়। খাদ্যগ্রহণের পর মুহূর্তেই কখনও শয়ন করা উচিত নয়। তাহাতে বদহজম হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

ভালভাবে চিবাইয়া ধীরে ধীরে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করাই স্বাস্থ্যসম্মত আহারের প্রথম ও প্রধান কথা। ইহাতে খাদ্য সহজে হজম হয়।

আহারের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবার অভ্যাস করা উচিত। শুধু খাদ্যগ্রহণকারীকে নয় পরিবেশনকারীকেও এই অভ্যাস বজায় রাখিতে হইবে। খাদ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে হাতমুখ ভালভাবে ধুইয়া ফেলিবে। নখ কখনও বড় রাখিবে না।

খাদ্যদ্রব্য কখনও হাত দিয়া পরিবেশন করিবে না; হাতা বা চামচের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা উচিত। পরিবেশন করার হাতা বা চামচে কখনও মাটিতে ফেলিয়া রাখিবে না।

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল না থাকিলে আহার করা উচিত নয়। তাহাতে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। কায়িক বা মানসিক কঠিন পরিশ্রমের পর দেহ কর্মবিমুখ হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আহার করিলে হজমের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। আনন্দপূর্ণ পরিবেশে সতেজ, শান্ত ও নিশ্চিন্ত মানসিক অবস্থা লইয়াই আহার করিতে হয়।

আহারের ভিতর দিয়া শিশুর সামাজিক চেতনা বিকশিত

হইয়া থাকে। কি করিয়া পিতামাতা ও ভাইবোনদের সহিত মিশিতে হয়, একসঙ্গে মিশিয়া কাজ করিলে কত আনন্দ পাওয়া যায়, সকলে একসঙ্গে সমভাবে বণ্টন করিয়া খাইলে কত আনন্দের সৃষ্টি হয়—এই সব সামাজিক অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে বসিয়া শিশু ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

প্রতিদিন একঘেয়ে আহার করিতে করিতে শিশুর কেন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদেরও মনে বিরক্তি আসে, খাদ্যদ্রব্যের প্রতি কোন আকর্ষণই থাকে না। এইজন্য খাদ্যবস্তু রান্না করিবার সময় কিছুটা নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির কথা মনে রাখা উচিত।

স্নান

স্নান কর্মক্লান্ত দেহকে সতেজ রাখে, এবং মনে আনন্দ দেয়, মস্তিষ্কের উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তোলে। স্নান করিবার অভ্যাস দেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়া চর্মরোগ হইতে রক্ষা করে এবং শরীরকে স্নিগ্ধ ও শীতল রাখিতে সাহায্য করে।

স্নানের নিয়ম—স্নান করিবার পূর্বে সর্বাঙ্গে রগড়াইয়া তেল মাখিবার অভ্যাস করিতে হয়। তেল মাখিবার পর কিছুক্ষণ সূর্যকিরণ হইতে অতিবেগুনি রশ্মি সেবন করিবে। এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

স্নানের সময় ভাল সাবান মাখিবে এবং পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করিবে। শরীরের সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থ উঠাইয়া ফেলিবে। কারণ, শরীর তেলতেলে থাকিলে সহজে ময়লা বসিয়া লোমকূপের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়।

সর্বদা সূর্যোদয়ের সময় শীতল জলে স্নান করিবে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন বৈকালে গা ধুইবার অভ্যাস করা ভাল। আহারের

পরে কখনও স্নান করিবে না। তাহাতে হজমের ব্যাঘাত হয়। স্নানের জল যেন পরিষ্কার ও শীতল থাকে তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী, দীঘি এবং নদীর জলে স্নান করিবার অভ্যাস করিবে। নদীর জলে স্নান সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর। স্নানের সময় কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিতে পারিলে যেমন আরামবোধ হয় তেমন নিয়মিত ব্যায়ামও হয়। বৃদ্ধদের জন্য শীতকালে উষ্ণজলে স্নান করিবার ব্যবস্থা করাই ভাল। মাথায় কখনও উষ্ণজল ঢালিবে না। শিশুর ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাই অনুসরণ করিবে। বেশী বয়সের বালক-বালিকা এবং প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর শীতল জলে স্নান করাই উচিত। রোগীর শরীর উষ্ণজলে স্পঞ্জ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

শিশুর স্নান—শিশুকে স্নান করাইবার পূর্বে ভাল করিয়া তৈল মাখাইয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে। শিশুর স্নানের জল রৌদ্রে রাখা খুব উপকারী। স্নানের সময় তোয়ালে দিয়া মৃদুভাবে ঘসিয়া ঘসিয়া শরীরের সব তৈল উঠাইয়া ফেলিবে। মাথায় খুব মৃদুভাবে জল ঢালিবে। একসঙ্গে বেশী জল ঢালিলে শ্বাস লইতে কষ্ট হইবে। শীতকালে শীতল জলে উষ্ণজল মিশাইয়া শিশুকে স্নান করাইবে। স্নানের পর তোয়ালে দিয়া ভাল করিয়া শরীর ও মাথা মুছাইয়া দিবে।

রুগ্ণ ব্যক্তির স্নান—রুগ্ণ ব্যক্তিকে কখনও উন্মুক্ত স্থানে স্নান করিতে দেওয়া উচিত নয়। বাহিরের ঠাণ্ডা শরীরে লাগিয়া অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া বন্ধঘরে রোগীর স্নানের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্নানের সময় রোগীকে তেল ব্যবহার না করাইয়া সাবান ব্যবহার করান চলিতে পারে। গরম জলে তোয়ালে ভিজাইয়া তাহা নিংড়াইয়া লইয়া ঐ ভিজা তোয়ালে দিয়া সমস্ত দেহ মুছিয়া দিতে হয়। পরে মাথায়

পরিমিত ঠাণ্ডা জল ঢালিতে হয়। এইরূপ ভাবে স্নান করাইবার ব্যবস্থাকে স্পঞ্জ করা বলে।

বৃদ্ধ ব্যক্তির স্নান—বৃদ্ধ ব্যক্তির স্নানের সময় সারাদেহে সুন্দরভাবে তেল মালিশ করিয়া দিবে। তেল মালিশে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া ভালভাবে কার্যকরী হয়। বালতিতে জল ভরিয়া একটি জলচৌকির উপর বসিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এইরূপ ব্যবস্থাই বৃদ্ধদের স্নানের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

সাধারণের স্নান—বাহির হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া তখনই স্নান করা অনুচিত। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিবে। যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে তাহাদের পক্ষে অবগাহন স্নান বিশেষ উপকারী। যাহারা কল-কারখানায় কাজ করে, আর যাহাদের পেশা ডাক্তারী করা বা নার্সিং করা, স্নানের সময় তাহাদের জলের সহিত কিছু নির্বীজন-দ্রব্য মিশাইয়া স্নান করিতে হয়। নোংরা কাজে হাত দিলে সাধারণ মানুষকেও ঐভাবে স্নান করিতে হয়। দলবদ্ধভাবে বড় লেকে অথবা নদীতে স্নান করিবার সুযোগ থাকিলে তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে স্নান শুধু স্বাস্থ্যকরই হয় না, আনন্দদায়কও হয়। কোন কোন দেশে এইরূপ স্নানের বেশ প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত হইতেছে।

দেহভঙ্গির কথা ঃ

দেহভঙ্গির সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত অনুশীলন প্রয়োজন। কি ভাবে বসিলে, কি ভাবে দাঁড়াইলে, কি ভাবে চলিলে, কি ভাবে শয়ন করিলে পেশী, অস্থি ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত না ঘটাইয়া দেহের গঠন সুন্দর করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আমরা

যাহাকে ফিগার বা গঠন-সৌষ্ঠব বলি দেহভঙ্গির অনুশীলনে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

দেহভঙ্গির অনুশীলন—দেহভঙ্গির সুষ্ঠু অনুশীলন শারীরিক গঠন-সৌন্দর্যকে বহুলাংশে বর্ধিত করে। মানুষের চলাফেরা, আলাপ-আলোচনায় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমান কালের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সুষ্ঠু দেহভঙ্গি শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অন্তর্নিহিত গুণ ও দেহভঙ্গির সুষ্ঠু বিকাশ যদি একই মানুষের ভিতর সন্নিবেশিত হয়, তবেই তাহার জীবনের সার্থকতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দেহভঙ্গির নিখুঁত বিন্যাস আমাদের স্বাস্থ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে।

দেহভঙ্গির সুষ্ঠু অনুশীলনের দ্বারা নিম্নোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে :—

* ইহার ফলে দেহ শক্ত হইয়া পড়ে না, দেহের কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের হানি হয় না ; গ্রীবাদেশ ও মেরুদণ্ড সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বার্ধক্যের ছাপ আনিতে পারে না।

* সুষ্ঠু অঙ্গবিন্যাস বা দেহভঙ্গি মানুষকে স্বাস্থ্যবান করে। তাহার বক্ষ প্রসারিত হয়। ফুস্‌ফুসের আয়তন বর্ধিত হয়। ফুস্‌ফুস ও হৃৎপিণ্ড ভালভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায়, রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকার্য সুন্দরভাবে চলিতে থাকে। এই ভাবে সুষ্ঠু অঙ্গবিন্যাস দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে স্বাভাবিক ও সহজ উপায়ে কাজ করিতে সাহায্য করে।

* দেহের ত্বক্‌কে সুন্দর ও মসৃণ করিয়া রাখে, সঙ্কুচিত হইতে সুযোগ দেয় না।

সুন্দর ও সার্থক স্বাস্থ্য গড়িতে হইলে শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার

চর্চাই নহে, সুষ্ঠু অঙ্গভঙ্গির চর্চা করাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। শৈশব কাল হইতে নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে দৈহিক শ্রী ও স্বাস্থ্যের মান অনেক উন্নত ও সুন্দর হয়। অবশ্য দেহবিন্যাসকে কার্যকরী করিবার পূর্বে নিখুঁত দৈহিক গঠনতন্ত্রের বা ফিগারের (Figure) বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ত মান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন।

বসিবার ভঙ্গি—বসিবার সময় একটি বিশেষ দৈহিক ভঙ্গি থাকা দরকার।

বসিবার সময় মেরুদণ্ড সোজা করিয়া উন্নত অবস্থায় বক্ষ প্রসারিত করিয়া বসিবার অভ্যাস করিবে। কখনও সম্মুখভাগে মাথা বা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিবে না। কাঁধ দুইটি সমানভাবে উঁচু রাখিবে। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলে মেরুদণ্ড অল্পদিনেই বাঁকিয়া যায়, দেহ কুব্জাকৃতি হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুসে নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

বিদ্যালয়ে বসিবার সময় অনেক ছাত্রছাত্রী বেঞ্চের উপর ঝুঁকিয়া বসে। ইহা যে কেবল দুষ্ট ভঙ্গি ও মেরুদণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা নয়, ইহা দুর্বলতার লক্ষণ ও সৌন্দর্যের পরিপন্থী। ইহাতে স্নায়ু ও পেশী স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিতে পারে না।

আহারে বসিবারও একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে। একটি হাত মাটিতে রাখিয়া, পা বাঁকাইয়া বসিতে অনেকেই ভালবাসে। ইহা বসিবার পক্ষে সুন্দর অথবা স্বাস্থ্যকর ভঙ্গি নয়। কারণ ইহাতে উদরের স্বাভাবিক ও সহজ অবস্থা ব্যাহত হয়। ইহাতে খাদ্যগ্রহণ ও হজম-ক্রিয়ায় অনেক গোলযোগ দেখা দেয়। স্বাভাবিক দৈহিক গঠন ও তাহার কার্যে ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বসিবার অভ্যাস করাই স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর বসিবার ভঙ্গি।

দাঁড়াইবার ভঙ্গি—চলিবার সময় পায়ের উপর দেহের সমস্ত ভার পড়ে। সমতা রক্ষা করিয়া দেহভার বহন করাই পায়ের কাজ। দেহের স্বাভাবিক গড়ন যদি ব্যবহারিক ত্রুটির জন্য অস্বাভাবিক হইয়া যায় তবে তাহাকে দুষ্ট অঙ্গভঙ্গি বলিতে পারি। পা ফেলিবার একটি সহজ ভঙ্গি আছে। চলিবার সময় গোড়ালি হইতে বুড়া আঙ্গুল পর্যন্ত ভার পড়ে। কিন্তু চলিবার দোষে সমস্ত পায়ের উপর দেহভার পড়িবার ফলে পায়ের গঠনে বিকৃতি দেখা দেয়। এই পা দেখিতে কদাকার হয়, চলিতেও অসুবিধা হয়। এই ধরনের পা-কে সাম-তলিক পা বা flat foot বলা হয়। দাঁড়াইবার দুষ্ট ভঙ্গি, ও অত্যন্ত ভারী জুতা পরিধান করিবার ফলে পায়ের গঠন-সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় পায়ের নিম্নদেশের মধ্যবর্তী অংশ মাটির সহিত মিশিয়া যায় না, বেশ কিছুটা আল্‌গা থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক গড়ন নষ্ট হইয়া গেলে ব্যতিক্রম দেখা যায়, সমস্ত পা মাটিতে লাগিয়া যায়। স্বাভাবিক ও সুস্থ ভঙ্গিতে মেঝের উপর ছাপ ফেলিলে দেখিতে পাইবে কোন অবস্থায়ই সম্পূর্ণ পায়ের ছাপ সেখানে পড়িবে না।

দাঁড়াইবার সময় পা সমান্তরাল করিয়া পিঠ সোজা রাখিয়া, মাথা উঁচু করিয়া এবং সম্মুখে দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইতে হয়। ইহাই দাঁড়াইবার আদর্শ ভঙ্গি।

বয়স অনুসারে দেহের উচ্চতা এবং ওজনের কথা

জন্মের পর প্রথম অবস্থায় শিশুর ওজন ৩ সের হইতে ৫ সের (৬ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ড) আর উচ্চতা ২০″ ইঞ্চির মত হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহের উচ্চতা ও ওজন দুইই বাড়ে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানবদেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি

সাধিত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের পশ্চাতে কার্যকারণের সম্পর্ক আছে। আমাদের দেহের ভিতরে ঝিল্লিকলা (Epithelial Tissue), সংযোজক কলা (Connective Tissue), পেশীকলা (Muscular Tissue) ও স্নায়ুকলা (Nerve Tissue)—এই চারি প্রকার কলা বা দেহতন্তু আছে। অসংখ্য কোষের সমবায়ে এগুলির সৃষ্টি। কোষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া অগণিত কোষের সৃষ্টি করে। প্রতি স্তরের কোষ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। দেহ বৃদ্ধির অর্থই হইল কোষের বৃদ্ধি। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়কালে ও বার্ধক্যে কোষ ও অস্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বেশী বয়সে এই প্রক্রিয়া মন্থর হইয়া যায়। তখন আর দেহের ওজন ও উচ্চতা বাড়ে না। আমাদের দেহ যদি উপযুক্ত খাদ্য পায়, দেহের বিভিন্ন লালাগ্রন্থি ও বিশেষ করিয়া থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড যদি স্বাভাবিক ভাবে আভ্যন্তরিক বিভাগে কাজ করিয়া চলে, তবে দেহের পুষ্টিসাধন ও স্বাভাবিক ওজন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই ভাবে দেহের অভ্যন্তরস্থ দেহকোষ, পেশীকলা ও বিভিন্ন গ্রন্থি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই ওজন বৃদ্ধি করে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে শরীর কৃশ অথবা স্থূল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ওজন কম-বেশী হইয়া থাকে।

খাদ্যগ্রহণ-ব্যবস্থার সহিত দৈহিক ওজনের সম্পর্ক ঃ

বয়স অনুসারে সুষম আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। শরীর এবং পাকস্থলী প্রভৃতি দুর্বল হইবার জন্য পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। অনেক সময় দারিদ্র্যের জন্য দেহের পুষ্টিসাধনের প্রয়োজনীয় ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তবে যতদূর সম্ভব খাদ্যমূল্য এবং ক্যালোরির বিচার করিয়াই খাদ্য গ্রহণ

করা উচিত। যাহারা সাধারণ রকমের পরিশ্রম করে তাহাদের খাদ্যের তাপমাত্রা ৩০০০ ক্যালোরি হওয়া প্রয়োজন। যাহারা অধিক পরিশ্রম করে তাহাদের খাদ্যে ৩৬০০ ক্যালোরির প্রয়োজন হয়। খাদ্যের সহিত ঐ নির্ধারিত মাত্রার ক্যালোরি গ্রহণ না করিলে শরীরের স্বাভাবিক ওজন হ্রাস পাইতে থাকে।

আমাদের শরীরের ভিতর সর্বদা দহনকার্য চলিতেছে। ফলে শরীর অনবরত ক্ষয় হইতেছে। যদি শুধু এই কার্যই শরীরে একটানা চলিত তবে শরীর একেবারে কৃশ হইয়া পড়িত; দৈহিক ওজনও হ্রাস পাইত। কিন্তু শরীর-বিজ্ঞানের কার্যকলাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একদিকে যেমন শরীরের ক্ষয় হইতেছে অন্যদিকে তেমন গঠনও হইতেছে। আমাদের দেহে দহনকার্যের জন্য এই যে ক্ষয় সাধন ঘটিতেছে ইহাকে 'অবচিতি' (Catabolism), আর যে ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষয়পূরণ সম্পাদিত হইতেছে তাহাকে 'উপচিতি' (Anabolism) বলে। একই সঙ্গে ক্ষয়কার্য এবং পূরণকার্য যখন পাশাপাশি চলে, তখন তাহাকে 'সমুচ্চিতি' (Metabolism) বলে।

শৈশবে শরীরের ক্ষয়ের চেয়ে গঠনকার্যই বেশী হয়। মধ্যবয়সে ও পূর্ণবয়সে ক্ষয় ও গঠনের মাত্রা প্রায় একই প্রকার থাকে বলিয়া শরীরের ওজন বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। রুগ্ণ অবস্থায়, অনশনকালে এবং বার্ধক্যে পূরণকার্য অপেক্ষা ক্ষয়কার্যই বেশী হইতে থাকে বলিয়া শরীরের ওজন বৃদ্ধি না পাইয়া দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। উপযুক্ত খাদ্যই আমাদের দেহে ক্ষয়পূরণের কাজ করিয়া থাকে। দেহের ওজন বৃদ্ধি ও ওজনের আনুপাতিক মান রক্ষা করিতে হইলে অস্থির (Bone) উপযুক্ত পরিপুষ্টির কথা ভাবিতে হইবে। এইজন্য ক্যাল্‌সিয়ামের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। ক্যাল্‌সিয়াম এক প্রকার চুন-ঘটিত লবণ। সাধারণতঃ

একজন প্রাপ্তবয়ক ব্যক্তির ৭৫ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়ামের প্রয়োজন হয়। শিশু ও বালক-বালিকাদের প্রয়োজন হয় কিছু বেশী। কিন্তু কেবলমাত্র অমিশ্রিতভাবে ক্যাল্‌সিয়াম গ্রহণ করা উচিত নয়। খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ফস্‌ফরাস গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না হইলে রিকেট নামক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। সমপরিমাণ ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিলে দেহের অস্থি যথোপযুক্ত ভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে।

শরীরের ওজন বৃদ্ধির জন্য খাদ্য কি ভাবে সাহায্য করে— যথোপযুক্ত ভাবে শরীরের পুষ্টিসাধন হইলে তবেই ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। যদি সেই কার্যে ব্যাঘাত ঘটে তবে যে বয়সে যে নির্দিষ্ট ওজন হওয়া উচিত তাহা হয় না। খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া ওজনের সমতা রক্ষা করে। ওজনবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন বিচ্ছিন্ন কাজ নয়, একটি অপরটির দ্বারা সার্থক হয় ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কাজেই শরীরের পুষ্টির জন্য আমাদের কি ধরনের খাদ্য, কি পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

দেহ-পরিপোষক খাদ্য দেহের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন করিয়া শরীরের উপযুক্ত ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই শ্রেণীর খাদ্যবস্তুকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বা প্রোটীন জাতীয় খাদ্য বলে। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ এই জাতীয় খাদ্য। ইহারা শরীরের বৃদ্ধি, গঠন ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই খাদ্য ছাড়া আমাদের দেহ যথাযথভাবে পুষ্ট হইতে পারে না। এই খাদ্য আমাদের দেহে মেদ গঠনেও কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের খাদ্যের ভিতর প্রাণিজ প্রোটীন শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ, এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটীন শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ থাকিলে তবেই দেহের পরিপুষ্টি সাধনে কোন অসুবিধা হয় না। আবার স্নেহজাতীয় খাদ্যও

আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য। এই খাদ্য দেহে মেদ সৃষ্টির কার্যে সাহায্য করে। অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিবার ফলে তাহা দেহে মেদরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। উপবাস, অনাহার প্রভৃতির সময় ইহা দেহের ক্ষয়পূরণের সাহায্য করে। খাদ্যদ্রব্য পরিমাণমত গ্রহণ করিলে ওজন হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে না।

লবণ জাতীয় খাদ্যও এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। লবণ জাতীয় খাদ্য অন্যান্য খাদ্যবস্তুকে হজম করিতে সাহায্য করে। হজমের জন্য মুখের লালার (Saliva) প্রয়োজন হয়। লবণ জাতীয় খাদ্যবস্তু লালার উৎপাদন করিয়া থাকে এবং পিত্ত প্রস্তুত করিবার জন্য যকৃৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। পাকস্থলী হইতে নির্গত পাচক রসের অম্লাংশ (Hydrochloric acid) এই লবণজাত খাদ্য হইতেই প্রস্তুত হয়। ইহা অস্থিগঠন, পুষ্টিসাধন ও শারীরিক যন্ত্র গঠনেও বিশেষ সাহায্য করে।

খাদ্যই দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। দেহ সুপুষ্ট হইলে তবেই দেহের উপযুক্ত ও পরিমিত ওজন বজায় থাকে। ওজন বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য আমাদের **(ক) প্রোটীন জাতীয় খাদ্য, (খ) স্নেহজাতীয় খাদ্য, (গ) লবণ জাতীয় খাদ্য** গ্রহণ করা উচিত।

সংক্ষেপে মনে রাখিতে হইবে উপযুক্ত প্রোটীন জাতীয় খাদ্য+ স্নেহজাতীয় খাদ্য+ লবণ জাতীয় খাদ্য=দেহের পুষ্টিসাধন ও ওজন বৃদ্ধির সহায়ক খাদ্য।

ওজনবৃদ্ধির জন্য শরীর-সঞ্চালন বা ব্যায়ামের প্রয়োজন—শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য নিয়মিতভাবে অঙ্গ পরিচালনা ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। উপযুক্ত খাদ্যব্যবস্থার সহিত নিয়মিত ব্যায়াম করিবার অভ্যাস শরীরকে পরিপুষ্ট করে, পেশী ও দেহের অন্যান্য অংশকে সুগঠিত করিয়া তোলে। এই ভাবে শরীর চালনা ও স্বাস্থ্য-

চর্চার মাধ্যমে দেহ সুগঠিত হইলে স্বাভাবিক ভাবে শরীরের ওজন বৃদ্ধি হয়।

ওজন বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ—অনেক ক্ষেত্রে মানুষের দেহ অত্যন্ত দ্রুত স্ফীত হইতে থাকে।. এইরূপ মাত্রাতিরিক্ত মেদবৃদ্ধি স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এইভাবে মেদবৃদ্ধির মূলে থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের কার্য-পদ্ধতিতে কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়।

শারীরিক ওজন বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত জাতিগত প্রভাবও যুক্ত থাকে। বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় যে সব নরনারী বাস করিতেছে তাহাদের আচার-ব্যবহার, খাদ্যগ্রহণ-ব্যবস্থা, পরিশ্রম ও জীবিকা অন্য দেশ হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। জলবায়ুর প্রভাবও তাহাদের স্বাস্থ্য এবং দৈহিক গঠন-ব্যবস্থাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। এই সকল উপাদান হইতেই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। সেই জন্য একই বয়সের একজন পাঞ্জাবী বা কাশ্মীরী মেয়ের সহিত একজন বাঙ্গালী মেয়ের দৈহিক ওজনের কিছুটা পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহার কারণ ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব। পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষদের চলাফেরায় যে পরিমাণ মাংস-পেশীর সঞ্চালন হয় সমভূমির মানুষদের তাহা হয় না। আবার কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে ফল যত সহজলভ্য অন্য দেশে ততটা নয়। এই সব দেশে পরিশ্রমের পরিমাণ, পেশী-সঞ্চালন, ভৌগোলিক অবস্থানের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর জলবায়ু শরীর গঠনের দিক হইতে অনেক বেশী সুবিধাজনক। এইভাবে জাতিগত পার্থক্য দুইটি সমবয়সী বালিকার দৈহিক ওজনের পার্থক্য সৃষ্টি করে।

ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহূর্ত হইতে মানুষের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী তাহার দেহগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। খাদ্য ও পানীয় মানুষের শারীরিক গঠন বৃদ্ধির

অন্যতম কারণ। দেশ ও জাতি বিশেষে ইহার আবার পার্থক্য হইয়া থাকে। কাহারও খাদ্যগ্রহণ-ব্যবস্থা হয়ত স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযুক্ত, কাহারও বা স্বাস্থ্যসম্মত নয় কিন্তু মুখরোচক। জাতিগত এইসব পার্থক্য দেহপুষ্টির কার্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ু, সূর্যরশ্মির প্রভাব, মৃত্তিকার গুণ এবং কীটপতঙ্গ ও পরজীবী জীবাণু প্রভৃতির প্রভাব ও আক্রমণ মানুষের দেহবৃদ্ধির ব্যাপারে প্রচুর উন্নতি সাধন কিংবা অবনতি ঘটাইয়া থাকে। যে অঞ্চলের অধিবাসী জাতিগত আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল, সূর্যকিরণ, মুক্তবায়ু, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভোগ করিবার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস আয়ত্ত করার বেশী সুযোগ পায় সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহপুষ্টির বেশী সম্ভাবনা থাকে।

দৈহিক উচ্চতার কথা

দৈহিক উচ্চতার হ্রাস এবং বৃদ্ধির অনেক কারণ আছে। সেই কারণগুলির আলোচনা নিম্নে করা হইতেছে।

* শিশু যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন অভ্যন্তরীণ জটিলতা অনেক সময় শিশুর দৈহিক উচ্চতাকে স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে দেয় না। এই ত্রুটির জন্য শিশু স্বাভাবিক উচ্চতা না পাইয়া একটু খর্বাকৃতি হয়।

* মাতাপিতার দৈহিক গঠন ও উচ্চতা বংশধরদের অনেকখানি প্রভাবিত করিয়া থাকে। মানবদেহ-কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর ৪৮টি চতুষ্কোণ সূক্ষ্ম ক্রোমোসোম (chromosome) থাকে। এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে গর্ভস্থ সন্তানের দেহগঠন-কার্যে সক্রিয়-ভাবে কাজ করিতে থাকে। মাতাপিতার ভিতর যাহার ক্রোমোসোম

অধিকতর শক্তিশালী হয় প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সন্তানের ভাবী আকৃতি, প্রকৃতি ও উচ্চতাকে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সন্তানেরা অনেকখানি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। গায়ের রঙ, চোখের রঙ ও গঠন-বৈশিষ্ট্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, দৈহিক উচ্চতা ও বৃদ্ধি প্রভৃতিও তাহারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া থাকে।

* আবার যদি নিয়মিত ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করা না হয় তবে দৈহিক উচ্চতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেকখানি কমিয়া যায়। দেহ মেদবহুল হইয়া পড়িলে শারীরিক উচ্চতার মান অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। দেহের উচ্চতা বৃদ্ধি করিতে উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের ব্যায়াম অভ্যাস করিলে বিশেষ ফললাভ করা যায়। স্কিপিং ও রিং করা উচ্চতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

* জাতিগত ও প্রকৃতিগত প্রভাবে মানুষের উচ্চতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। চীন দেশের অধিবাসী সমূহ, নেপালী বা গুর্খারা স্বাভাবিক ভাবেই খর্বাকৃতি ও বেঁটে। এইরূপ হইবার কারণ কিন্তু জাতিগত প্রভাব। তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যই স্বাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। মঙ্গোল, দ্রাবিড় ও অনার্য জাতির রক্তের চেয়ে যাহাদের গায়ে প্রকৃত আর্যজাতির রক্ত আছে তাহাদের দৈহিক উচ্চতা অনেক বেশী।

কোন্ বয়সে কিরূপ দৈহিক ওজন ও উচ্চতা থাকা উচিত তাহা একটি চার্টের সাহায্যে দেখান হইতেছে।

[দৈহিক ওজন ও উচ্চতার চার্ট ৮২ পৃষ্ঠার পরে দেওয়া হইল]

অনুশীলনী

1. What is Home Science? Explain what is the role of Home Science in modern life. (গৃহবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়? আধুনিক জীবনে গৃহবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।)
2. What is your idea about good health? (আদর্শ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?)
3. 'Health is not merely absence of disease.'—Explain. What are the factors that produce good physical health? ('নীরোগ হইলেই স্বাস্থ্যবান বলা চলে না'—ব্যাখ্যা কর। কি কি উপাদান শরীর সুস্থ রাখে?) (H. S. '60)
4. What is personal hygiene? Discuss why fresh air and sunshine are so important for health. (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলিতে কি বোঝ? মুক্তবায়ু ও সূর্যালোক স্বাস্থ্যের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় কেন?) (H. S. '61)
5. What parts of the body we should take in special consideration? (শরীরের কোন্ কোন্ অংশ সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করা উচিত?)
6. How can you maintain healthy skin? Describe with diagram the structure of skin, (গাত্রচর্ম সুস্থ রাখা যায় কিরূপে? চিত্র আঁকিয়া চর্মের গঠন-প্রণালী বর্ণনা কর।)
7. What is the utility of taking fresh air? (মুক্তবায়ু সেবনের প্রয়োজনীয়তা কি?)
8. What is the composition of air? (বায়ুর উপাদান কি?)
9. How air becomes purified by (1) natural means, (2) artificial means? [(১) স্বাভাবিক উপায়ে এবং (২) কৃত্রিম উপায়ে বায়ু বিশুদ্ধ হয় কিরূপে?]

10. What is the effect of over-crowding in a closed room ? (একটি বদ্ধঘরে বেশী লোক থাকার কি ফল ?)
11. What part does sunshine play in our life ? (আমাদের জীবনে সূর্যকিরণের প্রভাব কতখানি ?)
12. Why should we take regular exercise ? (আমাদের নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত কেন ?)
13. 'Sleep is a kind of rest'—Do you agree ? ('নিদ্রা এক প্রকার বিশ্রাম'—তুমি কি ইহা অনুমোদন কর ?)
14. How should we practise regular bath habits in our daily life ? (আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত স্নানের অভ্যাস কি ভাবে করিবে ?)
15. Is food one of the most prominent factors of health ? Give reasons for your answer. (স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য কি একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ? যুক্তি দ্বারা তোমার বক্তব্য সমর্থন কর।)
16. Give an account of ideal weights in proportion to height according to age. (বিভিন্ন বয়সের উচ্চতা অনুপাতে ওজনের একটি বিবরণ দাও।)
17. What steps would you take in oraer to prevent disease of your hair ? (চুলের রোগ নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে ?)
18. State briefly the steps you would take in order to prevent the early decay of your teeth. (অকালে দন্তক্ষয় নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে সংক্ষেপে লিখ।)
19. State the steps you would follow in order to preserve good eye-sight. (দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে ? বর্ণনা কর।)

20. What is the importance of rest in human life? Which is the best form of rest? (মানুষের জীবনে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কি? কোন্ প্রকার বিশ্রাম সর্বাপেক্ষা ?)

21. How does exercise help to promote our general health? State the rules for taking exercise. (ব্যায়ামের দ্বারা আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের কি উন্নতি হইয়া থাকে? ব্যায়ামের নিয়মগুলি লিখ।)

22. Discuss why rest and sleep are essential for our health. (স্বাস্থ্যের জন্য নিদ্রা ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন কেন—আলোচনা কর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ-পরিচালনার কথা

মানুষ সচেতন বুদ্ধিমান জীব। অন্ধের মত প্রকৃতির হাতে সে আত্মসমর্পণ করে নাই। আপন সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছে; প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিশুদ্ধ করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ
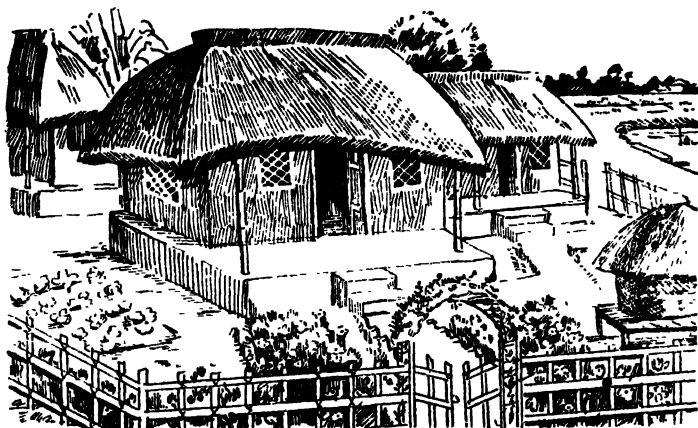
গ্রামের বাড়ী

মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, ভাল রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সরবরাহের সু-ব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য মানুষ সর্বদাই সচেষ্ট। আদর্শ বাসগৃহের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একদিকে প্রকৃতির দেওয়া আবেষ্টনী আর অন্য দিকে মানুষের রচিত নানাবিধ ব্যবস্থার

প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার উপর মানুষের জ্ঞান-লব্ধ সুযোগ-সুবিধাকে প্রয়োগ করিয়াই রুচিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহপরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

আদর্শ গৃহপরিবেশের কথা উঠিলেই সেই অঞ্চলের (১) অর্থ-নৈতিক অবস্থা, (২) সামাজিক অবস্থা, (৩) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অবস্থা এবং (৪) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় বিবেচনা করার কথা আসিয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনার ভিতর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা, যানবাহনের সুবিধা, শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা, নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য দোকান, অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস প্রভৃতি সব কিছুর কথা চিন্তা করিতে হয়। কোন অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করিতে গেলে সংসারের নিত্যকার প্রয়োজন কি কি হইতে পারে আর সেখানকার পরিবেশ প্রয়োজনের কতটা অংশ মিটাইতে পারে, তাহারও বিবেচনা করা দরকার।

ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাইতে পারিবে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। শিশুরা বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে পারে, এবং দূরত্ব ও গমনাগমনের পথ যেন বিঘ্নসংকুল বা কষ্টদায়ক না হয় ইহা অবশ্যই গৃহপরিবেশের দিক হইতে স্মরণে রাখা কর্তব্য।

ছোটদের লেখাপড়া শিখাইবার সুন্দর সহজ ব্যবস্থা আছে কিনা, বড়দের উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কতখানি আছে গৃহপরিবেশ নির্বাচনে এই ব্যাপারে সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

অসুখ-বিসুখে ডাক্তার, ঔষধ ইত্যাদি সহজলভ্য হইবে কিনা, কিংবা নিকটে দোকানপাট, বাজার আছে কিনা দেখা দরকার। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজে কিনিতে না পারিলে সেই গৃহ-পরিবেশকে কেহ আদর্শ পরিবেশ বলিয়া স্বীকার করিবে না। তাই গৃহের আঞ্চলিক সীমার ভিতর দোকানপসার, হাটবাজার, পোস্ট

অফিস, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সবকিছুই থাকা উচিত। তাহা না হইলে সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

যানবাহনের সুব্যবস্থা—যানবাহনের সুব্যবস্থা গৃহপরিবেশের একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দূরের অফিস, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে অল্প
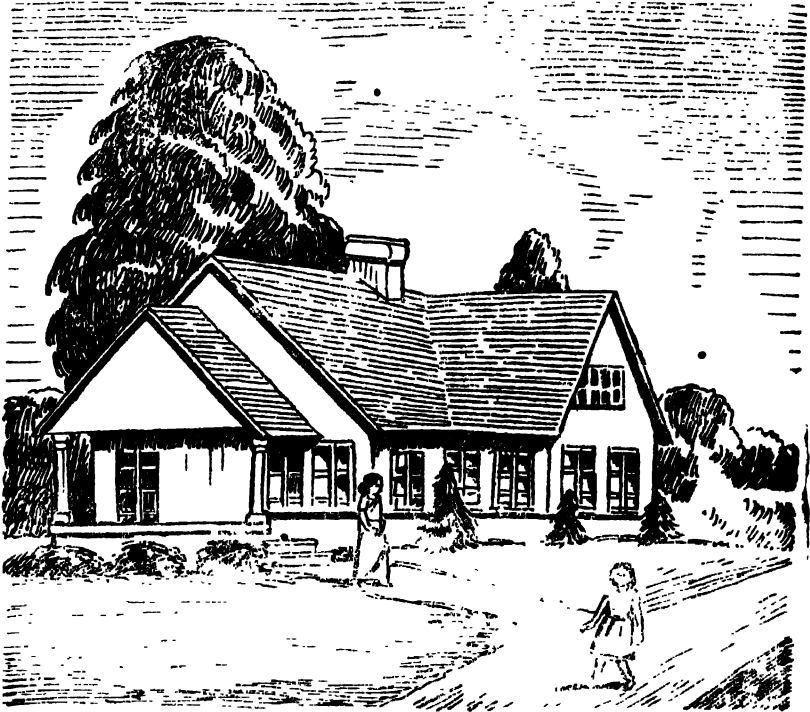
শহরের বাড়ী

সময়ে পৌঁছাইবার জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা আছে কিনা তাহাও বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন।

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে গত মহাযুদ্ধের পর

তিন-চারগুণ লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে ঘর-বাড়ী নির্মিত হয় নাই। বাসস্থানের স্বল্পতা এবং জল ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব প্রভৃতি নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াও মানুষ এই সকল বৃহৎ নগরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে আশ্রয় পাইবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল; ইহার একমাত্র কারণ যানবাহনের সুব্যবস্থা। চাকরিস্থল, বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এইসব নগরের যে কোনও স্থান হইতে সামান্য সময়ের পথ। যানবাহনের খরচও যৎসামান্য।

তাহা ছাড়া যানবাহনের অব্যবস্থা এবং কষ্টকর চলাফেরার জন্য মানুষের শরীর ও মন বিরূপ হয়, স্বভাব রুক্ষ হইয়া উঠে। অন্যদিক হইতে চাকরিস্থলে বা বিদ্যালয়ে উপস্থিতি প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট অর্থের অপচয় হয়। সুতরাং শরীর ও মনের স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সুবিধা এই উভয়বিধ দিক হইতে বাসস্থান নির্ণয় করিবার প্রাক্কালে যানবাহনের কথা বিবেচনা না করিয়া উপায় নাই।

সামাজিক পরিবেশ—ইংরেজীতে একটা কথা আছে "A man is known by the company he keeps." পরিবেশ দেখিয়া তাহার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রুচিগত মূল্য বিচার করা কঠিন নয়। সমান অবস্থাপন্ন এবং সামাজিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ যদি পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া বসবাস করে তবেই তাহাকে উপযুক্ত পরিবেশ বলা চলিতে পারে। বিকৃত-রুচিসম্পন্ন প্রতিবেশীর প্রভাব শিশুদের ভবিষ্যতের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। দূষিত পরিবেশ যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বিকৃত সামাজিক রুচিও শিশুর জীবন গঠনের পক্ষে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শান্তির পক্ষে সেইরূপ ক্ষতিকর। পরিবেশ শুধু স্বাস্থ্যকেই গড়ে না, জীবনকেও গড়িয়া তোলে। তাই পরিবেশের ভিতর শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক, চিকিৎসক, উকিল, সাহিত্যিক, গায়ক, চাকরিজীবী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত মানুষ এবং

বাড়ীর দেওয়াল ১০" অথবা ১৫" ইঞ্চি পুরু হওয়াই ভাল। দেওয়ালের ভিতর বাহির দুইদিকে চুনবালি কিংবা বালি ও সিমেণ্টের মিশ্রিত পলস্তারার প্রলেপ দেওয়া উচিত। দেওয়ালের আবরণ
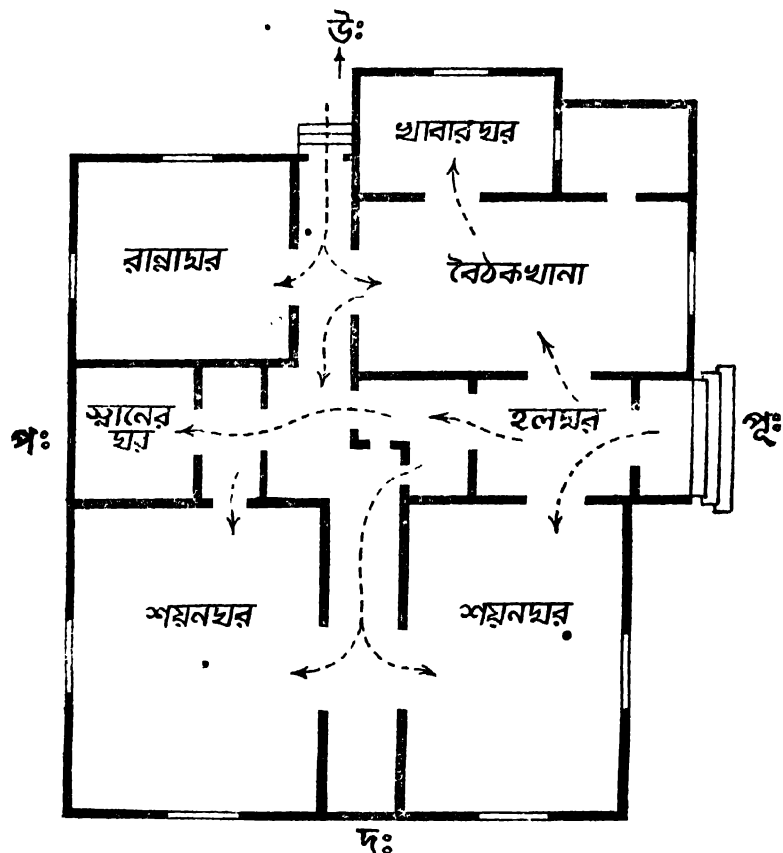
আদর্শ বাড়ীর নকশা

মোলায়েম হওয়া দরকার। অশোষক বস্তুর আস্তরণই দেওয়ালের পক্ষে ভাল। এইরূপ দেওয়াল বাহিরের জল শুষিয়া গৃহকে সেঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে না। প্রত্যেক ঘরের

উচ্চতা অন্ততঃ ১২ ফুট হওয়া দরকার। ইহাতে ঘবে প্রচুর আলো-বাতাস খেলিতে পারে। আস্তরণের কাজ শেষ হইলে দেওয়ালে রঙের কাজ কবিতে হয়। ইহা গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি
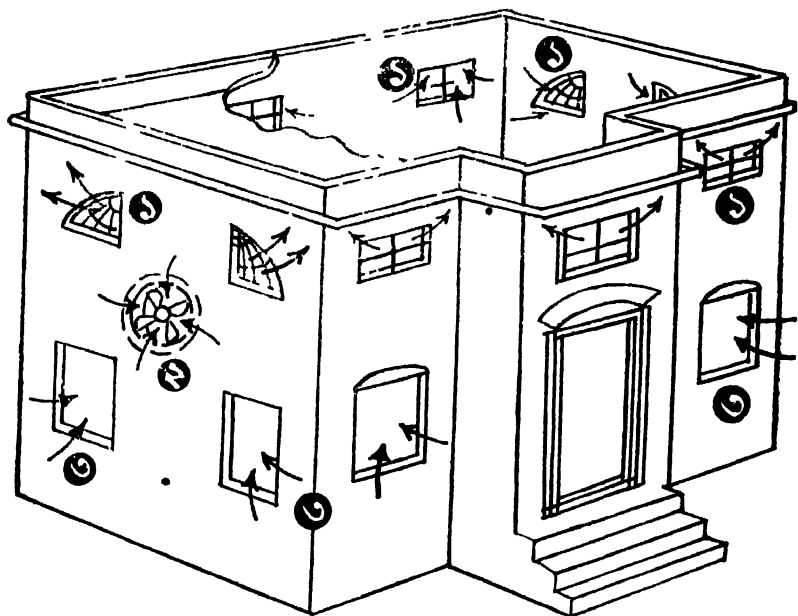
আদর্শ গৃহ ঃ (১) ঘরের গরম দূষিত বায়ু বাহির হইবার স্থান। (২) এই ধরনের বৈদ্যুতিক বায়ু-নিষ্কাশন পাখা ঘরের বায়ু চলাচলে সাহায্য করে। (৩) গৃহে বাহিরের ঠাণ্ডা নৈশ বায়ু প্রবেশের জন্য প্রশস্ত জানালা।

করে। যে রঙ চোখে লাগে সেইরূপ রঙ ব্যবহার করিতে নাই। যাহা চোখকে ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ করে সেই রঙই ব্যবহার করিতে হয়। প্রতি ঘরে একটি বড় দরজা ও অন্ততঃ দুইটি করিয়া জানালা রাখা উচিত। বায়ু সঞ্চালনের জন্য রন্ধ্র বা ভেন্টিলেটার থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বাসগৃহের মেঝে—প্রথমে ঝামা ইটের খণ্ড, সুরকী ও চুনে তৈয়ারী মিশ্রিত মসলা ফেলিয়া তুরমুশ করিতে হয়। পরে যখন উহা সমতল হইবে, তখন উহার উপরিভাগে সিমেণ্ট ও বালু মিশাইয়া প্ল্যাস্টার করিতে হইবে। জল নিষ্কাশনের জন্য এক কোণে মূল ড্রেনের দিকে মুখোমুখি করিয়া ছোট্ট একটি ড্রেন করিতে হইবে। মেঝে সকল ক্ষেত্রেই পাকা করা উচিত। ইহাতে ঘর পরিষ্কার করা সহজ হয়।

মেঝেতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবার জন্য সিমেণ্ট ও রঙ মাখাইয়া কিছু হাল্কা ধরনের নকশার কাজও করা যায়।

বাসগৃহের ছাদ—ঘরের উপরের আবরণ ছাদ। ছাদ নানা ভাবে নির্মাণ করা চলিতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ছাদ বেশ উঁচু হয় এবং মজবুত করিয়া তৈয়ারী হয়। ছাদ নীচু হইলে আলো-বাতাস সহজে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহাতে ঘরের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আবার ইহা মজবুত না হইলে বৃষ্টির জল, শিশিরকণা প্রভৃতি চুয়াইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাহাতে গৃহের বাসিন্দাদের নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ছাদের গঠনকার্যে ত্রুটি থাকিলে বৃষ্টির জল, ধূলাবালি ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা ভাল নয়। ছাদ পাকাই হউক বা টিন অথবা টালিরই হউক উহার, গঠন-প্রণালীতে যেন ত্রুটি না থাকে। টিন বা অ্যাস্‌বেস্টস্‌-এর ছাদ করিলে উহার কিছু নীচে সিলিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে এইরূপ ঘরে গ্রীষ্মকালে বাস করা কষ্টকর হয়।

রান্নাঘর—রান্নাঘরে গৃহিণীকে অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয়। তাই এই ঘর বেশ আলো-হাওয়াযুক্ত হওয়া উচিত। রান্নাঘর পাকা

করা এবং ঐ ঘরে বড় জানালা বসান প্রয়োজন। দেওয়ালের গায়ে জালের আলমারী তৈয়ারী করিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতের কাছে সাজাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। জল-নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ঘরের ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য ছাদের উপর ধূমনির্গমনের পথ থাকা বিশেষ প্রয়োজন;
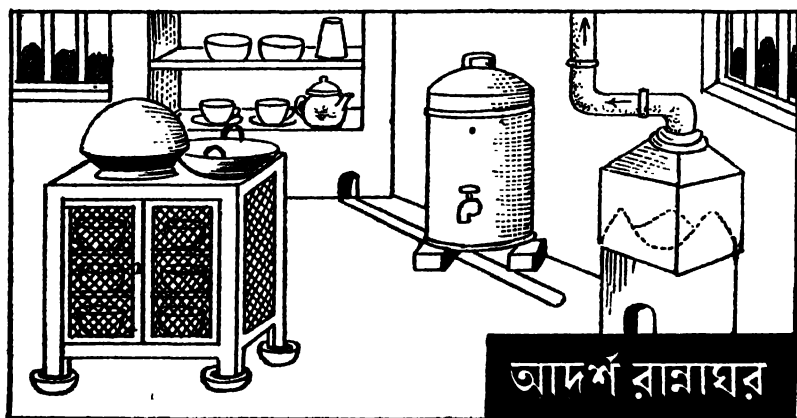
আদর্শ রান্নাঘর

কারণ ধূম স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। রান্নাঘর শুষ্ক ও পরিষ্কার হইলে মাছি, আবশুলা প্রভৃতির উপদ্রব বেশী হইতে পারে না। রান্নাঘর যেমন স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া উচিত তেমন আবার সহজভাবে চলাফেরা ও কাজকর্মের উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

পায়খানা—স্যানিটারী পায়খানা তৈয়ারী করাই ভাল। সকলের পক্ষে এইরূপ পায়খানা করা সম্ভব না হইলে পায়খানা বাসগৃহ হইতে বেশ দূরে করাই ভাল। কূপ কিংবা পুষ্করিণী হইতে ইহা ৫০।৬০ ফুট দূরে নির্মাণ করাই স্বাস্থ্যসম্মত। পায়খানার জমি অপ্রবেশ্য স্তরের হওয়াই উচিত। পায়খানায় যাহাতে বৃষ্টির জল একটুও ঢুকিতে না পারে এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যকিরণ প্রবেশ

করিতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পায়খানা নির্মাণের সময়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—

(ক) মল ও মূত্রের জন্য যেন আলাদা পাত্র থাকে। মল-মূত্র যেন পৃথক্‌ভাবে সঞ্চিত হয়।
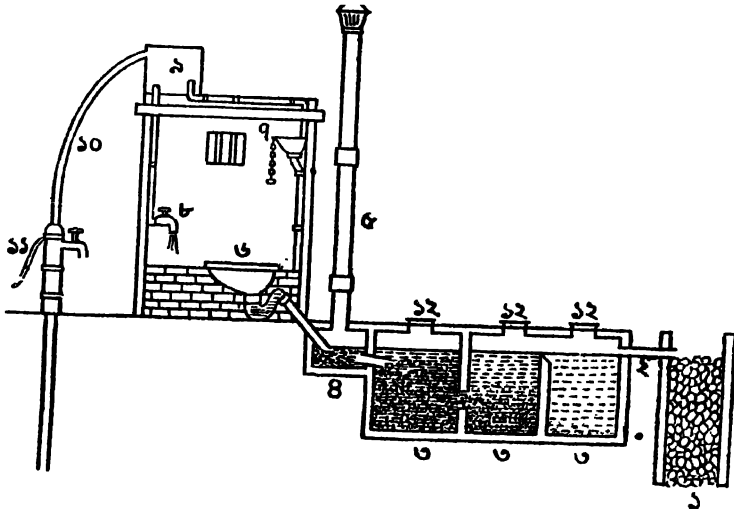
স্যানিটারী পায়খানা

১। চৌবাচ্চা, ২। নির্গমনল, ৩। মলকক্ষ ও জীর্ণকক্ষ, ৪। মল জমিবার কক্ষ, ৫। দূষিত গ্যাস নির্গমনল, ৬। মলপাত্র, ৭। ফ্লাশ, ৮। কল ৯। উপরের ট্যাঙ্ক, ১০। নল, ১১। টিউবওয়েল।

(খ) মেথর যাহাতে অনায়াসে পায়খানায় প্রবেশ করিয়া উহা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিতে পারে সেই কথা মনে রাখিয়া প্রবেশপথের পরিকল্পনা করা উচিত।

(গ) পায়খানার দরজা বেশীর ভাগ সময়েই বন্ধ করিয়া রাখিলেও যাহাতে প্রচুর বায়ু ও সূর্যকিরণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে সেই

ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ সূর্যকিরণের দুর্গন্ধ নিবারণের ও জীবাণু-ধ্বংসের ক্ষমতা আছে।

বাড়ীর সীমানা—গৃহের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে বাড়ীর সীমানাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। সমস্ত বাড়ীর দূষিত ও গলিত আবর্জনা বাহিরে ফেলিবার জন্য ড্রেন তৈয়ারী করিতে হয়। ঐ ড্রেন নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা উচিত। তাহা না করিলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হইবে। মশা, মাছি ও অন্যান্য রোগজীবাণুও বৃদ্ধি পাইবে। শুষ্ক আবর্জনা একটি পাত্রে করিয়া বাড়ীর বাহিরে স্তূপ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরে উহা আগুনে পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিতে হয়। বাড়ীর সীমায় আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

গৃহপরিবেশে বায়ুসঞ্চালন :

আদর্শ গৃহপরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বায়ুসঞ্চালনের প্রভাব যথেষ্ট। মানুষের মনের উপরেও ইহা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

সূর্যালোক ও জলের সহিত স্বাস্থ্যের যেমন সম্পর্ক আছে, বায়ুর সঙ্গেও সেইরূপ সম্পর্ক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, (ক) উষ্ণতা, (খ) আর্দ্রতা, (গ) চাপ ও (ঘ) প্রবাহ বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে। বায়ু-প্রবাহে উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে শ্বাসকার্য ও হৃৎপিণ্ডের গতি মন্থর হয়। ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি নষ্ট হয়, কর্মে অনিচ্ছা জন্মে, স্নায়ুতন্ত্র নিস্তেজ এবং শিথিল হইয়া পড়ে। বায়ুপ্রবাহে আর্দ্রতার কম-বেশী নির্ভর করে বায়ুর চাপ ও উষ্ণতার উপর। আবার উষ্ণতা ও আর্দ্রতার উপর বায়ুপ্রবাহের গতি নির্ভর করে। বায়ু চলাচলের দ্বারা জীবাণু, ধূলি, দূষিত গ্যাস প্রভৃতি বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়। স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক শান্তি ও আনন্দের জন্য নির্মল বায়ু-

প্রবাহ একান্ত প্রয়োজনীয়। বায়ুসঞ্চালন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির দিকে নজর রাখিতে হইবে।

(ক) গৃহ দক্ষিণমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। জানালা-দরজা আড়া-আড়ি ভাবে স্থাপন করা উচিত যাহাতে বায়ু চলাচল সহজ হয়।
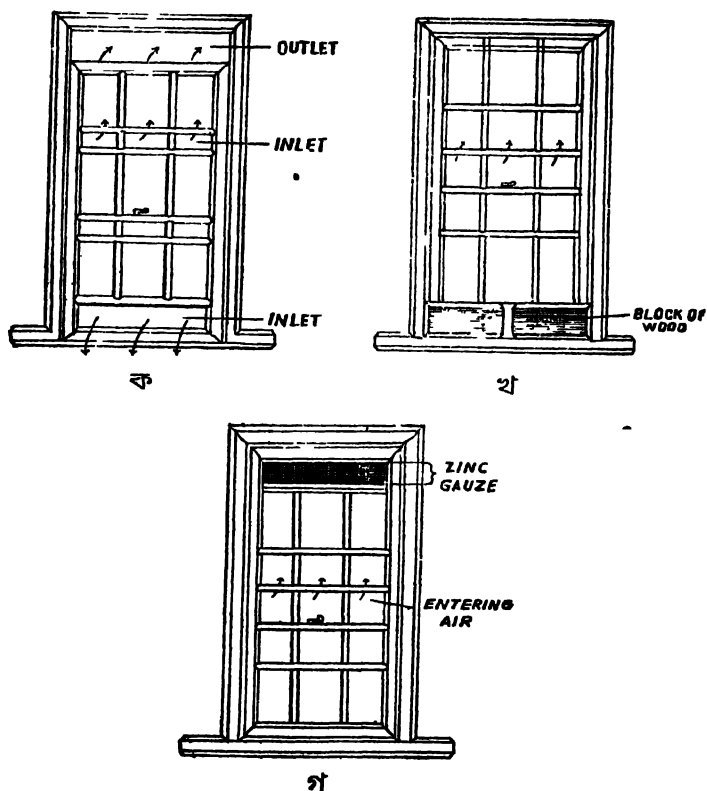
গৃহে বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা

(খ) বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার এবং একটি গৃহ আর একটি গৃহকে যাহাতে আড়াল করিয়া না রাখে সেইভাবে গৃহ নির্মাণ করা উচিত।

(গ) বাড়ীর সামনে ছোট বাগান রাখা ভাল। খোলামেলা স্থানে সহজেই বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। বাগানের গাছগুলি সূর্যালোক ও গাছের সবুজকণার (chlorophyll) সাহায্যে মানুষের
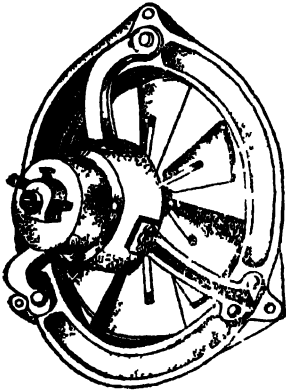
প্রপেলার
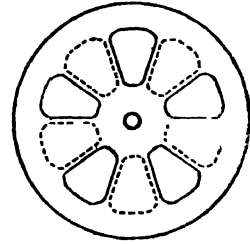
বায়ুসঞ্চালন-পথ

পরিত্যক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এইভাবে বাগানের গাছপালা বায়ুকে পরিশুদ্ধ করে।

(ঘ) বাহিরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত করা প্রয়োজন। পরিসর বিস্তৃত হইলে বায়ুপ্রবাহ বাধাহীন অবস্থায় সুন্দরভাবে সবেগে বহিতে পারিবে।

(ঙ) বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। বৃক্ষ বায়ুসঞ্চালনে সহায়তা করে এবং বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখে। "বন মহোৎসব" পালন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ভাল ভাল বৃক্ষ রোপণ করা উচিত। বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব বনভূমি আছে সেইগুলি সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

(চ) লোকের ভীড় ও কলকারখানার চাপ এড়াইয়া বাসগৃহ

নির্মাণ করিবে। স্বল্প পরিসরের ভিতর গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা অনুচিত। এগুলি মুক্তবায়ু সঞ্চালনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। তাই আধুনিক কালে এইগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া নূতন ধাঁচে শহর নির্মাণ করা হয়।

কলকারখানায় ব্যবহৃত নানা প্রকারের গ্যাস বায়ুকে অতি অল্প সময়ের ভিতর দূষিত করিয়া ফেলে। পচা নালা, ডোবা, পুষ্করিণী ও জলাভূমি হইতে নানা গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস বায়ুর সহিত মিশিয়া উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য, ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। আবার গোশালা, আস্তাবল, পায়খানা প্রভৃতি অপরিষ্কৃত থাকিলে মলমূত্র পচিয়া নানা প্রকার গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এইসব গ্যাসও বায়ুকে দূষিত করিয়া অনেক প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। শহরের কলকারখানা হইতে উদ্ভূত নানা প্রকার গ্যাসও বায়ুকে দূষিত করিয়া বিবিধ রোগের সৃষ্টি করে।

সুস্থ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন পাইতে হইলে আমাদের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণে নর্দমা, ডোবা, পুকুর প্রভৃতিতে যাহাতে পচা গন্ধ ও গ্যাসের সৃষ্টি না হয় তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

গৃহের বায়ু কি ভাবে দূষিত হয়—মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যের সহায়। কিন্তু গৃহের অব্যবস্থার জন্য অনেক সময় এই বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে এবং নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। তাই গৃহ ও তাহার পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। কি ভাবে গৃহের বায়ু দূষিত হইতে পারে তাহা আলোচনা করা হইতেছে।

নিষ্কাশন ব্যবস্থার ত্রুটি—বিশুদ্ধ আবহাওয়া রক্ষার জন্য দূষিত আবর্জনা নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। গৃহের ড্রেন যদি

নিয়মিত পরিষ্কার করা না হয়, তবে গলিত আবর্জনার গ্যাস বায়ুর সহিত মিশিয়া বায়ু অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে।

গৃহে কোন সংক্রামক রোগ হইলে তাহার পরিচর্যা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হইলে এবং জিনিসপত্র জীবাণুশূন্য না করিয়া ব্যবহার করিলে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু চারিদিকে ছাড়াইয়া বায়ু দূষিত করে।

প্রতিদিন শুধু ড্রেন পরিষ্কার করাই বড় কথা নয়। উহা রোগ-জীবাণুশূন্য না হইলে জীবাণুগুলি বায়ুবাহিত হইয়া সংক্রমিত হইতে পারে এ চিন্তা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং ড্রেন পরিষ্কার করিবার সময় ফিনাইল ব্যবহার করা প্রয়োজন অথবা পরিষ্কার করিবার পর ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছিটান দরকার। সূর্যকিরণ জীবাণুনাশক। কোন বৃক্ষের শাখা গৃহপ্রাঙ্গণের কোন অংশের সূর্যকিরণকে আড়াল করিতেছে বুঝিলে সেই শাখা কাটিয়া ফেলা উচিত। তাহাতে গৃহপরিবেশ স্বাস্থ্যকর হইবে, বায়ুও দূষিত হইতে পারিবে না।

আবর্জনা নিষ্কাশন এবং জীবাণুনাশন—স্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থা (Sanitation) রোগ প্রতিরোধ করিবার একটি উন্নততর ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যসংরক্ষণের এই ব্যবস্থা দুই ভাবে হইতে পারে। (ক) পরিত্যক্ত আবর্জনা রোগজীবাণুর আবাস। সেই আবর্জনা হইতে জলবাহিত বা বায়ুবাহিত ব্যাধির জীবাণু মানুষের শরীরকে আক্রমণ করে। কাজেই সর্বপ্রথম আমাদের আবর্জনা দূর করিয়া স্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এই ব্যবস্থাকে আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Disposal of Refuse) বলা হয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ সোজাসুজি ঐসব রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া কিংবা তাহাদের নিষ্ক্রিয় করিয়া আমরা স্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারি। ইহাকে জীবাণুনাশন পদ্ধতি (Sterilization) বলে।

লোকালয়ে আমরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর আবর্জনা দেখিতে পাই—(১) শুষ্ক আবর্জনা, ও (২) গলিত আবর্জনা।

ঘরের ধূলি-বালি, রান্নাঘরের ছাই, তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, ছেঁড়া কাগজ বা কাপড়, টিন ও মাটির পাত্রের ভাঙ্গা অংশ, ভাঙ্গা কাঁচ—এমন নানা রকমের অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল প্রত্যেক গৃহে প্রতিদিনই সঞ্চিত হয়, সেগুলি কোন কাজে লাগে না। এই শ্রেণীর অকেজো জঞ্জালগুলিকে আমরা শুষ্ক আবর্জনা বলিতে পারি।

মানুষ ও পশুর মলমূত্র, কাপড়কাচা ও বাসনমাজার জল, ভাতের ফেন, গোয়ালঘরের নোংরা জল প্রভৃতি তরল নোংরাকে আমরা গলিত আবর্জনা বলি।

এইসব আবর্জনা ক্রমশঃ দূষিত হইতে হইতে রোগজীবাণু উৎপত্তির প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তারপর নানা ভাবে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। সেই কারণে আবর্জনাগুলি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার ও ধ্বংস করা প্রয়োজন। দুইটি বিভিন্ন রকমের আবর্জনাকে একই নিয়মে পরিষ্কার কিংবা ধ্বংস করা সম্ভবপর নয়। কোন্ কোন্ উপায়ে কি ধরনের আবর্জনাকে পরিষ্কার ও ধ্বংস করা যায় তাহার আলোচনা করিতেছি।

গৃহের যাবতীয় শুষ্ক ময়লাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ড্রাম বসাইয়া তাহাতে স্তূপীকৃত করিতে হইবে। কেহ, বিশেষ করিয়া গৃহের ছোট ছেলেমেয়েরা যাহাতে ইহা স্পর্শ না করে সেজন্য সাবধান করিয়া দিতে হইবে। যে সব অঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব নাই সেখানে এই শুষ্ক ময়লা পরিষ্কারের দায়িত্ব স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যেখানে ঐসব প্রতিষ্ঠান আছে, জনস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচেষ্টা আছে, সেইখানে ঐ জঞ্জাল পরিষ্কারের সকল দায়িত্ব

মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-দপ্তরের উপর থাকে। এইসব পৌরপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের হইয়া জনস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

রাশীকৃত করা এবং ভরাট করিবার প্রথা—পল্লীগ্রামে বাড়ীর শুষ্ক আবর্জনা বাড়ী হইতে বেশ দূরে একটি ড্রামে বা সিমেন্টের তৈরী চৌবাচ্চায় স্তূপীকৃত করিতে হইবে। তাহার মুখে একটি ঢাকনা দিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার পর যত শীঘ্র সম্ভব ঐ জঞ্জালগুলি মেথরের সাহায্যে লোকালয় হইতে দূরে কোন একটি স্থানে গর্তের ভিতর ঢালিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। মাটির ভিতরকার অবায়বীয় জীবাণু (Anaerobic bacteria) এইসব পদার্থকে তরল করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দোষশূন্য করিয়া দিবে। এইবার যাহাতে ময়লা সঞ্চিত ছিল সেই সিমেন্টের চৌবাচ্চা অথবা ড্রাম ফিনাইল এবং ব্লিচিং পাউডার দিয়া ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। শহরে প্রত্যেক সংসারের শুষ্ক জঞ্জাল ঐভাবে একটি ড্রামে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। প্রত্যূষে ধাঙ্গড়েরা কাজে বাহির হইয়া একটির পর একটি বাড়ীর শুষ্ক ময়লা গাড়ীতে সংগ্রহ করিতে করিতে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে আসে। শেষে একটি পাড়ার সব শুষ্ক জঞ্জাল নির্ধারিত স্থানে ঢালিয়া দেয়। শহরের কাজ ও দায়িত্ব অনেক সহজ। এইসব কাজ করা প্রত্যেক গৃহস্বামীর অবশ্য কর্তব্য।

সংমিশ্রিত সার প্রস্তুতকরণ ব্যবস্থা—আধুনিক যুগ অনুসন্ধান আর গবেষণার যুগ। শুষ্ক জঞ্জাল হইতে বর্তমানে কৃষিকার্যে ব্যবহারের উপযুক্ত সার তৈয়ারী হয়। তিন বা চার ফুট গর্ত করিয়া আবর্জনা সংরক্ষণের জন্য একটি পাকা চৌবাচ্চা তৈয়ারী করিতে হয়। ঐ চৌবাচ্চার মুখে একটি ঢাকনার ব্যবস্থা করাও

বিশেষ কর্তব্য। শুষ্ক আবর্জনা ও মল দিয়া ঐ চৌবাচ্চাটি ভর্তি করিয়া দশ-পনের দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। ইতিমধ্যে ভিতরে পচন ও মিশ্রণ আরম্ভ হইতে থাকে। এইবার কিছুদিন বাদে বাদে ঐ সঞ্চিত বস্তুগুলি ভালভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ভালভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। মাস দুয়েক পর ঐ জঞ্জালগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। তখন ঐগুলি জমির সাররূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে। ইহাকেই কম্পোস্ট সার বলা হয়; ইহা বেশ উন্নত ধরনের সার।

সমুদ্রে নিক্ষেপ করা—শহরের অবস্থিতি যদি সমুদ্রতীরে হয় তবে ঐসব শুষ্ক আবর্জনা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা চলিতে পারে। সমুদ্রের জল পানের উপযুক্ত নয়। সমুদ্রের ভীষণ ঢেউ দূষিত পদার্থকে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহা ছাড়া নানা প্রকার জলজ প্রাণী আবর্জনা খাইয়া ফেলে। আবর্জনা সমুদ্রে ফেলিলেও নদীতে ফেলা ভাল নয়। কারণ নদী সাধারণতঃ লোকালয়ের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত এবং নদীর জল লোকের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। আবর্জনার দ্বারা নদীর জল বিষাক্ত হইলে তাহা হইতে উদরাময়, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

পোড়াইয়া ফেলিবার পদ্ধতি—পল্লীগ্রামে সক্রিয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের অভাবে আবর্জনা নিষ্কাশনের অনেক অসুবিধা আছে। অথচ আবর্জনা ধ্বংস করিতে না পারিলে গণস্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে। সেখানে ব্যক্তিগত দায়িত্বেই আবর্জনা পরিষ্কার করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আবর্জনায় আগুন লাগাইয়া উহাকে একেবারে ধ্বংস করাই শ্রেষ্ঠ পথ। প্রথমে বসতবাটি হইতে বেশ দূরে বাড়ীর সীমানায় সিমেণ্টের তৈয়ারী একটি চৌবাচ্চায় আবর্জনাকে স্তূপীকৃত

করিতে হয়। তারপর ধাঙ্গড়ের সাহায্যে পল্লীর জনবসতিহীন প্রান্তে একটি গর্ত করিয়া ঐ জঞ্জাল তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়। আবর্জনা পোড়াইবার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর চুল্লি আছে, এই ধরনের চুল্লিকে দহন-কক্ষ বলে, ইংরেজীতে বলে Incinerator।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সকল ব্যবস্থাকেই স্বয়ংক্রিয় করিয়া লইতেছে। তরল আবর্জনা দূরীকরণের ব্যাপারেও ড্রেনেজ ব্যবস্থা বা পরিবাহী প্রথায় আবর্জনা দূরীকরণ করিবার ব্যবস্থা শহরে শহরে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই ব্যবস্থা সরল এবং স্বয়ংক্রিয়।

সাধারণতঃ (ক) সঞ্চয় ও দূরীকরণ প্রথায় (যাহাকে কনজারভেন্সি প্রথা বলা হয়) এবং (খ) পরিবাহী বা ড্রেনেজ প্রথায় তরল আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

কনজারভেন্সি প্রথা—তরল আবর্জনাকে সংরক্ষণ করিয়া মানুষের সাহায্যে দূরে নিরাপদ স্থানে তাহা নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থাকে কনজারভেন্সি প্রথা বলা হয়। এই প্রথা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

মানুষের মলমূত্র, তরিতরকারী-ধোওয়া জল, স্নানকরা জল, কাপড়কাচা জল—এমন কত রকমের দূষিত জল প্রাত্যহিক কাজে প্রত্যেক বাড়ীতে সঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া গোশালার মলমূত্র প্রভৃতিও থাকে। শহরের পৌর ব্যবস্থা উন্নত না হইলে কনজার-ভেন্সি প্রথা অবলম্বন না করিয়া কোন উপায় নাই।

প্রথমে বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বের সীমাতে অপ্রশস্ত উন্মুক্ত পাকা ড্রেন তৈয়ারী করিতে হইবে। সকল রকম দূষিত তরল আবর্জনা যাহাতে ড্রেনে পড়ে সেই ভাবে কাজকর্ম করিবে। প্রতিদিন দুইবেলা ড্রেনে জল ঢালিয়া ড্রেন পরিষ্কার করিতে হইবে। ড্রেনগুলির

পারস্পরিক যোগাযোগ সুন্দর হওয়া উচিত। একেবারে শেষে একটি ট্যাঙ্ক বা জলীয় ময়লা ধারণের চৌবাচ্চা থাকিবে।• ড্রেন পরিষ্কার করিবার পর ময়লা জল ঐখানে সঞ্চিত হইবে। ট্যাঙ্ক ভরিয়া উঠিলে পৌর প্রতিষ্ঠানে আবেদন করিয়া ধাঙ্গড়দের সাহায্যে ঐ সব ময়লা দূরে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ড্রেন পরিষ্কার করিবার সময় মাঝে মাঝে ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে মশা-মাছির উপদ্রব কমিবে, তুর্গন্ধও নাশ হইবে। সূর্যালোক যত ড্রেনের উপর পড়িবে, যত তাহা খটখটে থাকিবে ততই আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হইবে।

বাড়ীতে গোয়ালঘর থাকিলে তাহার পশ্চাৎদিকে বড় ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিতে হয়। গোয়ালঘরের ভিতরে চারিদিকে সামান্য ঢালু পাকা ড্রেন করা দরকার; ঐ ড্রেনের সাহায্যে গোমূত্র ট্যাঙ্কে গিয়া জমা হইবে। শেষে অনেক দূরে একটি পাঁচ-ছয় ফুট গর্ত করিয়া টিনে করিয়া গোমূত্র ঐখানে ঢালিবে। সর্বশেষে মাটি দিয়া ঐ গর্ত ভরাট করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রতিদিনের গোবর চুপড়িতে করিয়া তুলিয়া আর একটি গর্তে সঞ্চয় করিবে। ঐ গর্ত ভরিয়া উঠিলে মাটি চাপা দিতে হইবে। দীর্ঘদিন বাদে মাটির সহিত গোবর মিশিয়া ভাল সারে পরিণত হয়। উহাদের সাহায্যে কৃষিকার্যের অনেক উন্নতি হইবে। তাই গোবর সঞ্চয়ের গর্ত ক্ষেত-খামারের কাছে করিতে পারিলেই কাজের সুবিধা হয়।

মানুষের মলমূত্রও তরল আবর্জনা। ইহাকে পরিষ্কার করিবার বহু ব্যবস্থা আছে। এখানে শুধু কনজারভেন্সি প্রথার কথা আলোচনা করিতেছি।

পায়খানায় মলমূত্র ধারণের জন্য তুইটি স্বতন্ত্র পাত্র থাকা উচিত। অথবা পায়খানার সম্মুখভাগে ছোট্ট ঢালু একটি ড্রেন নির্মাণ করিতে

হয়। ঐ ড্রেনের ভিতর মূত্র সঞ্চিত হইয়া যাহাতে গড়াইয়া মূল ড্রেনে গিয়া পড়ে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। মল ধারণ করিবার জন্য নীচে টিন বা বড় মাটির গামলা বসাইতে হইবে। প্রতিদিন সকালে মেথর আসিয়া উহা হইতে মল আপন বালতিতে ঢালিয়া পৌর প্রতিষ্ঠানের মল নিষ্কাশনের গাড়ীতে উঠাইয়া দিবে।

এই কনজারভেন্সি প্রথার অনেক অসুবিধা ও জটিলতা আছে। (ক) ধাঙ্গড়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়। একদিন সে না আসিলে সমস্ত গৃহপরিবেশ বিষময় হইয়া পড়ে। (খ) মলের গাড়ী বা বালতি অনেক সময় পুরাতন ও জীর্ণ থাকে। মল লইয়া যাইবার সময় তাহা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রাস্তায় পড়িতে থাকে। ইহা একদিকে যেমন নাগরিক জীবনের শুচিতা নষ্ট করে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা ক্ষতিকর। (গ) অনেক সময় মেথরেরা গৃহ হইতে মলের বালতি আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে একটির পর একটি জমা করিয়া ময়লার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ইত্যবসরে সেখানে মাছি বসিয়া আশেপাশে রোগজীবাণু সংক্রমিত করে। তাহার ফলে ঐ স্থানের বায়ুও দূষিত গন্ধে ভরিয়া উঠে।

সুতরাং কনজারভেন্সি প্রথা চালু রাখিবার সঙ্গে এই অসুবিধা-গুলির দিকেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পরিবাহী প্রথা বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা—তরল আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য আধুনিক জগতে পরিবাহী বা ড্রেনেজ ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। উন্নত শহরসমূহে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারতে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরে এই ব্যবস্থায় সকল প্রকার তরল আবর্জনা নিষ্কাশনের কাজকর্ম চলে।

শহরের প্রতিটি দীর্ঘায়তন পল্লীর মাটির নীচে পাকা নল বসান আছে। এই নলগুলিতে প্রতি গৃহের তরল ময়লা নিষ্কাশনের

নলগুলি যুক্ত থাকে। ময়লা জল বা সিউয়েজ (Sewage) গৃহের ছোট নল দিয়া জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে রাস্তার বৃহৎ নলের ভিতর পতিত হয়। রাস্তার এই ধরনের বৃহৎ পাইপযুক্ত ড্রেনকে সিউয়ার (Sewer) বলে।

সিউয়ারকে লোকালয় হইতে অনেক দূরে কোন সমুদ্র, নদী বা জলাভূমির নিকট টানিয়া আনিয়া শেষ করা হয়। অব্যবহার্য জল-ধারার ভিতর ইহাকে মিশাইয়া বায়ু ও সূর্যকিরণের সাহায্যে ইহার দূষিত গ্যাস নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

কলিকাতার সিউয়ার হইতে ময়লা জল উচ্চশক্তি-সম্পন্ন পাম্পের সাহায্যে প্রথমে বিদ্যাধরী নদীতে লইয়া যাওয়া হয়, পরে আবার বঙ্গোপসাগরের গভীর জলে ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। সিউয়ার অর্ধগোল কংক্রিটের তৈয়ারী; উহার ভিতরের আবর্জনা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইলে মানুষ প্রবেশের পথ (Man-hole pit) আছে। ঐ প্রবেশপথের মুখ একটি ঢাকনা দিয়া ঢাকা থাকে।

বায়ু সঞ্চালনের সুবিধার জন্য ঐ ঢাকনার গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। শহরের মলমূত্র, অন্যান্য ময়লা জল—এমন কি বর্ষার সঞ্চিত জলও ইহার সাহায্যে অপসারিত হয়।

এই ব্যবস্থা সকল শহরে সম্ভব হয় না। ইহা প্রচলিত করিতে পৌরসভার প্রচুর আর্থিক সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। সমস্ত শহরব্যাপী ভূনিম্নস্থ ড্রেন-ব্যবস্থা না হইলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে না। সিউয়ার বা ভূনিম্নস্থ ড্রেন জীর্ণ বা ভগ্ন হইলে ভূনিম্নে জল সরবরাহের যে পাইপ লাইন থাকে তাহার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে পানীয় জল দূষিত হইয়া জনস্বাস্থ্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারে। ইহারই ফলে

সংক্রামক রোগের এবং জলবাহিত অন্যান্য রোগের ব্যাপক প্রসার ঘটে

আবর্জনা ও তরল ময়লা নিষ্কাশন

গৃহপরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে আবর্জনা বাহির করিবার সুন্দর ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই ব্যবস্থার ক্রটি থাকিলে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। প্রত্যেকের বাড়ীতে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানাবিধ আবর্জনা স্তূপীকৃত হইতেছে। উহাদের নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিতে না পারিলে যে কোন অঘটন ঘটিতে পারে। কাজেই প্রত্যেক গৃহীর আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ময়লা ও আবর্জনা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। যে সব ভাঙ্গা-চুরা জিনিসপত্র কিংবা কাগজের টুকরা, তরকারীর খোসা, মাছের কাঁটা বা ডিমের খোলা প্রভৃতি গৃহে সঞ্চিত থাকে তাহাদিগকে শুষ্ক ময়লা বলা হয়। বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে বেশী থাকিলে শুষ্ক ময়লার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিবিধ আবর্জনা নিষ্কাশনের কথা বলা হইয়াছে ;, এবার বিশেষভাবে তরল ময়লা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

বাসনমাজা ও কাপড়কাচার নোংরা জল, স্নান, শৌচ ও গোয়ালঘর ধুইবার অপরিষ্কার জল ইত্যাদিকে আমরা তরল ময়লা বলিতে পারি। উভয় শ্রেণীর ময়লাই গৃহের ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

পৌর দায়িত্ব ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ হইলে ইহাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা কঠিন কাজ নয়। তবে একথা সত্য যে পল্লী ও শহরে এই সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিবার ঝুঁকি একই

রকমের নয়। পল্লীগ্রামে ভাল পৌর প্রতিষ্ঠান না থাকায় ঐ সব ময়লা পরিষ্কার করা অনেক জটিল হইয়া উঠে। শহরে তাহা হয় না। কিন্তু যতই জটিল হউক না কেন, মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার কাছে তাহা বিশেষ কোন কঠিন কাজ নয়।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মলমূত্র নিষ্কাশনের সুন্দর ব্যবস্থা এখনও নাই। অনেক পল্লীর অধিবাসীরা পুষ্করিণীর পাড়ে ঝোপঝাপের আড়ালে বা মাঠে মলত্যাগ করে। বৃষ্টির জলে ঐ মল ধুইয়া অতি সহজেই পুষ্করিণীতে গিয়া পড়ে। আবার হয়ত ঐ একটি মাত্র পুষ্করিণীর জলেই ঘরের যাবতীয় কাজ চলিতেছে, এমন কি পানীয় জল হিসাবেও তাহার জলই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার পরিণাম বড় মারাত্মক হইতে পারে। ঐইরূপ কাজ করিবার মূলে অনেকখানি অজ্ঞতা আছে ; যেমন আছে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা, তেমন আছে অল্প খরচে পায়খানা তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা। অল্প খরচে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পায়খানা তৈয়ারী করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করা হইল।

গর্ত পায়খানা (Bored Hole Latrine)—বাংলার দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে ইহা একটি আদর্শ স্থানীয় পায়খানা। ইহাতে খরচের বেশী ঝুঁকি নাই, গঠন-প্রণালীও সহজ সরল। বসত-বাটি ও পুষ্করিণীর সীমা হইতে দূরে উঁচু জমিতে এই ধরনের পায়খানার স্থান নির্বাচন করিতে হয়। ঐ নির্বাচিত জমিতে ১৫।১৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গর্ত করিতে হইবে। ঐ গর্তটি গভীরতায় ১০ হইতে ১৫ ফুট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মাটির জলস্তরের ৩।৪ ফুট উপরে গর্তটি শেষ করিতে হইবে। গর্তের চারিধারে এবং তলদেশে সিমেন্টের আস্তরণ বা প্ল্যাস্টার করা উচিত। এইবার গর্তের উপরদিকে বসিবার স্থান পাকা ভাবে তৈয়ারী করিয়া উপরে একটি

চালা দিতে হইবে। এরূপ করিলে বর্ষার জল ভিতরে ঢুকিবে না, বাহিরেও কোন দুর্গন্ধ বাহির হইবে না। ব্যবহার করিতে করিতে কালক্রমে যখন গর্তের ৫।৬ ফুট পর্যন্ত ভরিয়া যাইবে তখন মাটি দিয়া গর্তটি বুজাইতে হইবে এবং অন্য স্থানে নূতন পায়খানা তৈয়ারী করিতে হইবে।

কুয়া পায়খানা (Deep Well Latrine)—পল্লী বাংলায় এই ধরনের পায়খানার প্রচলন আছে। এই পায়খানা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ইহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে যথেষ্ট ঝামেলা আছে। একটি কূপের মত গর্ত করিয়া এই পায়খানার কাজ চালানো হয়। বাহিরের জল ঐ কূপে যাহাতে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পায়খানাটির উপর একটি উঁচু ভিত স্থাপন করিয়া মলত্যাগ করিবার স্থানটি পাকাভাবে তাহার উপর বাঁধাইয়া লইবে। উপরে চালা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কূপ ভর্তি হইয়া আসিলে মেথরের সাহায্যে উহা পরিষ্কার করাইতে হইবে। ঐ সময়ে পায়খানা হইতে প্রচুর দুর্গন্ধ বাহির হয়। সেই সময় চুন ঢালিয়া উহাকে দুর্গন্ধবিহীন করিয়া আবার ব্যবহার করা চলিতে পারে। ঐ পায়খানার ময়লাকে উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহার করা চলে। এইরূপ পায়খানা দীর্ঘকাল ব্যবহারের উপযুক্ত থাকিলেও তাহাকে পরিষ্কার করা এবং ব্যবহারের উপযোগী রাখা কষ্টসাধ্য।

নালা পায়খানা (Trench Privy)—বসতবাটি এবং পুষ্করিণী হইতে বেশ খানিকটা দূরে এইরূপ পায়খানা নির্মাণ করা চলিতে পারে। বাড়ীর দক্ষিণ অথবা পূর্বদিকে এইরূপ পায়খানার স্থান নির্বাচন করা উচিত নয়। পায়খানার জন্য নির্বাচিত স্থানে প্রথমে ৪।৫ হাত দীর্ঘ এবং ১০।১১ ইঞ্চি প্রশস্ত একটি নালা কাটিতে হইবে। উহার গভীরতা ৩।৪ হাতের বেশী না হওয়াই ভাল। এই

নালাতে মলত্যাগের ব্যবস্থা করিবে। মলত্যাগের পর মলের উপর ছাই বা মাটি ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে দুর্গন্ধ বা রোগজীবাণু ছড়াইতে পারে না। ঐ গর্তে শৌচকার্য করা উচিত নয়। মল জলের সংস্পর্শে আসিলেই তরল হইবে এবং পচিতে আরম্ভ করিবে। ফলে বায়ু দুর্গন্ধময় ও দূষিত হইয়া উঠিবে এবং গ্রামের স্নিগ্ধ আবহাওয়া নষ্ট হইবে। যাহাতে গন্ধ বাহির না হয়, আবহাওয়া বিষাক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই নালা ভরিয়া উঠিলে পাশেই আর একটি নালা করিয়া লইতে হয়। তারপর মাটি দিয়া পুরানো নালা ভরিয়া ফেলা উচিত। অনেক দিন পরে, মল মাটির সহিত মিশিয়া গেলে তাহাকে সাররূপে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা চলে।

গর্ত পায়খানা, কূয়া পায়খানা ও নালা পায়খানা তৈয়ারী করা দরিদ্র পল্লীবাসীর পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। তাই বাংলার পল্লীতে এই ধরনের পায়খানার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কযুক্ত পায়খানা—পল্লীর একটু সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী বাসিন্দারা স্বতন্ত্র ধরনের সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কযুক্ত পায়খানা তৈয়ারী করিতে পারেন। সেই পায়খানা তৈয়ারী করিতে কিছু অর্থের দরকার হইলেও তাহা স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কযুক্ত পায়খানাগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারী। ইহাতে মেথরের প্রয়োজন হয় না, ইহা স্বয়ংক্রিয়। এই সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের কার্যপ্রণালী ও গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের তিনটি চেম্বার বা কক্ষ থাকিবে। এই কক্ষ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিবে। তিনটির কাজ একত্রিত করিলেই তবে একটি স্বয়ংক্রিয় পায়খানার পূর্ণরূপ চোখে পড়িবে।

এই কক্ষগুলিকে (ক) আলো-বায়ুবদ্ধ ট্যাঙ্ক, (খ) বায়ুপূর্ণ ট্যাঙ্ক ও (গ) সাধারণ চৌবাচ্চা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি কক্ষের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।
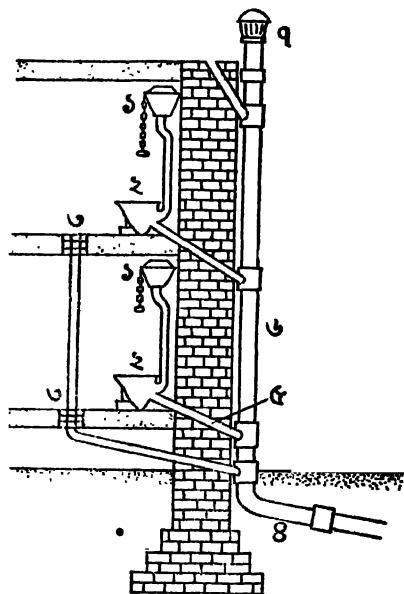
সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কযুক্ত পায়খানা
১—ফ্লাশ, ২—মলপাত্র, ৩—ঝাঁঝরি, ৪—সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক, ৫—মল নিষ্কাশন নল, ৬—দূষিত গ্যাস নির্গম নল, ৭—গ্যাস নির্গম নলের উপরিভাগ

(ক) **আলো-বায়ুবদ্ধ ট্যাঙ্ক বা Anaerobic Tank**—এই কক্ষ সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের একটি অংশ। বাহিরের আলো-বাতাস ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার ভিতর বেশীর ভাগই জল থাকে। এই কক্ষের ভিতর অবায়বীয় জীবাণু দ্বারা মল তরল হয়। এই সব অবায়বীয় জীবাণু বায়ুহীন স্থানে বিশেষ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। প্রথমে নলের ভিতর দিয়া মলমূত্র ও শৌচজল এই কক্ষে আসে। তখনও তাহা সম্পূর্ণ তরল রূপ লয় না। কিন্তু অবায়বীয় জীবাণুগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করিলে মল ক্রমশঃ তরল হইতে থাকে।

(খ) **বায়ুপূর্ণ ট্যাঙ্ক বা Aerobic Tank**—এই কক্ষটি শুধু বায়ুতে পূর্ণ থাকে। ইহার গাঁথুনিও সর্বত্র পাকা। জলকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে শোষ কাগজ, বালি প্রভৃতির সাহায্যে যেমন ফিল্টার করিতে হয়, এই চৌবাচ্চাতেও পূর্বের ট্যাঙ্ক হইতে তরল মল আসা

মাত্রই অনুরূপ ফিল্টার-কার্য শুরু হয়। প্রথম চৌবাচ্চাটি যখন পুরাপুরি ভরিয়া উঠে তখন সেখানকার তরল মল আস্তে আস্তে এই চৌবাচ্চায় আসে। এখানে ছোট্ট পাথরখণ্ড, বালি ও কুচি কাঁকরের ভিতর আসিয়া ঐ তরল গলিত পদার্থ ক্রমশঃ বিশোধিত হয়।

(গ) **সাধারণ চৌবাচ্চা বা শেষ কক্ষ**—দ্বিতীয় কক্ষ হইতে মল খুব ধীরে ধীরে এই চৌবাচ্চায় আসে। তখন তরল মল বেশ স্বচ্ছ হইলেও একেবারে দুর্গন্ধহীন হয় না। এই চৌবাচ্চা হইতে ঐ জল যখন উপছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিবে তখন নলের সাহায্যে তাহাকে পাকা ড্রেন বা বেগবান নদীর মুখে যুক্ত করিয়া দিতে হয়।

ছোট বা বড় শহরে মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কিরূপ সে সম্পর্কে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ছোটখাট শহরে জনস্বাস্থ্য দেখিবার ভার থাকে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে। সেখানে মেথর বা মেথরাণী খাটা পায়খানা হইতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মল পরিষ্কার করিয়া থাকে। পরে ঐ ময়লার বালতি নির্দিষ্ট রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে জমা করিয়া রাখে। সেখান হইতে পশুচালিত ময়লার গাড়ীতে করিয়া সেগুলি শহর হইতে বহুদূরে অপসারিত করে। পরে ঐ ময়লা শুকাইয়া গেলে তাহা পোড়াইয়া ফেলা হয়, কিংবা মাটিতে পুঁতিয়াও ফেলা হয়। এই সব ছোট শহরে মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। এখানকার অধিবাসীরা কেহ খাটা পায়খানা ব্যবহার করে, আবার কেহ কেহ সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক-যুক্ত পায়খানাও ব্যবহার করিয়া থাকে।

শহরের মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি খুব বড় বড় শহরে মল নিষ্কাশন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে হইয়া থাকে। জলবাহিত প্রণালীতে

ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজীতে ইহাকে Water-carriage System বলে। বড় বড় শহরের রাস্তাগুলির নিম্নে বড় পাইপযুক্ত ড্রেন আছে। নানা ধরনের তরল ময়লা শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্বদাই বাহির হইতেছে। ড্রেনের ভিতরকার ঐ ময়লা জলধারা নদী, সমুদ্র কিংবা কোন জনহীন অঞ্চলের জমিতে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে। মাটির নীচে ময়লা বাহির করিবার জন্য নানা ভাবে বহু পাইপ যুক্ত করা হইয়াছে। বহু পাইপকে একত্রে সংযুক্ত-করণ প্রণালীকে বলে সিউয়ার (Sewer)। বড় বড় শহরে ঐ সিউয়ারের সাহায্যেই ময়লা নিষ্কাশন করা হয়।

ভূগর্ভে এমন সারিবদ্ধ সিউয়ার থাকার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন ধরনের পায়খানা নির্মাণের সুবিধা আছে। এই পায়খানা
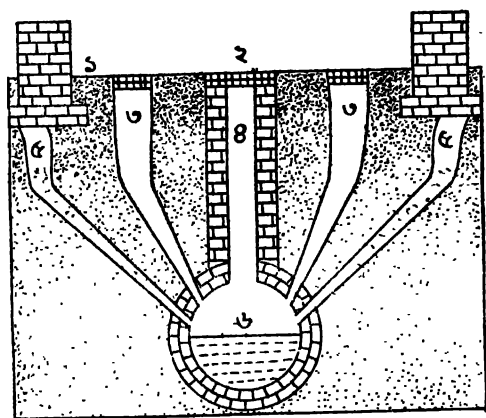
বড় শহরের রাস্তার উপরে চলার পথ ও নিম্নে মল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থা
১—চলার পথ, ২—গাড়ী চলাচলের পথ, ৩—ঝাঁঝরি, ৪—ম্যানহোল,
৫—ময়লা জল বাহিরে যাইবার নল, ৬—সিউয়ার

নির্মাণে অনেকখানি নূতনত্ব আছে। বাড়ীর ছাদের উপর সর্বদাই জলে-ভরা একটি চৌবাচ্চা থাকে। ঐ চৌবাচ্চা হইতে নলযোগে

পায়খানার দেওয়ালে স্থাপিত পাত্রে (ইংরেজীতে ইহাকে বলে cistern) জল সঞ্চিত হয়। ঐগুলি এক গ্যালন পরিমাণ জল ধারণ করে। সিস্টার্নের হাতলের সহিত শিকল ঝুলাইয়া উহাকে টানিবার মত সহজ ব্যবস্থা আছে। পায়খানার মেঝেতে চিনামাটির প্যান বসান হয় এবং এই প্যানের নীচেকার অংশে একটি বাঁকানল বা সাইফন (siphon) বসান থাকে। উহাতে সর্বদাই জল সঞ্চিত থাকে। নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করিয়া পায়খানায় বসিয়া শিকলটি ধরিয়া টান দিলে সবেগে সিস্টার্ন হইতে জল আসে এবং প্যানের ভিতরের ময়লা ধুইয়া তাহাকে নীচের নলের ভিতর লইয়া যায়। জলের বেগে এই ময়লা পাইপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে রাস্তার সিউয়ারের ভিতর পড়ে।

প্যানের নিম্নমুখে সাইফনের বন্দোবস্ত আছে, আর সেই সাইফনে সর্বদা জল সঞ্চিত থাকে বলিয়াই সিউয়ারের দুর্গন্ধময় বায়ু তাহা ভেদ করিয়া আসিতে পারে না। তাহা ছাড়া দুর্গন্ধকে হাওয়ায় মিলাইয়া দিবার জন্য সাইফনের অংশটুকুর পরেই দুর্গন্ধ দূরীকরণ-নল যুক্ত থাকে। ঐ নলের মুখ বাড়ীর ছাদের চেয়েও ঊর্ধ্বে থাকে। ফ্যাক্টরীর চুল্লির ধোঁয়া যেমন বিরাট চিমনীর ভিতর দিয়া আকাশে মিলাইয়া যায়, সাইফনে সংযুক্ত নলটির ভিতর দিয়াও দূষিত গন্ধ সেইভাবে মিলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই এই শ্রেণীর পায়খানা দুর্গন্ধ সৃষ্টি তো করেই না, বরং বিশেষ আরামদায়ক ও নির্ভাবনার বস্তু।

এই ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা থাকাতে বড় বড় শহরে মল নিষ্কাশনের জন্য ঝামেলা পোহাইতে হয় না।

আলোর ব্যবস্থা

আলোর বিভিন্ন উৎস ঃ

সূর্যই আলোর প্রধানতম উৎস। ইহা ছাড়া বিদ্যুৎ এবং বিভিন্ন রকম জ্বালানী দ্রব্যও আলোকপ্রবাহের মূল উপাদান। প্রাকৃতিক উৎস হিসাবে সূর্যের আলো স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবীর মাটিতে বিকিরিত হয়। অন্যান্য জ্বালানী দ্রব্যাদি বা বিদ্যুৎকে মানুষ আলো সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করে। সূর্যের কিরণ মানুষের নানাবিধ উপকার সাধন করে। মানুষ ইহাকে ভিন্নতর প্রয়োজনে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ইতিমধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সব চাইতে সহজে আয়ত্তে আনয়ন করা যায় বৈদ্যুতিক আলোর প্রবাহ। ইহার জন্য খরচও বেশী নয়। মানুষের প্রতিদিনের কাজে বিদ্যুতের দান অপরিসীম। শুধু আলোর উৎস হিসাবেই নয়, শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব অসীম।

সূর্যকিরণ—সূর্যালোক মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল্যবান উপাদান। ইহা নানা রোগজীবাণু এবং পোকা-মাকড় ধ্বংস করে, দুর্গন্ধ দূর করে, স্যাঁতসেঁতে স্থানকে অতি দ্রুত বিশুদ্ধ করিয়া ফেলে, অন্ধকারের জলসিক্ত ময়লা আবর্জনাকে ধূলিকণায় পরিণত হইতে সাহায্য করে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (Ultra-violet Ray) মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু প্রত্যেকের জীবনীশক্তি যোগায়। সূর্যের আলোই আমাদের একমাত্র প্রাণশক্তি। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক রাখিবার পক্ষে সূর্যকিরণের দানও অশেষ।

গৃহনির্মাণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে বাড়ীর মধ্যে প্রচুর সূর্যকিরণ পড়ে এবং প্রতি গৃহে আলো প্রবেশের সুবন্দোবস্ত

থাকে। দরজা-জানালার অবস্থান এবং সংখ্যার উপরেই গৃহের আলোক-সম্পাত প্রধানতঃ নির্ভরশীল। ঘরের দুইদিকে যেন মুখোমুখি জানালার অবস্থান হয়, জানালার আয়তন অন্ততঃপক্ষে ঘরের মেঝের আয়তনের চারভাগের একভাগ হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

এমন ভাবে গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য শিশুদের ঘরে, বৈঠকখানায়, শয়নঘরে, স্নানঘরে, পায়খানা প্রভৃতিতে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে।

কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা—বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির মাধ্যমে যে আলোর সৃষ্টি হয় তাহাই কৃত্রিম আলো। সূর্যের আলো যেখানে একেবারেই প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানকার অন্ধকার হইতে আমাদের রক্ষা করে কৃত্রিম আলো। যেখানে বিদ্যুতের বা গ্যাসের ব্যবস্থা নাই সেখানে কেরোসিন এবং অন্যান্য স্নেহজাতীয় পদার্থ পোড়াইয়া আমরা ঘরে কৃত্রিম আলোর সৃষ্টি করিয়া থাকি।

হারিকেন লণ্ঠন, প্রদীপ বা মোমবাতি-বসানো ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি পূর্বে আমাদের দেশের স্বাভাবিক আলোর উপাদান ছিল। অন্ধকারে নির্জীবের মত বাঁচিয়া থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। প্রাণে স্ফূর্তি এবং উদ্দীপনা আনয়ন করা একমাত্র আলোর পক্ষেই সম্ভবপর। প্রদীপের আলো মোলায়েম বলিয়া ইহা চোখের পক্ষে উপকারী। হারিকেন বা মোমের আলোতে গ্যাসের সৃষ্টি হয় বলিয়া তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। ক্ষীণ আলোতে কাজকর্ম করিলে বা পড়াশুনা করিলে চোখের উপরে চাপ পড়ে এবং ইহাতে মন নিষ্ক্রিয় এবং মেজাজ রুক্ষ হয়। অবশেষে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে।

আলো হইবে মৃদু অথচ উজ্জ্বল। যথোচিত আলোতে আরামে
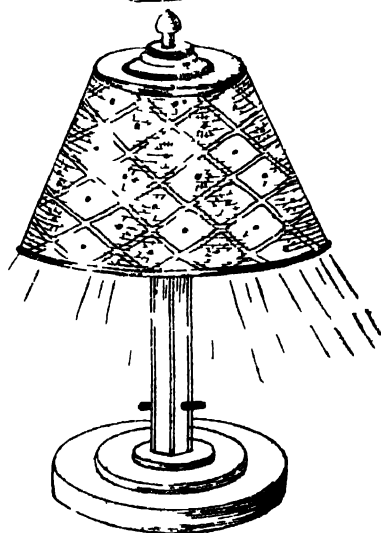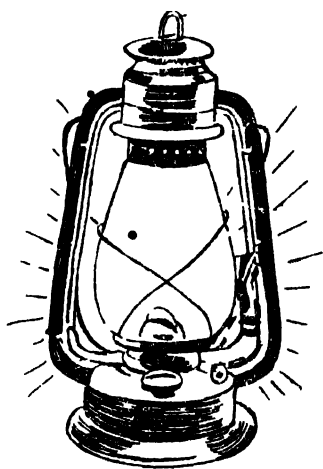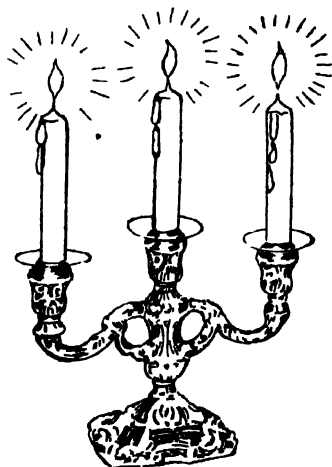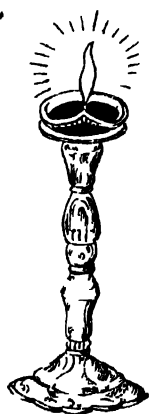
বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম আলো

এবং স্বচ্ছন্দে কাজ করা যায়, মনও তাহাতে প্রফুল্ল থাকে। ইহাতে দৃষ্টিশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ হয়, দেহেও কর্মোদ্দীপনার সঞ্চার

হয়। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে তাহারা আলোর খুব কাছে ঝুঁকিয়া না থাকে• অথচ আলো হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও উজ্জ্বল আলোক পাইতে পারে। দিনের বেলা সূর্যালোকে পড়াশুনার কাজ করাই শ্রেয়। সর্বদা কৃত্রিম আলোয় কাজকর্ম করা বিধেয় নয়।

আলোর তীব্রতা এবং মাত্রা নির্ণয়—পূর্বে মাটির প্রদীপ ছিল একমাত্র কৃত্রিম আলোর আধার। তারপর মোমবাতি, কাচের চিম্‌নীযুক্ত কেরোসিনের বাতি, গ্যাসের আলো ইত্যাদির প্রচলন হয়। এখনও বহু স্থানে মোমবাতি এবং হারিকেন লণ্ঠন আলোর প্রধান উৎস। কিন্তু বড় বড় শহরে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এদেশের বহু গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে। জলবিদ্যুৎ সস্তা হওয়ায় এখন পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশে অধিকাংশ মানুষ বিদ্যুৎ-আলো সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিদ্যুৎ আলোর উৎস; বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে কল-কারখানা প্রভৃতি সচল রহিয়াছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশেও ভাকরা-নাঙ্গাল, দামোদর, হীরাকুদ প্রভৃতি পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন হইয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামেও বৈদ্যুতিক আলোর সরবরাহ সহজতর হইবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করিবার সময় ইহার মাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করিয়া ইহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। অবশ্য মাত্রা নির্ণয় মিটারের (Meter) সাহায্যেই হয়, কিন্তু তাহা কেবল কত একক (unit) ব্যবহৃত হইল সেই পরিচয়ের স্বাক্ষর। এখানে মাত্রা বলিতে বুঝাইতেছে তীব্রতা ও ঔজ্জ্বল্য।

স্বাস্থ্য অনুযায়ী এবং কর্মের বিভিন্নতা অনুসারে মানুষের নিকট আলোর মাত্রা রকমারি হইতে বাধ্য। পড়াশুনার

এক রকম, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য এক রকম, আবার কারখানার কাজে অন্য রকম আলোর প্রয়োজন। বিশ্রামের সময় বা অবসর বিনোদনের জন্য ভিন্নতর আলোর প্রয়োজন হয়। বিশ্রামের আলো হইবে মৃদু এবং স্নিগ্ধ। আলোর রঙের ভিন্নতায় চোখ, শরীর, মন বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন সবুজ আলো স্নিগ্ধ, লাল আলো স্নায়ুকে অত্যধিক আঘাত করে, তীব্র সাদা আলো চোখে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, মনেও বিরক্তির উদ্রেক করে। বয়স অনুসারেও আলোর মাত্রার ব্যবহারিক অনুপাত কমাইতে বাড়াইতে হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের মণি (Pupil) ছোট হইতে থাকে, চোখের তন্তু (Tissue) শক্তিহীন হইতে থাকে এবং দৃষ্টিশক্তিও ক্রমশঃ কমিতে থাকে ; সুতরাং ছোটবেলা যে রকম তীব্র আলো সহ্য হয়, বৃদ্ধ বয়সে তাহা হয় না।

কোন্ কাজে কতটা আলোর প্রয়োজন তাহার একটি সাধারণ নিয়ম আছে। সেই সম্বন্ধে একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এই তালিকা বা চার্টটি ইহা সহজভাবে বুঝিতে সাহায্য করিবে।

স্থান এবং কাজ	কত ফুট ক্যাণ্ডল্স্ প্রয়োজন
হলঘরে, সোপান-শ্রেণীতে, গল্প-গুজব করিবার জন্য বৈঠকখানায়।	৫ হইতে ১০
বড় অক্ষরে ছাপা বই পড়িবার জন্য, রান্নার কাজের জন্য, কাপড়-চোপড় ধৌত করা বা ইস্ত্রি করিবার জন্য, তাস, পাশা ইত্যাদি খেলিবার স্থানে।	১০ হইতে ২০

স্থান এবং কাজ	কত ফুট ক্যাণ্ডল্‌স্ প্রয়োজন
খবরের কাগজ বা পাঠ্যপুস্তক পড়িবার জন্য, হাল্‌কা রকমের সেলাইর জন্য, উল বোনার (knitting) কাজের জন্য, বাজার-হাট করিবার স্থানে।	২০ হইতে ৫০
ছোট অক্ষরে ছাপা বই বা কঠিন বিষয়-বস্তু পড়িবার জন্য, কঠিন সেলাই-কর্মের জন্য, অঙ্ক ইত্যাদি করিবার জন্য।	৫০ হইতে ১০

বাল্‌বে ফুট ক্যাণ্ডল্‌স্ (foot candles)

২৫	ওয়াট বাল্‌ব	২	ফুট দূরের	৫ ফুট ক্যাণ্ডল্‌স্
৫০	” ”	২	” ”	১৩ ”
৬০	” ”	২	” ”	১৭ ”
১০০	” ”	২	” ”	৩২ ”

আলোর ঢাকনা—বিভিন্ন রঙ এবং বিভিন্ন প্রকারের ঢাকনা (shade), আকৃতি বা গঠন (size and shape) অনুসারে আলোর মাত্রাকে সহনীয় বা স্নিগ্ধ করিতে পারে। ঢাকনি একদিকে ঘরের সৌষ্ঠব বাড়ায়, অপরদিকে আলোর তীব্রতা প্রতিরোধ করে। ঢাকনা হইবে আলোর আধার বা বাল্‌বের (bulb) সঙ্গে আকারে এবং গঠনে মানানসই। ঢাকনার রঙের জন্যও আলোর মাত্রার তারতম্য ঘটে। ধূসর ও সাদা রঙ ঠাণ্ডা-নিরপেক্ষ। ঘিয়ে রঙ (cream), পাটকিলে রঙ ও ফিকে হলুদ রঙ উত্তাপ-নিরপেক্ষ। এই রঙগুলি ঘরের অন্য স্থানের রঙের আভা বিনষ্ট করে না।

আলো সংস্থাপনের স্থান এবং উচ্চতা নির্ণয়—আগেই বলা হইয়াছে, আলো যেন চোখের সম্মুখে খুব কাছাকাছি স্থাপন করা
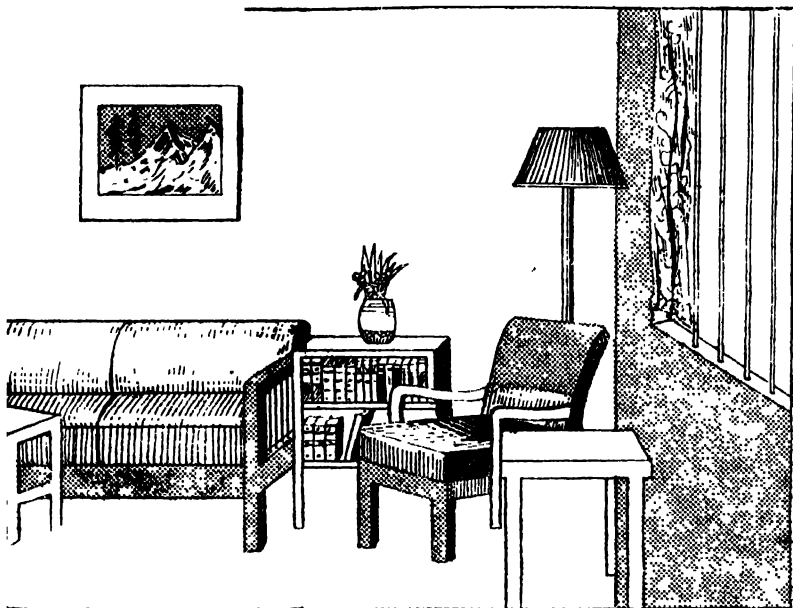
বসিবার ঘরের সরঞ্জামসমূহ এবং ঢাকনা-দেওয়া আলো

না হয়। কারণ ইহাতে আলোর তেজ সরাসরি চোখের উপরে পড়ে এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষতিসাধন করে। আবার বেশী উঁচুতে আলোর আধারটি সংস্থাপিত হইলে প্রয়োজনীয় আলোর অভাব ঘটে।

চেয়ারে বসিয়া পড়িবার সময় নজর রাখিতে হইবে যেন টেবিল-ল্যাম্পটি ২৮ ইঞ্চি হইতে ৩০ ইঞ্চির উপরে স্থাপিত হয়। বিছানার মাথার উপরে যে আলো রাখা হইবে তাহা যেন দেওয়ালের সম্মুখ-ভাগে ১০-১২ ইঞ্চি বাড়ান থাকে। বিছানায় শুইয়া পড়ার অভ্যাস থাকিলে লক্ষ্য করিতে হইবে যেন মাথার সম্মুখভাগে বা পড়ার বইয়ের উপরে আলো আসিয়া পড়ে।

টেবিলে বসিয়া কাজ করিবার সময় মনে রাখিবে উজ্জ্বল টেবিল-ল্যাম্প সম্মুখে রাখিয়া ঘরের অন্য অংশ যেন ঢাকনির ছায়ায় রাখা না হয়। তীব্র আলোয় পড়াশুনার পর চোখের মণি সঙ্কুচিত হইলে চোখ বিশ্রাম খুঁজিবে। সুতরাং মাঝে মাঝে ছায়ার দিকে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হইবেই। এইভাবে একবার তীব্র আলোয় চোখ রাখিয়া, আবার ছায়ায়, মুহূর্ত পরেই আবার তীব্র আলোয় চোখ ফিরাইলে চোখে অনবরত চাপ (strain) পড়িতে থাকিবে। ইহাতে চোখ পীড়িত হয়, দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। টেবিলে যে আলো পড়িবে তাহার দশভাগের একভাগ আলো যেন ঘরের বিভিন্ন অংশে সমানভাবে পড়ে।

আজকাল Fluorescent tube বা Neon lightএর খুব প্রচলন হইতেছে। এই আলোর উত্তাপ বাল্‌বের চাইতে কম। ইহাতে বিদ্যুৎ-শক্তিও কম খরচ হয়, সুতরাং ইহাতে অর্থব্যয় কম হয়। তাহা ছাড়া এই আলো এত উজ্জ্বল যে, ইহা ঘরের যে কোনও স্থানে স্থাপন করিলে ঘরের সম্পূর্ণ অংশ সমানভাবে দিনের মত আলোকিত হয়।

আলোর অন্যান্য উপযোগিতা—অফিসে, বাড়ীতে, কারখানায় যেমন কাজকর্মের জন্য আলোর প্রয়োজন, তেমনি রাস্তাঘাটে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা না হইলে নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, চোর-ডাকাতের উপদ্রবও বাড়ে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে বৈদ্যুতিক আলো নাই সেখানে টর্চ খুবই উপকারে আসে। আলো দেখিলে হিংস্র জীবজন্তু বা সাপ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী ভয়ে পথ ছাড়িয়া পলায়ন করে। চোর-ডাকাত আলো দেখিলে বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।

ইহা ছাড়া আমাদের দেশে পূজাপার্বণে, উৎসব-অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা হয়। যে কোনও মাঙ্গলিক উৎসবে আলোকসজ্জা

একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। গৌরব, সম্মান, আনন্দ ও উদ্দীপনার প্রতীক আলো। আলো না থাকিলে সব উৎসবই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। পূর্বে বড়লোকের বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্মে, পূজায় নাটমন্দিরে কারুকার্যমণ্ডিত ঝাড়-লণ্ঠনের ব্যবস্থা থাকিত; এখন বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জায় সার্বজনীন পূজামণ্ডপ, জনসাধারণের উৎসবক্ষেত্র সদা প্রাণচঞ্চল।

জল-সরবরাহ

জলের বিভিন্ন উৎস—জল জীবসাধারণের জীবন স্বরূপ। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় জলের স্থান সর্বশীর্ষে। ইহা যেমন দেহগঠনের প্রধান উপাদান, তেমনি পিপাসার্তের পানীয়। দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কার্যে নানাবিধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা অদ্বিতীয়। পরিধেয় বস্ত্রাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধোলাই করা, নিত্য ব্যবহার্য বাসন-কোসন পরিষ্কার করা, স্নান, রন্ধন, হস্তপদাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনে জল মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

প্রকৃতির বিভিন্ন উৎস হইতে আমরা জল আহরণ করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে সাগর, নদী, হ্রদ, পার্বত্য নির্ঝর, বৃষ্টি প্রভৃতি উৎসগুলি সম্পূর্ণ প্রকৃতিজ, অন্যদিকে ইঁদারা, কূপ, নলকূপ, খাল, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ইত্যাদি খননের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির উৎসসমূহকে স্ববশে আনিয়াছে। উল্লিখিত উৎসগুলির মধ্যে একমাত্র নলকূপ এবং বৃষ্টি আমাদের বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করে। অবশ্য বড় বড় শহরে পরিস্রুত জল সরবরাহ করিবার ভিন্নতর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বাষ্পীয় অবস্থায় জলকণা উপরে উঠিয়া বৃষ্টিকণার আকারে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসে। ইহা যেন এক প্রকারের পাতন-

প্রক্রিয়া যাহা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনায় সংঘটিত হয়, সুতরাং বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ পাতিত (distilled) জলের সামিল। অবশ্য প্রথম দুই-এক পশলা বৃষ্টির জলে নানা প্রকার ধূলিকণা, জীবাণু, বিষাক্ত গ্যাস মিশিয়া থাকে। বাতাস প্রতিনিয়ত এই দূষিত পদার্থগুলির দ্বারা ক্লিন্ন এবং আবিল থাকে। বৃষ্টির দ্বারা ইহা বিধৌত হইয়া পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসে। তাহা ছাড়া বায়ুর মধ্যস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতিও বৃষ্টির জলের সঙ্গে অনেক পরিমাণে অপসৃত হয়। সুতরাং কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়, কিন্তু বৃষ্টি আমাদের নিয়মিতভাবে বা প্রয়োজনমত জল সরবরাহ করিতে পারে না। ইহার পরিমাণ কখনও মাত্রানির্দিষ্ট নয়। কখনও অবিরাম বৃষ্টিপাতে দেশ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, আবার দিনের পর দিন আবহাওয়া বিশুষ্ক থাকে। বর্ষাঋতু ব্যতীত নিয়মিত বৃষ্টির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই মানুষ অনিয়মিত জল সরবরাহের উপরে নির্ভরশীল থাকিতে নারাজ। তেমনি সাগরের জল অপেয়, নদীর জল দূষিত এবং কর্দমাক্ত, ঝরনার জল নানা নোংরা জঞ্জাল সম্পৃক্ত, হ্রদ বা বিলাঞ্চলের জলও দূষিত পদার্থে সমাক্রান্ত। সুতরাং পুষ্করিণী, কূপ, ইঁদারা ইত্যাদি হইতে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বেশীর ভাগ জলের যোগান পাইয়া থাকে।

বিভিন্ন উৎসের জল কি করিয়া দূষিত হয়—বৃষ্টির প্রথম কয়েক পশলা কেন দূষিত থাকে তাহা বলা হইয়াছে। সাগরের জল লবণাক্ত বলিয়া তাহা প্রায় ব্যবহারের অনুপযোগী। ঝরনার জল প্রধানতঃ পার্বত্য মানুষের ব্যবহারে লাগে, কিন্তু ইহার জল দূরদূরান্ত হইতে বহুবিধ জঞ্জাল বহিয়া আনে। সুতরাং নির্ঝরের জল ব্যবহার করিবার পূর্বে তাহা পরিশোধিত করিয়া লওয়া

কর্তব্য। নদী, খাল প্রভৃতির জল বিষাক্ত-কর্দম-মিশ্রিত। পঁচা-গলা পদার্থ, পশু-পাখী, এমন কি মানুষের মৃত গলিত দেহ, বহু প্রকার মল ও জঞ্জাল স্রোতের জলে হামেশাই ভাসিতে দেখা যায়। এই উৎসগুলির জল পরিশোধিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এইগুলিকে জীবাণুমুক্ত রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা প্রভৃতি মানুষের আবাসভূমির সন্নিকটে থাকে। কূপ ও ইঁদারা মানুষের গৃহ-সংলগ্ন স্থানেই খনন করা হয়। মানব-সৃষ্ট এই উৎসগুলিই গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ জলের চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার নিমিত্ত এই উৎসগুলি নানা ভাবে দূষিত হইবার অবকাশ পায়। অনেক গ্রামে দেখা যায়, যে পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয় সেই পুষ্করিণীতেই কাপড় কাচা, বাসনপত্র ধৌত করা, অবগাহন স্নান করিয়া দেহের ক্লেদ প্রক্ষালিত করা, পশু-পক্ষীদের স্নান করানো ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিধি-বিগর্হিত কাজ সর্বদাই নিশ্চিন্তমনে করা হয়। ইহা ছাড়া ময়লা-আবর্জনা, মৃত জীবজন্তুর দেহ, সংক্রামক রোগীর মলমূত্র, থুথু ইত্যাদি পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকার জলে হামেশাই ফেলা হয়। পুষ্করিণীর চারি পাড়ে বড় বড় গাছ জন্মে, ঘন জঙ্গল বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ইহার প্রত্যেকটিই পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকার জলের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

কূপ বা ইঁদারার গাঁথনি পাকা না হইলে কিংবা উত্তোলিত বাড়তি জল বা ব্যবহৃত জল পাকা নর্দমার সাহায্যে দূরে সরাইয়া না দিলে, নোংরা জল চুয়াইয়া কূপ বা ইঁদারার ভিতরের জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। কূপ বা ইঁদারা হইতে জল তুলিবার দড়ি ও বালতি অপরিষ্কৃত হাতের সংস্পর্শে আসিলে বা নিকটবর্তী স্থানে বাসনপত্রাদি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র মাজা-ঘষা করিলে

দূষিত জল কূপ বা ইঁদারায় সংমিশ্রিত হইবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কূপ বা ইঁদারার উপরে ঢাকনি বা ছাউনির ব্যবস্থা না থাকিলে বৃষ্টির নোংরা জল, ধূলিকণা, ডাল-পাতা, পাখীর মল ইত্যাদি নিঃসন্দেহে জলে পড়িবে।

ইহা ছাড়া পুষ্করিণী বা কূপ প্রভৃতির নীচে প্রতি বৎসর পাঁক জমিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহা পরিষ্কৃত না হইলে গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং জল দূষিত হয়।

বিশুদ্ধ জল পাইবার উপায়

নলকূপের জল সাধারণতঃ পরিশোধিত অবস্থায় পাওয়া যায়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নলগুলি গভীর স্তর ভেদ করিয়া মাটির অনেক নীচে পৌঁছিতে পারে। যদিও নলগুলির শেষপ্রান্তে ছাঁকনি থাকে, কিন্তু শোষক স্তরের মাটিতে যে জল থাকে তাহা অতিরিক্ত দূষিত বলিয়া ছাঁকনির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত। গ্রামাঞ্চলে নলকূপই বিশুদ্ধ পানীয় জলের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত উপায়ে জল বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব।

নলকূপ

সংরক্ষিত পুষ্করিণী বা রিজার্ভ ট্যাঙ্ক—অনেক শহরে সংরক্ষিত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিপাশ উঁচু গাঁথনিতে ঘেরা থাকে যাহাতে বাহিরের জল নীচে গড়াইয়া না পড়ে। চারিপাশে দেওয়াল বা কাঁটা-তারের বেড়া থাকে। জলে নামিবার জন্য সুনির্দিষ্ট বাঁধানো ঘাট থাকে; শুধুমাত্র বালতি, কলস বা অন্যান্য
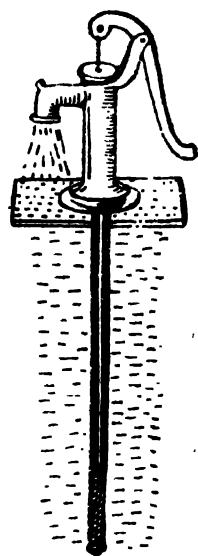
পাত্রে করিয়া জল লইতে হয়। কাহাকেও জলে নামিতে দেওয়া হয় না। জল বহন করিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইতে হয়, ঘাটে কোনও কাজ করা নিষিদ্ধ। পাড়ে বড় গাছ জন্মিতে বা বনজঙ্গল বাড়িতে দেওয়া হয় না। জলে মাছের চাষ করা হয়, কারণ মাছ জলের নানা প্রকার পোকা-মাকড় এবং জীবাণু খাইয়া জীবনধারণ করে। এই ধরনের পুষ্করিণী প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সংরক্ষিত কূপ বা ইঁদারা—সংরক্ষিত পুষ্করিণীর মতই পাড়ায় পাড়ায় বা প্রতি পল্লীতে অন্ততঃ একটি করিয়া সংরক্ষিত কূপ বা ইঁদারা থাকিলে ভাল হয়। এই ধরনের কূপ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। কূপের চারিপাশে দেওয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হয় এবং চারিপাশ উঁচু করিয়া বাঁধানো হয়; পরিসীমার বাহিরে বহুদূর পর্যন্ত স্থান বাঁধানো হয় এবং ব্যবহৃত জল নর্দমার সাহায্যে যাহাতে অনেক দূরে গড়াইয়া যাইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়। কূপের উপরে কাঠ, টিন বা অন্য কোন পদার্থের ঢাকনি থাকে। উপরে ঘরের মত ছাউনি করিয়া দিলেও ভাল হয়। তবে ঢাকনি বা ছাউনির একটি অসুবিধা হইল এই যে, ইহাতে কূপের জল সূর্যকিরণের স্পর্শ লাভ করে না। সূর্যকিরণের অতিবেগুনি রশ্মিতে জীবাণু-বিধ্বংসী ক্ষমতা আছে। সুতরাং ঢাকা থাকিলেও কূপের জল পান করিবার আগে পরিশোধিত করিয়া লওয়া উচিত। ইহা ছাড়া কপিকলের সাহায্যে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং দড়ি ও বালতি যাহাতে নোংরা হাতের স্পর্শ না পায় সেদিকে সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কলস ফিল্টারের ব্যবস্থা—কলস ফিল্টারের ব্যবস্থা খুবই প্রাচীন। ছোট শহরে বা গ্রামে অনেক পরিবারে এই

ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। ইহা সহজ এবং স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ ব্যবস্থা।

তিন খণ্ড মজবুত লম্বা কাঠের সঙ্গে ছোট ছোট কাঠ জুড়িয়া একটি ফ্রেম তৈয়ারী করিয়া তাহাতে পর পর চারিটি কলস স্থাপন করিতে হয়। তাহাদের প্রথম তিনটির তলায় ছিদ্র থাকে। উপরের কলসটির মুখে ঢাকনা দিতে হয়। কলসটির নীচের ছিদ্র-মুখে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা বা পাটের গোছা এমনভাবে গুঁজিয়া রাখা হয় যেন অল্প অল্প করিয়া জল নীচের কলসে পড়িতে পারে। পরিষ্কার স্থান হইতে জল সংগ্রহ করিয়া ভালভাবে ছাঁকিয়া এই কলসে ঢালিতে হইবে। পরের দুইটি কলসের মধ্যে প্রথমটিতে কাঠকয়লা এবং পরেরটিতে বালি রাখা হয়। এই দুইটি কলস হইতে চুয়াইয়া জল সর্বনিম্নের কলসে জমা হয়। এই ভাবে পরিশোধিত জল পাওয়া যায়। তবে এই প্রথা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়। কাঠকয়লা বা বালি ভেদ করিয়াও দূষিত পদার্থ অনায়াসেই জলের সঙ্গে আসিতে পারে। এই প্রথাটি সহজ এবং ইহা কিছু পরিমাণ জল পরিশোধন করিতে সমর্থ।
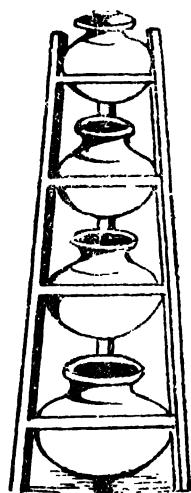
কলস ফিল্টার

সাধারণ পরিস্রাবণ প্রণালী—সাধারণ পরিস্রাবণ-প্রণালী কলস ফিল্টারের অনুরূপ। পরিস্রাবণ-প্রণালীতে প্রথমে একটি ফিল্টার কাগজ দুই ভাজ, তারপর চার ভাঁজ করিয়া শঙ্কুর (cone) আকারের একটি ফানেলে স্থাপন করিতে হয়। তারপর একটি সরু কাচদণ্ডের পাত্র বহিয়া দূষিত জল ইহার উপরে অল্প অল্প করিয়া

ঢালিতে হয়। ফিল্টার কাগজ জলের দূষিত পদার্থ ছাঁকিয়া রাখে, নীচের পাত্রে পরিশুদ্ধ জল জমা হয়।

পরিস্রাবণ-প্রক্রিয়ায় জল শোধন
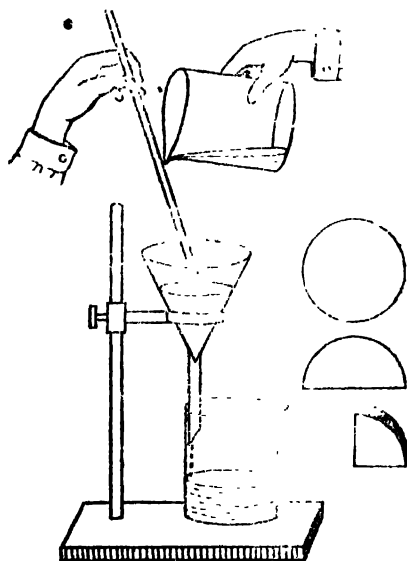
বার্কফেল্ড ফিল্টার বটল্ (Berkefeld Filter Bottle)—আধুনিক ফিল্টার যন্ত্রের মধ্যে বার্কফেল্ড্ ফিল্টার বটল্ খুবই পরিচিত, কিন্তু বিশেষ প্রচলিত নয়। পোরসিলেন বা চীনামাটির একটি পাত্র থাকে। এই ফিল্টার পাত্রের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র থাকে যেগুলি চোখের দৃষ্টিতে ধরা সম্ভব নয়। এই ছিদ্রপথে জলের দূষিত পদার্থ আটকাইয়া থাকে। তারপর নলের সাহায্যে পরিস্রুত জল নীচে জমা হইতে থাকে। কলের দ্বারা সেই বিশুদ্ধ জল বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং পরিবেশিত হয়। তবে এই ফিল্টার বোতলে সাধারণতঃ গরম
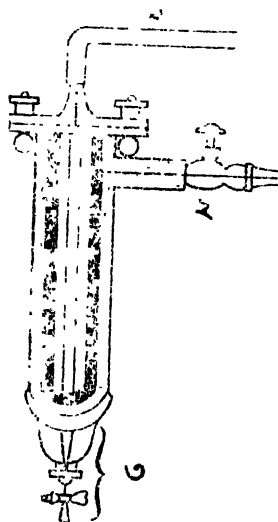
বার্কফেল্ড ফিল্টার বটল্
১—জল বাহির করিবার কল, ২—জল ভিতরে প্রবেশের পথ, ৩—বিশুদ্ধ জল বাহির হইবার নল

জল ঢালা প্রয়োজন। জল গরম করিয়া না লইলে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করিবার ক্ষমতা এই ফিল্টার বোতলের নাই।

শহরে পরিস্রুত জল সরবরাহ—উল্লিখিত পরিস্রাবণ-প্রণালীতেই বড় বড় শহরে পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হয়। কলিকাতা শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকিলে এই কথা আরও স্পষ্ট হইবে।

কলিকাতা শহরের পরিস্রুত জল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইল পলতা। পলতার নিকটস্থ গঙ্গা হইতে পাইপ বা নল-যোগে জল তুলিয়া প্রথমে একটি বাঁধানো ড্রেনের (নর্দমার) মত স্থানে জমা করা হয়। এই ড্রেনের দুইপাশে চওড়া লোহার ফলক থাকে। গঙ্গা হইতে আসিয়া এই ড্রেনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফটকিরি মিশাইয়া লওয়া হয়।

তারপর জল আসিয়া পড়ে বড় দীর্ঘিকায়। দীর্ঘিকার মুখেও প্রচুর ফটকিরির বস্তা ফেলিয়া রাখা হয়। ফটকিরি জলের কর্দম এবং নোংরা পদার্থকে নীচে থিতাইয়া ফেলিতে সাহায্য করে। দীর্ঘিকার জল পরবর্তী অন্য ঢালু দীর্ঘিকায় যাইয়া আরও কর্দমমুক্ত হয়। এখানে ময়লা ভালভাবে থিতাইয়া পড়ে। এই থিতানো অবস্থাকেই ইংরেজীতে বলা হয় Sedimentation and precipitation. এই পরিষ্কৃত জল কতগুলি চৌবাচ্চায় চালিত হয়। অতি-বেগুনি রশ্মির সাহায্যে চৌবাচ্চার জল জীবাণুমুক্ত করা হয়।

জীবাণুমুক্ত জল বাহিত হইয়া ফিল্টার বেডে যায়। ফিল্টার বেডগুলি ছোট ছোট পুকুরের মত। ফিল্টার বেড আছে সংখ্যায় অনেকগুলি। কারণ এই বেডগুলির ভিতরে স্তরে স্তরে মিহি বালি, মাঝারি বালি, মোটা বালি, নুড়ি, ইট ইত্যাদি পর পর সাজাইয়া দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বালি, ইট ইত্যাদি পাল্টাইয়া

দিতে হয়। কতগুলি বেড চালু থাকে, অন্যগুলিতে বালি ও ইট সাজানো হইতে থাকে। কলস ফিল্টারের মত এই স্তরগুলি চুয়াইয়া জল নীচে জমা হয়। ফিল্টার বেডের উপরে একটি পাতলা পর্দার সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহাতে সমস্ত দূষিত পদার্থ আটকাইয়া যায়। এই পর্দাকে বলা হয় ফিল্টার বেডের প্রাণ (Vital Layer)।
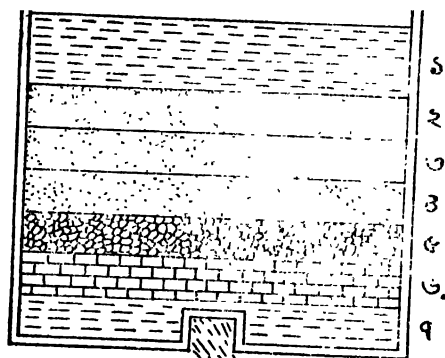
ফিল্টার বেড

১—জল, ২—মিহি বালি, ৩—মাঝারি বালি, ৪—মোটা বালি, ৫—নুড়ি, ৬—ইট, ৭—জল।

পরে এই পরিস্রুত জলের সঙ্গে ক্লোরিন (Chlorine) নামক জীবাণু-ধ্বংসী পদার্থ মিশ্রিত করিয়া জল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয় এবং পানের বা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। পরিশোধিত জল পাম্পের সাহায্যে ট্যাঙ্কে জমা করা এবং টালা পাম্পিং স্টেশনে আনিয়া সেইখান হইতে কলিকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

প্রয়োজনমত টালার ট্যাঙ্কেও ক্লোরিন মিশাইয়া জলকে বিশুদ্ধতর করিবার ব্যবস্থা আছে। কলেরা ইত্যাদি রোগ মহামারীর আকার ধারণ করিলে জলে ক্লোরিনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

পাতন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে জল বিশুদ্ধকরণ—পাতন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে পানীয় জল পরিশোধন করা যায়। জল উত্তপ্ত করিয়া জলীয় বাষ্পকে নলের মধ্য দিয়া চালিত করা হয়। নলের

চারিদিকে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিলে এই বাষ্প আবার জলে পরিণত হইয়া ব্যবহারের উপযোগী হয়।
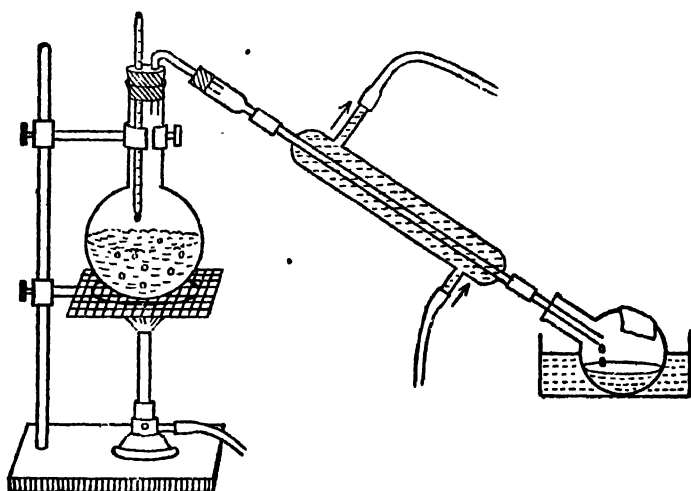
পাতন-প্রক্রিয়ায় জল পরিশোধন

সাধারণতঃ সমুদ্রগামী জাহাজে এই প্রক্রিয়ায় পানীয় জল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

জল পরিশোধনের অন্যান্য সহজ ব্যবস্থা—প্রতিদিন পুষ্করিণী বা কূপ হইতে যে জল উত্তোলিত হয় তাহা সাধারণ কতগুলি প্রক্রিয়ায় অনায়াসেই পরিশোধিত হইতে পারে। যেখানে উল্লিখিত ব্যবস্থায় জল জীবাণুমুক্ত বা বিশুদ্ধীকরণের বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধা নাই সেখানে প্রাথমিক কর্তব্য জল ফুটাইয়া ব্যবহার করা।

পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পুষ্করিণী বা কূপের জলে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট, ব্লিচিং পাউডার, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, চুন, আয়োডিন প্রভৃতি মিশ্রিত করিলে জল বহুল পরিমাণে জীবাণুমুক্ত

হইবে। উত্তোলিত জলে ক্লোরোজেন মিশাইলেও জীবাণু বিনষ্ট হয়। তোলা জল সর্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং যে পাত্রে জল রাখা হয় তাহা অবশ্যই পরিষ্কার রাখিবে। জলের পাত্র যাহাতে কোন ক্রমেই দূষিত পদার্থ বা রোগজীবাণুর সংস্পর্শে না আসিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আজকাল নানা প্রকার জীবাণুনাশক পাউডার পাওয়া যায়। জলের পাত্র এই সকল পাউডার সাহায্যে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা সমীচীন। মনে রাখিতে হইবে বিশুদ্ধ জলের কোনও স্বাদ নাই। বিশুদ্ধ জলে লবণের অংশ অনুপস্থিত। জলে কোনও স্বাদ থাকিলে বুঝিতে হইবে ইহাতে কোনও পদার্থ সংযুক্ত হইয়াছে।

কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিগুলির প্রাদুর্ভাব ঘটিলেই জলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ এই রোগসমূহের জীবাণু জলবাহিত। এই সকল রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে জল ফুটাইয়া উহাতে ফটকিরি এবং কর্পূর মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

গৃহসজ্জা

আসবাবপত্র, চিত্রাদি, অন্যান্য রকমারি জিনিসপত্রে বাসগৃহ পরিপূর্ণ করিলে তাহাকে গৃহসজ্জা বলা চলে না।

গৃহসজ্জা বলিতে বুঝায় নিজেদের বাসগৃহকে সুন্দর এবং সুরুচিসম্মত ভাবে সজ্জিত করা। গৃহে আসবাবপত্র, দেওয়ালে ফটো, চিত্র, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি, পর্দা ও ফুলদানি হইতে শুরু করিয়া ঘড়ি, পত্র-পুস্তিকার আলমারি, আলনা, রেডিও প্রভৃতি এমনভাবে

সংস্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ঘরে প্রবেশ করিয়াই মনে হয় গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীর রুচিবোধ প্রশংসনীয়। গৃহসজ্জার সঙ্গে দুইটি কথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত—প্রথম সৌন্দর্যবোধ, দ্বিতীয় রুচিজ্ঞান।

সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞান—সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। পশুপাখীদের মধ্যেও গৃহসজ্জার বাতিক বা ঝোঁক দেখা যায়, তবে তাহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিস্ফুট, অথবা সেই বোধশক্তি খাদ্য বা স্থান নির্বাচনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীন প্রবৃত্তির প্রকাশমাত্র। মানুষের মত অবাধ কল্পনাশক্তি, অদম্য আবিষ্কার-স্পৃহা, অনবদ্য সংগঠন-প্রবৃত্তি অন্য কোন প্রাণীর নাই। স্থির নির্দিষ্ট পরিকল্পনার দ্বারা গঠনমূলক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবোধও তাহার মস্তিষ্কে সদা ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির সঙ্গে আনন্দবোধ পাশাপাশি চলে। এজন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া মানসিক তৃপ্তির জন্য মানুষ গৃহসজ্জার কথা চিন্তা না করিয়া পারে না।

গৃহিণীকেই বাসগৃহে অধিকক্ষণ থাকিতে হয়। অগত্যা গৃহসজ্জার দায়িত্ব গৃহকর্ত্রীকেই প্রধানত বহন করিতে হয়। মেয়েদের সেইজন্যই যেন সৃষ্টিকর্তা সৌন্দর্যানুভূতি সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন করিয়া রাখিয়াছেন। সৌন্দর্যবোধ বা রুচিজ্ঞান মেয়েদের মধ্যে অতি প্রবল এবং বাসস্থান সুসজ্জিত করিবার আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের যেন মজ্জাগত।

ছোটবেলায় পুতুলঘর সাজাইয়া মেয়েরা গৃহসজ্জার প্রথম পাঠ নেয়। তারপর ধীরে ধীরে গৃহের মনোরম পরিবেশ গঠনে সুগৃহিণীর হাত ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে থাকে। কিন্তু শুধু সহজাত প্রবৃত্তি বা জন্মগত ক্ষমতার দ্বারা কোন শিক্ষাই পরিপূর্ণ হয় না। যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন দ্বারা প্রতিভার স্ফুরণ সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠে।

গৃহ সাজাইবার ঝোঁক প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। অনুভূতির প্রেরণায় মানুষ জীবনে ছোট-বড়, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সকল কাজ করিয়া থাকে। শিক্ষা বা জ্ঞানের সাহায্যে এই কাজের মধ্যে সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে, কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সুতরাং সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিজ্ঞানের পিছনে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রভাব অপরিসীম।

সুরুচির কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুন নাই। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ইহার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হয়। নিয়মিত অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও অভ্যাসের দ্বারা এবং গঠনমূলক কার্যের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রুচিজ্ঞানেব ক্রমবিকাশ ঘটে। ছোটবেলা হইতে সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে বাস করিলে সৌন্দর্যজ্ঞান বা সুরুচিবোধ স্বভাবতঃই বিকশিত হইতে পারে। মানুষের আশ্রয়স্থান গৃহকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের জীবনের নানা কর্মপ্রবাহ। সুতরাং জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িতে গেলে গৃহের গড়নের দিকেই পূর্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

ছোটবেলা হইতেই এমন শিক্ষা শিশুকে দিতে হইবে যেন তাহার সময়জ্ঞান এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার আগ্রহ জন্মে। সুশৃঙ্খলভাবে প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনায় শিশুকে আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে মায়ের প্রভাব অসামান্য। সবকিছু সুষ্ঠুভাবে করিবার প্রবৃত্তিই সৌন্দর্যবোধ এবং রুচিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়।

সুচারুরূপে সজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেই মনেপ্রাণে আনন্দ হয়। সুন্দর গৃহপরিবেশ যে-কোন মানুষকে মুগ্ধ করে। মানুষ জীবনের সবকিছু, সংসারের যাবতীয় বস্তু সুন্দরভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিতে চায়। রুচিবোধ উদ্রিক্ত না হইলে সৌন্দর্যজ্ঞান যেমন পরিপূর্ণ হয় না, তেমনি জীবনে আনন্দলাভ

বা পরিপূর্ণতার আস্বাদন সম্ভবপর হয় না। জীবনেব যাত্রাপথে প্রতিক্ষণে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে রুচিবোধ বা সৌন্দর্যজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ এই সুরুচির উপরে নির্ভর করিতেছে।

রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক—মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চালচলন সুরুচিসম্মত হওয়া বিধেয়। প্রতিটি গৃহকর্ম—গৃহের আসবাবপত্রের সন্নিবেশ, খাদ্যরন্ধন, শয্যারচনা, অতিথির আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি রুচিসম্মত হওয়া প্রয়োজন। পূজা-পার্বণ, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সুরুচিপূর্ণ না হইলে সার্থক বা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না।

মানুষের সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম প্রভৃতি রুচির উপরে নির্ভর করে। অপরিচ্ছন্ন এবং বিশৃঙ্খল গৃহপরিবেশ শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঘটায় এবং মানসিক স্ফূর্তিতে বাধার সৃষ্টি করে। রুচির সঙ্গে সৌন্দর্য কথাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত; রুচিজ্ঞান বলিতে সৌন্দর্যজ্ঞানও বুঝায়। অভিজ্ঞতা আর পরিবেশ মানুষকে ছোটবেলা হইতে রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সম্পর্কেও সচেতন করিয়া তোলে।

যে জিনিসের প্রয়োজন কম তাহার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ নাই। অর্থবান ব্যক্তিদের ঘরে হয়ত প্রখ্যাত শিল্পীদের দুর্বোধ্য ছবি এবং প্রয়োজনহীন অনেক কারুকার্যখচিত শিল্পদ্রব্য শোভা পায়। ইহার মূল্য সীমাবদ্ধ পরিবারের মধ্যেই নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঘরের মধ্যে ফুলদানি সাজাইয়া বা দেওয়ালে ছবি টাঙাইয়া রুচি এবং এবং সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দিতে সচেষ্ট বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রতিই তাহাদের

দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবিষ্ট। আগে প্রয়োজনীয় আসবাব ইত্যাদির সংযোজন, পরিশেষে শিল্পকলাজাত দ্রব্যসম্ভারের প্রতি আগ্রহ—ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রয়োজন না মিটাইয়া শিল্প-জ্ঞানের প্রতি কৌতূহল প্রকাশ খুব কম মানুষের মধ্যেই প্রতিভাত হয়।

তারিখ নির্দিষ্ট করিবার তাগিদে দেওয়ালপঞ্জী বা ক্যালেণ্ডারের প্রয়োজন। কিন্তু একগাদা বাজে শ্রেণীর ছবি দেওয়ালে টাঙাইবার কোনও অর্থ হয় না। সুন্দর একখানি ছবির সঙ্গে আঁটা তারিখ-পঞ্জী ঘরের দেওয়ালে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলে প্রয়োজন মিটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইবে।

কদাকার আসবাবপত্রে ঘর না সাজাইয়া ছোট আকারের এবং শিল্প সুন্দর টেবিল-চেয়ার প্রভৃতিতে ঘর সাজাইলে প্রয়োজন এবং রুচিজ্ঞানের যথার্থ সমন্বয় ঘটিবে। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবোধের একত্র সমাবেশ গৃহসজ্জার মূল আদর্শ।

রুচি ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আরাম ও আনন্দের সম্মিলন—প্রয়োজনের সঙ্গে রুচি ও সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য বিধান করিলেই সকল কর্তব্য শেষ হইল না। গৃহের সাজসজ্জা যেন আরাম ও আনন্দদায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আরাম ও আনন্দের দিক হইতে গৃহসজ্জার বিচার করিলে চারিটি মূলকথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি হইবে সুন্দর। দ্বিতীয়তঃ সজীবতার লক্ষণও সকল দ্রব্যে পরিস্ফুট থাকে সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। আসবাবপত্রের ঢাকনি বা বিভিন্ন দ্রব্যের রঙ যেন অস্পষ্ট হইয়া বা অতি স্পষ্ট হইয়া চক্ষুপীড়ার কারণ না হয়। পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে অনুষ্ঠান-যোগ্যতার কথা, অর্থাৎ কোন আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনের

সঙ্গে দ্রব্যটির যোগাযোগ না থাকিলে ইহার মূল্যবোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে না। অনুষ্ঠানের আনন্দের মধ্যেই যে কোনও জিনিসের প্রয়োজনীয়তা আমরা ঠিকভাবে অনুভব করিতে পারি। কোন জিনিস যদি আরামদায়ক না হয় বা আনন্দের সঞ্চার না করে তাহা হইলে সেই জিনিস যতই সুন্দর হউক আমাদের নিকট তাহা মূল্যহীন।

রুচির পরিবর্তনশীলতা—যুগের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন হইতে বাধ্য অন্ধকার গুহার অধিবাসী মানুষ জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করিয়া পরিবেশ মনোরম করিতে চেষ্টা করিয়াছে; তারপর গাছ, লতাপাতা সাজাইয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছে; মাটি পোড়াইয়া দেওয়াল গড়িয়া তাহাতে রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। পরিশেষে ইট গাঁথিয়া গৃহকে মজবুত করিয়া গৃহসজ্জার উপকরণে শিল্পবোধ এবং বৈচিত্র্যের আমদানি করিয়াছে। প্রাচীনকালে বিরাট অট্টালিকা বা প্রাসাদ গড়াইয়া অর্থবান মানুষ ঝাড়-লণ্ঠনে, মর্মর-মূর্তিতে, মার্বেল পাথরে, গালিচায়, অন্যান্য জাঁকজমকপূর্ণ সজ্জায় বা আসবাবে গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের সাজসজ্জায় জাঁকজমকের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আধুনিকতম যুগে সমাদর লাভ করিয়াছে ছোটখাট সাধারণ জিনিসপত্র। বর্তমান যুগে মানুষ দেখে সজ্জাদ্রব্যের রঙ, গড়ন (shape), আকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদ। মানুষ এখন উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া ঘর সাজায় না। ঘরের আকর্ষণ বাড়াইবার উদ্দেশ্য সাধন এবং প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের রুচিজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয়।

এখন গৃহ-সমস্যার দিনে প্রথমেই ভাবিতে হয় মানুষের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই করা যায় কি ভাবে; পরে বিচার করিতে

হয় গৃহসজ্জার কথা। স্বভাবতঃই এই যুগে গৃহসজ্জার রুচি একদিকে হইয়াছে বিচিত্র, অন্যদিকে সহজ, সরল, আড়ম্বরবিহীন। এখন গৃহ-পরিকল্পনায় ঘরের প্রতিটি অংশ মানুষের রুচিবিচারের দ্বারা পরিলক্ষিত এবং ঘরের জানালা, মেঝে, দরজা, ছাদ প্রভৃতি রুচিসম্মত সুন্দর সজ্জায় পরিবৃত। ঘরের কোনও অংশ সজ্জার দিক হইতে লক্ষ্য-বহির্ভূত হওয়া এখন রুচি-বিগর্হিত মনোভাবের পরিচয়। পৃথিবী এবং প্রকৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনূতন রুচির এবং সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তনশীলতাও পরিলক্ষিত হইতেছে।

রুচিজ্ঞান বা সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আর্থিক সামঞ্জস্য বিধান—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রুচিজ্ঞান বজায় রাখিয়া প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইতে হইবে। কিন্তু প্রয়োজন বলিতে ইংরেজীতে যেমন Necessityকে বুঝায় তেমনি অর্থশাস্ত্রে অন্যরূপে ইহাকে আরাম (Comfort) বা বিলাস (Luxury) বলা হইয়া থাকে।

একজনের নিকটে যাহা প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অন্যের নিকট তাহা আরামের বস্তু, ভিন্ন লোকের কাছে আবার তাহা বিলাসিতার নামান্তর। ব্যবসায়ীর নিকটে গাড়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অর্থবান নিষ্কর্মার পক্ষে ইহা আরামদ্রব্য, গরীবের নিকট বিলাসদ্রব্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে প্রয়োজনের সূত্র আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রুচির মাত্রা আরামের পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে, কিন্তু বিলাসিতায় পর্যবসিত হইলে তাহা সুলক্ষণ নয়। অর্থের সঙ্গে বা আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই রুচিজ্ঞানের মাত্রা বজায় রাখিতে হইবে। জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে হইবে আগে। তারপর আসিবে গৃহসজ্জার কথা। আহারের সংস্থান না থাকিলে ফুলদানি সাজাইবার প্রচেষ্টা অর্থহীন পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষকে আগে খাইয়া-পরিয়া

বাঁচিতে হইবে। অভাব দূর করাই সামাজিক মানুষের প্রাথমিক দায়িত্ব।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে রুচিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান ঃ

সামঞ্জস্য বলিতে Proportion বা সমানুপাতের কথা বুঝায়। এক বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অথবা একই ধরনের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে মিলের মাত্রাকেই সামঞ্জস্য বুঝায়। সামঞ্জস্য বলিতে প্রধানতঃ কোন বস্তু বা জিনিসের রঙ, গঠন, আয়তন, কারুকার্য ইত্যাদির বিচারজ্ঞানের কথা .আসে। ঘর সাজাইতে গেলে যে বস্তুর দ্বারা ঘর সাজান হইবে তাহার সঙ্গে আসে ঘরের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি আয়তনের মূল প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়াল, মেঝে, দরজা, জানালা ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয় করিয়া সামঞ্জস্যের চিন্তা করিতে হইবে। সামঞ্জস্য-জ্ঞান না থাকিলে গৃহসজ্জার মূল কথাই বাদ পড়িয়া যাইবে এবং রুচি বা সৌন্দর্যবোধ অর্থহীন হইয়া পড়িবে। সামঞ্জস্য বিধানের প্রসঙ্গে মাত্রাজ্ঞান এবং ছন্দ এই দুইটি কথাই প্রধানতঃ বিবেচনা করিতে হইবে।

মাত্রাজ্ঞান (Balance)—মাত্রাজ্ঞান না থাকিলে রুচি বা সৌন্দর্য-বোধ অর্থহীন; সামঞ্জস্য বিধানের সঙ্গে ইহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রঙ, গঠন, বৈচিত্র্য, নকশা ইত্যাদি নির্বাচনে এবং পরিমাণের ক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। একটি বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া সজ্জার কথা চিন্তা করিতে গেলে ইহার চারিপাশের সজ্জাদ্রব্যের সঙ্গে বস্তুটির সমতার কথা চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। একই গৃহের মুখোমুখি দেওয়ালে সমানাকৃতি আসবাবের সংস্থাপন করা বিধেয়। দুই দেওয়াল সমানভাবে সজ্জিত করিলে উহাদের পরস্পরের যোগসূত্র সহজেই প্রতীয়মান হইবে এবং

ইহা নয়ন-মনোমুগ্ধকর হইবে। এক পাশে গাঢ় রঙের আসবাব, অন্য পাশে হাল্‌কা রঙের আসবাব চোখে লাগে। আয়তনের সামঞ্জস্য বিধানও মাত্রাজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। ঘরের একদিকে প্রকাণ্ড আলমারি রাখিয়া অন্যদিকে ছোট একখানি টেবিল রাখিলে ঘরের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে। পরিমাণের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা আসে। ভারী একটি টেবিলের পাশে ছোট এবং হাল্‌কা কয়েকখানি চেয়ার বসাইলে তাহা বিসদৃশ মনে হইবে।

ছন্দ (Rhythm)—একই বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছন্দ নামে অভিহিত হয়। একই জিনিস বার বার একই নিয়মে প্রয়োগ করা হইলে ছন্দের সৃষ্টি হয়। যেমন স্ট্রাইপ-দেওয়া কাপড়ে সমান জায়গা বাদ রাখিয়া একই ভাবে সারা কাপড়টিতে স্ট্রাইপ দিলে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়; ছাপান বা ডোরা-কাটা শাড়িতে ইহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পুনরাবৃত্তি কখনও কখনও যেমন একঘেয়েমির নামান্তর, তেমনি প্রকারান্তরে তাহা সৌন্দর্যসৃষ্টিরও উপায়। প্রকৃতিজাত সৌন্দর্যের মধ্যে ইহা বেশ লক্ষ্য করা যায়। মাঠে বা বিলাঞ্চলে সারি সারি ধানের ক্ষেত দিগন্তে প্রসারিত। এই সুবিস্তৃত মাঠের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে মনপ্রাণ সৌন্দর্যানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। মানুষও স্বীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যটি ছন্দের মধ্য দিয়া অর্জন করিয়াছে।

গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ

গৃহসজ্জার উপকরণের বৈচিত্র্য অসীম। প্রকৃতিজ এবং মনুষ্য-সৃষ্ট বহু প্রকার জিনিস এই উপকরণের তালিকায় পড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উঠিবে রঙের কথা। রঙের পরেই আসিবে বিভিন্ন আসবাবপত্রের আলোচনা।

রঙ—রঙ গৃহসজ্জার অপরিহার্য উপকরণ। রঙিন বস্তু শুধু শিশুকে নয়, বয়স্কদের পর্যন্ত আকর্ষণ করে। ইহা মানুষের মনে আনন্দ দেয় এবং ইহার বিমোহন সৌন্দর্য জীবজগৎকে মুগ্ধ করে। রঙের সজীবতা প্রাণপ্রাচুর্যের লক্ষণ বজায় রাখে। কিন্তু অনেক সময় রঙের ভুল নির্বাচনে জিনিসপত্রের আকর্ষণ হ্রাস পায়। ঠিক মত রঙ নির্বাচন করিতে না পারিলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই কারণেই শিল্পীরা রঙ নির্বাচনে এত ভাবেন। অনেক নিকৃষ্ট ছবি শুধুমাত্র সুষ্ঠু রঙ প্রয়োগে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পাইয়া থাকে। ঠিকমত রঙ নির্বাচন করিয়া ঘরের সৌন্দর্যে ছন্দের হিল্লোল তোলা সম্ভব এবং ঘরের পরিচ্ছন্নতা অনেকগুণ বেশী বাড়াইয়া তোলা সহজসাধ্য। রঙের প্রয়োগ করিয়া ছোট একখানি ঘরকে বড় দেখান সম্ভব। রঙের বিভ্রম শুধু জিনিসকে পরিবর্তিত করে না, আয়তনের তাবতম্যের আভাস সৃষ্টিও করে। ঘরের বিভিন্ন খুঁত অনায়াসে রঙের দ্বারা ঢাকা যায়। যথাযথ রঙের প্রয়োগে ঘরের আলো অনেক বেশী বিকীর্ণ হইয়া থাকে, ঘরে উজ্জ্বলতর স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠে। রঙ মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ইহার কুশ্রীতা যেমন মনে বিরূপতার ভাব ফুটাইয়া তোলে, তেমনি ইহার সুসম প্রয়োগ চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করে। মনের শুচিতা এবং শান্তি বিধানে রঙের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রঙের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়।

রঙ নির্বাচন—রঙের উপরে মাত্রাজ্ঞান এবং ছন্দ অনেকখানি নির্ভরশীল। ঘরের আয়তন, উচ্চতা এবং অবস্থান প্রভৃতি বিচার করিয়া রঙ নির্বাচন করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রশস্ত ঘরে স্বচ্ছ এবং নির্মল রঙ ব্যবহার করা উচিত। গাঢ় এবং তীব্র রঙ আকর্ষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গাঢ় রঙের দিকে বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকা

যায় না। সুতরাং স্বল্পপরিসর ঘরে গাঢ় এবং তীব্র রঙ সামান্য পরিমাণ, ব্যবহার করা উচিত। গৃহসজ্জার বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় বা তৈয়ারী করাইবার কালে অভ্যন্তরবর্তী দেওয়াল, মেঝে প্রভৃতির রঙের সঙ্গে মিলাইয়া ক্রয় বা তৈয়ারী করিতে হইবে। আসবাবপত্র, চিত্র, পর্দা, আলো, মেঝের আলপনা, ফুলদানি,, ফুল ইত্যাদি যেন রঙের সমতা খুঁজিয়া পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আসবাবগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন রঙের হয় তাহা হইলে সেগুলি আকর্ষণের বস্তু না হইয়া চক্ষু-পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। মাত্রাজ্ঞান এবং সমতা রঙ নির্বাচনের দুইটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। ইহার সঙ্গে মিলজ্ঞান সংযুক্ত হইলেই গৃহপরিবেশ আকর্ষণীয় হয়।

আসবাবপত্র

আসবাবপত্র বলিতে গৃহের নানাবিধ সজ্জাদ্রব্যকে বুঝায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে খাট, টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, আয়না, আলনা, টিপয়, ট্রে, ফুলদানি, পুস্তকের তাক (shelf), কৌচ (couch), সোফা (sofa) আরাম-কেদারা ইত্যাদি বিভিন্ন আসবাব ব্যবহৃত হয়। সাধারণ গৃহস্থঘরে খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা কাঠের বেঞ্চি ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অর্থবান ব্যক্তিদের গৃহে উল্লিখিত আসবাব নানা আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরনের থাকে। ঘরের বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন আসবাব ব্যবহৃত হয়। পড়ার ঘরে টেবিল বা বইয়ের তাক এবং বসিবার ঘরের টেবিল বা বইয়ের তাক একই আকারের হইবে না সুনিশ্চিত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন আলো, ফ্যান, রেডিও, ফটো, চিত্র ইত্যাদি আসবাব হিসাবে গণ্য। আজকাল রান্নাঘরের

আসবাবে রেফ্রিজারেটার, মিটসেফ প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। পর্দা, ঢাকনি প্রভৃতিও আসবাবের অঙ্গবিশেষ।

আসবাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ :

কাঠ—আসবাব তৈয়ারী করিতে কাঠ হইতে শুরু করিয়া কাগজ, কাপড়, নানা ধাতব দ্রব্য, মাটি, নানা প্রকার রঙ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন আসবাব বিভিন্ন উপকরণে তৈয়ারী। প্রয়োজন, অবস্থান এবং ব্যবহারের দৃষ্টিতে উপকরণের বিভিন্নতা বিচার করিতে হয়। প্রত্যেক উপকরণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সাধারণ ব্যবহারের জিনিস চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি কাঠের দ্বারা তৈয়ারী হয়। কারণ কাঠ শক্ত, প্রচুর পাওয়া যায়, কাঠের জিনিস মজবুত এবং টেকসই হয়। কাঠের আসবাবের স্থায়িত্ব (durability) অনেক বেশী। কাঠে যে কোনও গঠন সৃষ্টি করা সহজ। সহজেই কাঠের জিনিসের উপরে নকশা অঙ্কিত করিয়া ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। পালিশ করিলে কাঠের স্বকীয় উজ্জ্বলতা ও স্নিগ্ধতা আত্মপ্রকাশ করে। মেহগিনি, সেগুন, ওক ইত্যাদি কাঠই ভাল এবং দামী। অবশ্য সাধারণ আসবাবের জন্য সেগুন কাঠই বেশী ব্যবহৃত হয়।

ধাতব দ্রব্য—কাঠ ছাড়া নানা প্রকার ধাতব দ্রব্যের দ্বারাও আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পিতল, টিন, ইস্পাত, লৌহ ইত্যাদি মিশ্রিত এবং অমিশ্রিত ধাতুতে বিভিন্ন আসবাব তৈয়ারী হইয়া থাকে। ধাতুর তৈয়ারী আসবাবও মজবুত হয়, সহজে ভাঙ্গে না, কার্যোপযোগী হয়। ধাতুকে আগুনে পোড়াইয়া ইচ্ছামত নানা আকার দেওয়া সহজসাধ্য। তাহা সত্ত্বেও ধাতুর জিনিসের মস্ত একটি ত্রুটি রহিয়াছে যে কারণে কাঠের

জিনিসের ব্যবহার এখনও কমিতেছে না। ত্রুটিটি এই—ধাতব
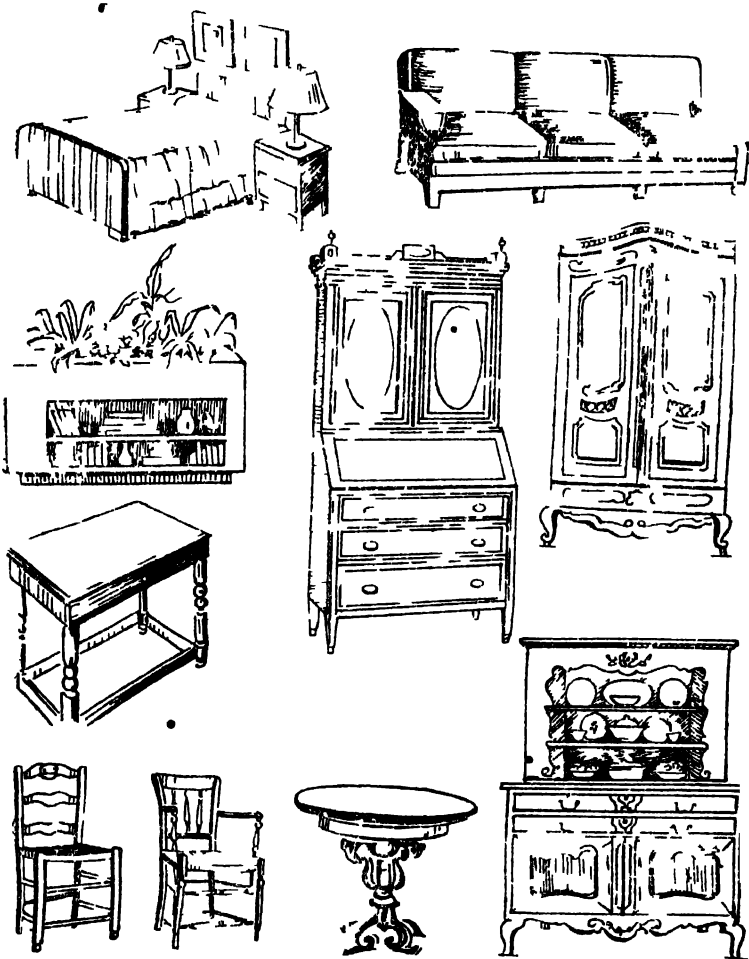
বিভিন্ন আসবাবপত্র

জিনিস খুব দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তবে ইহাতে কতকগুলি সুবিধাও রহিয়াছে যাহা কাঠের আসবাবে নাই। ধাতব দ্রব্য আগুনে পোড়ে

না এবং ওজনে হাল্‌কা হয়। ইহা কৃত্রিম উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, আর্দ্রতায় বা জলসিক্ত হইলেও কাঠের জিনিসের মত ইহাতে পচনক্রিয়ার প্রভাব পড়ে না। ইহা সহজে বহন করা যায়। ইহা ঘুণে ধরিবার আশঙ্কা থাকে না; উই বা ছাতায় ধরিবার সম্ভাবনাও ইহাতে একেবারেই নাই। আজকাল তাই বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে নানা আসবাব তৈয়ারী হইতেছে। ধাতব দ্রব্যের আসবাব ব্যবহারের ঝোঁক ক্রমশঃই বাড়িতেছে। দেওয়ালের খোপ, টেবিল ইত্যাদির কাঠাম (frame), বিভিন্ন আসবাব-দ্রব্যের উপরিভাগ, আলোর স্ট্যাণ্ড, বাতি, খাটের আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা, চেয়ার, বেঞ্চি ইত্যাদিতে ধাতুর ব্যবহার আজকাল খুবই বেশী।

ক্রোমিয়ামের পাত (plating) করা দ্রব্য, কলাই-করা দ্রব্য রঙিন ইস্পাত, রঙিন লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির প্রচলন বর্তমান যুগে বৃদ্ধি পাইতেছে।

মূল্যবান ধাতব দ্রব্য—পূর্বে রাজপ্রাসাদে বা ধনী এবং জমিদার-গৃহে সোনা রূপা ইত্যাদির আসবাবপত্র ব্যবহৃত হইত। সোনা-রূপার পাতে নানা দ্রব্য মোড়া থাকিত। এখনও সোনার পাতে আবৃত নানা আসবাব মন্দিরে বা ধনীদের গৃহে দেখা যায়। রূপার বাসনপত্র, গড়গড়া, আয়না বা খাটের চারিদিকে মূল্যবান ধাতব দ্রব্যের নকশা-তোলা বেড় ইত্যাদি দেখা যায়। রূপার ফুলদানি, ট্রে, পানের কৌটা ইত্যাদি অনেক বনেদীগৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। মূল্যবান ধাতব দ্রব্যের উপরে নানা খোদাই কাজ করিবার শিল্প আমাদের দেশের একটি গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে।

প্ল্যাস্টিক—বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার প্ল্যাস্টিক। বর্তমান যুগকে অনেকে প্ল্যাস্টিকের যুগ বলিয়া অভিহিত করেন। আমাদের প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য প্ল্যাস্টিকের দ্বারা

তৈয়ারী হয়। ফিতা, গহনা, শাড়ির পাড়, ভ্যানিটি ব্যাগ, জুতা, চশমার ফ্রেম, ঢাকনি, আলোর স্ট্যাণ্ড, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, ফটোর ফ্রেম, টেবিলক্লথ ইত্যাদি আসবাব এবং প্রয়োজনীব দ্রব্য প্ল্যাস্টিকের দ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে। প্ল্যাস্টিকের তৈয়ারী জিনিসপত্রের তালিকায় জীবনযাত্রার সকল উককরণই মিলিবে।

প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্রের সুবিধা এই যে, ইহা মজবুত এবং ওজনে হাল্কা। দামেও খুবই সস্তা বলিয়া ইহার বহুল প্রচার সম্ভব হইতেছে। ইহা সহজে ভাঙ্গে না, ব্যবহার করিতে সুবিধা, পরিচ্ছন্ন রাখিতে হাঙ্গামা কম। ইহা দ্বারা যে কোনও আকারের জিনিস সহজে গড়িতে পারা যায়। তাহা ছাড়া বস্তুটি সুন্দর এবং স্বচ্ছ বলিয়া ইহাতে আলোর প্রতিফলন দীপ্তিময় হইয়া উঠে। ইহাকে নানা রঙে ভূষিত করিতে বিশেষ ব্যয় বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। আজকাল প্ল্যাস্টিকের ফুল, পাতা, খেলনা, কারুকার্য-করা ঢাকনি বা টেবিলক্লথ ইত্যাদি প্রতি ঘরেই দেখা যায়। ভবিষ্যতে এই বস্তুটি আরও বহুবিধ কাজে নিয়োজিত হইবে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

চামড়া, কাগজ, মাটি, কাপড় ইত্যাদি—ব্যাগ, নানা রকমের খেলনা, ফুলদানি, ফুল, পাতা ইত্যাদি ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য এবং সজ্জাদ্রব্য চামড়া, কাগজ বা কাপড়ের মণ্ড, মাটি ইত্যাদি উপকরণের দ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে। চামড়া আমাদের আসবাবপত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে। কারুকার্যমণ্ডিত চামড়ায় দেওয়াল বা ঘরের মেঝে আবৃত করিলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। চামড়ায় তৈয়ারী নানা প্রকার ব্যাগ, চেয়ার-টেবিলের ঢাকনি ইত্যাদি আসবাব-দ্রব্যের বেশ প্রচলন হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্যুটকেস, নানা ধরনের ফোলিও ব্যাগ ইত্যাদিতেও চামড়ার

ব্যবহার সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে ও ঘরের সৌষ্ঠব বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করে।

বেত, বাঁশ ইত্যাদি—আজকাল ঘর সাজাইবার নিমিত্ত বেত এবং বাঁশের ব্যবহার খুব বাড়িয়াছে। ফুলদানি তৈয়ারী করিতে বাঁশের উপযোগিতা খুবই বেশী। ফুল ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিবার জন্য বিভিন্ন আকারের সাজিতে বেতের ব্যবহার অতীতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাঁশ এবং বেতের তৈয়ারী টেবিল-চেয়ারের প্রচলন যেন নূতন করিয়া চালু হইতেছে। আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে নূতন নূতন ডিজাইনের নানা প্রকার মোড়া, ইজিচেয়ার, বেঞ্চি, কৌচ ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। রঙ করিয়া ইহাদের সৌষ্ঠব আরও বাড়ান যায়। বাঁশ এবং বেতের তৈয়ারী জিনিস হাল্‌কা, নাড়াচাড়া করিতেও হাঙ্গামা নাই।

নানা রকম নকশা-করা এবং রঙ-করা বেত ইত্যাদির মাদুর জাতীয় জিনিস (টেবিল ম্যাট) ঘরের সৌন্দর্য অনেক গুণ বাড়াইয়া দিতে পারে। নলখাগড়ার সাহায্যে মাদুর তৈয়ারী হয়। এই মাদুরের উপরে রঙ দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্যের নকশা করা হইয়া থাকে। নলখাগড়ার তৈয়ারী ডালা বা ঝুড়িও বাজারে প্রচুর বিক্রয় হয়। এই সকল সুদৃশ্য মাদুর এবং ফুলফলে ভরা ঝুড়ি যেমন ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায়, তেমনি গৃহস্থের রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। এই ধরনের জিনিসগুলির সুবিধা এই যে, ইহারা স্বল্পমূল্য হইলেও মানুষের অনেক বেশী প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।

আসবাবপত্র নির্বাচন—আসবাব নির্বাচন করিবার পূর্বে প্রথমে ভাবিতে হয় মূল্যের কথা। সৌন্দর্যজ্ঞান সঙ্গতির মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিলে তাহাকে সুনির্বাচন বলা চলে না। তারপর বাড়ীঘরের অবস্থা, পরিবারের জীবনাদর্শ ও লোকসংখ্যা, গৃহের

আয়তন, বাসস্থানের স্থায়িত্ব, প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলি ভাবিতে হইবে।

প্রত্যেক পরিবারের মানুষ একই জীবনাদর্শ লইয়া জীবন অতিবাহিত করে না। শিক্ষা, রুচি, ব্যক্তিত্ব সকল লোকের এক প্রকারের হইতে পারে না। মানুষের প্রয়োজন এবং সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উপরেও এই আদর্শের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আসবাব নির্বাচনের পূর্বে পরিবারের জীবনাদর্শের কথাই প্রথমে ভাবিতে হইবে এবং পারিবারিক রীতি-নীতি, রুচি ইত্যাদি যথাযোগ্য বিচার করিতে হইবে।

অতিথিবৎসল পরিবারে নিত্য অতিথির আগমন হয়। সুতরাং তাহাদের ঘরে বাড়তি চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা ইত্যাদির প্রয়োজন। যে পরিবারের লোক শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত তাহাদের আলাদা পড়িবার ঘর রাখিতে হইবে এবং পড়াশুনায় যেসব আসবাব-পত্র প্রয়োজনীয় সেগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পারিবারিক জীবনধারা আসবাব নির্বাচনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

পরিবারস্থ প্রত্যেকের অভ্যাস, রুচি, শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আসবাব নির্বাচন করিতে হয়। ছোট শিশু বা বেঁটে ধরনের লোকের জন্য নীচু চেয়ার-টেবিল ক্রয় করা বা তৈয়ারী করানো দরকার। মোটা বা লম্বা লোকের জন্য ভিন্ন আকারের আরামকেদারা বা খাটের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং প্রয়োজন যাচাই না করিয়া আসবাব নির্বাচন ঠিক নহে।

যাঁহারা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন তাঁহাদের ঘরের জন্য আসবাবপত্র হইবে কম, হাল্কা, ছোট এবং মজবুত। যাঁহারা বদলীর চাকরি করেন, তাঁহাদের গৃহে ভারী এবং বড় টেবিল ইত্যাদি না থাকাই

ভাল। যাঁহাদের নিজস্ব বাড়ী আছে তাঁহারা স্থির বিবেচনা করিয়া আসবাব নির্বাচন করিতে পারেন।

আসবাব বাছাই করিবার সময়ে সেগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হয়। জিনিসগুলি টেকসই হইবে কিনা, দামে সস্তা কিনা, প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা এইসব বিষয় বিচার করিতে হইবে। কাঠ বা ধাতুতে গড়া দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টি ব্যবহারযোগ্য এবং যে প্রয়োজনে ক্রয় করা হইবে তাহার উপযোগী কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। খাঁটি জিনিস সরবরাহ করে বলিয়া যে দোকানদারের সুনাম আছে এমন দোকানদারের দোকান হইতে শখের জিনিস ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। আসবাবের গড়ন ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা তাহা ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে ভিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে লইয়া বা অতি পরিচিত দোকানদারের নিকট হইতে আসবাবপত্র ক্রয় করা উচিত। তাহা হইলে গুণাগুণের দিক হইতে ঠকিবার ভয় কম থাকে।

আসবাব নির্বাচন এবং সেগুলি ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান। ঝোঁকের মাথায় বা রুচির বড়াই করিয়া আসবাব ক্রয় করা অপব্যয়ের সামিল। জিনিসটি প্রয়োজনে আসিবে কিনা সেই প্রশ্ন আগে ভাবিতে হইবে। পরিশেষে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে একটি জিনিস দুই বা ততোধিক কাজের উপযোগী হয়। ঘরে স্থানের অভাব হইলে অনেক বড় ড্রয়ার সমন্বিত টেবিল ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাতে অনেক টুকিটাকি জিনিস ড্রয়ারের মধ্যে রাখা যায়। টেবিল একটু লম্বা গড়নের করিলে পড়াশুনা, গৃহাভ্যন্তরস্থ খেলাধূলা (indoor games) বা ভোজনের জন্য উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ফলকথা, মনে রাখিতে হইবে যেন

নির্বাচিত আসবাবটি একাধিক কাজে লাগে, আরামদায়ক হয়, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সহায়ক হয় এবং রুচিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

আসবাব-বিন্যাসের পরিকল্পনা—আসবাব নির্বাচনে রুচি এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে গৃহসজ্জার পরিকল্পনার কথাও ভাবিতে হইবে।

আসবাব ক্রয় করিবার পূর্বে ঘরের আয়তন, উচ্চতা, অবস্থান ইত্যাদি প্রথম বিবেচনা করিতে হইবে। তারপর আসিবে স্থান নির্বাচনের চিন্তা। যে স্থান দরজার সম্মুখে নয় বা যে স্থানে আসবাব রাখিলে জানালা আবৃত হইবে না এমন স্থানে ভারী আলমারি, সোফা, খাট ইত্যাদি রাখা চলিবে। দেওয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া আসবাব সাজাইতে হয়। কাঠ এবং কাপড়ের বা অন্য জিনিসের আসবাব সাজাইতে হইবে পর্যায়ক্রমে। এই সমতা রক্ষা করিতে স্থানের সংকুলান হইবে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে।

অনেক বাড়ীতেই লেখাপড়া করা, গানবাজনা করা, গল্পগুজব করা ইত্যাদির জন্য একখানি ঘর নির্দিষ্ট থাকে। অনেক সময় শুইবার বন্দোবস্তও ঐ একই ঘরে করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে গাদা গাদা বিভিন্ন ধরনের আসবাবে গৃহ পরিপূর্ণ করা ঠিক নয়। ঘরে আসবাব এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন কোন কাজেই বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। এক কোণে পড়িবার টেবিল রাখিয়া, নিকটেই পুস্তকের সেল্‌ফ্‌ সাজাইয়া, একটু দূরে খাট বসান যাইতে পারে। অন্য কোণে গল্পগুজবের জন্য ছোট একটি সোফা সেট রাখিলেই চলে। যাবতীয় বাজে (waste) কাগজপত্র বা টুকরা জিনিসপত্র রাখার জন্য ঘরের ভিতরে টেবিলের বা খাটের নীচে বেত বা বাঁশের ঝুড়ি রাখা অবশ্য কর্তব্য। উঁচু জানালার পাশে সোফা রাখিবে, তারপর তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ঘরে টেবিল রাখিতে হইবে। এই টেবিলের উপরে

থাকিবে আলো। ইহাতে ঘরের সৌন্দর্য বাড়িবে। যাহাতে একই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা যায় সেইজন্য আসবাবপত্রের বিন্যাস এবং আলোর ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য বিধান করা কর্তব্য

পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘর সাজাইলে বেমানান ঘরও পরিপাটি সৌন্দর্যে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে।

চিত্র-সন্নিবেশ

গৃহপরিবেশে চিত্রের গুরুত্ব—গৃহসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে পূর্বেই ছবি-চিত্রাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। রুচিজ্ঞান ও সৌন্দর্য-বোধের দিক হইতে চিত্র-সন্নিবেশ গৃহসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ। ঘরের ফটো বা ছবি দেখিয়া গৃহবাসীর রুচি, ব্যক্তিত্ব, ধর্মবোধ, সমাজবোধ, সংস্কার, শিল্পবোধ প্রভৃতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। পূর্বে অবশ্য খেয়াল-খুশিই ছিল চিত্র-সন্নিবেশের প্রেরণার উৎস। এখন পরের রুচিকে বিচার করিতে হয়, নিজের রুচির যাচাই করিতে হয়, চিত্রশিল্পের খোঁজখবর রাখিতে হয় এবং সর্বোপরি গৃহবিজ্ঞান সম্পর্কে সমুচিত জ্ঞান আহরণ করিয়া গৃহ সাজাইবার পরিকল্পনা করিতে হয়।

ঘরের আয়তন, উচ্চতা, দেওয়ালের রঙ, অন্যান্য আসবাবপত্র ইত্যাদির সঙ্গে ছবির আকার, গঠন, রঙ প্রভৃতির মিল রাখিয়া মানানসই চিত্র সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশ করাই আধুনিক রুচিবোধের পরিচয়। তারপরেই আসে ছবির বিষয়বস্তুর কথা। ছবির বিষয়বস্তু কল্পনাশক্তির বিকাশে সহায়তা এবং মানুষের ভাবপ্রবণ অন্তরে পবিত্র নির্মল ভাবের সৃষ্টি করে। পরিবেশ রচনার দিক হইতে চিত্র-বিন্যাসের গুরুত্ব অত্যধিক। পরিবেশ আমাদের দেহমনকে গড়িয়া তুলিতে

সর্বপ্রকারে সাহায্য করে ; চরিত্র গঠনে পরিবেশের প্রভাব সর্বাগ্রে গণ্য।

বিভিন্ন প্রকার চিত্র ও ছবির বৈশিষ্ট্য এবং প্রভাব—কোন্ ধরনের চিত্রে বা ছবিতে কি বিষয়বস্তু থাকে বা আঙ্গিক এবং পরিকল্পনার দিক হইতে ছবি বা চিত্রাদির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবার কারণ কি তাহা আমাদের জানিতে হইবে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের ছবি, ফটো ইত্যাদির আলোচনা করা হইতেছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত চিত্রাদি—ফটোই হউক বা পরিকল্পিত চিত্রই হউক প্রাকৃতিক দৃশ্যের আকর্ষণ সর্বক্ষেত্রে এবং সব সময়েই মানুষের অন্তরে তীব্র। প্রাকৃতিক দৃশ্য পছন্দ করে না এমন মানুষ বিরল। প্রকৃতির পটভূমি সুবিস্তৃত, ইহার রূপ ও রঙের বৈচিত্র্য অসীম। নদনদী, পাহাড়, সাগর, আকাশ, মরুভূমি, বনাঞ্চল ইত্যাদির বিচিত্র রূপ মানুষের দৃষ্টিকে কখনও সীমিত রাখিতে পারে না। মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন প্রকৃতির রূপে বিভোর হইয়া থাকিতে ভালবাসে। কবির কবিতা, দার্শনিকের আদর্শ, চিত্রশিল্পীর সৃষ্টি সবকিছু প্রকৃতির কাছে সর্বাংশে ঋণী। প্রকৃতির দৃশ্যে মন কখনও ক্লান্ত হয় না। দেহ প্রকৃতির সবুজ সমারোহ দেখিয়া সজীব হইয়া উঠে। এইজন্যই পৃথিবীর মনীষিবৃন্দ হইতে শুরু-

প্রাকৃতিক দৃশ্য

করিয়া সাধারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত আদিবাসীরা পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সম্মিলন অনুভব করিয়া থাকে। বিভিন্ন ঘরের দেওয়াল সজ্জিত করিতে, বিভিন্ন মনোভাবের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে, বিভিন্ন রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে একমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত চিত্রাদি বা ছবি (Landscapes)। জগতের সকল যুগের শিল্পীরাই প্রকৃতির দৃশ্য ক্যানভাসে রাঙাইয়া তুলিয়াছেন। সকল আলোক-চিত্রশিল্পীই ক্যামেরায় প্রকৃতির ছবি ধরিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এই ধরনের চিত্র বা ছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে কোন ঘরের দেওয়ালে পছন্দমত প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্বলিত ছবি বা চিত্র সাজাইয়া ঘরের সৌন্দর্য অনেকগুণ বাড়াইয়া তোলা সম্ভব এবং রুচিকর পরিবেশ সৃষ্টিও সহজসাধ্য।

শয়নঘরে এই ধরনের ছবি টাঙাইবার সময় মনে রাখিতে হইবে যেন রঙ হাল্কা অথচ উজ্জ্বল হয়। বিশ্রামঘরে এই ধরনের ছবি আকারে একটু বড় হওয়া প্রয়োজন। রঙ সর্বক্ষেত্রেই উজ্জ্বল হইবে। বহু রঙ বা বিভিন্ন রঙের ছবি হলঘরে থাকিতে পারে। হলঘরের ছবি আকারে বেশ বড় হইবে। যে ঘরে যেমন অবস্থায়ই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙান যাউক, মনে রাখিতে হইবে ছবিটি যেন চোখ ধাঁধাইয়া না দেয় এবং শান্ত ও মনোরম ভাবের সৃষ্টি করিয়া ইহা যেন বিশ্রাম-সুখ ও নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে সাহায্য করে।

আলোকচিত্র—ফটো তোলা (Photograph) অনেকের নিকটই আনন্দজনক প্রিয়-খেয়াল (hobby)। কোনও মুগ্ধকর দৃশ্য ক্যামেরায় ধরিয়া রাখিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। প্রকৃতির বা প্রিয়-জনের রূপ ও স্মৃতিকে চিরদিনের জন্য ছবিতে মূর্ত করিয়া রাখিবার
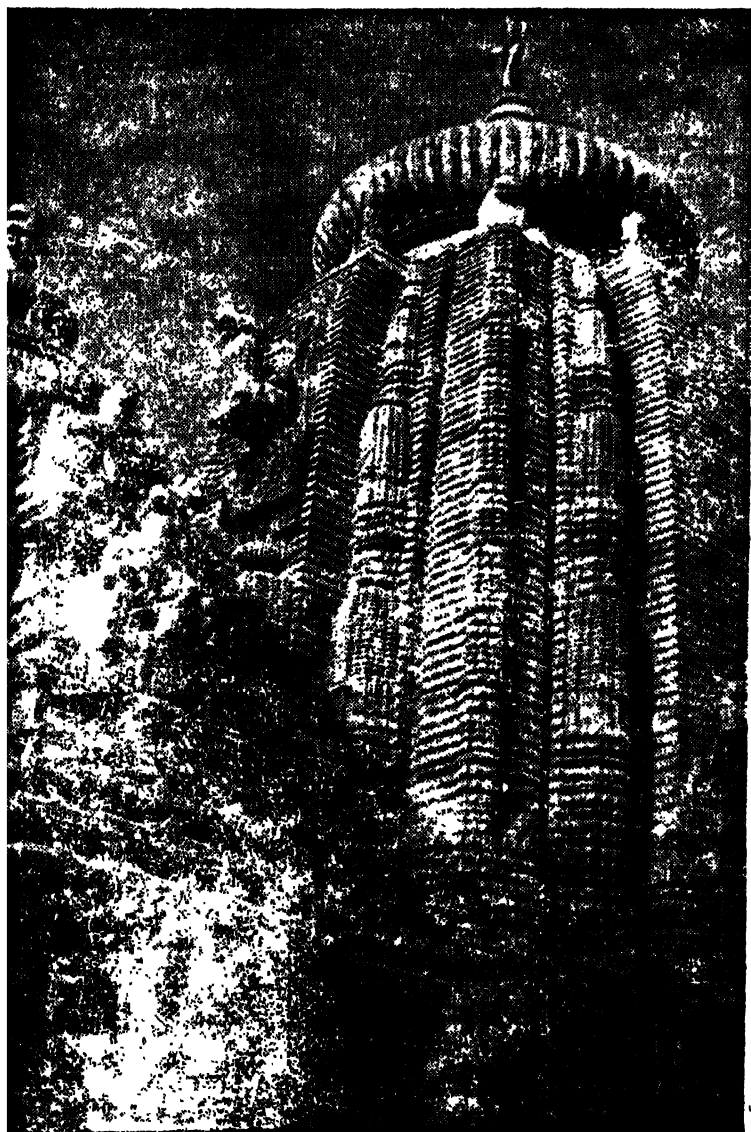
ভুবনেশ্বরের মন্দির [আলোকচিত্র]

পিছনে ঐ এক প্রবৃত্তিই ক্রিয়াশীল। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ফটোর সাহায্যে এই খেয়াল মিটান সহজসাধ্য হইয়াছে।

সাধারণতঃ মানুষ ঘরে প্রিয়জনদের ফটো রাখিতে ভালবাসে। অনেকে ধর্মগুরু, সমাজনেতা, সাহিত্যিক প্রভৃতি মনীষীদের ফটো ঘরে টাঙাইয়া অনুঃপ্রেরণা পাইতে চাহেন। পড়িবার ঘরে বা বসিবার ঘরে এইরূপ ছবি রাখা যায়। শয়নঘরে বা ড্রেসিং টেবিলে শিশুদের বা প্রিয়জনের ছবি ফটো-অ্যালবাম বা ছোট স্ট্যাণ্ডে রাখা যাইতে পারে। পূজার ঘরে ধর্মগুরুদের ছবি বা বিভিন্ন মন্দির ইত্যাদির ফটো রাখিলে সঠিক স্থান নির্বাচন হইয়াছে বলা যায়। পড়ার ঘরে সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজনেতা প্রভৃতির ফটো রাখা সমীচীন। শুইবার ঘরে গুরুজন বা প্রিয়জনের ছবিই রাখা ভাল। ইহা ছাড়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন ফটোতে চিরকাল ধরিয়া রাখা যায়। এলোরা বা অজন্তার চিত্রাদির ফটো মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধ উদ্রিক্ত করিতে পারে। শিল্পজাত বস্তুসমূহের আলোকচিত্র, বিভিন্ন মন্দির কিংবা পাহাড়-গাত্রের খোদাই-শিল্পের আলাকচিত্র সত্য সত্যই মনে আনন্দের সঞ্চার করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত এইসব আলোকচিত্রও ঘরের শোভা বর্ধন করে।

তৈলচিত্র এবং পোর্ট্রেট বা মানুষের আলেখ্য—মানুষের আলোকচিত্র যেমন ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয় তেমনি হাতে আঁকিয়াও ছবি করা যায়। পোর্ট্রেট (portrait), তৈলচিত্র (oil painting) মানুষের মূর্তিরও হয় এবং বড় বড় প্রাচীন অট্টালিকা কিংবা ফুল-ফল বা অন্যান্য নকশা-তোলা স্তম্ভ-পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদেরও হইতে পারে। এইগুলি খুব প্রাচীন পদ্ধতি। জমিদার বা রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদে বংশ পরম্পরার ছবি বা

বিভিন্ন দৃশ্যাদির বড় বড় তৈলচিত্র প্রচুর দেখিতে পাইবে। এইগুলি এখনও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের শোভা পরিবর্ধিত করিয়া থাকে। ফটো এনলার্জ পদ্ধতিতেই আমাদের সাধারণ ঘরে প্রিয়জনদের ছবি বড় করিয়া অঙ্কিত করিয়া রাখা হয়। ইহাতে অর্থব্যয় কম। তৈলচিত্র বড় হলঘরের দেওয়ালে খুবই মানানসই। পোর্ট্রেট যে কোন ঘরেই রাখা যায়।

বিদ্যাসাগর [অঙ্কিত ছবি]

বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে অঙ্কিত দৃশ্য বা ছবি—ইহার মধ্যে প্রথমে আসে বিভিন্ন ধরনের পেইন্টিংস বা রঙিন চিত্রাদির কথা। ছবিতে রঙের মিল বজায় রাখিতে শিল্পীদের গবেষণা বা পরিকল্পনার অন্ত নাই। রঙের মিল ঠিক না হইলে ভাবরূপ (idea) ঠিকমত মূর্ত করা অসম্ভব। ভাল ছবিও রঙ-সন্নিবেশের ত্রুটির জন্য বাতিল করিতে হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিভিন্ন খুঁটিনাটি রঙের বৈচিত্র্যে চমৎকারভাবে দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হয়। মুখ, চোখ, পোশাক-পরিচ্ছদ রঙের প্রভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। রঙের সাধনা শিল্পীর জীবনে চিরদিনই প্রাধান্য লাভ করে। শিল্পীর মনের ভাব নানা রঙের সামঞ্জস্যে সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে, এবং জীবনের বা প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ রঙের প্রভাবে অনবদ্যরূপে উপলব্ধ হয়। আমাদের ঘরের দেওয়াল সাজাইতে রঙ একটি মূল্যবান উপকরণ।

দেওয়াল এবং আলোর রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রঙিন চিত্র সজ্জিত করিতে হইবে। প্রখ্যাত শিল্পীর রঙিন ছবিও সব ঘরে সব দেওয়ালে মানায় না। সব সময় মনে রাখিতে হইবে যেন উগ্র রঙের ছবি নির্বাচিত না হয়। ছবির বা চিত্রের বিষয়বস্তু ইঙ্গিতময় হইলেও রঙের স্পষ্টতা সর্বদা লক্ষ্য করিতে হইবে। দেহ ও মনে প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি করিতে রঙের গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইহার পরেই আসে জলরঙের (water colour) ছবির কথা। ইহার অঙ্কন-প্রণালী ভিন্ন ধরনের। ইহা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় এবং ইহার রঙ খুবই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়। এই ধরনের ছবিতে যে কোন ঘরের দেওয়াল সজ্জিত করা চলে, কারণ এই ছবিতে দৃষ্টি কখনও পীড়িত হয় না।

দেওয়াল-চিত্র বা ফ্রেস্কো (Fresco)—দেওয়াল-চিত্র আসবাব নয়, বরং বলা যায়, ইহা আসবাব ইত্যাদির সৌন্দর্য বৃদ্ধির একটি উপকরণ মাত্র। ফ্রেস্কো বা দেওয়াল-চিত্র বলিতে বুঝায় দেওয়ালের কাঁচা জমাটের উপরে এক প্রকার চিত্রাঙ্কন। বিলেপন দ্বারা চিত্রিত করাই ফ্রেস্কো। অজন্তার গুহাচিত্রে এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবি রহিয়াছে। অজন্তা এবং এলোরার ছবিগুলি পৃথিবীর বহু শিল্প-রসিককে মুগ্ধ করিয়াছে। সাধারণতঃ মন্দির, বড় হলঘর, পড়ার ঘর বা পাঠাগার ইত্যাদি ফ্রেস্কোতে সজ্জিত করা হয়। কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলঘরটিতে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা সম্বলিত চিত্রাদি তোমরা সুযোগ পাইলে দেখিয়া আসিতে পার। পরিবেশ সৃষ্টিতে ফ্রেস্কোর প্রভাব অসামান্য। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ভবনের দেওয়ালে এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবির সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে।

ইহা ছাড়া রহিয়াছে ড্রইং (drawing) এবং স্কেচ (sketch)।

জীবজন্তু, লতাপাতা, মুখশ্রী ইত্যাদি পেনসিলের রেখায় অঙ্কিত করা যায়। রঙিন পেনসিলেও ফল, ফুল, গাছ, পাতা, সরোবর ইত্যাদি প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু চিত্রিত করা যাইতে পারে। পেনসিলের বা তুলির কয়েকটি টানে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুকে অনায়াসে

অজন্তার গুহা [ফ্রেস্কো-শোভিত]

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অঙ্কিত করা সম্ভব। এইগুলিতে সব রকমের ঘরের দেওয়ালই সজ্জিত করা যাইতে পারে।

পট, চিত্রবিচিত্র নকশা, চিত্রপট, চিত্রফলক, পদচিত্র, ছাপান ছবি ইত্যাদি নানা রকমের প্রচীন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি বর্তমান

যুগেও চালু রহিয়াছে। পুরাতন অঙ্কন-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। পটুয়াদের কথা আমরা জানি। পটচিত্রে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অঙ্কিত করিয়া পটুয়ারা ছড়া ও

এলোরার গুহা [ফ্রেস্কো-শোভিত]

গান রচনা করিত এবং পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া গান শুনাইয়া চিত্র দেখাইত।

বিভিন্ন কাপড়ের বা কাগজের উপরে নকশা অঙ্কিত হয়। বস্ত্রাদির উপরে অঙ্কিত চিত্রকে বলা হয় চিত্রপট। চিত্রফলক বলিতে বুঝায় কাঠ ইত্যাদির উপরে অঙ্কিত চিত্র। বর্তমান যুগে

ছাপান (print) ছবির বিশেষ প্রচলন দেখা যাইতেছে। পুরাতন পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই ধরনের ছবিতে ঘর সাজাইলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক গুণ বর্ধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন শিল্পপদ্ধতির পুনরুদ্ধারের কাজেও আগ্রহ সঞ্চার করা সম্ভব হয়।

অন্যান্য খোদাই এবং চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবি—চীনদেশে কাচের উপরে চিত্র রঞ্জিত করার একটি প্রাচীন রীতি রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে শোভাবর্ধক বহু রকমের ছবি অঙ্কন করা হইয়া থাকে।

লিথোগ্রাফ পদ্ধতির (প্রস্তরফলক হইতে ছাপাইবার প্রণালী) নাম তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে। ইহাতে গৃহের শোভাবৃদ্ধি হয়। ক্যানভাসের উপরে অঙ্কিত ছবি দেওয়াল-সজ্জার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কারণ, ইহাতে প্রয়োজনমত ছোট বা বড় আকারের ছবি তৈয়ারী করা যায়।

চিত্র বা ছবির কাঠাম—চিত্রের বা ছবির সঙ্গে আসে ইহার ফ্রেম (Frame) নির্বাচনের কথা। ফ্রেম ছবির বা চিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। কুশ্রী ফ্রেমে ছবির আবেদন অনেকখানি বিনষ্ট হয়। ফ্রেমের রঙ, গড়ন, আকার, বিস্তৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ফ্রেমে যেন বেশী নকশার কাজ না থাকে। ফ্রেম হইবে সাদাসিধা, জাঁকজমকপূর্ণ নয়। ছবির সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। ছবির আকার বড় করিবার জন্য যদি ম্যাট (ক্যানভাসের মত কাপড়) ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ছবির রঙের সঙ্গে ম্যাটের রঙ মিলাইয়া লইতে হইবে। ছবি সাদা হইলে, ম্যাটও সাদা হইবে। পূর্বে তৈলচিত্র কাঠের সোনালী ফ্রেমে বাঁধান হইত। আজকাল রঙের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত অল্প ম্যাট সমন্বিত সাধারণ কাঠের ফ্রেমে তৈলচিত্র বাঁধান হয়। অন্যান্য ছবির উপরে কাচ ব্যবহার করা উচিত। উপরে কাচ

থাকিলে এবং ছবির চারিপাশে কাঠ থাকিলে ফ্রেম মজবুত হয় এবং ইহাতে ছবিও ভাল থাকে। ফটো সাধারণভাবে ম্যাট ছাড়াই বাঁধান ভাল। আধুনিক যুগে ম্যাটের সমান আকারের কাচ কাটিয়া ধাতুর তৈয়ারী সরু ব্যাণ্ডের (band) সাহায্যে ছবি বাঁধান হয়।

ক্রোমিয়াম, পিতল, কাচের সরু ব্যাণ্ডে তৈয়ারী ফ্রেমও বর্তমান যুগে প্রচলিত হইয়াছে। অত্যাধুনিক আলেখ্য (Up-to-date portrait photograph) সমূহও অনেক সময় পূর্বপ্রচলিত রীতি অনুসারে সোনা বা রূপার ফ্রেমে বাঁধান হয়। ফ্রেম যেন জাঁকাল না হয় এবং রঙের বার্নিশে (varnish) লিপ্ত করা না থাকে। ছবি বা চিত্রের অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন রঙ থাকে তাহার যে কোন একটি রঙে ফ্রেম রঞ্জিত করিতে হইবে।

চিত্র-সন্নিবেশের প্রণালী—চিত্র সন্নিবেশ করিবার পূর্বে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ছবি বা চিত্রের বিষয়বস্তু অথবা উপকরণের মধ্যে যেন যোগাযোগ থাকে। খেলাধূলার ছবির সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধীয় ছবির কোনও সামঞ্জস্য নাই, বরং খেলাধূলার ছবির সঙ্গে বিভিন্ন ব্যায়ামের বা আসনাদির ছবির যেগোযোগ আছে। তৈলচিত্র সাধারণ ছবির পাশে রাখিলে বিসদৃশ দেখাইবে। একই দেওয়ালের ছবি বা চিত্রাদিতে সমতা রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, একই প্রকৃতির ছবি যেন পাশাপাশি সাজান না হয়। একই ধরনের সারি সারি ছবি বৈচিত্র্যহীন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সকল দেওয়ালে যদি ফুলের ছবি থাকে তবে ঘরের টেবিলে ফুলের তোড়া বেমানান দেখায়। কোন্ কোন্ ছবি একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইবে তাহা ছবির অঙ্কন-প্রণালী এবং উপকরণের উপরে নির্ভর করে। ছবির মধ্যে তৈলচিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।

ইহার রঙের গভীরতায় এবং ভাবব্যঞ্জনার সংমিশ্রণে ঘরের সৌন্দর্য উজ্জ্বলতর হয়। অন্য দিকে ইহার স্থায়িত্বও বেশী।

চিত্র-সন্নিবেশের অপর একটি মূল্যবান কথা হইল, ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, ছবির অঙ্কনরীতি, দেওয়ালের আয়তন ও রঙ, পরিবারের জীবনাদর্শ, ঘরের সৌন্দর্য-বিধান এবং অপরের চিত্তরঞ্জন ইত্যাদির সামঞ্জস্য বিধান। গৃহকর্তা বা গৃহিণীর ব্যক্তিগত রুচির কথা প্রথমেই বিচার্য। কিন্তু যাহা অঙ্কন-পদ্ধতির দিক হইতে নিখুঁত এবং রুচিসম্মত সেই ছবিকেই ঘরে স্থান দিতে হইবে। চিত্র বা ছবি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়া রুচি বিকাশের সহায়তা করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য।

একজন মাঝারি লম্বা লোক যাহাতে ছবিটিকে ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইয়া সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পারে সেইভাবে ছবি টাঙাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচুতে সাধারণতঃ ছবি টাঙাইতে হয়। অনেক সময় ইহার একটু নীচে, এবং ছবি বড় হইলে একটু উপরেও টাঙান যায়। তবে মনে রাখিতে হইবে ছবিটির নিকটে যেন অন্য কোনও দর্শনীয় বস্তু না থাকে—একমাত্র ছবিটিই যেন আকর্ষণীয় হয়।

অনেক ছবি পর পর সাজান ঠিক নয়। তাহাতে ছবির একক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। মাঝে মাঝে ছবির স্থান পরিবর্তন করিলে সব ছবির সঙ্গে চোখের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। ছোট ছোট কয়েকটি ছবির ফ্রেম মিলাইয়া মিলাইয়া ছবি সাজাইলে বিভিন্ন দৃশ্যাবলী একটি সম্পূর্ণ ভাবের সৃষ্টি করে, সবগুলি মিলিয়া বড় একটি ছবির আভাস দেয়। একসঙ্গে তিনটি ছবি টাঙাইলে সবগুলির উপরের দিকটা যেন সমান হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। চারিটি ছবি একসঙ্গে সাজাইলে দুইটি দুইটি করিয়া সাজাইতে হইবে এবং দুইটির

ফ্রেম সমান হইবে। উপরে নীচে ছবি সাজাইলে নীচের ছবিখানা চোখের সমান উঁচুতে রাখিতে হইবে। আসবাবের পিছনে ছবি টাঙাইলে সেই আসবাবের উপরের দিকটা ছবির ফ্রেমের নীচে রাখিতে হইবে।

ছবির সম্মুখে আলো রাখিলে এমনভাবে ছবি সংস্থাপন করিতে হইবে যেন আলোর ঢাকনা (ল্যাম্পশেড) ছবির ফ্রেমের ঠিক নীচে থাকে। সমস্ত ছবিটিতে যাহাতে আলো পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। দেওয়ালে কারুকার্য থাকিলে সেখানে অল্প সংখ্যক ছবি রাখা ভাল। ছবির শ্রেণীবিভাগ দেওয়ালের উপরই নির্ভরশীল। লম্বা ধরনের দেওয়ালে লম্বা ছবিই সাজাইতে হয়, অথবা দুইটি ছোট ছবি লাইন করিয়া টাঙাইতে হয়। দুই দেওয়ালের সমান্তরাল স্থানে সমান্তরাল করিয়া ছবি সাজাইতে হয়, অথবা দুইটি দুইটি ছবি একই দিকে সমান্তরাল করিয়া সাজাইতে হয়। পূর্বে হুকের (hook) সঙ্গেই ছবি টাঙান হইত। হুকে দেওয়ালের ক্ষতি করে বলিয়া এখন ভারী ছবি দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথিয়া দিবার প্রচলন দেখা যায়।

বিভিন্ন ঘরে ছবি নির্বাচন—বসিবার ঘরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, ফুলের ছবি, জাহাজ বা সমুদ্রের ছবি, খোদাইকরা প্রতিমূর্তি প্রভৃতি রাখা যায়। বসিবার ঘরের ছবি বিষয়বস্তুর দিক হইতে যেন বিরক্তিকর না হয়। কারণ এখানে বন্ধুবান্ধব মিলিত হইয়া গল্পগুজব করে।

পড়িবার ঘর হইবে শান্ত, গোলমালশূন্য ; সুতরাং সেখানকার ছবি হইবে স্নিগ্ধ এবং হাল্‌কা রঙের। পড়িবার ঘরে দার্শনিক বা সাহিত্যিকের আলেখ্য থাকিতে পারে। দুই-একটি মূর্তি রাখিলেও মন্দ হয় না। বিভিন্ন দেশের দর্শনীয় স্থানের কিছু কিছু শিক্ষামূলক

ছবিও সেখানে রাখা উচিত, তবে পড়ার ঘরে ছবির সংখ্যা খুবই কম হওয়া বিধেয়।

শুইবার ঘরে পারিবারিক ফটো এবং ফুল বা মূর্তি থাকিতে পারে। ছোট ছোট শিশুর শুইবার ঘরে প্রিয়জনদের ছবি থাকা বাঞ্ছনীয়। শয়নঘরের ছবি সম্পর্কে ব্যক্তিগত রুচিই প্রধান।
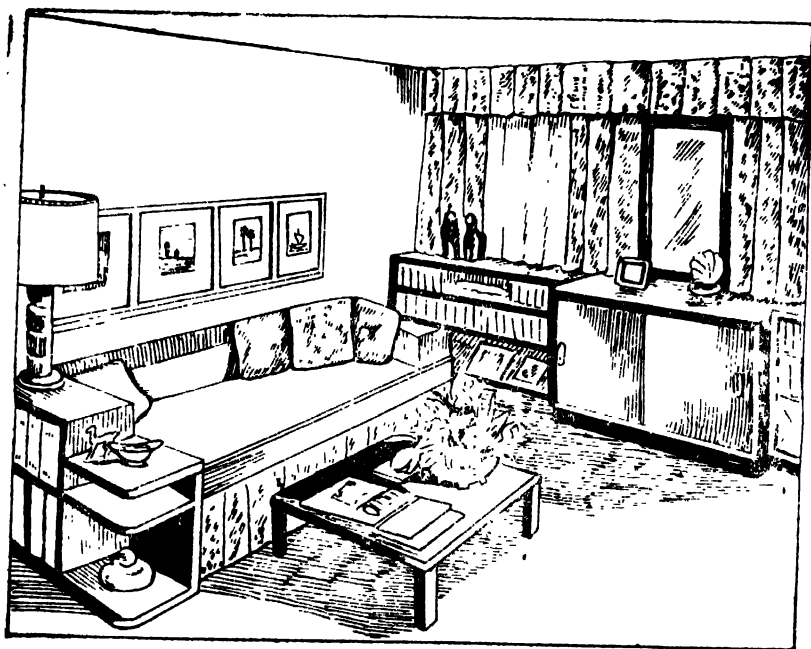
ছবি-সজ্জিত কক্ষ

শিশুদের খেলিবার ঘরে নানা জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখী, গাছ-পালার ছবি থাকিবে। খেলনা জাতীয় জিনিসের ছবি এবং খেলা-ধূলার ছবি থাকিলে ভাল হয়। শিশুদের ঘরে ছবিতে রঙের বাহার থাকিবেই। মুখোশ-ছবি, আনন্দদায়ক গল্পের ছবি এবং শিল্পমূলক ছবি শিশুদের ঘরে রাখা উচিত।

খাবার ঘরে অনেক সময় ফুল-ফলের ছবি. কলার ছড়া, কাটা তরমুজ ইত্যাদির ছবি রাখা হয়। দুই-একখানা নিসর্গ-চিত্রও খাবার ঘরে রাখা যায়। তবে যথাসম্ভব কম ছবিই খাবার ঘরে রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ খাবার ঘরের পরিবেশ হইবে মন প্রফুল্ল করিবার মত, কিন্তু খাবারের দিকে মন সন্নিবেশ করিবার কথাও সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করা কর্তব্য। ফুলের বা ফলের এবং পাখীর ছবি দুই-একখানা খাবার ঘরে রাখা যাইতে পারে।

পূজার ঘরে ধর্মসম্বন্ধীয় বা পৌরাণিক পটের ছবি বা দেবদেবীর মূর্তির ছবি এবং ধর্মপ্রবণ মানুষদের ফটো থাকিতে পারে।

হলঘরের দেওয়ালে ফ্রেস্কো জাতীয় ছবি অঙ্কিত করা যাইতে পারে। প্রতিকৃতি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত বড় বড় তৈলচিত্র হলঘরের সৌন্দর্য এবং সৌষ্ঠব বাড়াইতে সাহায্য করে।

রান্নাঘরে বা স্নানের ঘরে ছবি বা চিত্র না রাখাই সমীচীন। একই ঘরের ছবির মধ্যে রঙের মিল থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক গরীব। মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারে পড়ার জন্য এবং বসিবার জন্য একই ঘর ব্যবহৃত হয়। রান্না বা খাবার ঘর আলাদা থাকে না। শুইবার ঘরে অনেক সময় পড়িবার বা বসিবার ব্যবস্থা থাকে। এই ক্ষেত্রে ছবি বা চিত্রের নির্বাচন খুব সাধারণ করিতে হইবে। বিভিন্ন ধরনের ছবির মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখিয়া পূর্ণতা-সম্পাদনে সচেষ্ট হইতে হইবে। স্থান কম থাকিলেই চিত্র সন্নিবেশ কঠিন কাজ হইয়া দাঁড়ায়। গ্রামের সাধারণ ঘরে পটের ছবি, ছাপান ছবি ইত্যাদি সাজান যাইতে পারে। ক্যালেণ্ডারের একগাদা বাজে ছবিতে দেওয়াল না ঢাকিয়া পছন্দমত এবং রুচিসম্মত ছাপান ছবি, পটের ছবি বা

নানা নকশার ছবি ইত্যাদি স্বল্প মূল্যের ছবিতে ঘর সজ্জিত করা অনেক বেশী সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচায়ক।

পর্দা-সংযোজন

পর্দার প্রয়োজনীয়তা—পর্দা (Screen or curtain) আধুনিক গৃহসজ্জার অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ।

আমাদের দেশে গ্রামের বাড়ীগুলির অবস্থান ফাঁকা ফাঁকা। গৃহগুলি বড় এবং অনেকটা স্থান জুড়িয়া এক একটি বাড়ীর সীমানা সংরক্ষিত। তাহা ছাড়া আমাদের গরম দেশে প্রচুর আলো-হাওয়ার প্রয়োজন বলিয়াও জানালা-দরজায় পর্দার তেমন প্রচলন ছিল না। শহরের বাড়ীগুলির মধ্যে ফাঁকা জায়গা বড় একটা থাকে না। বাড়ীগুলি থাকে পাশাপাশি এবং ফ্ল্যাট বাড়ী-গুলিতে গৃহস্থদের খুবই কাছাকাছি বসবাস করিতে হয়। এই কারণে আমাদের দেশে পর্দা সংস্থাপনের প্রচেষ্টা শহর-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য-বিধান এবং অন্তঃপুরের আব্রু বা শালীনতা সংরক্ষণ পর্দা-সংযোজনের দুইটি মূল্যবান কথা। ইহা ছাড়াও পর্দা-সংযোজনের আরও বহুবিধ কারণ রহিয়াছে।
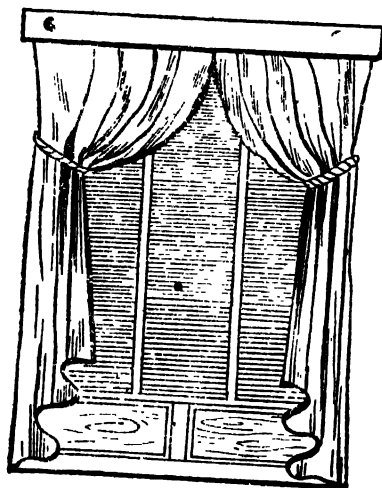
পর্দা

নিম্নে পর্দা-সংযোজনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইতেছে।

* প্রখর সূর্যকিরণ এবং অত্যধিক তাপ হইতে গৃহকে আড়াল করা।
* শীত বা বাহিরের আর্দ্র জলবায়ু হইতে গৃহকে রক্ষা করা।
* ময়লা ধুলাবালি এবং দূষিত বায়ুকে ঠেকাইয়া রাখা।
* গৃহের পুরাতন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঢাকিয়া রাখা।
* গৃহপরিবেশ সুন্দর, রুচিকর এবং মনোরম করিয়া তোলা।
* অন্তঃপুরের আব্রু এবং শালীনতা রক্ষা করা।

সূর্যকিরণ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা আগেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কোন জিনিসেরই মাত্রাধিক্য ভাল নয়। অত্যধিক সূর্যকিরণ শুধু কষ্টদায়ক নয়, দেহের পক্ষেও ক্ষতিকর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যকিরণ মানুষের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়। সর্দিগর্মি, মাথাধরা, শরীরের অসাড়তা প্রভৃতি রোগ অধিক সূর্যকিরণের উত্তাপেই সৃষ্ট হয়, সুতরাং এই উত্তাপ হইতে গৃহের অভ্যন্তরভাগ আড়াল করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়। পর্দা ব্যতীত অন্য কোন উপকরণের দ্বারা ইহা করা সম্ভব নয়। খসখস ব্যবহার করিয়া গরমের সময় আমাদের দেশে ঘর ঠাণ্ডা রাখিতে হয়।

শীতপ্রধান দেশে অত্যধিক শীত। পর্দার সাহায্যে গৃহের শৈত্যের পরিমাণ কমাইতে পারা যায়।

বাতাসের ধূলিকণা বা দূষিত বাতাসের আনাগোনা পর্দার সাহায্যে অনেকটা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব। শহরের রাস্তায় অনবরত গাড়ী চলে বলিয়া সন্ধ্যার পরে লক্ষ্য করিলেই দেখিবে বাড়ীঘরের মেঝে এবং জিনিসপত্র ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। নিকটবর্তী

অঞ্চলে কল-কারখানা থাকিলে চিম্‌নির ধোঁয়া চব্বিশ ঘণ্টাই বাতাসের সঙ্গে গৃহের মধ্যে চালিত হয়। এই ময়লা ধুলাসমূহ হইতে গৃহকে এবং গৃহের আসবাবপত্র প্রভৃতিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পর্দাই আমাদের একমাত্র সহায়ক.

ঘরের মধ্যে পুরাতন বা অব্যবহার্য এমন অনেক জিনিসপত্র থাকে যেগুলি হয়ত বাতিল করা বা স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। আবার এমন অনেক পুরাতন জিনিস থাকে যাহা প্রতিদিনই কাজে লাগে। অথচ এই সকল বস্তুকে সঠিক ভাবে বিন্যাস করিয়া রাখিলেও ঘরের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। এইগুলি দৃষ্টির সম্মুখে থাকিয়া প্রতিনিয়ত মনে বিরক্তি উৎপাদন করিতে থাকে। আমরা অনায়াসেই এই সকল বস্তুকে তাকে সাজাইয়া সম্মুখে পর্দা ঝুলাইয়া রাখিতে পারি।

গৃহের সৌন্দর্য রক্ষা পর্দা সংযোজনের প্রধান লক্ষ্য। পর্দার নানা রকম নকশা (design) এবং বিভিন্ন উপকরণ বা রঙ ঘরের দেওয়াল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গৃহে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। ঘরের সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা মাধুর্য পর্দার জন্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। ঘরে প্রবেশ করিতে আমরা প্রথমেই পর্দার সঙ্গে পরিচিত হইয়া থাকি। গৃহস্থের রুচি পর্দার মাধ্যমেই প্রথমে অতিথির চোখে প্রতিভাত হয়।

বাড়ীর অন্দরমহল বা অন্তঃপুর যদি পথিকের দৃষ্টির সম্মুখে অবারিত থাকে তবে গৃহের আব্রু বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বাড়ীর ভিতরে অনায়াসে চলাফেরায় বা কাজকর্মের কোন কোন ক্ষেত্রে সকল গৃহস্থকেই খানিকটা আব্রু বজায় রাখিতে হয়। পর্দার আড়াল না থাকিলে এই আব্রু বা শালীনতা রক্ষা কষ্টকর হয়।

পর্দার বিভিন্ন উপকরণ—গৃহের অন্যান্য আসবাব বা সাজ-

সরঞ্জামের তুলনায় পর্দার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই উচিত। তাহা ছাড়া পর্দা বাহিরের ধুলাবালিতে সহজেই নোংরা হয় এবং মাঝে মাঝে পর্দাগুলিকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সুতরাং খুব মূল্যবান উপকরণ পর্দায় ব্যবহার না করাই বিধেয়। তবে বিশেষ একটি ঘরকে সাজাইতে হইলে কিংবা কোন উৎসব উপলক্ষে গৃহ সজ্জিত করিবার জন্য সিল্ক, সাটিন, ভেলভেট, শিফন প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণ-ভাবে সস্তা দামের মধ্যে রঙ এবং নকশার দিক বিবেচনা করিয়া কাপড় বাছাই করিতে হইবে।

পর্দা
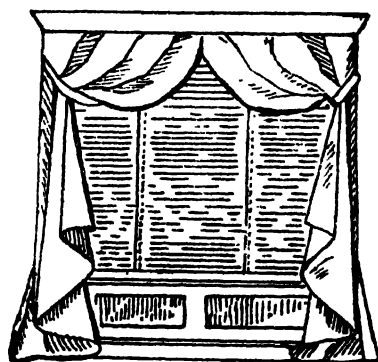
গরমের দিনের জন্য বাহির দিকের জানালা বা দরজার পর্দা কাপড়ের না হইয়া খসখস বা মাদুর জাতীয় দ্রব্যাদির হওয়াই উচিত। পর্দায় বিশেষ সৌন্দর্যসৃষ্টির নিমিত্ত ঝালরের ব্যবহার করা যাইতে পারে। ধাতুনির্মিত রড, কাঠের পোল (pole), ফ্রেম এবং রিং প্রভৃতির সাহায্যে পর্দা টাঙান হয়। পোল এবং ফ্রেমগুলি যেন মসৃণ হয়, রড বা রিংগুলিতে যেন মরিচা না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই উপকরণগুলি অমসৃণ হইলে বা ধাতুনির্মিত জিনিসগুলিতে সহজে মরিচা পড়িবার সুযোগ থাকিলে পর্দার কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে এবং কাপড়ে বিভিন্ন রকম দাগ পড়িতে পারে। পর্দায় মরিচার দাগ পড়িলে উহা দেখিতে বিশ্রী হয় এবং উহা তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায়।

সহজে ভাঁজ করা যায় ও ভাঁজ ঠিক একই ভাবে থাকে এইরূপ কাপড়ই পর্দার উপযুক্ত। যে কাপড় সহজে ছিঁড়ে না এবং বিবর্ণ হয় না তাহাই পর্দায় ব্যবহার করা উচিত। পর্দার জন্য এমন কাপড় নির্বাচন করিতে হইবে যাহা ব্যবহারে হলুদ বা ধূসর হইয়া যায় না এবং যে কাপড় অনায়াসেই পরিষ্কার করা বা ইস্ত্রি করা যায়। অর্গ্যাণ্ডি, নেট, লেস, নাইলন, ফাইবার গ্লাস, অর্লন (orlon), সিল্ক, ভেলভেট, সাটিন, শিফন ইত্যাদি কাপড় পর্দার উপযোগী। এইগুলি মজবুত এবং ইহাদের পর্দা ধুইলে সহজে পরিষ্কৃত হয়। এই পর্দাগুলির রঙ পাল্টাইতে অসুবিধা হয় না। সামান্য খরচে রঙ পরিবর্তন সম্ভব হয় এবং পরিষ্কার করিবার পরে পূর্বের মতই ভাঁজ করা সহজ হয়।
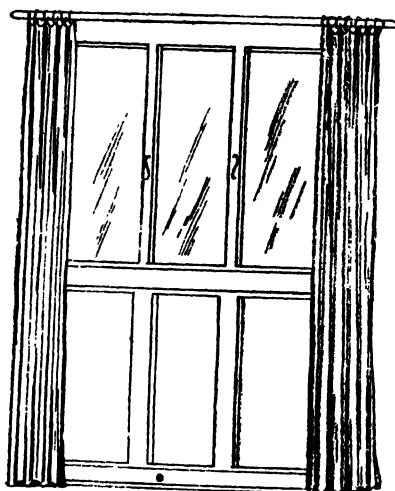
রড্ ও রিংএর সাহায্যে টাঙানো পর্দা

এই ধরনের কাপড় ধৌত করিয়া স্টার্চ মিশাইয়া সুষ্ঠুভাবে ইস্ত্রি করা যায়। নেট বা লেসের পর্দার কিন্তু এই সুবিধাগুলি নাই। এই ধরনের পর্দার অসুবিধা হইল পুরাতন আকৃতি বা আয়তন বজায় রাখিবার জন্য ভাঁজ না করিয়া এইগুলিকে ছড়াইয়া দিতে হয়। নাইলনের কাপড়ে ভাঁজ থাকিলে ইহা আরও সুন্দর দেখায়। এইগুলির সুতা উজ্জ্বল চকচকে এবং স্নিগ্ধকর। সূর্যের কিরণে নাইলনের রঙ নষ্ট হয় না বা কাপড়ের

ক্ষতিও করে না। এই কাপড় অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়, পরিষ্কার করিতে সময়ও কম লাগে। বেশী রগড়াইয়া পরিষ্কার করিতে গেলে উল্লিখিত কাপড়ের পর্দা নরম ন্যাকড়ার মত হইয়া পড়ে এবং অস্পষ্ট কুঞ্চন পড়ে। নাইলন প্রভৃতি পর্দা বেশীদিন ব্যবহার করিবার পর বিবর্ণ হইয়া যায়। পরিষ্কার করিলেও উহাতে পূর্বের রঙ ফিরাইয়া আনা কষ্টকর। এই জাতীয় পর্দা পরিষ্কার করিতে হইলে ঈষদুষ্ণ জলে একটুখানি ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি স্টিম ইস্ত্রি করাইয়া লইতে হয়।

ফাইবার গ্লাসের পর্দায় ছাতা পড়ে না বা সূর্যকিরণেও ইহার কোনও ক্ষতি হয় না। এই জাতীয় পর্দা কীট-পতঙ্গে কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। ইহা পরিষ্কার করিবার পরে শুকাইবার বা ইস্ত্রি করাইবার প্রয়োজন হয় না। তবে এই পর্দা পরিষ্কার রাখা অন্য দিকে খুবই অসুবিধাজনক। ধোঁয়া, ঘরের ঝুল, ধুলাবালি প্রভৃতি অতি সহজেই এই জাতীয় পর্দাকে নোংরা করিয়া ফেলে। অবশ্য গরম সাবান-জল এবং ক্লোরিনের সাহায্যে ইহা অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়। সাধারণতঃ বড় হলঘরে, সভাস্থলে, হোটেলে বা রেঁস্তোরায় এই জাতীয় পর্দা ব্যবহার করা হয়।

ডেক্রন পরিষ্কার করিলেই সহজে ধবধবে সাদা হয় এবং ইহা ইস্ত্রি করা সহজ।

অর্লনের পর্দা সুন্দর এবং খুবই মজবুত। অর্লন ধোঁয়া প্রতিরোধ করিতে পারে। সূর্যের অত্যধিক উত্তাপে এই জাতীয় পর্দার কোনও ক্ষতি হয় না এবং ইহা খুবই মজবুত।

সুতীর পর্দায় কিন্তু উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের পর্দার চাইতে অনেক কম যত্ন লইতে হয়। ইহা অন্যান্য পর্দার চাইতে দেরীতে ময়লা হয় এবং ইহা পরিষ্কার করাও সহজ। সুতী পর্দার ভাঁজও সহজে

ভাঙ্গে না এবং ইস্ত্রি করাও পরিশ্রমসাধ্য নয়। তাহা ছাড়া সূতী পর্দা বাড়ীতেই পরিষ্কার করা চলে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় গৃহ শীতল রাখিবার নিমিত্ত **খসখস** টাঙানো যায়। ধনীদের গৃহে বা অফিস-বাড়ীগুলিতেই খসখস বেশী ব্যবহৃত হয়। খসখসের পর্দায় মাঝে মাঝে জল ছিটাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। পাইপিং লাগাইয়া এই ধরনের পর্দাকে সুদৃশ্য করা চলে। ইহা ছাড়া ধনীর গৃহে পর্দার উপকরণ হিসাবে চিক (বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারী) ব্যবহার করারও রেওয়াজ আছে।

পর্দার সুষম বিন্যাস—পূর্বেই বলা হইয়াছে ঘরের দেওয়াল এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পর্দা বিন্যস্ত করিতে হয়। শুধু পর্দার নিজস্ব রঙ বা নকশা দেখিলেই চলে না। ঘরের মেঝেতে নকশা-করা গালিচা বা দেওয়ালে নকশা-করা দেওয়াল-কাগজ বা ওয়াল-পেপার থাকিলে কারুকার্যহীন সাধারণ পর্দাই মানানসই দেখাইবে। ঘর যদি সুন্দর আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত না হয় এবং গৃহের অভ্যন্তরভাগ যদি নিষ্প্রভ মনে হয় তাহা হইলে ঘরের ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতা বাড়াইবার জন্য নকশা-করা (patterned) বা উজ্জ্বল রঙের পর্দা টাঙানো উচিত। পর্দার নকশা এমন ভাবে করিতে হইবে যেন ভাঁজে ভাঁজে ঐ নকশাগুলি স্পষ্ট-ভাবে দেখা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে পর্দার রঙ হইবে ঘিয়ে (cream) রঙের বা ধূসর রঙের। হাল্কা রঙের পর্দা সব ঋতুতেই চলে এবং দৃষ্টিকেও পীড়িত করে না। তবে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিল রাখিয়াই পর্দার রঙ নির্বাচন করা উচিত; অর্থাৎ পর্দা-বিন্যাসের সময় নজর রাখিতে হইবে যেন ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের রঙের সঙ্গে উহার সমন্বয় থাকে এবং ঘরের বিভিন্ন সজ্জার মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিয়া উহা গৃহসজ্জার সৌষ্ঠব আরও বাড়াইয়া দেয়।

পর্দার সঙ্গে আসে লাইনিংএর কথা। লাইনিং দিলে পর্দা খুবই টেকসই হইয়া থাকে পর্দার চাইতে লাইনিংএর রঙ গাঢ় হওয়া উচিত। ঝালর থাকিলে লক্ষ্য করিতে হইবে যেন উহা পর্দার রঙের সঙ্গে খাপ খায় অথবা পর্দার ঠিক বিপরীত রঙে (contrasting colour) উহা রঞ্জিত হয়। তবে ঝালর এবং লাইনিংএর প্রয়োগ যেন অতিরিক্ত না হয়।

পর্দার মাপ লইবার সময় প্রথমে উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। চৌকাঠ পর্যন্ত লম্বা করিয়া পর্দার কাপড় কাটিয়া লইবে। চৌকাঠের নীচের অংশে থাকিবে ঝালর। মেঝে পর্যন্ত বা জানালার নীচের অংশ পর্যন্ত পর্দাকে ঝুলাইয়া দিতে হইবে। লম্বার মাপ ঠিক করিয়া জানালা বা দরজার চওড়া দিকের মাপ লইতে হইবে। পর্দা হইবে বেশ ছড়ান, সুতরাং চওড়ার মাপ লইবার সময়ে একটু বেশী করিয়াই কাপড় কাটিতে হইবে যাহাতে পরে অসুবিধা না হয়। নকশা-করা পর্দায় কাপড় কম হইলেও চলে ; কিন্তু নকশা-বিহীন সাধারণ পর্দায় কুঁচি বা ঝালর দিবার জন্য অতিরিক্ত কাপড়ের প্রয়োজন হয়। পর্দা-বিন্যাসের সময় অবশ্যই আপন আপন রুচি প্রযোজ্য।

আগেই বলা হইয়াছে, গ্রীষ্মের সময় খসখস টাঙাইলে ইহাতে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং যাহাতে জল দিবার ব্যবস্থা থাকে এবং ঝরা জল বাহির হইয়া যাইবার পথ থাকে সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে, নতুবা অনবরত ঝরা জলে মেঝের ক্ষতি হইবে। চিক ব্যবহার করিলে ইহাতে রঙ লাগাইতে হইবে। রঙের সমন্বয়ে চিকের সৌন্দর্য অনেক গুণ বাড়িয়া যায়।

পর্দা-বিন্যাসের সঙ্গে পর্দা গুটাইয়া রাখিবার কথাও ভাবিতে হইবে। পর্দা উপরের দিকে বা পাশের দিকে গুটান যায়।

গুটাইবার ব্যবস্থায় যেন খুঁত না থাকে। পর্দা গুটাইয়া রাখিবার মধ্যেও সৌষ্ঠব বজায় রাখিতে হইবে। প্রত্যেকটি স্থানের পর্দা দুই প্রস্থ রাখিবে, ময়লা বা নোংরা হইলে যাহাতে একটি পরিষ্কার করিবার সময়ে অন্যটি বিন্যস্ত করা যায়।

পর্দা-বিন্যাসের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ আলো এবং বাতাস ঘরে চলাচল করিতে পারে।

আসবাবপত্রের ঢাকনা

ঢাকনার উপযোগিতা—পর্দা যেমন গৃহের বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থান আড়াল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ঢাকনাও (slip covers) তেমনি বিভিন্ন গৃহসজ্জার উপকরণাদি ঢাকিয়া রাখিতে সাহায্য করে। পর্দার মতই ঢাকনা গৃহসজ্জার একটি আবশ্যিক উপকরণ। আসবাবপত্রের ঢাকনা থাকিলে উহাতে ময়লা পড়ে না, উহার রঙ চটিয়া যায় না এবং নূতনত্ব বজায় থাকে। আসবাবের সৌন্দর্য ঢাকনার সাহায্যে অনেকদিন বজায় থাকে এবং ইহা অনেকদিন টিকে। আসবাবপত্রের রঙ উঠিয়া গেলে বা কোথাও কদর্যতার কোন চিহ্ন থাকিলে ঢাকনার সাহায্যে তাহা সুশ্রী দেখান সম্ভব। ঢাকনার সাহায্যে আসবাব যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি আরামপ্রদও হয়। ইহা ছাড়া গৃহের সৌষ্ঠবও ঢাকনার সাহায্যে বাড়ান যায়। গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে ঢাকনার রঙ এবং নকশা মিলিত হইয়া গৃহের সৌন্দর্য অনেক গুণ বাড়াইয়া দেয়। ঢাকনার উপরে সুঁচ-সুতার বিভিন্ন কাজকরা নকশা গৃহিণীর শিল্পীমন এবং রুচির সাক্ষ্য দেয়।

ঢাকনার উপকরণ ও বিন্যাস—ঢাকনার কাপড় হইবে মাঝারি ধরনের এবং খুব মজবুত। খুব পাতলা হইলে বেশী দিন স্থায়ী হইবে না এবং সহজে কুঁচকাইয়া যাইবে। বেশী ভারী হইলে পরিষ্কার করিতে অসুবিধা হইবে। ঢাকনার জন্য প্রায় সব রকমের কাপড়ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্যালিকো, পপলিন, লিনেন, বেড-টিকিন, কেজমেন্ট, সিল্ক, ভেলভেট, সাটিন বা রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন কাপড় ঢাকনায় ব্যবহৃত হয়। রং মিলাইয়া পুরানো শাড়ীর পাড় বসাইয়া তৈয়ারী ঢাকনাও অনেক গৃহে ব্যবহৃত হয়। ছাপান বা ছিটের কাপড় হইলে এমনিতেই চলে। একরঙের কাপড় হইলে বিপরীত রঙের লাইনিং দিতে হইবে।

গৃহসজ্জার পরিকল্পনার সঙ্গে ঢাকনার রঙ, নকশা, প্যাটার্ন প্রভৃতির সামঞ্জস্যের প্রশ্ন জড়িত। যে আসবাবের ঢাকনা হইবে তাহার রঙ, নকশা প্রভৃতির সঙ্গে ঢাকনার কাপড়ের ও নকশার সমন্বয় রাখিতে হইবে। আধুনিক ভারী আসবাবের জন্য ঢাকনা হইবে ভারী এবং ভিন্ন বর্ণের রেখা বা ডোরা (stripe) কাটা। আসবাবের রঙ যদি উজ্জ্বল না হয় এবং প্যাটার্ন যদি সাধারণ রকমের হয় তাহা হইলে চেয়ার, সোফা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আসবাব আলাদা ভাবে সাজাইয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙের ঢাকনিতে ঐগুলিকে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। যাহাতে পরিপাটি সৌন্দর্যের একটি ছবি দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। একই ঘরে দুই-তিন রকমের আসবাব বা উপকরণাদি থাকিলে প্রধান আসবাবটির বা উপকরণের রঙ অন্যগুলির সঙ্গে মিলাইয়া সজ্জিত করিতে হয়, অর্থাৎ প্রধান আসবাবটিই এখানে মূল কেন্দ্রবিন্দু যাহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করিবে অন্যান্য

উপকরণ। ঢাকনার রঙ এবং নকশাও এই ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে।

টেবিলের ঢাকনা হিসাবে কাপড়ের বদলে পাটি বা মাদুর জাতীয় জিনিসের প্রচলন আজকাল দেখা যাইতেছে। দেশীয় কুটীর-শিল্পের প্রসারের জন্য এই প্রকার প্রচেষ্টা অবশ্যই সমর্থন-যোগ্য। প্ল্যাস্টিকের সুদৃশ্য টেবিলের ঢাকনাও বাজারে সহজলভ্য। বাক্স, স্যুটকেস প্রভৃতির ঢাকনা একরঙের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে গাঢ় রঙের ব্যবহার করাই ভাল। রঙ হাল্‌কা হইলে ঢাকনা তাড়াতাড়ি ময়লা হয়।

মেঝের আচ্ছাদন

মেঝের আচ্ছাদনের উপকারিতা—মেঝে পায়ের নীচে থাকে বলিয়া তাহাকে অযত্ন করিলে চলিবে না। ঘরের অন্যান্য স্থানে নানা উপকরণ সজ্জিত করিয়া যদি মেঝেতে খুঁত রাখা যায়, তবে তাহা অসঙ্গতির নামান্তর হইবে এবং গৃহের সৌন্দর্য তাহাতে ব্যাহত হইবে। মেঝে হইবে মসৃণ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। এইজন্যই মেঝেতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে আচ্ছাদনের সাহায্য লইতে হয়। মেঝের আচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রভূত আভরণ-বস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে। রূপসজ্জার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল বিভিন্ন উপকরণের সামঞ্জস্য বিধান। মেঝেকে মনোরম আচ্ছাদনে ভূষিত করিলে ঘরের শ্রী ফিরিয়া যায়।

পায়ের নীচে থাকে বলিয়া মেঝেতে সর্বদাই ধুলাবালির ছাপ লাগিবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে অবশ্য সাধারণভাবে আমরা দুই বেলা ঘরের মেঝেতে ঝাঁট দেই এবং অন্ততঃপক্ষে একবার ঘর

নিকানো হয়। মাটির মেঝে আমরা গোবরমিশ্রিত জলে নিকাইয়া লই। শান-বাঁধানো পাকা মেঝে ভিজা নেতার সাহায্যে নিকানো হয়। ইহা সত্ত্বেও দিনের মধ্যে বহুবার গৃহের অভ্যন্তরে আমরা বাহিরের ধূলি লইয়া প্রবেশ করি। সুতরাং প্রতিনিয়ত মেঝেতে নোংরা লিপ্ত হইতে থাকে। অর্থের সংকুলান হইলে ঘরের মেঝে আচ্ছাদনে আবৃত করিতে পারিলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে আচ্ছাদনের ধুলা ঝাড়িলেই ঝামেলা চুকিয়া যায়। কিছুদিনের ব্যবধানে ইহা ধৌত বা পরিষ্কৃত করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে দুইটি প্রধান কারণে আমরা মেঝে আচ্ছাদন করিয়া থাকি—(১) সৌন্দর্য বিধান, (২) ময়লা-ধুলা হইতে মেঝেকে রক্ষা করা। ইহা ছাড়াও আচ্ছাদিত করিয়া মেঝের ক্ষয় নিরোধ করা যায়।

আচ্ছাদনের উপকরণ এবং বিন্যাস—গালিচা (carpet) বা রাগ (rug) জাতীয় মোটা আচ্ছাদন এখন শুধু ধনীর গৃহে নয়, অনেক সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেঝেতে শোভা পাইতে দেখা যায়। অল্পমূল্যের অনেক রকম গালিচা আজকাল পাওয়া যায়, তবে কারুকার্যমণ্ডিত বহুমূল্য গালিচা সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে। এখনও গালিচা বা রাগ আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত বা সর্বজনপরিচিত নয়। মেঝের রঙ বা আচ্ছাদনের রঙ গৃহের অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে। যদি মেঝের রঙকে গৃহসজ্জার প্রধান রঙ হিসাবে ধরা হয় তবে আচ্ছাদনের রঙ হইবে উজ্জ্বল এবং গাঢ়। দেওয়াল বা ছাদের ভিতর দিকের (ceiling-এর) রঙ হইতে মেঝের আচ্ছাদনের রঙ ভিন্নতর হইবে। দেওয়ালে কোন নকশা না থাকিলে মেঝেতে নকশা-অঙ্কিত আচ্ছাদন বিছাইতে হইবে। তবে দেওয়ালকে

লাইনের দ্বারা মেঝে হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখাইবার সুযোগ থাকিলে দুইয়ের রঙ এবং প্যাটার্নে বা নকশায় সমতা সত্ত্বেও গৃহের সৌন্দর্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ বা নকশা-বিহীন আচ্ছাদনের সুবিধা এই যে, পছন্দমত সব সময়ই ইহার চেহারা ও ধারা বদলান যায়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ইহা সন্নিবেশ করিলেও বেমানান হয় না। হাল্‌কা রঙই আধুনিক যুগে প্রচলিত। বাদামী, ধূসর, হাল্‌কা চকোলেট, ঘিয়ে ধূসর, আভাযুক্ত সবুজ, নীল, গোলাপী প্রভৃতি রঙগুলি সর্বজনপ্রিয়। তবে, হাল্‌কা রঙ হইলে আচ্ছাদন তাড়াতাড়ি ময়লা হয় এবং ড্রাইংক্লিনিং প্রভৃতির জন্য খরচ বেশী হয়। হাল্‌কা রঙের আচ্ছাদন হইলে তাহা প্রায়শঃই পরিষ্কার করিতে হয়; গাঢ় রঙের হইলে ময়লার পরিমাণ বুঝিতে অসুবিধা ঘটে। সুতরাং রঙের প্রগাঢ়তা মাঝামাঝি ধরনের হওয়া সুবিধা-জনক। গাঢ় মেহগনি কাঠের আসবাবপত্রের সঙ্গে গাঢ় রঙের আচ্ছাদন খুবই মানানসই। দেওয়াল ও অন্যান্য আসবাবের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই আচ্ছাদনের রঙ বাছাই করা উচিত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘরের উপকরণ হিসাবে মোজেইকের বা বিচিত্র মার্বেল পাথরের কাজ, আর্ট টাইলের কাজ ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। কারণ ইহাতে ঘরের মেঝে শীতল থাকে। গরমের সময় মেঝেতে সাজাইবার গালিচা বা রাগ যেন ভারী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শীতপ্রধান দেশের ঘরে শুধু সৌন্দর্য রক্ষা নয়, মেঝের ঠাণ্ডাভাব বা সিক্ততা (dampness) হইতে ঘরের স্বাভাবিক আবহাওয়া বজায় রাখিবার নিমিত্ত আচ্ছাদন ব্যবহার করিতে হয়। শীতপ্রধান দেশগুলিতেই নিত্য নূতন নকশার (design) বা নূতন উপকরণের (materials) আচ্ছাদন আবিষ্কৃত হইতেছে। গালিচা বা রাগ প্যাটার্ন-সংযুক্ত হওয়াই বিধেয়।

প্যাটার্নযুক্ত গালিচায় পায়ের ছাপ মিলাইয়া যায়, অল্প যত্নে ইহা পরিষ্কৃত থাকে। দাগ বা ধুলাবালিতে ইহা নোংরা হইলে উল্টাইয়া অপর পিঠ ব্যবহার করা যায়। নকশা-বিহীন গালিচায় বা রাগে ঘর আয়তনে বড় দেখায়। ইহার চারিপাশে পাড় (বর্ডার) না থাকিবার জন্যই আয়তন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও চোখে এইরূপ বিভ্রম ঘটায়।
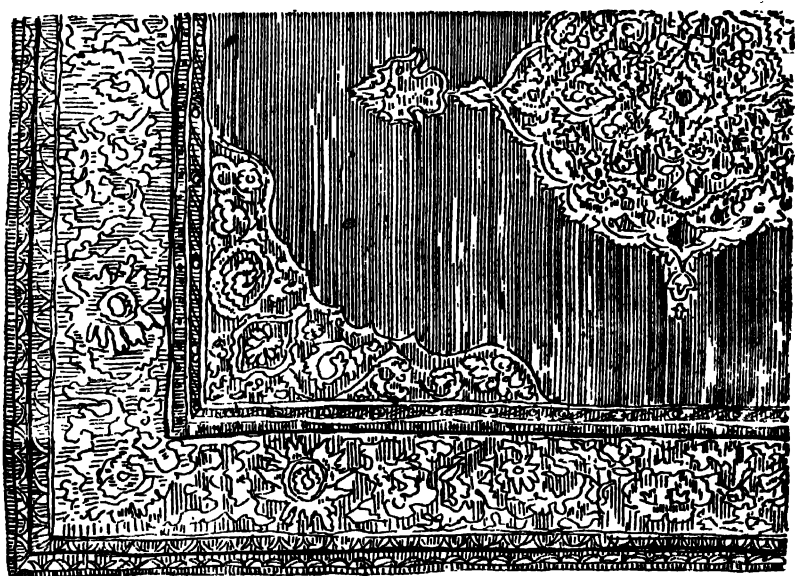
গালিচা

আবার নকশা থাকিলে রাগ বা গালিচায় ঘরের আয়তন ছোট দেখায়। এইজন্যই নকশাযুক্ত গালিচা শীতের দেশের উপযোগী। ঘরের মেঝের চারিপাশের দেওয়াল পর্যন্ত গালিচা বিছাইলে ঘর বড় দেখায়। মেঝের খুঁত ইহাতে অনায়াসেই ঢাকা পড়িয়া যাইবে।

গালিচা সূতীর এবং উলের দুই প্রকারের হয়। গরম দেশে সূতীর গালিচা ব্যবহার করা যায়। শীতপ্রধান দেশে পশমের

(woollen) রাগ বা গালিচা ব্যবহার করিতে হয়। সুতীর গালিচা দামে সস্তা ; ইহাতে যে কোনও ঘর সাজান চলে এবং ইহা সহজেই পরিষ্কার করা যায়। কাশ্মীরী গালিচায় রঙ ও কারুকার্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই গালিচার চাহিদা রহিয়াছে। পারস্যের (Persian) গালিচাও ইহার রঙের বাহার এবং কারুকার্যের জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত। গাঢ় ভেলভেটের রাগ বা গালিচা ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। গালিচা ঘরের রূপসজ্জার ধারাকে (style) অবশ্যই বজায় রাখিবে। নকশা-বিহীন গালিচার সুবিধা এই, যে কোনও রূপসজ্জার পটভূমিকা সৃষ্টি করিতে ইহার অবদান অসামান্য।

আজকাল লিনোলিয়াম (Linoleum)-এর আচ্ছাদনের খুব প্রসার দেখা যায়। ইহার বর্ডার, গঠন এবং ভিতরকার নকশা অপূর্ব। ইহার গঠন-বৈচিত্র্য এবং রঙ-নকশার সংমিশ্রণ নয়ন-মনোমুগ্ধকর। দামের দিক হইতেও ইহা গালিচা প্রভৃতির চাইতে সুলভ। অবশ্য সাধারণ দরিদ্রের গৃহে এখনও এই ধরনের মেঝে-আচ্ছাদনের উপকরণসমূহ বিলাসিতারই নামান্তর।

রাগ, গালিচা বা লিনোলিয়াম যে ধরনের আচ্ছাদনই ব্যবহৃত হউক ইহার সঙ্গে যেন ঘরের সজীবতা বজায় থাকে। রঙের বা শিল্পগত সামঞ্জস্যের কথাও অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

ঘাস বা তৃণের এক প্রকার রাগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেখা যায়। সূর্যকিরণোজ্জ্বল ঘরে তৃণের আচ্ছাদন খুবই মনোরম। পুরাতন কাপড়ের তৈয়ারী আচ্ছাদনও অনেক গ্রাম্য কুটীরে দেখা যায়।

মেঝের আচ্ছাদনের জন্য আমাদের গরীব দেশে শতরঞ্জি বা মাদুরের ব্যবহার মন্দ নয়। অবশ্য ইহা মেঝেতে বসিবার জন্যই আমরা বিছাইয়া থাকি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীতলপাটি

তৈয়ারী হয়। মেঝেতে পাটি বিছাইয়া গরমের দিনে অনেকেই শরীরকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। গৃহের সৌষ্ঠবও ইহাতে অনেক পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পাটি, মাদুর বা শতরঞ্জি গরম দেশে সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের আরামপ্রদ মেঝের আচ্ছাদন। শতরঞ্জি বা মাদুরের উপরে নানা রঙের নকশা অঙ্কিত করিয়া ইহার সৌন্দর্য অনেক বাড়ান যায়। গ্রামাঞ্চলে হোগলা জাতীয় উদ্ভিদের তৈয়ারী এক প্রকার মাদুর দেখা যায়। স্বল্পবিত্ত মানুষের গৃহে এই মাদুর বা বেত ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ বস্তুর তৈয়ারী চাটাই মেঝের আচ্ছাদন হিসাবে, বসিবার জন্য এবং শয্যার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইগুলি মানুষের সামর্থ্য বা অর্থের দিক হইতে সুলভ।

গরমের দেশে পাট বা শনের তৈয়ারী এক প্রকার সস্তা গালিচা পাওয়া যায়। রেয়নের রাগও দামে বেশ সস্তা, কিন্তু এইগুলি আর্দ্রতায় (moisture) তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, এবং ভারী বলিয়া পরিষ্কার করাও অসুবিধাজনক। বর্ষার দিনে এইগুলি একেবারেই অকেজো হইয়া দাঁড়ায়। গালিচা কিনিবার সময় অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে—সহজে ইহা পরিষ্কার করিবার সম্ভাবনা আছে কিনা, ড্রাইক্লিনিংএর সাহায্য লইতে হইবে কিনা, অথবা শুধু ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইলেই চলিবে কিনা। মূল্যবান রাগ বা কার্পেট ব্যবহার না করাই ভাল। বিশেষ করিয়া গরমের দেশে ইহার কার্যকারিতা খুবই কম। নিজস্ব বাড়ী না থাকিলে দামী রাগ বা গালিচা মেঝের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার না করাই উচিত। কারণ বাড়ী বদল করিবার সময় ইহা টানাহিঁচড়া করিতে হয় এবং বিভিন্ন বাড়ীর ঘরের মেঝের সঙ্গে আগের আচ্ছাদন পরিমিতি এবং রঙের দিক হইতে খাপ না খাইতেও পারে।

দেওয়াল-সজ্জা

দেওয়াল-সজ্জার উপযোগিতা—গৃহের অভ্যন্তরে যখনই যে অবস্থায় আমরা অবস্থান করি দৃষ্টির সম্মুখে সর্বক্ষণ চতুষ্পার্শ্বস্থ দেওয়ালের যে কোনও অংশ প্রতিভাত হইবে। সমগ্র গৃহের রূপ-সজ্জার সঙ্গে দেওয়ালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে বা গৃহসজ্জার সঙ্গে দেওয়াল-সজ্জার যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহা হইলে রূপসজ্জার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। নিম্নোক্ত কারণে আমরা দেওয়াল-সজ্জার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।

* গৃহের সৌন্দর্য বিধান।
* ময়লা, ধুলা, ঝুল, দাগ প্রভৃতি হইতে দেওয়ালকে রক্ষা করা।
* দেওয়ালের গড়নে কোন বৈসাদৃশ্য বা ত্রুটি (defect) থাকিলে তাহা আবৃত রাখা।
* দেওয়ালের সিক্ততা বা আর্দ্রতা হইতে গৃহকে রক্ষা করা এবং গৃহের আবহাওয়ার স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখা।

সৌন্দর্য বিধানের জন্য দেওয়ালে রঙ লাগান হয়। রঙের সঙ্গে তেল মিশাইয়া দেওয়ালে লাগাইতে হয়। বেশী চকচকে বা উত্তম পালিশের জন্য রঙের সঙ্গে পরিমাণমত এনামেল মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ইহাতে রঙের জৌলুস বা ঔজ্জ্বল্য যেমন বাড়িবে, তেমনি রঙ চটিয়া যাইবার সম্ভাবনাও কম থাকিবে। ইহাতে জলের সাহায্যে দেওয়াল পরিষ্কার করা যাইবে। ইহা ছাড়া ওয়াল-পেপার এবং দেওয়াল-সজ্জার অন্যান্য উপকরণে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বাড়াইয়া তোলা সম্ভব।

ওয়াল-পেপারে ঢাকা থাকিলে ধুলাবালি বা দাগ দেওয়ালে

লাগিবে না। জল চুয়াইলে বা আবহাওয়ার আর্দ্রতা শোষণ করিবার ফলে এক প্রকার শেওলার মত ছাতার দাগ দেওয়ালে প্রায়ই দেখা যায়। রঙ বা ওয়াল-পেপারের আচ্ছাদনে ইহা ঢাকিয়া যায়।

দেওয়ালের গড়নে কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা ঢাকিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ছবি, ফটো, ওয়াল-পেপার বা পর্দার সাহায্যে

ওয়াল-পেপার

দেওয়ালের সেই বিসদৃশ অংশকে অনায়াসে দৃষ্টির অগোচরে রাখা সম্ভব। রঙিন বা নকশা-করা কাপড়, ওয়াল-পেপার, লিনোলিয়াম প্রভৃতি আচ্ছাদন দেওয়ালের উপরে সজ্জিত করিয়া ঘরের আবহাওয়ার স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখা যায়।

দেওয়াল-সজ্জার বিভিন্ন উপকরণ ও তাহাদের বিন্যাস—দেওয়াল-সজ্জার প্রধান উপকরণের মধ্যে রঙ, ওয়াল-পেপার, লিনোলিয়াম ইত্যাদি দ্রব্য, ছবি, ফটো ইত্যাদি, ঘড়ি এবং অন্যান্য টুকিটাকি আসবাবপত্রের নাম করিতে হয়।

রঙ—দেওয়াল-সজ্জার উপকরণের মধ্যে প্রথম নাম করিতে হয় রঙের। গাঢ় রঙ বিরক্তির সৃষ্টি করে। দেওয়ালের রঙ গৃহসজ্জার অন্যান্য দ্রব্যাদির রঙের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ঘরের আলো প্রধানতঃ দেওয়ালে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিভিন্ন আসবাবাদির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। হাল্‌কা নীল, ঈষৎ বেগুনি, সবুজ, ঘিয়ে ইত্যাদি রঙ দেওয়ালের পক্ষে উপযোগী। রঙ পাকা না হইলে চটিয়া যায় এবং ঘষিলে বা জলে ধৌত করিলে উঠিয়া যাইতে পারে। রঙের সঙ্গে তৈল বা এনামেল মিশাইয়া ব্যবহার করিলে তাহা স্থায়ী হয় এবং রঙের ঔজ্জ্বল্যও বহুদিন বজায় থাকে। যেখানে ধুলাবালির আধিক্য সেখানে ল্যাকার (lacquer) বার্নিশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অম্ললেপন-দ্রব্যে (বার্নিশ) যে কোনও দ্রব্যের অথবা স্থানের বাহ্য চাকচিক্য সম্পাদন করা যায়, মসৃণতা বজায় রাখা যায় এবং তাহাতে রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিশেষ করিয়া ল্যাকার বার্নিশের নিজস্ব কোনও রঙ না থাকায় ইহাতে মূল রঙের কোনও ক্ষতি হয় না এবং নকশাগুলির ঔজ্জ্বল্য ইহাতে বাড়িয়া যায়। বার্নিশ-করা ওয়াল-পেপার অনায়াসে ভিজা ন্যাকড়ার সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। সাধারণ-রঙ-করা দেওয়ালে বার্নিশ করাইয়া তাহার উপরে ওয়াল-পেপারের পাড় বা বর্ডার দিলে গৃহে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

দেওয়ালের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জানালার শিকে বা জানালা-দরজার চৌকাঠে রঙ করিতে হয়। ঘরের ভিতর দিকের ছাদের (ceiling) রঙ এবং দেওয়ালের রঙের মধ্যে সমতা বজায় থাকা উচিত। দেওয়ালে রঙ করিয়া ছাদের নিম্নপৃষ্ঠে অর্থাৎ সিলিংএ ফুলের নকশা-যুক্ত ওয়াল-পেপার লাগান যাইতে পারে। সিলিং

উঁচু হইলে কাল, গাঢ় বাদামী, নীল বা সবুজ রঙ ভাল দেখাইবে। অবশ্য দেওয়ালের রঙ উজ্জ্বল না হইলে সিলিংএর রঙ গাঢ় হইবে না। গোলাপী বা অন্য কোনও রঙের চাইতে উচ্চ স্থানে উজ্জ্বল নীল রঙ অনেক বেশী আকর্ষণীয়। দেওয়াল বা সিলিংএর রঙ যদি একই রকমের হয় তাহা হইলে দেওয়ালের রঙই চোখে বেশী প্রতিভাত হয়।

ওয়াল-পেপার, লিনোলিয়াম প্রভৃতি দ্রব্য—সুন্দর-কারুকার্য-করা এবং নকশা-করা ওয়াল-পেপার দেওয়াল-সজ্জার সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। ওয়াল-পেপারে ঘর বড় দেখায় এবং দেওয়ালের খুঁত ঢাকিয়া রাখে। ইহাতে ঘরের আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকে। ঘরের শান্ত স্নিগ্ধ ভাব ওয়াল-পেপারে অটুট রাখা যায়। আধুনিক কালে ওয়াল-পেপারের বহুল প্রচলন হইতেছে। আজকাল বিভিন্ন রকমের এবং নয়নমুগ্ধকর বিভিন্ন রঙিন বা নকশা-চিহ্নিত ওয়াল-পেপার পাওয়া যায়। ছবি এবং অন্যান্য সাজসজ্জা ছাড়া কেবলমাত্র ওয়াল-পেপারেই দেওয়ালের রূপসজ্জা হইতে পারে।

ওয়াল-পেপার লাগাইতে হইলে প্রথমে লাইনিং দেওয়া প্রয়োজন। খুব পাতলা কাপড়ে প্রথমে দেওয়াল আবৃত করিয়া কাপড়ের উপরে ওয়াল-পেপার সজ্জিত করিতে হইবে। এই নিয়মে ওয়াল-পেপার সাজাইলে উহা নষ্ট হয় না এবং প্রয়োজন হইলে আলগাভাবে উহা উঠাইয়া অন্যত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব। এক রকমের ওয়াল-পেপার পাওয়া যায় যাহা জলে নষ্ট হয় না। অবশ্য বেশী জলে ধৌত করিলে বা রগড়াইলে উহার ক্ষতি হইবে। রান্নাঘরে বা স্নানের ঘরের দেওয়ালে এই ওয়াল-পেপার বিন্যস্ত করিলে তাহা ভিজা ন্যাকড়ার সাহায্যে পরিষ্কার করা যাইবে। বার্নিশ-লাগান ওয়াল-পেপার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

প্রত্যেক গৃহের দেওয়ালই ওয়াল-পেপারে সজ্জিত করা যায়। স্পষ্ট রঙের এবং সুন্দর প্যাটার্নের ওয়াল-পেপারে হলঘরের দেওয়াল সাজাইতে হয়। বসিবার ঘরের ওয়াল-পেপার হইবে কারুকার্য-মণ্ডিত এবং নকশা-চিহ্নিত। বসিবার বা খাইবার ঘরের সম্মুখের দেওয়াল দুইটি আলাদা ভাবে সজ্জিত করা যায়। দুই রকমের ওয়াল-পেপার দুই দেওয়ালে সাজান চলে বা এক দেওয়ালে রঙ করিয়া অন্য দেওয়ালে ওয়াল-পেপার বিন্যস্ত করা চলে। রঙ এবং ডিজাইনের বৈপরীত্যে গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব।

রান্নাঘর বা খাবারঘরের দেওয়ালে ওয়াল-পেপার গাঢ় রঙের না হইলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তবে শুধু অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কথা ভাবিয়া মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বা মনের সংযম ও একাগ্রতা নষ্ট করিতে পারে এমন গৃহসজ্জা সন্নিবেশ করা শোভন নয়।

শয়নঘরের দেওয়ালে কি রঙ দিতে হইবে বা কি রকমের ওয়াল-পেপারে উহা সজ্জিত হইবে তাহা গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর রুচির উপরে নির্ভর করে। স্বল্পপরিসর ঘরে ছোট ছোট প্যাটার্নের ওয়াল-পেপার ভাল মানাইবে। ফুলের ডিজাইন করা ওয়াল-পেপার শয়নঘরে এবং খাবারঘরের দেওয়ালে লাগান যায়। দেওয়ালে সাধারণ রঙ থাকিলে উপরের দিকে কার্নিশে ওয়াল-পেপারের বর্ডার লাগাইলে ভাল দেখায়। দরজা বা জানালায় ওয়াল-পেপারের পাড় বা বর্ডার গৃহের পরিবেশ সুন্দর করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। দেওয়াল বা অন্য স্থানের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া অথবা বিপরীত রঙের ওয়াল-পেপার সজ্জিত করিয়া গৃহের শ্রী অনেক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বর্তমান যুগে লিনোলিয়ামের বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে আজকাল যে বিভিন্ন নকশার লিনোলিয়াম উৎপন্ন

হয় তাহা রঙের বৈচিত্র্যে এবং ডিজাইনের সৌষ্ঠবে পৃথিবীর যে কোনও দেশের লিনোলিয়ামের সমপর্যায়ভুক্ত। পূর্বে বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত বলিয়া ইহা ব্যয়বহুল ছিল। বর্তমানে দামের দিক হইতে লিনোলিয়াম অনেকের ক্রয়-ক্ষমতার সীমার মধ্যে আসিয়াছে। মেঝের আচ্ছাদনের জন্য ইহার ব্যবহার বেশী। ক্রমেই অন্যান্য আসবাবের আচ্ছাদন এবং দেওয়ালের আচ্ছাদন হিসাবে ইহার ব্যবহার বাড়িতেছে।

চিত্রাদি—চিত্র সন্নিবেশ, দেওয়াল-সজ্জায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাই বলিয়া এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত ধারায় ছবির প্রাচুর্যে দেওয়াল ঢাকিলে গৃহের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে। পূর্বে চিত্র সন্নিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। নানা প্রকার সরু লতার বর্ডার দিয়া এবং ফ্রেস্কো বা অন্য রকমের পেণ্টিং, আলপনা জাতীয় পেণ্টিং ইত্যাদির সাহায্যে দেওয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।

ঘড়ি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি—দেওয়াল-ঘড়ি শুধু সময়-ঘোষক হিসাবেই নয়, গৃহসজ্জার দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর-নকশা-করা কাঠের অথবা ব্রোঞ্জ জাতীয় বিভিন্ন ধাতুনির্মিত কিংবা পোর্সিলেনের আচ্ছাদনযুক্ত নানা ডিজাইনের ছোট-বড় ঘড়ি দেওয়ালের সৌন্দর্য অনেক গুণ বাড়াইয়া দেয়। ইহা গৃহের মর্যাদার প্রতীক। ঘরের পরিসরের সঙ্গে যেন ঘড়ির আকারের (size) সামঞ্জস্য থাকে। সাধারণ রঙের দেওয়ালে অধিক কারুকার্য-করা ঘড়ি বেমানান।

দেওয়ালের ডিজাইনের সঙ্গে মিল রাখিয়া কারুকার্য-করা ফ্রেমে ঢাকা আয়না ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সিলিংএর উচ্চতার কাছাকাছি পর্যন্ত টাঙান আয়না দেওয়ালের সৌন্দর্যকে উজ্জ্বলতর করে। দেওয়ালের এমন স্থানে আয়না সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে যেন

তাহাতে গৃহের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া যে কেহ নিজেকে প্রতিফলিত দেখিতে পায়। দেওয়াল-আয়না কম দামের হইলে তাহাতে বিকৃতভাবে নিজেকে প্রতিফলিত দেখিয়া সকলেই বিরক্তি অনুভব করিবে।

দুই-চারিটি ভাল ক্যালেণ্ডার জাতীয় ছবি দেওয়াল-সজ্জার উপকরণ হিসাবে রক্ষিত হইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে ক্যালেণ্ডার বা দেওয়ালপঞ্জী ব্যবসায়ীদের প্রচার-কার্যের অন্যতম অবলম্বন। সুতরাং ক্যালেণ্ডার বাছাই করিবার সময় প্রচারের দিক যতটা সম্ভব আড়াল করিয়া রাখা প্রয়োজন। নতুবা ক্যালেণ্ডারের ছবির মূল সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় এবং দেওয়ালের সাজসজ্জার সৌষ্ঠবও ব্যাহত হয়।

তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ইত্যাদি নানা ধাতব দ্রব্যের তৈয়ারী সজ্জাদ্রব্য ; ঘাস, বাঁশ, বেত, তালপাতা, গালা, কাগজমণ্ড (Paper pulp) প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু ; ফলক-চিত্রাদি দেওয়াল-সজ্জার কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিনার কাজ করা বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যের নানা ডিজাইনের প্লেটগুলি দেওয়ালকে সুষমামণ্ডিত করে।

ছোট টবে মানিপ্ল্যাণ্ট এবং ঐ জাতীয় লতা বাহির দিকের দেওয়ালে টাঙাইলে এবং সরু লতার একটি রেখা পর পর দেওয়ালে সাজাইলে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

দুই দেওয়ালের মাঝের কোণটিতে বেতের বা বাঁশের রঙ-করা বা নানা ডিজাইনের ফুলদানি বসাইয়া দিলে দেওয়ালের সৌন্দর্য বাড়িয়া যায়। কাঠের তাকের উপরে নানা সজ্জাদ্রব্য সাজাইয়া রাখা যায়। ঋতু বিশেষে বা উৎসবাদি উপলক্ষে এই সজ্জাদ্রব্যের রকমফের করা যাইতে পারে। এই পরিবর্তনে এক দিকে যেমন বৈচিত্র্য আনয়ন করা যায় অন্য দিকে তেমনি আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টিও হয়।

গৃহসজ্জার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ লইয়া আলোচনা হইয়াছে। উল্লিখিত উপকরণ ছাড়াও অনেক ছোটখাট, টুকিটাকি জিনিসপত্রে গৃহের শোভা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে গৃহের আকর্ষণ বর্ধিত হয় এবং গৃহে সজীব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নিজস্ব রুচি, পছন্দ, সৌন্দর্যজ্ঞান প্রভৃতি ধরা পড়ে এই দ্রব্যসমূহ বাছাইয়ের মধ্যে। প্রয়োজন অনুযায়ী এবং শৃঙ্খলার সহিত এই দ্রব্যগুলি গৃহের বিভিন্ন স্থানে এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন সহজেই গৃহস্থের বুদ্ধিবৃত্তির এবং শিল্পজ্ঞানের পরিচয় উপলব্ধি করা যায়।

এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলিতেই গৃহস্থের পরিকল্পনার ব্যাপকতা, উদ্ভাবনী শক্তির বৈচিত্র্য এবং স্বতন্ত্র রুচির বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হয়। কারণ এই ছোট বা ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বাছাই করা শুধুমাত্র গৃহসজ্জার উপকরণ সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করিয়া সম্ভব হয় না।

এই সংগ্রহ-বাতিক সকলের থাকে না। কৌতূহল বা উৎসাহ থাকিলে স্বল্প মূল্যেও অনেক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহ করিবার সময়ে অবশ্যই ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্যের কথা মনে রাখিতে হইবে। গ্রাম্য জীবনধারার সঙ্গে খাপ খায় এমন দ্রব্য অবশ্যই শহরের প্রাসাদে মানানসই নয়। গৃহের সঙ্গে মিল রাখিয়া রঙ, রূপ, ডিজাইন প্রভৃতির বিচার করিতে হইবে।

এই জিনিসগুলির মধ্যে বই, ঘড়ি, ফুলদানি (flower vases), অন্যান্য কারুকার্য-করা পাত্র, আয়না, পর্দা (Screen partition), বিভিন্ন মূর্তি, খোদাইর কাজকরা জিনিসপত্র, খেলনার জিনিস, নানা তৈজসপত্র, ধাতুপাত্র, গিল্‌টি-করা রেকাবি, বাসন, সোনা-

রূপার পাত্রাদি, ফলক-চিত্র, নানা প্রকার ঝুঁড়ি, বিভিন্ন প্রকারের শাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য দ্রব্যের নাম করা যায়।

বই, মাসিকপত্র, ফটো-অ্যালবাম প্রভৃতি তাকে এমন ভাবে জ্যামিতিক আকারে সাজান যায় যাহাতে গৃহের সৌন্দর্য অনেক
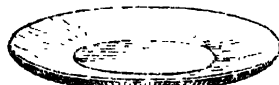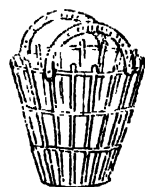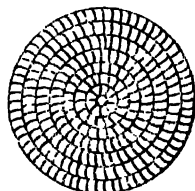
গৃহসজ্জার আনুষঙ্গিক দ্রব্য

গুণ বাড়িয়া যায়। বইগুলি রঙ এবং আকার অনুযায়ী সাজান যাইতে পারে। বড় বড় বই এবং গাঢ় রঙের মলাটযুক্ত বই নীচের তাকে রাখিতে হয়। একই রঙের বই একসঙ্গে রাখা উচিত। বিষয়বস্তু অনুযায়ী বই সাজাইবার প্রশ্ন অবশ্য উঠিতে পারে। সুতরাং

বিভিন্ন রঙের মলাটযুক্ত বইয়ের সমাবেশ করিলে এই কাজটি সহজ হইতে পারে।

ঘড়ি নির্বাচনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বর্তমান যুগে ত্রিকোণ কিংবা বৃত্তাকার কাচযুক্ত এবং বিচিত্র ডিজাইনের ঘড়ি দেখা যায়। পূর্বে ঈগলের ছবি বা কোনও ঐতিহাসিক দৃশ্যের ছবি ঘড়িতে সাজান থাকিত। বর্তমানকালে অল্প-কারুকার্য-করা বা নকশা-বিহীন ঘড়ির বেশী প্রচলন দেখা যায়।

স্ক্রীন

সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান বিচিত্র রকমের আয়না ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা বহুদিনের রেওয়াজ। স্ক্রীন (Screen) জাতীয় পর্দা একদিকে যেমন গৃহের অভ্যন্তরকে আড়াল করিবার জন্য টাঙান হয়, তেমনি নানা কারুকার্যমণ্ডিত নকশা-করা ফ্রেমে আঁটা তিন-চারি ভাঁজ করিবার সুবিধা সহ স্ক্রীন গৃহকে বিভক্ত (Partition) করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় স্ক্রীনের কারুকার্য এবং ডিজাইন রকমারি হইতে পারে। অতীত যুগেও স্ক্রীন জাতীয় পর্দার ব্যবহার ছিল। একই ঘর বসিবার জন্য বা শয়ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইলে স্ক্রীনের সাহায্যে গৃহকে অনায়াসে দুই ভাগ করা যায়। কাঠের জাফরি-কাটা স্ক্রীনের দাম অনেক,
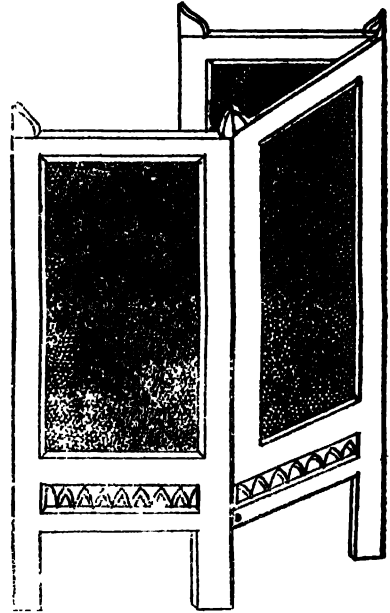
এজন্য কাঠের ফ্রেমে আঁটা চিত্রিত কাপড়যুক্ত স্ক্রীনের প্রচলন সমধিক। স্ক্রীন বেশ বড় এবং সুন্দর প্যাটার্নযুক্ত হওয়া বিধেয়। নানা প্রকার গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি বড় করিয়া স্ক্রীনের গায়ে চিত্রিত করা হয়। সাধারণতঃ বাসগৃহে ৫½ ফুট দীর্ঘ এবং তিন-চারি ভাঁজের স্ক্রীনই ব্যবহারযোগ্য। আবেষ্টনীর বিস্তৃতি অনুযায়ী দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা কমবেশী হইতে পারে। শয়নঘরের বা স্নানের ঘরে আব্রু হিসাবেই স্ক্রীন ব্যবহৃত হয়, এজন্য ইহার রঙ গাঢ় হওয়া প্রয়োজন।

পাথরের, কাঠের, নানা ধাতুর, হাতীর দাঁতের (Ivory), পোর্সিলেনের, প্লাস্টিকের, কাচের, মাটির, বেতের, বাঁশের—এই রকম নানা দ্রব্যের তৈয়ারী মূর্তি, খেলনা, বাসনপত্র, ঝুড়ি ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাচযুক্ত আলমারির ভিতরে এইগুলি সাজাইয়া রাখিলে গৃহের সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়া যায়। অনেকের প্রাচীন এবং দুর্লভ বস্তু (curio) সংগ্রহের বাতিক আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহ না থাকিলে এই সব দুর্লভ বস্তুর দিকে দৃষ্টি পড়িবে না। এইগুলির পিছনে অনেক ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের সত্য লুকায়িত থাকে। ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া কাছাকাছি পাখীর মূর্তি এবং কৃত্রিম (artificial) ছোট গাছপালা কিংবা বিচিত্র রঙ ও আকৃতিবিশিষ্ট নুড়িপাথর সংযোজনা করিলে চমৎকার একটি উদ্যান-পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে।

কাচের পাত্রে শেওলা, শামুক, নানা বর্ণের মাছ রাখিলে গৃহে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জলজ উদ্ভিদ্ এবং মাছ রাখিবার জন্য কাচনির্মিত ক্ষুদ্র জলাশয়কে অ্যাকোয়ারিয়াম (aquarium) বলে।

ছোট ছোট পাত্র বা মূর্তি লেসের ডয়লির (doily) উপরে বেশ মানানসই হয়। বোল (bowl) জাতীয় নানা আকারের পাত্রে

ফুল সজ্জিত করিয়া ফুলদানির মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। নানা ডিজাইনের ছাইদানি (ash tray) আসবাবের উপরে সঠিক স্থানে সজ্জিত করিয়া একই সঙ্গে প্রয়োজন মিটান যায় এবং সৌন্দর্য রক্ষা করা যায়। ছোট ট্রের (tray) মধ্যে ফুল সাজাইয়া কিংবা লেসের ট্রে-ক্লথ বিছাইয়া, ড্রেসিং টেবিলে টেবিল-ম্যাট পাতিয়া, ছোট ছোট রঙ-বেরঙের সামুদ্রিক ঝিনুক ও কড়ি আসবাবের উপরে বা আলমারির ভিতরে সাজাইয়া গৃহসজ্জায় বৈচিত্র্য আনয়ন করা যায়।
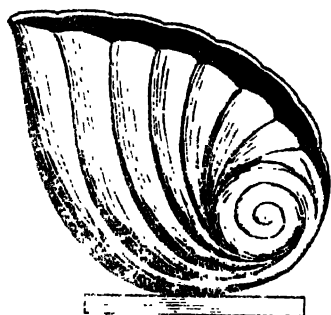
গৃহসজ্জায় শামুক
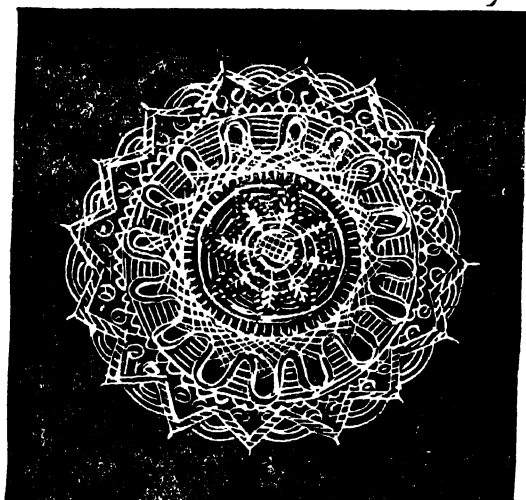
লেসের ডয়লি (doily)

গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে সরল এবং সুন্দর জিনিস রুচিসম্পন্ন

মানুষকে যেমন সহজে আকর্ষণ করে, তেমনি অন্য দিকে অতিরিক্ত জাঁকজমক-ভরা জিনিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টিনিক্ষেপ সম্ভ্রমপূর্ণ
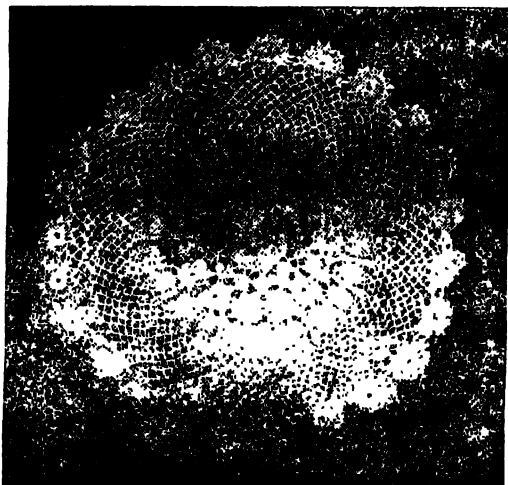
লেসের ডয়লি (doily)

হইলেও রুচিজ্ঞান-সমৃদ্ধ শিল্পপ্রাণ মানুষের মনে নিঃসন্দেহে ইহা বিরাগ সৃষ্টিই করিবে।

আলপনার কথা

আলপনার উদ্দেশ্য—আলপনা বলিতে সাধারণতঃ মাঙ্গল্যচিত্র বুঝায়। আলপনা বা আলিম্পন-প্রথা কবে হইতে প্রচলিত হইয়াছে কিংবা কি ভাবে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহার নির্দিষ্ট ইতিহাস গবেষণা-সাপেক্ষ। বৈদিক যুগেই সম্ভবতঃ আলপনার সৃষ্টি হয়। পুরোহিতগণ যজ্ঞবেদীতে আলপনা দিতেন। আমাদের দেশের অন্তঃপুরবাসিনীরা গৃহসজ্জার সহায়ক হিসাবে বা রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন

শিল্পরীতি গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োগার্থ এবং সংসারে শ্রীময়, পবিত্র ও নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির মানসে সূচীকর্ম, চিত্রাঙ্কন, শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি নানা কর্মের চর্চা করিতেন। গৃহকর্ত্রীর অবসর এই ভাবে সৌন্দর্য ও শিল্পচর্চায় ব্যাপৃত হইত। আলপনা গৃহিণীদের এই শিল্পচর্চারই অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহ।

আলপনা

আমাদের দেশের যাবতীয় শিল্প, সাহিত্য ও কর্মের সঙ্গে ধর্মের ওতপ্রোত সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই দেশের শিল্প ও সাহিত্য ধর্মের প্রভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। পৌরাণিক যে কোনও শিল্পপদ্ধতি দেবদেবীর মূর্তি বা ধর্মের প্রতীক-চিহ্ন, মাঙ্গলিক চিহ্ন ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আলপনাও গৃহকে একাধারে সুন্দর, শিল্পময়, সুষমা-মণ্ডিত করিয়াছে, অন্য দিকে পরিবার-পরিজনবর্গের মঙ্গলার্থ নানা মঙ্গল-চিহ্নের রেখায় রূপকাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন সামাজিক বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অঙ্গন হইতে শুরু করিয়া কুলা, পিঁড়ি, সরা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদি চিত্রিত করিবার মধ্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি এবং মঙ্গল-কামনা দুইই একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। জোড়া মাছ, ধানের ছড়া, শস্যশীষ, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, ঘোড়া বা হাতীর মূর্তি ইত্যাদি চিত্রিত করিয়া সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বা কামনা প্রকাশ করা হয়। জোড়া পদ্ম, প্রদীপ, শঙ্খ

ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া সংসারের মঙ্গল কামনা করা হয়। জল, নৌকা প্রভৃতি রেখাঙ্কিত করিয়া বিদেশী আত্মীয়-স্বজনের গৃহ-প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা করা হয় বা তাহাদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়। নানা লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি চিত্রিত করিয়া সামগ্রিক পবিত্রতা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে আলপনার উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—(১) গৃহপ্রাঙ্গণ, গৃহাভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থান, গার্হস্থ্য নানাবিধ সাজসজ্জার আসবাব-উপকরণাদি আলপনার সাহায্যে সুশ্রী বা সুন্দর করিয়া তোলা ; (২) ইঙ্গিতময় চিহ্ন বা মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি অঙ্কিত করিয়া গৃহে মঙ্গলময় আশ্বাস এবং পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা ; (৩) উৎসব-অনুষ্ঠানে নয়নমুগ্ধকর এবং মনোরম লতা, পাতা, ফুল, নানা মঙ্গলময় প্রতীক-চিহ্ন ইত্যাদি চিত্রিত করিয়া উপস্থিত সকলের মনে আশা-আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করা।

ইহা ছাড়াও আলপনার মাধ্যমে আর একটি বড় কাজ সমাধা হয়। শিশু বয়স হইতে মেয়েরা ঠাকুরমা, মা, দিদিদের সঙ্গে আলপনার রেখা টানিতে যাইয়া গৃহসজ্জা রচনায় হাতে-খড়ি গ্রহণ করে এবং এই ভাবে তাহাদের শিল্পচেতনার উন্মেষ ঘটে।

আলপনার উপকরণ—আলপনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হয় না বলিয়াই সাধারণ দরিদ্র পরিবারের গৃহেও আলপনা চিত্রিত হইয়া থাকে। ঘরের মেঝে, গৃহপ্রাঙ্গণ প্রভৃতি স্থানে আলপনা অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমে সব জায়গাটি ভালরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আলপনার স্থানটি ভিজা নেতায় মুছিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। কোনও দ্রব্যের উপরে কিছু চিত্রিত করিতে হইলে উহার ময়লা ধুলা ঘষিয়া উঠাইয়া ভিজা কাপড়ের প্রলেপ লাগাইয়া তাহা শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। পূর্বেই

আতপ চাউল ভিজাইয়া রাখা দরকার। আর প্রয়োজন হয় জল এবং একখণ্ড পরিচ্ছন্ন বস্ত্রের। আতপ চাউল মিহি এবং মোলায়েম করিয়া পিষিয়া জলে গুলিয়া পিটুলি তৈয়ারী হয়; তাহার পর আঙ্গুলে কাপড়ের টুকরাটি জড়াইয়া বা চাউল-গোলায় নেকড়াটি

আলপনা দেওয়ার পদ্ধতি

ভিজাইয়া দক্ষিণ হস্তের চারিটি অঙ্গুলিতে তাহা চাপিয়া অনামিকার সাহায্যে চিত্র রেখাঙ্কিত করিতে হয়।

সাধারণতঃ আলপনার চিত্র সাদা রঙের হয়। তবে প্রয়োজন মতো রঙে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমনিতে আলপনায় রঙ বা তুলির ব্যবহার করা হয় না। এখানে তুলি হাতের আঙ্গুল, রঙ চাউলের গুঁড়া। কিন্তু বিভিন্ন রঙের প্রয়োজন দেখা দিলে তাহা প্রাকৃতিক বা শস্যজাত দ্রব্যাদির স্বাভাবিক রঙেই রঞ্জিত করা হইত। খড়ির গুঁড়া, কাঠকয়লার গুঁড়া, হরিদ্রার গুঁড়া, লাল ইটের গুঁড়া, আবীর ইত্যাদি আলপনার রঙের জন্য ব্যবহার করা হইত। ঐ সকল গুঁড়া বা চূর্ণ দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর সাহায্যে ছড়াইয়া নানা ফুল, লতা, পাতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক চিত্র চিত্রণ করিবার প্রথাও আমাদের দেশে আছে। ইহাও এক প্রকারের আলিম্পন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষে বিশেষ করিয়া মাঘমণ্ডলের ব্রতে চন্দ্র-সূর্য-তারকাপুঞ্জ এই বিভিন্ন রঙের গুঁড়ায় চিত্রিত হইত। পাল-পার্বণে, ক্রিয়া-কর্মে পূজা-উৎসবে পিঁড়ি, কুলা, সরা, মাটির পাত্র, প্রদীপ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করা হয়। চাউলের গুঁড়া ছাড়াও পঞ্চশস্য, ডাল, কালজিরা, মেথি ইত্যাদি মসলা, খই, ফুল ইত্যাদি নানা উপকরণের সাহায্যে আলপনা দেওয়া যাইতে পারে।

বৈদিক যুগে আলপনার উপকরণ হিসাবে নিম্নলিখিত গুঁড়া ব্যবহৃত হইত—

(১) কাল রঙের জন্য—তুষের ছাই।

(২) সাদা রঙের জন্য—চাউলের গুঁড়া।

(৩) সবুজ রঙের জন্য—বেলপাতার গুঁড়া।

(৪) লাল রঙের জন্য—সিঁদুর।

(৫) হলুদ রঙের জন্য—হলুদের গুঁড়া।

বাংলাদেশের আলপনা—পূর্বেই বলা হইয়াছে আলপনার সাহায্যে গৃহসজ্জার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার পদ্ধতি সুদীর্ঘ প্রাচীনকাল হইতে এই দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কবে হইতে এই অঙ্কন-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইতিহাস সন তারিখ ধরিয়া বলা প্রায় অসম্ভব। তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে উহা আমাদের অন্দর-মহলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের যে কোনও সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্রত-উদ্‌যাপন ইত্যাদি কাজে আলপনার ব্যবহার আবশ্যিক একটি প্রথার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধি, বধূবরণ, যাগযজ্ঞ, চূড়াকরণ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে বা সংস্কার-সাধনে আলপনার রেখা না টানিলে ধর্মীয় আচারকেই যেন লঙ্ঘন করা হয়।

বাংলাদেশের গ্রামে এমন অনেক গৃহিণী আছেন যাঁহাদের নিকটে বিবাহের পিঁড়ি, বৃদ্ধি-চূড়াকরণের সরা-কুলা প্রভৃতি আলিম্পন চিত্রিত করিবার জন্য পাঠান হয় এবং বাদ্য-বাজনা সহযোগে মাছ, মিষ্টি, পান ইত্যাদি ভেট পাঠাইয়া সেই চিত্রিত দ্রব্যাদি বাড়ীতে ফেরত আনিতে হয়। কোনও আর্থিক প্রাপ্তি নয়, শুধু সামাজিক স্বীকৃতিই এই শিল্পকলার একমাত্র পুরস্কার। উৎসব-আনন্দে সবার কাছে প্রশংসা অর্জন এবং প্রাধান্য পাইবার অবকাশ অন্য যে কোনও পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কোনও ঋতুতে সকাল, সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি, শেষরাত্রির যে কোনও মুহূর্তে সযত্নে পিটুলি-গোলার ছবি বা রেখা অঙ্কিত করিয়া পরিপাটিভাবে সকল রীতিনীতি মান্য করিয়া বিভিন্ন ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়-নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, মমতাবোধ প্রভৃতির পরিচয় তো থাকেই, উপরন্তু শিল্পজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের আলপনার মধ্যে শিল্প ও মাত্রা-জ্ঞানের এবং রুচি ও সৌন্দর্যবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া ইহা বাংলাদেশের গৃহসজ্জার আবশ্যিক উপকরণ হিসাবে বা উপকরণের সহায়ক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় পূজা-মণ্ডপ, উৎসব-গৃহের আঙ্গিনা, মন্দিরের প্রবেশপথ প্রভৃতি স্থানে আলপনা অঙ্কনই গৃহের সৌন্দর্য এবং গৃহস্থের রুচিজ্ঞানের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল। তখনকার গৃহসজ্জায় যে দৈন্য ছিল তাহা ঢাকা পড়িত আলপনার সাহায্যেই।

প্রাচীন বাংলার এই আলপনা চিত্রণে সাদা রঙের প্রাধান্যই স্বীকৃত ছিল। এই আলপনায় খুব উচ্চস্থানীয় চিত্রবিদ্যার পরিচয় ছিল না। বিশেষ ধরনের কতগুলি বৃত্তকে অবলম্বন করিয়া,

সোজা এবং বাঁকা রেখার সমন্বয়ে বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের স্বাভাবিক ধর্ম বা আবর্তকে পরিস্ফুট করিয়া, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকিয়া, প্রতীক-চিহ্নের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর ইঙ্গিত করিয়া, দেবদেবীর বাহন জীবজন্তুর ছবি আঁকিয়া, শস্যশীষ, ফুল-লতা-পাতা, মাঙ্গল্য দ্রব্য বা পবিত্র মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে এমন বস্তুর চিত্রাদি অঙ্কন করিয়া আলপনার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইত। এক কথায় তখনকার দিনে আলপনার উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। আধুনিক যুগের মত গৃহসজ্জাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার ব্যাপক বিস্তৃতি তখন ছিল না।

প্রাচীন বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ হইল আলপনা। গুহাবাসী মানুষও গোলাকার গুহার অভ্যন্তরে জীবজন্তুর মূর্তি অঙ্কন করিত। পরে সামাজিক মানুষগোষ্ঠীর বিশেষ নিদর্শন বা প্রতিরূপচিহ্ন (totem) বাসস্থানে বা গ্রামের প্রবেশপথে চিত্রিত করিয়া রাখিত। ভৌতিক বা দৈবিক ভয়-ভীতি দূর করিবার জন্য, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনরক্ষা ও মঙ্গলবিধানের জন্য, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিভিন্ন চিত্রাদি অঙ্কন করিত। এই রীতিনীতিই ধীরে ধীরে আলিম্পনে পর্যবসিত হইয়াছে।

আলিপন বা আলিম্পন অর্থাৎ কোনও রঙ বা রেখা লেপন করিয়া মূর্তি বা ছবি ফুটাইয়া তুলিবার অর্থই আলপনা। বৈদিক যুগে যে যজ্ঞবেদীর উপরে রেখাঙ্কন করিয়া বা জ্যামিতিক রেখা টানিয়া সামাজিক মঙ্গল সূচনার চেষ্টা হইত তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলাদেশেও দেখা যায় অন্য কোন জটিল জ্যামিতিক রেখা গ্রহণ না করিয়া বৃত্তাকার গোল রেখাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মাঘমণ্ডল ব্রতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ব্রতের আলপনায় বিশেষভাবে সমগ্র বিশ্বের একটি ছবিকে যেন

চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে দেখা যায়। বৃত্তাকার রেখাসৃষ্টির এবং প্রতীক-ধর্মিতার এরূপ অপূর্ব সমন্বয় অন্য কোনও ব্রতের আলপনায় এমন সুস্পষ্ট নয়। লক্ষ্মীপূজা, তারাব্রত এবং অন্যান্য আলপনায় এই বৃত্তাকার রেখাঙ্কনের প্রাধান্যই দেখা যায়।

ইহা ছাড়া বাংলাদেশের আলপনার আর একটি দিকও লক্ষ্য করিবার মত। সামান্য উপকরণের সাহায্যে অলঙ্কারবিহীন দৃশ্যবস্তুর
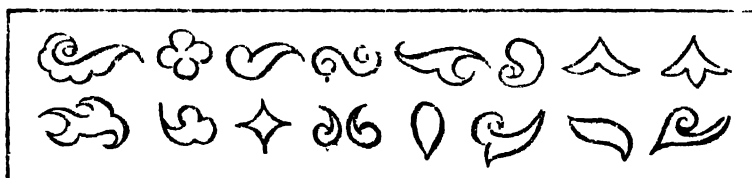
আলপনায় অলঙ্করণ
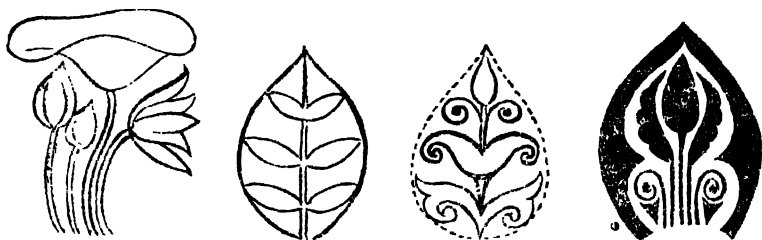
আলপনায় বিভিন্ন নকশা

চিত্রণ অন্যত্র এমন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে শুরু করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র আলপনার অবাধ গতি। ইহার শিল্পচাতুর্য বা শোভামাধুর্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যরূপকে আশ্রয় করিয়াই পরিবর্ধিত। জটিলতা-বিহীন এই শিল্পচর্চায় বাংলার মেয়েদের শিক্ষা কোন বিশেষ বিদ্যালয় হইতে অর্জিত নয়। ঠাকুরমা, দিদিমার নিকটে ছোটবেলায় শিক্ষানবিসি করিয়া গতানুগতিক শিল্পরীতিকেই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে

বাংলাদেশের গৃহিণীরা। গৃহ-প্রসাধনের এই বিশেষ প্রথায় পুরুষের কোন স্থান নাই বলিলেই চলে। কলমিলতা, কলাগাছের মোচা, লক্ষ্মীর আসনের শঙ্খ, দীর্ঘিকার বিকশিত পদ্ম, গ্রামাঞ্চলের রকমারি ফুল, লতাপাতা, ধানের ছড়া, শস্যশীষ, উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির নানা

আলপনায় পাখী

ছবি, বিস্তৃত আকাশের রবি, শশী, তারা, দৃশ্য, পশুপাখী, নদী, নৌকা, জল, মৎস্য ইত্যাদি সব কিছুই আপনার রেখায় মূর্ত হইয়া উঠে। ঐশ্বর্য-কামনা, নিরাপত্তার চিন্তা ইত্যাদি সব কিছু সরল এবং সহজ গার্হস্থ্য জিনিসপত্রের মাধ্যমে প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে বাংলাদেশের

নানা ব্রত-পার্বণের আলপনায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মাঘ-মণ্ডলের ব্রতে তাই চিত্রিত দেখি ঘর, ঝাঁপি, গহনা, হাতী, ঘোড়া, আয়না, চিরুনি, আরও কত কিছু। ইচ্ছার চরিতার্থতার নিমিত্ত
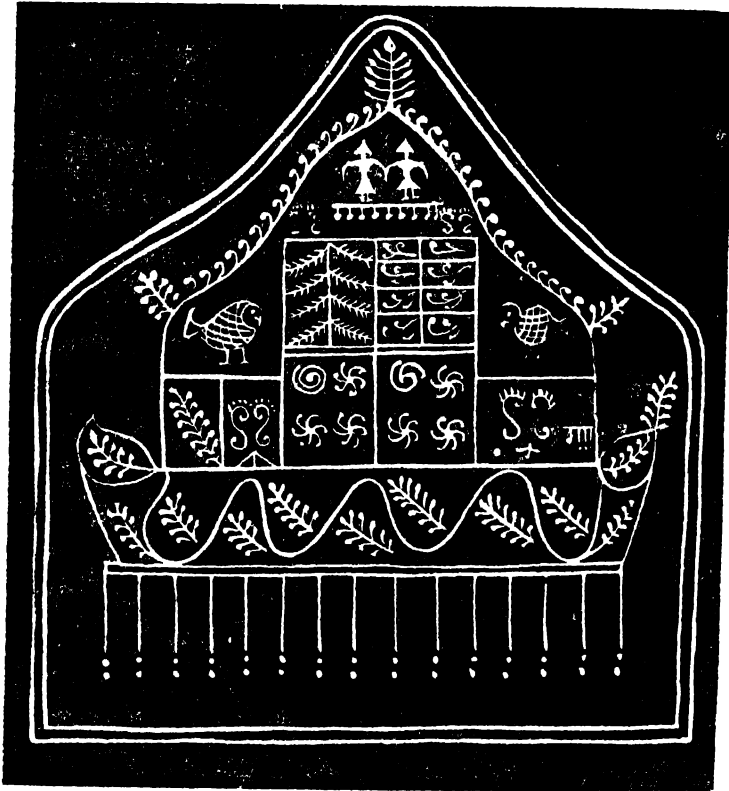
লক্ষ্মীপূজার আলপনা

কল্পতরু অঙ্কন করিতেও দেখা যায়। লক্ষ্মীপূজার দিনে ধানের ছড়া, শস্যশীষ, পায়ের ছাপ ইত্যাদি অঙ্কিত না হইলে যেন উৎসবের বিশেষত্বই নষ্ট হইয়া যায়। মাঙ্গল্য কর্মে শঙ্খ বা পদ্ম চিত্রিত

না হইলে মঙ্গলকর্মও যেন বিঘ্নিত হয়। আধুনিক যুগে আলপনার প্রচলন ব্যাপকতর হইয়াছে। পূর্বে যেমন ধর্ম-উৎসবে বা সামাজিক অনুষ্ঠানেই মাত্র আলপনার ব্যবহার ছিল, বর্তমানে ইহা নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ-প্রসাধনের অংশ বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান যুগে বাংলাদেশে লোক-সংস্কৃতি, লোক-গাথা, লোক-সঙ্গীত, লোক-শিল্প প্রভৃতি সবকিছুই নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে এবং সংস্কৃতরূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। বাংলাদেশের আলপনায় গবেষণার স্থান ছিল না। অনুসরণ ছাড়া স্বাধীন চর্চার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই এবং এই শিল্পের স্থায়ী কোনও নিদর্শন সংরক্ষণে কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই। নতুবা অজন্তা, ইলোরা বা উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন চিত্রকলার সঙ্গে পাশাপাশি আসন গ্রহণ

উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে খোদিত চিত্র

করিবার যোগ্যতা ইহার ছিল। একমাত্র সৌভাগ্য এই সচল লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ হিসাবে একই ধারার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও ইহা আজও আমাদের সমাজ-জীবনে বাঁচিয়া আছে। বাংলাদেশের গৃহিণীদের নিকটে ইহা গর্বের সামগ্রী নিঃসন্দেহে এবং আলপনা আজও বাঁচিয়া থাকিবার পিছনে বাংলার মেয়েদের অবদান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের সদা ক্রিয়াশীল শিল্পরুচির অপূর্ব বিকাশ এই পদ্ধতির মধ্যে প্রমাণিত।

আলপনা সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক, শোভাবর্ধক এবং অপ্রাকৃত (non-realistic) শিল্প। ইহা ফটোগ্রাফিক নয়। ইহাতে দৃশ্য, আলো, ছায়া সবকিছুই কল্পনাশ্রিত হইয়া ভিন্নরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ঠিক যেমনটি আমরা পৃথিবীর দৃশ্য বস্তু দেখি তেমন করিয়া ইহা চিত্রিত হয় না। ইহা সম্পূর্ণ কল্পনাময় কারুশিল্প।

বাংলাদেশের আলপনার রূপ খানিকটা বাস্তবাশ্রয়ী হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতার অনুগ হয় নাই। ঠিক যেমন ভাবে প্রকৃতির রূপটি দেখা যায় তাহাই যথাযথভাবে ফোটান শিল্পীর কাজ নয়। সৃষ্টিই দক্ষ শিল্পীর জীবন-ধর্ম। এই রূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কখনও অমূর্ত ভাবব্যঞ্জনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, আবার কখনও অলঙ্করণের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অলঙ্করণের মাধ্যমে বাস্তবকে আরও ইঙ্গিতময় বা স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশিত করাই মণ্ডন নামে আখ্যাত। মণ্ডন অর্থ এক দিকে নূতন সৃষ্টি, অন্য দিকে অলঙ্করণ।

অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া কোনও বস্তুর রূপে নূতনতর ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই মণ্ডন-শিল্পের কাজ। এই কারণেই আলপনার অন্য নাম মণ্ডন-শিল্প। কলস বা পদ্ম আঁকিতে যাইয়া এখানে ভিন্নতর একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিভিন্ন বস্তুর রূপ অলঙ্করণের নিমিত্ত অন্য একটি ভাবধারা লইয়া লতানো রেখায় রূপান্তরিত হয়। কোন একটি বস্তুর গঠনে বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ কোনও প্রাকৃতিক জিনিসের রূপ মণ্ডন বা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা আলপনার স্বাভাবিক রীতি।

মাঘমণ্ডল বা তারা ব্রতের (মাঘমণ্ডলের ব্রতে গুঁড়ার ব্যবহার করা হয়, ইহা সকালবেলার ব্রত। তারাব্রতে গুঁড়া এবং পিটুলি

দুইএর সাহায্যেই আলপনা অঙ্কিত হয়। . ইহা সন্ধ্যাবেলার ব্রত।.) আলপনায় এক দিকে সূর্য, অন্য দিকে চন্দ্র অঙ্কিত হয়; মাঝে থাকে বৃত্তাকার বিশ্বমণ্ডল। এই বৃত্তের অন্তস্থলে আকাশের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে মেঘের ভাব সামান্য কয়েকটি লতানো রেখায় চিত্রিত করা হয়। তেমনি পদ্মের সঙ্গে দুই-চারিটি রেখায় দীঘির জল দেখান হয়। আবার নৌকা দেখাইয়া তাহার সঙ্গে নদীকে ভিন্নরূপে মণ্ডন হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। বাস্তবের সঙ্গে অলঙ্কারের এই সংমিশ্রণ যেমন মেঝে, দাওয়া, প্রাঙ্গণ, মণ্ডপ প্রভৃতি বিস্তৃততর স্থানের আলপনায় পরিস্ফুট, তেমনি দরজা, জানালা, খিলান, কার্নিস প্রভৃতিতে বা বিভিন্ন দ্রব্যাদির উপরিভাগে আলপনা চিত্রিত করিবার প্রাক্কালে লতাপাতা অথবা অন্যান্য প্রতীক-চিহ্নের সূক্ষ্ম কাজে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর রূপ এইখানে বাস্তবতা লইয়াই সপ্রকাশ। কেবলমাত্র শিল্পী এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বীয় মনের সৃষ্টিশীল রুচি এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তার সংযোগ ঘটায়। এই সকল শিল্পকার্যে মেয়েদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, প্রাণের সজীবতা এবং বাস্তবের সংস্পর্শ স্বাভাবিকভাবেই একত্রিত হইয়াছে।
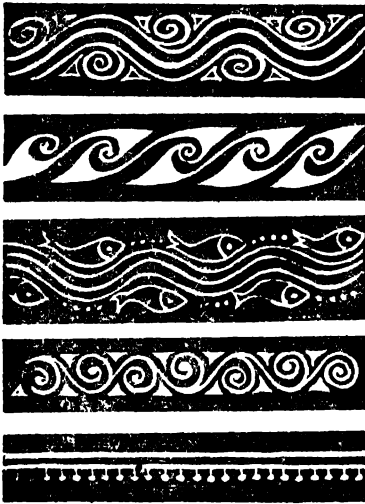
আলপনায় বিভিন্ন লতা

বাংলাদেশের আলপনায় শ্বেতবর্ণের প্রাধান্যই বেশী। শুভ্রতা

পবিত্রতা এবং শুচিতার প্রতীক। মাঙ্গল্য কর্মে সাদা রঙের পদ্ম, শঙ্খ, মৎস্য ইত্যাদি শোভা পায়।

এতদিন বাংলাদেশে আলপনার রূপ এবং ছন্দে বিশেষ শিক্ষাভ্যাসের স্থান ছিল না। অবশ্য আলপনা অঙ্কনের শুরুতে হাত চালান শিক্ষার নিমিত্ত সহজভাবে কতগুলি সরু বা মোটা রেখা এদিক ওদিক টানিয়া পরে বৈচিত্র্যের দিকে অগ্রসর হইত। ছবিতে এই প্রাথমিক পর্যায়ের আলপনা দেখান হইয়াছে। সোজা-ভাবে, মাপজোখ না করিয়া, ছন্দ বজায় রাখিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর হাত চালান বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ক্রমে হাত ঠিক হইয়া গেলে নকশা অঙ্কন বা সৌন্দর্য-সৃষ্টির দিক ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হয়।

বর্তমানে আলপনা শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন কলাকেন্দ্রে বা শিল্প-শিক্ষণালয়ে আলপনা সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আলপনার প্রচলন বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইলেও বাংলাদেশে যেমন অন্তঃপুরে তেমনি আধুনিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ইহার প্রচলন অব্যাহত রহিয়াছে। বরং এই লোকশিল্পটি আরও বৈচিত্র্য এবং সজীবতা লইয়া নূতন জীবন লাভ করিতেছে।

বাংলাদেশে আলপনার এই নবজীবন দান করিবার মূলে শান্তি-নিকেতনের দান অপরিসীম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এবং উৎসাহে শান্তিনিকেতনে এই শিল্পটি গঠন-বৈশিষ্ট্যে, নূতনত্বে এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

বাংলার এই লোকশিল্পটি বর্তমানে বহু গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলাদেশে এখন শুধু বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানেই নয়, সাংস্কৃতিক উৎসবেও আলপনার ক্ষেত্র প্রসারিত। নূতনতর পরিকল্পনায় আলপনার রূপ এখন পরিবর্তিত হইয়াছে। শিল্প উন্নত

বা আধুনিক রুচির উপযুক্ত না হইলে তাহা গৃহসজ্জার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই আধুনিক যুগে বাংলাদেশে তুলি ও রঙ আলপনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সাবেক কালের আলপনার ধারায় নিত্য নূতন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে সংযোজিত হইতেছে।

আলপনাকে বহুবর্ণে চিত্রিত করিবার পথ শান্তিনিকেতনের শিল্পীরাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তুলির সাহায্যে সূক্ষ্মরেখার বিন্যাসও আধুনিক বাংলার আলপনার বৈশিষ্ট্য। আলপনার বিভিন্ন নকশা এখন দেওয়াল-সজ্জা, আবরণ-সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন প্রভৃতিতে গৃহীত হইতেছে। আজ তাই অন্য প্রদেশের আলপনা যখন বৈচিত্র্য এবং নূতনত্বের অভাবে মৃতপ্রায়, বাংলাদেশ তখন পুরাতন পদ্ধতি ও কলাকৌশলের সঙ্গে আধুনিক শিল্প-রীতির সংমিশ্রণ করিয়া এই সর্বজনপ্রিয় লোকশিল্পটিকে প্রসারিত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। আলপনা এখন বাংলাদেশের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানেই সাজসজ্জার অঙ্গ হিসাবে চিরস্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের আলপনা—বাংলাদেশের আলপনায় যেমন শ্বেতবর্ণের প্রাধান্য, দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্য সমূহে তেমনি আলপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন রেখা সমূহের সমষ্টি বা রঙ-রেখাবলী হইতে এই আলপনা-পদ্ধতির নাম হইয়াছে রঙোলী বা রঙ্গোলী। চাউলের গুঁড়া বা খড়ির গুঁড়ার সাহায্যে যে আলপনা হয় তাহাকে বলে কলম্ (kolam)। এইসব আলপনায় বাংলাদেশের আলপনার মত লতাপাতা বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর তেমন প্রচলন দেখা যায় না। শুধু সহজ সরল বৃত্তরেখার মধ্যেই এই আলপনার পরিণতি শেষ হইয়া যায় নাই। জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশা এই আলপনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

দক্ষিণ ভারতের আলপনা শুধু ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইহা ঐ রাজ্য সমূহের জনসাধারণের গৃহ-সজ্জার একটি অপরিহার্য উপকরণ।

আলপনায় জ্যামিতিক নকশা (১)

এই রঙ্গোলী প্রথায় প্রথমে অবশ্য সাদা চাউলের গুঁড়ায় রূপের বা আকৃতির রেখা অঙ্কিত হয়; তারপর চারিদিকে নানা রঙ লাগাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন রঙের সমন্বয় সাধন এই আলপনা-পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় মাটিতে আলপনার রেখা টানিয়া শুষ্ক রঙে তাহা চিত্রিত করা হয়। শুষ্ক রঙের গুঁড়া ব্যবহার দক্ষিণ ভারতের আলপনার একটি লক্ষণীয় বিষয়। কাঠকয়লা, ইট, চুন, খড়ি, চাউল, ডাল প্রভৃতির গুঁড়া রঙ্গোলীর নকশাকে বিচিত্রতর করিয়া তোলে। মেঝেতে বা প্রাঙ্গণে এই গুঁড়া রঙ ব্যবহার করা হয় এবং দরজা, জানালা, সোপানশ্রেণী ইত্যাদি চিত্রিত
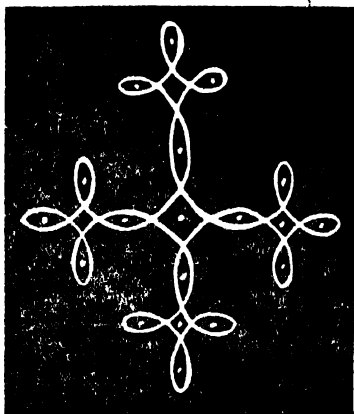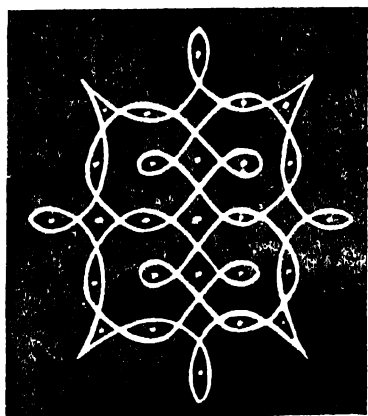
আলপনায় জ্যামিতিক নকশা (২)

করিতে গোলা রঙ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার উপরে একটি সচ্ছিদ্র নকশা-কাটা কাগজ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিভিন্ন রঙের গুঁড়া বা আবীর জাতীয় শুষ্ক রঙ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই রঙ জলে পড়িয়া ভাসমান রঙ্গোলীর সৃষ্টি হয়।

গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের জনসাধারণ রঙ্গোলী বা আলপনাকে বিশিষ্ট লোকশিল্পে পরিণত করিয়াছে। সাধারণতঃ কলম্ বা রঙ্গোলীর সমতল স্থানটিকে ধৌত করা হয়। ঝাঁটার সাহায্যে জল সরাইয়া মাটি একটু ভিজা থাকিতেই গুঁড়া রঙের ব্যবহার করা হয়। জমি শুষ্ক হইলে গুঁড়া বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে বলিয়াই এই ব্যবস্থা। সেই সব রাজ্যে কলম্ বা রঙ্গোলী দেখিলেই বোঝা যায় গৃহস্থের সবাই কুশলে আছে।

উড়িষ্যার আলপনা—উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরগাত্র লক্ষ্য করিয়া অনায়াসেই কল্পনা করা যায়, অতীতকালে এই প্রদেশে আলপনা বা মণ্ডন-শিল্পের স্থান কত উচ্চে ছিল। শিল্পচর্চায় কলিঙ্গ ধারার একটি বিশেষ স্থান আছে। গৌড়ীয় শিল্পরীতির সঙ্গে এই ধারার যোগাযোগ সুস্পষ্ট। উড়িষ্যার অজস্র ভগ্নপ্রায় দেউলগাত্রে, কোনারকের মন্দিরে যে ভাস্কর্যের নিদর্শন রহিয়াছে তাহা কলিঙ্গ প্রদেশবাসীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। তবে এই প্রাচীন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি বা আলপনা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। উড়িষ্যার পট্টকুম্ভের নকশা, হংসলতা, সাদাডালি, বক্রডালি, ফুলডালি, পত্রলতা প্রভৃতি আলপনা বিশেষভাবে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উড়িষ্যার গ্রামের সাধারণ পর্ণকুটীরে আজও আলপনা চিত্রিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রসার বাংলাদেশের মত নয়। চর্চার অভাবে

উড়িষ্যার এই উন্নত লোকশিল্পটি অবলুপ্তির পথে আগাইয়া যাইতেছে।

উড়িষ্যার আলপনায় বাংলাদেশের মতই লতাপাতার নকশা এবং জ্যামিতিক রেখার সংমিশ্রণ দেখা যায়। রেখা এখানে পরিবেশ সৃষ্টি করে বা মণ্ডনের কাজ করে। ফুল, পাতা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তু, পাখী, মানুষ ইত্যাদিও লতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কোথায়ও ভিত্তির উপরিভাগে জীবজন্তুর ছবি থাকে। উপরে অন্যান্য পত্রপুষ্প-শোভিত লতার সমাবেশ দেখা যায়। চারিপাশে জ্যামিতিক রেখা বা বিন্দুর সারি সারি মাল্য থাকে। ইহাই মালী নামে খ্যাত হইয়া থাকে।

শুধুমাত্র উড়িষ্যা নয়, উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও আলপনার চর্চা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। উৎসাহ এবং শিক্ষার অভাবে বর্তমানে ইহা মৃতপ্রায়। উপযুক্ত শিক্ষাভ্যাস এবং গবেষণার সাহায্যে এই লোকশিল্পটিকে উজ্জীবিত করিবার দায়িত্ব সবাইকে গ্রহণ করিতে হইবে।

পুষ্পবিন্যাস

গৃহসজ্জায় পুষ্পবিন্যাসের স্থান—ফুল পছন্দ করে না এমন লোক কমই আছে। প্রকৃতির কোলে বসবাস করে যে আদিবাসী রমণীরা তাহাদের খোঁপায় পর্যন্ত কৃষ্ণচূড়া বা পলাশ পুষ্প শোভা পাইয়া থাকে। প্রাচীনকালেও পুষ্পমাল্য এবং পুষ্পালঙ্কারে পুরনারীগণ ভূষিতা হইতেন। শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয় বাটন-হোলে ফুল গুঁজিয়া দিতে বা পত্রগুচ্ছবেষ্টিত গোলাপ হাতে রাখিতে অভ্যস্ত শৌখিন পুরুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে বিরল নয়। সমাজবদ্ধ মানুষ

মাত্রই পুষ্পবিন্যাসের প্রতি সহজাত আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, শুধু মাত্র ঠাকুরঘর বা পূজা-বেদীতেই পুষ্পমাল্য শোভা পায় না। বসিবার ঘর, শয়নঘর, পড়িবার ঘর প্রভৃতি সকল স্থানেই ফুল, ফুলের তোড়া বা মাল্য সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

পত্রসহ পুষ্পসজ্জা

ফুলের প্রতি আকর্ষণের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। অন্যান্য গৃহসজ্জার বা প্রসাধনের উপকরণ মনুষ্যসৃষ্ট। প্রকৃতির দান হিসাবে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মর্যাদা সমধিক। কৃত্রিমতার মধ্যে প্রকৃতিজ সজ্জাদ্রব্যের সংযোজন গৃহ-প্রসাধনের গুরুত্ব অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়। ফুলের বর্ণ এবং গন্ধ মনকে আমোদিত করে, মনের মালিন্য বিদূরিত করে। পুষ্পগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মানুষের মন বিশ্বপ্রকৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। গৃহসজ্জায় পুষ্পবিন্যাস মানুষের প্রকৃতি-প্রিয়তার লক্ষণকে পরিস্ফুট করে। জীবনযাত্রার একঘেয়েমি, মনের বিরক্তি, গ্লানি প্রভৃতিকে দূর করিয়া পুষ্পস্তবক অনায়াসে মানুষের দেহ-মনে নির্মল শুচিতা এবং মুক্ত আনন্দের সূচনা করে। এইজন্যই গৃহসজ্জায় পুষ্পবিন্যাসের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা শুধু গৃহের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, মানসিক অনুভূতির ক্ষেত্রে বা চিত্তে স্ফূর্তির উদ্‌বোধনে ইহার প্রভাব অসীম।

পুষ্পবিন্যাসের বিভিন্ন ধারা—পুষ্পবিন্যাসের জন্য বিশেষ কতগুলি নিয়ম আমাদের অনুধাবন করিতে হয়। আবার কি ভাবে পুষ্প-

বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহপরিবেশ সুন্দর এবং মনোরম হইয়া উঠিতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঘরের কোন্ কোণে, কোন্ স্থানে কিরূপ আধারে পুষ্প সংরক্ষিত হইবে তাহা, আগে বিবেচনা করিতে হইবে। একটি বড় ফুল কি পুষ্পস্তবক সাজাইবে, ডাঁটাসহ কয়েকটি ফুল কি পত্রবেষ্টিত তোড়া রাখিবে, বিকশিত পুষ্পসহ গোটা গাছটিকে টবে করিয়া অলিন্দ বা চাতালের পাশে রাখিবে, কি জানালার বাহিরে যেখানে দৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবে নিবদ্ধ হয় সেখানে ফুলের বাগান করিবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। কি ধরনের ফুল কি ভাবে বিন্যাস করিতে হয়, কোন্ ফুল কখন বিকশিত হয়, কোন্ ফুলের কি রঙ, কি ধরনের পাত্রে বিশেষ বিশেষ ফুল মানানসই হয়, গৃহের গঠনের সঙ্গে ফুলদানি, টব ইত্যাদির আকারের সম্পর্ক ইত্যাদি লইয়া বিশেষ পর্যালোচনা করা উচিত।

পুষ্পসজ্জায় কাচের ফুলদানি
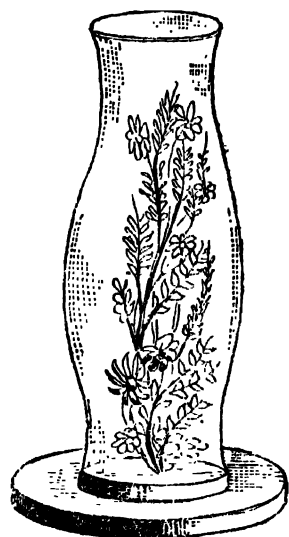
ব্যবহারিক জ্ঞান বা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে পুষ্পবিন্যাস করিয়া গৃহকে শ্রীমণ্ডিত করা প্রায় অসম্ভব। অন্যান্য সজ্জাদ্রব্য বা আসবাবপত্র প্রথম শ্রেণীর বিপণী হইতে ক্রয় করা যায় অথবা সুদক্ষ মিস্ত্রীর বা কারিগরের দ্বারা নিজের ইচ্ছামত তৈয়ারী করান যাইতে পারে। ক্রয়ক্ষমতা বা আর্থিক সঙ্কুলান থাকিলে পছন্দমত আসবাব বা অন্যান্য সজ্জাদ্রব্য ক্রয় করা বা সংগ্রহ করা সুকঠিন কাজ নয়। কিন্তু মানুষকে নিজের রুচি বা সৌন্দর্য-

জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করিয়া স্বীয় প্রচেষ্টায় দৈনন্দিন পুষ্পবিন্যাসের কাজ সমাধা করিতে হয়।

আলিম্পন বা আলপনার মতই পুষ্পবিন্যাস আপন খুশির খেয়াল। ইহার শিক্ষাও গৃহীত হয় সহজাত প্রবৃত্তি হইতে বা পরিবেশগত অভিজ্ঞতা হইতে।

গৃহের সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া পুষ্পবিন্যাস করা হইয়া থাকে।

* পুষ্পদান বা ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া বিভিন্ন গৃহে সংস্থাপন।
* অলিন্দ, চাতাল, গৃহের প্রবেশপথ, ছাদের কানিস বা জানালার সম্মুখভাগ প্রভৃতি স্থানে পুষ্পসহ ফুলের চারা বিভিন্ন আকারের টব (tub) জাতীয় পাত্রে স্থাপন।
* জানালার অদূরে বা গৃহে বসিবার স্থান হইতে দেখা যায় এমন স্থানে, শয়নঘরের কাছাকাছি অঞ্চলে ছোট পুষ্পোদ্যান রচনা।
* পাত্র ব্যতিরেকে শুধু পুষ্প বা পুষ্পমাল্য ফটো, মূর্তি বা দেওয়ালের অংশবিশেষে বিন্যাস করিয়া গৃহপ্রসাধন।

ফুলদানির কথা তোমরা আগেই পড়িয়াছ। মাটির, চীনামাটির, প্লাস্টিকের, কাচের, ধাতব দ্রব্যের, বেত বা বাঁশের ইত্যাদি নানা দ্রব্যের সাহায্যে ফুলদানি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

পুষ্পস্তবকের উচ্চতা ফুলদানির উচ্চতা হইতে দেড়গুণ বেশী হওয়া উচিত। অবশ্য ইহা লম্বা গড়নের ফুলদানির পক্ষে প্রয়োজন। ফুলদানি নীচু বা চেপ্টা হইলে পুষ্পস্তবকের বেড় ফুলদানির বেড় হইতে দেড়গুণ বেশী বিস্তৃত হওয়া উচিত। নীচু ফুলদানিতে পুষ্প-স্তবকের এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ লতাপাতার দ্বারা আবৃত

করা যাইতে পারে। মনে রাখা দরকার যাহাতে ফুলদানির আকার এবং অবস্থানের সঙ্গে ফুলের রঙ বা পুষ্পস্তবকের আকৃতির সামঞ্জস্য থাকে, অর্থাৎ যে কক্ষে পুষ্পবিন্যাস করিবে সেখানকার স্থান, সেই কক্ষের গঠন, বিস্তার প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে। ঘরে যে আসবাব-উপকরণ সমূহ সাজানো হইয়াছে সেই-গুলিকেও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। ঘরের কোন্ স্থানে, কোন্ আসবাবের উপরে কি ভাবে ফুলদানি রাখিতে হইবে তাহার বিচার করিতে হইবে।

পুষ্পসজ্জা

সর্বশেষে আসে পুষ্পের কথা। কক্ষটির আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পুষ্প নির্বাচন করিতে হইবে। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে সাদা বা ফিকে রঙের ফুল নির্বাচিত হওয়া দরকার। নির্মল পরিবেশ রচনায় শ্বেতবর্ণের পুষ্পস্তবকই প্রশস্ত। গন্ধও যাহাতে অত্যধিক উগ্র না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে
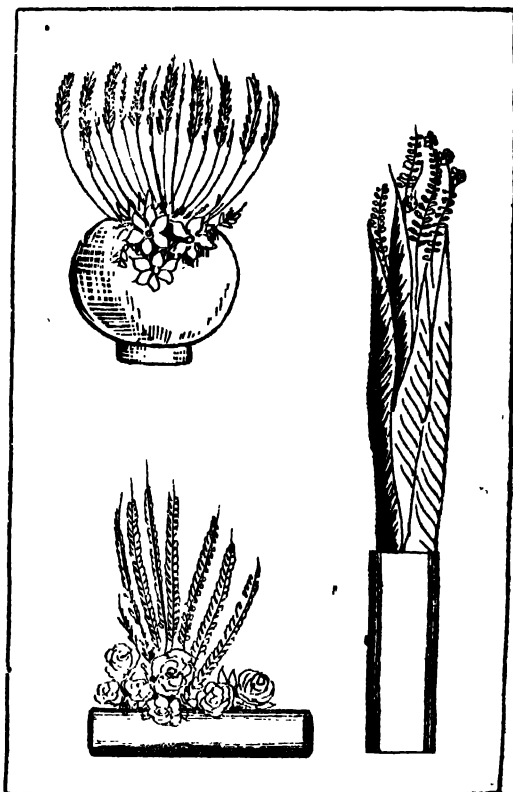
হইবে। রজনীগন্ধা, জুঁই, বেলা, কেয়া, গোলাপ ইত্যাদি ফুলই গৃহপ্রসাধনের উপযুক্ত।

উৎসব-অনুষ্ঠানে আতিশয্য প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ-ভাবে ফুলের পরিমাণ যেন অত্যধিক না হয় এবং সামাজিক রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেখানে সেখানে ফুল গাদা করিয়া রাখিলে মাত্রাজ্ঞানের অভাবই সূচিত হয়।

ছবির বা মূর্তির দুই পাশে বা সম্মুখভাগে একই রকমের দুইটি ফুলদানিতে একই আকারের একজাতীয় ফুল বা পুষ্পস্তবক রক্ষিত হইতে পারে। গুণিজন বা মনীষিবৃন্দের ছবির বা আবক্ষ মূর্তির সন্নিকটে রজনীগন্ধা বা শ্বেতবর্ণের পদ্ম, বড় গোলাপ ইত্যাদি রাখিয়া পড়িবার ঘরে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব। ইহাতে চিত্ত প্রফুল্ল থাকে এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশ সহজসাধ্য হয়।

ঠাকুরঘরে বা উপাসনা-কক্ষে পদ্মফুল, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, বড় গাঁদাফুল ইত্যাদি (যে ঋতুতে যেমন সম্ভব) সংগ্রহ করিয়া ফুলদানিতে সাজাইতে হয়। অবশ্য রজনীগন্ধা ইত্যাদি ফুলগুলি বার মাসই সংগ্রহ করা সম্ভব। ছোট ফুল সুষ্ঠুভাবে ছড়াইয়া দিতে হয়। যেমন বেলা, অপরাজিতা, শেফালিকা, টগর, ছোট আকারের চাঁপা জাতীয় ফুল ইত্যাদি জ্যামিতিক রেখার মত সাজাইয়া সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হইতে পারে এবং হৃদয়ে শান্ত কোমল ভাব আনয়ন করা যায়।

শয়নঘরে জুঁই, রজনীগন্ধা, বেলা বা মল্লিকা ইত্যাদি সুগন্ধ ফুল ফুলদানিতে সাজান যায়। ফুলের গন্ধে মন শান্ত ও স্থির হয় এবং মস্তিষ্ক দুশ্চিন্তামুক্ত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করে।

বসিবার ঘরে আসবাব-সংস্থাপনের প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যক্তিগত রুচিকে এখানে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। নিজের প্রবৃত্তি বা রুচির প্রকাশ যেমন স্বচ্ছন্দ হইবে, অন্যের পছন্দকেও

সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। অন্ততঃ বসিবার ঘরের আসবাব-উপকরণ ইত্যাদি সজ্জার প্রসঙ্গে রুচি-বৈচিত্র্য যাহাতে কখনই গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ নিত্য নূতন অতিথির সমাগমে সেখানকার জীবনপ্রবাহ সচল। পরিবর্তনশীল রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ সেখানে সর্বদাই কার্যকরী। স্বচ্ছলতার প্রকাশও সেখানে স্বাভাবিক কারণেই ঘটে। সুতরাং বাহিরের ঘরে শুধুমাত্র দেশজ পুষ্পই নয়, বিদেশী বা নানা বিলাতী পুষ্পসম্ভারও সেখানে থাকিবে। আজকাল আমাদের দেশেই ঐসব বিলাতী ফুলের চাষ হইয়া থাকে। বিভিন্ন নার্সারীতে (যেখানে ফুলের বীজ বা চারা লালন করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়) নানা ঋতু-পুষ্পের এবং বিদেশী ফুলের চাষ হইতেছে।

নীচু ফুলদানিতে পুষ্পস্তবক

আজকাল ডালিয়ার খুবই প্রচলন দেখা যায়। 'শহর অঞ্চলে গৃহসজ্জায় বিভিন্ন রঙের এবং বিভিন্ন আকারের ডালিয়ার এখন বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জিনিয়া, ক্রিসেন্থিমাম, সূর্যমুখী, বিভিন্ন রকমের গোলাপ ইত্যাদি ফুল এবং রকমারি ঋতুপুষ্প গৃহসজ্জার পক্ষে উপযোগী।

শীতপ্রধান দেশের ফুলের বৈশিষ্ট্য হইল বর্ণ এবং রূপের সমাবেশ। সাধারণতঃ সুগন্ধ ফুল গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বেশী পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পুষ্পে সাদা রঙের বাহারই বেশী। শ্বেত এবং সুগন্ধ পুষ্প আমাদের দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া

গৃহসজ্জায় সাদা রঙের আতিশয্য আমাদের মন বেশী মুগ্ধ করে। আমাদের নিকটে শ্বেত পুষ্প পবিত্রতা এবং শুচিতার প্রতীক। অধিকাংশ দেব-দেবীর আরাধনায় যে ফুলগুলির ব্যবহার দেখা যায় তাহার বেশী ভাগই সাদা রঙের। বিবাহাদি অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক উৎসব, সামাজিক সমাবেশ—প্রত্যেক স্থানেই সাদা ফুলের সমারোহ আমরা দেখিতে পাই।

বোলে (Bowl) পুষ্পবিন্যাস

অনেক রঙের ফুল সাজাইলে রঙগুলি হাল্‌কা হওয়া উচিত। সাদা ফুলের সঙ্গে হাল্‌কা হলুদ বা সাদার কাছাকাছি মাঝারি রঙের কোনও ফুল রাখা যাইতে পারে। একসঙ্গে বিভিন্ন রঙের ফুল রাখিতে হইলে উপরের দিকে হাল্‌কা রঙের ফুল এবং নীচে গাঢ় রঙের ফুল সাজাইবে। বড় ঘরে অথবা মৃদু আলোয় বিপরীত রঙের সমাবেশ দূর হইতে মনোরম দেখায়। গাঢ় রঙের ফুল কেন্দ্রে রাখিয়া বাহিরের দিকে নানা রঙের কুঁড়ি বা ছোট ফুল রাখা যাইতে পারে। ফিকে রঙের ফুল দিনের আলোয় ভাল দেখায়।

ফুলদানিতে পুষ্পগুচ্ছ সাজাইয়া তাহা একটু উঁচুতে কোথায়ও রাখিবে। বইএর তাকে, টেবিলে, আলমারির উপরের যে কোনও অংশে, দেওয়ালের কোনও অংশে ফুলদানি রাখা যাইতে পারে। বাঁশ বা মাটির তৈয়ারী ফুলদানির উপরে নকশা আঁকিয়া উহা দেওয়ালে ঝুলান অবস্থায় রাখা যায়।

স্থান নির্বাচন পুষ্পবিন্যাসের প্রধান কথা। কোথায় পুষ্পস্তবক রাখিলে মানানসই হইবে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, গৃহের সকলের তৃপ্তি বিধান করিবে, গৃহের পরিবেশ মনোরম হইবে তাহা

পূর্বে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ফুলের সঙ্গে ফুলদানির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফুলের রঙ, স্তবকের বিস্তার ইত্যাদির সঙ্গে ফুলদানির আকার, গঠন, নকশা ইত্যাদির সম্মিলন যেন সমভাবাপন্ন বা সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
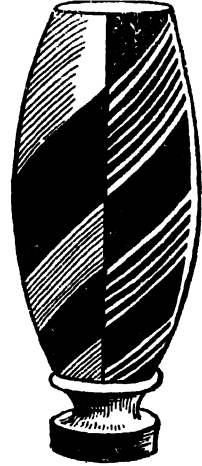
ফুলের রঙ লক্ষ্য করিয়া গাঢ় বা হাল্‌কা রঙের ফুলদানি নির্বাচন করিতে হইবে। সাদা রঙের ফুল স্বল্পচিত্রিত বা হালকা এবং এক-রঙের ফুলদানিতে সাজাইবে। ফুলের ডাঁটাগুলি যদি লম্বাকৃতি করিয়া রাখা হয় তবে ফুলদানিটিও লম্বাকৃতি হওয়া প্রয়োজন। রজনীগন্ধার জন্য এই ধরনের ফুলদানিই নির্বাচন করিতে হইবে। আবার জুঁই

লম্বাকৃতি ফুলদানি

জাতীয় ফুল বা লতানে ডালসহ ফুল সাজাইতে হইলে চওড়া-মুখ এবং চেপ্টা ধরনের ফুলদানি বাছাই করিবে। পুষ্পস্তবক বা বড় ডালিয়া কিংবা পদ্মফুল সাজাইতে হইলে অনতিদীর্ঘ এবং গোল বা মোটা বেড় সমন্বিত ফুলদানি বাছাই করিতে হয়। ছড়ানো ফুলদানি হিসাবে গোয়ালিয়রের ফুলদানিই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা ছাড়াও বহু ডিজাইনের এবং বিচিত্র-নকশা-করা অজস্র প্রকারের ফুলদানি আছে। ফুলের সঙ্গে ফুলদানির কারুকার্য মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

মাত্রাজ্ঞান এবং ছন্দবোধ পুষ্পবিন্যাসের আসল কথা। ফুলের সঙ্গে লম্বা শীষ বা বৃন্ত ইহার ছন্দ ও সৌন্দর্য অনেক গুণ বাড়াইয়া দেয়। চারাগাছ ফুলের সঙ্গে থাকিলে যে বাঁকা রেখার সৃষ্টি করে তাহাতে চমৎকার ছন্দ ফুটিয়া উঠে। গোলাপ ফুলের সঙ্গে ফার্ন

জাতীয় পাতার বিন্যাস অপূর্ব ছন্দের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন আকারের লম্বা ডাঁটা বা ডাল একদিকে বা ত্রিকোণ আকারে সাজাইলে শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবিন্যাসের মাত্রায় ছন্দের বৈচিত্র্য বজায় থাকে। ত্রিকোণ, পিরামিড, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, ইলেক্‌ট্রিক পাখা এবং S-এর আকারের পুষ্পসজ্জা আজকাল বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

পুষ্পবিন্যাস শুধু গৃহাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নয়। পুষ্পের সৌন্দর্যের সাহায্যে সমগ্র বাড়ীটির পরিবেশ পাল্টান যাইতে পারে। গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে প্রবেশপথের আচ্ছাদনের উপরে, লনের চারিপাশে, রাস্তার দুই দিকে, অলিন্দে, ছাদের কার্নিসে লতানো ফুলের গাছ বা টবে করিয়া ঋতুপুষ্প বা অন্যান্য ফুলের গাছ, ঝুলানো টবে ছোট ফুলের গাছ বা অর্কিড ইত্যাদি সাজানো যাইতে পারে। ইহাতে গৃহে প্রবেশ করিবার মুহূর্তেই প্রত্যেক মানুষের মন খুশি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।

বাড়ীর সম্মুখভাগে বা জানালার বাহিরে দৃষ্টিপথে আসে এমন স্থানে ছোট ফুলের বাগান করিয়া গৃহের সৌন্দর্য অনেক গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রবৃতি বা গুল্মের বেড়ায় বাগান ঘিরিয়া বা লতানো ফুলের বেড়া সাজাইয়া বাগানের সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। লতাকুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া বা লতানে ফুলের গাছে পর্দার মত তৈয়ারী করাইয়া গৃহপরিবেশ মনোরম করা সম্ভব।

বাগান করিতে হইলে কোন্ ঋতুতে কি ফুল হয় বা কোন্ ফুলের চারা কখন বসাইতে হইবে তাহা জানা দরকার। পুষ্পবিন্যাসে সেই ফুলের প্রয়োজনীয়তা কতটা তাহাও ভাবিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ক্রিসেন্থিমাম, আষাঢ়-শ্রাবণে ডালিয়া, সূর্যমুখী, জিনিয়া, ফ্লক্স ইত্যাদি, শ্রাবণ-ভাদ্রে গোলাপ, ভাদ্র-আশ্বিনে গোলাপ এবং আরও নানা জাতীয় ফুলের বীজ, চারা বা

কলম (graft) অবস্থায় আলাদা পাত্রে লাগাইতে হয়। পরে বাগানে বসান যাইতে পারে। গন্ধরাজ, টগর, গোলাপ, রজনীগন্ধা, জবা ইত্যাদি প্রায় বারমাসই ফোটে। জলপদ্মও অধিকাংশ ঋতুতে কমবেশী মিলে। শেফালিকা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি শীত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে ফুটিতে থাকে। গাঁদাফুল, পলাশফুল তোমরা সরস্বতী পূজায় নিশ্চয়ই প্রচুর সংগ্রহ করিতে পার। বর্ষায় ফোটে প্রচুর কদম্ব। বেলি ফুলও এই সময় পাওয়া যায়। কেয়া বা হাস্নুহানা গন্ধে মন-প্রাণ বিভোর হয়। হাস্নুহানা গৃহের সম্মুখে রাখিতে হইলে মাঝে মাঝে ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

অঙ্গসজ্জা হিসাবে পুষ্পের বহুল ব্যবহার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে খুবই দেখা যায়। ফুলের মালা হাতে বা খোঁপায় জড়ানো, ফটো বা মূর্তির চারিদিকে ফুলের মালা সজ্জিত করা বিশেষ প্রচলিত।

পুষ্পবিন্যাসের আনুষঙ্গিক উপকরণ ও ইহাতে বিদেশী প্রভাব— পুষ্পবিন্যাসের প্রধান উপকরণ বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। কিন্তু ইহা ছাড়াও সহায়ক উপকরণ হিসাবে নানা দ্রব্যের নাম করা যাইতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে পুষ্পবিন্যাসের যে ধারাগুলি আমরা বর্তমানে আমাদের দেশে চালু দেখিতে পাই তাহার প্রেরণা প্রধানতঃ বিদেশী। অবশ্য ইয়োরোপে, আমেরিকায় পুষ্পবিন্যাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নানা রকমের ফুলদানি, কর্তন-যন্ত্রাদি, বোঁটা-ধারক (Stem holder), স্পঞ্জ, কাগজের রুমাল, ফুল সাজাইবার তার, পাইপ, উপকরণ পরিষ্কার করিবার যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন রকমের ফিতা, কাঠের বালতি, রবারের ব্যাণ্ড, আঠাল ফিতা (adhesive tape), সীসা ইত্যাদির টুকরা, মডেলিং ক্লে, কাঁচি প্রভৃতি নানা সহায়ক উপকরণ পুষ্প-বিন্যাসের নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে হয়। জাপানে পুষ্পবিন্যাস করা

একটি প্রধান শিল্প। বাড়ীতেই ফুলসাজানো এই সকল দেশে প্রায় বাঁধা-ধরা নিয়মের অন্তর্গত। আমাদের দেশে যেমন প্রত্যেক মেয়ে সহজাত শিক্ষার গুণে মোটামুটি আলপনা চিত্রিত করিতে পারে, ঐ সকল দেশেও পুষ্পবিন্যাস প্রতি গৃহের মেয়েরাই অতি সহজে আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের দেশের তুলনায় ঐ সকল দেশে পুষ্প-বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী। প্রতি শহরে বা বড় গ্রামেও পুষ্প বিক্রেতা বা নার্সারীর খোঁজ পাওয়া যাইবে। ফুল লইয়া বিদেশে যথেষ্ট গবেষণাও (culture) হইয়া থাকে। রঙের সমন্বয় সাধনে জাপানে বা ইয়োরোপে সাধারণ গৃহস্থকেও সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে যেমন বিবাহ-বাসর হইতে শুরু করিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সাদা রঙের প্রাধান্য দেখা যায়, বিদেশে তেমন নয়।

রঙের বৈচিত্র্য এবং সামঞ্জস্য বিধান বিদেশী পুষ্পবিন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। বিদেশের কোন একটি অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফুলের রঙের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যেখানে হলুদ রঙের ফুল রহিয়াছে, সেখানে ঠিক তাহার পাশেই রহিয়াছে হলুদ-আভাযুক্ত সবুজ, ঘি রঙ, পাণ্ডুবর্ণ, কমলা রঙ, বাদামী, কমলারঙের আভাযুক্ত গোলাপী (salmon), আগুনের শিখার রঙ (flame), হলুদ-আভাযুক্ত লাল (scarlet) ইত্যাদি ফুলের সমারোহ। আবার স্নিগ্ধ মৃদু রঙের নীল বা নীলাভাযুক্ত ফুলের পাশেই দেখা যাইবে নীলাভ সবুজ, নীলাভ বেগুনি, লাল আভাযুক্ত ফিকে নীল (lavender), হাল্কা গোলাপী, ঈষৎ নীলাভ লাল (magenta), ধূসরবর্ণ, লাল, সাদা ইত্যাদি ফুল। রঙের এই সামঞ্জস্য বিধান এবং নানা সহায়ক উপাদানের সাহায্যে রুচিকর নিত্য নূতন পরিকল্পনা সাধন আমাদের দেশে ইদানীং অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যাইবে। ইহার

প্রেরণা যে মূলতঃ বিদেশী ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে ভারতবর্ষে পুষ্প-বিন্যাসের পদ্ধতি পূর্বে জানা ছিল না।

ভারতবর্ষের সভ্যতা গ্রামীণ। গ্রামে প্রায় প্রত্যেক গৃহের সংলগ্ন বাগানে নানা দেশজ ফুল জন্মে। ফার্ন জাতীয় পত্র বা নানা লতা-পাতার চাহিদা মিটাইতে বেশীদূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হয় না। গাছের প্রথম ফুলটি দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিবার ইচ্ছা প্রত্যেক গৃহবাসীর কাম্য। যে কোনও গ্রাম্য উৎসবে ফুল একটি আবশ্যিক উপকরণ। বিবাহোৎসবে ফুলসজ্জা, মাল্য বিনিময় করা আমাদের দেশে বিবাহের প্রধানতম প্রথার মধ্যে গণ্য। প্রাচীনকালে তপোবনের ঋষি-বালিকারা পুষ্পালঙ্কারে নিজেদের ভূষিত করিতেন। সেই ধারা আজও ভারতের গ্রাম্য বালিকাদের মধ্যে ও আদিবাসী রমণীদের মধ্যে প্রচলিত। অঙ্গপ্রসাধনে পুষ্পরেণু বা পুষ্প-নির্যাসের ব্যবহার বহুকাল হইতে ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে পুষ্পবিন্যাসের বা পুষ্পের সাহায্যে বিভিন্ন ভাবে অঙ্গপ্রসাধনের বহুবিধ প্রথা যে চালু ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজার্চনায় বিল্বপত্রসহ পুষ্পাঞ্জলির প্রথা নিশ্চয়ই বিদেশ হইতে চালু হয় নাই।

বর্তমানে শহর-সভ্যতার দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। এখন বিদেশী উপকরণের বাহুল্য আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বাগানের স্বল্প স্থানে এখন আর সূর্যমুখী, কামিনী, শিউলী, গন্ধরাজ, বকুল, পদ্ম, কৃষ্ণচূড়া, করবী, গাঁদা, গোলাপ, কাঠগোলাপ, মালতী, দোপাটি, তুপুরিয়া, কলাবতী, চন্দ্রমল্লিকা, মাধবীলতা, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি বহুবিধ দেশজ ফুলের চাষ সব সময় হয় না। অল্প স্থানে দুই-চারিটি বেলা, গাঁদা, দোপাটি,

সূর্যমুখী ইত্যাদির চারাগাছ রাখা হইলেও নানা বিদেশী ঋতুপুষ্পের সম্ভারেই এখন অধিকাংশ শহুরে বাগান সজ্জিত দেখা যায়। কস্‌মস্‌ (cosmos), অ্যাস্টার (aster), ক্রিসেন্থিমাম (chrysen-themum), ফ্লক্স, জিনিয়া (zinnia), ড্যালিয়া (dahlia), কক্সকম্ব (cockscomb), নিকোটিয়ানা (nicotiana), ইপোমী (ipomoe), নানা জাতীয় গোলাপ, সুইটপীজ, পপি, হোলিহক ইত্যাদি নানা রকমের বিলাতী ফুলের সম্ভার আজকাল পুষ্পোদ্যান হইতে গৃহসজ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফুলগুলি এখন আর বিদেশী ফুল বলিয়া গণ্য হয় না। দেশী ফুলের অনেক গাছই যেমন দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেক স্থান লইয়া অবস্থান করে, বিদেশী অধিকাংশ ফুলই ঋতুজাত এবং ইহার বিস্তার স্বল্প স্থানই অধিকার করে। ইহা সত্যই সুবিধাজনক। অবশ্য দেশী বিদেশী দুই রকমের সংমিশ্রণ আমাদের পুষ্পবিন্যাসের ক্ষেত্রকে আরও সুপ্রশস্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন বিদেশী ফুলের সমাবেশ ছাড়াও পুষ্পবিন্যাসের আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে সকলেরই কিছু জ্ঞান থাকা উচিত।

তোমরা জান ফুল ক্ষণস্থায়ী। ফুল, লতা, পাতা শীঘ্র শুকাইয়া যায়। সুতরাং কিছু বেশী সময় ইহা সতেজ রাখিতে হইলে কতগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। অতি প্রত্যূষে কিংবা প্রদোষকালে ফুলের বোঁটাগুলি কোণাকুণিভাবে ধারাল ছুরির সাহায্যে কাটিয়া বৃন্তের নীচের অংশ ছাঁটিয়া এক বালতি জলে রাখা যাইতে পারে। স্থলজ ফুলের বৃন্তের নীচের অংশ পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। জলজ ফুলের বোঁটার নিম্নাংশ শক্ত করিবার নিমিত্ত এক মিনিট উষ্ণজলে রাখিলে ভাল হয়। ইহাতে কর্তিত বোঁটায় জলকণা প্রবেশের পথ করিয়া দেয়। বোঁটা শক্ত হইলে তাহার নীচের অংশ চাঁছিয়া বা পিষিয়া দিলে জল প্রবেশের পক্ষে সুবিধা হয়। রজনীগন্ধা বা লিলি

ফুলের বোঁটার নীচের দিক পোড়াইয়া তরল প্যারাফিনে ডুবাইয়া রাখা উচিত। উইস্টারিয়ার (wisteria) বোঁটার শেষাংশ অ্যালকোহলে ডুবাইয়া রাখা ভাল।

পপি, জলপদ্ম, গোলাপ, মর্নিং গ্লোরি এই ফুলগুলি কুঁড়ি অবস্থায় কাটা যাইতে পারে। হেলিয়োট্রোপ, হোলিহক, পপি, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলগুলির বোঁটার শেষের দিক ফুটন্ত জলে রাখা যাইতে পারে। ক্রিসেন্থিমামের বৃন্ত জলের মধ্যেই ভাঙ্গিতে হয়। ফুল কাটিয়া কমপক্ষে তিনঘণ্টা সময় কোনও অন্ধকার স্থানে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে মুল পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উচিত। ইহাতে ফুলগুলি দৃঢ় হইবে। রাত্রিতে কোনও ঠাণ্ডা স্থানে গভীর জলে ফুল রাখা ভাল। দিনের বেলা অল্পজলে ফুল রাখিতে হইবে। ফুলগুলি অনেকদিন পর্যন্ত সতেজ রাখিতে হইলে জলে রাখিতে হইবে এবং জলে রাখিয়াই মাঝে মাঝে ইহার বোঁটা ছাঁটিয়া দিতে হইবে। জলও প্রতিদিন পাল্টাইয়া দিতে হইবে।

ফুলের সঙ্গে নানা লতাপাতার সন্নিবেশ ইহার সৌন্দর্যকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশেও পুষ্পবিন্যাসের সঙ্গে পল্লবশাখার সম্মিলন দেখা যায়। বিদেশী প্রভাবে ইহা আরও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। চাইনিজ এভারগ্রিন, হাকলবেরি, সাইট্রাস, ক্যামেলিয়া, লেবুপাতা, ইউক্যালিপ্টাস ইত্যাদির পাতা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সতেজ থাকে এবং ইহা পুষ্পস্তবকের সৌন্দর্য বাড়াইয়া দেয়। ক্যানা বা পেপার পাতা অথবা নানারূপ রঙীন পাতার সমাবেশ দেখিতে খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। অগুরু জাতীয় দেবদারু, মোরগ ফুল, পাইন ইত্যাদি গাছের পাতা ফুলের সঙ্গে মিলিয়া গৃহের রূপ পাল্টাইয়া দিতে পারে। নানা রকমের ঘাস এবং আগাছাও ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পুষ্পসজ্জায় প্ল্যানটেইন (কলাবতী), মিন্ট

উইড, মানিওয়ার্থ, মুলেইন, মানিপ্ল্যান্ট, খিস্‌ল (শিয়ালকাঁটা) বার্গামট (সুগন্ধিযুক্ত ছোট গাছ), ক্যাকটাস্, বিবর্ণ হলুদ বর্ণের ইয়োরো গাছ, পাতাবাহার ইত্যাদি আজকাল ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ফল এবং নানা শাকসবজীর ব্যবহারও পুষ্পবিন্যাসের সৌন্দর্য বিকাশে সহায়তা করিয়া থাকে। রডোডেনড্রন, ম্যাগনোলিয়া, আইভি ইত্যাদি গাছের পাতাও আজকাল পুষ্পবিন্যাসের সহায়ক উপকরণ হিসাবে বেশ প্রচলিত হইয়াছে।

পুষ্পসজ্জার জন্য কলাপাতা, পাইনগাছের বৃন্তমূলের পাতা টেবিলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাঠের, টিনের, রূপদস্তার (Pewter) ট্রে, মাখনের বোল (bowl), মাটির থালা, তরমুজ বা লাউর শুষ্ক খোলা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইতে পারে। ফুলের বোঁটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য টেস্ট টিউব কাজে লাগান যায়। গোল আলু বা আপেল ছিদ্র করিয়া বোঁটাগুলি বসান যায়। বোঁটাগুলির সঙ্গে ডালিম, সাদা আঙ্গুর, পামগাছের পাতা ভাল মানায় এবং ইহাদের সমাবেশে বোঁটাগুলি আচ্ছাদিত করিয়া রাখা যায়।

প্রাকৃতিক নানা উপকরণও পুষ্পবিন্যাসের কাজে লাগে। শঙ্খ, ঝিনুক, কড়ি, তারামাছ, পাথর, পাখীর পালক পুষ্পসজ্জার আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ছোট ছোট মূর্তিও এই সঙ্গে রাখা যাইতে পারে। মোমবাতি, বই, নকশা-আঁকা বাক্স ইত্যাদি বিপরীত রঙের ফুলের সঙ্গে সজ্জিত করা যায়। কৃত্রিম উপকরণ হিসাবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের জরী, রঙীন কাগজের ডিজাইন, লেস, রিবনের ফুল,

গোল কাচপাত্র

কুঁচি ফুল ইত্যাদি পুষ্পবিন্যাসের সহিত মিলাইয়া সাজাইলে আনন্দ ও উৎসবমুখর ভাব সৃষ্টি করে।

কি ধরনের ফুলদানিতে কোন্ কোন্ ঋতুপুষ্প রাখা যায় তাহা বলা হইতেছে। স্নিগ্ধ এবং হাল্‌কা রঙের ফুলের জন্য কাচের ফুলদানিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টিউলিপ্, ডালিয়া, লিলি, পিয়োনি ইত্যাদি পোর্সিলেন বা কাচের ফুলদানিতে মানানসই হয়। ডালপালা বা লতাপাতাসহ এইসব ফুল ভারী কাচের বা মাটির মোটা ফুলদানিতে ভাল দেখায়। বড় গোল কাচের পাত্র ফুলের তোড়া রাখিবার উপযুক্ত। অ্যাস্টার, ক্রিসেন্থিমাম, কস্‌মস্ ইত্যাদি কাচের বোলে (bowl) রাখা সমীচীন। সেই বোলে দুধ কিংবা জল থাকিলে ফুল গুঁজিবার পাত্রটি দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কাচের ছোট বাঁকার, বোল বা বোতল অন্যদিকে ফুলের বোঁটাগুলিকে প্রকাশ করিয়া পুষ্পবিন্যাসের সৌন্দর্যে অধিকতর বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারে। মার্বেলের পাত্র ফুলের বোঁটাগুলি লুকাইয়া রাখে। বৃন্ত লুক্কায়িত অবস্থায় রাখিতে হইলে এই পাত্র ব্যবহার করা যায়। যে পাত্রে বেশী জল ধারণ করিবার স্থান থাকে এবং যাহা বৃন্তকে লুক্কায়িত রাখে তেমন ফুলদানির প্রচলনই বেশী দেখা যায়। মাটির ফুলদানি দামে সস্তা এবং এই দিক হইতে কার্যকরী। তবে জল চুয়াইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া মাটির বা

মাটির পাত্র

চীনামাটির ফুলদানির ভিতরের দিকে মোম বা ওয়াক্সের (wax) আস্তরণ দেওয়া যাইতে পারে। ঘনক্ষেত্র (cube), লম্বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র (oblong), পিরামিড গলাকৃতি (cylinder), সূচ্যগ্র গোলাকৃতি (cone), বর্তুলাকার (sphere) ইত্যাদি জ্যামিতিক আকারে পুষ্পবিন্যাস হইয়া থাকে। কলসী, ঘুরান শঙ্খ, শিশু, হাঁস প্রভৃতির রূপ মানানসই ফুলদানির সঙ্গে একত্রিত হইয়া পুষ্পবিন্যাসে রূপ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ফুলের বৃন্ত গুঁজিবার জন্য আজকাল নানা ভাবে হোল্ডার ব্যবহার হইতেছে। ফ্লাওয়ার ভাসে (vase) হোল্ডার তৈয়ারী করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ভাসের ভিতরে তৈল মাখাইয়া তাহার মধ্যে তরল প্যারাফিন ওয়াক্স ও বালি মিশ্রিত করিয়া শক্ত হইবার পূর্বে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য বাহির করিতে হয়। তৎক্ষণাৎ পেন্সিলের সাহায্যে উহাতে ছিদ্র করিয়া ধারগুলি খাঁজ কাটিয়া লইতে হয়। নীচের দিকটা গোলাকৃতি করিতে হইবে। এই ভাবে হোল্ডার তৈয়ারী হইবে। আবার ফুলদানির নীচে কাঠের টুকরা (block), স্ট্যাণ্ড (stand), ছোট ম্যাট (mat) ইত্যাদি বসান যাইতে পারে। ইহাতে ফুলদানির সৌষ্ঠব অনেক বাড়ে। দেওয়ালের আকার, রঙ, আসবাবের আকার, রঙ প্রভৃতির সঙ্গে মিলাইয়া পুষ্পবিন্যাসের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

পুষ্পবিন্যাসে পশ্চাদ্‌ভূমির (background) একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। দেওয়ালের পর্দায় নানা নকশা-করা ফুল থাকিলে, পিছনে কোন কুলুঙ্গি, ছোট ছোট ছবি বা মূর্তি, পিয়ানো, অর্গ্যান, বড় আয়না ইত্যাদি বা রেডিও প্রভৃতি রাখিয়া পুষ্পবিন্যাসের পশ্চাদ্‌পটে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা সম্ভব। ঢাকনা, পর্দা, রাগ, ওয়াল-পেপার ইত্যাদির নকশায় ফুল থাকিলে ঘরের ফুলদানিতে

এমন ফুল রাখিবে যেন ঐগুলির সঙ্গে খাপ খা. . .. এবং নকশার মিল যে কোন সজ্জার আসল কথা।

আবহাওয়া এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পুষ্পবিন্যাস করিতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কোন্ ঋতুতে কি ফুল হয় এবং আবহাওয়া অনুযায়ী প্রকৃতির রঙের কি পরিবর্তন ঘটে তাহা জানা দরকার। শীতকালে গাঢ় সবুজ লরেল (laurel) পাতার সঙ্গে ফুল সাজান যায়। বসন্তকালে ফলের সঙ্গে, গাছের লতাপাতার সঙ্গে পুষ্পের সামঞ্জস্য বিধান সহজতর হয়। এই সময় জুঁই, চামেলি ইত্যাদি নানা জাতীয় দেশজ ফুল প্রচুর পাওয়া যায়। শরতের প্রথমদিকে কস্‌মস্, অ্যাস্টার ইত্যাদি ফোটে, শরতের শেষের দিকে ক্রিসেন্থিমাম প্রচুর পাওয়া যায়।

যেখানে তাজা ফুল সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেখানে কাগজের ফুল, পাতা ইত্যাদি সজ্জিত করিবার প্রচেষ্টা বিদেশেও খুব আছে। তবে মনোরম আবহাওয়া সৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিজাত ফুলের সন্ধান করাই বাঞ্ছনীয়, নতুবা ফুলের প্রাণমাতান সুগন্ধ কোথায় মিলিবে?

শয়নঘর

শয়নঘরটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে গোলমাল বা কথাবার্তা নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। প্রভাতের সূর্যের আলো যাহাতে চোখে না লাগে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বড় রাস্তায় সাধারণতঃ গোলমাল লাগিয়াই থাকে, কাজেই সেই রাস্তার ধারে বাড়ী হইলে বাড়ীর পিছনদিকে শয়নঘরের ব্যবস্থা করিলেই ভাল, কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে আলো-হাওয়ার অভাব না হয়। শয়নঘরে আড়াআড়ি দরজা-জানালা থাকা

উচিত যাহাতে বাতাস সহজে ঘরে ঢুকিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারে। শয়নঘরের দরজা-জানালা বেশ বিবেচনার সহিত করিতে হইবে যেন আসবাবপত্র সুবিধামত রাখা যায়। শয়নঘরের ভিতর দিয়া অন্য
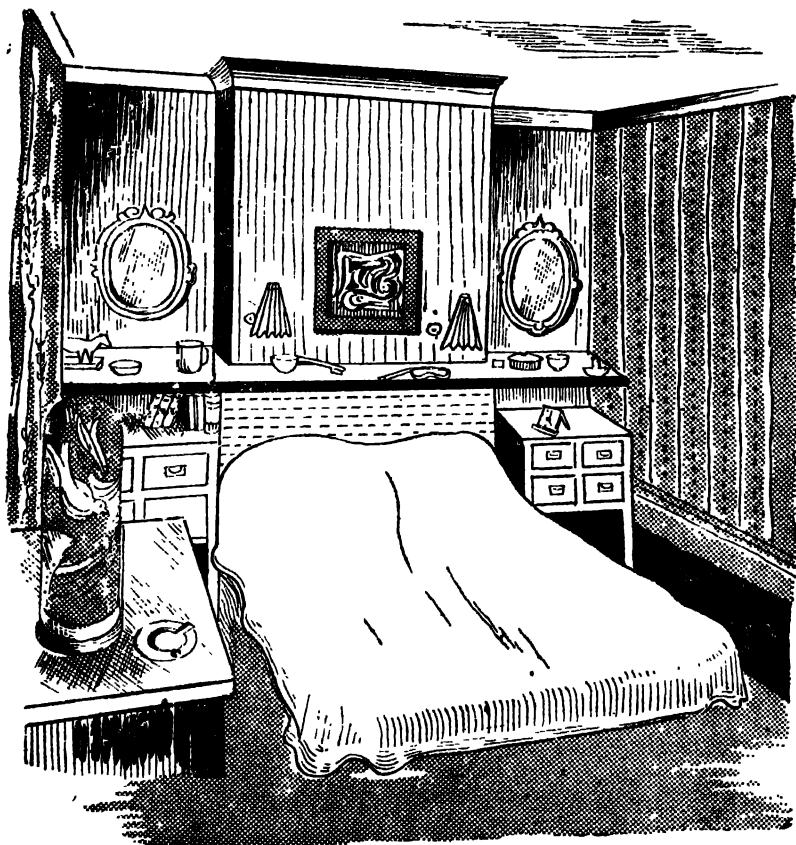
শয়নঘর

ঘরে যাইতে হয় এরূপ ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য নয়। যতদূর সম্ভব শয়নঘরের দক্ষিণ ও পূর্ব দিক খোলা রাখিতে চেষ্টা করিবে।

শয়নঘরের আয়তন কত বড় হইবে লোকসংখ্যার উপরই তাহা

নির্ভর করে। একজন লোকের জন্য ১১ ফুট দীর্ঘ, ১০ ফুট চওড়া ঘর এবং দুইজন লোকের জন্য ১৪ ফুট দীর্ঘ, ১২ ফুট চওড়া ঘর হইলেই চলে। শয়নঘরের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ অথবা একটু জায়গা থাকিলে সারাদিনের পরিহিত বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া মানুষ শয্যা গ্রহণ করিতে পারে। ছোট্ট একটি স্নানের ঘরও শয়নঘরের সন্নিকটে থাকা আবশ্যক। শয়নঘর যত সাধারণই (simple) হউক না কেন ব্যবস্থাপনায় অনেক বিবেচনা করিতে হয়। সুনিদ্রা মানুষের জীবনরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। শয্যা অর্থাৎ খাটটিই শয়নঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে প্রধান। প্রত্যেক মানুষের শয্যা মানুষের চেয়ে ৮ ইঞ্চি লম্বা হইলেই আরামদায়ক হয়। দেওয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া খাট পাতিলে সুবিধা হয়।

শয়নঘরে খাট থাকিবেই, উপরন্তু দেওয়ালের সামনে যথেষ্ট জায়গা থাকিবে যেখানে আলমারি বসান যায় এবং ড্রয়ারও খোলা যায়। পড়িবার জন্য আলোর ব্যবস্থা সহ একটি কি দুইটি ইজি-চেয়ার, একটি টেবিল বা ডেস্কের সামনে একটি চেয়ার থাকিলে সুবিধা। বিছানার পায়ের দিকে একটি লম্বা বা দুইটি ছোট বেঞ্চ থাকিলে মন্দ নয়। কখন কখন ছোট টেবিলও থাকিতে পারে।। জানালার সম্মুখে বা পার্শ্বে যথেষ্ট আলো আছে এরূপ স্থান ড্রেসিং টেবিলটি থাকিবার উপযুক্ত।

গৃহিণী যদি বসিবার ঘরে বসিয়া লেখাপড়া বা হিসাবপত্র লেখার কাজ না করিতে চান, তবে শয়নঘরে নিরালায় বসিয়া ঐ কাজ করিবার জন্য একটি ডেস্কও রাখিতে পারেন। যদি অন্য ঘরে সুবিধা না হয় তবে সেলাই করিবার জন্য একটি টেবিল এবং শিশুর জন্য শিশুখাট থাকিতে পারে। যদি শয়নগৃহের সংলগ্ন ড্রেসিং রুম থাকে তবে শয়নঘরে অনেকগুলি দেরাজ বা খুব বড় দেরাজ নিষ্প্রয়োজন।

শয্যার পাশে একটি বড় টেবিল থাকা বাঞ্ছনীয়। ঐ টেবিলটিতে সাধারণ আলো, জলের গ্লাস, একটি ঘড়ি অবশ্যই থাকিবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী যদি ইচ্ছা করেন তবে রেডিও, টেলিফোন, পছন্দমত একটি ছবি এবং কয়েকটি বইও ঐ টেবিলটির উপরে রাখিতে
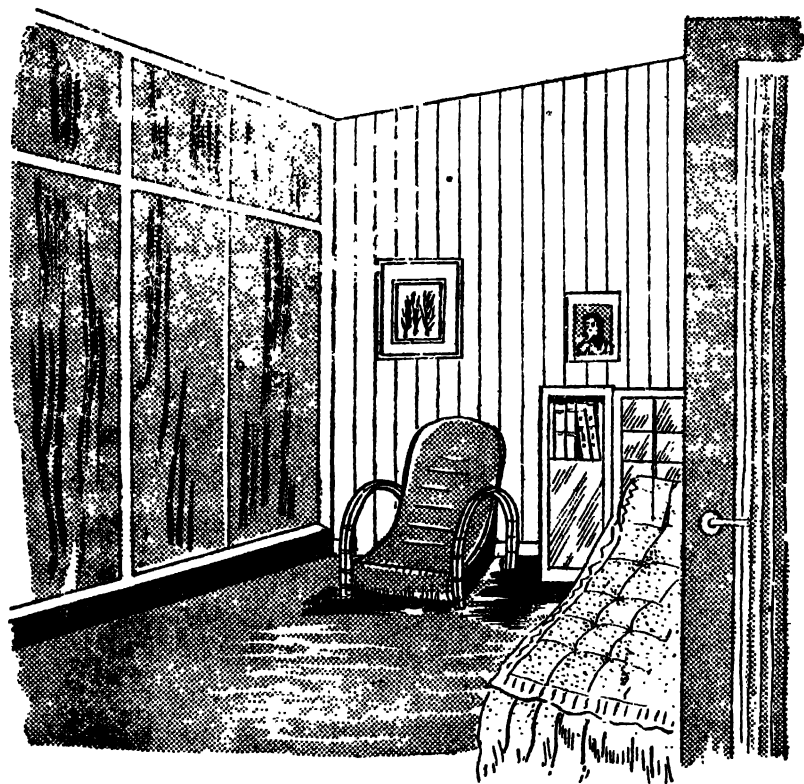
শয়নঘর

পারেন। শয্যায় থাকিয়াই খোলা যায় এরূপ একটি ড্রয়ার ঐ টেবিলে থাকিলে বিশেষ সুবিধা হয়।

দুইটি বিছানা থাকিলে সেগুলি কাছাকাছি থাকিলেই ভাল।

খাট দুইটির উভয় পার্শ্বে রাত্রির প্রয়োজনের জন্য টেবিল থাকিবে কিংবা দুইটির দূরত্ব এমন হইবে যেন দুইয়ের মাঝখানে একটি টেবিল বসান যায় এবং বিছানা করিবার জন্য যাতায়াতের সুবিধা থাকে। বড় শয়নঘরে জোড়া খাট রাখিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শয়নকক্ষ যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই সাধারণভাবে আলোচনা করা হইল।

আজকাল স্থানাভাবের জন্য ছোট ছোট বাড়ীতে শয়নঘরে অনেক রকম কাজই করিতে হয়। এই ঘরটিতে বিশ্রাম করা, খেলা করা, রেডিও শোনা সব কাজই চলে। এই ঘরটিতে বাচ্চারা তাহাদের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খেলা করে, মা সেলাই-ফোঁড়াই বা ঘরের অন্যান্য টুকিটাকি কাজ করেন, বাবা তাঁহার হিসাবপত্র লেখেন। অতিথি বন্ধুবান্ধব সকলের বসিবার এবং আদর-আপ্যায়ন করিবার ঘরও এইটি।

সেইজন্যই ঘরটিকে মনোরম ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজান-গুছান রাখিতে হইবে। এই ঘরটিতে প্রয়োজনীয় সব জিনিস রাখার মত যথেষ্ট জায়গা থাকা চাই এবং জিনিসপত্র সহজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থাও রাখা চাই।

বিশ্রামের জন্য আরাম-কেদারা (easy chair), এবং প্রত্যেকটির জন্য বাতি প্রয়োজন। ঘরে বই রাখার জন্য প্রয়োজনমত তাক (shelves) এবং ছোট টেবিল, টেবিলে ছাই ফেলিবার পাত্র (ash tray) রাখার ব্যবস্থা থাকিবে। ফোল্ডিং টেবিল (folding table) এবং ফোল্ডিং চেয়ার (folding chair) সুবিধাজনক। ছোটদের খেলনা ও বই রাখিবার জন্য ড্রয়ার বা সুদৃশ্য একটি বাক্সও রাখা দরকার।

বাড়ী করিবার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কক্ষ তৈয়ারী করা

হয়। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঘরটিকে সাজাইতে গুছাইতে হয়। শয়নঘরটি কর্তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। সেজন্য তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি, চিন্তাধারা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরখানি সাজান থাকে ; ঘরের আসবাবপত্রও সেই ভাবেই নির্বাচন করা হয়।

শয়নঘর মানুষের সবচেয়ে আরামের জায়গা, শান্তি ও বিশ্রামের স্থান। সারা দিনের শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষ শয়নঘরে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করে। সেইজন্য শয়নঘরটি যেন বেশ খোলোমেলা, আলো-হাওয়া-যুক্ত হয় এবং শয়নঘরের পরিবেশ যেন মনোরম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শয়নঘরের দেওয়ালের রঙ, মেঝে, আসবাবপত্র, ছবি, পর্দা, আলো ইত্যাদি শান্তি ও বিশ্রামের পরিপোষক হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেওয়ালের রঙ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদা। শয়নঘরের পরিবেশ বেশ স্নিগ্ধ ও মনোরম হওয়া দরকার যেন ক্লান্ত মানুষের মনে সহজেই একটা আরামের আমেজ আসে। সেইজন্য শয়নঘরের দেওয়ালের রঙ হাল্কা, শান্ত ও স্নিগ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নীল রঙের একটি শান্ত, স্নিগ্ধ অথচ সজীব ভাব আছে, সবুজ রঙটির মধ্যেও একটি উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ আমেজ আছে। ইহা ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক এবং জীবনীশক্তির রূপক। এইজন্য ফিকে নীল ও হাল্কা সবুজ রঙের দেওয়ালই শয়নঘরের পক্ষে ভাল। ইহা মনোরম আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া আরামের আমেজ আনিয়া দেয়। ঐ সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ঘরের পর্দা, আসবাবপত্রের ঢাকনা, বাতিটির রঙও ঠিক করা দরকার। ঘরের মেঝের সহিতও যেন দেওয়ালের রঙের মিল থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মোট কথা বড়দের শয়নঘরের রঙ যেন উত্তেজক বা উগ্র না হইয়া স্নিগ্ধ, শান্ত ও বিশ্রামের পরিপোষক হয়।

ড্রেসিং টেবিলের ল্যাম্পটি লোকের মাথার উপর না ঝুলিয়া ঠিক টেবিলের উপর যেন পড়ে, অর্থাৎ আলো যেন আয়নায় না পড়িয়া লোকটির উপর পড়ে। কেহ কেহ শয়নঘরে সিলিংয়ের মাঝখানে সিলিং-ফ্যানের সহিত একটি বাতি পছন্দ করেন। শয্যায় পড়িবার জন্য যিনি যে রকম বাতি পছন্দ করেন তাহাই ব্যবহার করিবেন, কিন্তু দেখিতে হইবে আলো যেন পাঠকের মুখে না পড়িয়া বইয়ের উপরে পড়ে। ডেস্কের সঙ্গেও বাতি থাকিবে। আকস্মিক কোন প্রয়োজনের জন্য শয়নঘরে একটি প্রধান সুইচ্ (switch) থাকা উচিত যাহা প্রয়োজনে সমগ্র বাড়ীটি আলোকিত করিবে।

শয়নঘরে খুব নিজস্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত পছন্দকরা আত্মীয়-স্বজনের বা বন্ধুবান্ধবের ছবি, পারিবারিক ফটো ইত্যাদি রাখাই বাঞ্ছনীয়। শয়নঘরের পুষ্পবিন্যাস গৃহকর্তার রুচির উপরই বেশী নির্ভর করে। অনেকে রৌদ্রোজ্জ্বল জানালায় ক্রমবর্ধমান চারাগাছ রাখিতে ভালবাসেন। পোর্সিলেনের সুন্দর ফ্লাওয়ার ভাসে (vase) স্নিগ্ধ, মনোরম ফুল সুন্দর মানায়। রৌপ্যাধারে ঈষৎ গোলাপী গোলাপ ফুল, সাদা সুইটপীজ ইত্যাদি চমৎকার দেখায়। ঘরের রঙ ও ফুলের রঙ এক হইলেই ভাল।

শয়নঘরের মেঝেয়, ঘরের কোণে, দরজার সম্মুখে বা সম্মুখ-দেওয়ালে আলপনাও দেওয়া যাইতে পারে। দেওয়ালের চারিদিকে বা ঘরের মেঝের চারিদিকে সরু যে কোন লতাও চমৎকার দেখায়।

বসিবার ঘরের (বৈঠকখানার) সজ্জা

বসিবার ঘরটি পরিবারের সকলের বিশ্রামের, কৌতুক-ক্রীড়ার, আলাপ-আলোচনার প্রধান জায়গা। সেইজন্য এই কক্ষে বহু লোকের সমাবেশ হয়। এই ঘরে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও তাহাদের

বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্পগুজব, হাসি-তামাসায় নিজেদের উপভোগ করে। কাজেই এই ঘরটি সকলের কাছেই খুব আকর্ষণীয়। ইহার কাজই লোকের মনোরঞ্জন করা, লোককে আনন্দ-উল্লাস পরিবেশন করা।

বৈঠকখানার পরিবেশ পরিবারে আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব এবং গৃহ-কর্তার মেজাজ ও রুচির পরিচয় প্রকাশ করে। এখানে যাহাতে সকলেই প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা হাসিগল্প ঠাট্টা-তামাসা করিতে পারে সেজন্য ইহার মধ্যে একটি স্নিগ্ধ, মনোরম, আনন্দোচ্ছল পরিবেশ জাগাইয়া তুলিতে সর্বদাই সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সম্ভব হয়, ইহার দক্ষিণ খোলা এবং সম্মুখে সুন্দর দৃশ্য থাকিলে ভাল। এই ঘরটি বড় হওয়া দরকার—অন্ততঃ ২০ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট চওড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘরটি বেশ মানানসই হওয়া চাই। ইহা চতুষ্কোণ (square) না হইয়া চওড়ার দিকে লম্বায় দুই-তৃতীয়াংশ হইলে ভাল। ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াতের পথ থাকিবে না; একদিকে দরজা থাকিবে। অন্ততঃ দুই দিকের দেওয়ালে যথেষ্ট বড় বড় জানালা থাকা চাই। আসবাবপত্রের যথাযথ সন্নিবেশের জন্য দেওয়ালের সামনে প্রয়োজনমত জায়গা থাকিবে।

এই গৃহটিকে এমনভাবে সাজাইতে হইবে যেন ইহা সকলকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

একটি পুরু গদিযুক্ত সোফা এবং কয়েকটি পুরু গদিযুক্ত চেয়ার বসিবার ঘরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় আসবাব। সোফা এবং চেয়ারগুলি একরকম হওয়া উচিত নয়, কারণ ইহা একঘেয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের রুচি, ভাব ও সুর প্রকাশের সহায়ক নয়। কোন কোন সময় একই চেয়ার একজোড়া রাখা বাঞ্ছনীয়। দুইটি সাধারণ চেয়ার এবং একজোড়া সোজা চেয়ারও কোন কোন বসিবার ঘরে থাকিতে পারে।

দেওয়ালের সম্মুখে বুক-কেস, সেক্রেটারী টেবিল, আলমারি, ডেস্ক ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি রাখিলে সমস্ত ঘরের সুর ও ভাব বেশ শ্রীসম্পন্ন মনে হয়। প্রত্যেক সোফা ও চেয়ারের পাশে আলো এবং অন্য জিনিস রাখিবার জন্য একটি করিয়া টেবিল রাখা প্রয়োজন। ঐ টেবিলটি সোফার হাতলের ঠিক সমান উঁচু হইবে
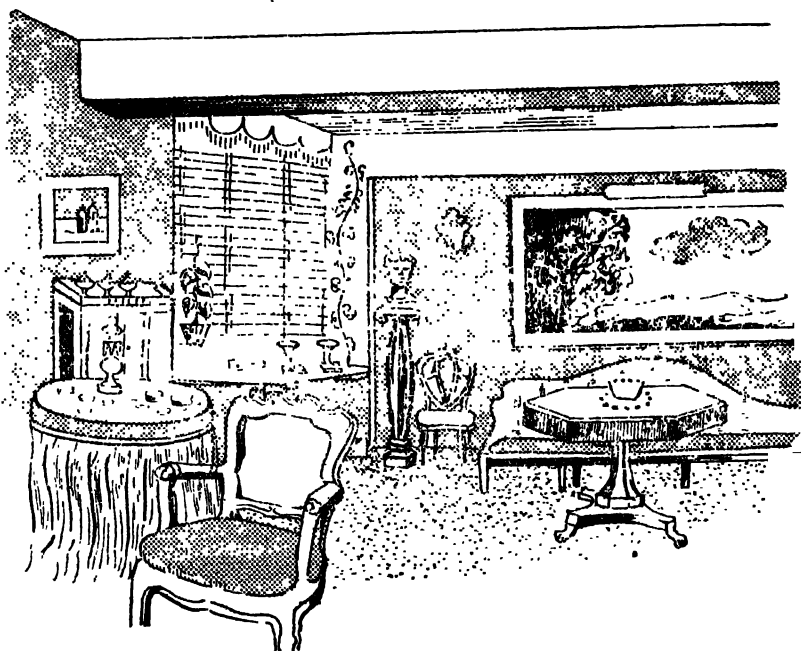
বসিবার ঘর

এবং টেবিলটিতে প্রয়োজনীয় জিনিস রাখিবার জন্য তাক বা ড্রয়ার থাকিলে ভাল।

একটি বড় টী-টেবিল বা কফি-টেবিল (নীচের দিকে তাক সহ) এই ঘরে থাকা একান্ত আবশ্যক। খাবার দেওয়ার জন্য কয়েকটি ছোট টেবিল সর্বদা ব্যবহারের জন্য থাকিলে ভাল। ছোট

একটি পিয়ানো বা অর্গ্যান থাকিলে গৃহসজ্জার মধ্যে একটু নূতনত্ব আসে। রেডিও, গদিযুক্ত বসিবার টুল (Cushioned seat without arm) এবং সুন্দর ডিজাইনের স্ক্রীনও অনেকে বসিবার ঘরে রাখা পছন্দ করেন। বসিবার ঘরে সিলিংএ কিংবা দেওয়ালে আটকান আলো বাঞ্ছনীয় নয়। ঘরের মেঝেয় অথবা গৃহের কোন জায়গার ভিতর দিকে আলো থাকিলে সমস্ত ঘর সাধারণভাবে আলোকিত হয়। ইহা ছাড়া সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এবং ঘরের সর্বত্র প্রয়োজনমত রাখা যায় এরূপ মেঝের ল্যাম্প বা টেবিল-ল্যাম্প রাখা দরকার। এইগুলি এমন জায়গায় রাখিতে হইবে যেন কাজেরও সুবিধা হয়, আবার সুন্দরও দেখায়। সোফার পাশের প্রত্যেকটি টেবিলে বড় দুইটি ল্যাম্প দাঁড়ান অবস্থায় থাকিলে সুন্দর দেখায়। এই দুইটির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গল্পগুজব করার জায়গায় আর একজোড়া ল্যাম্প রাখা যাইতে পারে। ঘরের সমস্ত ল্যাম্প যেন উচ্চতায় একরকম হয়; মেঝে হইতে ল্যাম্পের শেড পর্যন্ত ৫৮" ইঞ্চি হইলেই ভাল। পিয়ানো, অর্গ্যান বা ডেস্কের জন্য সাদাসিধা কাজ করার উপযোগী আলোই ভাল।

বসিবার ঘরে ছোট দেওয়ালের সহিত বসান বইয়ের তাক ঘরের লাইনের উপযোগী হয় বলিয়া আল্‌গা তাক অপেক্ষা ভাল দেখায়। কাচ-বসান চক্‌চকে বুককেস বসিবার ঘরে রাখিতে নাই। ছোট ছোট মূর্তি বা পাত্র কোন কোন সময় বইয়ের তাকের সৌন্দর্য বাড়ায়। আকার ও রঙ বিবেচনা করিয়া বইগুলি সাজাইতে হয়। এক রঙের বই এক লাইনে এবং গাঢ় রঙের বই তাকের নীচের দিকে রাখিলে ভাল দেখায়। সাদাসিধা লাইনের অল্প সাজান (decorated) ঘড়িও গৃহকর্তা ইচ্ছা করিলে

বসিবার ঘরে রাখিতে পারেন। বসিবার ঘরের ডেস্ক বা টেবিলে ডয়লি, ম্যাট ইত্যাদি রাখিবার প্রয়োজন নাই; একটি ল্যাম্প বা ছোট দুই-একটি জিনিসই যথেষ্ট।

বড় নীচু টী অথবা কফি টেবিলে কয়েকটি সাময়িক বা মাসিক পত্র জড় করিয়া, একটি য়্যাস ট্রে (ash tray), একটি চারাগাছ বা ফুল রাখা যাইতে পারে। বসিবার ঘরে প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামুদ্রিক দৃশ্য, ফুলের ছবি, প্রতিমূর্তি (Portrait) ইত্যাদি ছবিই বিশেষ উপযোগী। এই ঘরের ছবি যাহাতে পরিবারের লোকদের এবং বন্ধুবান্ধবদেব বিরক্তির কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে। ইহার বিষয়বস্তু, রঙ ও বিন্যাস খুব অদ্ভুত অর্থাৎ সচরাচর যাহা দেখা যায় না সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; কারণ এই ঘরটির পরিবেশ শান্ত হওয়া দরকার। বসিবার ঘরে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এইরূপ একই রকম দুইটি ফ্লাওয়ার ভাসে ফুলের দুইটি তোড়া সাজান থাকিলে ভাল। একই রকম দুইটি রৌপ্যাধার টেবিলের দুই পাশে সাজাইলেও চমৎকার মানায়।

বসিবার ঘরের পরিবেশে হর্ষ ও আতিথেয়তার সুর থাকা আবশ্যক। সেইজন্য এই ঘরের রঙ আনন্দদায়ক কিন্তু উত্তেজক হইবে না—স্নিগ্ধ মনোরম অথচ উজ্জ্বল হইবে। গরম দেশে সাদা দেওয়ালের সহিত নীল সিলিং ও মেঝে শ্রান্তি অপনোদনে সাহায্য করে। সাধারণ আবহাওয়ায় সাদা, বাদামী, ঈষৎ সোনালী রঙের সহিত হাল্‌কা ধূসর বর্ণ বেশ মানায়। বসিবার ঘরের রঙ অন্যান্য সাজসজ্জার সহিত মিলান অথবা বিপরীত হইবে তাহা গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর উপরই নির্ভর করে।

আলপনার সাহায্যেও ঘরটি সাজান যায়। ঘরের দেওয়ালে ঠিক সম্মুখে কিংবা দরজায় আলপনা দেওয়া যাইতে পারে। ঘরের

মেঝেতে এবং ঘরের কোণেও আলপনা ভাল হয়, তবে অন্যান্য আসবাবপত্রের সহিত যেন আলপনাটি মানায় সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে। খুব বেশী সাজান ঘরের দেওয়ালে বেশী আলপনা মানাইবে না; কাজেই সেখানে সরু একটি লতা দেওয়ালের চারিদিকে দিলে মন্দ হয় না। তবে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে ঘরের শ্রী বাড়াইবার জন্যই গৃহসজ্জার প্রয়োজন; অতিরিক্ত সাজসজ্জা যেন মূল উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ না করিয়া দেয়।

খাবারঘরের সজ্জা

খাবারঘরের মাঝখানে একটি টেবিল এবং চারিপাশে চেয়ার থাকিলেই মোটামুটি চলে। তবে ঘরে জায়গা থাকিলে যেখানে আরও সন্তোষজনক মনে হয় সেখানেই টেবিলটি বসান যাইতে পারে। বাগান সামনে থাকিলে টেবিলটি জানালার ধারে বাগানের মুখোমুখি বসান যাইতে পারে যাহাতে ভোজনকারীরা বাগানটি দেখিতে পায়। যদিও খাবারঘরে যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার তবু ঘরের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং সুন্দর দেখাইবার জন্য জানালার সামনাসামনি একটি লম্বা আসবাব (furniture) বসাইতে পারিলে ভাল।

যদি ড্রয়ার প্রয়োজন হয় তবে ড্রয়ারযুক্ত একটি টেবিল রান্নাঘরের দরজার কাছে থাকিতে পারে। খাবার-টেবিলের দুইধারে একই ধরনের দুইটি পরিবেশন করিবার জন্য টেবিল খাবার-টেবিলটিরই বাড়ান অংশ হিসাবে বসান যাইতে পারে। আজকাল স্থানাভাবের জন্য অনেক বাড়ীতেই খাওয়ার, পড়ার, বসিবার বা সেলাই ইত্যাদি করিবার জন্য একই ঘর ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ জায়গায়

খাবারঘরটিতে বসিবার ঘরের বাড়তি অংশ হিসাবেই আসবাবপত্র সাজাইতে হয়।

মাঝখানে একটি পর্দা, খাড়াভাবে গুটান যায় এরূপ স্ক্রীন, নীচু বইয়ের তাক বা অন্য যে কোন একটি পার্টিশন দ্বারা বসিবার ও খাওয়ার জায়গা প্রয়োজনমত আলাদা করা যাইতে পারে।

খাবারঘর

খাবারঘরের দুই-একটি কোণে বা সকল কোণেই কাবার্ড (cupboard) তৈয়ারী থাকিলে সুবিধা হয়, ভাল দেখায়; আলাদা কাবার্ড কেনার খরচও বাঁচে।

মেঝে হইতে সিলিং পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ দেওয়ালে থালা-বাটি ইত্যাদি রাখিবার কাবার্ড তৈয়ারী করিলে এই উদ্দেশ্যে আলাদা কোন আসবাব কিনিতে হয় না, অনেক জায়গাও বাঁচে। শিশুদের জন্য ছোট টেবিল করিলে সব রকমেই সুবিধা হয়।

খাবারঘরের বাতিটি ঠিক টেবিলের উপরে থাকিয়া খাবারদ্রব্যে ও আহারকারীর মুখে আলো পড়িবে, কিন্তু ঘরের অন্যান্য জায়গায় ছায়া থাকিবে—এইরূপ জায়গায় থাকা প্রয়োজন।

খাবারঘর বাড়ীর সকলেরই; কাজেই সেই ঘরের রঙের পরিকল্পনা খুব উচ্চ ও সুরুচিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। ঘরটির রঙ এবং সাজসজ্জা মনোরম হইলে খাবার সময়টি খুব আনন্দে কাটে এবং ভাল ক্ষুধাও পায়। খাবারঘরে একটু নূতনত্ব থাকিলে বা উহা খুব বর্ণাঢ্য হইলেও ক্লান্তি আসে না, কারণ ঐ ঘরে কেহ বেশীক্ষণ থাকে না।

কচি কলাপাতার মত সবুজ, লালচে গোলাপী, মাখনের মত হলুদ, সবুজাভ হলুদ, গোলাপী এবং লাল রঙের মধ্যে সজীব ও আনন্দদায়ক ভাব আছে। খাবারঘরে এইসব রঙের সঙ্গে সাদা রঙ থাকিলে আরও চমৎকার হয়—বিশেষতঃ যদি টেবিলে সাদা রঙ থাকে। স্বাভাবিক কাঠের (বার্নিশ-করা নয়) কিংবা প্ল্যাস্টিকের চেয়ার, গাঢ় রঙের টেবিল হাল্‌কা গোলাপী রঙের পটভূমিতে থাকিলে আরও উৎসাহব্যঞ্জক হয়।

আকাশী নীল রঙের সিলিং ও সাদা দেওয়ালের খাবারঘরে ছোট চারাগাছ, গাছ ও পাখী সাজাইলে চমৎকার 'বাগান বাগান ভাব' সকলকেই আনন্দ দেয়।

খাবারঘরে ফুল সাজাইতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে ইহা কেবল টেবিল সাজাইবার জন্য অথবা রঙ ও প্যাটার্ন তৈয়ারী করিবার জন্য কিনা। বর্ণ-বৈচিত্র্য ও প্যাটার্নের জন্য নানা রকমের ফুল ব্যবহার করা যাইতে পারে, অবশ্য ঘরটির রঙের পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য যেন থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখিতে হইবে। ফুলের পরিবর্তে একটি বোলে (bowl) কাচের বা মাটির নানা রঙের

ফলও সাজান যাইতে পারে—যদি প্রকৃত ফল সাজান সম্ভব না হয়। খাবার-টেবিলে নীচু ফুলের তোড়া বা পত্রগুচ্ছ বেশ ছড়াইয়া থাকে এরূপভাবে সাজাইতে হয় যেন ভোজনকারীরা পরস্পরের মুখ দেখিতে পায়। কাচের, রূপার, পোর্সিলেনের, মাটির—এইরূপ নানা জিনিসের তৈয়ারী ছোট ছোট পাখী, মাছ ইত্যাদি বা অন্য ছোট ছোট মূর্তিও টেবিলের উপরে বা কাবার্ডের উপরে সাজাইলে চমৎকার দেখায়। এমন কি মাঝে মাঝে ছোট ছোট মোমবাতিও উহার সহিত যোগ করিলে ভালই সাজান হয়।

খাবারঘরের ছবি খুব জীবন্ত ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। ফুলের, প্রাকৃতিক দৃশ্যের, সুসজ্জিত চায়ের পাত্র, পত্রপুষ্প-শোভিত বৃক্ষ ইত্যাদির ছবিই খাবারঘরে মানায় ভাল। খাবারঘরে টেবিলের ঠিক সম্মুখস্থ দেওয়ালে বা দেওয়ালের কোণে একটি সুন্দর আলপনা দেওয়া যাইতে পারে। দেওয়ালে মৎস্যলতা, শঙ্খলতা, কলমিলতা ইত্যাদি সরু বর্ডারের মত দিলেও আলপনাটি মন্দ হয় না।

গৃহসজ্জার সময় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে নিজের আয়, আশেপাশের পরিবেশ এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিজের জীবনধারার মান অনুযায়ী যেন গৃহের সাজসজ্জা হয়। জীবনযাত্রার মান (standard) এবং পরিবেশের সহিত মিল না হইলে সেই সাজসজ্জা কুশ্রীতার রূপান্তর হইয়া দাঁড়ায়।

মোট কথা প্রতিবেশী, বাড়ী, ঘর, লোক, জীবনযাত্রা এবং উপার্জন—সব কিছুর, সব দিকের কথা চিন্তা করিয়া তবেই গৃহ-সজ্জার উপকরণ ও আসবাবপত্র নির্বাচন ও ক্রয় করিতে হইবে। এলোমেলোভাবে অযথা কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিলেই গৃহের সৌন্দর্য বাড়ান যায় না। গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাই গৃহসজ্জার প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু অবিবেচনা বা নির্বুদ্ধিতার জন্য যদি তাহার ব্যাঘাত

হয় তবে গৃহ যত সাজানই থাকুক তাহা কখনও শান্তি বা তৃপ্তি দিতে পারে না। কাজেই বিশেষ বিবেচনার সহিত পরিকল্পনা করিলে তবেই গৃহসজ্জা যথোপযোগী হইতে পারে।

শিশুর ঘরের সজ্জা

শিশুর ঘর মায়ের পছন্দমতই সাজান-গুছান হইবে। ছোট খাটটি বা বিছানাটি, ছোট টেবিল-চেয়ারগুলি কোথায় থাকিবে সব কিছুই মা ঠিক করিবেন। তবে মোটামুটি কি থাকা বাঞ্ছনীয় আমরা কেবল তাহাই আলোচনা করিব।

শিশুর চরিত্র গড়িয়া উঠে তাহার পরিবেশের মধ্য দিয়া। খেলাধুলা ও কর্মের মধ্যেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। সুতরাং শিশুর শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শিশুর ঘরটি সাজান উচিত। ছোট শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অধিকাংশ সময়ই ঘুম প্রয়োজন। সেজন্য শিশুর ঘরটি বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে নিরালায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাহাতে কোন গোলমাল বা পরিবারের অন্যান্যদের উপস্থিতি শিশুর ঘুমের ব্যাঘাত না জন্মায়। শিশুর জন্য ছোট একটি খাট থাকিবে। খাটটি এমন জায়গায় থাকিবে যেন সর্বদাই সেখানে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে। শিশুর জন্য বালিশ না দেওয়াই ভাল। বিছানার চাদর ও ঢাকনা যথেষ্ট বড় হওয়া প্রয়োজন যেন শিশু পা দিয়া উহা ফেলিয়া দিতে না পারে। বিছানাটি বেশ হাল্‌কা অথচ আরামদায়ক ও গরম হইবে। শিশুদের আসবাবপত্র তাহাদের মাপ উপযোগী হওয়া উচিত। কোন কোন আসবাবপত্র এমনভাবে তৈয়ারী করা বাঞ্ছনীয় যেন শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও বাড়ান যাইতে পারে। আসবাবপত্র খুব হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন

যেন সহজেই নাড়াচাড়া করা যায়। শিশু নিজেই নিজের কাজ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে শিশুকে সম্মুখে রাখিয়াই সমগ্র পরিবেশটি সাজাইতে গুছাইতে হইবে। শিশুর ঘরে খেলনা রাখার জন্য

শিশুর ঘর

একটি দেরাজ, ছোট্ টেবিল, ছোট চেয়ার, কাপড়-চোপড় রাখার জন্য একটি হ্যাঙ্গার থাকিবে। আসবাবগুলি হইবে হাল্কা এবং আকারে শিশুর পক্ষে কাজ করার উপযোগী ও বসিবার

জন্য নীচু। শিশু যেন তাহার নিজের কাপড়-চোপড়, খেলনা ইত্যাদি প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস নিজেই সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ঐ ধরনের আসবাব তৈয়ারী করিবে। শিশু বয়স হইতে এই ভাবে অভ্যাস করিলে শিশু ভবিষ্যতে কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল ও পরিশ্রমী হইবে। ঘরের মাঝখানে যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার যেন শিশু সেখানে খেলা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ঘুমাইতে ও আহার করিতে পারে।

শিশুর ঘরের দেওয়ালের রঙ উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। রঙের বৈচিত্র্য শিশুকে অতি সহজে আকৃষ্ট করে। কাজেই শিশুর ঘরের রঙটি বেশ হর্ষোৎপাদক ও সতেজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। রঙেব জন্য ঘরে যেমন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়, আবার রঙের জন্য ঘরের আবহাওয়ায় বিষাদও নামিয়া আসে। শিশুর কর্মচঞ্চল প্রফুল্ল মনটি যেন বিষাদ-ক্লিষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখিয়া রঙ নির্বাচন করিবে। শিশু গাঢ় রঙ—যেমন, গোলাপী, লাল, সোনালী, হলুদ, সবুজ ও নীল রঙ পছন্দ করে। কালো বা ধূসর রঙ শিশুকে নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ করিয়া তোলে। শিশুর ঘরের পর্দা রঙীন, জন্তুজানোয়ারের বা ফুলফলের ছাপযুক্ত হইলে শিশু আনন্দ পায়। জন্তুজানোয়ারের ছবি শিশু ভালবাসে। কারণ সদাচঞ্চল শিশু জন্তুজানোয়ারের ছবির মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করে।

শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য শিশুর ঘরে নানা রঙের ছবি ও গল্পের ছবি রাখা প্রয়োজন। শিশুর সৌন্দর্যানুভূতির জন্য ও রুচিজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ফুলফল, লতাপাতা ইত্যাদির ছবি রাখাও দরকার। ছবি বড় হইবে এবং শিশুর চোখের সমান সমান উঁচুতে থাকিবে। মাঝে মাঝে শিশুর ঘরের ছবি বদলাইয়া দিলে শিশুর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাইবে।

ছোট ছোট মানুষের মূর্তি, পাখী, জন্তুজানোয়ার, গাছপালা, ইত্যাদির মূর্তি শিশু খুব পছন্দ করে। ছোট ছোট বাড়ীঘর, টেবিল, চেয়ার, হাঁড়ি, থালা, ঘটী, বাটি ইত্যাদি এবং ছোট ছোট মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন ইত্যাদি এই রকমের নানা খেলনা লইয়া শিশু আপন মনে বা বন্ধুদের সহিত খেলা করিতে ভালবাসে। খেলনাগুলি যেন এমন জিনিসে তৈয়ারী হয় যাহা শিশুর কোন ক্ষতি করে না।

শিশুর সৌন্দর্যজ্ঞান ও রুচিজ্ঞান বিকাশের জন্য শিশুর ঘরে নানা রঙের ফুল ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখা ভাল। বিভিন্ন রঙের ফুলের সাহায্যে শিশু রঙের জ্ঞান এবং বিভিন্ন আকারের ও গড়নের ফুলদানির সাহায্যে আকারের (form) জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

মানুষের সহজাত সৌন্দর্য-পিপাসা শিশুর মধ্যেও আছে। সুষ্ঠু পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিশুর সৌন্দর্য-পিপাসা জাগ্রত করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য সৌন্দর্যানুভূতির সুষ্ঠু বিকাশ করিতে হইলে শিশু বয়স হইতেই তাহার চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন।

অতএব শিশুর ঘরখানির আসবাবপত্র, পর্দা, রঙ, ছবি ও রূপসজ্জা মিলিয়া যাহাতে শিশুর মনে সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচি বিকশিত করে সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।

বর্ণসমাবেশ (Colour Combination)

বর্ণসমাবেশের গুরুত্ব—গৃহসজ্জা বা গৃহপ্রসাধনের বিভিন্ন বস্তু লইয়া আলোচনা হইয়াছে। যে সব আসবাবদ্রব্যের বা সজ্জা-দ্রব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সব কিছুই রঙ বা বর্ণের সমাবেশে বিচিত্র সৌন্দর্যে ভূষিত হয় এবং অপূর্ব শোভায় শ্রীমণ্ডিত

হইয়া উঠে। মেঝের গালিচার নকশা, দেওয়াল-সজ্জার নানা চিত্রাদি, পুষ্পবিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি, কক্ষের আসবাবপত্রের ঢাকনা ইত্যাদি সব কিছুই যে রঙের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নির্বাচন করিতে হয় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। মোট কথা সৌন্দর্য এবং শিল্পকলার সঙ্গে রঙের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য।

ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে রঙের সমন্বয় লইয়া রীতিমত মাথা ঘামান হয়। গৃহসজ্জার জন্য, গৃহের দেওয়াল, মেঝে, ছাদ প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত ঐ সকল দেশে বৃহৎ সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহারা গবেষণা এবং পরিকল্পনার সংযোগে রঙের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গৃহস্থের সম্মুখে হাজির করিয়া থাকে ; তাহার ফলে সাধারণ মানুষের রঙ বাছাই করিতে সুবিধা হয়।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে স্থাপত্য-শিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ রঙ সমাবেশের মধ্যে নিহিত। বিশ্রামকক্ষ, শয়নকক্ষ, বৈঠকখানা, বাড়ীর বাহিরের দেওয়াল প্রভৃতি নকশা করিবার সময়ে রঙ সংযোগের কথাও বিবেচনা করা হইয়া থাকে। যাহাতে মনের বিভিন্ন সময়ের চিন্তাধারা, ভাবাবেগ (moods) প্রভৃতি যথাযথভাবে স্ফূর্ত হয় এবং যাহাতে চিন্তাধারার সঙ্গে জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গতি থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রঙের কথা বিবেচিত হয়।

রঙের সৌন্দর্য বা বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অনুভূতির সংযোগও অত্যধিক। মানসিক বিষণ্ণতা দূর করিতে, চিত্তের অসুস্থতা নিরাময় করিতে, দুশ্চিন্তা হইতে মস্তিষ্ক বিমুক্ত রাখিতে রঙের প্রভাব অপরিসীম সন্দেহ নাই। বর্ণসমাবেশের মারফত মানুষের মধ্যে যেমন শান্তি, প্রফুল্লতা, কোমল ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তেমনি সময়ান্তরে বা ভিন্ন পরিবেশে উহা বিষাদ, বিরক্তি,

বিরাগ প্রভৃতি অসুস্থ ভাবের উদ্রেকও করিতে পারে। একই রঙ হাল্‌কা ধরনের হইলে মনে নিরুত্তাপ নিস্তেজ ভাবের সূচনা হয়, আবার গাঢ় বা উজ্জ্বল বর্ণ-সুষমায় তাহাই উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। একই গড়নের বা আকারের এবং স্বাভাবিক রঙের আসবাব-দ্রব্য মনে বিরক্তির উৎপাদন করে, আবার তাহাই বিচিত্র রঙের সমাবেশে আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

মনের অবস্থাও রঙের সাহায্যে পরিবর্তিত হইতে পারে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত মানুষ যখন বিশ্রামের প্রত্যাশায় গৃহকোণে ফিরিয়া আসে তখন ঈষৎ সবুজ বা সবুজাভ রঙের মৃদু এবং স্নিগ্ধ আলোতে বসিয়া তাহার মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হয়, দেহ প্রশান্ত আরাম উপভোগ করে। মানুষের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার সঙ্গে রঙের ওতপ্রোত সম্বন্ধের কথা তোমরা যে কোন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে।

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রঙ পছন্দ করে। একজন মানুষ কি রঙ পছন্দ করে জানিলে তাহার চরিত্রের অনেক তথ্য তোমরা জানিতে পারিবে। একই রঙ আলাদা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। যে রঙ দেখিয়া এক ব্যক্তি প্রেরণা উপলব্ধি করে, অন্যজন তাহা দেখিয়াই অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। সুতরাং মানুষের মনের কথা চিন্তা করিয়া বা কর্মশক্তি, প্রেরণা প্রভৃতি দিকের কথা ভাবিয়া অবশ্যই রঙের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

বর্ণসমাবেশ এক দিকে রুচিবোধ ও সৌন্দর্যচর্চার পরিচয় বহন করে, অন্য দিকে ইহার প্রভাবে মানুষ কর্মোদ্যম এবং মানসিক অনুপ্রেরণার আবেগ অনুভব করে। গৃহসজ্জার দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত হইবে তাঁহাদের বিভিন্ন রঙ এবং মানবজীবনের উপর

সেইগুলির প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে।

বিভিন্ন রঙের পরিচয়—রঙের মধ্যে লাল, নীল এবং হলুদ এই তিনটি রঙকে প্রধান (Primary) রঙ বলা হয়। এই রঙ তিনটিকে আর বিশ্লিষ্ট করা যায় না বা ভাগ করা সম্ভব নয়। আবার অন্য কোনও রঙ একত্রিত করিয়াও এই রঙগুলি সৃষ্টি করা যায় না। তাহা ছাড়া এই রঙ তিনটিই অন্য রঙের সৃষ্টির মূলে অবস্থান করে। এই রঙ তিনটি একত্র মিলাইলে ধূসর ও সাদা রঙের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে প্রধান রঙগুলির যে কোনও দুইটিকে মিশ্রিত করিয়া যে তৃতীয় বা মধ্যবর্তী রঙটির সৃষ্টি হয়, তাহাকে অপ্রধান (Secondary) রঙ বলে। লাল ও হলুদ রঙ একত্র হইয়া কমলা রঙের সৃষ্টি করে, নীল ও হলুদে সবুজ রঙ হয়, লাল ও নীলে বেগুনি বর্ণের রূপ পায়। কমলা, সবুজ ও বেগুনি প্রভৃতি রঙগুলিই অপ্রধান রঙ। হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনি, লাল, কমলা এইগুলিকে স্বাভাবিক বা স্ট্যাণ্ডার্ড (Standard) রঙ বলা হয়।

রঙের দুইটি প্রধান ধর্ম বা গুণ রহিয়াছে। গৃহসজ্জায় ইহা যেমন এক দিকে স্নিগ্ধতার (coolness) সূচনা করে, অন্য দিকে আবার উগ্রতার (warmth) উদ্রেকও করিতে পারে। যে রঙের মধ্যে লাল বা হলুদ বেশী তাহাকে উগ্র রঙ বলা যায়। যাহার মধ্যে নীলের প্রাধান্য তাহাকেই স্নিগ্ধ রঙ বলা হয়। সবুজ ও বেগুনি রঙের মধ্যে উগ্র এবং স্নিগ্ধ উভয় ধর্মই বর্তমান। হলুদাভ সবুজ উগ্র, নীলাভ সবুজ স্নিগ্ধ। লালচে বেগুনি উগ্র, নীলাভ বেগুনি স্নিগ্ধ। এই কারণেই সূর্যকিরণ, কৃত্রিম আলো বা আগুনের রঙ আমাদের দৃষ্টিতে উগ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ এইগুলির মধ্যে হলুদ বা লালের আভা বর্তমান। আবার আকাশ, জল,

পাতা প্রভৃতির রঙে নীল ও সবুজের আধিক্য হেতু আমাদের সম্মুখে ঐগুলি স্নিগ্ধ রূপ লইয়া প্রতিভাত হয়। বিশিষ্ট কয়েকটি রঙ এবং তাহাদের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিলেই বর্ণসমাবেশ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হইবে।

হলুদ রঙ—ইহা সূর্য এবং কৃত্রিম আলোর রঙ। সূর্যের আলোর রঙে ইহার সংযোগ আছে বলিয়াই প্রাচীনকাল হইতে ইহাকে ভগবান বা শক্তির প্রতীক-রঙ বলিয়া কল্পনা করা হয়। ইহা হর্ষ এবং প্রফুল্লতা, উল্লাস এবং সজীবতা, শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি, ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর প্রভৃতির প্রতীক। চীনদেশেও এই রঙটিকে পবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয়। হলুদ বর্ণ উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান্ বলিয়াই গৃহসজ্জায় ইহা অপরিহার্য। মেঘলা দিনে নিস্তেজ পরিবেশও হলুদ রঙে আনন্দোচ্ছল হইয়া উঠে।

হলুদ রঙ মিশ্রিত হইয়া বা রূপান্তরিত হইয়া নানা রঙের সৃষ্টি করে। ঘি, পক্ককদলী, পাণ্ডু, পক্কলেবু প্রভৃতির হাল্কা রঙ হলুদ রঙের সঙ্গে সম্পর্কিত। ওয়াল-পেপারে হলুদ রঙের খুবই ব্যবহার দেখা যায়। কারণ এই রঙ অন্য রঙের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে ভাল মানায়। কার্পেট, পর্দা, গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে ওয়াল-পেপারের রঙের সঙ্গতি থাকা চাই। হলুদ রঙের স্বল্পমূল্যের সুতার কাপড়, লিনেন, উল প্রভৃতিও দেখিতে সুন্দর বলিয়া সাধারণ পরিবারের পক্ষে ইহা ব্যবহার করা সুবিধা-জনক। বাড়ীর উত্তর দিকের কক্ষে বা যে কক্ষে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাইবার ব্যবস্থা নাই সেখানে যথাসাধ্য হলুদ বর্ণের সজ্জাদ্রব্য রাখিলে ভাল হয়। হলুদ রঙেরই একটি সংস্করণ সোনালী রঙের ব্যবহার গৃহসজ্জার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। একটি স্বল্পালোকিত ঘর সোনালী পর্দায় সতেজ ও আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে।

কমলা রঙ—লাল এবং হলুদের মিশ্রণের পরিণতি কমলা রঙ। এই রঙটির বড় গুণ ইহার স্পষ্টতা। কমলা রঙ অন্য রঙের চাইতে অনেক বেশী জীবন্ত। সজীবতার জন্যই গৃহসজ্জায় এই রঙটি প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাঢ় কমলা রঙ খুবই উগ্র। সুতরাং ইহার ব্যবহার স্বল্প হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কমলা রঙ উৎসাহ, উদ্দীপনা, তেজ, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহস, আন্তরিকতা প্রভৃতির প্রতীক। বিভিন্ন ধরনের কমলা রঙ বা ইহার রূপান্তরিত মরিচা রঙ এবং তামার রঙ ইত্যাদি গৃহসজ্জায় আতিথেয়তা প্রদর্শনে বা আনন্দোৎসবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরৎকালে এই রঙ গৃহসজ্জার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাদামী রঙ—বিনয়, শান্তি, নম্রতা, ভদ্রতা প্রভৃতির প্রতীক বাদামী রঙ। কাঠের আসবাবপত্রের স্বাভাবিক রঙ বাদামী ধরনের। অন্য রঙ পালিশ করাইয়া বা বার্নিশের সাহায্যে কাঠের আসবাবপত্র ভিন্ন রঙে রূপান্তরিত হয় এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু বাদামী রঙের আভা সংযুক্ত থাকে বলিয়াই ইহাদের সৌন্দর্য আপ্যায়নের স্বরূপ লইয়া আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। হাল্কা বাদামী রঙের রাগ গৃহসজ্জার পক্ষে উপযুক্ত। লাল রঙের সঙ্গে বাদামী রঙ পাশাপাশি রাখিয়া দেওয়াল সজ্জিত করা যাইতে পারে। ইহাতে ঘরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। চকোলেট রঙ আজকাল খুবই প্রচলিত। ইহা বাদামী রঙেরই রূপান্তর।

লাল রঙ—আগুন বা রক্তের মধ্যেই এই বর্ণের আভা রহিয়াছে। ইহা শত্রুতা, যুদ্ধ, শক্তি, ক্ষমতা, গতি, সাহস, আক্রমণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশের সহায়ক। লাল মানুষের প্রিয় রঙ সমূহের অন্যতম। আদিম যুগে মানুষ রক্ত এবং আগুনের সঙ্গে সর্বদাই পরিচিত হইত। আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে গুহামুখে সর্বক্ষণ অগ্নি

প্রজ্বলিত রাখিতে হইত। প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামে রক্তমোক্ষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইত। সুতরাং লাল রঙ তাহাদের নিকটে খুবই পরিচিত এবং স্বাভাবিক রঙ ছিল।

পূর্বপুরুষের এই অতি পরিচিত রঙটির মধ্যে তাই এখনও আমরা আনন্দ এবং উৎসাহের রূপ খুঁজিয়া পাই। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, তেজ, আতিথ্য বা উল্লাস প্রভৃতি প্রকাশ করিতে ইহা গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আনন্দ বা উদ্দীপনার প্রতীক হইলেও এই রঙটি স্নিগ্ধ নয়। সুতরাং ইহার ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। মৃদু এবং হাল্‌কা লাল রঙ নীল বা বেগুনি রঙের সঙ্গে মানানসই হয়। গাঢ় বা উগ্র লাল রঙ হলুদ, কমলা, ফ্যাকাশে সবুজ, গোলাপী প্রভৃতি রঙের সঙ্গে সম্মিলিত করা যাইতে পারে। উগ্র বা ফ্যাকাশে রঙের কার্পেট দেখিতে খুবই মনোরম। গোলাপী লাল মেয়েদের খুবই প্রিয় রঙ বলিয়া পরিচিত। গৃহসজ্জার উপকরণ, আসবাব প্রভৃতিতে এই রঙের ব্যবহার অতিরিক্ত হইলে ইহার সঙ্গে সামান্য ধূসর রঙের সংমিশ্রণ করিয়া রঙটিকে হাল্‌কা করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। চেয়ারের ঢাকনা এবং ছোট ছোট জিনিসের আবরণে লাল রঙ চমৎকার দেখায়। যদি গোলাপী ও নীল রঙ পাশাপাশি সাজাইতে হয় তাহা হইলে ঈষৎ লালচে গোলাপী এবং বেগুনি নীল হইলেই চমৎকার দেখাইবে।

বেগুনি রঙ—ইহা লাল ও নীলের সংমিশ্রণে তৈয়ারী। প্রহেলিকা, চিন্তা, শোক, দার্শনিকতা, অস্পষ্টতা, মহিমা প্রভৃতির ইঙ্গিত সৃষ্টি করিতে এই রঙের ব্যবহার হইয়া থাকে। একক রঙ হিসাবে এই রঙটির বিশেষ কোনও মর্যাদা নাই।

নীল রঙ—নির্মল আকাশ এবং গভীর জলের রঙ নীল বলিয়া স্নিগ্ধ নির্মল ভাবের দ্যোতক হিসাবেই এই রঙ আমাদের কাছে বিশেষ

মর্যাদা পাইয়া থাকে। গৃহসজ্জায় এই রঙটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করিয়া শয়নঘর, বিশ্রামকক্ষ, ভোজনগৃহ প্রভৃতি এই রঙে সজ্জিত করা যাইতে পারে। ফ্যাকাশে নীল, হাল্কা সবুজাভ নীল দেওয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এই রঙের আলোর প্রভাবে ঘরের আয়তন বড় দেখায়। দুই রঙের রূপসজ্জায় স্বল্প নীল এবং শ্বেতবর্ণের মিলন খুবই চমৎকার।

সবুজ রঙ—ইহা ঘাস, লতাপাতা, শাকসব্জীর রঙ। বিশ্রাম, আরাম, উৎসাহ প্রভৃতির প্রতীক সবুজ রঙ। এক দিকে ইহা মানুষের মনোরম বিশ্রাম-সুখের সহায়ক, অন্য দিকে স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করিয়া ইহা মানুষের দেহে নূতন কর্মশক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিকে সুস্থ এবং মেজাজকে সুস্থির করিতে সবুজ রঙের প্রভাব অসীম। সবুজ রঙ চক্ষুর পক্ষে খুবই উপকারী। অবশ্য কিছু সংখ্যক বর্ণ-বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, গাঢ় সবুজ রঙ হিংসা, দ্বেষ এবং অসুস্থতার পরিচায়ক। এই অভিমত যে কতদূর সত্য বলা যায় না, তবে সবুজ রঙ যে ক্লান্তমনে আনন্দের স্পর্শ বুলাইয়া দেয় এবং শ্রান্তদেহে আমোদপূর্ণ বিশ্রামসুখের সঞ্চার করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নীল এবং হলুদ রঙের সংমিশ্রণে সবুজ রঙের সৃষ্টি। যদি হলুদ রঙের পরিমাণ বেশী হয় তবে রঙটি গাঢ় এবং উগ্র হয়। নীলের অংশ বেশী হইলেই রঙটি হাল্কা এবং স্নিগ্ধ হয়। উগ্র সবুজ রঙের গাঁটযুক্ত পাইন স্বাভাবিক রঙের কাঠের সঙ্গে বেশ মানানসই হইয়া থাকে। কাহারও নিকটে অস্বস্তির কারণ না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সবুজ রঙ গৃহসজ্জায় ব্যবহার করিবে।

কালো রঙ—প্রহেলিকা, জটিলতা, মূঢ়তা, গভীর জ্ঞান প্রভৃতির প্রতীক কালো রঙ। নাটকে তোমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া

দেখিবে কোনও কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে বা বিশেষ নাটকীয়তা প্রদর্শনে এই রঙটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভৌতিক পরিবেশ, খুন-জখম, ডাকাতি প্রভৃতি বা মনের গূঢ় অভিসন্ধি এবং জটিল চিন্তাধারা ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে বা বুঝাইবার নিমিত্ত কালো রঙ প্রতীক হিসাবে উপস্থিত করান হয়। গাঢ় রঙের রূপসজ্জার পরিকল্পনায় যদিও এই রঙ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু হাল্‌কা রঙের সঙ্গে ইহা একেবারেই বিসদৃশ দেখায়, এবং অন্য রঙটিকে ম্লান করিয়া দেয়। কালো রঙের সামান্য ছোপ (tint) গৃহসজ্জার উপকরণে মন্দ দেখায় না। কালো রঙের কার্পেট কখনও কখনও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বিলাসিতার জন্য মাঝে মাঝে আসবাবে কালো রঙ ব্যবহৃত হয়।

সাদা রঙ—ইহা সকল রঙের সমষ্টি মাত্র। ইহা সুখ, পবিত্রতা, সাফল্য, আনন্দ, শান্তি, সরলতা প্রভৃতির প্রতীক। রূপালী চাঁদ নির্মল স্নিগ্ধতার প্রতীক, এবং শ্বেত পারাবত শান্তি-দূত বলিয়া কথিত হয়। এই রঙকে শীতকালের রঙ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বর্ণাঢ্য সাজসজ্জার মাঝে মাঝে ইহার প্রয়োগ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অন্য রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে সাদা রঙ সর্বদাই সাহায্য করিয়া থাকে। গৃহের ভিতরে এবং বাহিরে সমভাবেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ধূসর রঙ—কালো ও সাদা রঙের সংমিশ্রণেই এই রঙের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কালো, সাদা এবং ধূসর রঙকে সাধারণতঃ উদাসীন বা অপক্ষান্তর্গত (Neutral) রঙ বলা হইয়া থাকে। কাঠের রঙ, বালুর রঙ, বিস্কুটের রঙ এইগুলিও অপক্ষান্তর্গত রঙ। এই রঙগুলি গৃহসজ্জার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। কারণ পশ্চাদ্‌ভূমির (background) রঙগুলি এই রঙ কয়েকটির হইলে ভাল হয়।

ধূসর রঙের নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। হাল্কা ধূসর রঙ স্নিগ্ধ ও শান্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। গাঢ় ধূসর রঙ পরিবেশে গাম্ভীর্য এবং মহান ভাব আনয়ন করে। দেওয়ালে ধূসর রঙের নকশা অঙ্কন করিয়া বা আলেখ্য চিত্রিত করিয়া চমৎকার শোভার সৃষ্টি করা সম্ভব। আধুনিক গৃহসজ্জায় ধূসর রঙের খুবই প্রাধান্য দেখা যায়। কারণ এই রঙের নিজস্ব জলুস কম থাকায় ইহা পশ্চাদ্‌ভূমিতে থাকিয়া অন্য রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। বাহির-দিকের দেওয়ালে ধূসর রঙের ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বর্ণবিন্যাসের কথা—বিভিন্ন রঙ লইয়া আলোচনা হইয়াছে। বিভিন্ন রঙের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। কিন্তু বর্ণসমাবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষাভ্যাস না করিয়া বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিয়া শুধু জ্ঞান আহরণ করিলেই গৃহসজ্জায় ইহার প্রয়োগ করা যায় না। এই সম্পর্কে আগ্রহশীল হইয়া নানা প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থানের বর্ণবিন্যাসের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে অনেক কিছু শিখিতে পারা যায়। অভ্যাস সৃষ্টিই যে কোনও শিক্ষার বড় কথা। অনেক বার একটি কাজ করিয়া ভুল শুধরাইয়া তবেই সার্থকভাবে কোনকিছু সম্পন্ন করা সম্ভব। সুতরাং নিজেরা ছোট ছোট জিনিসে রঙের ব্যবহার করিয়া গৃহসজ্জার কাজে লাগাইলে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সুবিধা হয়। ঢাকনার রঙ নির্বাচন করিয়া, বইয়ের মলাট নির্দিষ্ট করিয়া, পর্দা সাজাইয়া, পুষ্পবিন্যাস করিয়া রঙ সমাবেশ সম্পর্কে অনায়াসেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারা যায়।

পশ্চাদ্‌ভূমিতে রঙ হিসাবে সাদা, কালো এবং ধূসর রঙ ব্যবহার করার কথা বলা হইয়াছে। স্নিগ্ধ এবং উগ্র রঙের কথাও বলা হইয়াছে। স্নিগ্ধ এবং উগ্র রঙ একত্রিত ভাবে ব্যবহার করিবে না।

দেওয়াল	সিলিং	কার্পেট	পর্দা	আসবাবপত্র
ঝিনুকের মত সাদা	ঝিনুকের মত সাদা	গাঢ় গোলাপী লাল	গোলাপী	গাঢ় নীল এবং সাদা
নীল	সাদা	নীল	লেবুর মত হলুদ	হলুদাভ বাদামী বা হলুদ
বাদামী	হাল্‌কা হলুদ	হলুদ	হলুদ এবং লাল	লাক্ষার মত লাল
ধূসর	ধূসর	বেগুনি এবং আশমানী	গোলাপী এবং আশমানী রঙ	ধূসর এবং বেগুনি
বিস্কুট রঙ	বিস্কুট রঙ	গাঢ় বাদামী	হলুদ	গাঢ় নীলাভ সবুজ
সবুজ	সাদা	বাদামী	সাদা এবং সোনালী	বিস্কুট রঙ এবং সবুজ
হাল্‌কা গোলাপী	হাল্‌কা গোলাপী	সাদা	সবুজ	সবুজ এবং সাদা
রক্তিমাভ হলুদ	বিস্কুট রঙ	বিস্কুট রঙ	বিস্কুট রঙ ও আশমানী রঙ	আশমানী এবং সবুজ
সবুজ	গাঢ় সবুজ	বাদামী	সবুজ এবং সাদা	হলুদ
ধূসরাভ সাদা	ধূসরাভ সাদা	অনুজ্জ্বল নীলাভ সবুজ	সাদা এবং নীলাভ সবুজ	টুকটুকে লাল
ঘি-রঙ	ঘি-রঙ	কোমল সবুজ	চকোলেট রঙ	ফিকে গোলাপী
গাঢ় বিস্কুট রঙ	গাঢ় বিস্কুট রঙ	হলুদ	মরচের রঙ	তামার রঙ এবং সরিষার রঙ

গৃহের বর্ণ-পরিকল্পনা (Colour Schemes for Rooms)

দুইটির স্থান আলাদা নির্দিষ্ট থাকিবে। পশ্চাদ্‌ভূমি ও আসবাব-পত্রের রঙ স্নিগ্ধ এবং হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন। স্নিগ্ধ রঙে ঘরের পরিসর যেমন বড় মনে হয়, তেমনি উগ্র লাল বা লালচে বেগুনি রঙে ঘরের আয়তন ছোট বলিয়া মনে হয়। একটি লম্বা, সরু এবং স্বল্প-আয়তন ঘরের দেওয়ালের নীচের অংশে উজ্জ্বল রঙের নকশা আঁকিলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইবে। চতুষ্কোণ ঘরের দুইটি বিপরীত দিকের দেওয়ালে গাঢ় রঙ দিলে এবং অন্য দুইটির রঙ হাল্‌কা হইলে ঘরের উজ্জ্বলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। উত্তর দিকের ঘর ঠাণ্ডা হওয়ায় সেখানে লাল ও হলুদ রঙের ব্যবহার করা উচিত। দক্ষিণের ঘর সূর্যালোকে উজ্জ্বল থাকে বলিয়া সেখানে স্নিগ্ধ রঙ ব্যবহার করিতে হয়; নীল, হাল্‌কা বাদামী, ধূসর ইত্যাদি ঐ ঘরের উপযোগী। ঘরে পর্যাপ্ত আলো থাকিলে গাঢ় অথচ স্নিগ্ধ রঙের সহজ সরল নকশা থাকিতে পারে। একটি বাড়ীর সকল ঘরেই যাহাতে রঙ সমাবেশের ঐক্য এবং সামঞ্জস্য বজায় থাকে সেদিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিতে হইবে। গৃহসজ্জাসমূহ সংগ্রহ করিবার পূর্বে এই সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

গৃহের সাজসরঞ্জাম

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিলাসের উপকরণ ও দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। সেইজন্য গৃহকে আধুনিক রুচি অনুযায়ী সজ্জিত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। গার্হস্থ্য প্রয়োজন মিটাইতে চীনামাটি, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, লোহা, কাঁসা, রূপা, মাটি প্রভৃতি গৃহের নানাবিধ উপকরণ হিসাবে নানা রকম বাসনকোসন ও আসবাবপত্র

যোগাইতেছে। এইগুলি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে এবং গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হইতেছে।

বাসনকোসন

চীনামাটি ও পোর্সিলেন—সুদূর অতীত যুগ হইতে চীনামাটির বিভিন্ন প্রকারের আসবাবপত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, মিশর, গ্রীস ও রোমে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব এক শতাব্দী হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শিল্প চীনদেশে শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিল। তারপর ইয়োরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহা চীনদেশ হইতে প্রথম আমদানি হইয়াছে বলিয়া ইংরেজরা ইহার নাম দিয়াছে চীনামাটি। এই চীনামাটির দুইটি অংশ—একটি কাঠামো আর একটি ঔজ্জ্বল্য।

কাঠামোটি কাদা (clay) ও অন্যান্য উপাদানে গঠিত। উপাদানের তারতম্য অনুযায়ী জিনিসের পার্থক্য হয়। ইহার ঔজ্জ্বল্য খুব চকচকে, মাঝারি, স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ হইতে পারে।

পোর্সিলেনও অনেকটা চীনামাটির মত। ইহা কেয়োলিন (Kaolin) ও ফেল্ডস্পার (Feldspar) নামক পদার্থের দ্বারা গঠিত। অধিক উত্তাপে পোর্সিলেনের উপাদানগুলি গলাইয়া একটি পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে ইহা বেশ মজবুত। ভাঙ্গিয়া বা ফাটিয়া গেলেও ইহার ভিতর ময়লা জমে না।

চীনামাটির অনেক উপকরণ গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে সিঙ্ক (Sink), ফুলদানি, পুতুল, গ্লাস, ডিশ, বাটি, পায়খানার পাত্র প্রভৃতি প্রধান। চীনামাটির পেয়ালা, পিরিচ, টী-পটও খুব প্রচলিত। নিয়মিত পরিষ্কার না করিলে এই সব জিনিসে দাগ পড়ে ও নোংরা দেখায়। সোডা বা সাবানের সহিত গরমজল অথবা লেবু ও তেঁতুলের সাহায্যে এগুলি পরিষ্কার করা হয়। প্রয়োজন হইলে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা অন্যান্য লঘু অ্যাসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাটির আসবাবপত্র—মাটির নির্মিত পাত্র একেবারেই অস্বচ্ছ। ফুলদানি হইতে টেবিল সাজানোর নানাবিধ দ্রব্যই এই মাটির সাহায্যে নির্মিত হয়। রান্নার হাঁড়ি-কড়াই, গ্লাস, থালা, কলসী, জলের কুঁজো ইত্যাদি মাটির তৈয়ারী। ইহার মধ্যে হাঁড়ি, কলসী ও কুঁজো আমাদের নিত্য প্রয়োজনে লাগে এবং বড় বড় নিমন্ত্রণের সময় মাটির গ্লাস ও থালা ব্যবহৃত হয়। বেঙ্গল পটারী প্রভৃতি হইতে নির্মিত চায়ের নানাবিধ পাত্রেরও আজকাল খুব বেশী প্রচলন। কাদা, চুন ও বালি সহযোগে এগুলি গঠিত এবং পোর্সিলেন অপেক্ষা অনেক বেশী সচ্ছিদ্র। ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে ইহাদের ভিতর

ময়লা জমে এবং রঙ বিবর্ণ হইয়া যায়। এইসব পদার্থ সাধারণতঃ ন্যাকড়ার সাহায্যেই ঘষিয়া অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

কাচ—অতি প্রাচীন কাল হইতেই কাচের প্রচলন চলিয়া আসিয়াছে। মিশরের সম্রাটদের (Pharoah) কবরে কাচের নির্মিত ছোট ছোট দ্রব্য দেওয়া হইত। তারপর রোম কাচশিল্পে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। রোম হইতে ইয়োরোপের সর্বত্র ইহার প্রচলন হয়।

কাচের প্রধান উপাদান—বালি, চুন ও ক্ষার জাতীয় পদার্থ। ফ্লিন্ট গ্লাস অথবা গ্লাস স্ফটিক চুর্ন জাতীয় গ্লাস হইতে ভারী ও উজ্জ্বল। সাধারণ গ্লাস আর যে সব গ্লাস দ্বারা বোতল প্রস্তুত হয় সেইসব গ্লাস দামী গ্লাস অপেক্ষা বেশী ভঙ্গুর। হস্তনির্মিত কাচ বহু-বৈচিত্র্যপূর্ণ হইতে পারে। যে কোন উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল রঙ কাচের উপর আরোপিত করা যায়। গোল্ড ও কপার অক্সাইড কাচকে লাল রঙ, ক্যাডমিয়াম ও ইউরেনিয়াম হল্‌দে, তামা অথবা কোবাল্ট অক্সাইড নীল রঙ করে। সাদা, লাল বা হল্‌দে কাপড়ের উপর গাঢ় নীল রঙের পাত্র বা থালা খুব সুন্দর দেখায়।

কাচের নির্মিত বহু রকমের পাত্রই গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে গ্লাস, থালা, ছোট বড় বাটি, ফুলদানি, কাপ (cup), জগ (jug) প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য কাচ হইতে প্রস্তুত হয়। গৃহের দরজা-জানালাতে নানা রকমের কারুকার্যখচিত সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ কাচ ব্যবহৃত হয়। কেশ-প্রসাধনের অত্যাবশ্যক সামগ্রী আয়না কাচের তৈয়ারী।

কাচ সহজেই পরিষ্কার করা যায়। গরম সাবানজল বা সোডা-জলের সাহায্যে উত্তমরূপে ঘষিলে ইহার ময়লা দূরীভূত হইয়া ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসে। চীনামাটি, পোর্সিলেন বা কাচের জিনিস কখনও

একসঙ্গে জড় করিয়া রাখিতে নাই, কারণ পরস্পরের ঘর্ষণে ইহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ডিশের নীচের অংশটি পালিশ করা হয় না বলিয়া তাহার ঘর্ষণে অন্য জিনিসের পালিশ নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যই সুগৃহিণীরা প্লেটের মাঝে মাঝে প্যাড, ফেল্ট কিংবা কাগজ ব্যবহার করেন। পেয়ালাগুলি কখনও ঝুলাইয়া রাখিতে নাই, কারণ উহাদের হাতলগুলি খুব শক্ত হয় না। ঐগুলি একটির উপরে আর একটি স্তূপাকারে না রাখিয়া প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে রাখিতে হইবে। যে সব পাত্র সর্বদা ব্যবহারে লাগিবে না সেগুলি স্বচ্ছ ঢাকনা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। কাচের জিনিসে অম্লরস লাগিলে ব্যবহার করার পরমুহূর্তেই তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিবে, নতুবা ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

রৌপ্যনির্মিত দ্রব্য—রৌপ্যের বিভিন্ন গুণাবলী ও বিশেষ চিত্তাকর্ষক ধর্ম থাকায় ইহা বহুদিন হইতেই মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আগেকার দিনে ব্যাঙ্ক ছিল না বলিয়া অনেকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা রৌপ্যনির্মিত বাসনপত্রাদি কিনিয়া রাখিত। আবশ্যকমত সেগুলি গলাইয়া তারপর পুনরায় বিক্রয় করিত।

Sterling (স্টার্লিং) শব্দটি Easterling (ইস্টারলিং)-এর সংক্ষিপ্ত আকার। ১২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টারলিং নামে একটি জার্মান পরিবার বিশুদ্ধ রূপা হইতে জিনিস তৈয়ার করিত। তাহার নাম হইতে স্টার্লিং শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। স্টার্লিংএর ভিতর মিশ্রণের ভাগ শতকরা ৭½। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বালসোবার শেফিল্ডে প্রথম রূপার পাত বসান প্রচলন করেন।

রূপার থালা, ফুলদানি, বাটি, গ্লাস, পানের ডিবা, সিঁদুর-কৌটা প্রভৃতি নানা রকমের বাসনপত্রের প্রচলন আমাদের দেশে ও বিভিন্ন

দেশে চলিয়া আসিয়াছে। রৌপ্যনির্মিত পাত্রগুলি মহার্ঘ বলিয়া এগুলি সব সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। একমাত্র পূজাপার্বণ ও সামাজিক উৎসবে এগুলি ব্যবহার করা চলে। নিমকদানি, কেট্‌লি, কুঁজো, চিনির পাত্র, চা ও কফির পাত্র, ট্রে, ফুলদানি, দোয়াত, চামচে, চুলের কাঁটা ও ফুল, এইসব জিনিস নির্মাণের জন্য রূপার প্রয়োজন আছে। রূপার পাত্র সহজে মরিচা ধরে না আর ইহার ব্যবহার কম বলিয়া অতি সহজেই সিল্‌ভার ক্লথের সাহায্যে ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

অ্যালুমিনিয়াম—অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অত্যন্ত হাল্‌কা, দামেও সস্তা। এইজন্য অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর পাত্র সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়। সেইজন্য নিজগৃহে বা গৃহের বাহিরেও ইহার ব্যবহার চলে। অ্যালুমিনিয়াম দামে সস্তা এবং সহজে ভাঙ্গে না বলিয়া আমাদের সাধারণ গৃহে ইহার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন-ক্যারিয়ার, জল নিবার পাত্র, গ্লাস, বাটি, হাঁড়ি, কড়াই, অনেক জিনিসই গৃহস্থালির জন্য প্রস্তুত হয়। অ্যালুমিনিয়াম-নির্মিত পাত্র ধুইবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ক্ষার ও অ্যাসিড উভয়ের সংস্পর্শে ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষীণশক্তি-সম্পন্ন জৈব অ্যাসিড, সাইট্রিক ও টারটারিক (লেবু ও তেঁতুল) ব্যবহার করিলে ইহার ক্ষতি হয় না।

লৌহ—জানালা-দরজার শিক হইতে আরম্ভ করিয়া চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি অনেক জিনিসই লোহার সাহায্যে নির্মিত হইয়া থাকে। রান্নার লোহার কড়াই আমাদের নিত্য ব্যবহারের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, দামেও সস্তা। লোহা খুব বেশী তাপেও নষ্ট হয় না। এজন্য ভাজা রান্নার জন্য লোহার কড়াই সবচেয়ে বেশী সুবিধাজনক। লৌহপাত্র ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখিবার

সময় খুব শুকনা করিয়া মুছিয়া না রাখিলে মরিচা ধরিয়া যায়। যত্ন করিয়া রাখিলে অনেকদিন ব্যবহার করা চলে। জানালা-দরজার শিকগুলি যদি উন্মুক্ত অবস্থায় বায়ু ও জলের সংস্পর্শে রাখা যায় তবে অতি সহজেই মরিচা ধরিয়া আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয়। এইজন্য ইহাদের উপর বার্নিশ (যেমন জিঙ্ক বার্নিশ) দিয়া রাখিলে সহজে মরিচা পড়িতে পারে না। হোয়াইট লেডের (White lead) বার্নিশও অনেক সময় বেশ কাজে লাগে। ইহা ব্যতীত অয়েল পেইণ্ট (oil paint) ব্যবহার করিলে লৌহনির্মিত পদার্থ জলের সংস্পর্শে আসিলেও সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

যে সমস্ত লৌহনির্মিত টেবিল-চেয়ার গৃহে ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর বিভিন্ন রঙের (oil paint-এর) একটা আবরণ (coating) থাকে। জল দ্বারা ধুইলে এইসব রঙ আদৌ উঠে না; তবে ব্যবহারের ফলে যদি চটা উঠিয়া যায় তবে সেই স্থান পুনরায় রঙ না করিলে অতি শীঘ্রই সেখানে মরিচা পড়ে। এইজন্য কয়েক বৎসর অন্তর লৌহনির্মিত আসবাবপত্রে রঙ করা উচিত। কৃত্রিম রঞ্জন জাতীয় পদার্থ, কৃত্রিম তৈল, নূতন রঙ ও দ্রাবকের সাহায্যে এইসব আধুনিক পেইণ্ট তৈয়ারী করা হয়। সাধারণতঃ অস্বচ্ছ রঞ্জক পদার্থ এবং তিসি, সয়াবিন, পেরিলা অথবা টাং তেলের সাহায্যে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পেইণ্ট পাতলা হইলে টারপেনটাইন (Turpentine) ব্যবহার করা হয়। পেইণ্ট তিন রকমের হয়—উজ্জ্বল, অর্ধ-উজ্জ্বল ও ফ্যাকাশে। স্নানের ঘর ও রান্নাঘরে লোহা ও কাঠের উপর উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা দরকার। কারণ সেই সব ঘরের দরজা-জানালার উপর সব সময় জল লাগে। উজ্জ্বল রঙ সহজে নষ্ট হয় না। কাঠে ও দরজা-জানালায় অর্ধ-উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা উচিত।

ফ্যাকাশে রঙ অপেক্ষা ইহা অধিক স্থায়ী। ফ্যাকাশে রঙ দেওয়ালে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

এনামেল—লৌহনির্মিত পাত্রে এনামেল করা হয়। ইহা লোহার উপরে একটি সাদা আবরণের (coating) মত। ইহা স্থায়িভাবে পাত্রে লাগিয়া থাকে। শত ধোয়া মোছাতেও ইহা নষ্ট হয় না। গ্লাস, ছোট বড় বাটি বা পাত্রে এনামেলের রঙ কোটিং ব্যবহার করা হয়। ইহার দামও খুব বেশী নয়; তাহা ছাড়া সহজেই সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার হয় বলিয়া কাঁসার বাসনের পরিবর্তে অনেক বাড়ীতে আজকাল ইহার প্রচলন দেখা যায়।

তামা—পূজার ছিপ্‌, কোষা, তাম্রপাত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি তামার তৈয়ারী। তামার থালা দেখিতে খুব সুন্দর। তাম্রপাত্রে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার আশঙ্কা হেতু ইহা সাধারণতঃ দৈনন্দিন ব্যাপারে বাসনকোসন রূপে ব্যবহৃত হয় না। তামার রঙ বেশ লাল, দেখিতে সুন্দর। বায়ুতে বেশীদিন রাখিয়া দিলে ইহা বায়ু হইতে গন্ধক গ্রহণ করার ফলে কপার সালফেট নামক এক সবুজ রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে। জলের সাহায্যে মাজাঘষা করিলে ইহার রঙ আবার ফিরিয়া আসে। তামার ছোট ছোট নকশা-করা থালা, বোল ইত্যাদি গৃহসজ্জার বিশিষ্ট উপকরণ।

পিতল—পিতল একটি সংকর ধাতু। দুই ভাগ তামা ও এক ভাগ দস্তার সংমিশ্রণে পিতল প্রস্তুত। ফুলদানি, বোল (Bowl), পিলসুজ, প্রদীপ ও পুতুলমূর্তি প্রভৃতি পিতলে নির্মিত হয়। পিতলের বালতির ব্যবহারও মন্দ নয়। বেশীদিন অনাবৃত রাখিলে পিতলের রঙ বিবর্ণ হইয়া যায়। ব্রাসো (Brasso) সাহায্যে পিতল, তামা প্রভৃতির জিনিসপত্র মাজিলে ঘষিলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

কাঁসা—ইহাও একটি সংকর ধাতু। সাত ভাগ তামা ও এক ভাগ টিন মিশাইয়া কাঁসা তৈয়ারী হয়। ইহার সহিত দস্তাও কিছু পরিমাণে মিশানো থাকে। এইজন্য কাঁসা দেখিতে উজ্জ্বল। আমাদের গৃহস্থালির অধিকাংশ বাসনকোসন কাঁসায় নির্মিত। বহরমপুরের, খাগড়ার কাঁসার বাসন খুব প্রসিদ্ধ। দৈনন্দিন জীবনে এইসব বাসনের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া এগুলি প্রায় প্রত্যহ মাজা-ঘষা হয়। সেইজন্য এইগুলি বেশ পরিষ্কার থাকে। কাঁসার থালা, গ্লাস, বাটি, পিকদানি, ফুলদানি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থরূপে ব্যবহার ছাড়াও তামা, লোহা, কাচ প্রভৃতি জানালা-দরজায় ব্যবহার করা হয়। দরজার চাবি, ট্রাঙ্ক ও মিটসেফের তালা আটকানোর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়—তাহাতে পিতল ব্যবহার করা হয়। এইগুলিকেও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা দরকার। কাঁসা দামে সস্তা এবং বহুদিন টিকে বলিয়া আমাদের দেশে কাঁসার বাসনকোসনই বেশীর ভাগ বাড়ীতে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই দরিদ্র ; সুতরাং উৎকৃষ্ট থালা-বাসন নির্বাচনের ক্ষমতা তাহাদের নাই। যাঁহাদের সংস্থান আছে তাঁহারাও সুপরিকল্পিত উপায়ে আসবাবপত্র নির্বাচন করেন না। পাশ্চাত্ত্য দেশের ও আমেরিকার লোকেরা উন্নত ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করেন। আজকাল আমাদের অনেকে নানা ভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই গৃহসজ্জা করিয়া থাকেন।

গৃহসজ্জার সুষ্ঠু পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রূপা দামী বলিয়া সাধারণ লোকের গৃহে ইহার বেশী প্রচলন নাই। অল্প আয়ের পরিবারে একটু অল্প দামী সেট রাখিলেও চলে।

এইসব জিনিসের বর্ণ ও আকৃতির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটি সবুজ রঙের পাত্রে সবুজ লেটুস শাক বা লাল রঙের টম্যাটো

রাখিলে সুন্দর দেখায়। তেমনি সুন্দর দেখায় লেবু রঙের পাত্রে বীট ও কমলালেবু। এইসব পাত্র হলদে রঙের টেবিল-ক্লথের উপরে রাখিলে সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত হয়। ক্রিম বা সাদা রঙের লিনেন কাপড়ের উপর রূপার থালা-গ্লাস সুন্দর দেখায়। থালার আকৃতি সাধারণতঃ গোল ধরনের হয়; অনেক সময় জ্যামিতিক আকারের থালাও পাওয়া যায়। আধুনিক গৃহসজ্জার অঙ্গরূপে এইগুলি অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। আমাদের সাধারণ ঘরে মাটির তৈয়ারী ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি বেশী ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কারণ এইগুলি দামে খুবই সস্তা।

ধাতব পদার্থ, চীনামাটির দ্রব্য প্রভৃতির কি কি আসবাবপত্র হয় ও কি ভাবে উহাদের পরিষ্কার করা হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন কাষ্ঠ, বেত ও চামড়া নির্মিত পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কাষ্ঠ—প্রত্যেক গৃহেই কাষ্ঠনির্মিত আসবাবপত্রের প্রাধান্য থাকে। ঘরের আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলনা, দরজা, জানালা সব কিছুই কাঠের তৈয়ারী। এই সমস্ত কাঠ যাহাতে ঘুনে না ধরে বা যাহাতে ইহাদের বার্নিশ নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠের মধ্যে সেগুনের প্রচলনই বেশী। সেগুনকাঠ সহজে ঘুনে ধরে না আর ইহার উপর বেশ ভালভাবে বার্নিশ করা যায়। চেয়ার-টেবিলের রঙ বিবর্ণ হইয়া গেলে এইগুলি পুনরায় রঙ করা দরকার। ভাল শিরীষ কাগজের সাহায্যে উত্তমরূপে ঘষিয়া সব রঙ উঠাইয়া ফেলিয়া তুলির সাহায্যে বার বার ঘন পোঁচ দিলে এই রঙ লাগিয়া থাকে। ইহার ফলে কাঠের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। ফিনল ও রেজিনের মিশ্রণ আধুনিক কালে কাঠ রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। তিসির তেল,

রেজিন জাতীয় পদার্থ, স্পিরিট, টারপেনটাইন ইত্যাদির সাহায্যেও বার্নিশ তৈয়ার করা হয়। গৃহস্থ তাহার প্রয়োজনমত পুরানো আসবাবপত্রকে নিজেই নূতন করিয়া রঙ করিয়া লইতে পারে।

বেত—বেতের আসবাবপত্র কাঠের আসবাবপত্র অপেক্ষা সস্তা ও হাল্‌কা বলিয়া সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। ইহাদের উপর বসিতে বা শুইতে বেশ আরাম। ইজি-চেয়ার, খাট, মোড়া, সোফা, চেয়ার অনেক কিছুই বেত দ্বারা তৈয়ারী হয়। রঙ করিয়া দিলে এইগুলি খুব সুন্দর দেখায়। অনেকদিন ব্যবহারের ফলে ঐগুলি নোংরা হইয়া যায়; তারপর ছারপোকার আবাস হয়। তখন এইগুলিতে মাঝে মাঝে গরম জল ঢালা উচিত; তাহাতেও অনেক সময় ছারপোকা সমূলে নষ্ট হয় না। এইজন্য ডি.ডি.টি. স্প্রে প্রভৃতি ব্যবহার করিলে ছারপোকা একেবারে সমূলে ধ্বংস হয়। ইহার ময়লা পরিষ্কার করার জন্য গরম জল ও সোডা ব্যবহার করা যায়।

চামড়ার ব্যাগ

চামড়া—স্যুটকেস, ব্যাগ, কুশান-কভার প্রভৃতি চামড়া দিয়া তৈয়ারী। ভালভাবে ট্যান করা চামড়া সহজে নষ্ট হয় না; তবে এসব জিনিসের খুব যত্ন নেওয়া আবশ্যক। খোলা অবস্থায় অযত্নে রাখিলে আর্দ্রতায় (Damp লাগিয়া) বা ছত্রাক (Fungus) জন্মিয়া চামড়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। চামড়ায় প্রস্তুত আসবাবপত্র কাপড়ের ঢাকনা দ্বারা আবৃত রাখিলে ভাল থাকে। ব্যবহারের ফলে

অনেক সময় রঙও উঠিয়া যায়। তখন উপযুক্ত বার্নিশের দ্বারা আবার সেই রঙ ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে।

গৃহের পরিচ্ছন্নতা

গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে ঘরের ভিতর ও বাহির সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। মাসে অন্ততঃ একবার ঘরের ঝুল, ময়লা ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং বৎসরে একবার চুনকাম করা ও দরজা-জানালায় রঙ করা দরকার। প্রতিদিন গৃহের চারিদিকও ঝাড়পোঁচ করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। দুই বেলা ঘর ঝাঁট দিয়া ঘর মুছিয়া ফেলিলে ধুলাবালি জমিতে পারে না। দরজা-জানালা ইত্যাদি এবং প্রতিদিনের ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি ইত্যাদি ঝাড়িয়া-মুছিয়া রাখিতে হয়। উহাদের জিনিসপত্রগুলিও নাড়িয়া-চাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দরজা-জানালার পর্দা ও আসবাবপত্রের ঢাকনাগুলি সপ্তাহে সপ্তাহে সাবান দ্বারা পরিষ্কার করিবে। বইগুলি আলমারি হইতে নামাইয়া মাসে একবার রৌদ্রে শুকাইতে হয় এবং ঝাড়িয়া-মুছিয়া নেপথেলিন দিয়া আবার সাজাইয়া রাখিতে হয়।

কাপড়চোপড় রাখিবার আলনাটিতে প্রতিদিনের ব্যবহারের কাপড়চোপড় বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে হইবে। যিনি যেরকম পছন্দ করেন সেইভাবে ভাঁজ করিয়া বা কুঁচাইয়া রাখিবে। টেবিলের উপরের টুকিটাকি জিনিসপত্র—কলম, ফুলদানি ইত্যাদিও রোজ ঝাড়ামোছা করার পর নূতনভাবে সাজাইয়া রাখিলে সুন্দর দেখায়। ঘরের টেবিল-চেয়ারের, খাটের নীচেকার অংশসহ প্রতি দিন ঝাঁট দিয়া মুছিয়া ফেলিলে কোনরকম ধুলাবালি জমিতে পারে না বা পোকা-মাকড় বাসা বাঁধিতে পারে না। ঘরে যে সব ছবি বা

ক্যালেণ্ডার থাকিবে তাহা সপ্তাহে একবার নামাইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় টাঙাইতে হইবে। যেসব বাসনকোসন নিত্য ব্যবহার করা হয় না সেগুলিও মাসে একবার করিয়া পরিষ্কার করা ভাল।

তোলা কাপড়চোপড় ইত্যাদি মাসে মাসে রৌদ্রে দিয়া নেপথেলিন, নিমপাতা বা কালজিরা দিয়া রাখিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং পোকা-মাকড়েও কাটিতে পারে না।

ঘরের পাখা, আলোর বাল্‌ব ইত্যাদিও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিতে হইবে; তাহাতে ঐগুলি দেখিতে সুন্দর হয়. টিকেও বেশীদিন।

পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে শরীর ভাল থাকে, মনও ভাল থাকে, গৃহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়।

প্রতিদিন ঘর মুছিবার সময় একটু ফিনাইল বা ডি.ডি.টি. জলের সহিত মিশাইয়া মুছিলে মশা-মাছির উপদ্রবও কমে, রোগজীবাণুও বাধা পায়। প্রতিদিন রান্নার শেষে রান্নাঘরটি সোডা ও গরম জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

সাজসরঞ্জাম রাখিবার ব্যবস্থা

উপযুক্ত এবং সুপরিকল্পিত ভাবে জিনিস রাখার ব্যবস্থা (Storage) বাড়ীর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। ভাঁড়ার সুন্দররূপে গুছাইয়া রাখিলে অপ্রয়োজনীয় ও অনুপযুক্ত জিনিসপত্রাদি দূরে সরাইয়া রাখা যায়। তাহাতে কাজেরও সুবিধা হয়, সময়ও বাঁচে।

শয়নঘরে সাধারণতঃ কাপড়চোপড়, জামা, বিছানাপত্র, বিছানার চাদর ইত্যাদি, সেলাই-ফোঁড়াইর জিনিস, সাজসজ্জার সামগ্রী, প্রসাধন-সামগ্রী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি রাখিবার প্রয়োজন হয়।

এইগুলি রাখিবার জন্য আলমারি ইত্যাদির কথা শয়নঘরের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিদিনের কাপড়চোপড় আলমারিতে না রাখিয়া আলনায় ও র‍্যাকে রাখা যাইতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শয়নঘরে বাহিরের জুতা রাখা হয় না, ইহার জন্য ঘরের বাহিরে ছোট তাকের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বসিবার ঘরে ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, গানবাজনার যন্ত্রপাতি, নানারূপ শিল্পকলা, কলম, কাগজপত্র, নানারূপ শখের জিনিস, শিশুদের খেলার জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। চেয়ার টেবিল ইত্যাদির কথা বসিবার ঘরের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

খাবারঘরের থালা-বাসন, কাপ, ডিশ ইত্যাদি রাখিবার জন্য তাক বা দেরাজের প্রয়োজন। খাবারঘরের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। খাবারঘরে মূল্যবান জিনিসপত্র রাখিবার জন্য একটি তালা-দেওয়া দেরাজ প্রয়োজন।

রান্নাঘরে রান্নার মসলাপাতি, তরিতরকারীর ও হাঁড়ি, কড়াই, হাতা, খুন্তি ইত্যাদি রাখিবার জন্য তাক বা দেরাজ থাকা একান্ত আবশ্যক। মসলাপাতি কৌটায় রাখিয়া প্রত্যেকটির গায়ে নামের লেবেল আঁটিয়া দিলে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়, অকারণ হয়রান হইতে হয় না। মসলাপাতি একটি আলাদা তাকে বা দেরাজে রাখা বাঞ্ছনীয়। তরিতরকারী রাখিবার জন্য আলাদা তাক বা দেরাজ রাখা ভাল। হাঁড়ি-কড়াই আবার আলাদাভাবে থাকা সুবিধাজনক। হাতা-খুন্তিগুলি ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য র‍্যাক থাকিলে সুবিধা। উনুন ধরানোর সরঞ্জাম সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় তাকের উপর গুছাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা অন্য জিনিস অপরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সমস্ত তাক ও দেরাজগুলি যে জিনিস রাখিবার জন্য তৈয়ারী হইবে তাহার উপযোগী করিয়া এবং সহজে নামান উঠান যায় এই ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে। মেঝে হইতে ১২ ইঞ্চি উঁচুতে তাক হইলেই বেশী সুবিধা হয়, তবে কোন রকমেই ৬ ফুটের উঁচু হইবে না। নীচের তাকটি বেশ চওড়া হইবে যেন ভারী জিনিসগুলি

রান্না ও খাবার ঘর

রাখা যায়। যেখানে যে কাজের জিনিসটি দরকার তাহারই কাছাকাছি তাকটি তৈয়ারী করিবে। বাসনকোসন ও ঘর পরিষ্কার করিবার জিনিসপত্রাদি রান্নাঘরের কাছেই রাখিবে।

বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময় যথাসম্ভব ঘরের সহিত সংলগ্ন

তাক বা দেরাজ করিয়া নিলেই সুবিধা হয়, কারণ তাহাতে জায়গা বাঁচে এবং আসবাবপত্র টানাটানি করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া পরিশ্রমও বাঁচে।

গৃহ ও গৃহকর্ত্রীর প্রভাব

গৃহ আমাদের প্রাণকেন্দ্র। ইহা শুধু আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে না, গৃহের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও পরস্পরের সাহচর্যের ফলে আমরা প্রচুর আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। এই গৃহই আমাদিগকে বিশ্রাম, সুখ-শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, পরস্পরের প্রতি আস্থা ও ভাব বিনিময়, নিরাপত্তা, ভালবাসা সব কিছুরই সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। সত্যিকারেব আদর্শ পরিবার হইতে আমরা জীবন-আদর্শের মূল নীতির সঙ্গে পরিচিত হই। ইহাই আমাদিগকে চরিত্রগঠনে উদ্দীপনা দিয়া থাকে। জীবনের স্পন্দন ও শ্বাসগ্রহণের মত গৃহের প্রতি আকর্ষণ আমাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। প্রত্যেক বালক-বালিকা গৃহকে অবলম্বন করিয়া জীবনের উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে। গৃহের সহিত পরিবারের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহা শিশুদের যত্ন ও আশ্রয়ের স্থান এবং পরিবারের বয়স্ক লোকদের পরস্পর সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ হইবার একমাত্র আশা-ভরসার স্থান।

একটি সাধারণ পরিবারে বাবা, মা ও ছেলেমেয়ে থাকে। আমাদের ভারতীয় সমাজে অতীতে অনেক যৌথ পরিবার ছিল; তাহাতে বাবা, মা, ভাই-বোন নয়, খুড়া, জ্যেঠা প্রভৃতি বহু আত্মীয়-স্বজনও থাকিত। বর্তমানে কিছুটা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে আর কিছুটা আর্থিক বিপর্যয় ও অনটনের ফলে আমাদের পরিবারের কাঠামো অনেকটা সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বাবা, মা, ছেলে,

মেয়ে এই কয়জনের সমবায়ের ভিত্তিতে পরিবার; পরিজনদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও পরস্পরের প্রতি সম্পর্কের উপরেই পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত।

মানবজাতির ইতিহাসে সভ্যতার প্রথম উন্মেষেই পরিবার-কল্পনা সূচিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত সেই কল্পনা অব্যাহত রহিয়াছে। পরিবার শুধু মানুষের আশ্রয়স্থল নয়—ইহা কৃষ্টি, সামাজিকতা ও সভ্যতার যোগসূত্র। কোন বৃহৎ গৃহের চারি দেওয়ালের মধ্যে বহু লোক একত্রে বাস করিলেই তাহাকে গৃহ ও পরিবার বলা চলে না। রক্তের সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও স্বভাবের অনেকগুলি মানুষ পারস্পরিক মতানৈক্য থাকিলেও একটি ঐক্যবন্ধন মানিয়া লইয়া একত্রে বাস করিলে তাহাকেই আমরা পরিবার বলি। গৃহের প্রত্যেক পরিজনই নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিজের সুখ-সুবিধার সঙ্গে অপরের সুখ-সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই গৃহের আদর্শ, নিজের স্বাধীন মত ও সূক্ষ্ম বিচার সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। প্রত্যেককেই সুস্থ, স্বাস্থ্যবান ও সুখী হইতে হইবে এবং প্রেম, প্রীতি, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহচর্য ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়া গৃহের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

কেবলমাত্র একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা গার্হস্থ্য জীবন কোন মতেই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সহিত গৃহকর্মে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই গৃহের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব রহিয়াছে এবং গৃহের সমগ্র জীবনের প্রতি দান রহিয়াছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে গৃহের আবেষ্টনী ও কর্ম-পরিবেশ তাহার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সহায়ক, তবেই সে

মনের আনন্দে গৃহকর্মের সব কিছুই সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইবে। পরিবারের প্রত্যেককে তাহার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করিয়া প্রত্যেকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিবার মত পরিবেশ সৃষ্টি ও ব্যবস্থা গৃহিণীকেই করিয়া দিতে হইবে।

আদর্শ গৃহকর্ত্রীর আবশ্যকীয় গুণাবলী ও কর্তব্য—প্রত্যেক পরিবারেই একজন কর্তা এবং একজন কর্ত্রী থাকেন। কর্তা আর্থিক ব্যবস্থা করেন এবং বাহিরের সবরকম দায়িত্ব বহন করেন। কর্ত্রী আর্থিক বিলিব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ সকল দায়িত্ব পালন করেন। কর্তা ও কর্ত্রীর মিলিত প্রচেষ্টার উপরই পারিবারিক সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। গৃহ ও পরিবারের শ্রেষ্ঠ-আদর্শ-সম্পন্ন কর্তা বা কর্ত্রীর শিষ্টাচার, সরলতা, বিবেচনা, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা, সাহায্য, পরস্পর নির্ভরতা, উদ্দীপনা, সহানুভূতি ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক। অতি শৈশব হইতেই এসব গুণের বিকাশ সাধন বাঞ্ছনীয়। তবেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এইরূপ বিবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে সে উত্তরজীবনে দেশের ও দশের বহু উন্নতি সাধন করিতে পারে। কেহ কেহ এই গুণগুলিকে 'সামাজিক জীবনের অগ্রগতি' বলিয়া মনে করেন। আমাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং অনেকের সহিত সৌহার্দবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য এই গুণগুলি একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র গৃহিণী নন, পরিবারের সকলেরই এইসব গুণ থাকা দরকার। এইসব গুণের অধিকারী হইতে হইলে পরিবারের প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

সুস্বাস্থ্য—কোন কাজ করিতে হইলে শরীরকে সব সময় সুস্থ ও সতেজ রাখা দরকার। স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি কর্মঠ, সহানুভূতিসম্পন্ন,

উচ্চাভিলাষী ও সুখী হয়। মানসিক ও সামাজিক উৎকর্ষ, প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে তাহারা কোনরূপ কষ্ট বোধ করে না। এইসব গুণের অভাব হইলে, পরিবারের ঐক্যসূত্রের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। দুর্বল ও রুক্ষ মেজাজের বশবর্তী হওয়ার দরুন তাহারা পরিবারের কোন কাজে আসে না। যেসব বালক-বালিকা নিয়মিত শরীর পরিষ্কার রাখে, সুখাদ্য গ্রহণ করে, নিয়মিত স্বাস্থ্য-বিধি পালন করে, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে, নির্মল বায়ু সেবন করে, সুনিদ্রা বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের সুযোগ গ্রহণ করে তাহারাই উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য হয় এবং সেই সব রুগ্ণ ব্যক্তি পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতন বালক-বালিকারা নিজের গৃহ ও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে এবং গার্হস্থ্য জীবনের উচ্চতর আদর্শের পরিচয় দিয়া থাকে।

মানসিক উৎকর্ষ—দৈহিক উৎকর্ষের সঙ্গে প্রত্যেক বালক-বালিকার মানসিক উৎকর্ষও থাকা দরকার। মানসিক উৎকর্ষের ফলে বালক-বালিকারা সাহস, শান্তি, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, আত্ম-বিশ্বাস, বোধশক্তি, নিপুণতা, আশাবাদ, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়। তাহারা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিতে শিখে, সমালোচনার সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা রাখে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজকে মানাইয়া চলিতে জানে

সূক্ষ্ম অনুভূতির বিকাশ—মানবজীবনের হৃদয়াবেগের মধ্যে তিনটি প্রধান—প্রেম, ক্রোধ ও ভয়। স্বীয় সুখ ও অপরের সুখ বিধানের জন্য এই সব বিষয়ে আত্মসংযম থাকা দরকার। যাহারা ক্রোধ সংযত করিতে শিখিয়াছে তাহারা যখন কাহারও উপর অন্যায় ও

অবিচার করা হয় তখনই ক্রুদ্ধ হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করিতে সাহায্য করে। 'ভয়কে' সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে মানুষ দৈনিক ও নৈতিক সাহসের অধিকারী হয়। চরিত্রের গুণাবলী ও সমষ্টিগত অভ্যাস মানুষের সত্যকারের পরিচয়। পরিবারের প্রত্যেকের সুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে এই সমস্ত বিভিন্ন গুণের সমাবেশের উপর। ব্যক্তিগত ভাবে এইসব গুণের অভাব হইলে তাহারা অবিবেচক, রুক্ষ ও তার্কিক হইয়া উঠে। এইজন্য পরিবারের কল্যাণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইসব সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে উদ্যম ও সময়ের অপচয় ঘটে না, অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় ঘটনা ঘটে না, সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অবকাশও থাকে না।

পরিজনদের সহিত গৃহকর্ত্রীর সম্পর্ক—গৃহের শান্তি ও আনন্দ রক্ষা করিবার জন্য যদিও পরিবারের প্রত্যেক পরিজনেরই গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তথাপি গৃহিণীই এজন্য মুখ্যতঃ দায়ী। তন্মধ্যে প্রধান কর্তব্য তিনটি—(১) প্রথমতঃ গৃহের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য আয়ের ব্যবস্থা করা; (২) এই অর্থ বিবেচনার সহিত ব্যয় করিয়া যাহাতে সমগ্র পরিবার উপকৃত হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা; (৩) এই সমস্ত দ্রব্য ও সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে যাহাতে গৃহের প্রত্যেকটি পরিজন শারীরিক, মানসিক ও সূক্ষ্ম অনুভূতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করিতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া।

এইসব কাজ সুসম্পন্ন করিবার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির। এইসব কাজের মধ্যে গৃহকে সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করা, পুষ্টিকর খাদ্য যোগান, স্বাস্থ্যবিধি পালন, পরিচ্ছদ ক্রয়, পীড়িতের সেবা, শিশুদের নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক

বিকাশ, পরিবারের উপার্জিত অর্থের ব্যয়, পরিজনদের সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গৃহিণীকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে।

পরিবারের স্বার্থের খাতিরে একত্রে কাজ করা—পরিবারের উন্নতিকল্পে একত্রে কাজ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও গর্ব জাগিয়া উঠে। পরস্পরের সহযোগিতার ফলে আমরা অপরের অধিকারের প্রতি সচেতন হইয়া উঠি এবং পরিবারের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে নিজকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিতে শিখি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গৃহের পরিজনের প্রত্যেকেরই গৃহ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে। যদি কোন ব্যক্তি গৃহের প্রতি তাহার কর্তব্য পালন করিতে পরাঙ্মুখ হয় তবে সমগ্র পরিবারের শান্তি ও ঐক্য ব্যাহত হয়। বয়সের সঙ্গে আমাদের বোধশক্তি ও কর্মশক্তি বাড়িয়া চলে, আমরা অধিকতর দায়িত্ব বহন করিতে শিখি এবং অধিকতর সুখ-সুবিধা উপভোগ করিয়া থাকি। এইজন্য গৃহসমস্যা সমাধা করিয়া অপরের সুখ-সুবিধার বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি। পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ ও অধিকারের প্রতি সচেতন মনোভাবের উপর গৃহের সুখশান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। সংসারে একত্র বাস করিতে গেলে মানুষমাত্রেরই ভুলত্রুটি হইবেই। পরস্পর পরস্পরের ভুলত্রুটি সংশোধন ও ক্ষমা করিয়া চলিতে পারিলেই পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ছোট শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই গৃহ-পরিচালনা সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য পরিবারের ছোট বড় সকলেরই গৃহিণীর সহিত সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা করা উচিত, নতুবা সংসারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

শিশুদের কাজ—বড়দের তুলনায় ছোটদের দায়িত্ব অনেক লঘু হইবে ইহাই স্বাভাবিক। অনেক শিশুই নিজেদের অজ্ঞাতসারে

গৃহের কিছু কিছু কাজ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কয়েকটি হইল এই—নিজের ও গৃহের যত্ন নেওয়া, কাপড়-জামা আলনায় ঝুলাইয়া রাখা, রান্নার কাজে সহায়তা করা, পিঁড়ি দেওয়া বা টেবিল সাজানো, থালা-বাসন পরিষ্কার করা, আসবাবপত্র ধোয়া মোছা, বাড়ীঘর ও উঠান ঠিক রাখা।

প্রত্যেকেরই ভুলত্রুটি স্বীকার করা এবং যাহাতে সেগুলি সংশোধিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই পরস্পরের কাজ ও ভাব বিনিময়ের ভিতর দিয়া বালক-বালিকারা উন্নত গৃহ-জীবনের অধিকারী হয়। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা না বুঝিয়া শুনিয়া, স্বার্থের বশীভূত হইয়া অন্যায় আবদার করে। গৃহস্বামীর আয় যথেষ্ট না থাকা সত্ত্বেও তাহারা ভাল পোশাক, ভাল খাওয়া, ভাল থাকিবার ঘরের জন্য দাবি করে। মাতাপিতার সাংসারিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহারা যদি নিজের নির্ধারিত অংশ প্রফুল্ল ও হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে, তবেই গৃহের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক পরিজনেরই ভাবা উচিত যে তাহার কথাবার্তা ও কর্মধারা যেন অপরের অসন্তোষ সৃষ্টি না করে। শৈশব হইতেই চিন্তাধারা সুনিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। অনেক পরিবারে কোন কোন পরিজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়; যেমন—ছোট্ট বাচ্চা, বয়োবৃদ্ধ বা বৃদ্ধা কিংবা পঙ্গু ব্যক্তি। গৃহের স্বার্থের এবং মানবতার খাতিরে ইহাদের কিছু সুবিধা দিতে হইবেই, কিন্তু কোন অবস্থাতে ইহাকে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

মায়ের কর্তব্য—মা গৃহের কর্ত্রী। গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুদের প্রতি নজর, পরিবারের খাওয়া-পরার দিকে দৃষ্টি, গৃহের রুগ্ণ ব্যক্তিদের সেবা—ইহাই মায়ের প্রধান কাজ। অনেকে মনে করেন মায়ের শুধু পরিবারের খাওয়া-পরার দিকে লক্ষ্য করা একমাত্র কাজ।

তাঁহারা ভুলিয়া যান আদর্শ পরিবারে সহানুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি রাখা মায়ের একান্ত কর্তব্য। পরিবারের শ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া অবসর বিনোদন করিতে পারে সেই দিকে মা-ই দৃষ্টি রাখেন। বালক-বালিকা স্কুলে কি করিল এবং স্কুলে কি নূতন ঘটনা ঘটিল সব কিছু জানিবার জন্যই মায়েদের আগ্রহশীল হওয়া উচিত।

কোন কোন মা নিজের গৃহকাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে পরিবারের বিভিন্ন পরিজনের সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি দিতে পারেন না। যদি তাহাই হয় তবে গৃহের অন্য পরিজনের উচিত মায়ের কাজের ভার লঘু করা যাহাতে তিনি অবসর সময়ে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারেন এবং গৃহসমস্যা মিটাইতে পারেন

মায়েদের অনেকে ঘরের বাহিরে কাজ করিতে বাধ্য হন। সেই ক্ষেত্রে গৃহকর্ম সুসম্পন্ন করিতে ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অন্য লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই সব মা উপার্জনের দ্বারা পরিবারের আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহাদের এই দানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহাতে গৃহকর্ম সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মায়ের অন্য কাজ গৃহ নির্বাচন। কিরূপ বাড়ীতে বসবাস করা আরামদায়ক, বাড়ীভাড়া কতটা হওয়া উচিত ইত্যাদি বিবেচনা করা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাওয়া-দাওয়ায় কতটা খরচ করা উচিত, আয় অনুযায়ী কি ভাবে শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ ও কাপড়-চোপড়ে ব্যয় করা দরকার মা-ই তাহা ঠিক করিবেন। মা-ই গৃহের শ্রেষ্ঠ অধিকর্ত্রী। সমস্ত পরিবারের সুখ-সুবিধার দায়িত্ব তাঁহার হাতে। গৃহকে পরিষ্কার, চিত্তাকর্ষক, সাচ্ছল্যপূর্ণ করা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করাই মায়ের কাজ।

এক কথায় মায়ের উপরই সংসারের প্রায় সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। সেইজন্য গৃহকর্ত্রীর সহনশীলতা, ধৈর্য, সুবিবেচনা, নিষ্ঠা ও দরদ—এই গুণগুলি একান্ত আবশ্যক। শিশুর জীবনে মায়ের সাহচর্য অত্যাবশ্যক। মায়ের সাহচর্য ও সহানুভূতি ব্যতীত শিশুর শারীরিক বা মানসিক কোন দিকই উত্তমরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। মায়ের কাজকর্মে চলাফেরায় যদি শৃঙ্খলা না থাকে, সংযম না থাকে, তবে শিশুর মধ্যেও তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ের আত্মমর্যাদা-বোধ, সংযম শিশুর জীবনেও প্রতিফলিত হয়। কারণ শিশু শৈশবে মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে এবং সর্বদা মায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে বলিয়া মায়ের চালচলন, আচার-আচরণ খুব আগ্রহ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে। এই পর্যবেক্ষণের ফলে শিশুর মনে সেই সব কাজ ও ভাব গভীর ভাবে দাগ কাটিয়া যায়। উত্তরকালে সে যখন বড় হয় তখন তাহার মনের সঞ্চিত সেই ভাবধারা কার্যক্ষেত্রে তাহাকে পরিচালিত করে।

অনেক সময় মা, বাবা ও অন্য অভিভাবকগণ শিশু কিছু বোঝে না মনে করিয়া, তাহার সম্মুখেই অনেক অন্যায় বা অশিষ্ট আচরণ বা আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান শিশুর পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও অনুকরণ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ করিয়া মা-বাবাকে সে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া জানে, কাজেই সে মা-বাবার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ অনুকরণ করিতে ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং মা-বাবা দুইজনেরই আদর্শচরিত্র হইতে চেষ্টা করা উচিত। শিশুর সম্মুখে এমন একটা উচ্চ আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে যাহার অনুপ্রেরণায় শিশুর চরিত্রগঠন হইবে। মা-বাবার পরস্পরের আচরণের মধ্যেও সংযম ও শৃঙ্খলা থাকা অত্যাবশ্যক।

ইহা ছাড়া আমাদের দেশে পরিবারে ঠাকুরমা, ঠাকুর্দা, খুড়া,

জ্যেঠা প্রভৃতি অনেকে থাকেন। তাঁহারাও যাহাতে পরিবারে নিজেকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মনে করিতে পারেন কর্ত্রী সেই ভাবে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। তাঁহারা উপার্জন না-ও করিতে পারেন, কিংবা শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বা বার্ধক্য-হেতু কোন কাজ না-ও করিতে পারেন, তথাপি তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁহারা বুদ্ধি-পরামর্শ দ্বারা গৃহ পরিচালনায় অনেক সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহাদের সহিত এইরূপ আলোচনা করিলে তাঁহারা নিজেদের উপর অনেকখানি বিশ্বাস রাখিতে পারেন এবং নিজেদের অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া দুঃখও পান না, আবার জীবন বিড়ম্বনা স্বরূপও মনে করিতে পারেন না। ইহার ফলে তাঁহাদের মনে আত্মতৃপ্তি ফুটিয়া উঠে এবং তাঁহারা পরিবারের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহাদের এই সন্তুষ্টি পরিবারের সকলের মনেও শান্তি দেয় এবং পরিবারের কল্যাণ হয়।

ঠাকুরমা-ঠাকুর্দা সম্পর্কটি বড় মধুর। ঠাকুরমা-ঠাকুর্দা নাতি-নাতনীদের বন্ধুস্থানীয়। যে কথা পরিবারের আর কাহাকেও বলিতে পারে না, ঠাকুরমা-ঠাকুর্দাকে তাহা বলিতে বালকবালিকাদের দ্বিধা হয় না। যত কিছু আদর-আবদার ঠাকুরমা-ঠাকুর্দার কাছে। তাঁহারাও অতি সহানুভূতির সঙ্গে সানন্দে নাতি-নাতনীদের আবদার সহ্য করেন ও পূরণ করিতে চেষ্টা করেন। পূর্বে আমাদের দেশে যৌথ পরিবার থাকার দরুন শিশু বয়স হইতেই ঠাকুরমার ঘরেই ছেলেমেয়েরা থাকিত; দিনের বেশীর ভাগ সময়, এমন কি রাত্রেও ঠাকুরমা, পিসীমা যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের কাছেই অতিবাহিত করিত। শিশুদের চরিত্রগঠনে ঠাকুরমা-ঠাকুর্দার অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করিয়া পারা যায় না। বেশীর ভাগ সময় ঠাকুর-মাদের কাছে থাকিত বলিয়া মা-বাবার সম্পর্কে শিশুদের অনাবশ্যক

কৌতূহল বা ঔৎসুক্য ছিল না এবং কতকগুলি আচার-ব্যবহার তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইত না। ইহাতে তাহাদের মানসিক জটিলতা বা চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা খুব কমই থাকিত। ঠাকুরমার কাছে নানারূপ গল্প শুনিয়া, ঠাকুরমার স্নেহ-ভালবাসায় তাহারা নিরুদ্বেগে জীবন কাটাইত। এইজন্য পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় আমাদের দেশে মানসিক অবসাদগ্রস্ত লোক খুব কমই ছিল। ঠাকুরমা-ঠাকুর্দাদের সাহচর্য নাতি-নাতনীদের জীবনগঠনে একটি অমূল্য সম্পদ।

গৃহে যে সকল দাসদাসী আছে তাহাদের প্রতিও গৃহিণীর নজর রাখিতে হইবে। তাহারা যাহাতে অনাদৃত না হয়, তাহারা যেন বাড়ীর দশজনের মতই খাওয়া-দাওয়া পায় গৃহিণী সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। কারণ তাহারা খাওয়া-দাওয়ার জিনিস নাড়াচাড়া করে বলিয়া তাহাদেরও উত্তম খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা হয়। তাহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে সময়মত এবং প্রয়োজনমত বিশ্রাম পায় সেদিকেও খেয়াল রাখিতে হইবে। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন গৃহিণী সে সকলের ব্যবস্থা করিবেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলে এবং শিশুরা যাহাতে তাহাদের সহিত বাড়ীর লোকের মত ব্যবহার করে তাহাও গৃহিণীর দেখা কর্ত্তব্য। সর্বদা তাহাদের মতামতের মূল্য দিতে হইবে যেন তাহারা পরিবারের একজন রূপেই নিজেদের মনে করিতে পারে। ব্যক্তি হিসাবে তাহাদের মতামতের মূল্য দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে এবং পরিবারের কল্যাণকামী হইয়া উঠিবে। ইহাতে তাহাদের নিজেদের প্রতি আস্থা আসিবে। তাহাদের এই সন্তুষ্টি ও আস্থা সমগ্র পরিবারের কল্যাণ এবং সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে।

পিতার কর্ত্তব্য—পিতাই গৃহের কর্তা। তিনি সব কিছু যোগান

ও গৃহকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁহার উপস্থিত আয় হইতে পরিবারের সব কিছু আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করা হয়। সমস্ত বিপদ হইতে গৃহকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতাদের মধ্যে অনেকেই ভোরের বেলা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যান এবং সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসেন। এই গুরু কার্যভারের দরুন ও বাড়ী হইতে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা তাহাদের বাবাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

পিতা পরিবারের প্রত্যেকটি পরিজনের সুখ-সুবিধা অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মায়ের সমস্যাগুলি তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়া নেন এবং মায়ের সহযোগিতায় গৃহ ও পরিবারের প্রত্যেকের বিষয় ভাবিয়া দেখেন। পিতার এই সহানুভূতিশীল দৃষ্টির জন্য পরিবারের সকলেই নিজেকে নিরাপদ ও সুখী মনে করে। অবসর সময়ে গৃহের কোন কোন পুরাতন জিনিস তিনি মেরামত করেন, বাগানের যত্ন নেন এবং সংসারের যাবতীয় জিনিস ক্রয় করিয়া পরিবারের সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করেন। পিতা যদি দিনের শেষে পরিবারের সকলের খোঁজখবর করেন, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন, সন্তানদের সহিত গল্পগুজব করেন তবে পরিবারের আবহাওয়া বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাবে চলিতে পারেন। মা ও বাবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন পারিবারিক জীবন সুপরিচালিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না।

পরিবারের প্রতি মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য—মেয়েরা তাহাদের উত্তরজীবনে মায়ের দায়িত্ব লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইবে। এইজন্য অল্প বয়স হইতে যাহাতে তাহারা দক্ষতা অর্জন করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গৃহকর্ত্রীদের সময় ও শক্তির অনেকখানিই দিনে চারি বার আহারের যোগানে ব্যয়িত হয়। ভিন্ন

রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে পূর্ব হইতেই ভালভাবে চিন্তা করিতে হয়। পরিবারের পরিজনেরা তাহাদের ইচ্ছামাফিক ফরমাস গৃহকর্ত্রীর কাছে নিবেদন করিতে পারে। বালক-বালিকারা অনেক সময় কয়েক দিনের বা সপ্তাহের খাদ্য-তালিকা নির্ধারিত করে। কখনও কখনও তাহারা প্ল্যান করিয়া সমস্ত খাদ্য তৈয়ার করে এবং যে যে রান্নায় তাহারা দক্ষতা অর্জন করিয়াছে সেইসব রান্না করিয়া পরিবারের সকলের মনস্তুষ্টি করে এবং নিজেরাও তৃপ্তি পায়।

আহার প্রস্তুত করিবার সময় গৃহকর্ত্রীদের মনে রাখিতে হইবে কাহার কি রকম খাদ্য দরকার। ছোট ছেলেমেয়েদের ও বৃদ্ধদের জন্য দুধ, ডিম, শাকসব্জী ও টাট্‌কা ফলের দ্বারা খাদ্য-তালিকা তৈয়ার করিতে হইবে। এইসব খাদ্য বেশ সহজে হজম করা যায়। দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য শিশুদের খাদ্য দরকার আর বয়স্কদের শুধু দেহের অভাব মিটাইবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য-তালিকার ভিতরে যেন সব সময় প্রোটীন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন থাকে এইদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যদি গৃহকর্ত্রীরা এক সপ্তাহের খাদ্য-তালিকা তৈয়ারী করেন এবং এক সপ্তাহের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লন, তাহা হইলে আর্থিক দিক হইতে পরিবারের লাভ হয়। বাজারে অনেক সময় বহুদিনের বাসি জিনিস থাকে। এইজন্য ফেরীওয়ালার কাছ হইতে গ্রাম হইতে আনীত তরিতরকারী কিনিলে অনেক সময় সস্তা ও টাট্‌কা পাওয়া যায়।

প্রত্যেক গৃহকর্ত্রীরই খাওয়া-খরচের জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক নির্ধারিত করা উচিত। কয়েক সপ্তাহ বা মাসের খরচ দেখিয়া সে তাহার পরিবারের একটা সাধারণ গড়পড়তা খরচ ঠিক করিতে পারে। আয় অনুসারে খাদ্যের ব্যয় ঠিক করা হয় একথা সত্য।

তবে টাকার উপরে যে সব সময় খাদ্যের গুণ নির্ভর করে তাহা নয়; খাদ্যের পুষ্টিকারিতার উপরই খাদ্যের মূল্য নির্ভর করে। প্রত্যেক বালক-বালিকাকেই পরিবারের খাদ্য-বাজেট সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা রাখিতে হইবে এবং যাহাতে পরিবারের খাদ্য-সমস্যার সুরাহা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক বালক-বালিকা তরি-তরকারী উৎপাদন করিয়া, হাঁস-মুরগী পালন করিয়া পরিবারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। মায়েরা যদি এই সব কাজে সর্বদা বাড়ীর বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে রাখেন তবে তাহারা ছোটবেলা হইতেই এইসব কাজে নিপুণ হইতে পারে।

খাদ্যকে চিত্তাকর্ষক করিয়া পরিবেশন করা—যেহেতু দেহের পরিপুষ্টির জন্য একই রকম জিনিস সপ্তাহে বহুবার রান্না করা হয়, সেইজন্য এইসব জিনিস যাহাতে চিত্তাকর্ষক রূপে রান্না ও পরিবেশন করা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। খাদ্যপূর্ণ থালা শুধু দেখিতে চিত্তাকর্ষক হইবে না, যাহাতে প্রত্যেক রান্নাকরা পদার্থ মনে আনন্দ দেয় তাহাও দেখিতে হইবে। আগেকার যুগের ভারতীয় মেয়েরা কত কারুকার্যখচিত ছানার সন্দেশ, নারিকেল সন্দেশ, নানা প্রকার পিঠা-পায়েস তৈয়ার করিয়া এবং মাছ, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া পরিবারের আনন্দবর্ধন ও অতিথিদের মনস্তুষ্টি বিধান করিতেন। বর্তমান যুগেও যাহাতে মেয়েরা এইরূপ সুপরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটি থালার ভিতরে কয়েক প্রকারের ব্যঞ্জন একত্রে দিলে ইহা দেখিতে সুন্দর হয় না, আহারকারীও সন্তুষ্টচিত্তে খাইতে পারে না। খাওয়ার সময় তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাতে আনন্দময় হয় সেইদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। স্ফূর্তি ও আনন্দের ভিতর দিয়া বেশ তৃপ্তিতে খাওয়া হইলে আহার্য দ্রব্য সহজে হজম হয়।

পরিবেশনকারিণীদের পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত যাহাতে কোন প্রকারে আহারকারীদের মনে ঘৃণার উদ্রেক না হয়। পরিবেশনের কাজটি বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা করাইলে তাহারা ইহার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ইহাতে মায়ের অনেক সাহায্যও হয়। সকাল-বিকালের জলযোগ, ছেলেদের টিফিন কি রকম হওয়া উচিত বাড়ীর মেয়েদের তাহা ঠিক করিতে হয়। সকালবেলা পাঁউরুটী, টোস্ট, মাখন, চা, ডিম ইত্যাদি সাধারণতঃ খাওয়া হয়। রুটীর সাহায্যে স্যাণ্ডউইচ (Sandwich) প্রস্তুত করিলে তাহা খুব পাতলা করিয়া কাটা দরকার। টাট্‌কা রুটী অপেক্ষা বাসি রুটী স্লাইস করা সহজ। রুটীর উপর মাখন দিলে তাহা খাইতে আরও সুস্বাদু হয়। আমাদের দেশে সকালবেলা চা বা কফির সঙ্গে মুড়ি-নারিকেল, চিড়া, দোভাজা চিড়াও দেওয়া যাইতে পারে।

খাদ্যের ভিতর প্রোটীন খাদ্যই শ্রেষ্ঠ। মাংস, ডিম, মাছ প্রভৃতি গৃহে ব্যবহৃত হয়; আলু, কপি, শালগম বা অন্যান্য তরকারী সহযোগে বিভিন্ন ভাবে রান্না করিয়া দিলে আহারকারীর মনে আনন্দ হয়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন ভাবে আচার, ফলের পায়েস, ফ্রুট স্যালাড (Fruit salad) প্রভৃতিরূপে পরিবেশন করা যাইতে পারে।

মেয়েদের দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রান্নাই প্রধান। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ইহার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হইত। জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় সমাজের পরিবর্তন আসিয়াছে। মেয়েদের অন্য নানাবিধ কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহারা বেশীর ভাগ সময় রান্নায় মনোনিবেশ করিতে পারে না। রান্না ছাড়া গৃহের অন্যান্য কাজের দায়িত্ব মেয়েদের গ্রহণ করিতে হয়। আর্ত ও

পীড়িতের সেবা, ঘর-দোর গোছানো, ছোট ভাইবোনদের যত্ন নেওয়া, বাড়ীর হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি নানারূপ দায়িত্ব আছে।

সেবা ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলে মেয়েরা যেরূপ সুসম্পন্ন করিতে পারে ছেলেরা সেইরূপ পারে না। রোগীর জন্য পথ্য তৈয়ার করা, সময়মত ঔষধ খাওয়ান, থার্মমিটার সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয় করা, রোগীর গা স্পঞ্জ করিয়া দেওয়া, বেড-প্যান দেওয়া—এইসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার দায়িত্ব মেয়েদের। ঘরের আলনা গোছানো, বিছানাপত্র পরিষ্কার রাখা, ঘর মোছা, ঘর ঝাড় দেওয়া, সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দেওয়া, ছোট ছেলেমেয়ের কাপড়-জামা কাচা, তাহাদের স্নান ও খাওয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া—সব কিছুর দায়িত্বই মেয়েদের। তাহা ছাড়া নিয়মিতভাবে সংসারের যাবতীয় খরচের হিসাবপত্র রাখিলে পরিবারের অনেক উপকার হয়।

মেয়েরা আজকাল বাহিরের কাজ করে বটে, তবুও তাহাদের বেশীর ভাগ কাজের দায়িত্ব গৃহের ভিতর। সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া মায়েরা মেয়েদের গৃহকর্ম সুসম্পন্ন করিতে শিক্ষা দিলে পরিবারের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, মায়ের কষ্ট লাঘব হয় এবং মেয়েরা ভবিষ্যৎ গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ছোটবেলা হইতেই মায়েদের এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে বড় হইয়া মেয়েরা আপনা হইতেই এইসব কাজকে কর্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারে এবং মায়ের কাজে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়।

বন্ধু নির্বাচন ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা—জীবনকে ভালভাবে গঠিত করিতে হইলে বন্ধুবান্ধবের প্রভাবকে আমরা এড়াইয়া চলিতে পারি না। মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী সে বন্ধু নির্বাচন করে, নিজের ও বন্ধুবান্ধবের সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়। এই মেলামেশার ফলে সে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। জীবনের

সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে এই মেলামেশার উপরে। শুধু ঘরের কোণে যাহারা কুণো হইয়া বসিয়া থাকে, বহির্জগতের অনেক কিছুরই সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ঘটে না ; সেইজন্য তাহাদের জ্ঞানও পরিস্ফুট হয় না, মনেরও প্রসারতা বাড়ে না।

পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজের কাঠামো আমাদের দেশের সমাজের কাঠামো অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহার ফলে তাহারা অনেক ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া নেওয়ার সুযোগ পায়। ইহার ভাল-মন্দ বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সমাজে ছেলেমেয়েদের মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য এবং সৌন্দর্যানুভূতির গুণ সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য পরস্পরের সান্নিধ্য ও বোঝাপড়ার আবশ্যকতা আছে।

যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু চিত্তাকর্ষক, তাহার দিকে প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ঝোঁক আছে। প্রত্যেক মানুষের ভিতর একরূপ অন্তর্নিহিত গুণ থাকিতে পারে যাহা অনুকরণ করিয়া অপরে শিখিতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক স্কুল-কলেজে সামাজিক উৎসব, বিতর্ক-সভা, পিক্‌নিক, দেশভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রচলন আছে। পুস্তক 'মূক বন্ধু'। পুস্তকের নির্বাক ভাষা কোন দিনই সচল প্রাণবান মানুষের ভাষার মত সুন্দর ও সার্থক হইতে পারে না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধুর গুণাগুণ বিচার না করিয়া শুধু ভাবাবেগের বশেই আমরা বন্ধু নির্বাচন করিয়া থাকি। ইহাতে অনেক সময় কুফল ফলিবার সম্ভাবনা থাকে। বন্ধুর চারিত্রিক দোষের প্রভাব অলক্ষিতে আমাদের উপর ধীরে ধীরে বর্তিয়া থাকে। ইহার ফলে অকল্যাণই সাধিত হয়। মাতা, পিতা বা বাড়ীর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করিয়া বন্ধু নির্বাচন করিলে ভাল হয়।

সৎবন্ধু লাভ জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাহাতে মন কষাকষি না হইয়া বন্ধুত্বের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বার্থশূন্য হইয়া অকৃত্রিম ভালবাসার উপরে যদি বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলেই বন্ধুত্ব স্থায়ী হইবে। পরস্পর ভাব বিনিময় ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানে উভয়েই উপকৃত হইব—এই নীতি গ্রহণ করিয়াই আমরা বন্ধু হিসাবে পরস্পর মিশিব, এই হইবে বন্ধুর মনোবাসনা। ইহার দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রত্যেকেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। এখানেও মাতা, পিতা বা অভিভাবকের সতর্কদৃষ্টি ও সহানুভূতি জাগ্রত প্রহরীরূপে কাজ করিবে। ছেলেমেয়েরা কি ধরনের, কি বয়সের, কোন্ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সহিত মেলামেশা করে, কিরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের পারিবারিক আবহাওয়া, কৃষ্টি, সভ্যতা, চারিত্রিক যোগ্যতা কিরূপ ইত্যাদি সর্বাঙ্গীণ অবস্থার সন্ধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লইয়া তবেই ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব করিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য।

ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী-সহপাঠিনীদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মাঝে মাঝে মাতাপিতা তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের চারিত্রিক পরিচয় নিবেন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের ছেলেমেয়ের সহিত উহাদের মিশিতে দিতে পারেন কিনা। যাহাদের সংস্কৃতি, রুচি ও শিক্ষা সমান, কেবল তাহাদের সহিতই বন্ধুত্ব করা ভাল, নতুবা সর্বদা বন্ধুত্বের ফল খুব ভাল হয় না।

মোট কথা ছেলেমেয়ের বন্ধু নির্বাচনে মাতাপিতার বিবেচনা ও বুদ্ধি থাকা একান্ত প্রয়োজন। যখন তিনি কাহারও সম্পর্কে নিঃসংশয়

হইবেন তখনই তাহাদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মিশিতে দিবেন, নতুবা প্রথম হইতেই মেলামেশা বন্ধ করিয়া দিবেন। কারণ অল্পবয়সে বিবেচনা পরিপক্ক থাকে না, দূরদর্শিতাও থাকে না। পিতামাতার বিবেচনা ও দূরদর্শিতাই এখানে ছেলেমেয়েদের পথপ্রদর্শন করিবে। ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা দিবেন, কিন্তু তাহাদের উপর সতর্কদৃষ্টি রাখিবেন যেন স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় না পায়। অবাধ স্বাধীনতার পরিণাম বড়ই বিষময় হয়; সুতরাং মাতাপিতার দায়িত্ব এখানে অপরিসীম।

1. What points would you look for when selecting a house in a town? Draw up a plan for an ideal house in a town. (শহর অঞ্চলে গৃহ নির্বাচন করিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবে? শহরের একটি আদর্শ গৃহের নকশা প্রস্তুত কর।) C. U. 1949

2. What principles should guide you in selecting a site for a house? (গৃহনির্মাণের স্থান নির্বাচন করিতে হইলে কোন্ কোন্ আদর্শের দ্বারা তুমি পরিচালিত হইবে?)

3. What points would you look for when selecting a house? What factors would influence your choice? (গৃহ নির্বাচন করিবার প্রাক্কালে কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখিবে? কোন্ কোন্ বিষয়গুলি তোমার পছন্দকে প্রভাবিত করিবে?) C. U. 1950

4. What are the factors which you should consider in choosing a site for a house in a village? (গ্রামে

গৃহ নির্মাণের স্থান নির্বাচনে কোন্ বিষয়গুলি তুমি বিবেচনা করিবে ?)

5. What is an ideal home ? Name the duties that a mother has to perform in a home. What are your responsibilities at home ? (আদর্শ গৃহ বলিতে কি বোঝ ? গৃহে মাকে কি কি কর্তব্য পালন করিতে হয় উল্লেখ কর। গৃহে তোমাকে কি কি দায়িত্ব বহন করিতে হয় ?) C. U. 1960

6. Describe the duties which a housewife has to perform from morning till night in the average middle class family. (সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীকে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কি কি কর্তব্য পালন করিতে হয় তাহা বর্ণনা কর।) C. U. 1945

7. What are the duties of a home maker ? When could you say a house is efficiently managed ? (গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য কি কি ? একটি গৃহ সুনিপুণভাবে পরিচালিত হইতেছে ইহা তুমি কখন বলিতে পার ?) C. U. 1953

8. "The words beauty, comfort and convenience seem belong to a happy well-ordered home."—Discuss. ("সৌন্দর্য, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এই কথাগুলি সুখী এবং সুশৃঙ্খল গৃহ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।"—আলোচনা কর।) C. U. 1961

9. Discuss the importance of planning. What are the duties and responsibilities of a girl in her family ? (পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। কোন মেয়ের স্বকীয় পরিবারের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব কি কি ?)

10. State briefly what steps you would take in maintaining a clean and healthy home. (গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও

স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হইলে তোমাকে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।) C. U. 1948

11. In planning a new home should you give special thought to the following ?—(a) Structure, (b) Ventilation, (c) Drainage arrangement. [(ক) গঠন-প্রণালী, (খ) বায়ু-সঞ্চালন, এবং (গ) পয়ঃ-প্রণালী ব্যবস্থার প্রতি নূতন গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার প্রাক্কালে তুমি দৃষ্টি রাখিবে কি ? কারণসহ উত্তর লিখ।] C. U. 1960

12. Point out the essential features of a home. Any place which supply you with food and shelter cannot be your home. Discuss. (গৃহের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু কি তাহা উল্লেখ কর। যে কোন স্থান তোমার খাদ্য এবং বাসস্থান যোগাইতে সমর্থ হইলেই তাহাকে গৃহ বলা যায় না।—আলোচনা কর।)

13. What are the main principles underlying good ventilation ? (উত্তম বায়ু সঞ্চালনের প্রধান উপায়গুলি কি কি ?)

14. What are the methods of purification of drinking water ? (পানীয় জল বিশুদ্ধ করণের উপায়গুলি কি কি ?)

15. What are the principles of decorating a room ? Make a list of articles that you should keep in your bedroom. (একটি কক্ষ সজ্জিত করিতে কি কি নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে ? শয়নঘরে যে সব আসবাবপত্র রাখিবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।)

16. Draw a diagram to show the arrangement of drawing-cum-dining room. (ভোজনের ব্যবস্থাসহ বসিবার ঘরের সজ্জা-বিন্যাসের একটি চিত্র অঙ্কিত কর।)

17. What colour-scheme would you like to have for the different room in your house ? (তোমাদের বাড়ীর বিভিন্ন গৃহের জন্য কি প্রকার রঙের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে চাও ?)

18. Make a list of equipments that you might keep in your drawing room. What part does curtain play in interior decoration ? (বৈঠকখানায় তুমি যেসব আসবাব রাখিবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। গৃহের আভ্যন্তরিক সজ্জার ক্ষেত্রে পর্দার প্রয়োজনীয়তা কি ?)

19. What do you know about the system that is generally employed for the disposal of body-wastes in big cities. (বড় বড় শহরে দেহ-নিঃসৃত ক্লেদসমূহ দূর করিতে যে সকল প্রণালী সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয় তুমি সেগুলি সম্পর্কে কি জান ?)

20. Describe different system of filtration for purification of drinking water. (পানীয় জল বিশুদ্ধ করিতে যেসব বিভিন্ন পরিস্রাবণ-পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায় সেগুলির বর্ণনা দাও।)

21. Account for the various systems employed for the disposal of wastes. (নোংরা দ্রব্যসমূহ দূর করিবার নিমিত্ত যে সকল বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার বর্ণনা কর।)

22. Describe the arrangement that is usually made for purifying water for drinking purpose in big cities like Calcutta and supplying it from house to house. Give diagrams where necessary. (কলিকাতার মত বড় শহরে পানীয় জল বিশুদ্ধ করণে এবং তাহা গৃহে গৃহে সরবরাহ করিতে যে সকল ব্যবস্থা সাধারণতঃ গৃহীত হয় তাহা বর্ণনা কর। স্থানমত চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও।)

23. Describe the system that is usually employed for the disposal of body-wastes in big cities like Calcutta. What are the advantages of this system ? (কলিকাতার মত বড় শহরে মল প্রভৃতি দূষিত পদার্থ দুর করিবার জন্ত যে পদ্ধতি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় তাহা বর্ণনা কর। এই পদ্ধতির সুবিধা কি কি ?) C. U. 1949 ; S. F. 1952

24. Simplicity is the key-note of modern decoration. Explain and illustrate. (সারল্যই আধুনিক গৃহসজ্জার মূল কথা—উদাহরণসহ বিশদভাবে আলোচনা কর।) C. U. 1950

25. Colour is now playing an ever increasingly important point in the planning of interior decoration. Justify the statement. (রঙের ব্যবহার আজকাল আভ্যন্তরিক গৃহ-সজ্জার নিমিত্ত ক্রমেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে—এই কথাটির যাথার্থ্য প্রমাণিত কর।) S. F. 1953

26. What a desolate place would be the world without a flower ! How far is the saying applicable to house ? How would you proceed to arrange flower in a room ? (পুষ্প ব্যতীত এই পৃথিবী মরুভূমির আকার ধারণ করিত—গৃহের ক্ষেত্রে এই কথাটি কতখানি প্রযোজ্য ? কোন একটি কক্ষ কি ভাবে তুমি পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত করিবে ?)

S. F. 1953

27. House furnishing and decoration go hand in hand. Do you agree ? Give reason for your answer. State the factors that you should consider while buying furniture for your house. (আসবাবসজ্জা এবং চিত্রসজ্জা পাশাপাশি অবস্থান করে। তুমি কি ইহা স্বীকার কর ? যুক্তিসহ

উত্তর লিখ। গৃহের আসবাবপত্র ক্রয় করিবার সময় তুমি কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবে উল্লেখ কর।) S. F. 1957

28. Describe how you would clear and polish any one of the following articles ? (a) A copper decorative flower vase, (b) A leather bag, (c) A silver pot, (d) A steel knife with wooden handle, (e) An aluminium saucepan, (f) A cane chair, (g) A glass jug, (h) A brass or a bellmetal dish, (i) An iron frying pan. [নিম্নলিখিত জিনিসগুলির মধ্যে যে কোনও একটি কিরূপে পরিষ্কার করিবে এবং পালিশ করিবে বর্ণনা কর— (ক) নকশা-করা তামার ফুলদানি, (খ) একটি চামড়ার ব্যাগ (থলিয়া), (গ) একটি রূপার পাত্র, (ঘ) কাঠের হাতলযুক্ত একটি ইস্পাতের ছুরি, (ঙ) একটি অ্যালুমিনিয়াম হাতলদার চাটু বা রান্নার পাত্র, (চ) একটি বেতের চেয়ার, (ছ) একটি কাচের জগ, (জ) একখানা পিতল বা কাঁসার থালা, (ঝ) একটি লোহার কড়াই।]

29. Briefly describe the principles of flower arrangement with special references to West Bengal. (পশ্চিমবঙ্গের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুষ্পবিন্যাসের নিয়মাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।)

30. Explain the significance of Kolam or Rangoli as a typical decorative art of Southern and Western India. (আদর্শ সজ্জা-শিল্প হিসাবে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের কলম অথবা রঙ্গোলীর যে একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বল।)

31. Can 'Alpana' of West Bengal be called a kind of flower-decoration ? (পশ্চিমবঙ্গের আলপনাকে কি পুষ্প-সজ্জার সমপর্যায়ভুক্ত বলা চলে ? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।)

32. Explain with reasons how any one of the following may be prevented. (a) Rusting of iron, (b) Tarnishing of brass. [নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঠেকাইয়া রাখিতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহা যুক্তিসহ বুঝাইয়া বল। (ক) লোহার মরিচা, (খ) পিতলের মেড়ো বা ময়লা দাগ।]

H. S. 1961

33. "At the time of selecting the household articles for an average Indian home the question of cost should be considered first of all."—Discuss. ("ভারতীয় সাধারণ গৃহের জন্য গার্হস্থ্য জিনিসপত্র ক্রয় করিবার সময় মূল্যের কথাই সর্বপ্রথম বিবেচনা করা উচিত।"—আলোচনা কর।)

34. A housewife should not only be a good home maker but also a sincere friend and reliable adviser to other members of the family—Do you agree ? (গৃহকর্ত্রী শুধু মাত্র ভাল গৃহ-পরিচালিকাই নন, তাঁহাকে পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রকৃত বন্ধু এবং বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হইতে হইবে।—এই কথা তুমি স্বীকার কর কি ?)

35. An ideal mother should guide her children in choosing real friends. Justify this statement ? (আদর্শ মাতা নিজের সন্তানদের বন্ধু নির্বাচনে পথপ্রদর্শক হইবেন।—এই কথাটিকে সপ্রমাণ কর।)

———

তৃতীয় অধ্যায়

পুষ্টিকর খাদ্য ও রন্ধন-প্রণালী

খাদ্য ও তাহার প্রয়োজনীয়তা—ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যেরূপ কয়লা ও বাষ্পশক্তি আবশ্যক সেইরূপ মানবদেহ-যন্ত্র চালাইবার জন্য তাপ ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। মানবের প্রত্যেকটি দৈহিক কর্মের সঙ্গে শক্তির ব্যবহার ও তাহার রূপান্তর—যেমন স্থৈতিক শক্তি (Potential energy) হইতে তাপশক্তির (Heat energy) রূপান্তর—অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা যখনই কোন দৈহিক কঠোর পরিশ্রম করি তখনই আমাদের শক্তি ব্যয়িত হয়। নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের শারীরিক কর্ম একেবারে নিশ্চল হইয়া যায় না। যতদিন পর্যন্ত জীবনের স্পন্দন থাকে ততদিন পর্যন্ত দেহের অন্তঃক্রিয়া চলিতে থাকে। এই সমস্ত শক্তি ও তাপের এক মাত্র উৎস খাদ্য।

খাদ্যদ্রব্যের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে তাপের উদ্ভব হয় তাহাই আমাদের কর্মপ্রেরণা দিয়া থাকে। মানবদেহে প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-জাতীয় পদার্থগুলি জীর্ণ হইবার পর ইহাদের সারাংশ আমাদের রক্তের ভিতর সঞ্চালিত হয়। রক্তের মাধ্যমেই সমস্ত কর্মপ্রেরণা দেহের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। বিজ্ঞানজগতে এই কর্মশক্তির প্রেরণা তাপকে ক্যালোরী (Calorie) বলা হয়। এক কিলোগ্রাম (kilogram) জলকে 1°C-তে উত্তপ্ত করিতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকেই একক ক্যালোরী হিসাবে ধরা হয়। বয়সের তারতম্য, বিভিন্ন কর্ম ও পেশা অনুযায়ী শরীরের জন্য বিভিন্ন প্রকার ক্যালোরীর দরকার। শক্তির

যান্ত্রিক ও ভৌতিক (Physical) ব্যাখ্যা খাদ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কার্য করিবার ক্ষমতাকেই শক্তি বুঝায়। দেহের ইন্ধন যোগান এবং এই ইন্ধন হইতে শক্তির দ্বারা দেহের মাংসপেশী ও অন্যান্য অঙ্গের সঞ্চালনকে কার্য বুঝায়।

সমগ্র দেহটিকে যদি মোটর ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে প্রোটীন ও অন্যান্য খনিজ উপাদানগুলিকে মোটরের আকৃতির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। জল সমেত অন্যান্য খনিজ দ্রব্য-গুলিকে তেলের সহিত, জৈব পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বিজাতীয় পদার্থগুলিকে ইন্ধনরূপে এবং ভিটামিনগুলিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। খাদ্যের ভিতর পুষ্টির সমস্ত উপাদান—প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকা সত্ত্বেও ভিটামিনের অভাবে দেহের কার্য কোন রকমেই চলিতে পারে না। খাদ্যমূল্য হিসাবে ভিটামিনের কোন দান নাই বটে, তবুও দৈহিক কর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা একেবারে অপরিহার্য। খাদ্য দেহের ক্ষয়পূরণ, কোষ ও তন্তুর গঠন, মাংসপেশীর পরিপুষ্টি সাধন, কর্মে উদ্দীপনা যোগান, তাপ উৎপাদন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম করিয়া থাকে। Half the struggle of life is a struggle for food, অর্থাৎ জীবন-যুদ্ধের প্রায় অর্ধাংশই খাদ্যের জন্য সংগ্রাম—আমেরিকানদের এই উক্তিটি শুধু আমেরিকানদের পক্ষে নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একান্তভাবে প্রযোজ্য।

খাদ্য: ইহার গুরুত্ব ও কার্যাবলী—দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য হিসাবে আমরা বহুবিধ কঠিন ও তরল পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকি। দেহে জীর্ণ হইবার পর এইসব খাদ্য আমাদিগকে তাপ ও কর্মশক্তি প্রদান করিয়া থাকে এবং দেহের কোষ, তন্তু (Tissue) ও অন্যান্য উপাদানের বৃদ্ধির সঙ্গে সমগ্র দেহের পরিপুষ্টির সহায়তা করে।

খাদ্য আমাদের দেহের ক্ষয়পূরণ, পরিপাক-ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে।

খাদ্যকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে —(১) দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য, (২) দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক এবং ক্ষয়পূরক খাদ্য, (৩) রোগ-প্রতিরোধক ও দেহের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী খাদ্য।

(১) **দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য**—মানবদেহের বিভিন্ন যন্ত্র কোন অবস্থাতেই অচল থাকে না। এমন কি নিদ্রিত অবস্থাতেও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, বক্ষঃপ্রাচীর আন্দোলিত হয়, পরিপাক-ক্রিয়া চলিতে থাকে। এইসব শারীরিক কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা রকম খাদ্য আমাদিগকে শক্তি ও তাপ দান করিয়া থাকে।

শর্করা-জাতীয় খাদ্য

শর্করা-জাতীয় খাদ্য—ধান্য জাতীয় শস্যবর্গ, চাউল, গম, রাগী, বাজরা, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি।

স্নেহ-জাতীয় খাদ্য—ঘি, তেল, মাখন, চর্বি, পেস্তা, বাদাম, নারিকেল ইত্যাদি স্নেহ-জাতীয় পদার্থই প্রধান শক্তি উৎপাদক।
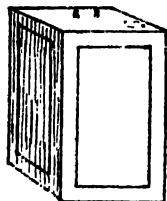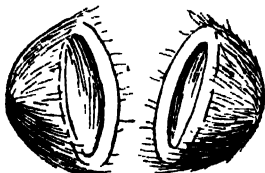
স্নেহ-জাতীয় খাদ্য

প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য

প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য—দুধ, ডিম, ডাল, মাছ, মাংস ইত্যাদি। খাদ্য হিসাবে প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য বিশেষ করিয়া জৈব

প্রোটীন উৎকৃষ্ট খাদ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রোটীন খাদ্য মহার্ঘ ও দুর্লভ ; এজন্য শর্করা ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থের সাহায্যে প্রোটীনের অভাব দূর করা যাইতে পারে।

(২) **দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক এবং ক্ষয়পুরক খাদ্য**—একটি গৃহকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে কাঠ, লোহা, সিমেন্ট, বালি, চুন, সুরকী প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই প্রয়োজন, সেইরূপ সমগ্র দেহের উন্নতির জন্য দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশী, অস্থি, মজ্জা, রক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের পরিপুষ্টি একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য খাদ্যেরই দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। দেহের যে কোন অংশের বৃদ্ধির অভাবের দরুন সমগ্র দেহের স্বাস্থ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। দেহের কোমল তন্তুসমূহ, মাংসপেশী, রক্ত প্রভৃতি প্রধানতঃ প্রোটীন, জল ও খনিজ পদার্থের সাহায্যেই গড়িয়া উঠে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্য হিসাবে প্রোটীনের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ ইহা বিশেষভাবে দেহ গঠনের সহায়তা করে ও ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। দেহের বিভিন্ন কোষ ও তন্তুর বৃদ্ধি ব্যতীত প্রোটীন রক্ত উৎপাদনে সহায়তা করে এবং রোগ-প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইয়া ব্যাধির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উচ্চস্তরের প্রোটীন, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বলিয়া ইহাদের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ প্রোটীন ডাল, ছোলা, চীনাবাদাম প্রভৃতি দ্রব্যের উপর কিছুটা নির্ভর করা যাইতে পারে। খাদ্য হিসাবে চীনাবাদামের মূল্য প্রায় মাংসের তুল্য।

(৩) **রোগ-প্রতিরোধক ও দেহের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ-কারী খাদ্য**—শক্তি উৎপাদন ও দেহের গঠন ব্যতিরেকেও খাদ্য আমাদের দেহের বিভিন্ন কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে এবং আঘাত ও ব্যাধির হাত হইতে শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। জল, খনিজ-পদার্থ

ও ভিটামিন এইসব খাদ্যের অন্তর্গত। পরিপাক-ক্রিয়া, ঘর্ম ও মূত্রের নিঃসরণ ও দেহের তাপের সমতা রক্ষার জন্য জলের একান্ত প্রয়োজন। লৌহ যদিও আমাদের দেহে অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনীয়, তবুও ইহার স্থান অন্য কোন উপাদানের দ্বারা পূরণ করা সম্ভবপর নয়। রক্ত জমাট বাঁধিবার জন্য, মাংস-পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও অস্থির গঠনের জন্য ক্যাল্সিয়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে। থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid gland) সাহায্যে দেহের অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য আয়োডিন আবশ্যক।
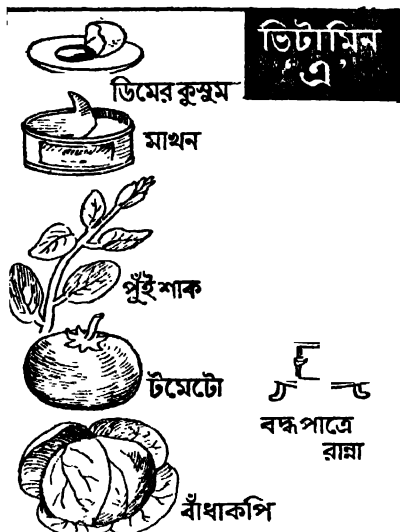
ভিটামিন জাতীয় দ্রব্যগুলি আমাদের দেহের বৃদ্ধি, মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, চর্মের স্বাস্থ্য, পরিপাক-ক্রিয়া ও দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ভাবে কাজ করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা প্রকার ভিটামিন (এ, বি, সি, ডি, ই, এবং কে ভিটামিন) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সবুজ শাকসব্জীগুলি ভিটামিনের প্রধান উৎস। এইসব দ্রব্য দরে সস্তা ও সহজলভ্য। শাকসব্জীর ভিতরে সাধারণতঃ ভিটামিন এ (ক্যারোটিন), বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি থাকে। টমেটো হইতে প্রচুর ভিটামিন সি পাওয়া যায়। দুধের ভিতরে ভিটামিন এ ও ডি এবং বি গ্রুপের রাইবোফ্লেবিন (riboflavin) পাওয়া যায়।

মানবদেহের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (Gland) সমূহ হইতে হর্মোন (Hormone) নামে এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়; ইহা রক্ত-প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের শ্বাসকার্য, চলন, কথন, নিদ্রা ও দেহের নানাবিধ কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। এই হর্মোন-জাতীয় পদার্থগুলি প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ। সুতরাং দেহের কার্য ও গঠনের জন্য এইসব পদার্থের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পুষ্টির অভাব জনিত ব্যাধি—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইলে ও অতিরিক্ত আহারের ফলে দেহের ভিতর নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

অপ্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের দরুন আমাদের পরিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হয়, দেহের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পরিবর্তনের (metabolism) বিঘ্ন জন্মায়, ক্ষুধামান্দ্য ঘটায়। দেহ ক্ষীণতর হওয়ার ফলে অনেক প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

অতিরিক্ত আহারের ফলে হৃৎপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের পীড়া, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের আশঙ্কা থাকে। যদি আহারের অনুপাতে আমরা দৈহিক পরিশ্রম না করি তাহা হইলে অতিরিক্ত মেদ ও চর্বি-প্রাবল্যে দেহের ওজন বাড়িয়া যাইবে।

খাদ্য দ্রব্যের অভাব বা অপব্যবহারের ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের নিম্নলিখিত কুফল হইবার সম্ভাবনা থাকে :—

(১) দেহের ওজন হ্রাস, (২) অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি, (৩) দুর্বল দৈহিক গঠন, (৪) অস্থির অপরিপুষ্টতা, (৫) অমসৃণ ত্বক, (৬) দুর্বল মাংসপেশী, (৭) কর্মবিমুখতা, অবসাদ, নিরুৎসাহ (৮) বিষণ্ণ ভাব, (৯) ক্ষুধামান্দ্য, (১০) খিটখিটে স্বভাব, (১১) ঘন ঘন সর্দি-কাশি, (১২) কোষ্ঠবদ্ধতা, (১৩) রাতকানা, (১৪) পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রভৃতি।
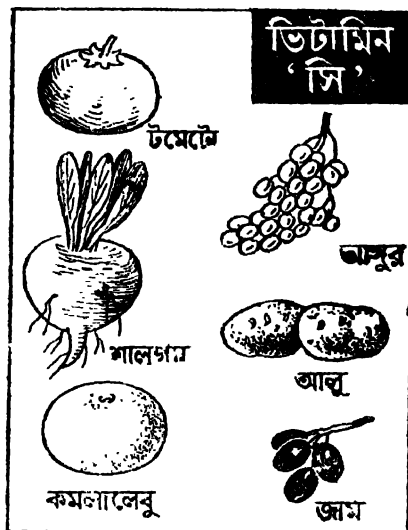
রন্ধনগৃহ ও তাহার সুব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাঘর—মেয়েরা, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মেয়েরা বেশ কিছুটা সময় রান্নাঘরে কাটাইয়া দেন। পরিপাটিরূপে অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া পরিবারস্থ লোকদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন বাংলার গৃহিণীদের একটি চরম আনন্দ। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা—বিশ বছর এক চক্করে বাঁধা।" ঘরের বধূ ও মেয়েরা যেখানে অনেক সময় কাটাইতে বাধ্য হয় সেই রন্ধনগৃহের পরিকল্পনা যাহাতে আদর্শ ধরনের হয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

রন্ধনগৃহটি এই ভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় সব জিনিস যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। চুল্লী বসানোর স্থান, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বেসিন (Basin), জলের কল, বাসনকোসন, মসলাপাতি রাখিবার স্থান, মিটসেফ (meat safe), কাবার্ড (cup-board) প্রভৃতির আয়োজন—এইসব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রন্ধনগৃহ তৈয়ার করিতে হইবে। রন্ধনগৃহের পাশেই খাওয়ার ব্যবস্থা থাকা
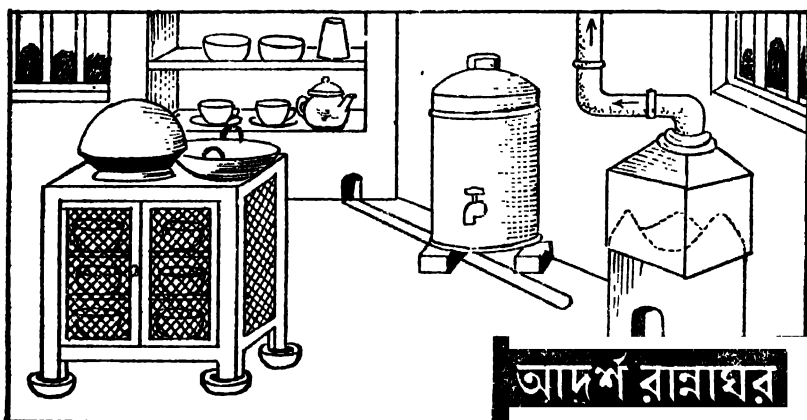
আদর্শ রান্নাঘর

উচিত। ইহাতে পরিবেশনকারী ও আহারকারী উভয়েরই সুবিধা। রান্নাঘরেই আজকাল অনেক সময় খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট আলো-বাতাস পাওয়া যায় এইরূপ স্থান বাছিয়া লইয়া রন্ধনগৃহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আহারকারীর বসিবার স্থান জানালার কাছে হওয়া বাঞ্ছনীয়। জানালার ভিতর দিয়া প্রচুর আলো ও বাতাস চলাচলের ফলে সে প্রফুল্লচিত্তে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে অধিক দরজা-জানালা থাকিলে রান্নাঘরের দেওয়ালে প্রয়োজনীয় তাক রাখিবার অসুবিধা ঘটে। রন্ধনকার্য

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে আবশ্যকীয় বাসনকোসন, মসলাপাতি রাখিবার জন্য তাকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

রন্ধনগৃহ যতদূর সম্ভব বাহুল্যবর্জিত হওয়া উচিত। রান্নাঘরের দেওয়ালে বা জানালায় অযথা কোনরূপ খাঁজ বা জাফ্রি না থাকাই সঙ্গত, কারণ উহাতে ধুলা, ঝুল ইত্যাদি জমিয়া ঘর নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনাবশ্যক দ্রব্যের আতিশয্যে আমরা অনেক সময় অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না। ইহাতে সময়ের অপচয় হয় ও রন্ধনের বিঘ্ন জন্মায়। যাহাতে এক-দৃষ্টিতে সব জিনিস চোখে পড়ে সেই ভাবে কাগজের লেবেল-আঁটা শিশিতে ভরিয়া পুরু কাচের আলমারিতে মসলাপাতি গুছাইয়া রাখিলে কাজের সুবিধা হয়।

ঘুঁটে, কয়লা প্রভৃতি নোংরা দ্রব্যগুলি যথাসম্ভব রান্নার জায়গা হইতে দূরে রাখিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। নোংরা দ্রব্যের প্রাচুর্যে মশা, মাছি, আরসোলা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হয়। মাঝে মাঝে এইসব কীটপতঙ্গের ধ্বংস সাধনের জন্য ডি. ডি. টি. স্প্রে (D. D. T. Spray) বা গ্যামেক্সেন (Gammexane) পাউডার ব্যবহার করা উচিত। রান্নাঘরে কয়লার ঝুল, ময়লা প্রভৃতি না জন্মায় সেইজন্য ঝাড়নের সাহায্যে মাসে দুই-একবার রান্নাঘর পরিষ্কার করা উচিত। ঘরের মেঝে জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে যাহাতে ইহা সহজে শুকাইয়া যায় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জল যাহাতে জমিয়া না থাকে সেজন্য ড্রেনের ব্যবস্থাও ভাল করা দরকার।

রান্নাঘরের নিরাপত্তা—রান্নাঘরের নিরাপত্তার কথা মনে রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে বায়ু-চলাচল ও ধূম-নির্গমনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বায়ু চলাচলের অভাবে শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়,

ক্লান্তি ও অবসাদের দরুন রন্ধনকার্যে অনিচ্ছা জন্মিবার আশঙ্কা থাকে। কয়লা বা কাঠ পোড়াইলে কার্বন মনঅক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক গ্যাস নির্গত হয়। বিশেষ করিয়া কার্বন মনঅক্সাইড গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত। বস্তী অঞ্চলে কোন কোন সময় ধূম নিষ্কাশনের অব্যবস্থার দরুন শ্বাসের সহিত এই বিষাক্ত গ্যাস গ্রহণ করিয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় দাহ্য পদার্থ কেরোসিন, স্পিরিট প্রভৃতি অতি সাবধানতার সহিত সংরক্ষিত হওয়া উচিত। সাবধান না হইলে অনেক সময় কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাহায্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

রন্ধনের প্রয়োজনীয় বাসনপত্র—পরিবারের লোকসংখ্যা ও রন্ধন-দ্রব্যের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের বাসনপত্রেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। এইসব নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য যাহাতে সহজে পরিষ্কার করা যায় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রাঁধিবার অপরিচ্ছন্ন বাসন দেখিতে চিত্তাকর্ষক নয়; তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা রোগজীবাণু ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধাতুনির্মিত বাসন ব্যবহার করা হয়।

(১) কাঁসা, (২) পিতল, (৩) অ্যালুমিনিয়াম, (৪) লৌহ, (৫) স্টেইনলেস স্টীল (Stainless steel)। ইহা ছাড়া এনামেল-করা পাত্র, কাচপাত্র, মাটি, পাথর ও চীনামাটির পাত্র ব্যবহার করা হয়।

কাংস্যপাত্র—কাঁসা একটি সংকর ধাতু। ইহা সাত ভাগ তামা, এক ভাগ টিন ও দস্তাবজের সংমিশ্রণে তৈয়ারী করা হয়। এই মিশ্রিত ধাতু খুব মজবুত, দেখিতেও বেশ উজ্জ্বল এবং সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ঘষিলে মাজিলে ইহা বেশ উজ্জ্বল দেখায়, অতি সহজেই ইহার গায়ের ময়লা দূর হইয়া যায়। অম্লাক্ত পদার্থ কাঁসার বাসনে

রাখিবার ফলে কাঁসার সহিত অম্লাক্ত পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction) ঘটে। ইহার জন্য রন্ধনজাত দ্রব্য বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে, বাসনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অধিক উত্তাপে কাঁসার পাত্র ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্য কোন কোন গৃহে যাহাতে আগুনের তাপ সোজাসুজি না লাগে—সেইজন্য পাত্রের উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। মাটির প্রলেপ দিলে পরিষ্কার করিতেও সুবিধা হয়।

পিতল-পাত্র—কাঁসার মত পিতলও একটি সংকর ধাতু। দুই ভাগ তামা ও এক ভাগ দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। কাঁসার পাত্রের মত পিতলের পাত্রও অম্লাক্ত পদার্থ রাখিবার অনুপযোগী।

অ্যালুমিনিয়াম-পাত্র—অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর আণবিক ওজন (molecular weight) খুব কম। এইজন্য অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র অত্যন্ত হাল্‌কা—নাড়াচাড়া করিবার জন্য বিশেষ সুবিধাজনক। অ্যালুমিনিয়ামের চাদর বা পাত (sheet) অন্যান্য ধাতুর চাদর অপেক্ষা অনেক পাতলা বলিয়া সহজেই উত্তপ্ত হয় ও অধিকক্ষণ তাপ সংরক্ষণ করিতে পারে। ফল ও সব্‌জীর রস বহুক্ষণ ধরিয়া অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখিলে নষ্ট হয় না। তবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উভধর্মী। অম্ল ও ক্ষার পদার্থ উভয়ই অ্যালুমিনিয়ামের উপরে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। ক্ষার প্রভৃতি রাখার ফলে ইহা ক্ষয় হয়। অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অ্যালুমিনিয়ামের দরও সস্তা। এইজন্য অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা ইহার প্রচলন বেশী। ফুটন্ত গরমজলে দুই এক চামচ ভিনিগার (vinegar) মিশাইয়া অ্যালুমিনিয়ামের বাসন পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

লৌহপাত্র—ইহার অসুবিধা এই যে ইহা অত্যন্ত ভারী।

নাড়াচাড়া করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। বাতাসে রাখিলে সহজে মরিচা ধরিবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য সব সময় মাজা-ঘষার প্রয়োজন আছে।

স্টেনলেস স্টীল (Stainless steel)—আজকাল স্টেনলেস স্টীল-এর বাসনপত্রের প্রচলন হইয়াছে। এগুলি খুব দামী, তবে বেশ মজবুত ও শক্ত; ব্যবহারে সহজে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণ লোহার মত ইহা সহজে মরিচাও ধরে না।

এনামেল-পাত্র—ধাতুর উপর—সাধারণতঃ লোহার উপর এনামেল করিয়া এনামেলের বাসনকোসন তৈয়ারী করা হয়। ইহার ভিতর রন্ধনজাত পদার্থ রাখিলে তাহার স্বাদ বা বর্ণ বিকৃত হয় না। তবে পাত্রের কোন অংশের এনামেল উঠিয়া গেলে বা ফাটিয়া গেলে তাহা ব্যবহার করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

কাচপাত্র—ইহাতে কোন রন্ধনজাত পদার্থের নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে ইহা অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং উত্তাপে ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া আমাদের দেশে রন্ধনকার্যে ইহার প্রচলন কম।

চীনামাটির পাত্র—কাচের পাত্রের মত চীনামাটির পাত্র ভঙ্গুর বলিয়া সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তবে রন্ধনজাত দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না বলিয়া এই সব পাত্রের প্রচলন বাড়িয়া চলিয়াছে।

মাটি ও পাথরের পাত্র—ধাতু আবিষ্কারের পূর্বে এই সব পাত্রের প্রচলন ছিল। রন্ধনের দিক হইতে বিচার করিলে এগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ। পল্লী অঞ্চলে মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধার ব্যবস্থা এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায়। সচ্ছিদ্র শোষক স্তরের জন্যই ইহা নির্দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আজকাল অনেক হিন্দু বিধবা ধাতুর পরিবর্তে পাথরের

বাসন ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাথরের বাসন মাটির বাসনের মত উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া উহাতে রান্না করা চলে না।

রন্ধনের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম—বাসনকোসন ছাড়াও রান্নার কাজ ভালভাবে করিবার জন্য নিম্নলিখিত সাজসরঞ্জাম রান্নাঘরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

চামচ, মাপিবার জন্য Measuring cup, পেয়ালা অথবা বাটি, বঁটি-দা, সাঁড়াশি, হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরা, চালুনী, বেলন, চাকী, কুরুনি, বিভিন্ন প্রকারের বালতি ও গামলা, তরকারীর খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র (Vegetable peelers), ডিম ফেটানোর যন্ত্র (Egg beaters), ডাল ভাঙ্গিবার যাঁতা, ডাল ভাঙ্গিবার ও পেষাইএর কাঁটা, মাংসের কিমা করিবার যন্ত্র (Mincing machine), ফলের রস করিবার যন্ত্র ইত্যাদি।

চামচ ও তাহার ব্যবহার—পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রান্না হয় বলিয়া তাহারা পরিমিত মাপের সাহায্যে রান্নার কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহারা কাঁটা, চামচ ও ছুরির সাহায্যে খাইয়া থাকে ও বেশীর ভাগ রান্নাতেই খালি হাত ব্যবহার করে না। সব কিছুই চামচ বা অন্য জিনিসের সাহায্যে ধরিয়া রান্নার কাজ শেষ করে। এই জন্যই তাহারা নানা প্রকার চামচ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে চায়ের চামচ ও টেবিল-চামচ এই দুই ধরনের চামচের ব্যবহারই বেশী। ঘন জিনিস মাপিবার জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়। টেবিল-চামচ ৩ চায়ের চামচের সমান।

কাঁটা—আমরা সাধারণতঃ হাত দিয়া খাই। সেজন্য আমাদের ছুরি-কাঁটার প্রয়োজন হয় না, তবে বিশেষ অতিথিকে ইয়োরোপীয়

পদ্ধতিতে আপ্যায়িত করার জন্য টেবিলে ছুরি, কাঁটা ও চামচের আয়োজন রাখা দরকার।

Measuring cup—একটি মাপিবার বাটিতে ½ কোয়ার্ট, ২৩৭ মিলিমিটার অথবা ১৬টি টেবিল-চামচের সমান জিনিস ধরে। পাশ্চাত্ত্য দেশে রন্ধনের জন্য নিখুঁত মাপের প্রয়োজন হয় বলিয়া সে সব দেশে ছোট ছোট সূক্ষ্ম দাগ কাটা মাপিবার পেয়ালা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে রান্না করা বেশ সহজভাবে সম্পন্ন হয়। শক্ত জিনিসগুলি স্প্যাচুলার (Spatula) সাহায্যে জোরে টানিয়া মাপিবার পেয়ালা সমান করিয়া লওয়া হয়। কঠিন স্নেহজাত পদার্থগুলিকে কাপে লইবার সময় চামচের সাহায্যে সমান করিয়া দেওয়া উচিত যেন ইহাতে কোন ফাঁক না থাকে বা বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।

বিভিন্ন রকমের ছুরি—এইগুলিও রান্নাঘরে থাকা দরকার। ছুরির সাহায্যে ক্ষিপ্রতার সহিত কোন জিনিস সহজে কাটা যায়। হাত-দা অপেক্ষা ইহার ধারও অনেক বেশী থাকে।

বঁটি-দা ও হাত-দা—আমাদের দেশে রান্নাঘরে বঁটি-দা ও হাত-দার প্রচলন বেশী। তরকারী ও মাছ বঁটি-দার সাহায্যেই কাটা হয়। শক্ত জিনিস কাটিবার জন্য হাত-দা দরকার।

চালুনী—চালুনী সাধারণতঃ দুই রকম: (১) সাধারণ চালুনী (Ordinary Sieve), (২) লোহার চালুনী (Stainless Steel Strainer)।

সাধারণ চালুনীর সাহায্যে আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি চালিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়।

লোহার চালুনীতে সহজে মরিচা পড়ে না। যেসব খাদ্যদ্রব্য ইহার ভিতর দিয়া চালিত করা হয় তাহা স্টীলের জন্য কোনরূপ

ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হাতল শুদ্ধ চালুনী ব্যবহার করা উচিত।

বড় বড় মিলে এই সব চালুনী ব্যবহারের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিশুর খাদ্য পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

বেলন-চাকী—রুটি, লুচি, পরটা প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য রান্নাঘরে বেলন-চাকী রাখা উচিত।

কুরুনি—নারিকেল কোরার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। কুরুনিযুক্ত বঁটিও বাজারে পাওয়া যায়।

যাঁতা—ডাল, গম প্রভৃতি ভাঙ্গিবার ও পিষিবার জন্য একটি যাঁতাও রাখা দরকার।

ডিম ফেটাইবার যন্ত্র—(Egg beater)—ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়: (১) নাইলন গ্লেয়ার্ড এগ বিটার (Nylon glared Egg beater), (১) কয়েল টাইপ অব এগ বিটার (Coil Type of Egg beater)।

নাইলন গ্লেয়ার্ড এগ বিটার—ইহা Stainless steel-এর তৈয়ারী। ইলেকট্রিক উপায়ে ডিম ফেটানোর চেয়ে ইহাদ্বারা অনেক কম সময়ে ফেটানো হইয়া থাকে। ইহাকে সহজে ধোওয়া যায় এবং ইহার উপর কোন মরিচা পড়ে না। চালাইবার সময় কোন শব্দ হয় না। এই যন্ত্রের প্রতিটি গর্তে এক ফোঁটা তেল দিলেই চলে।

কয়েল টাইপ অব এগ বিটার—ইহাতে ছোট একটি ডিমের কুসুমকে সহজে ও সুন্দররূপে ফেটানো যায়।

Vegetable Peelers বা তরকারীর খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র—এই যন্ত্রের সাহায্যে আলুর বা অন্যান্য তরকারীর খোসা বেশ পাতলা ভাবে ছাড়ানো হয়। ইহার ফলে তরকারী ও অন্যান্য

ফলের ত্বকের নীচের মূল্যবান খাদ্যের অপচয় হয় না। ব্যবহার করার পর এই যন্ত্র ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত। তাহা না হইলে যে কোন অবস্থায় মরিচা পড়িবার আশঙ্কা থাকে।

কিমা করার যন্ত্র (Mincing Machine)—চপ বা কাটলেট প্রভৃতি তৈয়ার করিতে হইলে মাংসের কিমার প্রয়োজন হয়। তাই মাংসকে মেসিনের সাহায্যে সূক্ষ্ম কুচি করা হয়। ছুরির সাহায্যে কিমা ভাল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সময় বেশী লাগে।

খুন্তি ও ঝাঁঝরা—লুচি ভাজিবার জন্য ঝাঁঝরা, তরকারী প্রভৃতি রান্না করিবার জন্য খুন্তির দরকার।

শিল ও নোড়া—ইহা রান্নাঘরের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। রান্না করিবার মসলা—লঙ্কা, হলুদ, জিরা, ধনে, গরম মসলা সবকিছুই শিল ও নোড়ার সাহায্যে বাটা হয়, তারপর মাছ, মাংস ও তরকারীর সঙ্গে মিশান হয়।

পিতলের গামলা, বালতি—পরিবেশনের জন্য পিতলের গামলা ও বালতির দরকার আছে।

নানা প্রকারের জ্বালানী ও চুল্লী ঃ

রন্ধনকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য বহু প্রকার জ্বালানী ও চুল্লীর প্রচলন আছে। তন্মধ্যে কয়লা ও কাঠের ব্যবহার—বিশেষ করিয়া কয়লার ব্যবহার আমাদের দেশে খুব বেশী। বর্ত্তমান যুগে গ্যাসের ও বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে রন্ধনকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কয়লা ব্যবহারের সুবিধা এই যে ইহা দামে সস্তা এবং অতি সহজেই ইহার সাহায্যে রান্না করা যায়। তবে ইহার অসুবিধা এই যে ধূম ও অন্যান্য গ্যাস নির্গমনের পথ না থাকিলে রান্নাঘরে ঝুল পড়ে এবং রান্নাঘরের দেওয়াল মসীচিহ্নিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে ধুঁয়া বাহির হইবার জন্য চিম্‌নি থাকে। চিম্‌নির

ভিতর দিয়া ধুঁয়া সহজেই বাহির হইয়া যাওয়ার ফলে ঘর-বাড়ী নোংরা হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বর্তমান সময়ে গ্যাসের প্রচলন সীমাবদ্ধ। গ্যাসের সাহায্যে সহজেই রান্না করা যায়। ইহাতে সময়ও খুব কম লাগে। কয়লার উনুন জ্বালাইতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই তুলনায় ইহাতে সময় কম লাগে। দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়া কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্যাসের ব্যাপক প্রচলন হইলে দেশের লোকেরা কয়লার পরিবর্তে গ্যাসের ব্যবহার বেশী করিতে পারিবে।
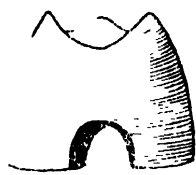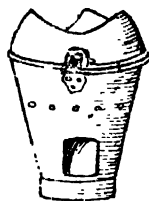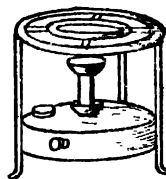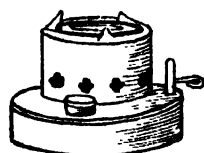
সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরনের চুলার ব্যবহার দেখা যায়। (১) কয়লার চুলা, (২) কাঠের চুলা, (৩) ইক্‌মিক্ কুকার, (৪) কেরোসিন কুকার, (৫) বৈদ্যুতিক চুল্লী (Heater), (৬) গ্যাসের উনুন—প্রেসার কুকার (Pressure cooker)।

কয়লার চুলা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের দেশে কয়লার চুলার প্রচলন বেশী। চুলাটি এই ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে মুখটি ছোট হয় ও ভিতরে কয়লা বেশী থাকিতে পারে। ভিতরের লোহার শিকগুলি বেশ মজবুত হওয়া দরকার। চুলার মুখ ছোট

হইলে ভিতরের তাপ বাহিরে যাইতে পারে না; ফলে কয়লার অপচয় কম হয়, আর রন্ধনকার্যেরও বেশ সুবিধা হয়। কেরোসিনের সাহায্যে ঘুঁটে এবং কাঠ জ্বালাইয়া প্রথম উনুন ধরাইতে হয়, তারপর কয়লা দিয়া ধীরে ধীরে বাতাস দিলে উনুন জ্বলিয়া উঠে। কাঠকয়লার সাহায্যেও কয়লা ধরান যাইতে পারে। ইহাতে ধোঁয়া প্রায় হয় না।

কাঠের চুলা—আজকাল শহরে কাঠের চুলার প্রচলন খুব কম। পল্লী অঞ্চলে কাঠ সুলভ বলিয়া সেখানকার লোকেরা এখনও কাঠের সাহায্যে রান্নার কাজ করিয়া থাকে। কয়লার চুলা অপেক্ষা কাঠের চুলার সুবিধা এই যে, কাঠের চুলায় ইচ্ছামত তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। কোন কোন জিনিস অল্প আঁচে রান্না করিলে আহার্য দ্রব্য বেশ সুস্বাদু হইয়া থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে কাঠের চুলায় রান্না করা সুবিধা।

ইক্‌মিক্ কুকার

ইক্‌মিক্ কুকার—ইন্দুমাধব ঘোষ সাধারণ চুলার উন্নতি সাধন করিয়া সর্বপ্রথম আমাদের দেশে ইহার প্রবর্তন করেন। ইহার ভিতর তিন-চারিটি বাটি পর পর সাজানো থাকে। ঐ বাটিগুলির মধ্যে চাউল, মাংস, ডাল, তরকারী প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া দিতে হয় একেবারে নীচে থাকে কাঠকয়লা বা কাঠকয়লার গুঁড়ার গুলের চুলা। উত্তাপ প্রয়োগে একসঙ্গেই সব রান্না হইয়া থাকে। ইক্‌মিক্ কুকারে প্রয়োজনমত জল একবারেই দেওয়া হয়।
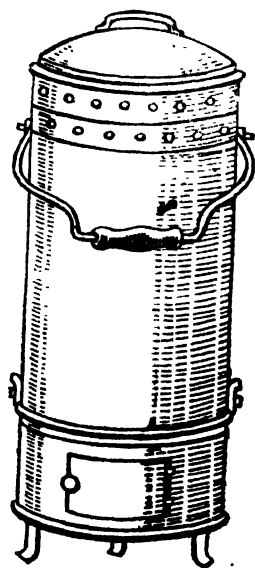
ইহাতে রান্না হইতে কম সময় লাগে। ইক্‌মিক্ কুকারের ভিতরে বাষ্প থাকে বলিয়া মাংস বেশ সহজে ভাল রান্না হয়।

কেরোসিন কুকার—আজকাল বাজারে বহু প্রকার কেরোসিন কুকারের প্রচলন আছে। বিশেষ করিয়া জনতা স্টোভ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহা ধরাইতে স্পিরিট বা অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না এবং দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

আগের দিনে প্রাইমাস্ স্টোভ (Primus Stove)-এর ব্যবহার খুব বেশী ছিল। আধুনিক যুগে কোন কোন কারণে ইহার প্রচলন পূর্বের মত নাই। প্রাইমাস্ স্টোভ খুব দামী আর উহা জ্বালানের সময় সতর্কতা অবলম্বন না করিলে নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

বৈদ্যুতিক চুল্লী ও গ্যাসের উনুন :

প্রেসার কুকার (**Pressure Cooker**)—বর্তমান যুগে ইহাই সবচেয়ে উন্নত ধরনের চুলা। রান্না করিবার সময় জল-মিশ্রিত পদার্থ
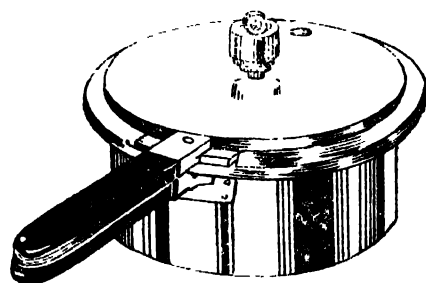
প্রেসার কুকার

হইতে যে বাষ্প নির্গত হয় তাহা পাত্রের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে এবং চাপে (pressure) উত্তাপ বাড়ে; সেজন্য রন্ধনকার্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। প্রেসার কুকারে ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে মাংস রান্না করা যাইতে পারে। তবে ইহা একটু ব্যয়সাপেক্ষ।

হিটার (Heater)—অতি অল্প সময়ের মধ্যে রান্না করিবার জন্য হিটার এবং গ্যাসের উনুন বেশ কার্যকরী। বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে অনায়াসে হিটারের দ্বারা রান্না করা যাইতে পারে। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা যখন তখন জ্বালানো বা নিভানো যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাপ কমানো বাড়ানো চলে।

চুলার তাপ—তাপের শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন ধরনের হয়।

	তাপমাত্রা	
মৃদু আঁচ	১২১°—১৭৭°	সেন্টিগ্রেড
মাঝারি আঁচ	১৭৭—২০৪°	„
উষ্ণ আঁচ	২০৪—২৩২°	„
অতি উষ্ণ আঁচ	২৩২—২৬০°	„

রান্নায় ওজন ও পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

আহার্য দ্রব্য সুস্বাদু করিতে হইলে পরিমিত ওজনের বিভিন্ন
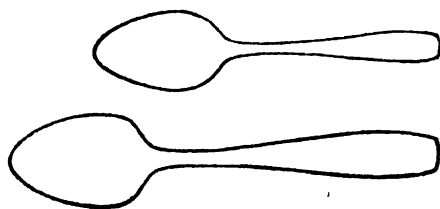
ওজন করিবার চামচ

মসলা মিশ্রিত করা উচিত। আমাদের দেশে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার
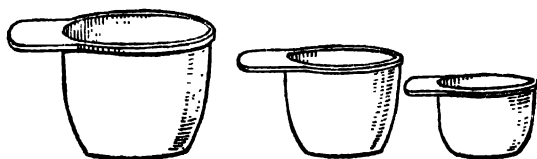
ওজন করিবার পাত্র বা কাপ

না করিয়া হাতের আন্দাজ মত মাছ, মাংস, তরকারী প্রভৃতিতে

মসলাদি মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানসম্মত রূপে রান্না হয় বলিয়া তাহারা মসলা ও রান্নার উপকরণ মাপিবার জন্য রান্নাঘরে ও ভাঁড়ারঘরে চায়ের চামচ (Tea spoon), টেবিল-চামচ (Table spoon), মেজারিং সিলিণ্ডার (Measuring Cylinder) প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রমাণ সাইজের মাপিবার পাত্র (Standard measuring Cup) = ¼ কোয়ার্ট, ২৩৭ সি. সি. অথবা ১৬ টেবিল-চামচ।
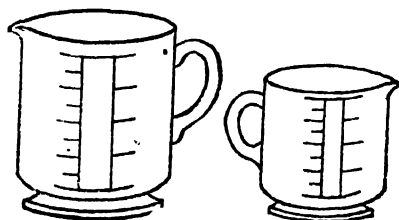
ওজন করিবার সিলিণ্ডার

শুষ্ক দ্রব্যগুলি কাপের ভিতর লইয়া ছুরি বা স্প্যাচুলার (Spatula) সাহায্যে সমান করিয়া লওয়া হয়। Measuring Cylinder 5 cc, 10 cc, 25 cc, 100 cc, 1000 cc পর্যন্ত পাওয়া যায়। অনেক চামচেও দাগ কাটা থাকে, ইহার সাহায্যে প্রয়োজনমত মান অনুযায়ী উপকরণ লওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের মত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন না করিলেও আমরা রান্না করিবার সময় এদেশে চালু বাটখারা ব্যবহার করিতে পারি। বিশেষ করিয়া যে সমস্ত পদার্থের আধিক্যে অন্নব্যঞ্জনের স্বাদ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে সেগুলি মাপিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বেশী মাত্রায় কর্পূর, হিং, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিলে তরকারী ও অন্য খাবার বিস্বাদ হইবার সম্ভাবনা থাকে। অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে বেশী

মসলা ব্যবহার করা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কারণ মসলাগুলির খাদ্যমূল্যের (food value) চেয়ে ভেষজ মূল্যই (medicinal value) বেশী।

খাদ্যকে সুঘ্রাণ ও স্বাদযুক্ত করিবার জন্য রান্নার দরকার। রন্ধনের ফলে খাদ্যের পুষ্টিকর-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অনিষ্টকর জীবাণুগুলি ধ্বংস হয়। ইহা কোষপ্রাচীরের সেলুলোজকে (Cellulose) ভাঙ্গিয়া দিয়া ও স্টার্চ গ্রেইন্‌কে (Starch grains) নরম করিয়া হজম করিতে সহায়তা করে। কোষপ্রাচীর-সংলগ্ন কার্বোহাইড্রেটকে সেলুলোজ বলে। উত্তাপ বিবিধ প্রকারে খাদ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। স্টার্চ (Starch) জলে অদ্রবণীয়; শুষ্ক অবস্থায় ইহা পরিপাক করা দুরূহ। রান্না করার ফলে ইহা সহজেই দ্রবীভূত এবং সুঘ্রাণযুক্ত হয়। ইহা হজম করিতেও কোন কষ্ট হয় না। শুষ্ক উত্তাপের ফলে চাউল, চীনাবাদাম, রুটী প্রভৃতি দ্রব্য সহজপাচ্য হয় এবং আর্দ্র উত্তাপের সাহায্যে শস্য জাতীয় পদার্থ জল গ্রহণ করিয়া নরম হয় এবং চিনি বিশ্লেষিত হইয়া গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত হয়। সেলুলোজ ভাঙ্গিয়া ফ্রুক্টোজ নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে। অধিক উত্তাপে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া যায়, গন্ধবিকৃতি ঘটে ও হজমে ব্যাঘাত জন্মায়। অনেক ক্ষেত্রে অধিক উত্তাপে প্রোটীন জমাট বাঁধিয়া শক্ত হয় এবং দুষ্পাচ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই ডিম বেশী সিদ্ধ করিলে হজম করা কষ্টসাধ্য হয়।

সাধারণতঃ তিন প্রকার উপায়ে আমাদের রন্ধনকার্য হইয়া থাকে—(১) জলের সাহায্যে সিদ্ধ করা (Boiling Process), (২) বায়ু ও তাপের সাহায্যে রন্ধন (Steaming), (৩) ঘি বা চর্বির সাহায্যে রন্ধন (Frying)।

(১) জলের সাহায্যে সিদ্ধ করা :

(ক) অল্প জলে রান্না—শাকসব্জী ও বাঁধাকপি জাতীয় তরকারী জলশূন্য বা খুব অল্প জলের সাহায্যে রান্না করা হয়।

(খ) বেশী জলে রান্না—ভাত, ডাল, আলু, মাছ, মাংস প্রভৃতি বেশী পরিমাণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া রান্না করা হয়।

মৃদু তাপে সিদ্ধ করা (Stewing)—অল্পজলে ধীরে ধীরে রান্না করাকে Stewing বলা হয়। রন্ধন করিবার দ্রব্যকে জলে মিশ্রিত করিয়া পাত্রের উপর ঢাকনা দিয়ে আস্তে আস্তে সিদ্ধ করিতে হয়। মাংস এবং ফল জাতীয় দ্রব্য মসলা সংযোগে এই ভাবে সিদ্ধ করিতে হয়। অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হয় না।

অধিক সিদ্ধ করা (Double boiling)—সরাসরি ভাবে উত্তাপ পাইবার জন্য অনেক সময় তরকারী, দুগ্ধ ইত্যাদি একটি পাত্রে লইয়া অন্য একটি ফুটন্ত জলপূর্ণ পাত্রে সেই পাত্রটি রাখিয়া সিদ্ধ করা হয়। ইহাকে Double boiling বলা হয়।

(২) তাপ বা বাষ্পের সাহায্যে রান্না (Steaming) :

শাকসব্জী, ফল, মাছ ইত্যাদি বাষ্পের সাহায্যে ভাপে সিদ্ধ হয়। ইহার জন্য বহু প্রকার বাষ্পীয় কুকার বাজারে পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগের প্রেসার কুকারে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা কুকারে সঞ্চিত থাকে; ফলে রান্না অতি অল্প সময়ে সুসম্পন্ন হয়। ইহা খাদ্যের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও পুষ্টিকারিতা বজায় রাখে। আমাদের দেশে প্রেসার কুকারের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, মূলা প্রভৃতি তরকারী অতিরিক্ত সিদ্ধ করিলে বিশ্রী গন্ধ বাহির হয় এবং ভিটামিন কিছুটা নষ্ট হয়। সেইজন্য শাকসব্জী অল্পজলে সিদ্ধ করা উচিত। ইহাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভিটামিন 'সি' নষ্ট না হইয়া সংরক্ষিত থাকে।

(৩) ঘি প্রভৃতির সাহায্যে রন্ধন বা ভাজা (Frying):

ভাজা তিন রকমের—(১) ডুবানো ঘি বা চর্বিতে ভাজা (Deep fat frying), (২) অল্প ঘি বা চর্বিতে ভাজা (Shallow fat frying), (৩) খুব অল্প ঘি মাখিয়া ভাজা (Panning)।

ডুবানো ঘি বা তেলে ভাজা (Deep fat frying)—মাংসের চপ, মাছ, মাংসের কোপ্তা, লুচি প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণ ঘিতে ভাজা হয়। ইহাতে অত্যধিক তাপের প্রয়োজন। সেইজন্য ভাজা জিনিসের পুষ্টি কম।

অল্প ঘি বা চর্বিতে ভাজা (Shallow fat frying)—ডিমের মামলেট, ডিমের সহিত রুটী ভাজা (French Toast) প্রভৃতি খাদ্য এই প্রকারে ভাজা হয়।

খুব অল্প ঘি মাখিয়া ভাজা (Panning)—পরটা, দোশা, সরুচাকলি জাতীয় পিঠা প্রভৃতি ভাজিবার পাত্রে একটু ঘি ছড়াইয়া দিয়া ভাজা হয়।

সেঁকা (Baking)—রুটী, বিস্কুট, কেক্ প্রভৃতি জিনিস তন্দুর বা তেজালের সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা হয়।

ঝলসান (Roasting)—চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, মাংস, পাঁপর প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণতঃ এইরূপে ভাজা হয়।

রন্ধন করিবার সময় শুধু এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে ভিটামিন 'সি' উত্তাপ ও বায়ুর সংস্পর্শে সহজেই নষ্ট হয়। ভিটামিন 'এ' অধিক উত্তাপে নষ্ট হয়। জলে দ্রবণীয় ভিটামিন 'বি' তাপের প্রভাবে স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে পারে না। রাইবোফ্লেভিন (Riboflavin) আলোর সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য ভিটামিন-সমৃদ্ধ পদার্থগুলি অতি অল্প আঁচেই সিদ্ধ করা উচিত।

ব্রেইজ (Braise)—অল্প ঘি বা চর্বিতে মাংস অথবা তরকারী প্রথমে ভাজিয়া, তারপর জল, মাংসের স্যুপ, দুধ ইত্যাদি মিশাইয়া আচ্ছাদিত পাত্রে আস্তে আস্তে রান্না করাকে ব্রেইজ বলা হয়।

গ্রিল বা ব্রয়েল (Grill or Broil)—লোহার ঝাঁঝরীতে রন্ধন করিবার দ্রব্যকে লইয়া উত্তাপের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে রন্ধন করাকে গ্রিল বা ব্রয়েল বলা হয়। শিক কাবাব এই ভাবে রান্না করা হয়।

সাধারণ খাবার তৈয়ার-প্রণালী

ভাত—ভাত বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য। পরিমিত জল ও উত্তাপের সাহায্যে ভাত রান্না হইয়া থাকে। প্রথমে ৪ কিলোগ্রাম আন্দাজ জল হাঁড়িতে করিয়া উনুনে চাপাইতে হয়। ভাত রাঁধিবার পূর্বে চাউল ভালরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ধুইয়া লইতে হইবে, কোন প্রকার কাঁকর বা ময়লা যেন তাহার ভিতর না থাকে। জল পাঁচ-সাত মিনিট সিদ্ধ হইলে তারপর ইহার ভিতর চাউল ছাড়িয়া দিতে হয়।

ভাত ফুটিতে আরম্ভ করিলে জল উথলাইয়া হাঁড়ির মুখ দিয়া ফেনের সহিত অনেক ময়লা বাহির হইয়া যায়। ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা এইজন্য একটু ফাঁক করিয়া রাখা উচিত।

নূতন চাউল সিদ্ধ হইতে কম সময় লাগে, কিন্তু ইহা দুষ্পাচ্য। পুরাতন চাউলের ভাত চার-পাঁচ গুণ বাড়িয়া যায়। ভাত রান্না করিতে প্রায় ২০-২৫ মিনিট সময় লাগে। বেশী ফুটিয়া গেলে ভাত খুব নরম হইয়া অনেক সময় ডেলা পাকাইয়া যায়। বেশী সিদ্ধ নরম ভাত মুখরোচক নয় এবং উপকারীও নয়। আবার কম ফুটিলে ভাত শক্ত থাকিতে পারে এবং হজম করিতে কষ্ট হয়। আমাদের দেশে ফেন গালিয়া ভাত ঝরঝরে করা হয়। ফেনের ভিতরেই

ভাতের সারপদার্থ থাকে। সুতরাং ভাতের ফেন ফেলা কোন মতেই স্বাস্থ্যের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয়। একবার পরিমিত জল দিয়া ভাত সিদ্ধ করিলে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হয়।

ডাল—উপকরণ : মুগের ডাল ১ কিলো, লবণ ১ চামচ (বড়), তৈল—৩০ গ্রাম, জিরা অথবা পাঁচফোড়ন সামান্য পরিমাণে (আন্দাজমত)।

মসুরী ছাড়া ছোলা, মুগ, কলাই প্রভৃতি ডালে একটু চিনি দিলে ভাল হয়।

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য সমূহের মধ্যে ডাল একটি প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশে মুগ, মসুরী, ছোলা, অড়হর, কলাই প্রভৃতি বেশী ব্যবহৃত হয়। ডাল রান্না করিতে প্রায় ২৫-৩০ মিনিট সময় লাগে। বিশেষ করিয়া ছোলার ডাল সিদ্ধ হইতে অনেক সময় নেয়।

ডাল সিদ্ধ হওয়ার পর লবণ, হলুদ, কাঁচালঙ্কা, তেজপাতা ইত্যাদি দেওয়া হয়। সুসিদ্ধ হইলে কাঁটার সাহায্যে দানাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। মসুরীর ডালে মাঝে মাঝে হাতা দিয়া ফেনা সরাইয়া ফেলা উচিত। ডাল সিদ্ধ হইয়া গেলে তারপর একটি পাত্রে সরিষার তেল অথবা ঘি গরম করিয়া শুকনো লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন (ডাল অনুযায়ী বিভিন্ন ফোড়ন) ভাজিয়া লওয়া হয়। তারপর ডালে সম্ভার দেওয়া হয়। ডালের সঙ্গে ঘি মিশাইলে ইহা খাইতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয়।

লুচি—উপকরণ : ময়দা ১ কিলো, ঘি ৫০০ গ্রাম, লবণ ½ চা-চামচ, জল—আন্দাজমত।

প্রথমে ময়দার সঙ্গে প্রয়োজনমত ঘৃত মাখাইতে হইবে। তারপর ভাল করিয়া ঠাসিয়া ময়দা মাখিতে হইবে; ইহাকে ময়ান দেওয়া

বলে। ময়ান না দিলে লুচি খাস্তা হয় না এবং একটু শক্ত হয়; খাইতেও সুস্বাদু হয় না। ময়দা যাহাতে নরম না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লুচি ডুবানো ঘিতে ভাজিতে হইবে। ঘি বেশ ভালভাবে তাতিবার পর তাহার মধ্যে লুচি ছাড়া উচিত। লুচি খুব পুরু করিয়া বেলা উচিত নয়। পুরু লুচি খাইতেও ভাল লাগে না এবং কাঁচা থাকিবার ভয় থাকে।

চাপাটি—আটা অথবা ময়দায় জল মিশাইয়া খুব করিয়া ঠাসিতে হয়। তারপর বেলন-চাকীর সাহায্যে ইহা বেশ পুরু করিয়া বেলিয়া লওয়া দরকার। লোহার তাওয়াতে ইহা সেঁকিয়া লইতে হয়। চাপাটি খুব পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার উপর একটু ঘি বা মাখন মাখাইয়া লইলে খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়।

খিচুড়ি—উপকরণ :—ডাল—১½ কিলো, চাল (আতপ)—১ কিলো, কাঁচালঙ্কা—আন্দাজমত, পেঁয়াজ—৫০ গ্রাম, আদা—৫০ গ্রাম, নুন—৫০ গ্রাম, তেল—৫০ গ্রাম, ঘি—১০০ গ্রাম, চিনি—দুই চামচ, তেজপাতা—দুই-তিনটি।

খিচুড়ি নানা প্রকারের হইতে পারে, তবে সাধারণতঃ হয় দুই প্রকার—(১) গিলে খিচুড়ি, (২) ভুনি খিচুড়ি।

গিলে খিচুড়ি—ডাল তিন ভাগ ও চাল এক ভাগ হইলেই খিচুড়ি খাইতে সুস্বাদু হয়। কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ, গরম মসলার সাহায্যে খিচুড়ি রান্না করা হয়। নিরামিষ খিচুড়িতে নারিকেল দিলে ইহা খাইতে বেশ মুখরোচক হয়।

ভুনি খিচুড়ি—উপকরণ :—সোনামুগের ডাল—১½ কিলো, চাল—৫০০ গ্রাম, ঘি—৫০ গ্রাম, তেল—৫০ গ্রাম, আদাকুচি—সামান্য, চিনি—দুই চামচ, তেজপাতা—চার-পাঁচটা, ছোট এলাচ—৬টা, দারুচিনি—আন্দাজমত চার-পাঁচ টুকরা।

ইহার মধ্যে ঘি ও গরম মসলার পরিমাণ একটু বেশী থাকাতে ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু ও পোলাওয়ের মত ঝর্‌ঝরে হয়।

ভাজা—আমাদের দেশে মাছ ভাজা, আলু ভাজা, পটোল ভাজা, বেগুন ভাজা প্রভৃতি অনেক রকম ভাজারই প্রচলন আছে। কড়াইয়ে তেল গরম করিবার পর ফেনা মরিয়া গেলে নুন-হলুদ মাখাইয়া তেলে ভাজিয়া লইলেই হয়। ভাজা জিনিসের খাদ্যমূল্য কম। ইহাতে ভিটামিন 'সি'র অনেকখানি অপচয় হয়।

সাধারণভাবে ভাজা ব্যতীত অনেক সময় বেসন মাখাইয়া বেগুন, কুমড়া প্রভৃতি ভাজা হয়। ফুলুরী, পেঁয়াজী প্রভৃতি ভাজার প্রচলন প্রায় সর্বত্রই আছে। এই দুইটা ভাজা খুব মুখরোচক।

ডিম ও বিস্কুট দিয়া মাছের ফ্রাই (Fry) ও হাঁস-মুর্গীর রোস্ট উঁচু দরের ভাজার পর্যায়ে পড়ে।

শাকসব্‌জীর ঝোল—ভারতবর্ষে নিরামিষ তরকারীর প্রচলন প্রায় সর্বত্রই আছে। আলু-পটোলের ডালনা, আলুর দম, ইঁচড় ও মোচার ঘণ্ট, আলু, কুমড়া, ঝিঙে, বেগুন প্রভৃতি পাঁচমিশালী তরকারী—এইসব রান্না আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। এইসব উৎকৃষ্ট ধরনের ব্যঞ্জন রাঁধিবার জন্য ঘি ও গরম মসলার প্রয়োজন হয়।

আলুর দম—আলু—১ কিলো, ঘি—৫০গ্রা, তেল—৫০ গ্রা, হলুদ, লঙ্কা, গরম মসলা, আদা, জিরা বাটার সাহায্যে আলুর দম রান্না হয়।

ন্যূনাধিক এইসব মসলার সাহায্যে ইঁচড়ের ডালনা, আলু-কপির ডালনা, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি তরকারীও রান্না করা হয়।

স্টু (Stew)—রুগ্‌ণ ব্যক্তির পক্ষে প্রচলিত মসলা সংযুক্ত আহার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এইজন্য মসলা-বর্জিত রান্না তাহার পক্ষে প্রশস্ত হইবে।

কপি, আলু, পটোল প্রভৃতি তরকারী জলে সিদ্ধ করিবার সময়

একটু দুধ, আদাকুচি, তেজপাতা, গোটা গরম মসলা ও এক চামচ চিনি দিতে হইবে। সব্জীগুলি ভাল করিয়া সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ঘি সম্ভার দিতে হইবে। ইহাকেই 'স্টু' বলে।

খাদ্য পরিবেশনে পরিচ্ছন্নতা

শুধু উত্তমরূপে রান্না করিলেই খাদ্য সম্বন্ধীয় সব ব্যাপার সুসম্পন্ন হয় না। ইহার সহিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিবেশন করার মূল্যও অনেকখানি জড়িত আছে। খাদ্যের সংস্পর্শে যাহা কিছু আসিবে সবই পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। আহার্য দ্রব্য কোন অবস্থাতেই না ঢাকিয়া রাখা উচিত নয়। যে জায়গায় খাদ্য পরিবেশিত হইবে সেই জায়গাটি সব সময় সুন্দর, চিত্তাকর্ষক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে অতিরিক্ত খরচের প্রশ্ন উঠে না। একটু চিন্তা ও চেষ্টার সাহায্যেই আমরা এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর, ধোঁয়াহীন উনুন, পরিষ্কৃত আহারের স্থান, বাসনপত্র ঝকঝকে থাকিলে সহজেই আহারে রুচি জন্মে। খাদ্যের বিভিন্নতার সঙ্গে তাহার আকার ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের লালা-গ্রন্থির রসনিঃসরণ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। শান্ত আবহাওয়া ও হাসিগল্পের ভিতর দিয়া ক্ষুধার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্রেক হয়, হজমক্রিয়াও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

পরিবেশনের নিয়মকানুন—খাদ্য রান্না করা ব্যতীত খাদ্য পরিবেশনের যথেষ্ট মূল্য আছে। বেশীর ভাগ শিশুই খুব গরম ও ঠাণ্ডা খাবার অপেক্ষা ঈষদুষ্ণ খাদ্য পছন্দ করে। শস্য জাতীয় দ্রব্য ও সব্জী জাতীয় পদার্থ ঝোলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকিলে

তাহারা সহজেই উহা গ্রহণ করে। বেশী মসলাপূর্ণ ও উগ্র গন্ধযুক্ত খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা মৃদুগন্ধযুক্ত দ্রব্য তাহারা পছন্দ করে। রঙীন বাসনপত্র দেখিলে তাহাদের খাইবার প্রবৃত্তি জন্মে।

খাওয়ার টেবিলের উপর পরিষ্কার টেবিল ক্লথ পাতিয়া রাখা উচিত। আহার করিবার আসন বা চেয়ার ভালরূপে সাজানো রাখা উচিত যাহাতে আহারকারী ভালভাবে বসিয়া মনের আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করিতে পারে। শিশুর বাসনপত্র তাহাদের উপযোগী সুন্দর ও ছোট ধরনের হওয়া উচিত।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। নিয়মিত দুই বেলা আহারের মাঝখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করা মোটেই উচিত হইবে না। নূতন খাদ্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা, কোন বিশেষ খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা, ক্ষুধামান্দ্য বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। শিশুদিগকে রুচি ও ক্ষুধানুযায়ী আহারে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমে হয়ত শিশুরা অনেক জিনিসের বৃথা অপচয় করিতে পারে ; তারপর ধীরে ধীরে খাওয়া বিষয়ে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। তরকারী ও ফল এমনভাবে কাটিতে হইবে যাহাতে শিশুরা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। উজ্জ্বলরঙ হলদে গাজর, সবুজ মটর, লাল বীট প্রভৃতি সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

পরিবেশনকারিণীর পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন হইলে আহারকারীর খাইবার প্রবৃত্তি থাকে না। বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রুচি অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা উচিত। মাতাপিতা সব সময়ে আহারের পরিবেশকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। মাতাপিতা ক্লান্ত ও উৎকণ্ঠিত হইলে শিশুরও সেইরূপ মনোভাব হওয়া স্বাভাবিক।

খাওয়ার সময় শিশু বা আহারকারীকে ভয় দেখান কিংবা অবাস্তব গল্প বলাও বাঞ্ছনীয় নয়।

সব্জীর বাগান (Kitchen Garden)

সুগৃহিণীর যেরূপ উত্তমরূপে রন্ধন করিবার দায়িত্ব আছে, সেইরূপ টাটকা সব্জী ও তরকারী যাহাতে দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনে
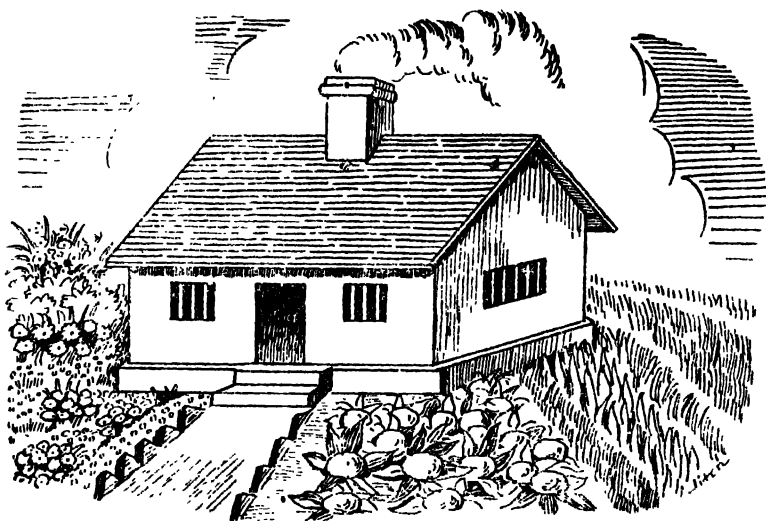
সবজী-বাগান

লাগান যাইতে পারে সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। বাজারে তরিতরকারী অনেক দিনের শুষ্ক ও বাসি থাকে; এইজন্য তাহাদের খাদ্যমূল্য অনেক কমিয়া যায়। রান্না করিলেও সেই সব দ্রব্য তত সুস্বাদু হয় না। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য বাটীর সংলগ্ন স্থানে সবজীর বাগান করিলে সংসারের অনেক উপকার হয়।

সব্জী-বাগান করার প্রধান উদ্দেশ্য হইল—(১) মনোমত

তরিতরকারী ফলানো, (২) তাজা টাট্‌কা শাকসব্‌জীর ব্যবস্থা, (৩) গৃহস্থের আয়ের দিক বাড়ানো।

পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেক বাটীর সংলগ্ন কিছু না কিছু জায়গা থাকে। সেই জায়গা পতিত অবস্থায় থাকিলে কাহারও উপকার হয় না; সেখানে শাক্‌সবজী রোপণ করিলে গৃহস্থের বিশেষ সুবিধা হয়। জায়গার অনুপাতে তরিতরকারীর প্রকার বাড়ানো বা কমানো যায়।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বিভিন্ন প্রকারের শালগম, বীট, গাজর, আলু, কপি, স্যালাড (salad) শাক, টমেটো প্রভৃতি তরকারীর চাষ হয়। আমাদের দেশেও ঐসব তরকারীর কতকগুলি—যেমন টমেটো, বীট, গাজর পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আরও বিভিন্ন রকম তরকারী উৎপন্ন হয়; যেমন—লাউ, কুমড়া, পটোল, ঝিঙে, করলা প্রভৃতি।

ঋতুভেদে বিভিন্ন ধরনের তরকারী পাওয়া যায়। কুমড়া, বেগুন, মোচা, কাঁচাকলা, পেঁপে প্রভৃতি তরকারী সব ঋতুতে পাওয়া যায়। ঝিঙে, ঢেঁড়স, পটোল, কাঁকুড়, ডাঁটা প্রভৃতি তরকারী বর্ষাকালে জন্মে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটী, ধনেপাতা, পেঁয়াজকলি, মূলা, শালগম, বীট, গাজর, স্কোয়াস প্রভৃতি তরকারী শীতকালে হয়। আলু শীতকালে জন্মিলেও সারা বৎসর ইহা সংরক্ষণ করা হয়।

গৃহস্থকে জানিতে হইবে কোন্ ঋতুতে কোন্ বীজ রোপণ করিতে হয়। কপির চারা ভাদ্র-আশ্বিন মাসে রোপণ করিলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ভাল কপি পাওয়া যাইতে পারে। লাউএর বীজ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পুঁতিলে পৌষ-মাঘ মাসে গাছে লাউ ধরে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে শিমের বীজ রোপণ করিলে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে শিম পাওয়া যায়। শীতকালে ধনে হইতে ধনেপাতা বাহির হয়। অনেকেই মাছ ও তরকারী রাঁধিবার সময় ধনেপাতার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাগান করিতে হইলে প্রথমে কোদালের সাহায্যে মাটি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে হইবে। এই গুঁড়া মাটির মধ্যে বীজ রোপণ করিলে বীজ অতি সহজেই বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে এবং মাটির ভিতর হইতে আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সহজেই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে—বিশেষ করিয়া পড়ন্ত রৌদ্রে গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের খুব উপকার হয়।

আমাদের দেশে বিবিধ রকমের সার ব্যবহৃত হয়—যেমন খইল-পচা, হাড়ের সার, গোবর পচা, পানা পচা, কচুরীপানা পোড়াইয়া তাহার ছাই, পটাসিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি।

বর্তমানে আমাদের দেশে সিন্ধ্রির কারখানায় অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট (Ammonium Sulphate) নামে একটি রাসায়নিক সার ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। এই সার ব্যবহারের ফলে গাছের পাতার দ্রুত বৃদ্ধি হয়, অন্যান্য অঙ্গ (যেমন ফুল, ফল প্রভৃতি) ছোট হইয়া যায়। এইজন্য ফুলকপি অপেক্ষা বাঁধাকপির চাষেই ইহা প্রয়োগ করা উচিত।

সব্‌জী-বাগানের তরিতরকারী ভিটামিন 'সি'-র প্রধান উৎস। তরিতরকারীর সঙ্গে লেবু-জাতীয় দুই-একটি গাছ থাকিলে মন্দ হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে লেবুর দান অতুলনীয়। ইহা পরিপাক-শক্তি বাড়াইয়া হজমের বেশ সহায়তা করে।

বর্তমান যুগে কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী হিসাবে রাসায়নিক দ্রব্য (Chemicals) ও ঔষধ (Medicine) ব্যবহৃত হয়। তরিতরকারী সংরক্ষণের জন্যও এইসব দ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন আছে। ইথিলিন (Ethylene), এসিটিলিন (Acetylene) প্রভৃতি জৈব পদার্থের সাহায্যে অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানো হয়। যদিও

বাহির হইতে এইসব ফল দেখিতে অনেকটা পাকা ফলের মত বোধ হয়, কিন্তু অকালপক্ক বলিয়া ইহারা খাইতে সুস্বাদু হয় না।

কিছুদিন আগে পাটগাছের কীট ধ্বংস করিবার জন্য গাছের পাতায় রাসায়নিক দ্রব্য ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই পাট-গাছের পাতা খাইয়া অনেক লোক মারা গিয়াছে।

তরিতরকারীতে কোন কোন সময় বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ছিটানো হয় এবং হিমকক্ষেও (Cold storage) সংরক্ষিত হয়। রাসায়নিক দ্রব্য ছিটানোর ফলে তরকারীর স্বাদ নষ্ট হয় এবং হিমকক্ষে সংরক্ষিত আলু কেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহার পরিচয় আমরা ভালভাবেই লাভ করিয়াছি। সেইজন্য যাহাতে নিজ নিজ পছন্দমত টাট্কা শাকসব্জী পাওয়া যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বাটীর সংলগ্ন জায়গায় সব্জীর বাগান করা উচিত।

আমাদিগকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট 'Grow more food' বা 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে দেশবাসীরা উন্নত ধরনের তরিতরকারী উৎপাদন করিতে বিশেষ মনোযোগী হয়, সেইজন্য গভর্নমেন্ট শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারীকে পুরস্কৃতও করিয়া থাকেন।

অনুশীলনী

1. What are the different functions of food? Give an outline of the classification of different kinds of foods. (খাদ্যের বিভিন্ন ক্রিয়া কি কি? বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।)

2. Why is food so important in our daily life ? State what principle should guide you in planning the daily family menu. (আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য এত প্রয়োজনীয় কেন ? পরিবারের প্রাত্যহিক খাদ্য-তালিকা তৈয়ারী করিতে কোন্ কোন্ নীতির দ্বারা তুমি পরিচালিত হইবে বর্ণনা কর।)

3. Write notes on the following—(a) animal protein and vetetable protein, (b) carbo hydrates, (c) hormone. [নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ—(ক) জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ (প্রোটীন), (খ) শ্বেতসার, (গ) হর্মোন।]

4. Name some mineral elements present in our diet. What purpose do they serve in the human body ? (আমাদের খাদ্যে যে সব খনিজ পদার্থ থাকে তাহাদের কয়েকটির নাম কর। মানব-দেহের উপরে উহাদের কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় ?)

5. Give a comparative statement on the functions of carbohydrates and fat in the human body. How far can they supplement each other in a normal adult diet ? (মানব-দেহে শ্বেতসার এবং স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের কার্যকারিতার তুলনামূলক বিবরণ দাও। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির স্বাভাবিক খাদ্যে ইহা পারস্পরিক প্রয়োজন কতটা মিটাইতে পারে ?) (S. F. 1956)

6. What do you mean by the saying "Food serves as fuel of our body" ? What contributions do cereals make to nutritive value of our daily diet ? ("খাদ্য আমাদের দেহের ইন্ধন স্বরূপ" এই কথার দ্বারা তুমি কি বুঝ ?

শস্যজাতীয় খাদ্য পুষ্টিগত মূল্যের দিক হইতে আমাদের প্রাত্যহিক আহারের ক্ষেত্রে কি প্রকারে সহায়তা করে ?) (S. F. 1957)

7. Describe with sketches, where necessary, the arrangement you should like to have in your kitchen with a view to saving your time and labour. Prepare a list of kitchen equipments such as are usually required by people of moderate means. (সময় এবং শ্রম বাঁচাইবার নিমিত্ত রান্নাঘর কি ভাবে সজ্জিত করিবে তাহা যেমন যেমন প্রয়োজন নকশা অঙ্কন করিয়া বর্ণনা কর। সাধারণ পরিবারের রান্নাঘরে যে সব সরঞ্জামাদি থাকে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।) (G. U. 1949)

8. What points would you consider while selecting furniture and equipment of kitchen ? (রান্নাঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম নির্বাচন করিবার সময়ে কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিবে ?) (S. F. 1955)

9. What kinds of cooking utensils would you select for your kitchen ? (রান্নাঘরের নিমিত্ত কি প্রকার বাসনপত্র নির্বাচন করিবে ?)

10. What precautionary measures would you take in a kitchen ? (রন্ধনগৃহে কি প্রকার সংর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ?)

11. What are the advantages and disadvantages of different types of utensils ? (বিভিন্ন বাসনপত্রের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি কি ?)

12. Write what you know about different types of fuels and ovens. What is the advantage of the pressure cooker ? (বিভিন্ন প্রকার চুল্লী এবং জ্বালানী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। প্রেসার কুকারের সুবিধা কি ?)

13. Why is it advisable to use weights and measuress in our cooking ? (রন্ধনের নিমিত্ত ওজন এবং ।পরিমাপ করিবার সরঞ্জামাদি ব্যবহার করিতে বলা হয় কেন ?)

14. Write briefly what you know about the simple methods of cooking, such as—(a) boiling and steaming, (b) frying, stewing, roasting and baking. [সাধারণ রন্ধন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ, যেমন—(ক) সিদ্ধ করা, বাষ্পে ভাপান, (খ) ভাজা, অল্প জলে মৃদু উত্তাপে সিদ্ধ করা, আগুনের উত্তাপে ঝলসানো বা ভাজা এবং সেঁকা ।)

15. Why cleanliness should be observed in handling food ? (খাদ্যাদি নাড়াচাড়া সম্পর্কে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখিবার কারণ কি ?)

16. How can you prepare the following recipes—(i) rice, (ii) dal, (iii) luchi, (iv) khichurie. [নিম্নলিখিত খাদ্যোপকরণ-গুলি কিরূপে প্রস্তুত করিবে ?—(ক) ভাত, (খ) ডাল, (গ) লুচি, (ঘ) খিচুড়ি ।]

17. What are the essential qualifications of a good server of food ? (খাদ্য-পরিবেশকের কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন ?)

18. Kitchen-garden is an asset to the family.—Discuss. (সব্জী-বাগান পরিবারের একটি সম্পত্তি বিশেষ—আলোচনা কর ।)

19. Write short notes on any two of the following—(a) smokeless chula, (b) kitchen-garden, (c) food preservation. [নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও—(ক) ধূমশূন্য চুল্লী, (খ) সব্জী-বাগান, (গ) খাদ্য সংরক্ষণ ।] (H. S. 1961)

চতুর্থ অধ্যায়

বস্ত্র ও বস্ত্রধৌতি

তন্তুর প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিন্যাস : তাহাদের উৎপত্তি ও উৎপত্তি-স্থান ; তন্তুর গুণ বা ধর্ম

দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি, শালীনতা রক্ষা ও শীতাতপ হইতে শরীরকে বাঁচাইবার জন্য আমাদের বিবিধ প্রকারের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে হয়। ব্যক্তিগত রুচি, বয়স ও ঋতু অনুযায়ী নানা রকমের তন্তুর দ্বারা তৈয়ারী বস্ত্র আমরা ব্যবহার করি। তন্তুকে প্রধানতঃ দুই-ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) উদ্ভিজ্জ তন্তু, (২) প্রাণিজ তন্তু।

ইহা ছাড়া খনিজ তন্তু আর কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক তন্তু, যেমন—নাইলন, ভিনিয়ন, ডেক্রন, টেরিলিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

এই ভাবে তন্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।
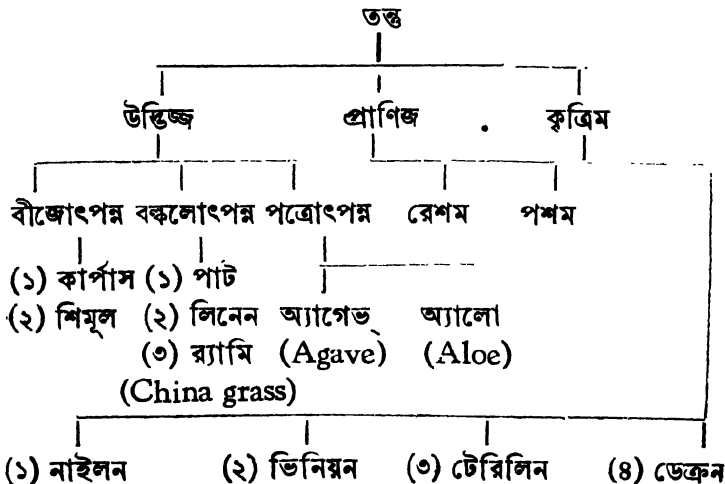
উদ্ভিজ্জ তন্তু

বস্ত্রজগতে বীজ হইতে উৎপন্ন কার্পাস তূলার সাহায্যেই ব্যাপকভাবে সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সূতার দ্বারা সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনের বস্ত্রের চাহিদা মিটানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় তূলার আঁশগুলি বীজকে আবৃত করিয়া থাকে। এই বীজগুলি ৩ হইতে ৫ পরত ঢাকনিযুক্ত ফলের ভিতরে ঢাকা থাকে। ফল পাকিবার পর তূলা হইতে বীজ ছাড়াইয়া তূলা বাজারে বিক্রয় করা হয়। বীজ হইতে তূলা পৃথক্ করাকে 'জিনিং' বলে।

বাণিজ্যিক হিসাবে যে তূলা ব্যবহৃত হয় তাহা চারি প্রকারের। সব চেয়ে ভাল তূলা পাওয়া যায় আমেরিকা ও মিশর দেশে। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট ধরনের তূলা পাওয়া যায় না। মিশর ও আমেরিকার তূলার সঙ্গে ভারতীয় তূলার সংমিশ্রণে (breeding) ভারতীয় তূলার গুণ উন্নত হইতে পারে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তূলার চাষ হয়।
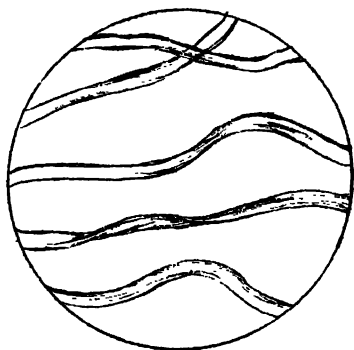
ভারতীয় তন্তু (আসাম)

তূলার আঁশ (Fibre)—তূলার আঁশের বাহিরের দিক সেলুলোজ উপাদানের দ্বারা গঠিত; ভিতরের দিকেও সেলুলোজের বিভিন্ন স্তর থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে সমগ্র আঁশটিকে একটি চওড়া ফিতা বা রিবনের মত দেখায়। ইহার আকৃতি গোলাকার, বীজের সংলগ্ন অংশ হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ক্রমশঃ সরু।

তন্তুর ভিতরে যে রস থাকে তাহা উত্তাপে বা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শুকাইয়া যায়। তখন ঐ তন্তুকে ভাঁজ-করা ফিতার মত দেখায়।

অপরিপক্ক তন্তুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে নলের মত বোধ হয় না, ইহা দেখিতে স্বচ্ছ আর ইহার ভিতর অসমান ভাঁজ পড়ে। ইহাকে ডেড কটন (Dead cotton) বলা হয়। ডেড কটনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। এই তন্তুর ভিতরে প্রবেশপথ না থাকায় এই তন্তু কোন রঙ বা রাসায়নিক পদার্থ শোষণ করিতে পারে না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় তূলার স্থান কোথায় তাহা নীচের তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

তূলা (বিভিন্ন দেশ)	তূলার দৈর্ঘ্য (ইঞ্চির মাপে)		তূলার পরিধি (ইঞ্চির মাপে)	
	লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ
(১) নিউ অর্লিন্স	·৮৮	১·১৬	·০০০৫৮০	·০০০৯৭০
(২) সামুদ্রিক দ্বীপ*	১·৪১	১·৮০	·০০০৪৬০	·০০০৮২০
(৩) ব্রেজিল	১·০৩	১·৩১	·০০০৬২০	·০০০৯৬০
(৪) মিশর	১·৩০	১·৫২	·০০০৫৯০	·০০০৭২০
(৫) ভারত	·৭৭	১·০২	·০০০৬৪৯	·০০১০৪০

সব চেয়ে বড় আঁশের তূলার সব চেয়ে ছোট পরিধি। এই সব লম্বা আঁশ হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের সূতা প্রস্তুত হয়। বাজারে ইহার চাহিদা ও মূল্য বেশী।

লম্বা ধরনের আঁশ হইতে রেশমের মত সুন্দর সূতা পাওয়া যায়। ১ পাউণ্ড আমেরিকার তূলার সমস্ত আঁশ লম্বালম্বি ভাবে জোড়া দিলে প্রায় ১১০০ মাইল পর্যন্ত ইহা ব্যাপ্ত হইবে।

* এই জাতীয় তূলার চাষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দঃ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডার সন্নিহিত দ্বীপগুলিতে হইত বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

কার্পাস তূলা হইতে উৎপন্ন সূতার সূক্ষ্মতা কাউন্ট হিসাবে ধরা হয়। ৮৪০ গজে এক লাছি (hank) ধরা হয়। এইরূপ যত লাছি এক পাউণ্ডে দরকার তাহার উপর সূতার মান ঠিক করা হয়।

৬০ লাছি হইলে ৬০ কাউণ্ট ও ৮০ লাছি হইলে ৮০ কাউণ্ট বলা হয়। তূলার ভিতরে সেলুলোজ ব্যতীত আরও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে ; যেমন—পেক্‌টিক অ্যাসিড (Pectic acid), মোম (Cotton wax), কটন অয়েল (Cotton oil) এবং অন্যান্য অ্যাল্‌বুমিনাস পদার্থ। বিরঞ্জনের ফলে এইসব দূষিত পদার্থ অনেকটা দূরীভূত হয়। সেলুলোজ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত এবং ইহা কার্বো-হাইড্রেট শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন নিষ্ক্রিয় পদার্থ। ইহা জল, কোহল (Alcohol), ইথার বা অন্যান্য দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না।
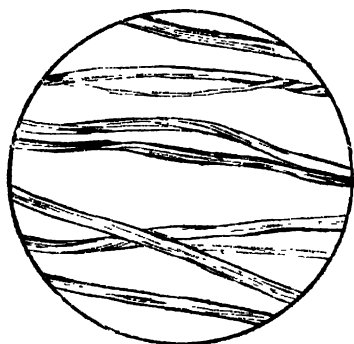
মিশরীয় তন্তু

সাধারণ অবস্থায় তূলার আঁশের উপর জলের কোন প্রভাব থাকে না। কিন্তু ১৫০° ডিগ্রী চাপের তাপে উত্তপ্ত করিলে তূলার আঁশের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং ইহা নরম হইয়া পড়ে। কার্পাস-তন্তুর উপর গাঢ় অজৈব (inorganic) খনিজ অ্যাসিডের ক্রিয়া ক্ষতিকর ; কিন্তু জৈব (organic) অ্যাসিডের ক্রিয়া তত মারাত্মক নয়। অ্যাসিডের শক্তি, তাপ ও স্থিতিকাল অনুযায়ী কার্পাসতন্তুর উপর রাসায়নিক প্রভাব অনেকটা নির্ভর করে। গাঢ় সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড বা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে কার্পাসতন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। লঘু অজৈব অ্যাসিডের দ্বারা শীতল অবস্থায় কার্পাসের কোন

ক্ষতি হয় না, তবে লঘু অ্যাসিডে ভিজানো অবস্থায় বেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে কার্পাসতন্তু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কোন অবস্থায় অ্যাসিড বা লবণজাত পদার্থ কার্পাসতন্তুর উপর অধিকক্ষণ থাকিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণভাবে কার্পাসতন্তুর উপর ক্ষারের প্রভাব তত ক্ষতিকর নয়। ক্ষার জাতীয় কার্বোনেট সাবান, সোহাগা, ফস্‌ফেট অব সোডা, অ্যামোনিয়া প্রভৃতির কার্পাস জাতীয় জিনিসের উপর কোন রাসায়নিক প্রভাব নাই। কিন্তু কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের দ্রবণে যদি কার্পাসতন্তু বেশীক্ষণ ফুটানো হয় বা বেশীক্ষণ বায়ুর সংস্পর্শে রাখা হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাঢ় কস্টিক সোডার সহিত কার্পাসতন্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কার্পাসতন্তু মারসিরাইজেশন (Mercerization—চক্‌চকে) গুণ সম্পন্ন হয়। কার্পাসতন্তু উত্তাপ-পরিবাহক। অন্যান্য তন্তু অপেক্ষা এই তন্তু রঙ করা বা ধোয়া সুবিধাজনক।

শিমূল তূলার বড় আঁশ নাই। ইহা হইতে কোন রকম সুতা প্রস্তুত হয় না। সেইজন্য বস্ত্রশিল্পে ইহার প্রয়োগ নাই। বালিশ, তাকিয়া ইত্যাদিতে শিমূল তূলা ব্যবহৃত হয়।

পাটতন্তু
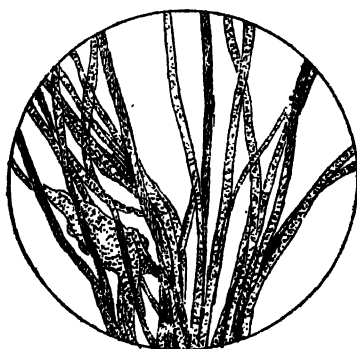
বল্কলোৎপন্ন তুলা : পাট—ইহাকে স্বর্ণসূত্র (golden thread) বলা হয়। পূর্ববঙ্গে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ বেশী হয়। পাটগাছ জমি হইতে উৎপাটিত করিয়া প্রথমে ফল, পাতা ইত্যাদি ছাড়ানো হয়; তারপর কয়েকদিন জলে রাখা হয়। এইভাবে জলে পচিতে থাকিলে কাণ্ড হইতে ছাল আল্‌গা হইয়া পড়ে। তারপর

পাটের আঁশগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকাইলে ইহা বেশ পরিষ্কার দেখায়। পাটের আঁশের দৈর্ঘ্য ১½ গজ হইতে প্রায় ২½ গজ।

ব্যাস্টোজ ও সেলুলোজ এই দুই উপাদানের মিশ্রণে পাটতন্তু গঠিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এই তন্তু দণ্ডাকৃতি দেখায়। এই দণ্ডাকৃতি তন্তুর ভিতরে সরল রেখার মত প্রচুর রেখা দেখা যায়। শতকরা ৩ ভাগ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করিলে ইহা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যাসিডের পরিবর্তে ফটকিরি (Alum) ব্যবহার করিলে পাটতন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বস্তা, চট ও কার্পেট প্রস্তুত করিতে পাটতন্তু ব্যবহার করা হয়। পাটতন্তু হইতে সস্তা দরের সিল্ক প্রস্তুত করা হয়।

লিনেন (Flax)—মসিনা গাছের (flax) ছাল ও কাষ্ঠাত্মক অংশ হইতে লিনেন পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পে কার্পাসতন্তুর পরেই ইহার স্থান। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ইহা ভাল জন্মে। এই গাছের বীজ সাধারণতঃ বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে রোপণ করা হয়। ফ্লাক্‌সের তন্তু উদ্ভিদের কাষ্ঠময় অংশের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হওয়ার দরুন ইহাকে সহজে পৃথক্ করা যায় না।

প্রধানতঃ চারি উপায়ে ফ্লাক্‌স্ হইতে আঁশ ছাড়ানো হয়—

(১) অপরিষ্কৃত বদ্ধ জলে ডুবানো, (২) জলপ্রবাহের ধারার উপর ফ্লাক্‌স্ গাছকে রাখা, (৩) মাঠে শিশিরের সাহায্যে শুকানো, (৪) কৃত্রিম উপায়ে।

অপরিষ্কৃত বদ্ধ জলে ডুবানো—রাশিয়া ও আয়র্ল্যাণ্ডে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গর্ত খুঁড়িয়া বা ছোট ডোবার মধ্যে ফ্লাক্‌স্ গাছ এক সপ্তাহ কাল রাখা হয়। ইচ্ছা করিলে এই সব গর্ত বা ডোবা হইতে জল অপসারণ করা যাইতে পারে। গর্তের জল

কোমল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পচনক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং অনেক জৈব পদার্থ দূরীভূত হইয়া যায়। বেশী পচিলে অনেক সময় তন্তু দুর্বল হইয়া পড়ে। এইভাবে প্রাপ্ত ফ্লাক্স-তন্তুর রঙ সাধারণতঃ গাঢ় হইয়া থাকে।

জলপ্রবাহের ধারার উপর ফ্লাক্স গাছকে রাখা—বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে এই উপায়ে ফ্লাক্স্ হইতে তন্তু সংগ্রহ করা হয়। বড় বড় কাঠের বাক্সের খাঁচায় ফ্লাক্স্গুলি পূরিয়া লওয়া হয়, তারপর জল-প্রবাহের ধারার ভিতর নিমজ্জিত করা হয়। দুই-এক দিনের মধ্যেই পচনক্রিয়া শুরু হয়। তারপর পুনরায় বাক্সের ভিতর পুরা হয়। এই প্রক্রিয়া ১০ হইতে ২০ দিন পর্যন্ত চলে। এই ভাবে যে তন্তু সংগ্রহ করা হয় তাহা হাল্কা রঙের হয়।

মাঠে শিশিরের সাহায্যে শুকানো—দশ সপ্তাহ পর্যন্ত আর্দ্র অবস্থায় ফ্লাক্স্গুলি মাঠে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। পচনক্রিয়ার ফলে গাছ হইতে অাঁশ আল্গা হইয়া যায়। রাশিয়া ও জার্মানিতে এই পন্থা অবলম্বন করা হয়।

কৃত্রিম উপায়—কৃত্রিম উপায়ে ফ্লাক্স্ হইতে তন্তু উৎপাদন খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে ফ্লাক্স্গুলিতে জল মিশানো সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া ১০০° সেঃ তাপে উত্তপ্ত করিলে পেক্টিক অ্যাসিড জেলীর মত পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া তন্তুর উপর লাগিয়া থাকে। পরে উত্তপ্ত সোডার দ্রবণের দ্বারা ইহা দূরীভূত করা হয়। বেইজারনিক (Beijernick) এবং ভ্যানডেলড্যাম (Vandeldem)-এর মতে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইল ফ্লাক্স্গুলিকে বড় বড় কাঠের পাত্রে একত্রিত করা। পাত্রের তলদেশে ফাঁক রাখা হয়। এইজন্য সহজে জলের তাপ ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা চলে। প্রথম ২৪ ঘণ্টায় জলে দ্রবীভূত ময়লা অংশ দূরীভূত করা হয়,

তারপর পচনের জন্য জলের ধারা প্রবাহিত করা হয়। তৃতীয় দিনে কেবল বিশুদ্ধ জলই ব্যবহার করা হয়। বেলজিয়াম পদ্ধতিতে ফ্লাক্স্-তন্তুর ভিতরে শতকরা ৮২'৫০ ভাগ সেলুলোজ এবং ৭'৬ ভাগ শর্করা থাকে এবং গরম জলের দ্বারা পরিষ্কৃত ফ্লাক্স-তন্তুর ভিতর শতকরা ৮৮—৮৯ ভাগ সেলুলোজ এবং ১'২০ ভাগ শর্করা থাকে।

কার্পাসের মত লিনেন-তন্তুও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। কিন্তু ইহার ভিতর অন্যান্য পদার্থের শতকরা মাত্রা অনেক বেশী। ফ্লাক্স্-তন্তু বিরঞ্জিত করিতে হইলে জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পেক্টিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুন ইহা বিরঞ্জিত করিতে এত সময় লাগে। একটি ফ্লাক্স্-তন্তুর দৈর্ঘ্য গড়ে ২০ হইতে ৪০ মিলিমিটার ও প্রস্থ '০১২ হইতে '০২৬ মিলিমিটার হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লিনেন-তন্তুকে দেখিলে নলাকার বস্তুর মত দেখায়। লিনেন-তন্তু কার্পাস-তন্তু হইতে শক্ত ও উজ্জ্বলতর। ইহা কার্পাসতন্তু অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপ পরিবাহক। এই জন্য লিনেনের বস্ত্র সুতীবস্ত্র অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয়।

ক্ষীণশক্তি অ্যাসিড বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ লিনেনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। সেইজন্য কার্পাসতন্তুর মত লিনেনের রঙ ও রাসায়নিক দ্রব্য শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লিনেন-তন্তুকে নলাকার বস্তুর মত দেখায়। এক লী (Lea) বলিতে ৩০০ গজ দৈর্ঘ্য বুঝা যায়। ১ পাউণ্ড লিনেনে ১ লী হয়; তাহা দ্বারা লিনেনের কাউণ্ট বর্ণনা করা হয়। পাটের কাউণ্টও ঠিক এই ভাবে গণনা করা হয়।

র‍্যামি (China grass)—চীন ও ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে এই গাছের চাষ করা হয়। এই র‍্যামি-তন্তুর বিশের অসুবিধা এই যে, সহজে কাণ্ড ও ছাল হইতে তন্তু পৃথক্ করা যায় না সাধারণতঃ

সবুজ কাণ্ডকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং ভগ্ন কাণ্ডের অংশ হইতে তন্তু পৃথক্ করা হয়। তারপর জলের ধারায় তন্তুকে ধুইয়া লওয়া হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সব তন্তু রেশমের মত উজ্জ্বল হয়। ইহা সহজে বিরঞ্জিত করা যায়, কিন্তু উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত করা খুবই কষ্টসাধ্য।

অ্যাগেভ ও অ্যালো—অ্যাগেভকে (Agave) সেঞ্চুরী প্ল্যাণ্ট (Century plant) বলা হয়। ১০০ বৎসরে এই গাছে ফুল ধরে। ইহা আমাদের দেশে হয় না, আমেরিকায় পাওয়া যায়। এই গাছের পাতা দেখিতে কিছুটা আনারস গাছের পাতার মত। এই পাতা হইতে তন্তু তৈয়ারী হয়। অ্যালো (Aloe) ঘৃতকুমারী গাছের মত। ইহার পাতা হইতে তন্তু প্রস্তুত হয়।

প্রাণিজ তন্তু

প্রাণিজ তন্তু প্রধানতঃ দুই প্রকারের : পশম ও রেশম। প্রাণীর গায়ের লোম হইতে যে তন্তু প্রস্তুত হয় তাহাকে পশম বলে, আর গুটিপোকার দেহ হইতে যে তন্তু তৈয়ারী হয় তাহাকে রেশম বলা হয়।

পশমতন্তু—উদ্ভিদ্-তন্তুর প্রধান উপাদান সেলুলোজ; ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত, কিন্তু ইহা ছাড়াও প্রাণিজ তন্তুর ভিতর নাইট্রোজেন ও সালফার থাকে। পশমের ভিতর কার্বন শতকরা ৫০ ভাগ, নাইট্রোজেন ১৫—১৭ ভাগ, হাইড্রোজেন ৭ ভাগ, গন্ধক ২·৪০ ভাগ এবং বাকী অংশ অক্সিজেন। পশমের ভিতর যে গন্ধক আছে তাহা এই উপায়ে প্রমাণ করা যায়। লেড অক্সাইডের লঘু দ্রবণে কস্টিক সোডা সংযোগ
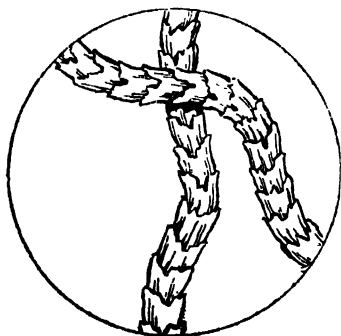
পশমতন্তু

করিয়া তাহার মধ্যে পশম লইয়া উত্তপ্ত করিলে তন্তুগুলি প্রথমে বাদামী রঙ হয়, পরে কালো রঙে রূপান্তরিত হয়। ইহার কারণ ইহাতে লেড সাল্‌ফাইড নামক কালো রঙের একটি রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্যান্য তন্তু হইতে পশমের পার্থক্য করা যায়। অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ পশমের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। পশমের উপর লঘু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে ইহার ঔজ্জ্বল্য বা শক্তির কোন অপচয় ঘটে না ; বরং ইহার উপর স্প্রীং‌এর মত একটা শক্তি আরোপিত হয়। গাঢ় অ্যাসিডে পশমের তন্তু একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষারীয় দ্রবণে পশম সহজেই নষ্ট হয়। 0°সেঃ গাঢ় ক্ষারীয় দ্রবণ পশমের উপরে বিশেষ কোন ক্রিয়া করে না, তবে উত্তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ধ্বংস হইতে শুরু হয় এবং বেশী উত্তাপে ইহা একেবারেই ধ্বংস হইয়া যায়।

ভেড়ার লোম হইতে উৎপন্ন পশমই সাধারণতঃ বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সব পশুর লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয় তাহাদের কথা বলা হইতেছে।

কাশ্মীরী পশম ঃ—তিব্বতের পর্বতে একরকম ছাগল দেখা যায়, তাহা হইতে উৎপন্ন পশম ভারতবর্ষের পশম-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এই পশম কাশ্মীরী পশম নামে প্রসিদ্ধ। এই সব ছাগলোম সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।

মোহেয়ার ঃ—অ্যাঙ্গোরা ছাগলের লোম হইতে উৎপন্ন পশম এই নামে প্রসিদ্ধ। তুরস্ক ও কেপ হইতে আমাদের দেশে এই পশম আমদানি করা হয়।

আলপাকা ঃ—লামা (Llama) জাতীয় পশুর লোম হইতে এই পশম তৈয়ার হয়।

উটের লোম :—উত্তর আফ্রিকায় কোন কোন অংশে গ্রীষ্মকালে উটের লোম ঝরিয়া যায়। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়।

ফার (Fur) :—এগুলি মূলতঃ খরগোশের লোম। উঁচুদরের ফেল্ট হ্যাটের জন্য সাধারণতঃ এগুলি ব্যাপকভাবে কাজে লাগান হয়।

পশমতন্তুর পরিধি তাহার দৈর্ঘ্যের অনুপাতে হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ছোট তন্তু উৎকৃষ্ট ধরনের তন্তু।

অস্ট্রেলিয়া ও কেপ দেশ হইতে আমদানি করা মেরিনো পশমকে বোটানি উল (Botany wool) বলা হয়। ইংলিশ ও মেরিনো ভেড়ার সংমিশ্রণে উৎপন্ন ভেড়ার পশমকে ক্রসফ্রেড উল (Crossfred wool) বলে। ইহা আর্জেনটিনা হইতে আমদানি করা হয়।

রুগ্ণ বা মৃত ভেড়ার দেহ হইতে সংগৃহীত পশম অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। একই জাতের সুস্থ, রুগ্ণ ও মৃত ভেড়ার পশম পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সুস্থ ভেড়ার পশম উজ্জ্বল রঙের, রুগ্ণ ভেড়ার পশম হাল্‌কা রঙের এবং মৃত ভেড়ার পশম একেবারেই অনুজ্জ্বল।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ভেড়ার পশমকে লম্বা দণ্ডাকৃতি দেখায় এবং ইহা মাছের আঁশের মত এক প্রকার পদার্থের দ্বারা আবৃত বোধ হয়। পশমতন্তুর দৈর্ঘ্য ও পরিধি নানা রকমের হইয়া থাকে। একটি পশমতন্তুর দৈর্ঘ্য ১½ ইঞ্চি হইতে ৭ ইঞ্চি হয়, এবং ইহার পরিধি ·০০৪ হইতে ·০১৮ ইঞ্চি হয়।

বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত পশম বেশ মজবুত ও শক্ত, লম্বা ও স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। তাহা ছাড়া ইহার আকর্ষণ-ক্ষমতা থাকা দরকার। পশম যাহাতে যথেষ্ট রঙ ও রাসায়নিক দ্রব্য শোষণ করিতে পারে সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। ভেড়ার দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন প্রকারের পশম পাওয়া যায়। কাঁধ ও শরীরের দুই পার্শ্ব হইতে পাওয়া যায়

সব চেয়ে ভাল পশম। স্বাভাবিক অবস্থায় দুই প্রকার পশম পাওয়া যায়—যেমন একটি লম্বা ও শক্ত, অপরটি ছোট ও নরম। যত্ন সহকারে প্রতিপালিত ভেড়া হইতে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়।

ভেড়ার ত্বক হইতে লোম আলগা করিবার সময় ত্বককে কিছুক্ষণের জন্য চুনের জল অথবা সোডিয়াম সাল্‌ফাইডের লঘু দ্রবণে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ইহার ফলে আঁশগুলি ত্বক হইতে আলগা হইয়া যায় বলিয়া সেগুলি ছাড়াইতে বেশ সুবিধা হয়। ভেড়ার পশমের সঙ্গে চর্বিজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। খুব সতর্কতার সহিত এই চর্বি জাতীয় পদার্থ হইতে পশম পৃথক্ করা হয়। বেশীক্ষণ জলে ফুটাইলে ইহার ঔজ্জ্বল্য ও প্রসারণক্ষমতা কমিয়া যায়। পশমতন্তুর জমাট বাঁধিবারও আশঙ্কা থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ক্ষীণশক্তি অ্যাসিড পশমের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, বরঞ্চ ইহাতে পশমের গুণ উৎকৃষ্টতর হয়। অ্যামোনিয়া, বোরাক্স ব্যতীত ক্ষার জাতীয় পদার্থ পশমের উপর ক্ষতিকর ক্রিয়া করে। এইজন্য পশমী বস্ত্র ধুইবার সময় ঐসব ক্ষার জাতীয় পদার্থকে দূরীভূত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রেশমতন্তু—গুটিপোকা হইতে রেশমতন্তুর উৎপত্তি। আমাদের দেশে গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুতকার্য অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। আসামের এণ্ডিমুগা, বীরভূমের তসর, বহরমপুরের সিল্ক, গরদ প্রভৃতি নানা প্রকারের রেশম গুটিপোকা হইতে উৎপন্ন হয়।
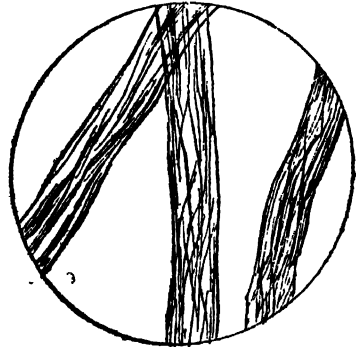
রেশমতন্তু

আসামের এণ্ডিমুগা সাদা, হাল্‌কা বাদামী বা ঘি রঙের হয়। তসর অন্যান্য রেশম হইতে অনেক বেশী শক্ত। তসর বাদামী রঙের, এই রঙ সহজে উঠান যায় না। যেসব গুটিপোকা তুঁতপাতা খাইয়া বর্ধিত হয় তাহাদের তন্তুর পরিধি ·০১৮ মিলিমিটার আর তসরের রেশমতন্তুর পরিধি ·০৫২ মি. মি.। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহা দুইটি চওড়া তন্তুর দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি তসরতন্তুকে আটটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ফিতার মত তসরের অমসৃণ আঁশ $\frac{১}{৫৪০}$ হইতে $\frac{১}{৬০০০}$ ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে। তসরের তন্তুতে ছাইয়ের মাত্রা খুব বেশী থাকে। যদি ১০০° সেঃ উত্তাপের সাহায্যে একটি তসরতন্তুকে শুষ্ক করা হয় তবে সমগ্র তসরতন্তুর ওজনের শতকরা ৫·৩৪ ভাগ ছাই পাওয়া যায়।
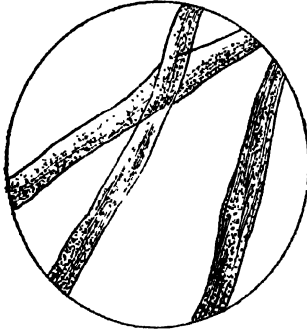
তসরতন্তু

গরদের রঙ অনেকটা মাখনের রঙের মত। পশ্চিমবঙ্গে বহরমপুরে রেশমের চাষ ব্যাপকভাবে চলিতেছে। রেশমকীটের চাষ কোন কোন স্থানে বছরে একবার হয়। সেই সব রেশমকীটকে ইউনিভোল্ট (univolt) বলা হয়। কোন কোন জায়গায় দুইবার বা তাহার অধিকবারও চাষ হয়। উহাদিগকে মাল্‌টিভোল্ট (multivolt) বলা হইয়া থাকে। বহরমপুরে মাল্‌টিভোল্ট কীটের চাষই বেশী হয়। এই কীটের জীবনের চারিটি অবস্থা—ডিম, শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ (Egg, larva, pupa and adult)। পূর্ণ প্রজাপতি হইবার পূর্বে মূককীট অবস্থায় ইহাকে ধ্বংস করা হয়। কারণ পূর্ণ প্রজাপতি

হইবার সময় ইহা রেশমতন্তু কাটিয়া ও নষ্ট করিয়া বাহির হইয়া যায়।

রেশমতন্তু প্রস্তুত পদ্ধতি—রেশম-কীটগুলি কৃত্রিম উপায়ে প্রতিপালিত হয়। বন্য রেশম-কীটও পাওয়া যায়। শিল্পের প্রয়োজনে প্রথমোক্ত কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর গুটিপোকার ভিতরে বোম্বেক্সমোরী (Bombayxmori) বা তুঁতগাছের রেশম-কীট (mulberry silk worm) চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, ইটালী, দক্ষিণ ফ্রান্স, গ্রীস প্রভৃতি দেশে রেশমশিল্পে ব্যবহৃত হয়। এশিয়াতে এই পোকাগুলি খোলা মাঠে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু ইউরোপে এই পোকা একটি বিশেষ ধরনের গৃহে বা অট্টালিকায় রাখা হয়। প্রথমতঃ ডিম পাড়িবার পর কীটগুলিকে কাপড়ে ধরিয়া রাখা হয়। ডিমগুলির গায়ে আঠাজাতীয় এক প্রকার বস্তু থাকায় সেগুলি কাপড়ে লাগিয়া থাকে। ঐ অবস্থায় উষ্ণ ও আর্দ্র স্থানে রাখিতে হয় ও পরে ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ডিমগুলি সাদা কাগজে ঢাকা তাকের উপর রাখা হয়। সেই প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা ১২ দিন ধরিয়া ১৮° হইতে ২৫° সেঃ পর্যন্ত উঠানো হয়। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর ডিমগুলি ফুটিয়া শূককীট বাহির হয়। এই শূককীটগুলিকে তারপর একটি প্রশস্ত কক্ষে লইয়া তুঁতগাছের পাতা খাইতে দেওয়া হয়। শূককীট জন্মিয়াই প্রচুর পরিমাণে

তুঁতগাছে গুটিপোকা, গুটি, সিল্ক মথ ও প্রজাপতি

খাইতে থাকে এবং ৩০ হইতে ৩৩ দিনের মধ্যে গারষ্ঠ আকৃতি ধারণ করে।৫ এই অবস্থায় ৪ হইতে ৬ দিন অন্তর খোলস বদলায়। ইহার পর তাহাদের নড়ন-চড়ন কমিয়া যায়, তাহারা আর আহার গ্রহণ করে না। তখন তাহারা গাছের নরম শাখায় বা পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও ধীরে ধীরে মূককীট বা গুটিতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ এই মূককীট অবস্থায় তাহারা ৩ দিন পর্যন্ত সূতা বোনে। তবে নিশ্চিত হইবার জন্য এই মূককীটগুলিকে ৫ দিন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। তারপর এই গুটিগুলিকে সংগ্রহ করা হয়, এবং জলে সিদ্ধ করিয়া মারা হয়।

গ্রন্থিক রস হইতে রেশমতন্তু প্রস্তুত হয়। রেশম-কীটের শরীরের দুই পাশে চারিটি রসস্রাবী গ্রন্থি (gland) আছে। এই গ্রন্থি চতুষ্টয় হইতে রস নির্গত হইবার একটি করিয়া পথ থাকে। মূককীট তরল রস শরীরের চারিপার্শ্বে নিক্ষেপ করিতে থাকে। ঐ পদার্থ বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া জমাট বাঁধিয়া যায় এবং মূককীট ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে গুটি তৈয়ার করিতে থাকে। ৭২ ঘণ্টায় শূককীট গুটিতে পরিণত হয়।

সংগৃহীত।গুটির উৎকৃষ্ট গুটিগুলি প্রজননের জন্য রাখা হয়, অবশিষ্টগুলি ৬০° হইতে ৭৫° সেঃ তাপে ৩ ঘণ্টা ধরিয়া স্টোভে উত্তপ্ত করিয়া অথবা দশ মিনিট বাষ্পে উত্তপ্ত করিয়া মারা হয়। তারপর গুটিগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ ২৫ গ্রাম ডিম হইতে ৭৬০০০ গ্রাম ওজনের গুটি পাওয়া যায়। প্রত্যেক গুটির ওজন ১°৭৫ গ্রাম। একটি গুটির ১৫ ভাগ রেশম।

রিলিং (Realing)—বাছাই করার পর গুটিগুলি হইতে রিলিং মেশিনের সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করা হয়। এই উপায়ে যে সব সিল্ক পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত দামী ও উৎকৃষ্ট ধরনের। কতগুলি

গুটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখা হয় এবং গ্যাস বা বাষ্পের সাহায্যে ৬০° সেঃ তাপে উত্তপ্ত করা হয়। ইহার ফলে রেশমের আঠাজাতীয় পদার্থ গলিয়া যায় এবং প্রত্যেক রেশমতন্তু পরস্পর জোড়া লাগিতে সুবিধা পায়। তারপর মেসিনের সাহায্যে রিলিং সম্পন্ন করা হয়।

গুটিগুলি রিলিং করিবার পূর্বে প্রথমতঃ ক্ষার মিশ্রিত গরমজলে সিদ্ধ করা হয়। কারণ গুটির ভিতর যে আঠাজাতীয় পদার্থ থাকে তাহা বিনষ্ট করিতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ সহায়তা করে। ইহার পর শক্ত ব্রাশের সাহায্যে সুতা বাহির করিয়া চীনামাটির গাইডের (সরু পাইপের মত জিনিস) ভিতর দিয়া পার করা হয়। এই ভাবে গুটি হইতে রেশমতন্তু পৃথক্ করা হয়।

রেশমের রাসায়নিক সংগঠন ও বিশেষ গুণাবলী—সাধারণতঃ রেশম-কীট যে শ্রেণীর বৃক্ষের পাতা খাইয়া থাকে, তাহাদের গায়ের রঙ সেইরূপ হয়। সোনাল (Indian Laburnum) গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করার ফলে তাহার গায়ের রঙ সোনালী হয়। রেশম-গুটির উপরের ও নীচের রেশম কম দামী। এইজন্য নিকৃষ্ট ধরনের বস্ত্র প্রস্তুতির জন্য এই শ্রেণীর রেশম ব্যবহার করা হয়। রেশম একক পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়; ইহা দুইটি পদার্থের দ্বারা গঠিত: একটি প্রকৃত আঁশ—ফাইব্রোইন (Fibroine), অপরটি বাহিরের আবরণ—সেরিসিন (Sericine)।

সেরিসিন আঠা জাতীয় পদার্থ এবং গরম জল বা লঘু সাবান দ্রবণে দ্রবীভূত (dilute) হয়, কিন্তু ফাইব্রোইন জলে বা সাবানে গলে না। সমগ্র রেশমতন্তুর প্রায় শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ ওজনের রেশম আঠার দ্বারা গঠিত। সেরিসিন থাকার দরুন রেশমীবস্ত্রের উজ্জ্বলতা ফুটন্ত জলে বা রঙ-ধৌত করিবার সময় আংশিকভাবে নষ্ট হয়।

কৃত্রিম উপায়ে এই তন্তুর উজ্জ্বলতা বাড়ান যায়। অ্যাসিটিক অ্যাসিড্ (Acetic Acid), ভিনিগার, টারটারিক অ্যাসিড (Tartaric acid), লঘু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি রেশমতন্তুর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। নাতিগাঢ় অ্যাসিডে ডুবাইয়া যদি রেশমী বস্ত্রকে শুকানো হয় তবে ইহার তন্তু সংকুচিত হয় এবং তুলার বস্ত্রের মত মার্‌সিরাইজেশন গুণ-সম্পন্ন হয়। এই জাতীয় রেশমকে ক্রেপ সিল্ক বলা হয়। o° সেঃ তাপ ক্ষারজাতীয় পদার্থের রেশমের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। উত্তপ্ত ক্ষারজাতীয় দ্রবণ রেশমতন্তুকে নষ্ট করে। সাবানজল সিল্কের কোন ক্ষতি করে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে রেশমতন্তুকে স্বচ্ছ আকৃতিবিহীন দণ্ডের মত দেখায়।

পশমের মত রেশমও জলীয় অংশ গ্রহণ করে। রেশমতন্তু নিজ ওজনের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ জল শোষণ করিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও রেশমবস্ত্র ভিজা বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু স্পর্শ করিলে ঠাণ্ডা বোধ হয়। রেশমতন্তু স্থিতিস্থাপক; ইহাকে স্বীয় দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{৫}$ হইতে $\frac{১}{৪}$ ভাগ পর্যন্ত টানিয়া বাড়ানো যায়। রেশমতন্তু বিদ্যুতের কুপরিবাহক এবং ঘর্ষণের দ্বারা সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সেইজন্য রেশমবস্ত্রের উৎপাদন-কেন্দ্রে জলীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করা উচিত যাহাতে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি না হয়।

খনিজ তন্তু

খনিতে আকরিক হিসাবে অ্যাস্‌বেস্‌টস্ পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে অ্যাস্‌বেস্‌টসের সঙ্গে মিশ্রিত অন্যান্য পদার্থ পৃথক্ করা হয়; তারপর উহাকে তন্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অ্যাস্‌বেস্‌টসের প্রধান গুণ এই যে, ইহা তাপের কুপরিবাহক।

এইজন্য অগ্নি-নির্বাপক দলের (Fire Brigade) লোকেরা এই তন্তু দ্বারা দস্তানা বা পোশাক তৈয়ারী করে। তাপের কুপরিবাহক বলিয়া ইহা আগুন নিবাইতে সহায়তা করে। রসায়নাগারের উত্তপ্ত কাচপাত্র—বীকার, বেসিন প্রভৃতি ঠাণ্ডা করিবার জন্য অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ পাতে (sheetএ) রাখা হয়। তবে আমরা বাজারে যে অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ দেখিতে পাই উহা শুধু অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ নয়, উহার সঙ্গে তূলা, লিনেন প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। তূলা ও লিনেন-তন্তু অগ্নি সংযোগে নষ্ট করিয়া অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌কে তন্তুরূপে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলা হয়।

ধাতব তন্তু

স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত জরি উঁচু দরের বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। এখন কৃত্রিম জরি, সলমা, চুমকী প্রভৃতি বাজারে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম তন্তু (Artificial Fibres)

প্রকৃতিজাত তূলা, রেশম ও পশম হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এইসব ছাড়াও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সাধনার ফলে বহু প্রকারের কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কতগুলি একেবারে কৃত্রিম ; যেমন—নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি, আর কতগুলি অর্ধকৃত্রিম ; যেমন—রেয়ন, অ্যাসিটেট রেয়ন, সিল্ককেসিন ফাইবার, কর্ন ফাইবার, সয়াবিন ফাইবার, প্রোটীন ফাইবার ইত্যাদি। প্রকৃতিজাত তন্তুর সঙ্গে কৃত্রিম তন্তুর সংমিশ্রণেও অনেক তন্তু গঠিত হইয়াছে। পূর্বে মানুষ তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের তন্তুর জন্য একমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিত। কিন্তু এখন চেষ্টার দ্বারা সে কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার করিয়াছে; হয়ত অদূর

ভবিষ্যতে উন্নত ধরনের কৃত্রিম তন্তুর সাহায্যে সে তাহার বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়া ফেলিবে।

অনেক প্রকারের কৃত্রিম তন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন, ডেক্রন, গ্লাস ফাইবার, প্রোটীন ফাইবার, সয়াবিন ফাইবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব কৃত্রিম তন্তু খুব হাল্‌কা ধরনের এবং নানা কার্যে (যেমন—প্যারাসুট, দড়ি, থলে, ফিতা, পরিস্রাবণের বস্ত্র তৈয়ারীর কাজে) ব্যবহৃত হয়। এখানে সব আলোচনা ব্যাপকভাবে করা সম্ভবপর নয়। তবে বেশী ব্যবহৃত কয়েকটি কৃত্রিম তন্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

রেয়ন—রবার্ট হুক নামক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম রেশমতন্তুর অনুরূপ কৃত্রিম তন্তু রেয়ন উৎপাদন করেন। সেলুলোজ-জাতীয় কার্বো-হাইড্রেট উদ্ভিদের দেহগঠনের প্রধান উপাদান। পাতার ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থ সূর্যালোকের সহায়তায় কার্বন ডাইঅক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করিয়া প্রথমে ফরম্যালডিহাইড, পরে চিনি ও স্টার্চ উৎপন্ন করে। এই স্টার্চ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে সেলুলোজ কার্বোহাইড্রেটে রূপান্তরিত হয়। এই সেলুলোজ নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রো-সেলুলোজ যৌগ (compound) উৎপাদন করে। উদ্ভিদের এই নাইট্রো-সেলুলোজ অংশ রেয়ন-তন্তু প্রস্তুতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এই সেলুলোজ অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। ইহা ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়, কিন্তু
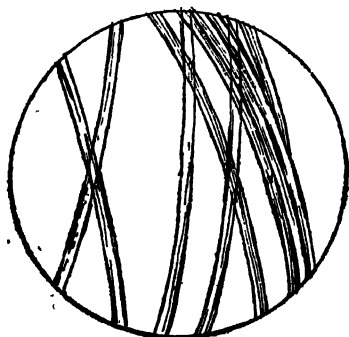
রেয়ন

অ্যাসিটোনে দ্রবণীয়। সেলুলোজের এই দাহ্যগুণকে পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অদাহ্য গুণে রূপান্তরিত করা হয়। ইথার ও অ্যালকোহল দ্রবণে সেলুলোজ ডাই-নাইট্রেট মিশাইলে এক প্রকার ঘন আঠাল পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম কোলোডিয়ন। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কোলোডিয়ন মিশাইয়া সূতার আকারের এক রকম কোলোডিয়ন তন্তু তৈয়ারী করা হয়। অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফাইডে ভিজাইয়া এই তন্তু অদাহ্য করা হয়। ইহাকে রেয়ন বলা হয়। রেয়ন তৈয়ারী করার জন্য তিনটি মূল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ঃ (১) ভিসকোস্ (Viscose), (২) সেলুলোজ অ্যাসিটেট (Cellulose acetate), (৩) কিউপ্রামোনিয়াম (Cuprammonium) পদ্ধতি।

ভিসকোস্ (Viscose) পদ্ধতিতে সেলুলোজের পাতগুলি প্রথমতঃ কস্টিক সোডার দ্রবণে ডুবানো হয়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকার দরুন সেলুলোজের পাতগুলি নরম হইয়া যায়—উদ্বৃত্ত তরল পদার্থকে বাহির করিয়া নেওয়া সয়। তারপর এই আর্দ্র পাতগুলি যন্ত্রের সাহায্যে একেবারে চূর্ণ না করিয়া টুকরা টুকরা করা হয়। তারপর এইগুলি ইস্পাতের পাত্রে নিয়ন্ত্রিত তাপে রাখা হয়। কস্টিক সোডা থাকার দরুন ইহার রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। তারপর এই টুকরাগুলি প্রকাণ্ড ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে কার্বন বাই-সাল্‌ফাইডের সঙ্গে মিশাইয়া বেগে ঘুরানো হয়। ইহার ফলে সমগ্র সেলুলোজ পদার্থটি উজ্জ্বল কমলা রঙের সেলুলোজ জেনথেট (Cellulose xanthate) নামে আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

তারপর সূতা প্রস্তুতের দ্রবণ তৈয়ার করা হয়। ট্যাঙ্কের ভিতর সেলুলোজ জেনথেট ও কস্টিক সোডার দ্রবণ মিশানো হয়। এইখানে তন্তুর ঔজ্জ্বল্য পরিপূর্ণরূপে নির্ধারিত হইয়া যায়। উজ্জ্বল

রঙ পাইতে হইলে ইহার সহিত আর কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইবার প্রয়োজন হয় না। আর হাল্‌কা বা ফিকে রঙের প্রয়োজন হইলে অন্য বিশেষ ধরনের রঙ মিশানোর দরকার হয়। ইহার পর সূতা প্রস্তুতের দ্রবণে কিছু নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়। তারপর দ্রবণকে পরিস্রাবণ করিয়া অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি দূরীভূত করা হয়। শেষ পর্যায়ে রেয়নের সূতা প্রস্তুত করা হয়।

একটি সরু চালুনীর মত জিনিসের ভিতর দিয়া এই পদার্থ পাম্পের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। এই চালুনীর ছিদ্রগুলি এত সরু যে খালি চোখে দেখা যায় না। তন্তুর সংখ্যা এই ছিদ্রসংখ্যার উপর নির্ভর করে। ঘূর্ণায়মান কাচের চাকাতে তন্তুগুলি জড়ানো হয় এবং ধৌত করিয়া শুকানো হয়, তারপর মিলে কাপড় বুনিবার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) আসল রেশমতন্তু অপেক্ষা নরম। ভিজা অবস্থায় এই তন্তুর অনেক জোর কমিয়া যায়, শুষ্ক হইলে ইহার স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসে। এইজন্য কৃত্রিম রেশম ধৌত ও রঙ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

রেয়নের পক্ষে অ্যাসিড ক্ষতিকর নয়। কৃত্রিম তন্তুর ঔজ্জ্বল্য আসল রেশম তন্তু অপেক্ষা বেশী। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে রেয়নতন্তুকে চওড়া ফিতা বা রিবনের মত দেখায়। এই তন্তু উত্তাপ পরিবাহক ও স্থিতিস্থাপক। এই স্থিতিস্থাপকতার জন্য রেয়ন সংকুচিত হয় ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইহাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা হয়। পূর্বে রেয়ন প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়িত, এখন আধুনিক পদ্ধতিতে তাহার চেয়ে অনেক কম পড়ে। বর্তমানে উৎকৃষ্ট ধরনের রেয়ন পাওয়া যায়।

নাইলন (Nylon)—অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিবার যন্ত্রে উচ্চ চাপে

কতকগুলি গ্যাস এবং আলকাতরার সংমিশ্রণে অ্যাডিপিক অ্যাসিড (Adipic acid), এবং হেক্সামিথিলিন ডাইএমাইন (Hexamethylene diamine) নামক দুইটি রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি হয়।

ইহার সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিশানো হয়। এই অ্যামোনিয়াও উচ্চচাপে সংযোজনী প্রথায় (Synthesis) তৈয়ারী করা হয়। নাইলনের উপাদান কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। এইজন্যই বলা হয় যে কয়লা, বায়ু ও জলের সাহায্যে নাইলন প্রস্তুত হয়। অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও ডাইএমাইন দ্রবণ স্টেইনলেস (Stainless) ইস্পাতের কেটলীতে নেওয়া হয়। এইসব রাসায়নিক দ্রব্য সংমিশ্রণে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামোনিয়াম অ্যাডিপেট নামক নাইলন দ্রবণে রূপান্তরিত হয়। এই ঘন দ্রবণ সিলিণ্ডার-আকৃতি অটোক্লেভে (Autocleve) নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ইহার বহু রূপান্তর ঘটে। নাইলনের আণবিক গুরুত্ব ও চটচটে ভাব নিয়ন্ত্রিত করিবার কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ইহার সঙ্গে যোগ করা হয়। বহু রূপান্তরের ফলে গলিত নাইলনকে রিবনের মত বাহির করিয়া লওয়া হয়। তারপর রিবনগুলি টুকরা টুকরা করিয়া পাত্রে ঢালিয়া ২৮৫° সেঃ তাপে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর পাম্পের সাহায্যে পরিস্রাবণ করিয়া সরু ছিদ্র বিশিষ্ট ছাঁকনীর ভিতর দিয়া চালনা করা হয়। তখন সরু তন্তু রূপে নাইলন বাহির হইয়া আসে।

প্রস্তুত করিবার সময় নাইলন-তন্তুকে নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয় যাহাতে অক্সিজেনের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ইহার উপর ঘটিতে না পারে। গলিত নাইলন ছাঁকনী হইতে বাহির হইয়া বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং খুব তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে। মিনিটে ৩০০০ ফুট নাইলন-তন্তু প্রস্তুত হয়। উত্তাপের সংস্পর্শে আসিলে নাইলন-তন্তু নষ্ট হইয়া যায়।

এইজন্য নাইলন-তন্তু-নির্মিত বস্ত্র কখনও ইস্ত্রি করিতে নাই। মৃদু অ্যাসিড বা ক্ষার নাইলন-তন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর নয়। নাইলন-তন্তুর জল শোষণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। সেইজন্য এই তন্তুর রঙ করিবার জন্য বিশেষ প্রকারের রঞ্জন দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এবং ধৌত করিবার জন্য পেট্রোল, বেঞ্জিন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অনেকের ধারণা নাইলন ছিদ্রবিহীন হওয়ার দরুন অনেক সময় চর্মরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডেক্রন (Dacron)—ইহা একটি কৃত্রিম তন্তু, দেখিতে সাদা। বেশী দিন বাহিরে ঝুলাইয়া রাখিলে রঙ নষ্ট হয়; সহজে সাদা রঙ ফিরাইয়া আনা যায় না। ডেক্রন-তন্তুর বস্ত্র সহজে কুঁচকায় না, ভাঁজও নষ্ট হয় না। এই কাপড় ইস্ত্রি করা খুব সহজ। ডেক্রনের সঙ্গে তূলার তন্তু মিশাইলে উত্তম প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। শতকরা ৬৫ ভাগ ডেক্রন ও ৩৫ ভাগ তূলা মিশাইয়া ব্লাউজ ও শার্টের কাপড় তৈয়ারী করা হয়। তূলার শোষণের ক্ষমতা আছে বলিয়া গ্রীষ্মকালে এই তূলা-মিশ্রিত ডেক্রন পরিলে বেশ আরাম বোধ হয়। ইহা হাল্‌কা ও নরম, বেশ সহজেই ধোওয়া যায়। কীটনাশক দ্রব্য এই কাপড়ের উপর বিছাইয়া না দিলে পোকায় কাটে। ইহা যে কোন লোক পরিতে পারে।

ভিনিয়ন—ইহা একটি কৃত্রিম তন্তু। ইহা শিল্পের পরিস্রাবণ-বস্ত্র তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা জুতা, হাতের দস্তানা, মাছের জাল এবং অন্যান্য বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিড, ক্ষার এবং অন্যান্য তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ ইহার উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করিতে পারে না। ভিনিয়ন-তন্তু রৌদ্রে নষ্ট হয় না। জীবাণু বা ছত্রাকের আক্রমণ হইতে ইহা সহজেই অব্যাহতি পায়।

ভিনিয়ন-তন্তুর ভিতরে শতকরা ৮৮ হইতে ৯০ ভাগ ভিনিল

ক্লোরাইড এবং শতকরা ১০-১২ ভাগ ভিনিল অ্যাসিটেট আছে। এই পদার্থগুলি অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করিয়া ভারী চটচটে পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়, তারপর পরিস্রাবণের পর স্টেইনলেস্ স্টীলের বহুছিদ্রযুক্ত ছাঁকনীর ভিতর দিয়া চালিত করিয়া তন্তুতে পরিণত করা হয়। ভিনিয়ন-বস্ত্রের ভিতর দিয়া জল শোষিত হয় না। এই জন্য ইহা বিশেষ পদ্ধতিতে রঙ করা হয়।

বস্ত্র ধৌত কারবার ঘর ও সাজসরঞ্জাম

গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার সময় কাপড় কাচিবার ঘরের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ গৃহে যদি অল্প খরচে জামা-কাপড় পরিষ্কার করা হয়, তাহা হইলে আর্থিক সুবিধা হয়, জামা-কাপড়ও কম নষ্ট হয়। এই ঘরে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন প্রচুর আলো, বাতাস ও জল।

কাপড় ধুইবার জন্য জলই বেশী প্রয়োজন, এইজন্য একটি কল (Tap) আবশ্যক। ইস্ত্রি করিবার সময় বা ধোয়ার সময় কাপড়ে দাগ দেখিবার জন্য আলোর প্রয়োজন। কাপড় কাচিবার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি রাখিবার জন্য ঘরটি প্রশস্ত হওয়া দরকার। যাহাতে জল সহজেই সরিয়া যাইতে প্যরে, সেইজন্য মেঝেটি একটু ঢালু করিতে হইবে। যদি ঘরের কোন অংশে জল জমিয়া থাকে তাহা হইলে শেওলা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ইহার ফলে ঘরের মেঝে পিছল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

কাপড় ধোয়ার সরঞ্জাম প্রয়োজনীয় সাবান, ক্ষারদ্রব্য, অ্যাসিড রাখিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা রাখা উচিত। জায়গার স্বল্পতা থাকিলে ঝুলান র‍্যাকের উপর কাপড় শুকানো যাইতে পারে।

কাপড় ধুইবার ঘরে নিম্নলিখিত সাজসরঞ্জাম অত্যাবশ্যক :—
(১) সিঙ্ক (Sink), (২) টব ও বালতি, (৩) মাটির বা এনামেলের

গামলা, (৪) উনুন, (৫) ভ্যাকুয়াম কোন (Vacuum cone), (৬) ঢেউখেলান তক্তা, (৭) কাপড় শুকাইবার র‍্যাক, (৮) ইস্ত্রি, (৯) ইস্ত্রি করিবার টেবিল, (১০) স্লিভ বোর্ড (Sleeve Board—আস্তিন ইস্ত্রি করিবার ভিন্ন টেবিল), (১১) কম্বল, (১২) চাদর, (১৩) স্প্রে মেসিন (Spray machine), (১৪) স্পঞ্জ, (১৫) আলমারি, (১৬) কাঠের রোলার, (১৭) ইস্ত্রি করিবার ফ্রেম, (১৮) রাসায়নিক দ্রব্য—নীল, টিনোপাল, নাইট্রিক অ্যাসিড, অক্সেলিক (oxalic) অ্যাসিড ইত্যাদি।

সিঙ্ক—কাপড় ধৌতকারী সিঙ্কের সাহায্যে নিজের সুবিধামত অতি সহজেই কাপড় ধুইতে পারে। সিঙ্কের নীচ হইতে জল ধরিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

টব ও বালতি—কাপড়চোপড় জলে ডুবাইবার জন্য, ধোয়ার জন্য, নীল দেওয়া, মাড় দেওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য অন্ততঃ দুইটি বালতি ও দুইটি টব হইলেই সাধারণ গৃহস্থের কাজ চলে।

মাটির বা এনামেলের গামলা—ধুইবার কাজে মাটির গামলা নিরাপদ, কারণ রাসায়নিক দ্রব্য মাটির উপরে কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কাঠের গামলাও ব্যবহার করা চলে। কিন্তু কাঠের গামলা জলে ভিজাইলে উহা হইতে যে কষ বাহির হয় তাহাতে কালচে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা থাকে। এনামেলের গামলা ভাল, কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ। রেশম ও পশমের বস্ত্র ধুইবার জন্য এনামেল পাত্র ব্যবহার করা হয়। কাপড়ে নীল দেওয়া বা রঙ করিবার সময় এনামেলপাত্র ব্যবহার করা চলে।

উনুন—ইস্ত্রি গরম করিবার জন্য বা বস্ত্রগুলিকে জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য উনুনের প্রয়োজন। কাপড় গরম জলে ধুইলে সহজে পরিষ্কার হয়।

ভ্যাকুয়াম কোন (Vacuum cone)—এই যন্ত্রটি খুবই

দরকারী। ময়লা জামা-কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য বারবার সাবানজলে ডুবাইতে হয় এবং যাহাতে সাবানজল কাপড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য নাড়িয়া দিতে হয়। এই কাজের সুবিধার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইহার নিম্নদেশ ফানেলের আকৃতি বিশিষ্ট ও চারিধার খাঁজকাটা ; উপরের দিক কাঠের দণ্ডের সহিত যুক্ত। কাঠের দণ্ড বা হাতল ধরিয়া যন্ত্রটি কাপড়ের উপরে চাপ দিতে হয়। তাহাতে গরম সাবানজল কাপড়ের ভিতর প্রবেশ করে। ইহাতে পরিশ্রম কম হয় ও সহজে কাজ হয়।
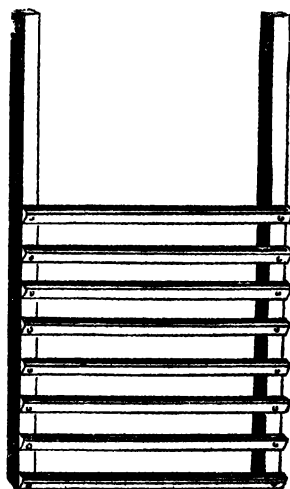
কাপড় কাচিবার তক্তা (Scrubbing Board)

ঢেউখেলানো তক্তা—বহুদিন যাবৎ এই জিনিসের প্রচলন চলিয়া আসিয়াছে। থুপিয়া থুপিয়া কাপড় কাচিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। কিন্তু ইহাতে কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা

থাকে। সেইজন্য ঢেউখেলানো তক্তা অপেক্ষা মসৃণ তক্তা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

কাপড় শুকাইবার র‍্যাক—অনেক জায়গায় স্থানাভাবের জন্য এই প্রকার র‍্যাকের বিশেষ সুবিধা হয়। ঘরের ছাদের ভিতরে যে হুক থাকে, সেই হুকের সহিত এই র‍্যাক ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহাতে জায়গার সমস্যা ঘুচিয়া যায়।
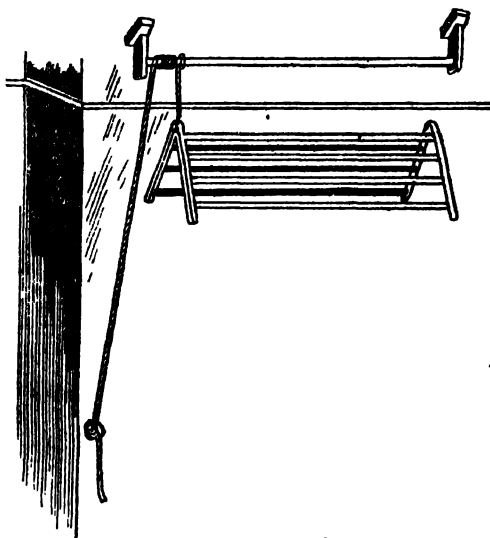
কাপড় শুকাইবার র‍্যাক (Drying Rack)

জামা-কাপড় ঘরের ভিতর শুকানো ভাল। কারণ সূর্যের কিরণে জামা-কাপড় অতিরিক্ত শুকাইয়া যাওয়ার ফলে খস্‌খসে হয় ও রঙীন জামা-কাপড়ের রঙ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ইস্ত্রি—সাধারণতঃ তিন রকমের ইস্ত্রি ব্যবহার করা হয়ঃ (ক) সম্পূর্ণ লোহার তৈয়ারী চ্যাপ্টা ধরনের ইস্ত্রি, (খ) কয়লার ইস্ত্রি—ইস্ত্রিকে গরম রাখিবার জন্য ভিতরে কয়লার বন্দোবস্ত সমেত লোহার ইস্ত্রি, (গ) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি।

(ক) চ্যাপ্টা ইস্ত্রি—সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজের জন্য এই ইস্ত্রি মন্দ নয়। তবে ইহার কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন—ইহার তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; ইস্ত্রি মরচে-ধরা হইলে জামা-কাপড়ে দাগ লাগিয়া যাইতে পারে।

(খ) কয়লার ইস্ত্রি—সাধারণতঃ রজকেরা এই ইস্ত্রি ব্যবহার করিয়া থাকে। জ্বলন্ত কয়লা বা গুল ইস্ত্রির ভিতর লওয়া হয়, ইহাই ইস্ত্রিকে গরম রাখে।

(গ) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি—এই ইস্ত্রি ব্যবহার করা সব চেয়ে সুবিধাজনক। ইহাকে বার বার গরম করিবার প্রয়োজন হয় না—সুইচ্ টিপিলেই ইস্ত্রি গরম হইয়া উঠে। বর্তমান যুগের উন্নত ধরনের
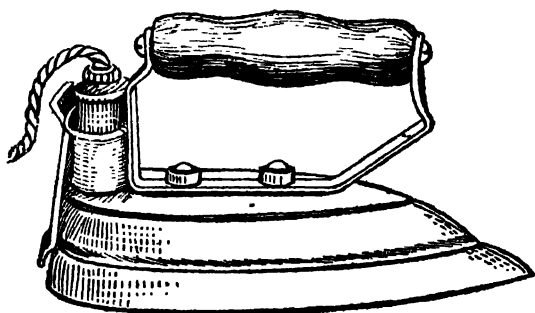
বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রেগুলেটার (Regulator) আছে। সেইজন্য ইস্ত্রি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ জানিতে অসুবিধা হয় না। তবে সব বৈদ্যুতিক প্লাগ পয়েন্ট (Plug point) ইস্ত্রি করিবার সহজ আয়ত্তে থাকা দরকার।

ইস্ত্রি করিবার বোর্ড (Ironing Board) ও স্লিভ বোর্ড (Sleeve Board) থাকা দরকার। প্রথমতঃ বোর্ডের উপর গরম কম্বল পাতিয়া

তাহার উপর ধোওয়া কাপড় রাখিয়া ইস্ত্রি করিতে হয়। জামার আস্তিন ইস্ত্রি করিবার জন্য স্লিভ বোর্ড রাখিতে হয়। ইস্ত্রির সংস্পর্শে
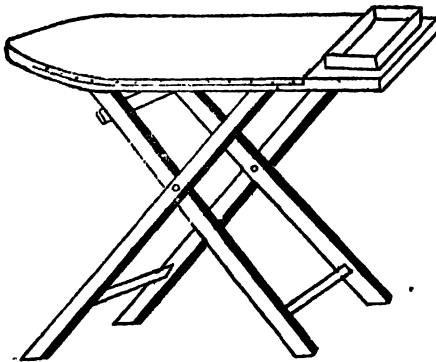
ইস্ত্রি করিবার বোর্ড (Ironing Board)
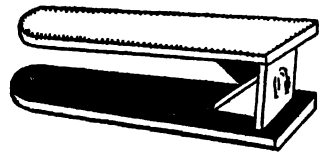
স্লিভ বোর্ড (Sleeve Board)

যাহাতে কাপড় বেশী উত্তপ্ত না হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে জল ছিটানো উচিত। স্পঞ্জ দিয়াও জল দেওয়া যাইতে পারে।

ম্যাঙ্গলার—নিত্যব্যবহার্য অনেক কাপড়চোপড় ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হয় না। ভালভাবে ভাঁজ করিয়া ম্যাঙ্গলার যন্ত্রে চাপ দিলেই চলে। ম্যাঙ্গলার যন্ত্রের উপরের ও নীচের দুইটি অংশই ধাতুনির্মিত। নীচের অংশে প্যাড আঁটা থাকে। টান দিলে দুইটি অংশই পরস্পর লাগিয়া যায়। ধাতুনির্মিত ঢাকনাটি সহজেই গরম করা যায়।
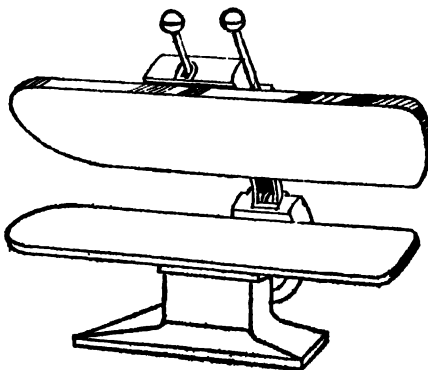
ম্যাঙ্গলার (Mangler) বা চাপ দিবার যন্ত্র

এই সব আসবাবপত্র ছাড়াও কতগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ধৌতাগারে রাখা উচিত। যেমন কাপড় ধোয়ার পর ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও শুভ্র করার জন্য নীল, টিনোপাল ইত্যাদি, কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড, অক্সেলিক অ্যাসিড প্রভৃতি দরকার আর মাড় দেওয়ার জন্য স্টার্চ, অ্যারারুট প্রভৃতিও রাখিতে হয়।

ড্রাই ক্লিনিং পাম্প (Dry cleaning pump)—পাশ্চাত্ত্য দেশে এই পাম্প ড্রাই ক্লিনিংএর উদ্দেশ্যে গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার করা হয়।
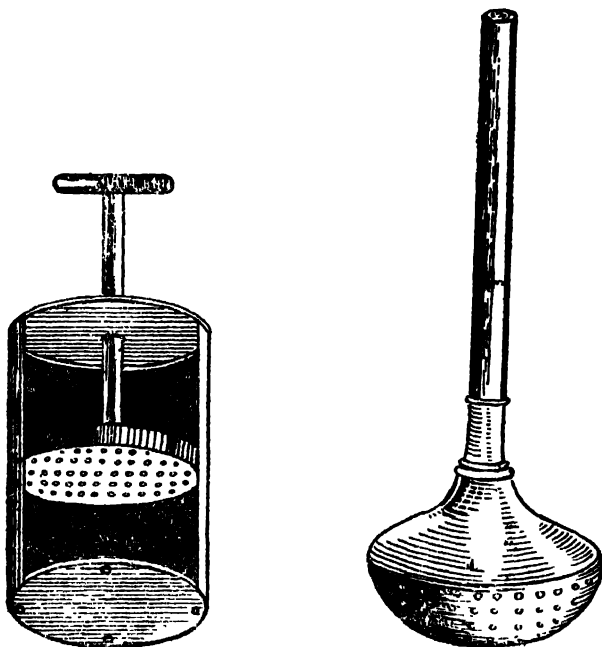
ড্রাই ক্লিনিং পাম্প শোষক যন্ত্র (Suction washer)

কিন্তু আমাদের দেশে ইহা পাওয়া যায় না। ড্রাই ক্লিনিং করিতে হইলে খোলা পাত্রে ইহা করা হয়। কিন্তু শুষ্ক উপায়ে পরিষ্কার করিবার দ্রব্যগুলি প্রায়ই দাহ্য এবং উদ্বায়ী (volatile)। সুতরাং

এইভাবে কাপড় ধুইতে যাওয়া বিপজ্জনক। তৈলাক্ত পদার্থের দ্রাবক পেট্রোল এবং বেনজিন উদ্বায়ী পদার্থ। শুষ্কভাবে কাপড় ধুইতে গেলে অনেক পদার্থই বাষ্পীভূত হইয়া বাহির হইয়া যায়। ড্রাই ক্লিনিং পাম্পের সাহায্যে পেট্রোল খরচ বাঁচানো যায়, কাজও বেশ ভাল হয়। ব্যবহার করিবার সময় পাত্রটি পেট্রোল দ্বারা অল্প পূর্ণ করা হয়, এবং ময়লা কাপড়গুলি ইহার মধ্যে ফেলিয়া স্ক্রু আঁটিয়া দেওয়া হয়। হাতলের সাহায্যে সাক্‌সন ওয়াশার বা শোষক যন্ত্র ১৫ হইতে ২০ মিনিট উঠা-নামা করিতে হয়। পোশাকের ময়লার উপরে সময় নির্ভর করে। সর্বশেষে কল খুলিয়া ফিল্‌টার কাগজের ভিতর দিয়া পেট্রোল লওয়া হয়। ডালার স্ক্রু খুলিয়া তারপর পোশাকগুলি তুলিয়া বায়ুতে রাখা হয়। সমগ্র যন্ত্রটি মরিচাবিহীন হওয়া দরকার। কাঠের হাতলই সব চেয়ে সুবিধাজনক।

অনুশীলনী

1. Give an outline of the classification of fibres. (বিভিন্ন প্রকার তন্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

2. What are the characteristics of a silk fibre ? Describe briefly the method you would adopt for washing a silk garment. (রেশম-তন্তুর বৈশিষ্ট্য কি কি ? রেশমী বস্ত্রাদি ধৌত করিতে কি উপায় অবলম্বন করিবে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

3. What peculiarities do you notice in a linen or flax fibre ? How will you wash a dress made of linen ? (লিনেন অথবা ফ্লাক্‌স্‌ তন্তুর কি কি বৈশিষ্ট্য তুমি লক্ষ্য করিয়া থাক ? কি ভাবে তুমি লিনেনের তৈয়ারী পোশাক ধৌত করিবে ?)

4. Name the natural fibres used in the Textile Industry and indicate their sources. How would you distinguish the fibres? (বস্ত্রশিল্পে যে সকল প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহৃত হয় তাহাদের নাম উল্লেখ কর। বিভিন্ন তন্তু কি ভাবে আলাদা করিয়া চিনিতে পারিবে?) (H. S., 1960)

5. State what do you know about woollen fibre. How does it differ from silk? (পশমতন্তু সম্বন্ধে কি জ্ঞান উল্লেখ কর। রেশম হইতে কি ভাবে ইহাকে আলাদা বলিয়া জানিবে?)

6. What are the characteristics of a cotton fibre? On what kind of soil cotton plants grow? What are the elements contained in it? (কার্পাস-তন্তুর বৈশিষ্ট্য কি কি? কার্পাস গাছ কি প্রকার মাটিতে উৎপাদিত হয়? কি কি উপাদান ইহাতে থাকে?)

7. Where does the best quality of cotton grow in the world? What is the position of Indian cotton in comparison with other best qualities of the world? (পৃথিবীর কোথায় অধিকতর গুণসম্পন্ন তুলা উৎপাদিত হয়? পৃথিবীর অন্যান্য অধিক গুণসম্পন্ন তুলার সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতীয় তুলার স্থান কিরূপ?)

8. How is linen-fibre extracted from original plant? Describe any of the processes of extraction of linen fibre from its mother plant. (মূল গাছ হইতে লিনেন বা ক্ষৌম-তন্তু কি ভাবে সংগৃহীত হয়? মূল গাছ হইতে লিনেন কি ভাবে সংগৃহীত হয় তাহার যে কোনও একটি প্রণালী বর্ণনা কর)।

9. What are the artificial fibres? How do they differ

from the natural fibres ? Give the names of some of the artificial fibres. (কৃত্রিম তন্তু বলিতে কি বুঝ ? প্রাকৃতিক তন্তুর সঙ্গে ইহার পার্থক্য কি ? কয়েকটি কৃত্রিম তন্তুর নাম কর।)

10. Why is Dacron preferable to other synthetic fibres in tropical countries ? Give reasons for your answers. (অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু অপেক্ষা ডেক্রনের ব্যবহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাঞ্ছনীয় কেন ? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।)

11. Write short notes on the following :—(a) Dacron, (b) Vinyon, (e) Rayon. [নিম্নলিখিত তন্তুগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—(ক) ডেক্রন, (খ) ভিনিয়ন, (গ) রেয়ন।]

12. How is Nylon prepared ? What precautions will you take in washing a piece of Nylon ? (নাইলন কি ভাবে প্রস্তুত করা হয় ? নাইলনের বস্ত্রাদি ধৌত করিতে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবে ?)

13. Give an account of the mixed fibres. What is its advantage ? (মিশ্র-তন্তু সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ইহার সুবিধা কি ?)

14. Compare the Egyptian cotton with Indian cotton. Why cotton-made clothes are largely used all over the world ? (মিশরীয় তূলার সঙ্গে ভারতীয় তূলার তুলনামূলক আলোচনা কর। তূলার তৈয়ারী পোশাক পৃথিবীর সর্বত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় কেন ?

15. How Nylon is manufactured in industrial scale ? What are special features of a Nylon fibre ? Why ironing is not at all recommended in the case of a Nylon cloth ? (শিল্প-সম্ভার হিসাবে নাইলন কি ভাবে প্রস্তুত

হইয়া থাকে ? নাইলন-তন্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? নাইলন বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে ইস্ত্রি করা একেবারেই নিষিদ্ধ কেন ?)

16. Why is Asbestos called mineral fibre ? What purpose does Asbestos serve in our daily life ? (অ্যাস্‌বেস্টস্‌কে খনিজ তন্তু বলা হয় কেন ? আমাদের জীবনে অ্যাস্‌বেস্টসের উপযোগিতা কি ?)

17. Compare silk rayon in their origin, nature, source and durability. (রেশম ও রেয়নের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং স্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।)

18. How do Woollen fibre, silk fibre and linen look under the microscape ? Give diagrams in each case. (অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পশমতন্তু, রেশমতন্তু এবং লিনেন-তন্তু কিরূপ দেখায় ? চিত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি বুঝাইয়া বল।)

19. What are the different stages inthe life History of a silk moth ? How do Berhampore silk moth differ from other silk moths ? What do you know about the important silk industries of different parts of India ? (রেশম মথের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা কি কি ? বহরমপুর রেশম মথের সঙ্গে অন্যান্য রেশম মথের পার্থক্য কি ? ভারতের বিভিন্ন স্থানের রেশম শিল্প সম্বন্ধে তুমি কি জান ?)

20. Make a list of equipment that is necessary for laundry work. How would you take care of the equipment ? (ধৌতাগারের নিমিত্ত যে সকল সরঞ্জামের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। কি ভাবে তুমি এই সরঞ্জাম রক্ষণা-বেক্ষণ করিবে ?) (H. S. 1960)

21. Describe with sketch where necessary, the arrange-

ments you should like to have in your Laundry room at home. (তোমাদের গৃহের ধৌতাগার কি ভাবে সজ্জিত করিবে তাহা প্রয়োজনমত চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।)

22. How can you perform dry-cleaning at home? Name the instruments and describe briefly the process of its working. (গৃহে বিশুদ্ধ ধোলাই বা ড্রাই ক্লিনিংএর ব্যবস্থা কি ভাবে করিবে? যন্ত্রটির নাম উল্লেখ কর এবং ইহার কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

23. Make a list of articles that you would require for dry cleaning a woollen coat. Describe briefly the method you would adopt for the work. (একটি পশমের কোট বিশুদ্ধ ধৌতকরণের নিমিত্ত কি কি জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। এই কার্যে যে যে উপায় অবলম্বন করিবে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) (H. S. 1961)

আধুনিক গৃহবিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা

সমগ্র নাগরিকসমাজের স্বাস্থ্যের আলোচনা, স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধন এবং নাগরিকদের রোগমুক্ত করাই সমাজস্বাস্থ্যের মূলকথা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনেই সমাজস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভবপর। ব্যষ্টিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কোন্ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য সুন্দর হয়—এই সবই সমাজস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য।

সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থাই (Community Sanitation) সমগ্র সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার ও তাহাকে উন্নত মানে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশে মানুষ আপনার স্বাস্থ্য ও সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত, সমাজস্বাস্থ্যের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন। সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণের দায়িত্ব কর্পোরেশন, মিউনিসি-প্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকে। বিশুদ্ধ জল ও বায়ু লাভের এবং ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষেই প্রয়োজন। তাই এই সব উপাদানকে অর্থাৎ জল এবং বায়ু প্রভৃতিকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অন্যতম দায়িত্ব। আবার রাস্তাঘাট, পার্ক, হাট-বাজার প্রভৃতি স্থান বহু লোকের সমাগমের ফলে অপরিষ্কার হইতেছে, সেইগুলি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের কাজ। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিয়া, ব্লিচিং পাউডার ছড়াইয়া, সব সময় পরিষ্কার ও নির্দোষ করিয়া রাখাই সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রধান কাজ।

সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-কার্য দুইটি ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়—

(ক) আবর্জনা দূর করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার ব্যবস্থা,

(খ) জীবাণুনাশন ব্যবস্থা।

মানুষ রাস্তাঘাট, হাট, বাজার প্রভৃতি জায়গায় যেখানে সেখানে নোংরা ফেলিয়া, কফ, থুথু ইত্যাদি ফেলিয়া নানা রকমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই অব্যবস্থার ফলে খাদ্যবস্তুও অনেক সময় দূষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষ ব্যক্তিগত দায়িত্বে সেই স্থানগুলি পরিষ্কার করিতে চাহে না। তাই সমাজস্বাস্থ্য সংরক্ষণের খাতিরে মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হয়—হাটবাজার পরিষ্কার করিয়া, আবর্জনা সরাইয়া সমস্ত বাজার ধুইয়া ঝকঝকে করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়; রোগজীবাণুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য ব্লিচিং পাউডার ছড়াইয়া দিতে হয়। লোকে রাস্তাঘাটে, পার্কে চীনাবাদামের খোসা, মসলা-মুড়ির ঠোঙ্গা, আরও কত নোংরা জিনিস ফেলে এবং এইভাবে প্রতিদিন রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদি অপরিচ্ছন্ন হয়। কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি তাহা পরিষ্কার করিয়া সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতেছে।

মানুষ আপন আপন গৃহ পরিষ্কার রাখিবার জন্য গৃহ হইতে মলমূত্র এবং অন্যান্য আবর্জনা রাস্তাঘাটে ফেলে। তাহা পরিষ্কার না করিলে শহরের সুন্দর রাস্তাঘাট আর পরিবেশের অবস্থা কেমন

হইত তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতেছ। ধাঙ্গড়দের ধর্মঘটের সময় তোমরা কলিকাতার বুকে সেই ছবি অনেকবার দেখিয়াছ। শহরের ড্রেন, পরিষ্কার এবং প্রত্যেক গৃহের মলমূত্র নিষ্কাশনের কাজ সম্পাদন করিয়াও ঐ সব পৌর প্রতিষ্ঠানকে সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ নীতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়।

যেখানে খাটা পায়খানা এবং ড্রেন উপরিভাগে অবস্থিত সেইখানে ধাঙ্গড়েরা তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। মানুষের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এইভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার ব্যবস্থাকে Service System বলে। ছোটখাট শহরে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত। তবে বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থার প্রচলন খুব বেশী নয়। সেখানে ভূ-গর্ভস্থ নালার সাহায্যে সকল প্রকার তরল দূষিত পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, আর মহল্লা মহল্লা ঘুরিয়া শুষ্ক ময়লা একসঙ্গে জড়ো করিয়া, ময়লা পরিষ্কারের লরীতে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। নাগরিকেরা যাহাতে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে সেইজন্য পল্লীর বিভিন্ন অংশে 'ডাস্টবিন' স্থাপন করা হয়। ইহা স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা বুঝিয়া চলিতে শিখিলে শহর ও পল্লী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। ইহাতে জনস্বাস্থ্য রক্ষাও অনেক সহজ হয়।

প্রতি শহরে পৌর প্রতিষ্ঠান সমূহের অধীনে স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (Sanitary Inspector), টিকাদার (Vaccinator), ধাত্রী (Midwife) প্রভৃতি কর্মচারী থাকেন। তাঁহারা জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন। পৌর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জল, বায়ু, খাদ্য প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে যাহাতে নাগরিকগণ পাইতে পারে তাহার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি সজাগ থাকে। ঘন বসতি যাহাতে শহরের বাড়ীঘরের বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনকে বাধা না দেয় সেইজন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের নিয়ম পালন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হয়।

শহরের ভিতর নোংরা বস্তি ধ্বংস করিয়া স্বাস্থ্যকর গৃহ স্থাপন, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের জন্য হাটবাজার, কসাইখানা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ—এইসব কাজের দায়িত্ব হইল স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের। বাজারে বিক্রয়ের জন্য মজুত দ্রব্য ক্ষতিকর বলিয়া সন্দেহ হইলে তিনি সেই দ্রব্যের বেচাকেনা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উপর তাঁহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আছে। পার্ক ও রাস্তাঘাট পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, বিক্রয়ের জন্য বাজারে নীত খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষা করা প্রভৃতি কাজ-গুলিই তাঁহার প্রধান দায়িত্ব। এইভাবে সমাজস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য-পরিদর্শককে নিযুক্ত করা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজস্বাস্থ্য সংরক্ষণই তাঁহার প্রধান কর্তব্য।

শহর বা গ্রামে একবার সংক্রামক রোগ আরম্ভ হইলে তাহা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিয়া গণস্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে। কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগগুলি এই ধরনের। এই সকল রোগের হাত হইতে সমাজস্বাস্থ্যকে বাঁচাইবার জন্য ব্যাপকভাবে টিকা, ভ্যাকসিন প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভাষায় কৃত্রিম সক্রিয় আরোপিত অনাক্রম্যতা (Artificial Active Acquired Immunity) বলে। রোগবীজকে সুঁচের সাহায্যে সুস্থ দেহে প্রবেশ করাইয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া কৃত্রিম উপায়ে ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। এই সব কৃত্রিম ব্যবস্থাকে টিকা, ইনজেকশন প্রভৃতি বলে। এই উপায়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করিবার প্রচেষ্টাকে ইংরেজীতে ইনোকুলেশন (Inoculation) বলা হয়। টিকাদারগণ

রোগ বিস্তারের সময় হাটবাজার, পল্লী, স্কুলকলেজ প্রভৃতি স্থানে গিয়া জনসাধারণকে টিকা দিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার ফলে যাহাতে জনসাধারণ রোগে আক্রান্ত হইতে না পারে সেই জন্য পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ফলে জনস্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হইতে পারে না।

আবার কোন গৃহে সংক্রামক রোগ হইলেই মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনকে তাহা জানাইতে হয়। সেই খবর পাইয়া বিভাগীয় কর্মচারীরা আসিয়া নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা গৃহ ও পরিবেশকে নির্বীজন করিয়া স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করেন। ইহাকে ইংরেজীতে বলে ডিসিনফেকশন (Disinfection) কার্য; বাংলায় 'নির্বীজন ব্যবস্থা' বলা হয়।

স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার মূলে আছে প্রাত্যহিক জীবনের স্তূপীকৃত তরল ও শুষ্ক আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আহার্য ও ভোগ্যবস্তুকে বিশুদ্ধভাবে পাইবার ব্যবস্থা, আর ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার উপায়। সমাজস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাকেই সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বলা হয়।

আমাদের চলাফেরার দোষে আর অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের জন্য সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা কি ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে তাহাই আলোচনা করা হইতেছে।

শিক্ষার দোষে এমন কতকগুলি কু-অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে আমাদের অজ্ঞাতে সমাজস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অজ্ঞতা ও কু-অভ্যাসের ফলে রোগজীবাণু ছড়াইয়া থাকে।

পথ চলিতে চলিতে অনেকেই যেখানে সেখানে থুথু ফেলিয়া

থাকে। অথচ এই থুথুর ভিতরে কত রোগ জীবাণুই না থাকে! এই অভ্যাসের ফলে রোগজীবাণু বাতাসে ও খাদ্যদ্রব্যে মিশিয়া দ্রুত রোগ বিস্তার করিতে পারে। এইজন্য রাস্তায়, গৃহে ও স্কুল-কলেজে যেখানে সেখানে কখনও থুথু ফেলা উচিত নয়। ক্ষয়কাশ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগ রোগীর হাঁচি, থুথু ও কফের ভিতর দিয়া অপরের সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। জীবাণুগুলি শ্লেষ্মা ও থুথুর সহিত মিশিয়া বাতাসকে দূষিত করে। দূষিত বাতাস শ্বাসকার্যের সময় সুস্থদেহে রোগ বিস্তার করে।

দশজনের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট আছে সেখানে থুথু ফেলা শুধু যে অস্বাস্থ্যকর তাহাই নয়, তাহা অসামাজিক এবং অভদ্র আচরণও বটে। সুতরাং এই অভ্যাসকে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পার্কে, রাস্তায়, সভা-সমিতিতে, হাটবাজারে, সিনেমাগৃহে এবং ভোজনাগারে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবার অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। এই কু-অভ্যাসের ফলে ক্ষয়রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি কঠিন রোগ অপরের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। বহু রাষ্ট্রে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য এবং উপভোগ্য স্থান সমূহে থুথু ফেলিলে আইন অনুসারে দণ্ডভোগ করিতে হয়। দেহের তরল দূষিত আবর্জনার মত থুথুও একশ্রেণীর আবর্জনা। ইহার ভিতর অনেক রোগজীবাণু থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া থুথু পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহাতে কত রকমের রোগজীবাণুই না আছে! থুথুর মত কুলকুচির জলও যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহাতেও রোগজীবাণু ছড়াইবার সুযোগ থাকে।

থুথু ফেলিবার সময় আমাদের যে সকল নিয়ম পালন করা উচিত তাহা বলা হইতেছে।

* ভীড়ের ভিতর কখনও থুথু-কফ ফেলিতে নাই ; এমন কি হাঁচিতেও নাই। হাঁচিবার সময় রুমাল ব্যবহার করা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। রুমালের ভিতর কফ বা হাঁচির শ্লেষ্মা থাকিলে তাহা বাহিরে ছড়াইতে পারে না এবং সুস্থ মানুষের কোন ক্ষতিও করিতে পারে না।

* বাড়ীতে বা দশজনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে থুথু ও কফ ফেলিবার আবশ্যক হইলে একটি নির্দিষ্ট স্থানেই ফেলা উচিত। বেশ কিছু চুন, কিংবা ব্লিচিং পাউডার সমেত একটা কাঠের বাক্স বাড়ীর এক কোণে রাখিবার ব্যবস্থা থাকা ভাল। প্রত্যেক বার ঐ নির্দিষ্ট স্থানে কফ ও থুথু ফেলিবার অভ্যাস করা কর্তব্য। স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য স্থানেও এই নিয়ম পালন করা উচিত। হাটবাজারেও এইরূপ পাত্র বসান থাকিলে সেখানে এই নিয়ম পালন করিয়া থুথু ফেলার অভ্যাস করা ভাল। চুন ও ব্লিচিং পাউডারের নির্বীজন-ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। তাহাতে কফ, থুথু ফেলিলে রোগ ছড়াইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

* রোগীর বেলায় আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ রোগীর কফ ও থুথুতে রোগজীবাণু প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় থাকে। কাজেই কফ-থুথু মুছিবার জন্য রোগীর ব্যবহৃত সকল প্রকার ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা পোড়াইয়া ফেলাই স্বাস্থ্যসম্মত কাজ। আর তাহার কফ, থুথু ইত্যাদি ফিনাইল, আইজল, লাইসল, ক্রিওলিন, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি জীবাণুনাশক দ্রব্যের সহিত জল মিশাইয়া পরিষ্কার করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে আর রোগবিস্তারের বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না।

বাড়ীতেও জানালার ধারে, ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে কিংবা কার্নিসে কখনও থুথু ফেলা উচিত নয়। গৃহে ও বাহিরে থুথু

ফেলিবার সময় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস ও নিয়ম পালন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

রোগ মানুষের প্রধান শত্রু। তাই রোগের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। রোগের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য (১) বিজ্ঞপ্তি (Notification), (২) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), (৩) সঙ্গরোধ (Quarantine or Segregation), (৪) প্রতিষেধন অনাক্রম্যতা (Immunization)—এই কয়টি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

বিজ্ঞপ্তি (Notification)—কোন গৃহে সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করিলে পৌর প্রতিষ্ঠান (Corporation), মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডের হেল্‌থ অফিসারের নিকট জানান উচিত। যাহাতে রোগ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation)—স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা হয়। রোগীর সহিত সুস্থ লোকের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্রীকরণ বলে। রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া বা পৃথক্ ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া, গৃহের অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তির সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার মত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেই তাহাকে পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ বলে। রোগীর আহারের পাত্র, বিছানা-পত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সব পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়। গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে আপন গৃহে পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাহাদের পক্ষে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করাই ভাল।

গৃহে স্বতন্ত্রীকরণ-ব্যবস্থা করিতে গেলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে ঃ—

(ক) রোগীর ঘরটি বাড়ীর অন্যান্য ঘর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। বাড়ীর অন্যান্য ঘর হইতে রোগীর ঘর যত বেশী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিবে ততই ভাল। ঐ ঘরের সহিত স্বতন্ত্র পায়খানা থাকিলে ভাল হয়।

(খ) যে ঘরে রোগীকে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইবে সেই ঘরটিকে একেবারে আসবাবশূন্য করিয়া ফেলিতে হইবে। শুধু রোগীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সেখানে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

(গ) রোগীর ঘরের দরজা সকল সময় বন্ধ রাখিতে হইবে। শুশ্রূষাকারী ভিন্ন ঐ ঘরে আর কাহারও প্রবেশাধিকার না থাকাই ভাল। একটি পর্দা কার্বলিক লোশনে ভিজাইয়া দরজায় ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। তাহার ফলে দূষিত বায়ু রোগজীবাণু লইয়া প্রবেশ করিতে বা বাহির হইতে পারিবে না। রোগীর সহিত সাক্ষাৎকারীরা ঐ ব্যবস্থা দেখিয়া একটু সতর্ক হইবেন, ঘরে সহজে প্রবেশ করিতে চাহিবেন না।

(ঘ) ঘরের জানালা সব সময় প্রসারিত করিয়া মেলিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হইবে। রোগীর কক্ষ দক্ষিণ-মুখী বা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হওয়াই ভাল। ইহাতে বায়ু সঞ্চালনের যেমন সুবিধা হয়, তেমন সূর্যকিরণ পাইতেও কোন অসুবিধা হয় না।

(ঙ) শুশ্রূষাকারী রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হাত-পা, পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস নির্বীজন লোশন দ্বারা বিশোধিত করিবে। স্নান করিয়া তবেই অপর লোকদের সহিত মেশা উচিত।

(চ) রোগীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানার চাদর, অন্যান্য

জিনিস এবং বাসনপত্র নির্বীজন লোশন দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। মলমূত্রাদি ও আহারের উদ্বৃত্ত অংশ লোশনপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া নিরাপদ স্থানে ফেলিয়া দিতে হইবে।

(ছ) রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলে সাবান ও লোশন মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া গৃহের পরিজনদের সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

(জ) মশা, মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ যাহাতে রোগীর ঘর হইতে রোগজীবাণু সুস্থ মানুষের ঘরে ও শরীরে বহন করিতে না পারে সেইজন্য বিশেষ সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝিয়া এবং রোগীর কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া, ঘরে নির্বীজক স্প্রে করিবার ব্যবস্থা করা ভাল। ইহা ভিন্ন মাঝে মাঝে নির্বীজন লোশন দিয়া ঘর মুছিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(ঝ) রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবার পর রোগী যে ঘরে ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বীজন করিবার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য-সচিব অথবা অন্য কোন বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করা উচিত। সাধারণভাবে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া মেঝেতে চুন ও ব্লিচিং পাউডার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জলকে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এক সপ্তাহকাল উত্তীর্ণ হইবার পর মেঝে ভালভাবে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। সারা ঘরে সেই সময় চুনকাম করা দরকার। দরজা, জানালা প্রভৃতি নির্বীজন লোশন দিয়া বার বার মুছিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর কিছুদিনের জন্য ঐ ঘরটি উন্মুক্ত রাখিয়া তারপর উহা ব্যবহার করা উচিত।

সঙ্গরোধ (Quarantine or Segregation)—শুধু মাত্র রোগীকে স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা সংক্রামক রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যায় না। যেই বাড়ীতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেই

বাড়ীর লোকদেরও বাহিরের অন্য লোকদের সঙ্গে মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শে আসার দরুণ সেই সব লোকের ভিতরেও ব্যাধির জীবাণু বর্তমান থাকিতে পারে। সেইজন্য কিছুদিনের জন্য অর্থাৎ রোগের উপ্তিকাল (Incuabation Period) পর্যন্ত সেই গৃহের লোকদের নজরবন্দী বা সংরুদ্ধ রাখাকে অথবা ঐ সময় অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তির সহিত সেই গৃহের লোকদের মিশিতে না দেওয়াকে সঙ্গরোধ বলে। সঙ্গরোধকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) আন্তর্জাতিক সঙ্গরোধ (International Quarantine)—কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত স্থান হইতে কোন ব্যক্তি এক দেশ হইতে অন্য দেশের বন্দরে আসিলে তাহার সঙ্গরোধ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এইজন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে বিমান-বন্দরে বা জাহাজের বন্দরে যাত্রীকে সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হয়।

(খ) বিদ্যালয় সংক্রান্ত সঙ্গরোধ (Scholastic Quarantine)—কোন বালক বা বালিকা সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে যতদিন না সে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে বিদ্যালয়ে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। বালক-বালিকাদের হাম, বসন্ত, হুপিং কাশি প্রভৃতির উপ্তিকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহাদের বাড়ীর ভিতরে আবদ্ধ রাখা উচিত।

(গ) গৃহজাত সঙ্গরোধ (Domestic Quarantine)—বাড়ীতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে বাহিরের লোকজন—ধোপা, নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতিকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। উক্ত বাড়ীর লোকদের অন্য বাড়ীতে বা হাট-বাজারে (যেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয় সেখানে) যাইতে দেওয়াও

বাঞ্ছনীয় নয়। যে বাড়ীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেই বাড়ীর কর্মী লোকদের সরকার হইতে ১৫ দিনের পুরাবেতনে সঙ্গরোধ ছুটি বা Quarantine leave দেওয়া হয়।

প্রতিষেধন অনাক্রম্যতা (Immunization)—স্বাস্থ্য সম্পর্কে নূতন গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগকে প্রতিহত করিবার জন্য মানুষ প্রতিষেধন অনাক্রম্যনের (Immunization) পথ গ্রহণ করিল। রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য উপযুক্ত টিকা ও ইনজেকশনের সাহায্যে প্রতিষেধক গ্রহণ করিয়া রোগের হাত হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করা হইল।

শরীরে অনাক্রম্যতা আরোপ করা হইলে দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে যে অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয় তাহাকে 'সক্রিয় আরোপিত অনাক্রম্যতা' বলে। ইহাকে ইংরেজীতে বলে Active acquired immunity।

"বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয়" বলিয়া একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ আছে। শরীরে অনাক্রম্য শক্তির মূলেও অনেকটা এই পদ্ধতি সক্রিয়ভাবে কাজ করে। যে বীজাণু দিয়া রোগের সৃষ্টি সেই বীজাণুই আবার প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টি করিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে একবার কোন ব্যক্তি কঠিন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে দ্বিতীয় বার সেই ব্যাধি ঐ ব্যক্তিকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। রোগ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির নিরাপত্তার কারণ হইল যে, রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতিষেধক ক্ষমতার সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাভাবিক উপায়ে রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই রোগ-জীবাণুর সাহায্যে শরীরের ভিতর প্রতিষেধক ক্ষমতা সৃষ্টি করাকে স্বাভাবিক সক্রিয় আরোপিত প্রতিষেধক ক্ষমতা বলা হয়। তাই বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ একবার হইলে শীঘ্র দ্বিতীয়বার হয় না।

আবার রোগজীবাণুকে কৃত্রিম উপায়ে ভ্যাকসিনের ভিতর সংগ্রহ করিয়া সুস্থ ব্যক্তির দেহে সূঁচের সাহায্যে টিকা দিয়া অথবা ইনজেকশন দিয়া যে প্রতিষেধক ক্ষমতা গড়িয়া তোলা হয় তাহাকে কৃত্রিম সক্রিয় আরোপিত প্রতিষেধক ক্ষমতা বলে। কলেরা, বসন্ত ও টাইফয়েড্ রোগের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এভাবে রোগ প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিনের সাহায্যে যে ইনজেকশনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাকে 'ইনোকুলেশন' (Inoculation) বলা হয়।

কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য এই ইনোকুলেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

রোগ প্রতিরোধের জন্য মানুষের সতর্কতার অন্ত নাই। যতই মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হইবে ততই নূতন নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি হইবে।

স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা মানুষকে রোগের হাত হইতে বাঁচিবার পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারে নাই বলিয়া রোগ প্রতিরোধের আরও নূতন নূতন গবেষণা হইতেছে।

প্রতিষেধক শক্তি সঞ্চারের দ্বিতীয় একটি পথ আছে। ইহাকে বাংলায় টিকা লইবার ব্যবস্থা এবং ইংরেজীতে ভ্যাকসিনেশন (Vaccination) বলা হয়। সুস্থ ব্যক্তির দেহ সামান্য একটু চিরিয়া ব্যাধি-প্রতিষেধক পদার্থ রক্তের লসিকা রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে প্রতিষেধক ক্ষমতার সৃষ্টি করা হয় তাহাকে টিকা দেওয়া বা ভ্যাকসিনেশন বলা হয়।

কলেরা, টাইফয়েড্, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে মৃত রোগজীবাণু হইতে ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু বসন্তের ও যক্ষ্মার বি. সি. জি. ভ্যাকসিন জীবন্ত জীবাণু হইতে প্রস্তুত

করা হয়। ইনোকুলেশন ও ভ্যাকসিনেশনের ভিতর তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে করা হইল।

ইনোকুলেশন	ভ্যাকসিনেশন
✱ ইনোকুলেশনের ভ্যাকসিন য্যাম্পুলের ভিতর তরল অবস্থায় রক্ষিত থাকে।	✱ ভ্যাকসিনেশনের ভ্যাকসিনও সেই অবস্থায় থাকে। সরু কাচের নলে ইহাকে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়।
✱ ইহার একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা আছে।	✱ অনুমানের উপর কাজ করিতে হয়। কোন ধরাবাঁধা মাত্রা নাই।
✱ ভ্যাকসিনকে ইনজেকশন করিয়া শরীরে প্রবেশ করাইতে হয়।	✱ ছুরিকার দ্বারা সামান্য একটু চিরিয়া রক্তের লসিকার সহিত মিশাইতে হয়।
✱ ইহার ভ্যাকসিন মৃত রোগজীবাণু হইতে প্রস্তুত হয়।	✱ সাধারণতঃ ইহার ভ্যাকসিন জীবন্ত রোগজীবাণু হইতে প্রস্তুত হয়।
✱ প্রতি বৎসর অন্তর লইতে হয়।	✱ বি. সি. জি. বাদে অন্য ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর অন্তর লইতে হয়।

রোগজীবাণু আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে। গৃহপরিবেশ যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হউক না কেন তাহার ভিতরও রোগজীবাণু আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত গৃহপরিবেশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয়। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে রোগজীবাণু অতি সহজেই গৃহপরিবেশে আসিতে পারে।

এই রোগজীবাণু শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশে প্রবেশ করিয়া প্রতিরোধ-শক্তিকে নষ্ট করিয়া শরীর-যন্ত্রকে বিকল করে; তাহার ফলে যে অস্বাভাবিক ও যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয় শরীরের সেই অবস্থাকে ব্যাধি বলা হয়।

রোগজীবাণুগুলি নানা ভাবে আমাদের দেহ আক্রমণ করে। বিভিন্ন রোগের জীবাণু কি ভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

উদরাময় বা পেটের অসুখ (Diarrhoea) :

পেটের অসুখ বলিতে পেটের যাবতীয় রোগকে বুঝাইলেও আমরা এখানে একটি বিশেষ রোগকেই বুঝিব। যখন স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া বার বার তরল পায়খানা হইতে থাকে তখন তাহাকে পেটের অসুখ বলা হয়। ইহাতে পায়খানার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, শরীরে অস্বস্তি বোধ হয়। অনেক সময় পেটে ব্যথাও বোধ হয়, পেট ফাঁপিয়া উঠে। এই অসুখে অতি সহজেই শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কখনও কখনও অপরিষ্কার মল ছিব্‌ড়া সহ বাহির হয়। মলের রঙ যখন চাল-ধোওয়া জলের রঙের মত হয় তখন তাহাকে কঠিন ধরনের পেটের অসুখ বলা হয়।

* পেটের অসুখ প্রধানতঃ বাসি, পচা খাদ্য হইতে শরীরে সংক্রামিত হয়। এই বাসি-পচা খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে এক প্রকার রোগজীবাণু আসে। এই সব জীবাণু হইতে রোগবিষ (Toxins) উৎপন্ন হইয়া খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করে এবং খাদ্যদ্রব্যের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া এই রোগের সৃষ্টি করে।

* মাছি হইতেও এই রোগ অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভ করে। মাছি মল-মূত্র, নালা, ডোবা ও অপরিষ্কার স্থানে বসিয়া পায়ে ও লোমশ দেহে রোগজীবাণু বহন করে এবং খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিয়া

ঐ খাদ্যদ্রব্যকে দূষিত ও বিষাক্ত করে। ঐ সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবার ফলে আমরা সহজেই উদরাময় বা পেটের অসুখ রোগে আক্রান্ত হই।

* পানীয় জল বিশুদ্ধ না থাকিলে এই রোগ সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। দূষিত পানীয় জলের ভিতর নানা প্রকার রোগজীবাণু থাকে। উহা পান করিলে অতি সহজেই উদরাময় রোগের সৃষ্টি হয়।

* গুরুপাক দ্রব্য ভোজন বা অতিভোজন করিতে নাই, অনাবৃত অবস্থায় রক্ষিত খাবার খাইতে নাই।

পেটের অসুখ প্রতিরোধের উপায়—(ক) এই রোগ প্রতিরোধ করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। আমাদের সকল সময় টাটকা ও সদ্য রান্নাকরা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। কখনও বাসি বা পচা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই। বহুক্ষণ আগে কাটা ফলও গ্রহণ করা উচিত নয়। এই সব স্বাস্থ্যকর উপায় অবলম্বন করিয়া আহার করিলে উদরাময় রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) রান্নাঘরের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। খাদ্যদ্রব্য সকল সময় ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বাতাস লাগে তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মীট্‌সেফে রাখাই ভাল। আবার গুরুপাক করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাহাতে বদ্‌হজম হইয়া উদরাময় রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য সহজপাচ্য ও সাধারণভাবে কম মসলা ও তেল দিয়া প্রস্তুত করাই ভাল।

(গ) পানীয় জল বিশুদ্ধ করিয়া পান করিতে হয়। পানীয় জলকে আমরা চারিটি উপায়ে বিশুদ্ধ করিতে পারি। (১) স্ফুটন,

(২) রাসায়নিক উপায়ে শোধন, (৩) ছাঁকন ও (৪) পাতন—এই চারিটি উপায়ে পানীয় জলকে বিশুদ্ধ করা যায়। সেইজন্য জল পান করিবাব পূর্বে এই চারিটির ভিতর যে কোন একটি প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া আমাদের পানীয় জল ব্যবহার করা উচিত।

(ঘ) এই রোগ দূর করিবার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে কোন ভেজাল মিশ্রিত না হয়, হোটেল ও অন্যান্য খাবারের দোকানে খাদ্যদ্রব্যগুলি যাহাতে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে তাহা লক্ষ্য করা উচিত। কাটা ফল, বাসি মাংস ও পচা মাছ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা উচিত।

এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে উদরাময় রোগের হাত হইতে স্বাস্থ্য রক্ষা করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়।

ম্যালেরিয়া ঃ

'ম্যালেরিয়া' নামটির একটি শব্দগত ইতিহাস আছে। ম্যাল (Mal) অর্থ দূষিত আর এরিয়া (aria) কথাটির অর্থ হইল বায়ু। এইভাবে দূষিত বায়ু হইতে ম্যালেরিয়া কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

মশা হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার স্থানে এবং বদ্ধ জলাশয়ে মশা ডিম পাড়ে। এইসব পরিবেশেই মশার বংশ বৃদ্ধি হয় এবং ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করে। মশা একটু সুযোগ পাইলেই আমাদের দংশন করে। মশকীদের দংশনে প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium) নামে এক প্রকার পরজীবী রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। বরাবর এইরূপ দংশনের ফলে এই ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দেয়।

ম্যালেরিয়া বিস্তারের কারণ ও পদ্ধতি—মশকীর দ্বারা এই রোগ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। ম্যালেরিয়া সংক্রমণ দুই ভাবে হইয়া থাকে। মশকীর শরীরের মধ্যে জীবাণুর বংশবৃদ্ধিকে

স্পোরোগনি (Sporogony) বলে এবং মশকীর দংশনের ফলে মনুষ্য-শরীরের মধ্যে যে জীবাণু সংক্রামিত হয় তাহাকে অযৌন বংশবৃদ্ধি বা সিজোগনি (Schizogony) বলে।

স্পোরোগনি—এনোফেলিস জাতীয় মশকী ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করে। ইহারা ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দংশন
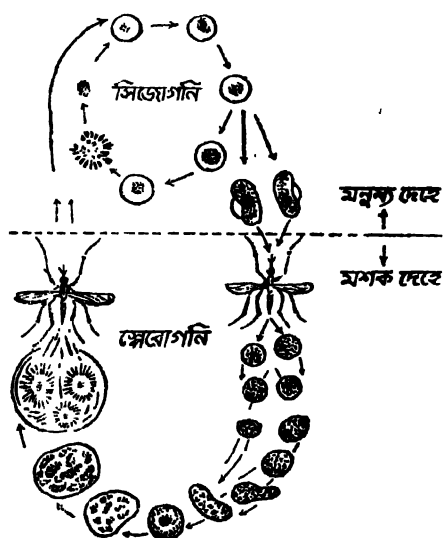
সিজোগনি ও স্পোরোগনি

করিলে রোগীর দেহ হইতে জীবাণু মশকীর পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। স্ত্রী ও পুরুষ রোগ-জীবাণুগুলির মিলনের ফলে মশকীর পাকস্থলীতে উহাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়। উহাদের যখন খুব বংশ বৃদ্ধি পায় তখন শুধু পাকস্থলীতে স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া তাহারা দশ-বার দিন পরে মশকীর লালা-গ্রন্থিতে আশ্রয় লয়। এইভাবে মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া রোগজীবাণুর যে বৃদ্ধি সাধন হয় তাহাকে স্পোরোগনি বলে।

সিজোগনি—ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু-বহনকারী মশকী এই সময় কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করিলে জীবাণুগুলি রক্তের লোহিত কণিকার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরজীবী হিসাবে বাস করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। উহাদের বংশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে লোহিত কণিকা স্ফীত হইয়া ফাটিয়া যায়; তখন জীবাণু বাহির হইয়া রক্তস্রোতে সহজে মিশিয়া পড়ে। ইহার পর দেহ-কোষ হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস নির্গত হয়। ইহাকে সিজোগনি বলে। এই বিষক্রিয়ার ফলে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়।

ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তৃতির কারণ তিনটি: (১) ম্যালেরিয়া-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত মেলামেশা, (২) মশকীর দংশন, এবং (৩) সিজোগনি প্রক্রিয়ার দ্বারা মানবদেহে রোগজীবাণু সংক্রমণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। শুধু এনোফিলিস মশকীর দংশনেই রোগ বৃদ্ধি হয় এমন নয়; ইহা ভিন্ন (ক) উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া, (খ) অপরিমিত ও অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, (গ) মশারী ব্যবহার না করিয়া শয়ন ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া রোগ বৃদ্ধির কারণ।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায়—(ক) অন্ধকার সেঁতসেঁতে স্থানই মশকীর জন্মস্থান। সুতরাং বাসগৃহে যাহাতে সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ সর্বদাই প্রবেশ করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাড়ীর নালা-নর্দমা যেন পরিষ্কার ও কার্যকরী থাকে তাহাও দেখা দরকার। মজা ডোবা বা পুকুরের নিকট এবং সেঁতসেঁতে ভূমিতে বাহগৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। গৃহপরিবেশ স্বাস্থ্যবিধান-অনুযায়ী না হইলে ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তার লাভ করে। সেইজন্য রোগ প্রতিরোধ করিতে হইলে গৃহপরিবেশ **স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন।**

(খ) মশক অভিযান—স্পোরোগনি অবস্থা প্রাপ্ত এঁনোফিলিস মশকীর্ বারংবার দংশন হইতেই এই রোগের সৃষ্টি। কাজেই মশকীকে নির্মূল করিতে পারিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। মশক নির্মূল করিয়া ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণের জন্য লোকালয়ের বাঁশঝাড়, আগাছা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হইবে। কোথাও ঝোপঝাড়, জঙ্গল রাখা উচিত হইবে না। খানা, ডোবা ও নালা ভরাট করিয়া ফেলা প্রয়োজন। জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনেব কর্ম-চারীদের আপন আপন এলাকায় মশা ধ্বংস করিবার জন্য ডোবা, নালা ও খাল-বিল প্রভৃতিতে প্যারিস গ্রীন এবং কেরোসিন ছড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়া নিবারণী সভা গঠন করিয়া তাহাব হাতে এই সকল কাজ সম্পাদন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে ডি. ডি. টি-র দ্বারা লোশন তৈয়ারী করিয়া বন, জঙ্গল ও নালা-নর্দমায় স্প্রে করা হয়। এই লোশনেব কীটপতঙ্গ ও মশা ধ্বংস করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমাদেব দেশে এই ব্যবস্থা অবলম্বন কবিলে ম্যালেরিয়া দূর করা অসাধ্য হইবে না।

ম্যালেরিয়া রোগীকে পৃথক্ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা—ম্যালেবিয়া সংক্রামক রোগ। সংক্রামক বোগেব হাত হইতে বাঁচিতে হইলে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। বাড়ীর অন্যান্য লোকদের সহিত রোগীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা উচিত। ম্যালেরিয়া-রোগী হইতেই এই রোগের প্রসার। ম্যালেরিয়া-রোগীকে মশারীর ভিতর রাখিলে এনোফিলিস মশকী রোগজীবাণু বহন করিয়া তাহা ছড়াইবার সুযোগ পাইবে না।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়—ম্যালেরিয়া রোগীর পক্ষে কুইনাইন বিশেষ কার্যকরী ঔষধ। ইহা রোগীকে দ্রুত নিরাময় করিতে পারে। সিন্‌কোনা নামক এক প্রকার গাছের ছাল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। কুইনাইনকে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিলে প্রতিদিন ৫ গ্রেণ গ্রহণ করিতে হইবে আর নিরাময়ের জন্য প্রত্যহ ১০ গ্রেণ সেবন করা উচিত। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিবার ও নিরাময় করিবার এই দুই ক্ষমতাই কুইনাইনের আছে। ক্ষেত্র বিশেষে কুইনাইন ইনজেকশন বিশেষ ফলপ্রদ হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কুইনাইন গ্রহণ না করাই ভাল। কুইনাইন ছাড়াও নিভাকুইন, ক্যামোকুইন, রিসোচিন, প্যালুড্রিন, প্যাসমোকুইন ও এটেব্রিন বিশেষ কার্যকরী ঔষধ।

ম্যালেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ—ম্যালেরিয়া জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করিলে আমরা সাধারণতঃ তিন প্রকারের রোগ দেখিতে পাইব। (ক) যে জ্বর কম্প দিয়া প্রতিদিন একই সময় আসে সেই ম্যালেরিয়াকে কোটিডিয়ান জ্বর (Quotidian Fever) বলে; (খ) যে জ্বর প্রতিদিন না আসিয়া তিনদিন অন্তর আসে তাহাকে ত্রৈদিবসিক জ্বর (Tertian Fever) বলে; (গ) যে জ্বর ঠিক চারিদিন অন্তর একই সময় আসে সেই জ্বরকে কোয়ার্টান জ্বর (Quartan Fever) বলে।

কম্পন ও জলপিপাসা ম্যালেরিয়া জ্বরের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

বসন্ত ও জলবসন্ত ঃ

বসন্তরোগ অত্যন্ত মারাত্মক ছোঁয়াচে ব্যাধি। এই রোগজীবাণু বাতাসের ভিতর ভাসিতে ভাসিতে চলে। সুতরাং ইহা বায়ুবাহী রোগও বটে। এই রোগে পাঁচটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়ঃ—

(ক) উপ্তিকাল অবস্থা (Stage of Incubation)—এই সময়

রোগজীবাণু শরীরে সংক্রামিত হইয়া ব্যাধি সৃষ্টির পূর্ব প্রস্তুতি সূচনা করে। এই অবস্থা সাধারণতঃ ১০।১২ দিন অবধি থাকে।

(খ) উপক্রম অবস্থা (Stage of Invasion)—উপ্তিকাল অবস্থার দুই-তিন দিন পর উপক্রম অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় রোগের বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় সারা দেহে ব্যথা. মাথাধরা ও কাঁপুনির সৃষ্টি হয়।

(গ) অভিধাবন অবস্থা (Stage of Irruption)—উপক্রম অবস্থা চারিদিন অতিক্রান্ত হইবার পর এই অবস্থার সূচনা হয়। অভিধাবন অবস্থায় রোগ পূর্ণ লক্ষণ লইয়া শরীরে প্রকাশিত হয়। মুখ, ঘাড়, পিঠ প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছোট ছোট গুটি বাহির হয়। গুটিগুলি দেখিতে অনেকটা মসুর ডালের দানার মত। প্রথমে গুটিগুলি ছোট ছোট ও লাল রঙের হয়। এই সময় কাশির ভাবও হয়। চারি-পাঁচ দিন এই অবস্থা থাকে। ছয়দিনের দিন গুটিগুলির একটু পরিবর্তন হইয়া উহারা ফুসকুড়ির মত হয় এবং আবার জ্বর হইতে থাকে।

(ঘ) পরিণত অবস্থা (Stage of Maturation)—আরও আটদিন অতিক্রান্ত হইবার পর ঐ গুটিতে পূজ জমিতে থাকে। এই সময় ব্যথার বিশেষ উপশম হয় না।

(ঙ) শুষ্কীভবন অবস্থা (Stage of Desiccation)—এইবার গুটিগুলি শুষ্ক হইতে হইতে মামড়িতে পরিণত হয় এবং বার দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক সময়। চৌদ্দ দিন পর মামড়ি ঝরিতে আরম্ভ করে। ঐ মামড়ি হইতে রোগ ছড়াইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এই সময় শুধু মামড়িতে নয়, রোগীর নিঃশ্বাস, থুথু, শ্লেষ্মা প্রভৃতিতেও প্রচুর রোগজীবাণু থাকে। এই সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বসন্তরোগ দুই প্রকার—আসল বসন্ত (Small pox) আর (২) জলবসন্ত (Chicken pox)।

আসল বসন্ত আকারে ছোট ; দেখিতে মসুর ডালের কণার মত। কিন্তু জলবসন্ত বড় ; দেখিতে ফোস্‌কার মত। আসল বসন্ত কষ্টদায়ক এবং শরীরে গভীর ক্ষতের মত চিহ্ন সৃষ্টি করে। জলবসন্তে শরীরে দাগ গভীর হয় না ; কিছুদিন পরে দাগ মিলাইয়া যায়।

বসন্তরোগে ঠাণ্ডা জিনিস আহার করা কর্তব্য। নিম ডালের বাতাস বিশেষ উপকারী। রোগীকে ডাক্তারের নির্দেশমত বদ্ধ ঘরে গা মুছাইয়া স্পঞ্জ করিয়া দিতে হয়। ডাব, সরবৎ, ঘোল প্রভৃতি জলীয় পথ্য দিলে রোগীর শরীরের জ্বালার উপশম হয়।

বসন্তরোগ বায়ুবাহী ও সংক্রামক। কাজেই এই সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্বপ্রথম পৃথকীকরণ (Isolation) ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর সহিত গৃহের সুস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রোগীকে একটি স্বতন্ত্র ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করা ভাল।

রোগীর ঘরটিতে সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বাতাস থাকা উচিত। ঘরের দরজায় ক্লোরিনের জলে ভিজান পর্দা টাঙাইবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইহার ফলে ঘরের দূষিত বায়ু কিছুটা বিশুদ্ধ হইয়া বাহিরে যাইবে। তাহাতে রোগ ছড়াইবার ভয় অনেক কমে। রোগীকে সর্বদা মশারীর ভিতরে রাখা ভাল। তাহাতে মাছি ও মশার সাহায্যে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। গুটির চামড়া ঝরিতে আরম্ভ করিলে তাহা যেখানে সেখানে না ফেলিয়া একটি পাত্রে সঞ্চয় করিয়া পরে পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

রোগীর পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত বাসনপত্র, মলমূত্র ইত্যাদি নির্বীজন লোশন দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। কফ, থুথু ইত্যাদি পরিষ্কার

করিবার সময়ও সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা কর্তব্য। প্রয়োজনমত ফিনাইল্‌স জল, ব্লিচিং পাউডার দ্বারা রোগীর ঘর বারংবার মুছিবার ব্যবস্থা করা ভাল।

রোগীকে তিন সপ্তাহ ঘরে আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। আরোগ্য-স্নান করিয়া রোগী সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাকে কাহারও সহিত মিশিতে দেওয়া মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। আবোগ্যস্নান করাইবার সময় নির্বীজন লোশন ব্যবহার করা উচিত। রোগমুক্তির পর রোগীর ঘর ব্লিচিং পাউডাব ও চুন-মিশ্রিত জলে পরিষ্কার করিয়া, দেওয়াল, কড়ি-বর্গা প্রভৃতিতে চুনকাম ও নূতন রঙ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ঘরের মেঝেতে চুন ও ব্লিচিং পাউডার মিশানো জল ঢালিয়া কয়েকদিন সেই জল আবদ্ধ রাখা ভাল। ঘর একেবারে নির্দোষভাব বিশোধিত করিবার পর সেই ঘর ব্যবহার করা উচিত।

ইহা ভিন্ন ঘরের আসবাবপত্র, তক্তপোষ ও বিছানাপত্রও প্রয়োজন মত লোশন দ্বারা বিশোধিত করিতে হয়। বিছানাপত্র পোড়াইয়া ফেলাই ভাল। তাহা না করিলে তোশক, বালিশ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া তূলা সিদ্ধ করিয়া নূতন কাপড়ে আবার সেগুলি তৈয়ারী করাই সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা।

বসন্তরোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতি বৎসর শীতকালে টিকা লওয়া প্রয়োজন। টিকা লইলে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে না। আর রোগ হইলেও মারাত্মক হইতে পারে না।।

হাম (Measles) :

ইহাও বসন্তের মত সংক্রামক ও বায়ুবাহী রোগ। প্রথমে গা ম্যাজম্যাজ করে, সর্দি, কাশি, জ্বর, চোখমুখ জ্বালা ইত্যাদি উপসর্গ

দেখা দেয়। রোগের ইহা প্রাথমিক অবস্থা। পরে ছোট ছোট লাল দানা প্রথমে মুখে, শেষে শরীরের সর্বত্র চাকা চাকা হইয়া বাহির হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও বাড়িতে আরম্ভ করে। ইহা সাধারণতঃ পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদেরই বেশী হয়।

এই রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য রোগীকে স্বতন্ত্র ঘরে রাখা উচিত। এই রোগ বাচ্চা শিশুদের বেশী হয় বলিয়া মাকে সকল সময় তাহার কাছে থাকিতে হয়। রোগী যাহাতে এঘর ওঘর না করে সেইজন্য মায়ের সতর্ক থাকা উচিত।

হাঁচি ও কাশির সময় মুখে ও নাকে রুমাল ঢাকা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ হাঁচি ও কাশির শ্লেষ্মাকণা রোগ বহন করিয়া বায়ুতে মিশিতে পারে। আর ঐ দূষিত বায়ুকে শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিলে অন্য শিশুরও তাহা হইতে পারে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) ঃ

দূষিত বায়ু সেবনের ফলে, বদ্ধঘরে দীর্ঘদিন বাস করিলে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা-গ্রস্ত রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে সাধারণতঃ এই রোগের সৃষ্টি হয়। সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, গা-হাত-পা বেদনা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। নিঃশ্বাস এবং শ্লেষ্মাকণার সহিত এই রোগের জীবাণু থাকায় ইহার সংস্পর্শে প্রশ্বাসের সহিত এই রোগ বিস্তার লাভ করে।

চারি-পাঁচ দিনের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ সমূহ ফুটিয়া উঠে। ইহা দ্বারা শ্বসনতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র সংক্রামিত হয় এবং রোগীর দেহ অত্যন্ত দুর্বল হয়।

নিয়মিত ভাবে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা উচিত। বদ্ধ, অন্ধকার, সেঁতসেঁতে ঘরে কখনও বাস করা উচিত নয়। শয়নঘরে বায়ু সঞ্চালন যাহাতে সুন্দরভাবে হয় তাহা লক্ষ্য করা কর্তব্য। সূর্য-

কিরণ যাহাতে ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে আসিতে পারে সে বিষয় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হাঁচি-কাশির সময় রোগী সর্বদা রুমাল ব্যবহার করিবে। শ্লেষ্মাকণার সহিত এই রোগজীবাণু বায়ুতে মিশিয়া বায়ু দূষিত করিতে এবং রোগ ছড়াইতে পারে।

সকলের সহিত কিছুটা বিচ্ছিন্ন হইয়া রোগীর চলাফেরা ও উঠাবসা করা উচিত।

এনাসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট এই রোগের ঔষধ। ফুটবাথ লইলেও সর্দিকাশির অনেকটা উপশম হয়।

যক্ষ্মা ঃ

যক্ষ্মা অত্যন্ত মারাত্মক বোগ। এই রোগ হইতে মুক্ত হইলেও মানুষের আর কঠিন সংগ্রামী জীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। এখন আমাদের দেশে এই রোগেব প্রকোপ দিন দিন বাড়িতেছে। ইহার পশ্চাতে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে।

অস্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ীতে অবস্থান কবা এবং দিনেব পর দিন অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। যক্ষ্মারোগের কাবণগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রত্যক্ষ কারণ ও সম্ভাব্য কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ—শ্লেষ্মা, কফ, ধুলা ও রোগজীবাণুপূর্ণ গোদুগ্ধ হইতে যক্ষ্মারোগের বীজ আমাদের দেহে সংক্রামিত হয়। আলোহীন, বায়ুহীন বদ্ধ পরিবেশ, কলকারখানার দূষিত বায়ু, সেঁতসেঁতে ঘর এই রোগ বিস্তৃতির কারণ। অতি সহজেই যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হয়। এইরূপ পরিবেশে ফুস্‌ফুসের স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তারপর ক্রমাগত দূষিত বায়ু সেবনের ফলে ফুস্‌ফুসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অপুষ্টিকর ভোজন শরীরের ক্ষয় ঠিকমত পূরণ করিতে পারে না।

খাদ্যে দীর্ঘদিন ভিটামিন ও প্রোটীনের অভাব থাকিলে এই রোগ সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে।

সম্ভাব্য কারণ ঃ—অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ বংশ-পরম্পরায় বিস্তার লাভ করে। মাতাপিতার ভিতর কাহারও এই রোগ থাকিলে তাহা সন্তানদের মধ্যে সংক্রামিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘকাল বদ্ধগৃহ ও ঘন বসতিতে বাস করিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। অসংযমী জীবন যাপন, ঘন ঘন গর্ভধারণ, মুক্ত বায়ুর অভাব ইত্যাদি যক্ষ্মারোগ প্রসারের অন্যতম কারণ।

এই রোগ সাধারণতঃ মানুষ, পশু ও কীটপতঙ্গ হইতে বিস্তার লাভ করে।

যক্ষ্মারোগীর থুথু, কাশি শুকাইয়া ধূলার সহিত মিশ্রিত হয়। সেই ধূলিকণা বায়ুর সহিত মিশিয়া শ্বাসকার্যের সময় সুস্থ লোকের নাসিকাপথ দিয়া রোগজীবাণু সহ ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। যক্ষ্মারোগীর উচ্ছিষ্ট পাত্রে আহার করিলে কিংবা রোগাক্রান্ত মাতৃদুগ্ধ পান করিলেও এই রোগ বিস্তারের আশঙ্কা থাকে। মাছি এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ রোগীর থুথু, কফ ইত্যাদি বহন করিয়া ঐ রোগের বিস্তার সাধন করে।

রোগজীবাণু ক্ষুদ্রান্ত্রকে সংক্রামিত করিলে তাহাকে অন্ত্রের যক্ষ্মা (Intestinal Tuberculosis) বলে। আর যদি ইহা অস্থি ও গ্রন্থিকে সংক্রামিত করে তবে ইহাকে যথাক্রমে অস্থির যক্ষ্মা (Bone Tuberculosis) এবং গ্রন্থির যক্ষ্মা (Glandular Tuberculosis) বলা হয়।

এই রোগ সংক্রামিত হইলে ঘুসঘুসে জ্বর, শক্তিহীনতা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমশঃ শরীরের ওজন কমিতে থাকে।

ফুস্‌ফুস ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কফের প্রাবল্য থাকে এবং উহার সহিত রক্তও বাহির হয়।

যক্ষ্মারোগ নিবারণের উপায়—(ক) অধিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, নৈতিক জীবনের অবনতি ইত্যাদি যক্ষ্মারোগের কারণ। এইগুলি পরিহার করিলে ক্ষয়রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা যায়। মেয়েদের পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণও ক্ষতিজনক।

(খ) বাসগৃহে যাহাতে প্রচুর আলো-বাতাস খেলিতে পারে, শয়নগৃহ যাহাতে খোলামেলা ও বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আদর্শ স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ করে। কারণ যক্ষ্মা-জীবাণু রৌদ্রে ও অক্সিজেন-বহুল বায়ুতে ধ্বংস হয়। পুষ্টিকর ও ক্ষয়পূরক খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, টাটকা ফল প্রভৃতি প্রোটীন ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য দৈনিক গ্রহণ করা উচিত।

(গ) রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিয়া সেবাশুশ্রূষা করা প্রয়োজন। তাহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র নির্বীজন লোশন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। কফ, থুথু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ ফরম্যালিনপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

এক পাত্রে ভোজন, দোকানের আঢাকা খাবার খাওয়া, চায়ের দোকানে বা হোটেলে খাওয়া উচিত নয়।

রোগীর ঘর সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আলো-বাতাসে পূর্ণ থাকা প্রয়োজন। রোগীর ব্যবহৃত কোন জিনিসপত্র কখনও স্পর্শ করা বা ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগী প্রয়োজনমত সূর্যকিরণ এবং মুক্তবায়ু সেবন করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। রোগীকে মুখে রুমাল চাপা দিয়া হাঁচিবার বা কাশিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে নোংরা বস্তি ধ্বংস করিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে গৃহ নির্মাণ করিয়া স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর বণ্টন করা উচিত। ইহার ফলে নির্মল সূর্যকিরণ ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সমস্যা দূর হইবে।

বাসগৃহ, স্কুল, কলেজ, সিনেমা ও থিয়েটার-গৃহে উপযুক্ত বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বালক-বালিকাদের খেলাধূলা করিবার জন্য এবং সকলের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য পার্ক প্রতিষ্ঠা করাও কর্তব্য।

সম্প্রতি যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য বি. সি. জি. টিকার প্রচলন হইয়াছে। ইহা যক্ষ্মা-প্রতিষেধক। ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাঃ আলবার্ট কালমেৎ এবং ডাঃ আলফোস গোয়েরঁা এই টিকার আবিষ্কারক।

বালক-বালিকাদেরই বি. সি. জি. টিকা নেওয়া দরকার। তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া যদি যক্ষ্মরোগের জীবাণু না পাওয়া যায় তবেই বি. সি. জি. টিকা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই টিকা দিবার ফলে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

টাইফয়েড্ঃ

ইহা এক প্রকার জ্বর বিশেষ। এই রোগ টাইফয়েড্-রোগজীবাণু হইতে শরীরে সংক্রামিত হয়। এই জীবাণু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মলমূত্রের ভিতর থাকে। তারপর দূষিত পরিবেশের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হয়। দূষিত নর্দমার এবং পায়খানার গ্যাস, রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য এবং শুশ্রূষাকারীর কু-অভ্যাসকে কেন্দ্র করিয়া এই রোগ সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। প্রথমে অবিরাম জ্বর শুরু হয়। জ্বরের সহিত পেটফাঁপা

ও অন্যান্য উপসর্গ—মাথাধরা, পাতলা পায়খানা, দাঁত ও নাক দিয়া রক্ত পড়া, প্রলাপ বকা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিন সপ্তাহ অতিক্রম করিলে তবেই এই রোগের উপশম হয়।

জ্বরের প্রকৃতি ও রক্তপরীক্ষা করিয়া আগে এই জ্বর টাইফয়েড্ কিনা তাহা সাব্যস্ত করিতে হয়। টাইফয়েড প্রতিষেধ ও শুশ্রূষার জন্য এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়ঃ—

(ক) দুধ ও জল ফুটাইয়া পান করা উচিত। জলকে আরও বিভিন্ন উপায়ে শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করা চলিতে পারে। কোন অবস্থায় বিশুদ্ধ না করিয়া জল পান করা উচিত নয়।

(খ) খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে যাহাতে ধূলি, মাছি বা ঐ ধরনের ক্ষতিকর কিছু না পড়ে সেইজন্য সতর্ক হইতে হইবে।

(গ) রোগ সংক্রমিত হইবার পূর্ব হইতেই টাইফয়েডের প্রতিষেধক ইনজেকশন নেওয়া কর্তব্য।

(ঘ) রোগীর মলমূত্র ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ লোশনে মিশ্রিত করিয়া নির্জন স্থানে ফেলিবার ব্যবস্থা করা ভাল। রোগীর ঘর লোশন-মিশ্রিত জল দিয়া মুছিয়া ফেলা প্রয়োজন।

কলেরা ঃ

কলেরা মারাত্মক রকমের সংক্রামক ব্যাধি। ইহা মহামারীরূপে দেখা দিলে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিয়া ফেলে। জীবাণু হইতে এই রোগ মানবদেহে সংক্রামিত হয়। কলেরা রোগের জীবাণুগুলি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র—অনেকটা ছেদচিহ্ন কমার (,) ন্যায়।

দূষিত দুধ, জল এবং মাছি কলেরা রোগের বাহক। ইহারা খাদ্যের ভিতর দিয়া কলেরার ঐ কমার আকৃতি ব্যাসিলাসকে শরীরে প্রবেশ করায়। রোগ প্রকাশ পাইবার সময় অনবরত চালধোয়া

জলের মত তরল পায়খানা ও বমি হওয়া, হাত-পায়ে খিল ধরা, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, হাতপা ঠাণ্ডা হওয়া, অধিক জল-পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

কলেরা নিবারণের উপায়—কলেরা রোগ প্রতিরোধ করিবার দুইটি পথ আছে। একটি হইল—ব্যক্তিগত প্রতিষেধক উপায় (Personal Prophylaxis), দ্বিতীয়টি হইল—সাধারণ প্রতিষেধক (General Prophylaxis)।

ব্যক্তিগত প্রতিষেধক—(ক) পাকস্থলীকে সর্বদা সুস্থ রাখিতে হইবে। পাকস্থলী খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ রাখিলে পরিপাক জনিত রস বাহির হইতে থাকিবে। এই পরিপাক জনিত অম্লরস কলেরা-জীবাণুর মহাশত্রু।

(খ) খাদ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত। বেশী ঝাল ও তেলে তৈয়ারী গুরুপাক খাদ্য এবং অতিরিক্ত পাকা বা কাঁচা ফল, চিংড়ি মাছ এবং পচিত খাদ্য কখনও গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্রমের লাঘব করিবার জন্য একবেলার রান্না অন্য বেলায় খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। খাদ্যদ্রব্য সযত্নে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রান্নাশেষে খাদ্যদ্রব্য মীটসেফে তুলিয়া রাখা ভাল অভ্যাস। কখনও বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। রেলপথে দূর দেশে যাইতে হইলে গরম খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্যই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। চা, দই, ঘোল, লেবুর জল ইত্যাদি গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। জল সর্বদা বিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে। আইসক্রীম, বরফ-দেওয়া ঘোল কখনই গ্রহণ করা ঠিক নয়।

(গ) কলেরার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত। আফিস অথবা স্কুল-কলেজ হইতে ফিরিয়া হাত, পা ও মুখ সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবে।

কয়েক ফোঁটা ডেটল জলের সহিত মিশাইয়া কুলকুচি করিলে ভাল হয়। বাহিরের কাপড়-জামা ছাড়িয়া তবেই জলযোগ করিতে হয়। নখ কখনও বড় রাখিবে না। জল পান করিবার সময় গ্লাস পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

(ঘ) মহামারীর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্বেই কলেরা প্রতিষেধক টিকা (Anti-Cholera Inoculation) প্রত্যেকেরই লওয়া উচিত।

সাধারণ প্রতিষেধক—কলেরা রোগের সাধারণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা মোটামুটি চারটি—(ক) বিজ্ঞপ্তি করণ, (খ) রোগীকে স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সঙ্গরোধ এবং (ঘ) নির্বীজন করণ। এইসব ব্যবস্থায় কলেরা রোগের সংক্রমণ-সম্ভাবনাকে অনেকখানি প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

অন্যান্য সংক্রামক রোগের মত কলেরা রোগেও একই রূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। কলেরা রোগে বেশীর ভাগ সময়ই প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ইউরেনিয়া রোগে রোগী মারা যায়। স্যালাইন ইনজেকসন দিলে অনেক সময় কলেরা রোগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কলেরারোগীর মল, মূত্র, বমি, বিছানার চাদর ও অন্যান্য জিনিস, আহারের পাত্র ইত্যাদি খুব ভালভাবে বিশোধিত করিতে হয়। মলমূত্র ও বমি একটি কার্বলিক-লোশন-পূর্ণ পাত্রে ধারণ করিয়া জনশূন্য স্থানে মাটির তলে পুঁতিয়া ফেলা উচিত। ঘরবাড়ী ও পায়খানা প্রত্যহ ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল অথবা সাইলিন লোশন দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার (Sanitation) ত্রুটি হইলে মাছির উৎপাত বৃদ্ধি পাইবে। মাছি ঐসব নোংরা দ্রব্য হইতে রোগজীবাণু বহন করিয়া খাদ্যদ্রব্যকে দূষিত করিতে পারে আর সেই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ

করিয়া সুস্থ মানুষের দেহেও রোগ সংক্রমণের সুযোগ থাকে। কাজেই রোগীর ঘর এবং গৃহপরিবেশ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। প্রয়োজনবোধে রোগীর ঘরে মাঝে মাঝে ফ্লিট স্প্রে করা চলিতে পারে।

আমাশয় :

ইহা এক প্রকার অন্ত্ররোগ। পুনঃপুনঃ মল ত্যাগ, মলের সহিত আম ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ, পেটকামড়ান, পেটব্যথা, মলদ্বার চুলকাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ।

সাধারণতঃ আমাশয় দুই প্রকারের—(ক) ব্যাসিলারি আমাশয় ও (খ) এমিবিক আমাশয়। শিগা (shiga) বা ফ্লেক্সনার (Flexner) নামক এক প্রকার রোগজীবাণু হইতে ব্যাসিলারি আমাশয় (Bacillary Dysentery) হয়। ইহা অতি মারাত্মক ও কষ্টকর রোগ। আর যে আমাশয় এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা নামক রোগজীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে এমিবিক আমাশয় (Amoebic Dysentery) বলে।

আমাশয় প্রতিরোধের উপায়—*পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে গৃহ পরিচালনা করিতে পারিলে এই রোগ বিস্তারের সুযোগ পায় না।* ঘরবাড়ী, রান্নাঘর, পায়খানা ও নালা-নর্দমা নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিতে হয়। শুধু রন্ধনশালার পরিবেশ পরিষ্কার হইলেই চলিবে না; রান্না করা দ্রব্যও পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রক্ষা করিতে হইবে। মাছি যাহাতে খাদ্যদ্রব্যে বসিতে না পারে সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য সকল সময় ঢাকিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু বাতাসশূন্য অবস্থায় ঢাকিয়া রাখা উচিত নয়।

রান্নায় অতিরিক্ত তেল, ঝাল ও মসলা ব্যবহার করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। গুরুপাক খাদ্যদ্রব্য না খাওয়াই ভাল। কেননা আন্ত্রিক

ক্ষতে গুরুপাক খাদ্য বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। জল সর্বদা বিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

রোগী যত বার মলমূত্র ত্যাগ করিবে তত বার উহা ফিনাইল এবং ব্লিচিং পাউডার বা অন্য উপযুক্ত লোশন দ্বারা শোধন করিতে হইবে। রোগীর বিছানাপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সাবান দিয়া ভাল ভাবে কাচিবার পর কার্বলিক এসিড্ মিশ্রিত জলে চুবাইয়া উহা বিশোধিত করিতে হয়। কোন পুষ্করিণী বা কূপের নিকট কাপড় কাচিতে নাই।

অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী আমাশয় রোগ দেখা যায়। এই রোগ নিরাময় করিতে হইলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই রোগে এমিটিন ইনজেকশন বিশেষ কার্যকরী হয়।

দাদ (Ring worm)ঃ

দাদ একপ্রকার চর্মরোগ। ছত্রাক (Fungus) জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদের দ্বারাই এই রোগের সৃষ্টি হয়। মানবদেহে বহু প্রকারের দাদ হয়। সাধারণতঃ হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলির মাঝে, জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে দাদ দেখা যায়। অপরিচ্ছন্নতা ও আর্দ্রতার ফলেই দাদ হয়। দাদের ক্ষতটা অনেকটা পাংশু বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ বা খুশ্‌কিতে ভরিয়া যায়। ইহার চুলকানি অতি তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক হয়। চুলকানির পর শরীর হইতে আঠাল রস গড়ায় ও কাপড়ে দাগ পড়িয়া থাকে। স্যালিসিলিক এসিড (Salicylic acid), বেন্‌জোয়িক এসিড (Benzoic acid), জেনশিয়ান ভায়োলেট (Gentian violet), ভায়োফর্ম (Vioform), ক্রাইসোফেনিক (Chrysophanic acid) এই রোগে ব্যবহৃত হয়। ভেসিলীন বা নারকেল তেলের সহিত এই সব ঔষধ মিশাইয়া তামার পয়সার সাহায্যে দাদ চুলকাইয়া ঐ স্থানে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া

যায়। ক্রাইসোফেনিক এসিড সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। তাহা না করিলে কাপড়ে দাগ পড়ে। দুই-তিন দিন ব্যবহার করিলে দাদ সারিয়া যায়। যদি এই সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয় তবে রঞ্জন রশ্মি (X-ray) প্রয়োগে এ রোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

দাদ প্রতিরোধের উপায়—এই রোগে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত শয্যাদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহার না করিলে এ রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। দেহের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সর্বদা সজাগদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পাঁচড়া (Scab) :

শরীর অপরিচ্ছন্ন থাকার দরুণ চর্মরোগ ঘটিয়া থাকে। চর্মের এক প্রকার ক্ষতের নাম পাঁচড়া।

পাঁচড়ার লক্ষণ—এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে দেহে ফুসকুড়ি ও পুঁজের সঞ্চার হয়। ক্ষতস্থানে চুলকানি থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে এই রোগ সর্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই ক্ষত হইতে আঠাল রস গড়ায়। রস, পুঁজ ইত্যাদি শুকাইয়া ক্ষতের উপরে একটি পাতলা চামড়ার ন্যায় আবরণ সৃষ্টি করে। ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেলে ঐ স্থানে নূতন ত্বক জন্মে।

মাকড়সার আকৃতি বিশিষ্ট অষ্টপদযুক্ত সাদা রঙের এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে পাঁচড়া রোগ জন্মে। স্ত্রী-কীট ডিম পাড়িবার উদ্দেশ্যে ত্বকের উপরের স্তর ভেদ করিয়া অতি ক্ষুদ্র গর্তের সৃষ্টি করে ও তাহার ভিতর আশ্রয় লয়। দুই-তিন সপ্তাহ ইহারা এই ভাবে ঐ গর্তে থাকে এবং প্রায় ৩০টি ডিম পাড়ে। তিন-চারি দিন পরে ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় ও আর এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কীটাণুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জীবাণু দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং পাঁচড়া দেখা দেয়।

পাঁচড়ার চিকিৎসা—পাঁচড়ার ক্ষতস্থানগুলি গরম জল ও কার্বলিক (carbolic) সাবানের সাহায্যে ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া গন্ধকযুক্ত (sulphuric) মলম ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। আজকাল বেন্‌জিল বেঞ্জোয়েট নামক রাসায়নিক পদার্থ সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতেছে।

পাঁচড়া প্রতিরোধের উপায়—রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ ও তাহার শয্যাদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি নির্বীজন এই রোগ প্রতিরোধের উপায়। শরীর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার।

কাউর বা বিখাউজ (Eczema)ঃ

কাউর এক প্রকার তীব্র যন্ত্রণাদায়ক চর্মরোগ। ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে সুচিকিৎসার দরকার। দেহে একবার এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সহজে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এই রোগে গন্ধকযুক্ত ঔষধ (sulphur drugs) বিশেষ উপকারী। বিখাউজের চুলকানো হইতে আঠাল রস নির্গত হয়।

রক্তের দূষিত পদার্থ ঘর্মের সাহায্যে বা অন্যান্য গ্রন্থি হইতে ত্বকের ভিতর দিয়া নির্গত হয়। ত্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকিলে খোস-পাঁচড়া, ব্রণ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যদি দেহের লোমকূপগুলি এক কালীন বন্ধ হইয়া যায় এবং দেহের দূষিত পদার্থগুলি ইহাদের ভিতর দিয়া বাহির হইবার সুযোগ না পায় তবেই এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেক দিন নির্মল জলে স্নান করা অত্যাবশ্যক। ত্বকে প্রচুর শোণিত চালনের জন্য ও ইহার স্থিতি-স্থাপকতা বজায় রাখিবার জন্য নির্মল মুক্ত বায়ু, সূর্যকিরণ সেবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনার বিশেষ প্রয়োজন। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, শাকসব্‌জী ও দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়া উচিত।

গৃহ-শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজনীয়তা

পারিবারিক জীবনে কয়েকটি সাধারণ রোগে বাড়ীর লোকই রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। কাজেই পরিবারের লোকদের রোগীর সেবা-যত্নের নিয়ম-কানুনগুলি ঠিকমত জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ মাতা বা গৃহকর্ত্রীর অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ তাঁহাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাহা ছাড়া অসুস্থ অবস্থায় সন্তান মাকেই কাছে পাইতে চায়। বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও মাকে এই বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। রোগীর সাধারণ সেবা-শুশ্রূষা করা, রোগীর একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা মাকে সাহায্য করিলে অনেক সুবিধা হয়। আবার মা নিজে অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্বও বয়স্ক ছেলেমেয়ের বা বাড়ীর অন্যান্য লোকদের গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং পরিবারের প্রত্যেকেরই রোগের সাধারণ লক্ষণ ও তাহার সেবা-শুশ্রূষার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গৃহ-শুশ্রূষাকারিণী এই সব কাজ করিয়া ডাক্তার ও রোগীর অনেক উপকার করিয়া থাকেন।

শুশ্রূষাকারিণীর আবশ্যকীয় গুণাবলী ও দায়িত্ব—রোগীর পরিচর্যার জন্য শুশ্রূষাকারিণীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া অনেক সময় রোগীর মন ও মেজাজ বিগড়াইয়া যায়। সেই অবস্থায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইজন্য শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে স্বাভাবিক মায়া-মমতা, প্রফুল্লতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মেয়ের শুশ্রূষা করিবার স্বভাবজাত ক্ষমতা থাকে, কিন্তু যে কোন মেয়ে কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হইলে শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের গুণে নিপুণা শুশ্রূষাকারিণী হিসাবে

পরিগণিত হইতে পারে। এই কয়টি গুণ শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে অপরিহার্য :

(১) রুগ্ণ ও আর্তের সেবার জন্য স্বাভাবিক দরদ,

(২) উত্তম স্বাস্থ্য,

(৩) প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ মনোভাব।

আদর্শ শুশ্রূষাকারিণীকে সময়নিষ্ঠ, প্রফুল্লচিত্ত, কর্মোৎসাহী, অনুগত ও একনিষ্ঠ হইতে হইবে। তাহাকে শান্ত স্বভাব, বিচক্ষণতা, বিশ্বস্ততা ও সহানুভূতি প্রভৃতি গুণ অর্জন করিতে হইবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও তাহার ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পর্যবেক্ষণ, বুদ্ধিমত্তা, মিতব্যয়িতা, সংযম, অধ্যবসায় ও উত্তম সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাহাকে অবহিত হইতে হইবে। রোগীর রুক্ষ ব্যবহার, দেহের ও মনের বিরক্তিকর অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সহজ ভাবে হাসি-গল্পের ভিতর দিয়া রোগীর মনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহা ছাড়া শুশ্রূষাকারিণীকে রোগীর আত্মীয়স্বজনের প্রতি শিষ্টাচারসম্পন্ন হইতে হইবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হইবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। রোগীর বিশ্রাম ও শান্তি-সুখের প্রতিও সতর্কদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

শুশ্রূষাকারিণীর পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ আঁটসাট ও বাহুল্যবর্জিত হওয়া দরকার ; কারণ পোশাক-পরিচ্ছদ এলোমেলো হইলে রোগীর পরিচর্যার সময় সেগুলি এদিক ওদিক পড়িয়া অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। অলঙ্কারের প্রাচুর্য, প্রসাধনের আতিশয্য শুশ্রূষা-কারিণীর পক্ষে নিতান্ত গর্হিত, কারণ অলঙ্কার রোগীর দেহে লাগিলে আঘাত পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং প্রসাধনের গন্ধ রোগীর বিরক্তির কারণও হইতে পারে।

শুশ্রূষাকারিণী সব সময় মনে রাখিবে যে, নিঃস্বার্থ মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাহাকে সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। স্বার্থপরতা, লঘু আমোদ-প্রমোদ যেন কোন অবস্থাতেই তাহার সেবার আদর্শকে ম্লান করিতে না পারে। শুশ্রূষাকারিণীর কি কি গুণ থাকা দরকার সেই বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে সময়নিষ্ঠা, প্রফুল্লচিত্ততা, আনুগত্য, একনিষ্ঠতা, সহানুভূতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি গুণ থাকা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

সময়ানুবর্তিতা—শুশ্রূষাকারিণীর যদি সময়ের মূল্যের জ্ঞান না থাকে তবে অনেক সময় রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে পারে। সময়মত ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করিলে রোগীর অবস্থা যে কোন সময় সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহা হইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরাও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

খুশি মেজাজ ও প্রফুল্লতা—শুশ্রূষাকারিণীর সবচেয়ে প্রধান কর্তব্য সর্বাবস্থায় নিজেকে খুশি ও প্রফুল্ল রাখা। অসুস্থতার জন্য রোগী অল্পেতেই রাগিয়া যায়। এইজন্য ধৈর্য ও নিপুণতার সহিত দেখিতে হইবে যাহাতে তাহার শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায়। রোগীর প্রতি মৌখিক ও ব্যবহারিক সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া কোন অবস্থাতেই তাহাকে অসুখ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। শুশ্রূষাকারিণী যদি রোগীর তালে তালে তাহার সঙ্গে অযথা করুণ বাক্যালাপ করে বা অশ্রুবর্ষণ করে তবে তাহার পক্ষে শুশ্রূষার ভার গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

আনুগত্য—নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্য শুশ্রূষাকারিণীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চিকিৎসক বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ সবসময় মানিয়া চলা দরকার। শুশ্রূষাকারিণীর ভুল-ত্রুটির দরুণ অনেক সময় রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

শুশ্রূষাকারিণীর কাজ—শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে এবং শৃঙ্খলামৃত সম্পাদন করিতে হইলে তাহার কর্তব্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) শুশ্রূষাকারিণীর নিজের প্রতি, (২) রোগীর প্রতি, (৩) চিকিৎসকের প্রতি, (৪) রোগীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, (৫) রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি।

শুশ্রূষাকারিণীর *নিজের প্রতি কর্তব্য*—শুশ্রূষাকারিণীকে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সেবাকার্য সম্পন্ন করিতে হয়। এইজন্য শুধু রোগীর নয়, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও শুশ্রূষাকারিণীর বেশ ভাল জ্ঞান সঞ্চয় করা আবশ্যক। অতিরিক্ত পরিশ্রম করার দরুণ শুশ্রূষাকারিণীর সুনিদ্রা ও বিশ্রাম দরকার। দৈনিক অন্ততঃ ৭ ঘণ্টা সুনিদ্রা শুশ্রূষাকারিণীর একান্ত আবশ্যক। সব ঋতুতেই শয়নকক্ষের জানালা খুলিয়া ঘুমানো দরকার। নিদ্রাই ক্লান্ত স্নায়ুগুলির অবসাদ দূর করিয়া নূতন কর্মশক্তির সঞ্চার করে। নিয়মিত আহার গ্রহণ করা শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে একান্ত দরকার। কোন অবস্থাতেই যেন আহারের সময় বিলম্বিত হইয়া তাহার কর্তব্য কর্মে বাধা সৃষ্টি না করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিবার জন্য তাহার প্রচুর পরিমাণে ফল ও শাকসব্জী গ্রহণ করা উচিত। কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইতে অনেক সময় নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ দেখা দেয় যাহা রোগীর বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে।

নিয়মিত স্নান ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন দ্বারা দেহ ও চর্মের পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতার প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিশেষ করিয়া আধুনিক শল্য চিকিৎসায় (Surgery) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। শুশ্রূষাকারিণীর হাত সব সময় পরিষ্কার থাকা উচিত। নখ যেন খুব বেশী বড় না

হয়। তাহার হাত যেন কোন অবস্থাতেই রুক্ষ, চামড়া-ওঠা, ক্ষত-বিক্ষত না হয়। সর্বদা জীবাণু-নাশক লোশন (Antiseptic lotion) ব্যবহার করার ফলে তাহার হাত রুক্ষ ও ক্ষতযুক্ত হইতে পারে। ইহা নিবারণের জন্য সব সময় সম পরিমাণে গ্লিসারিন ও রেড লোশন (Red lotion) ব্যবহার করা উচিত। অলিভ্ অয়েল, হেজেলিন (Hazeline) অথবা কোল্ড ক্রীম (Cold cream) অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রদ। শুশ্রূষাকারিণীকে সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার অসাবধানতার ফলে যেন রোগজীবাণু না ছড়ায় ও তাহার স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য যেন রোগীর যত্নের ত্রুটি না হয়।

রোগীর প্রতি কর্তব্য—হাসিমুখ ও খুশিভাব দ্বারা রোগীর চিত্তকে জয় করাই হইবে শুশ্রূষাকারিণীর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। রোগীর সহযোগিতা ব্যতীত রোগের উপশম করা সম্ভব নয়। শুশ্রূষাকারিণীর আন্তরিকতা ও কর্মনৈপুণ্য রোগী বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। শুশ্রূষাকারিণীর নিপুণ হাতের সেবা-যত্ন রোগীকে তৃপ্তি ও শান্তি দেয়। জুতার উঁচু হিলের খট্‌খট্ শব্দ, জোরে দরজা-জানালা বন্ধ করার শব্দ, বাসনপত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ রোগীর মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। রোগীর ঘরে কাহারও সঙ্গে কথা বলিবার সময় একেবারে ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা বলিলে রোগীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। আবশ্যক হইলে শান্ত নিম্নস্বরে কথা বলাই বাঞ্ছনীয়। অনিচ্ছুক রোগীকে পথ্য বা ঔষধ দেওয়ার সময় অনর্থক তর্কবিতর্ক করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করা উচিত নয়। সবসময় তোষণ-নীতি ও মিষ্টালাপের দ্বারা রোগীকে বুঝাইয়া ঔষধ ও পথ্য খাওয়ানো দরকার। তবে ঔষধ খাওয়ার সময় যদি রোগী খাইতে না চায় তবে যথেষ্ট দৃঢ় মনোভাব দেখাইতে হইবে। শুশ্রূষাকারিণীকে

সব সময়ই শান্ত ও দৃঢ়-মনোভাব-সম্পন্ন হইতে হইবে। যদি তাহার মুখে বা ব্যবহারে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায় তবে শুশ্রূষাকারিণীর সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

রোগীকে রুটীন অনুযায়ী সমস্ত কর্মে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। নিয়মিত স্নান, খাওয়ান প্রভৃতি রোগীর সমস্ত কাজই এই ধরাবাঁধা রুটীনের মধ্যে থাকিবে। রুটীন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অন্ততঃ কিছুটা সময় যেন রোগী একলা থাকার অবকাশ পায়। অনেক সময় অতিরিক্ত সতর্কতা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীর কাছে পাহারা থাকার ফলে রোগীর মন বিরূপ হইয়া উঠে। এজন্য রোগীর পূর্ণবিশ্রামদানের জন্য মাঝে মাঝে তাহাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য—চিকিৎসকের কাজের সুব্যবস্থার জন্য শুশ্রূষাকারিণীর দায়িত্বও নেহাৎ কম নয়। সাধারণতঃ চিকিৎসক দিনে একবার কি দুইবার অল্প সময়ের জন্য রোগীর বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। শুশ্রূষাকারিণী প্রায় সবসময়ে রোগীর কাজে ব্যাপৃত থাকে। রোগীর সম্বন্ধে যাবতীয় আবশ্যক তথ্য শুশ্রূষাকারিণীই চিকিৎসককে জানায়। নাড়ী পরীক্ষা, নিয়মিত সময় (দুই কি চারি ঘণ্টা অন্তর) থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বরের তাপ-মাত্রা নিরীক্ষণ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি (Rate of respiration), মল, মূত্র, বমন প্রভৃতির বার ও পরিমাণ চার্টের ভিতর লিখিয়া রাখা শুশ্রূষাকারিণীর কাজ। ছক কাগজে (Graph paper) নীচ হইতে উপরে তাপ-মাত্রা ও বাম হইতে ডান দিকে সময় ও দিনমানের উল্লেখ করিয়া লেখচিত্র (Graph) অঙ্কন করিলে চিকিৎসক সহজেই রোগ নির্ণয় (diagnosis) করিতে পারেন।

রোগীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য—রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা অনেক সময় রোগীর অবস্থা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। রোগীর অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহারা শুশ্রূষাকারিণীর উপরই নির্ভর করেন। রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাহার আত্মীয়-স্বজনকে না জানানো যেরূপ অনুচিত, আবার সহসা তাঁহাদের ভীতি উৎপাদন করিয়া সব কিছু অকপটে বলাও বাঞ্ছনীয় নয়। এই ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারিণীকে বাকসংযম ও কৌশলের সহিত আত্মীয়-স্বজনকে রোগীর অবস্থা জানাইতে হইবে।

রোগীর পারিপার্শ্বিকের প্রতি কর্তব্য—পারিপার্শ্বিক বলিতে বুঝায় রোগীর কক্ষ, তাহার শয্যা ও ব্যবহৃত দ্রব্য। রোগীর কক্ষে যাহাতে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ ও নির্মল বায়ু প্রবেশ করে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। রোগীর বিছানাপত্র যেন জীবাণুমুক্ত, শুষ্ক, ঝরঝরে ও স্বাস্থ্যসম্মত হয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রোগীর কক্ষ

রোগীর আরাম ও শুশ্রূষার সুবিধার জন্য একটি পৃথক্ কক্ষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাহাতে নির্মল বায়ু ও সূর্যকিরণ রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে সেই দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে। দক্ষিণমুখী কক্ষ ভাল; তবে ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, পড়ন্ত রৌদ্রের তপ্ত আলো এই দিক দিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করে। সেইজন্য রোগী কিছু পড়িতে চাহিলে বা ঘুমাইতে চাহিলে জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এজন্য দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী বা দক্ষিণ-পূর্বমুখী কক্ষই রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

রোগীর কক্ষ বাড়ীর কোলাহল হইতে দূরে থাকা দরকার। ইহা যেন অশ্বশালা, গোশালা, আবর্জনাস্তূপ বা কোলাহলপূর্ণ রাজপথ

হইতে দূরে থাকে। বহুতল বাড়ীর সবচেয়ে উপরের তলার কক্ষই রোগীর জন্য রাখা উচিত। বিশেষ করিয়া সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া আর কোন উপায় নাই। রোগীর কক্ষের সন্নিকটে যেন জল সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা থাকে।
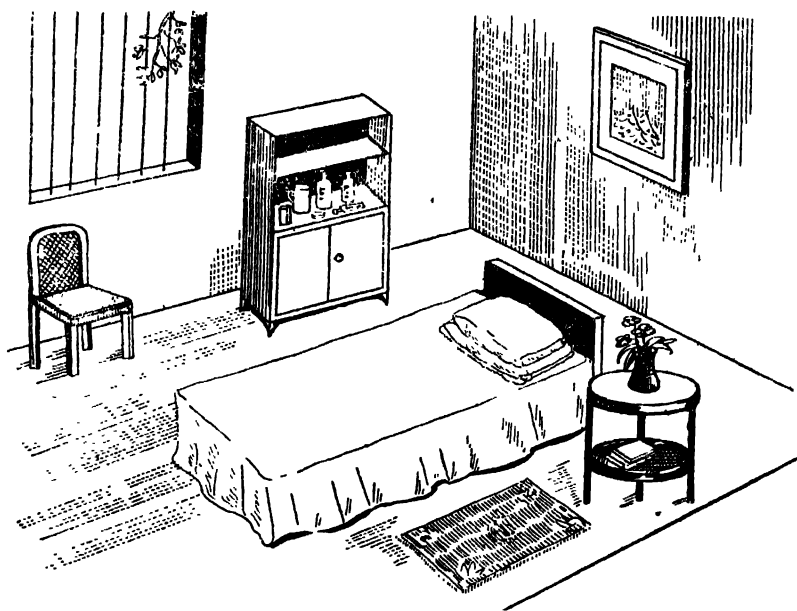
রোগীর কক্ষ

ইহার মলমূত্রাদি অপসারণের ব্যবস্থা থাকাও দরকার। অনাবশ্যক আসবাবপত্র, গালিচা বা ঝুলানো জিনিসপত্র যেন না থাকে, কারণ ইহারা অযথা বায়ুস্থান দখল করে, ধূলি আটকায় ও কাজকর্মের ব্যাঘাত জন্মায়। যাহাতে যথেষ্ট বায়ুস্থান (air space) পাওয়া যায় এইরূপ কক্ষই রোগীর পক্ষে প্রয়োজন। প্রত্যেক রোগীর কক্ষে ১০০০ ঘনফুট বায়ুস্থান থাকা চাই; অর্থাৎ প্রত্যেক রোগীর ঘর অন্ততঃ ১০ ফুট দীর্ঘ, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ হওয়া দরকার।

বায়ু চলাচলের জন্য দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে : (১) কক্ষের আকার এবং ইহার ভিতরে কয়জন লোক বাস করে ; (২) প্রতি ঘণ্টায় কতটা বায়ু ইহার ভিতর দিয়া আসা-যাওয়া করে।

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বায়ু উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং ঠাণ্ডা হইয়া সংকুচিত হয় ও নীচের দিকে নামিয়া পড়ে। কক্ষের বায়ু আগমনের দ্বারগুলি বায়ু নির্গমনের দ্বার অপেক্ষা প্রশস্ত হওয়া ভাল। রোগীর বিছানা খাটের উপর হওয়াই দরকার। যদি বাধ্য হইয়া রোগীকে মেঝেতে শুইতে হয় তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে দরজার নীচ দিয়া হাওয়া আসিয়া যেন তাহার পায়ে ঠাণ্ডা না লাগে ; কারণ ঠাণ্ডা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

রোগীর কক্ষের আসবাবপত্রাদির ব্যবস্থা—রোগীর খাট বেশী বড় হইবে না। রোগীর মাথা দেওয়াল হইতে কয়েক ফুট দূরে হওয়া দরকার। কোন অবস্থাতেই বাহিরের আলো তাহার চোখকে পীড়িত না করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে দীর্ঘদিন রোগে (chronic disease) আক্রান্ত রোগী—যাহার বাহিরের উন্মুক্ত প্রকৃতি ও বায়ুর সঙ্গে কোন সংস্পর্শ নাই তাহাকে আনন্দ দান করিবার জন্য জানালার ধারে বিছানা করা বাঞ্ছনীয়। রোগীর আচ্ছাদন প্রয়োজন অনুযায়ী একাধারে গরম ও হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন ; বেশ ভারী ও পুরু আবরণ হইলে রোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকার্যে কষ্ট হয়। ইহা ছাড়া খাটের অনুপাতে তোশক হওয়া প্রয়োজন ও তাহার ওয়াড় থাকা দরকার যাহাতে প্রয়োজনমত খুলিয়া উহা আবার ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় রুগ্‌ণ ব্যক্তি বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিস (যেমন—বই, কাগজপত্র, জামা-কাপড় ইত্যাদি) বিছানার নীচে রাখে। এই অভ্যাসের ফলে ব্যাধির জীবাণু সহজে ছড়াইতে পারে। রোগীর

ঘর সর্বদাই বাহুল্যবর্জিত হওয়া দরকার। তবে কক্ষটি একেবারে খালি না করিয়া চিত্তবিনোদনের জন্য পুষ্পবিন্যাস করিলে রোগীর মনে প্রফুল্লতা আসে। রাত্রিকালে পুষ্পসমূহ অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করিয়া ঘরকে দূষিত করিয়া ফেলিতে পারে, এজন্য রাত্রিবেলা ফুল সরাইয়া ফেলা উচিত। রোগীর ব্যবহারের জন্য ঢাক্‌নাযুক্ত পিকদান, মুখ ধুইবার গামলা, ইউরিন্যাল (urinal), মলত্যাগ করিবার জন্য বেড প্যান (bed pan),

ইউরিন্যাল
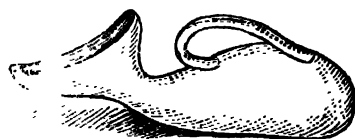
ইউরিন্যাল (মেয়েদের)

গামছা, রুমাল প্রভৃতি স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব মল পরিষ্কার করিয়া রোগীর কক্ষেই রাখা যুক্তিযুক্ত।

একটি ছোট টেবিলে রোগীর ঔষধপত্র ও ঔষধপত্র মাপিবার গ্লাস (Measuring glass), খাওয়াইবার গ্লাস, থার্মোমিটার, সাবান, জীবাণুনাশক লোশন (antiseptic lotion), পাউডার, চিরুনি প্রভৃতি টয়লেটের দ্রব্যও রাখা দরকার। আর রোগ যদি সংক্রামক না হয় তাহা হইলে রোগীর ব্যবহৃত থালা-বাসনও তাহার উপর রাখা চলিতে পারে। রোগীর গরমজলের ব্যাগ (Hot water bag), আইস্ ব্যাগ (Ice bag) ঝুলাইয়া রাখা উচিত। রোগীর পিপাসা নিবারণের জন্য কুঁজোর ভিতর ঠাণ্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা উচিত, কুঁজোর উপর যেন সব সময় ঢাক্‌না থাকে।
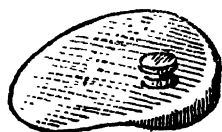
আইস্ ব্যাগ

শুশ্রূষাকারিণীকে রোগীর অবস্থানুযায়ী চার্ট করিয়া, রিপোর্ট করিতে হয়। এইজন্য আর একটি ছোট টেবিলে একখানা খাতা, দোয়াত, কলম ও সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত একটি ঘড়িরও ব্যবস্থা রাখা উচিত।

রোগীকক্ষের পরিচ্ছন্নতা—রোগীর কক্ষের পরিচ্ছন্নতা সাধন শুশ্রূষার মূল নীতি। ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের সাহায্যে রোগীর কক্ষ পরিষ্কার করা যাইতে পারে। যদি উহা সংগ্রহ করা অসম্ভব হয় তবে কক্ষের মেঝেয় চায়ের পাতা বা করাতের গুঁড়া বিছাইয়া দিলে ইহাদের ভিতর ধূলি ও ময়লা আট্‌কাইয়া যায় বলিয়া বায়ুর সাহায্যে উড়িতে পারে না। এজন্য রোগও ছড়াইতে পারে না। কোনও জীবাণু-নাশক দ্রবণের (Antiseptie lotion) সাহায্যে মেঝে মুছিয়া নির্বীজন করা যাইতে পারে। কক্ষের আসবাবপত্রে যাহাতে ধূলা না জমিতে পারে সেই জন্য ঝাড়ু দিয়া সেইগুলি সর্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে।

রোগীর স্নান ঃ

রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে যাহাতে ময়লা জমিয়া না যায় সেই জন্য রোগীকে স্নান করাইতে হইবে। গরম জল ও সাবান ব্যবহার করিলে রোগীর গায়ের ময়লা উঠিয়া যায় এবং রোগীর দেহচর্ম অক্ষত থাকে। স্নানের পরে শুক্‌না গামছা বা তোয়ালের সাহায্যে রোগীর গা অতি সন্তর্পণে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। গরম জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহা আবার বদলাইয়া লওয়া আবশ্যক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীর স্নান শেষ হওয়া দরকার যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া রোগীর গায়ে না লাগে।

গরম জলে গামছা বা তোয়ালে ডুবাইয়া পরে তাহা নিংড়াইয়া গা মুছাইয়া দেওয়াকে স্পঞ্জ করা বলে। স্পঞ্জ করার সময় ঘরের

দরজা-জানালা বেশ ভালভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। নতুবা রোগীর ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে। যে সকল রোগীকে স্নান করান যায় না তাহাদের এইভাবে স্পঞ্জ করাই সঙ্গত।

উত্থানশক্তিরহিত রোগীকে স্নান করাইতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। একখানি লম্বা অয়েল ক্লথ, স্নান করাইবার জন্য পুরানো কম্বল, গা মুছাইবার জন্য তোয়ালে, ছোট গামছা, সাবান, হাত ধোয়াইবার গামলা, গরম জলের পাত্র, পাউডার, চুলের ব্রাশ, চিরুনি ইত্যাদি পূর্ব হইতেই হাতের কাছে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। স্নান আরম্ভ করিবার পূর্বে রোগীর গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। রোগীকে একটি পুরানো কম্বল দিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হইবে। ইহার পর রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করাইয়া অয়েল ক্লথখানি পাতিয়া উহার উপর দ্বিতীয় কম্বলখানি বিছাইতে হইবে যাহাতে স্নানের জলে রোগীর বিছানাপত্র নষ্ট না হয়। এইবার রোগীর জামা-কাপড় খুলিতে হইবে। প্রথমে একটি হাত খুলিয়া জামাটি মাথা দিয়া গলাইয়া খুলিতে হইবে। যদি রোগীর কোন হাতে ব্যথা থাকে তবে সেই হাতটি শেষে খোলাই ভাল ; কিন্তু জামা পরাইবার সময় ব্যথাযুক্ত হাতখানিতেই আগে জামা পরাইতে হইবে।

রোগীকে স্নান করাইতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই তাহার মুখখানি মুছাইয়া দিতে হইবে। গলা ও কানের দুইপাশ গরম জল ও সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া দিবে। তারপর শুক্‌না তোয়ালের সাহায্যে মুখের ও কানের দুইপাশের জল ধীরে ধীরে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কানের ভিতরে জল ঢুকিলে কান পাকিবার সম্ভাবনা, কাজেই কানের ভিতরে যাহাতে জল ঢুকিতে

না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হইবে। গামলার মধ্যে সাবানজল লইয়া রোগীর কনুই হইতে আরম্ভ করিয়া হাত দুইখানি বেশ ভাল করিয়া ধোয়াইয়া শুক্‌না গামছার সাহায্যে মোছাইয়া দেওয়া দরকার।

তারপর পেট ও বুকের অংশ পরিষ্কার করিতে হইবে। সব সময় গায়ের কম্বলখানি একেবারে না তুলিয়া বাম হাতে কম্বলখানি আল্‌গা করিয়া ধরিয়া ডান হাতে গা মোছাইরা দিতে হইবে। হাতের তলা ও দেহের বিভিন্ন ভাঁজগুলি অত্যন্ত কোমল বলিয়া সেগুলি খুব সাবধানে পরিষ্কার করিতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই চামড়া উঠিয়া যাইতে পারে।

তলপেটের নিম্নদেশ পরিষ্কার করিবার সময় জলে দুই-এক ফোঁটা ডেটল বা অ্যামোনিয়া দ্রবণ হাল্‌কা পরিমাণে মিশাইয়া একখানি স্বতন্ত্র তোয়ালে দ্বারা মোছাইয়া দিতে হইবে। ঐসব অংশ কোমল বলিয়া সহজেই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

এইবার জল বদলাইয়া নূতন গরমজলে হাতের মত করিয়াই পা দুইখানি ধোওয়াইয়া দিতে হইবে। রোগী অত্যন্ত অস্থির অথবা অচেতন থাকিলে গামলায় পা রাখা সঙ্গত নয়।

শরীরের সামনের দিক এই ভাবে পরিষ্কার করিবার পর পিছনের দিক ধোওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া রোগীকে ধীরে ধীরে পাশ ফিরাইয়া কাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের পশ্চাদ্ভাগও গরম জল দিয়া মোছাইয়া দিতে হইবে। তারপর সামান্য স্পিরিট দিয়া মোছাইয়া পাউডার দিতে হইবে।

রোগীর হাত-পায়ের নখ যেন বড় না থাকে। নখকাটা ছোট কাঁচি দ্বারা আস্তে আস্তে নখ কাটিয়া দিলে ভাল হয়।

এই ভাবে স্নান শেষ হইলে ধীরে ধীরে নীচ হইতে কম্বল ও

অয়েল ক্লথ গুটাইয়া নিতে হইবে। তারপর রোগীর দেহের আচ্ছাদনখানি বদলাইয়া অন্য কম্বল আচ্ছাদন দিতে হইবে। কাপড়-জামা বদলাইয়া ধোওয়া কাপড়-জামা পরাইয়া দিলে রোগী অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবে।

রোগীকে স্নান করাইবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় :—

(১) রোগীকে বেশী নাড়াচাড়া করিবে না। রোগীর দেহের কোন্ অংশ প্রথমে ধোওয়ান দরকার তাহা রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

(২) স্নান করাইবার সময় রোগীকে খোলা হাওয়ায় খালি গায়ে রাখিবে না।

(৩) ভিজা গামছা বা তোয়ালের ধারগুলি যেন রোগীর নাকে মুখে পড়িয়া তাহার অস্বস্তির কারণ না হয়।

(৪) বিছানার দুইপাশে দুইখানি বড় তোয়ালে দিয়া ঢাকিয়া রোগীর হাত দুইখানি তোয়ালের উপর রাখিতে হইবে।

(৫) আঙ্গুলের ফাঁক, হাঁটুর নীচ অর্থাৎ যে সব জায়গায় শরীরের ভাঁজ পড়ে সেই সব জায়গার জল অতি সন্তর্পণে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

(৬) পরিষ্কার গরম জল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত জল বদলাইয়া ফেলিতে হইবে।

(৭) স্নানের পর বিছানার উপরের চাদরটি বদলাইয়া দিবে।

রোগীকে আহার করাইবার নিয়ম:

রোগীকে আহার করাইবার পূর্বে তাহার দাঁত, মুখ পরিষ্কার আছে কিনা দেখিতে হইবে। রোগীর মুখের নীচে পুরু রুমাল বা তোয়ালে পাতিয়া লইবার পর খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। একবারে

বেশী খাবার খাওয়াইবে না, কারণ ইহাতে রোগী কষ্টবোধ করিতে পারে। খুব ধীরে ধীরে খাওয়াইতে হইবে। তরল পদার্থগুলি যেন বেশী গরম না হয় সেদিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

দুধ পান করাইবার পর একটু জল পান করাইবে।

চামচের দ্বারা অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে খাওয়াইতে হইবে।

খাওয়াইবার সময় রোগীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিবে।

রোগীর শরীরে তীব্র যাতনা বা অন্য কোন কষ্টকর অবস্থার ঠিক পরেই রোগীকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়।

রোগীর আরাম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

রোগীর খাওয়ার সময় বাহিরের লোক না আসাই বাঞ্ছনীয়।

রোগী যাহাতে ক্লান্ত না হইয়া পড়ে সেই দিকে নজর রাখিতে হইবে।

রোগীর পথ্যের সহিত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—রোগীর পথ্য চিত্তাকর্ষক ভাবে পরিবেশন করিতে চেষ্টা করা উচিত। রোগীর খাবার ট্রেখানির উপর পরিষ্কার ও সুদৃশ্য ট্রে-ক্লথ বা তোয়ালে পাতিয়া খাবার পরিবেশন করিবে। রোগীর পেয়ালা, প্লেট, বাসনপত্র যেন ভাঙ্গা বা ফাটা না হয়। ট্রের উপর রোগীর মুখ মুছিবার জন্য (খাওয়ার পরে) একটি ছোট পরিষ্কার রুমাল রাখিবে। রোগীর খাওয়ার টেবিলে সুন্দর ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া দিলে পরিবেশ আরও মনোরম হয়। আহারে অরুচি সত্ত্বেও অনেক সময় সৌন্দর্য রোগীর মনকে খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। রোগী যতটুকু খাইয়া হজম করিতে পারে ঠিক ততটুকু খাওয়ান দরকার। তাহা না করিলে রোগীর বেশী ক্ষুধা পাইলে পরিমাণ ছাড়াইয়াও খাইতে দ্বিধাবোধ করিবে না।

খাদ্যদ্রব্য ভালভাবে পরিপাক করার জন্য চিবাইয়া খাওয়া দরকার,

নতুবা হজমের ব্যাঘাত হইতে পারে। যথাসম্ভব রোগীর রুচি অনুযায়ী খাবারে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার ফলে রোগীর আহারে রুচি জন্মিতে পারে।

রোগীর আহারের সময় কোন প্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে নাই, কারণ তাহাতে হজমের গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে বা পাশ ফিরিতে অসমর্থ হইলে ফিডিং কাপের সাহায্যে খাওয়ান উচিত।

ফিডিং কাপের ব্যবহার—ফিডিং কাপে খাওয়াইবার সময় রোগীর বালিশের তলায় বাঁ হাত রাখিয়া ডান হাতে রোগীকে খাওয়াইবে। ফিডিং কাপ, পেয়ালা প্রভৃতি যেন কানায় কানায় না ভরে। কোন প্রকারে তরল খাদ্য উপচাইয়া পড়িয়া রোগীর জামা-কাপড় যেন নষ্ট না হয়। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে খাওয়ান কোন রকমেই উচিত নয়, ইহার ফলে খাদ্যদ্রব্য রোগীর গলায় আটকাইয়া শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কখনও খুব তাড়াতাড়ি খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে না। পরিমিত খাদ্য না খাওয়া পর্যন্ত রোগীকে উৎসাহিত করিয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে। সর্বদাই একটু কম খাওয়াইবে। রোগীর ক্ষুধা ও রুচি বৃদ্ধির জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইবে। রোগীর আহারের নিয়ম সর্বদা রক্ষা করিবে।
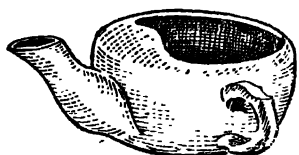
ফিডিং কাপ

রোগীর জলপান—বালিশের তলায় একখানি হাত দিয়া রোগীর মাথাটি একটু তুলিয়া ধরিয়া জল পান করাইবে। গ্লাসটিতে চারভাগের এক ভাগ জল লইয়া ধীরে ধীরে রোগীর মুখে ঢালিয়া দিবে। শায়িত অবস্থায় টিউবের সাহায্যে জল পান করান যাইতে

পারে। টিউবের মুখটি রোগীর মুখে লাগাইবার পূর্বে জল দিয়া একটুখানি ভিজাইয়া লইবে। জল পান করা হইয়া গেলে টিউবটি ধুইয়া রাখিবে।

রোগীকে নিজের হাতে জলের গ্লাস বা টিউব হইতে জলপান করিতে দিবে না। টিউবটি যেন সর্বদা জলের মধ্যে বেশ ভালভাবে ডুবিয়া থাকে, তাহা না হইলে রোগীর গলার মধ্যে হাওয়া ঢুকিয়া যাইতে পারে।

রোগীর পার্শ্বপরিবর্তন করাইবার নিয়ম :

রোগীর হাঁটু দুইটি সামান্য বাঁকাইয়া রাখিবে। তারপর শুশ্রূষাকারিণীর একখানি হাত রোগীর পিঠের নীচে দিয়া একেবারে কাঁধ অবধি লইয়া যাইতে হইবে। অন্য হাতখানি রোগীর কোমরের নীচে রাখিবে। এইবার দুই হাতেই একটু একটু জোর দিয়া রোগীকে শুশ্রূষাকারিণীর দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিবে। তাহার বিপরীত দিকে পার্শ্বপরিবর্তন করাইতে হইলে ঠিক একই ভাবে করিতে হইবে। তবে রোগীর পিঠে ও হাঁটুর তলায় হাত দিয়া রোগীকে শুশ্রূষাকারিণীর দিকে ঈষৎ টানিয়া ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্তন করাইতে হইবে। ছোট ছেলে বা মেয়েকেও ঠিক এইরূপেই পার্শ্ব-পরিবর্তন করাইতে হয়। তবে এস্থলে রোগী তাহার বাঁ হাতখানি শুশ্রূষাকারিণীর বুকের উপর দিয়া ও ডান হাতখানি পিঠের উপর দিয়া শক্ত করিয়া শুশ্রূষাকারিণীকে জড়াইয়া ধরিতে দিতে হইবে। কিন্তু রোগী যেন শুশ্রূষাকারিণীর গলা জড়াইয়া না ধরে।

রোগীর শয্যা রচনা :

রোগী যাহাতে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারে সেই ভাবে শয্যা রচনা করা দরকার। শয্যা তৈয়ার করিবার জন্য যেসব দ্রব্যাদি আবশ্যক তাহা হাতের কাছে রাখিতে হইবে। রোগীর

ব্যবহৃত জিনিসপত্র যাহাতে সহজে নির্বীজন করা যায় বা বদলান যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। শুশ্রূষার সুবিধার জন্য একজনের মত বিছানাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে শুশ্রূষাকারিণী খাট বা চৌকির দুইধার হইতে রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারে। গদি বা তোশক প্রতিদিন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এমনি করিয়া পাতিতে হইবে, যাহাতে বরাবর একদিকে একভাবে পাতার দরুণ উঁচুনীচু না হয়। দীর্ঘকাল একভাবে উঁচুনীচু অবস্থায় শায়িত থাকিলে রোগীর দেহে ক্ষত (Bed sores) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তোশক বা গদির উপর চাদরখানি এমন ভাবে পাতিয়া দিবে যাহাতে তোশকখানি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে, রোগী পাশ ফিরিবার সময়ও যেন চাদরখানি নড়চড় না হয়। চাদরখানি পাতিবার সময় প্রথমে খাটের একপাশে গিয়া চাদরখানি তোশকের নীচে গুঁজিয়া দিবে; পরে খাটের অপর পার্শ্বে মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া চাদরখানিকে টানিয়া আঁট করিয়া লইতে হইবে। এখন পায়ের ও মাথার দিকে টানিয়া দিবে।

বিছানা পাতা হইলে উঁচু করিয়া একটির পর আর একটি বালিশ রাখিবে। যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা বায়ুভরা ডান্‌লো পিলো (Dunlo Pillow) অথবা তোশক ব্যবহার করিতে পারেন। রোগী উত্থানশক্তিরহিত বা খুব বেশী দুর্বল হইলে চাদরের নীচে অয়েল ক্লথ বা রবার ক্লথ ব্যবহার করা উচিত যাহাতে রোগী নিঃসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করিলেও তাহা দ্বারা তোশক ইত্যাদি দুর্গন্ধ ও ময়লাযুক্ত না হয়।

পাশ্চাত্য দেশে গৃহে ও হাসপতালে রোগীর জন্য কম্বল ব্যবহার করা হয়। রোগীর দেহের উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য কম্বলের প্রয়োজন

আছে ; তবে অধিক উত্তাপের জন্য বেশী কম্বল ব্যবহার করা উচিত নয়। গৃহের ভিতরে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপ সঞ্চিত থাকে তবে উত্তাপের জন্য আমাদের দেশে বেশী কম্বলের প্রয়োজন হয় না। অসুস্থ অবস্থায় রোগীর পক্ষে ভারী কম্বল ব্যবহার কষ্টকর ব্যাপার।

রোগীর শয্যা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আঁটসাট করিয়া পাতিতে হইবে। রোগীর গায়ে দিবার কম্বলের নীচে একখানি পরিষ্কার চাদর বা কাঁথা থাকা ভাল। পুরানো কাপড়ের তৈয়ারী কাঁথা নরম বলিয়া রোগীর পক্ষে আরামদায়ক হয়। রোগীর কম্বল যাহাতে মুখে আসিয়া না পড়ে সেইজন্য মুখের দিকে ভাঁজ করিয়া দিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে ও আমাদের দেশের হাসপাতালে কম্বলখানিকে চাদর সমেত পায়ের দিকে ও দুই পাশে তোশকের সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সর্বদা এরূপ করিবার প্রয়োজন হয় না।

রোগীর বিছানা করিবার সময় অথবা চাদর ইত্যাদি বদলাইবার সময় যেন রোগীর অত্যধিক নড়াচড়া বা পরিশ্রম না হয়। যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের সহিত রোগীর শয্যা রচনা করিতে হইবে। তাহা না করিলে দমকা হাওয়ায় হঠাৎ তাহার ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। অসাবধানতা বশতঃ চাদর, কম্বল প্রভৃতি তাহার মুখে আসিয়া না পড়ে তাহা খেয়াল রাখিতে হইবে।

রোগীর শয্যা রচনার জন্য—(১) একজনের শুইবার মত খাট, (২) ওয়াড়যুক্ত তোশক ও বালিশ, (৩) দুইখানি বিছানার চাদর, (৪) দুইখানি গায়ে দেওয়ার কম্বলের নীচের চাদর, (৫) কম্বল, (৬) অয়েল ক্লথ—এই কয়েকটি দ্রব্য একান্ত আবশ্যক।

অয়েল ক্লথের উপরে মোটা পুরু চাদর পাতিয়া তাহার উপরে বিছানার চাদর পাতিলে ভাল। চাদর পাতিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে

হইবে যাহাতে রোগীর পিঠের নীচে মোটা সেলাই বা জোড়া ইত্যাদি না পড়ে। কারণ ইহার ফলে রোগীর পৃষ্ঠক্ষত (Bed sores) হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শয্যাগত রোগীর শয্যা রচনা—শয্যাগত রোগীর কাছে শুশ্রূষাকারিণী থাকিলে ভাল হয়। রোগীর পায়ের কাছে একটি চেয়ার রাখিয়া তাহার উপর রোগীর পরিত্যক্ত চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি রাখিতে হইবে। রোগের জীবাণু যাহাতে না ছড়াইতে পারে সেজন্য পরিত্যক্ত শয্যাদ্রব্যগুলি নাড়াচাড়া করিয়া উহার ধূলা ও দূষিত পদার্থগুলি ঘরে ঝাড়িবে না।

রোগীর পার্শ্বপরিবর্তন করাইবার সময় রোগীর কাঁধ, পিঠ, নিতম্বদেশ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশের নীচে হাত দিয়া হাতের উপর রোগীর দেহভার ন্যস্ত করিয়া পার্শ্বপরিবর্তন করাইতে হইবে। চাদর বদলাইবার সময় ময়লা চাদরখানি গুটাইয়া নিয়া পরিষ্কার চাদর পাতিয়া দিতে হইবে।

বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সর্বাঙ্গে বেদনা থাকে বলিয়া তাহাকে এবং খুব দুর্বল রোগীকে পার্শ্বপরিবর্তন করাইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও বাসনপত্র নির্বীজন করিবার উপায়—রোগীর ব্যবহৃত বেড প্যান, ইউরিন্যাল, পিকদানি প্রভৃতি ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই জীবাণুনাশক দ্রাবক—লাইসল, ডেটল, কার্বলিক এসিড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতির সাহায্যে বিশোধিত করা উচিত। তাহা না করিলে রোগজীবাণু ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে। শতকরা ২০ (20%) কার্বলিক এসিড দ্রাবকের সহিত সোডামিশ্রিত ফুটন্ত জলে ধুইয়া ফেলিলেই পাত্রগুলি বিশোধিত হইবে। সংক্রামক রোগে মল নিঃসৃত হইবার পূর্বেই ব্লিচিং পাউডারের মত জীবাণুনাশক

পাউডার বা দ্রবণ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। শুশ্রূষাকারিণীকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইবে।

রোগী যেসব বাসনপত্র ব্যবহার করে তাহা সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত না করিলে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এই জন্য রোগীর ব্যবহৃত থালা, গ্লাস ইত্যাদি ফুটন্ত গরমজলে লাইসল, ডেটল ইত্যাদি মিশাইয়া উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া রাখা দরকার। রোগীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, চাদর, ওয়াড় প্রভৃতি ফুটন্ত গরমজলে দশ-পনের মিনিট সিদ্ধ করিয়া লইলে জীবাণুমুক্ত হয়। কোন অবস্থাতেই যেন এইসব বস্ত্র অন্য লোকের বস্ত্রের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। যদি কোন কারণে ফুটাইবার অসুবিধা হয় তবে শতকরা ২০ (20%) কার্বলিক লোশন বা ২ পাউণ্ড জলে এক আউন্স ব্লিচিং পাউডার মিশাইয়া রাখিতে হইবে। ব্লিচিং পাউডারগুলি জলের তলায় থিতাইয়া পড়িলে সেই জল এক চামচ লইয়া ½ পাউণ্ড জলের সহিত মিশাইয়া কাপড়গুলি তাহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। ধোপাবাড়ী পাঠাইবার পূর্বে এগুলি উক্ত উপায়ে বিশোধিত করিয়া লইবে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়। ফুটন্ত জলে বিশোধিত করার অসুবিধা থাকিলে উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারাও জীবাণু ধ্বংস করা যাইতে পারে।

জলের সংস্পর্শে যে সব বস্ত্রের তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সেগুলি উত্তাপের সাহায্যে বিশোধিত করা যাইতে পারে। একটি পাত্রের এক-চতুর্থাংশ জলে পূর্ণ করিয়া লইয়া উত্তাপ দিতে হইবে। একটি তোয়ালে ঐ পাত্রের উপর চাপা দিবে। বিশোধন করিবার জিনিসগুলি একটি ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া তোয়ালের উপর রাখিয়া ঢাক্‌নি চাপা দিতে হইবে। প্রায় ৫০।৬০ মিনিট ঐসব দ্রব্য উত্তাপের

মুখে রাখিতে হইবে। এই পন্থা অবলম্বনে জল ব্যতীত শুষ্ক পদ্ধতিতে উত্তাপের সাহায্যেই বস্ত্রাদি বিশোধিত করা যায়।

গরমজলের ব্যাগ (Hot water Bag) **ও আইস্ ব্যাগ** (Ice Bag) **বিশোধন**—গরমজলের ব্যাগ ও আইস্ ব্যাগ শতকরা ২০ (20%) কার্বলিক এসিড মিশ্রিত জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া জল ঝরাইয়া রাখিতে হইবে। জল শুকাইয়া গেলে কিছু ট্যালকাম পাউডার (Talcum Powder) অথবা বোরিক এসিড (Boric Acid) ও জিঙ্ক অক্সাইড (Zinc Oxide) ছড়াইয়া দিয়া পাতলা কাগজ বা কাপড় জড়াইয়া ঐগুলি বাক্সের ভিতর রাখিতে হইবে। ফরম্যালিন (Formalin)ও একটি এন্টিসেপ্টিক (antiseptic); ইহার সাহায্যেও ব্যাগ ইত্যাদি বিশোধন করা যায়।

ঠাণ্ডা জলের সহিত কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া মিশাইয়া রোগীর ব্যবহৃত অয়েল ক্লথ প্রথমে মুছিয়া ফেলিবে; পরে অল্প গরম সাবানজল দিয়া উহা পুনরায় মুছিয়া লইতে হইবে। শতকরা ২০ (20%) কার্বলিক এসিডে অয়েল ক্লথ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ঝুলাইয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে।

রোগীর শুশ্রূষার প্রয়োজনীয়তা—বহু সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেক গৃহে ব্যাধির আক্রমণ হয়। রোগীকে ব্যাধি হইতে নিরাময় করিবার জন্য শুশ্রূষাকারিণীর দায়িত্ব অনেকখানি। রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা চিকিৎসকের কর্তব্য। সেই চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী সেবাশুশ্রূষা করিয়া রোগীর রোগ মুক্তির সাহায্য করা শুশ্রূষাকারিণীর একান্ত কর্তব্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শুধু শুশ্রূষার সাহায্যেই আরোগ্য লাভ করে। এই জন্য শুশ্রূষাকারিণীর কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। সুষ্ঠুরূপে শুশ্রূষার

কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি হাতের কাছে রাখা একান্ত আবশ্যক।

(১) আসবাবপত্রাদি : খাট, তোশক, বালিশ, টেবিল, চেয়ার, বাতি ইত্যাদি।

(২) প্রসাধনসামগ্রী : টুথ ব্রাশ, সাবান, সাবানদান (Soap case), টুথ পাউডার, গায়ে মাখিবার পাউডার।

(৩) পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্ত্রাদি : তোশক, তোশকের ঢাক্‌না, কম্বল, লেপ, স্নানের গামছা, কাঁথা, বালিশের ওয়াড়, মুখ মুছিবার গামছা।

(৪) অন্যান্য দ্রব্যাদি : থার্মোমিটার, গরম ও ঠাণ্ডা জলের কলসী বা কুঁজো, গরম জলের ব্যাগ, ঢাক্‌নি সমেত বেড প্যান, ইউরিন্যাল, বরফের ব্যাগ, মেজারিং গ্লাস (Measuring glass), ফিডিং কাপ (Feeding cup)।
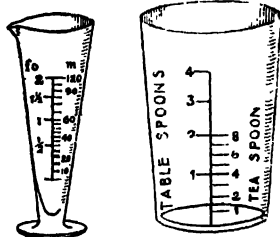
মেজারিং গ্লাস

শুশ্রূষাকারিণীর প্রধান কর্তব্য—রোগীর প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর দায়িত্ব অনেকখানি। এই জন্য তাহাকে অনেকগুলি কাজ করিতে হয়। রোগীকে খাওয়ানো, স্নান করানো, মুখ ধোওয়ানো, তাহাকে তৃষ্ণার জল দেওয়া, নিয়মিত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, রোগীর গায়ে হাত বুলান, বাতাস করা, গা-হাত-পা টিপিয়া দেওয়া, প্রয়োজনমত মালিশ করা প্রভৃতি শুশ্রূষাকারিণীর দৈনন্দিন কাজ।

শুশ্রূষার সময় সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে রোগীর গৃহে প্রচুর আলো-হাওয়া খেলিতে পারে। সূর্যকিরণে অনেক

জীবাণু ধ্বংস হইয়া যায়। রোগীর কম্বল বা বিছানা সূর্যকিরণের মধ্যে রাখিলে রোগের জীবাণুগুলি মরিয়া যায়। যদি দম্‌কা হাওয়ার প্রকোপে রোগী অসুবিধা অনুভব করে বা তাহার ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা থাকে তবে পর্দার সাহায্যে রোগীকে আড়াল করিয়া দেওয়া উচিত। তবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন কোন অবস্থাতেই বায়ু চলাচল ব্যাহত না হয়।

শুশ্রূষাকারিণীর দৈনিক কাজের রুটিন :

প্রাতঃকালীন কাজ—থার্মোমিটারের সাহায্যে রোগীর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে হইবে। ডাক্তারের নির্দেশমত থার্মো-মিটার বাহুর নীচে, বগলে, মুখে অথবা গুহ্যদ্বারে দিতে হইবে। তারপর থার্মোমিটার জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য কার্বোলিক এসিড-পূর্ণ পাত্রে রাখিতে হয়। সেই পাত্রে কিছু নরম তূলা রাখিতে হইবে যাহাতে থার্মোমিটারের বাল্‌ব্‌টি ভাঙ্গিয়া না যায়। রোগীর নাড়ীর ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি তাপমাত্রার সহিত চার্টে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। রোগী যাহাতে বিনা ক্লেশে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতে পারে সেই জন্য বেড প্যানের ব্যবস্থা রাখিবে। দাঁতন, টুথ পাউডার বা টুথপেস্ট, মুখ ধুইবার জল ও গামলা, তোয়ালে প্রভৃতি রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাখিতে হইবে।

রোগীর মুখ ধোওয়া হইয়া গেলে দাঁত মাজিবার ব্রাশ ইত্যাদি দূরে সরাইয়া রোগীর সকালের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কি রকম খাদ্য দেওয়া হইবে তাহা রোগের উপর ও ডাক্তারের পরামর্শের উপর নির্ভর করে। বাসি জল ফেলিয়া দিয়া টাটকা পরিষ্কার জল দিয়া কলসী বা কুঁজো ভরিয়া রাখিবে। তারপর রোগীর গা-হাত-পা মোছাইয়া দিয়া বা স্পঞ্জ করিয়া প্রাতঃকালীন স্নান সমাপন করিবে। এই সব কাজ শেষ হইলে পর রোগীর কক্ষ

DATE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
DAY OF DIS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TIME	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E	M E
PULSE	140 / 136	130 / 180	170 / 160	136 / 160	120 / 128	136 / 136	108 / 100	108 / 80	96 / 100	96 / 98	100 / 96	96 / 88	84 / 76	68
RESP.	30 / 32	32 / 34	34 / 38	34 / 30	32 / 38	40 / 38	30 / 36	26 / 24	24 / 22	24 / 18	22 / 16	20 / 18	16 / 16	18
BOWELS	/ 1	1 /	/ 1		/ 1		/ 1	1 / 1	/ 1	1 /	1 /	1 /	/ 1	1
URINE	10 / 10	[illegible] / 8	10 / [illegible]	12 / 10	14 / [illegible]	6 / 10	12 / [illegible]	8 / 6	12 / [illegible]	[illegible] / 10	8 / 12	10 / 10	12 / 14	10
SLEEP														

107°F, 106°F, 105°F, 104°F, 105°F, 102°F, 101°F, 100°F, 99°F, Normal Temp. 98⅘, 98°F, 97°F, 96°F

রোগীর অবস্থার চার্ট

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি নানা কাজ শেষ করিতে চেষ্টা করিবে।

মধ্যাহ্নের কাজ—রোগীকে ঠিক নিয়মমত ঔষধ ও পথ্য খাওয়ানো উচিত। প্রাতরাশের ঘণ্টা দুই পরে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-খাবারের ঘণ্টা দুই আগে রোগীকে তরল কিছু খাইতে দিবে। তরল পদার্থ বলিতে ঘোল, পেপটোনাইজড মিল্ক (Peptonized milk), বার্লি ইত্যাদি বুঝায়। ডাক্তারের উপদেশমত ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া তরল পদার্থ দিবে। উহার পরে ১০টার সময় পূর্বের মত রোগীর শরীরের উত্তাপ, নাড়ী ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ইত্যাদি চার্টে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নের খাবারের ব্যবস্থাও ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী করিতে হইবে। খাবার পর রোগীর হাত, মুখ ইত্যাদি ধোয়াইয়া তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। যাহাতে রোগী ঠিকভাবে শুইয়া ঘুমাইতে পারে, সেই জন্য বিছানা-পত্র ঠিক করিয়া দিবে। দরকারবোধে পিঠে পাউডার মাখিয়া এবং আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলাইয়া রোগীকে আরাম দিতে চেষ্টা করিবে।

বৈকালীন কাজ—এই সময়ে পূর্বের মত ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী রোগীকে তরল পদার্থ বা ফলের রস খাইতে দিবে। ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধপত্রাদি সেবন করাইবে। রোগীর মলমূত্রের বেগ হইলে বেড প্যান, ইউরিন্যালের ব্যবস্থা করিবে। ঠিক পূর্বের মত দেহের তাপ, নাড়ীর ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি চার্টে লিপিবদ্ধ করিবে। ছকপত্রে (Graph Paper) এই সব ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিলে তাহার সাহায্যে ডাক্তার সহজে রোগের অবস্থা নির্ণয় করিতে পারেন।

রাত্রির আহারের পর, ব্রাশ ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত মাজাইয়া

খুব ভাল করিয়া রোগীর মুখ ধোওয়াইয়া দিবে এবং বিছানা-পত্র ঠিক করিয়া রোগীকে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে দিবার ব্যবস্থা করিবে। ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী রোগীকে তরল পদার্থ বা ফলের রস খাওয়াইবে। যাহাতে রোগী ভালভাবে ঘুমাইতে পারে, সেই জন্য আলোগুলি নিভাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিবে।

নাড়ীর স্পন্দন দেখিবার নিয়ম—হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ সমস্ত ধমনীর ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হয়। তবে হাড়ের উপর যে সমস্ত ধমনী থাকে তাহার উপর আঙ্গুলের সাহায্যে আস্তে চাপ দিয়া নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই জন্য কব্জীর উপরে বুড়া আঙ্গুলের দিকে যে ধমনীটি—রেডিয়াল আর্টারী (Radial Artery) প্রবাহিত হইতেছে তাহার উপর দুইটি কি তিনটি আঙ্গুল একটু চাপিয়াই নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়। বেশী জোরে চাপ দিলে নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং নাড়ীর স্পন্দন একেবারেই অনুভব করিতে পারা যাইবে না। বুড়া আঙ্গুল দিয়া ধমনীর উপর চাপ দিতে নাই, কারণ বুড়া আঙ্গুলের মধ্যে একটা ধমনী আছে—সেই ধমনীর রক্তপ্রবাহের স্পন্দনের সঙ্গে রোগীর রক্তপ্রবাহের স্পন্দন মিশিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

নাড়ী দেখিবার সময় একটি সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি দেখা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ ৩০ সেকেণ্ড হইতে ৬০ সেকেণ্ড পর্যন্ত নাড়ীর স্পন্দন দেখা দরকার। স্বাভাবিক অবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন ৬০ হইতে ৮০ বার হয়; গড়ে ৭২ ধরা যাইতে পারে। ইহার বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা দুর্বল বলিয়া মনে করিবে। সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ি

আর যদি ধমনীর স্পন্দন ৬০এর নীচে হয় তবে মনে করিবে ইহাও

খারাপের দিকে। সদ্যোজাত শিশুর নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১২০-১৪০ ; আট বছরের পর হয় ৯০-১০০ বার। বৃদ্ধদের নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। মেয়েদের নাড়ীর স্পন্দন পুরুষদের নাড়ীর স্পন্দন হইতে একটু বেশী। মিনিটে ১৫০ বারের বেশী নাড়ীর স্পন্দন হইলে মনে রাখিবে তাহা খুব আশঙ্কাজনক। রোগীর মানসিক উত্তেজনার অবস্থায় কখনও নাড়ী দেখিতে নাই।

রোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরূপণের উপায়—রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার বুক ও পেটের উঠা-নামার দিকে তাকাইয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করা যাইতে পারে। বয়স্ক লোকদের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মিনিটে ১৬-১৮ বার ; বালক-বালিকাদের ২০-২৪ বার এবং শিশুদের ২৪-৩০ বার। সেকেণ্ডের কাঁটাযুক্ত ঘড়ির সাহায্যে ইহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বুকের বা তলপেটের ব্যথা বাড়িলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও বাড়িয়া যায়। মাদকদ্রব্য সেবন ও মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমিয়া যায়।

রোগীর মুখ ধোয়াইবার নিয়ম—রোগীর মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিলে রোগ সহজে আরোগ্য হয়। মুখ অপরিচ্ছন্ন থাকিলে নানা রকম রোগজীবাণুর সৃষ্টি হইয়া রোগ বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ জ্বরের রোগীর মুখ ভালভাবে না ধোয়াইয়া দিলে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হইতে পারে। মুখ পরিষ্কার করিতে কয়েক টুকরা গজ (gauge), শোষক লিণ্ট (absorbent lint) অথবা ২½ বর্গ ইঞ্চি তূলা দ্বারা তৈয়ারী তুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে। একই তুলি দুইবার মুখ ধুইতে ব্যবহার করা উচিত নয়।

মুখের বিভিন্ন প্রকার লোশন : (১) সমপরিমাণ লেবুর রস ও সোডা ওয়াটার (soda water) ; (২) সমপরিমাণ লেবুর রস

ও গ্লিসারিন (glycerine) ; (৩) সমপরিমাণ বোরাসিক লোশন (boracic lotion) এবং গ্লিসারিন ; (৪) সমপরিমাণ বোরাসিক লোশন এবং লেবুর রস।

মুখ বেশী শুষ্ক থাকিলে গ্লিসারিন বেশী ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। ইহা ছাড়া থাইমল (Thymol), মেন্থল (Menthol) প্রভৃতি নানা রকম লোশন আছে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাহা ব্যবহার করিতে হইবে। সকাল ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই কোন জীবাণুনাশক দাঁতের মাজন, ক্রিম প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া টুথ ব্রাশের সাহায্যে দাঁতের ভিতর ও বাহির মাজিয়া ফেলা উচিত। রোগী যদি খুব দুর্বল হয়, তবে শুশ্রূষাকারিণীকে এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। মুখ ধোওয়াইবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দরকার :

(১) ছোট পাত্রে চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী জীবাণুনাশক দ্রবণ।

(২) প্রান্তভাগে বিশোধিত তূলা (absorbed wool) জড়ানো সাত-আটটি তুলি।

(৩) মুখ ধুইবার জন্য একটি বড় গামলায় চিকিৎসকের নির্ধারিত জীবাণুনাশক দ্রব্য মিশ্রিত পর্যাপ্ত জল।

(৪) দাঁত মাজিবার ব্রাশ ও জল ঢালিবার পাত্র।

তুলিগুলি তৈয়ার করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে কাঠিগুলির অগ্রভাগ যেন বাহির হইয়া না থাকে। ইহার ফলে রোগীর মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতে পারে। রোগীর কৃত্রিম দাঁত থাকিলে তাহা পূর্বেই খুলিয়া রাখিতে হইবে। চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী ঠাণ্ডা বা গরম জলের দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইতে হইবে। তারপর মাজন বা পেস্ট (paste) ব্রাশে লাগাইয়া রোগীর দাঁতগুলি

ভিতরে বাহিরে মাজিয়া দিতে হইবে। এইরূপে দাঁত মাজা হইলে আবার তাহাকে কুলকুচি করাইতে হইবে।

পরে তুলিগুলি ছোট পাত্রে রক্ষিত দ্রাবকে ভিজাইয়া মুখের ভিতরে, দাঁতের গোড়ায়, মাড়ীতে ও চারিদিকে বুলাইয়া দিতে হইবে। মুখের মধ্যে জিহ্বা, তালু প্রভৃতি সর্বত্র ভালভাবে তুলি বুলাইয়া মুখ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিয়া দিবে। এখন আবার রোগীকে কুলকুচি করিয়া ফেলিতে দিতে হইবে। যদি রোগীর কুলকুচি করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে শুশ্রূষাকারিণীকেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যকৃতের ক্রিয়া ভালরূপ না হওয়ার জন্য অনেক সময় রোগীর জিহ্বায় সাদা দাগ পড়ে।

খুব কড়া টোস্ট করা রুটির টুকরা চিবাইয়া ফেলিতে দিলে অনেক সময় জিহ্বা পরিষ্কার হয়। অবশ্য ইহাতে যকৃতের রোগের কোন উপশম হয় না।

বেড প্যান ব্যবহারের নিয়ম—রোগীকে বেড প্যান দিবার পূর্বে প্রথমেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া লইতে হয়। বেড প্যান ধাতুনির্মিত বলিয়া ঠাণ্ডা হওয়া স্বাভাবিক, সেইজন্য রোগীকে দেওয়ার পূর্বে একটু গরম করিয়া লওয়া উচিত যাহাতে রোগী হঠাৎ বেড প্যানে বসিয়া ঠাণ্ডা বোধ না করে। রোগীর বিছানার দিকে বেড প্যান লইয়া যাওয়া আসার সময় উহা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বেড প্যানের নিজস্ব ঢাকনি এবং হাতলটিও ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইবে। শুশ্রূষাকারিণী নিজেই বেড প্যানটি দিবে, কারণ রোগী অনেক
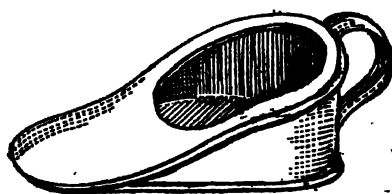
বেড প্যান

সময় যথাযথ স্থানে বসিতে পারে না বলিয়া তাহার দেহের কোন কোন স্থানে অত্যধিক ঘষা বা চাপ লাগিয়া যাইতে পারে।

বেড প্যানের কাজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড প্যানটি স্থানান্তরিত করিবে ও ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া দিবে যাহাতে ঘরের দূষিত বায়ু ও দুর্গন্ধ বাহির হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে।

বেড প্যান দিবার সময় বাঁ হাতখানি রোগীর নিতম্বের নীচে দিয়া ঐ অংশটি উঠাইয়া ডান হাতে বেড প্যানটি সাবধানে যথাস্থানে দিতে হইবে। রোগীর দেহে যাহাতে ঘষা বা আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখিবে। রোগী উত্থানশক্তিরহিত হইলে শৌচাদির কাজ শুশ্রূষাকারিণীকেই করাইতে হইবে। ইহাতে ঘৃণা বা বিরক্তির ভাব যেন না আসে।

রোগীর শৌচ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে একটি তুলি জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজাইয়া ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহৃত তুলিগুলি বেড প্যানে না ফেলিয়া আলাদা পাত্রে ফেলিবে।

মূত্র নিঃসরণের জন্য ইউরিন্যাল (urinal) ব্যবহার করিবে। ইহার জন্য দরজা-জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

রোগীর পৃষ্ঠদেশে যত্ন লইবার নিয়ম—দীর্ঘদিন একই ভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিলে মেরুদণ্ড, কাঁধের উপরিভাগ, কনুইয়ের নীচ প্রভৃতি শরীরের পিছনের দিকে পৃষ্ঠক্ষত বা বেড-সোর (Bed sores) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বার্ধক্যজনিত ক্ষীণ প্রাণশক্তি, অবিরাম জ্বর রক্তহীনতা, পক্ষাঘাত প্রভৃতির জন্য বেড-সোর হইতে পারে। শরীরের ভাঁজগুলিতেও বেড-সোরের ভয় থাকে। তবে পৃষ্ঠদেশেই বেশী হয় বলিয়া পৃষ্ঠদেশেরই যত্ন লওয়া উচিত।

রোগীর পুষ্টি, উপযুক্ত বিছানা ও ঘরে নির্মল বায়ু-চলাচল, বিছানাপত্র বার বার পরিবর্তন, রোগীর পার্শ্ব-পরিবর্তন প্রভৃতির

দ্বারা বেড-সোর নিবারণ করা যাইতে পারে। শয্যার যে অংশে রোগীর পৃষ্ঠদেশ ন্যস্ত থাকে, সেই অংশটি তোয়ালে দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। রোগীর পৃষ্ঠদেশ যখনই ধুইবে তখনই নরম তোয়ালে দ্বারা সমস্ত জল নিঃশেষে মুছিয়া দিবে। পরে পিঠে এলকোহল মাখাইয়া আস্তে আস্তে মালিশের মত পাউডার মাখাইবে। সাধারণতঃ স্টার্চ, জিঙ্ক এবং বোরাসিক পাউডার ব্যবহৃত হয়। উপর হইতে নীচে লম্বা টান দিয়া মালিশ করিবে যাহাতে কোন জায়গায় বেশী চাপ না পড়ে। যদি পিঠের কোন স্থান লাল হইয়া উঠে তবে মনে করিবে উহা বেড-সোরের পূর্বাভাস। তবে সেই অংশটিকে বাদ দিয়া অন্য অংশে চামড়ার উপর হাত চালাইয়া ধীরে ধীরে মালিশ করিবে।

সব সময় লক্ষ্য রাখিবে বিছানার চাদরটি শুকনা, পরিষ্কার ও পরিপাটি কিনা, রোগীর দেহের চামড়ার কোথায়ও ফুসকুড়ি উঠিয়াছে কিনা এবং রোগী অস্বস্তি বোধ করে কিনা। রোগীর দেহ হইতে জল সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া না লইলে বা অতিরিক্ত ঘষাঘষি করিলে দেহচর্ম ফাটিয়া ক্ষত হইতে পারে। অসাবধানতার সহিত বেড প্যান ব্যবহার করিলেও বেড-সোর হয়।

বেড-সোর বন্ধ করিবার উপায়—দেহের পরিচ্ছন্নতা বেড-সোর বন্ধ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। দেহের পশ্চাদ্‌ভাগগুলি সব সময় ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। রোগীকে স্নান করাইবার সময় হাতে বেশ করিয়া সাবান ফেনাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে সাবান মাখাইবে যতক্ষণ না দেহচর্ম সাবানটা সম্পূর্ণরূপে শুষিয়া লয়। পরে গামছা দিয়া না রগড়াইয়া শুধু হাতের সাহায্যে আস্তে আস্তে ঘষিয়া ঐ জায়গাটি ধুইয়া তারপর শুকনা তোয়ালের সাহায্যে ইহা মুছিয়া লইবে। হাতে সামান্য স্পিরিট লইয়া হাতটিকে

বৃত্তাকারে দেহচর্মের উপর ঘুরাইবে যে পর্যন্ত না স্পিরিট সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায় এবং চামড়া লাল হইয়া উঠে।

সর্বশেষে হাতে পাউডার মাখিয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে লাগাইয়া দিবে। শুকনা চামড়াতেও স্পিরিট ও তেল সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া চর্মের উপর দিয়া পরে পাউডার দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে ত্বকের মসৃণতা বাড়ে ও দেহচর্মের জায়গায় জায়গায় ফাটিয়া যাওয়া বন্ধ হয়। স্পিরিটের বদলে ক্যাস্টর অয়েল অয়েণ্টমেণ্ট (Castor oil ointment)ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া প্যাড, কুশন, বালিশ প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারাও সুফল পাওয়া যায়।

বেড-সোরের লক্ষণ—বেড-সোর দেখা দেওয়ার পূর্বে দেহচর্মের অংশবিশেষ লাল হইয়া উঠে। ঠাণ্ডা বা গরম কোন অবস্থাই রোগী সহ্য করিতে পারে না। অত্যন্ত জ্বালা হয়। রোগী অস্বস্তি বোধ করে। প্রথমে সামান্য ফাটা বা চামড়া উঠা দেখা দেয়। প্রথম হইতে যত্ন না লইলে বেড-সোর বড় হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইতে পারে।

রোগীর মাথা ধোয়ানোর ব্যবস্থা—রোগীর মাথা ধোওয়াইতে হইলে (১) একখানা পুরানো কম্বল, (২) দুইখানি অয়েল ক্লথ, (৩) একটি ছোট ও একটি বড় তোয়ালে, (৪) সাবান, (৫) জলের পাত্র (Jug), (৬) ধোওয়াইবার গামলা ও স্নানের ছোট একটি বেসিন (Basin) ও (৭) গরম জলের পাত্র (Jug), এই জিনিসগুলি অত্যাবশ্যক।

প্রথমে দেহের উপরিভাগ হইতে রোগীর জামা খুলিয়া লইতে হইবে। কম্বলখানি গলা-ঘাড় জড়াইয়া সামনের দিকে চিবুকের নীচে আটকাইয়া দিতে হইবে। বিছানার চাদরখানি গুটাইয়া

কোমর পর্যন্ত নিতে হইবে। রোগীর মাথাকে বিছানার ধারে আনিতে হইবে এবং মাথার নীচে একটি বড় অয়েল ক্লথ পাতিয়া দিবে। যাহাতে জল গড়াইয়া নীচের দিকে না যাইতে পারে সেইজন্য অয়েল ক্লথখানি ঘাড়ের নীচ দিয়া বরাবর পিঠ পর্যন্ত গুটাইয়া দিতে হইবে। জল সরিয়া যাইবার জন্য অয়েল ক্লথের অপর প্রান্ত বিছানার পাশ দিয়া ঝুলিয়া সামান্য নীচে রক্ষিত
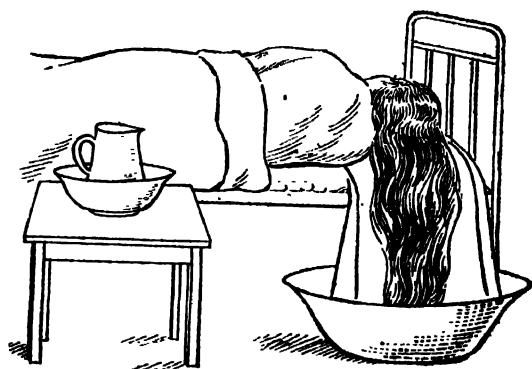
রোগীর মাথা ধোয়ানোর ব্যবস্থা

স্নানের গামলা পর্যন্ত চলিয়া যাইবে। ঐ গামলাটি সাবানজলে অর্ধপূর্ণ করিয়া চুলগুলি উহার মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। সাবান দ্রবণের সাহায্যে আস্তে ঘষিয়া মাথায় ফেনা করিবে। শুশ্রূষাকারিণীর নখ যেন বড় না থাকে। নখ বড় থাকিলে রোগীর মাথার আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। গরম সাবানজলের সাহায্যে মাথায় সমস্ত ময়লা দূর হওয়ার পর চুলগুলি বড় বেসিনটার মধ্যে ঝুলাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর জল ঢালিয়া এগুলি নিঃশেষে ধুইয়া ফেলিবে। পরে শুকনা তোয়ালের সাহায্যে জলটুকু মুছিয়া লইতে হইবে। অয়েল ক্লথ ও কম্বল দূরে রাখিয়া গরম

জলের ব্যাগের সাহায্যে চুল শুকাইবার চেষ্টা করিবে। পরে চিরুনি ও ব্রাশের সাহায্যে চুলগুলি আঁচড়াইতে হইবে।

পাশ ফিরিতে অক্ষম রোগীদের মাথা ধোয়ানোর ব্যবস্থা—বালিশগুলি সরাইয়া তোশক নীচের দিকে টানিতে হইবে অথবা তোশকের উপরের অংশটি সামান্য গুটাইয়া দিয়া খাটের একাংশ খালি করিতে হইবে। রোগীর মাথা বিছানার এক প্রান্তে রাখিতে হইবে। ঠিক আগের মত কম্বল জড়াইয়া ও মাথার নীচে অয়েল ক্লথ পাতিয়া দিবে। অয়েল ক্লথের অপর প্রান্তটি গামলার ভিতর ঝুলাইয়া দেওয়ার পরিবর্তে উহা গুটানো তোশকের নীচে পর্যন্ত মুড়িয়া দিবে। অন্য অয়েল ক্লথখানি খাটের অপর অংশে পাতিয়া উহার এক প্রান্ত রোগীর ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃত করিবে এবং খাটের খালি অংশের উপরে ধুইবার গামলাটি রাখিবে। ময়লাগুলি আল্‌গা হইলে ঠিক পূর্বের মত চুলগুলি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে।

রোগীর চুলের যত্ন—প্রত্যহই রোগীর চুল আঁচড়ানো দরকার। ইহাতে ময়লা দূর হয়। কাঁধের নীচে আচ্ছাদন দিয়া প্রথমে ব্রাশ ও পরে চিরুনির সাহায্যে চুল আঁচড়াইয়া দিবে। চুল বড় হইলে দুই দিকে বিনুনি করিয়া চুল বাঁধিয়া দিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে বিনুনি নীচের দিকে পড়িয়া রোগীর অস্বস্তির কারণ না হয়। আঁচড়াইবার পর চিরুনিগুলি জীবাণুনাশক দ্রবণ দিয়া ধুইয়া লইবে।

উকুন দূর করিবার উপায়—উকুন এক প্রকার পরদেহাশ্রয়ী (Parasitic) প্রাণী। ইহা মানুষের দেহ ও মাথা হইতে রক্ত শুষিয়া খায়। উকুনের প্রাদুর্ভাবে মাথা চুলকায়। দেহের অপরিচ্ছন্নতার দরুণই উকুন জন্মে। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার দরুণ দেহের অন্যান্য অংশেও এক প্রকার উকুন দেখা দেয়।

অয়েল ক্লথ দিয়া রোগীর বালিশটি ঢাকিয়া তাহার উপর একটি সাদা তোয়ালে পাতিয়া দিবে। তারপর পেট্রোলিয়াম জেলি লইয়া রোগীর মাথার চামড়ায় আস্তে আস্তে ঘষিয়া মাখিয়া দিবে। তারপর ভিনিগারের ছিটা দিয়া সমস্ত মাথার চামড়া ও চুলগুলি ভিজাইয়া দিবে। তোয়ালে বা অন্য শক্ত কাপড়ের সাহায্যে সমস্ত মাথা চুল সমেত আঁট করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। পরের দিন সাবানজলের সাহায্যে রোগীর মাথা ও চুল ধুইয়া আবার ভিনিগার ছিটাইবে। ব্রাশ ও সরু চিরুনির সাহায্যে দশ-বার মিনিট কাল চুলগুলি ভালভাবে আঁচড়াইবে। ডিমশুদ্ধ সমস্ত উকুন না মরা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালাইবে। তারপর ব্যবহৃত তোয়ালে, অয়েল ক্লথ প্রভৃতির পরিবর্তে নূতন কিংবা ধোওয়া জিনিস ব্যবহার করিবে।

রোগীর নখের যত্ন লইবার উপায়—আঙ্গুলের ফাঁকগুলি ভাল-ভাবে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিবে যাহাতে চামড়া কোনরূপে জখম না হয়। তোয়ালে দিয়া এই ফাঁকগুলি মোছাইয়া ফেলিতে হইবে। নখের ভিতর ময়লা থাকিতে পারে। এইজন্য নখ বড় হইলে কাটিয়া ফেলাই ভাল। তবে আঙ্গুলের সমান্তরাল করিয়া নখ কাটিতে হইবে। যাহাতে রোগী ব্যথা না পায়, সেইজন্য একেবারে না কাটিয়া বারে বারে নখ কাটা যাইতে পারে। এক বারে কাটিতে গেলে রোগী যদি বেশী চঞ্চল হয় তবে বেশী ব্যথা পাইবার আশঙ্কা থাকে।

রোগীর জ্বর দেখিবার নিয়ম—থার্মোমিটারের সাহায্যে রোগীর জ্বরের উত্তাপ জানা যায়। ডাক্তারের থার্মোমিটার ফারেনহাইট স্কেলে গঠিত। সাধারণতঃ ৯৫°—১১০° পর্যন্ত বিভিন্ন ডিগ্রীর অংশ আঁকা থাকে। উত্তাপ পাইলে পারদ প্রসারিত হয় এবং

যেখানে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে সেইটাই হইল জ্বরের তাপমাত্রা। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮·৪° ; তবে আমাদের দেশে ৯৭·৪° ডিগ্রী পর্যন্ত স্বাভাবিক তাপমাত্রা বলা যাইতে পারে। থার্মোমিটার মুখে, বগলে কিংবা মলদ্বারে দিয়া উত্তাপ নির্ণয় করা যায়। বগলের চেয়ে মুখের তাপমাত্রা একটু বেশী হয়।

রোগীর মুখে থার্মোমিটার দিবার সময়ে প্রথমে হাতখানি ভালভাবে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তারপর হাতের সাহায্যে ঝাঁকানি দিয়া থার্মোমিটারের পারদ ৯৫° ডিগ্রীতে আনিতে হইবে। পারদপূর্ণ কাঁচের অংশটি পরিষ্কার জলে ধুইয়া জিহ্বার উল্‌টা দিকে লাগাইবে। রোগী মুখ বুজিয়া ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে ২-৩ মিনিট কাল থার্মোমিটারটি ধরিয়া রাখিবে। তাপমাত্রা পরীক্ষার পর পুনরায় থার্মোমিটার ঝাঁকাইয়া ৯৫° ডিগ্রীতে আনিয়া ভিজা তূলা দিয়া মুছিয়া পারদের অংশটি নীচের দিকে করিয়া খাপে রাখিয়া দিবে। রোগী অজ্ঞান থাকিলে কখনই মুখে থার্মোমিটার ব্যবহার করিবে না। শিশুদের মুখে থার্মোমিটার কখনও দিবে না।

৯৫°
৯৮·৪°
১০০°
১০৫°
১১০°
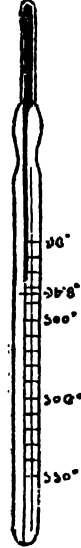
থার্মোমিটার

রোগীর বগলে থার্মোমিটার দিতে হইলে প্রথমে বগলের ঘাম মুছিয়া লইয়া থার্মোমিটার দিবে পূর্বের মত ঝাঁকানি দিয়া পারদ ৯৫° ডিগ্রীতে আনিতে হইবে। তারপর বগলের নীচে অন্ততঃ ৫ মিনিট কাল থার্মোমিটার রাখিবে। যে হাতের নীচে থার্মোমিটার দেওয়া হয় তাহার উপর দিকে চাপ দিয়া রাখিতে হয়। জ্বরের মাত্রা দেখা হইলে পুনরায় ঝাঁকিয়া পারদস্তম্ভ ৯৫° ডিগ্রীতে আনিয়া মুছিয়া খাপে রাখিয়া দিবে।

কতকগুলি বিশেষ ধরনের রোগীর জন্য গুহ্যদ্বারে থার্মোমিটার

দেওয়া হয়। শিশুদের ক্ষেত্রেই মলদ্বারে থার্মোমিটার প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। থার্মোমিটারের পারদপূর্ণ অংশে একটু তেল লাগাইয়া লইতে হইবে। তারপর থার্মোমিটারের এক ইঞ্চি পরিমাণ অংশ মলদ্বারের মধ্যে তিন মিনিট হইতে পাঁচ মিনিট কাল রাখিতে হইবে। পরে থার্মোমিটার বাহির করিয়া জ্বর দেখিয়া চার্টের মধ্যে তাপমাত্রা লিখিবে এবং থার্মোমিটারটি পূর্ববৎ পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া রাখিবে।

রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম—রোগীকে ঔষধ দিবার পূর্বে শুশ্রূষাকারিণীকে ঔষধগুলি নিয়মিত ভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। যে সব ঔষধ বিষাক্ত তাহাতে 'বিষ' (Poison) লেবেল আঁটা থাকিবে। সব সময় ঔষধগুলি যেন ছিপি আঁটা থাকে। অনেক ঔষধ আলোকের ও উত্তাপের সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য সেইগুলি ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

রোগীর নাম, তারিখ, কয় ঘণ্টা অন্তর ঔষধ খাওয়াইতে হইবে এইগুলি ভালভাবে লিখিয়া রাখা উচিত। সময় ও নিয়ম-নিষ্ঠার ব্যতিক্রম শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে মারাত্মক ক্রুটি।

রোগীকে ঔষধ দিবার পূর্বে সর্বপ্রথম লেবেল পড়িয়া লইবে, তাহার পর শিশিটি বেশ ঝাঁকাইয়া লইবে—বিশেষ করিয়া ঔষধটি যখন ইমালশান (Emulsion) জাতীয় পদার্থ হয়। তারপর ছিপি খুলিয়া শুঁকিয়া দেখিবে ঔষধ ঠিক আছে কিনা। রোগীর নিত্য ব্যবহার্য ঔষধগুলির গন্ধ শুশ্রূষাকারিণীর জানা দরকার। তারপর প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন অনুযায়ী শিশির উপরকার কাগজে কাটা দাগ ধরিয়া মেজারিং গ্লাসে (Measuring glass) ঔষধ ঢালিয়া দিবে। গ্লাসের কিনারাতে যেন কোন অবস্থাতে শুশ্রূষাকারিণীর

হাত না পড়ে। তাহার ফলে ময়লা ও দূষিত পদার্থ ঔষধের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাকে দূষিত করিয়া ফেলিতে পারে।

কোন সময়েই ঘুম ভাঙ্গাইয়া রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো উচিত নয়, কারণ রোগীর নিদ্রা ও বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। ঔষধ দেওয়ার পূর্বে শিশির লেবেল ভাল করিয়া বার বার পড়া উচিত। নতুবা ভুল ঔষধ সেবনের ফলে রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিতে পারে।

যদি ছোট চায়ের চামচ দ্বারা ঔষধ মাপিতে হয় তবে খেয়াল রাখিতে হইবে যে, আধ চামচ যেন ¾ ভাগ চামচে না দাঁড়ায়। কয়টার সময়, কত নম্বরের ঔষধ কি পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা লিখিয়া রাখিবে। ঔষধ মাপিয়া ঢালিবার সময় খুব সাবধান হইবে ও মনোযোগ দিবে। ঔষধ ঢালিবার সময় যেন লেবেলটি নষ্ট না হয়। এমন জায়গায় ঔষধ রাখিবে যেন ছোটরা নাগাল না পায়। শিশিতে পরিষ্কারভাবে লেবেল না থাকিলে সেই ঔষধ কখনও ব্যবহার করিবে না। অনেক দিনের ঔষধও ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ঔষধ অনেক দিন থাকিলে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য বাড়তি ঔষধ ফেলিয়া দিবে যেন অপরে ব্যবহার করিতে না পারে।

শুশ্রূষাকারিণীর কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। মনের আনন্দে প্রকৃত সেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। রোগের জীবাণু চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। যখনই রোগীর কোন জিনিসপত্রাদি স্পর্শ করিবে তখনই রোগজীবাণুর সংক্রমণ হইতে পারে। এইজন্য রোগীর ঘরে থাকার সময় মুখে, কাপড়-চোপড়ে হাত দিবে না। হাত সংক্রমিত হইলে কাগজের সাহায্যে দরজা-জানালা স্পর্শ করিবে। পরে ঐ সব কাগজের টুকরা ফেলিয়া

দিবে। রোগীর ঘর পরিষ্কার করিবার সময় লাঠির মাথায় ভিজা কাপড় জড়াইয়া ধীরে ধীরে মেঝে মুছিয়া লইতে হইবে। তাহা না হইলে ধূলার সঙ্গে মিশিয়া রোগজীবাণু ছড়াইয়া পড়িবে। ঐসব লাঠি রোগীর ঘরেই রাখিয়া দিবে।

ডেটল, লাইসল, ফিনল, ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি আধুনিক জীবাণুনাশক দ্রব্যের সহিত শুশ্রূষাকারিণীকে পরিচিত হইতে হইবে।

অনুশীলনী

1. What do you mean by Community Sanitation? What method would you adopt to maintain cleanliness of your locality? (সমাজস্বাস্থ্য বলিতে কি বোঝ? তোমার বাসস্থানের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?)
2. Describe briefly the different channels of spread of infectious diseases. Name some common antiseptics and disinfectants. (কি কি উপায়ে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি সংক্রমিত হয়? কয়েকটি বিশোধক ও নির্বীজক পদার্থের নাম কর।)
3. What are the duties of a nurse? How should a nurse behave with a patient? (শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য কি কি? শুশ্রূষাকারিণী রোগীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?)
4. What points should you remember in selecting a room for sick person? How would you select its

equipments? (রোগীর জন্য কক্ষ নির্বাচনে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে? এইজন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক?)

5. Describe the process you would follow in changing sheets of a weak patient's bed. What precautions are to be taken for the prevention of bed sores? (একটি দুর্বল রোগীর বিছানার চাদর বদলাইবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে? কি ভাবে বেড-সোর নিবারণ করা যায়?)

6. What do you understand by the term segregation? Why is it necessary? (সঙ্গরোধ বলিতে কি বোঝ? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?)

7. How can you prevent ringworm, scabies and eczema? [দাদ, পাঁচড়া ও বিখাউজ (এক্জিমা) নিবারণের উপায় কি?]

8. What are the main points which a nurse should observe while taking respiration? What are the rules of feeding the sick? (নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য শুশ্রূষা-কারিণীকে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে? রোগীকে খাওয়ানোর নিয়ম কি কি?)

9. Give the names of some water-borne diseases? How do the germs of these diseases spread? How can they be prevented? (কয়েকটি জলবাহিত ব্যাধির নাম কর। কি ভাবে ইহাদের জীবাণু সংক্রমিত হয়? ইহা নিবারণ করা যায় কি প্রকারে?)

10. How can you know that a man is attacked with influenza? How does it spread? (কিরূপে বুঝিবে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে কিনা? ইহা কি ভাবে ছড়ায়?)

11. What is the harm of spitting and throwing garbage everywhere ? (যেখানে সেখানে থুথু ও ময়লা ফেলিলে কি অপকার হয় ?)
12. What are the symptoms of small pox ? How it can be prevented ? (বসন্ত রোগের লক্ষণ কি কি ? কি ভাবে ইহা রোধ করা যাইতে পারে ?)
13. What are the causes of diarrhoea ? How can it be checked ? (পেটের অসুখের কারণ কি কি ? কি ভাবে ইহা নিবারণ করা যায় ?)
14. How is malaria caused ? What are the two different stages in the life-cycle of a mosquito ? How can you check the spreading of malaria ? (ম্যালেরিয়া কিভাবে হয় ? মশার জীবনের দুইটি বিভিন্ন ইতিহাস কি কি ? ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার কি ভাবে দমন করা যাইতে পারে ?)
15. What are the symptoms of tuberculosis ? What precautionary measures you would adopt against it ? (যক্ষ্মারোগের লক্ষণ কি কি ? যক্ষ্মা নিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ?)
16. What are the symptoms of typhoid fever ? How can you check the spread of the disease ? (টাইফয়েড রোগের লক্ষণ কি কি ? কি ভাবে ইহার বিস্তার দমন করা যায় ?)
17. What is the difference between vaccination and inoculation ? Give examples. (টীকা ও ইনোকুলেশনের মধ্যে পার্থক্য কি ? উদাহরণ দাও।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ-পরিচালনার কথা

পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব

আয়-ব্যয়ের হিসাব না রাখিলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যবসায়ে লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যবসাদারকেই ব্যবসায়ের হিসাব, আয়-ব্যয়, বাজেট সবকিছু সম্বন্ধেই ভাল জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে হইবে। আয়ের অনুপাতে ব্যয় বেশী হইলে ব্যবসা করিয়া কোন লাভ নাই। সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া যায়। অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক লোক দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজ বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেনরি ফোর্ড প্রমুখ ব্যক্তি ব্যবসা-জগতে সাফল্য লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারাই সার্থক হইয়া উঠে। তবে গৃহ-পরিচালনার দায়িত্ব একজন লোকের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অবশ্য গৃহের অন্যান্য পরিজন ও ছেলেমেয়েরা তাহাকে তাহার কর্তব্য-কার্য সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "Cut your coat according to your cloth," অর্থাৎ "আয় বুঝে ব্যয় কর।" এই নীতি বাস্তবে রূপায়িত করিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে সংসারের খরচপত্র নির্বাহ করিতে গেলে পদে

পদে দুঃখ অনিবার্য হইয়া উঠে। সেইজন্য গৃহকর্ত্রীর পক্ষে আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট পরিকল্পনা অপরিহার্য। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও ডিরেক্টরগণ তাহার অংশীদারকে লভ্যাংশ (dividend) দেন; নিজেদের বুদ্ধি ও কার্যক্ষমতার দ্বারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাঁহাদের কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তি (National assets) বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইরূপ গৃহকর্ত্রী যদি তাঁহার সুষ্ঠু কর্মপন্থার সাহায্যে পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিধানের উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করেন তবে তিনিও সুগৃহিণীরূপে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন।

আদর্শ ভাবে গৃহ-পরিচালনার দ্বারা 'আদর্শ পরিবার' রচনা করিতে পারা যায় এবং তাহার ফলে সমগ্র সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

বাজেট তৈয়ারীর নিয়ম—বাজেট কি ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, সকল মানুষের আয় সমান নয়—তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা মানুষভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। একজন দরিদ্র দীন মজুরকে তাহার অল্প খরচের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া নিস্পন্ন করিতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পক্ষে আহার-তালিকা রচনা করা দুরূহ ব্যাপার। আধুনিক রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি যে সকল শৌখিন দ্রব্য বা বিলাসের উপকরণ ভোগ করিয়া থাকে তাহা সে ভোগ করিতে পারে না—বাধ্য হইয়া অর্ধমলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াই তাহাকে জীবন কাটাইতে হয়।

খাদ্য বা বেশভূষা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও আপেক্ষিক। একের পক্ষে যাহা বিলাস অপরের পক্ষে তাহা নিছক প্রয়োজনীয়। তবে সব সময় গৃহকর্ত্রীকে মনে রাখিতে হইবে যে, নিজের আয়ের পরিমিত গণ্ডীর

মধ্যে পরিবারের সকলের সুখ ও স্বাস্থ্য বিধান করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থব্যয় করিতে হইবে। মাসিক আয় যাহাদের নির্দিষ্ট তাহারা ঠিক সেই ভাবেই গৃহের বাজেট ঠিক করিয়া থাকে। যাহাদের ব্যয় অনিয়মিত অর্থাৎ সব সময় ঠিক থাকে না, তাহারা সারা বৎসরের হিসাব-নিকাশ ঠিক করিয়া বাজেট প্রস্তুত করে। যাহাদের আয় সব সময় ঠিক থাকে না, তাহাদের সারা বৎসরের হিসাব ঠিক না রাখিলে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। যখন টাকা বেশী আসে তখন খরচ বেশী হইয়া গেলে পরে অসুবিধায় পড়িতে হয়। বাজেট করিতে হইলে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আশ্রয়, আমোদ-প্রমোদ সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। বাজেটে প্রথমে এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রয়োজন সাধ্যানুযায়ী পরিপূর্ণ করিয়া পরে অন্যান্য খরচ ও সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে।

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঞ্চয় করা খুবই দরকার। তবে জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়া কেবল অর্থ সঞ্চয় করিলেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় না। ইহাকে কার্পণ্যের নামান্তর বলা যাইতে পারে। শুধু বিলাসের উপকরণ যোগাইয়া দ্রব্যবাহুল্যের আয়োজন ও অনাবশ্যক অপচয়ের পরিবর্তে সঞ্চয় করা বিবেচকের কাজ।

বর্তমান কালে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিস খুব মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্বাহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ছোট ছোট জামা দরজীকে না দিয়া গৃহেই সেলাইর মেশিনের সাহায্যে তৈয়ারী করা যাইতে পারে। জামা ও কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে তাহা সেলাই করিয়া বা রিপু করিয়া লওয়া চলে।

মহার্ঘ ও দুর্লভ খাদ্যদ্রব্যের বদলে সুলভ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করিলে আর্থিক সুবিধা হয়। বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে তরকারী ও ফলের বাগান করিলে সংসারের আয় অনেক বাড়ে। পুরানো জামা-কাপড়ের বিনিময়ে অনেক সময় থালা-বাসন পাওয়া যায়, পুরানো খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া পয়সা পাওয়া যায়। গৃহে আচার, মোরব্বা প্রভৃতি তৈয়ার করিলে সংসারের পক্ষে বেশ সুবিধা হয়। সুনিপুণ গৃহকর্ত্রী সংসারের নানাবিধ ব্যয়ের মধ্যে কিছু না কিছু সঞ্চয় করেন। বাজারে ছোট ছোট মাটির ঘট পাওয়া যায়, তাহার একটা কিনিয়া তাহাতে প্রতিদিন দুই-চারি আনা রাখিলে মাসের শেষে ৫৲-১০৲ জমা হয়। রান্নার চাউল লইবার সময় প্রতিদিন দুই-এক মুঠা করিয়া অন্য একটি পাত্রে রাখিয়া দিলে মাসের শেষে কিছু পরিমাণ চাউল জমা হয়। মোট কথা সব সময় গৃহকর্ত্রীকে সংসারের যাবতীয় অপচয়, অমিতব্যয়িতা ও অযথা ভোগ-বিলাসের স্পৃহা দমন করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাজেট করিবার কোন নির্দিষ্ট মান নাই, ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। পাশ্চাত্য দেশ সমূহ ধন-সমৃদ্ধিতে ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত। সুতরাং সেই সব দেশের লোকেরা যে ভাবে খরচ করিতে পারে আমরা তাহা পারি না। আমাদের সংকীর্ণ আয়ের গণ্ডীর পরিধি স্মরণ করিয়াই বাজেট প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে যাহারা শহরে বাস করে তাহাদের ব্যয় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী। এখানে সাজানো গোছানো সুউচ্চ অট্টালিকার ভাড়া বেশী, যানবাহনের ব্যয়ও অনেক বেশী, বাইরের নানাবিধ আকর্ষণের জন্য বহু অর্থ খরচ

করিতে হয়। সেই জন্য গ্রামাঞ্চলের খরচ অপেক্ষা শহর অঞ্চলে খরচ অনেক বেশী হয়। পরিবারের জনসংখ্যা যদি বেশী হয়, তাহা হইলে খরচ বাড়িয়া যায়। কারণ তাহাতে খাওয়া খরচ, পরিচ্ছদাদির খরচ এবং শিক্ষার ব্যয় সেই অনুপাতে থাকে।

পাশ্চাত্য দেশে বাল্যকাল হইতেই বালকবালিকারা ব্যক্তিগত হিসাব রাখে। কাপড়-জামা, প্রসাধনের সামগ্রী, বই, পোস্ট অফিসের সেভিংস্ সব কিছুই তাহাতে লেখা থাকে। অল্প বয়স হইতে হিসাব রাখিতে অভ্যস্ত হইলে পরবর্তী জীবনে তাহার অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসী স্বামী-স্ত্রী কিংবা গৃহের অপর পরিজন মিলিয়া একটি বাজেট তৈয়ার করে।

বাজেট তৈয়ারীর উদ্দেশ্য—বাজেট তৈয়ারীর উদ্দেশ্য নানাবিধ। (১) পরিবারের আয় কোথায় কি ভাবে ব্যয়িত হইতেছে ইহা সঠিক জানা, (২) ভবিষ্যতে যাহাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, (৩) কোন প্রয়োজনে অর্থের পরিমাণ কম হইলে তাহা কি ভাবে বর্ধিত করা যায় তাহা আমরা বাজেট হইতেই পাইতে পারি।

বেশী হিসাবী লোকেরা আমোদ-প্রমোদকে বাদ দিয়া বাজেট প্রণয়ন করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে দেহই মানুষের সবখানি নয়—দেহ ছাড়া মানুষের মন বলিয়া একটি জিনিস আছে। সেই মনের খোরাক না যোগাইলে দেহও অপুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের কর্মমুখর জীবনের মাঝে একটু আমোদ-প্রমোদ নিতান্ত দরকার; ইহাকে অমিতব্যয়িতা বা অপচয় বলা যায় না। তবে অন্য প্রয়োজনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত করিয়া যদি সিনেমা-গৃহেই আমরা হানা দেই তবে তাহা নিছক অপব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পারিবারিক বাজেট সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে সর্বদাই একটি মূলনীতি অনুসরণ করা দরকার। মূল-নীতিটি মোটামুটি নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্য	....	৪০%
বাড়ীভাড়া	....	১৬%
আমোদ-প্রমোদ, সামাজিক পূজাপার্বণ, উৎসব, লোক-লৌকিকতা ইত্যাদি	....	৮%
জমা (প্রিমিয়াম সহ)	....	৮%
পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়, মেরামতি ও কাচানোর ব্যয়		৬%
শিক্ষা	....	৫%
যাতায়াত, ভ্রমণ ইত্যাদি	....	৪%
চিকিৎসাদি, ঝি-চাকরের বেতন, জ্বালানি ইত্যাদি		১৩%
	মোট	১০০%

কি ভাবে বাজেট তৈয়ারী করিতে হইবে তাহার মূলনীতিগুলি আমরা গোড়ার দিকে আলোচনা করিয়াছি। এখন কি ভাবে আয়ের অর্থ সমগ্র পরিবারের কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

প্রত্যেক পরিবারেরই একটি নির্দিষ্ট আয় আছে যাহার সাহায্যে পরিবারের সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে। সেইজন্য অর্থের ভাগ করা পরিকল্পনার (Planningএর) প্রধান অংশ। পরিবারের প্রত্যেকের সন্তোষের জন্য বিচক্ষণতার সহিত আয়ের অর্থ ব্যয় করা উচিত। প্রথমে দেখিতে হইবে আমরা কতটা ব্যয় করিতে পারি। পিতা-মাতা, এমন কি বয়স্ক ছেলেমেয়েরা একত্রে বসিয়া পরিবারের খরচপত্র ঠিক করিবে। যে যে উপায়ে আয় হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক কত পাওয়া যায় তাহাও লিখিতে হইবে।

বেশীর ভাগ পরিবারই মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে। যে সব পরিবারে নিয়মিত ভাবে মাসিক টাকা আসে সেই সব পরিবারে 'প্ল্যানিং' করা তত কষ্টকর নয়। তবে আয়ের ব্যবস্থা অনিয়মিত ও অস্থায়ী হইলে পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে টাকা যখন বেশী আসে তখন টাকা বৃথা অপচয় করিলে পরে অর্থাভাবের জন্য কষ্ট পাইতে হয়। পরিবারের ব্যয়ের হিসাব থাকিলে ভবিষ্যতের ব্যয়ের সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন হওয়া যায়। সবচেয়ে প্রথম বিবেচনা করিতে হইবে পরিবারের 'ঋণ' ও 'সঞ্চয়'। অতীতের রেকর্ড বা প্রাপ্ত বিলের সাহায্যে পরিবারের আহারের ব্যয় ঠিক করা যায়। এইসব না থাকিলে আগের মাসের ব্যয়ের হিসাবের সাহায্যে ইহা ঠিক করা যাইতে পারে।

খাদ্যের বাজেটের মধ্যে আহার্য, পানীয় সব কিছুই ধরিতে হইবে। খাদ্যের পরে আশ্রয়। আশ্রয়ের মধ্যে মাসিক বাড়ীভাড়া, ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স, ঘরবাড়ী মেরামত সব কিছুরই ব্যয় লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহার সহিত বাড়ীর কাজ চালাইবার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তাহাও ধরিতে হয়। আলো, জ্বালানি, টেলিফোন প্রভৃতি ইহার ভিতরে পড়িবে। মেরামত খরচ, ভাঙ্গাচুরা, গৃহস্থালীর আসবাবপত্রের প্রতিস্থাপন-ব্যয় ইহার মধ্যে পড়ে। অনেক পরিবারের 'বিবিধ ব্যয়' বলিয়া একটি তালিকা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয় তবে বিবিধ তালিকা না থাকিলে বিপদে পড়িতে হয়। আর একটি হইল উন্নতির খাতে ব্যয়। ইহার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সব কিছু ধরা হয়।

প্রত্যেক পরিবারেরই প্রয়োজনের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা থাকে। ইহার ভিতর থাকে শিক্ষা, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, অবসর

বিনোদন ইত্যাদি। পরিচ্ছদের ব্যয় সম্বন্ধে বলিতে পরিবারের প্রত্যেকের কতটা পরিচ্ছদ দরকার এবং তাহাদের সব মিলিয়া কতটা খরচ হয় তাহা ঠিক করিয়া নিতে হইবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বাজেট করিবার পূর্বে ভাবিতে হইবে ঐগুলি টেকসই কিনা এবং পরবর্তী বৎসর কতটা পোশাক-পরিচ্ছদের দরকার হইবে।

খাদ্য—পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য খাদ্যের বরাদ্দ মাসিক বাজেটের ভিতর ধরা উচিত। মাসিক আয়ের একটা বৃহৎ অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয়িত হয়। পরিবারের বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তি, বালক, যুবা, বৃদ্ধ প্রভৃতি ও তাহাদের বিভিন্ন পেশা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া খাদ্য-বরাদ্দ ঠিক করা উচিত। বর্ধিষ্ণু শিশু, বালক ও যুবক-যুবতীদের পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজনীয়তা বেশী। অনেক সময় অল্প মূল্যে পুষ্টিকর পদার্থ পাওয়া যায়। যে সব পরিবারের মাসিক আয় কম তাহারা যাহাতে অল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য যোগাড় করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাজেট রচনা করিবে। নিজ বাড়ীতে শাক-সবজীর বাগান করিলে সেই উৎপন্ন দ্রব্যেও অর্থের সংকুলান হয়। খাদ্য-দ্রব্যকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করিলে বাজেট বেশ ভালভাবে করা যায়। সেই ভাগগুলি এইরূপ—(১) তরকারী ও ফল, (২) রুটি চাল ও ডাল (৩) চিনি, কফি, চা ও চকোলেট, (৪) মাছ, মাংস ও ডিম, (৫) দুধ ও পনীর।

স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই জন্য মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির জন্য সবচেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজনীয় এবং যাহারা মাছ, মাংস খায় না তাহাদের জন্য দুধ অপরিহার্য।

যে সব খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিতে সময় কম লাগে তাহার খরচ

সাধারণতঃ কম হয়। আহারের বিষয় সুপরিকল্পিত ভাবে চিন্তা করিলে খরচ অনেক কমে। এক সপ্তাহ বা তিন-চারি দিনের খাদ্যের বিষয় আগে পরিকল্পিত থাকিলে খাদ্যে অনেক কম ব্যয় পড়ে। শশা, পেয়ারা, বাতাবীলেবু প্রভৃতি সকলের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব। আহারের পরিকল্পনা এই রকম ভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রতিদিনের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে। একদিন ভুরিভোজন করিয়া পরদিন উপবাস থাকিয়া দিন কাটানোর ব্যবস্থা হইলে—সেইরূপ বাজেটের কোন মূল্য থাকে না।

পোশাক-পরিচ্ছদ—পোশাক নির্বাচনের সময় আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পরিবারের আর্থিক আয়, সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাহাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করিতে পারা যায়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পোশাকের ব্যয় নির্ধারণ করিতে হইবে। পারিবারিক আয়ের একটা বিশেষ অংশ পোশাকের নিমিত্ত ব্যয় করা উচিত। ব্যক্তিগত আয়, পেশা, জলবায়ু অনুযায়ী পোশাকের তারতম্য হওয়া উচিত। যাহারা মিল বা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তাহাদের আঁটসাট পোশাক ব্যবহার করা উচিত।

শীতপ্রধান দেশে দেহের তাপ সংরক্ষণের জন্য গরম পোশাক ব্যবহার করিতে হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পোশাক যাহাতে সহজে উত্তপ্ত না হয় সেজন্য হাল্কা ধরনের পোশাক ব্যবহার করা কর্তব্য। পোশাকের ব্যয় অনেকটা স্থিতিস্থাপক। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে আর পারিবারিক অর্থের সংকুলান না হইলে পোশাক সম্বন্ধে ব্যয় স্থগিত রাখা উচিত। মেয়েদের পোশাক পুরুষদের পোশাক হইতে অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পোশাকের দামেরও

খুব তারতম্য হয়। পারিবারিক অর্থের সংকুলান হইলে আধুনিক রুচি ও ফ্যাশন অনুযায়ী একটু বেশী মূল্য দিয়া পোশাক ক্রয় করা চলে। সাধারণতঃ দেখা যায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, বিশেষ করিয়া চল্লিশ বৎসরের পর পোশাকের ব্যয় লোকে কম করিয়া থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ইহা আরও অনেক কমিয়া যায়। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইলে কি ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ, জামা-জুতা ঠিক রাখিতে হয় সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জামা-কাপড় বায়ুতে শুকান এবং ব্রাশের সাহায্যে তাহাদের ধূলা পরিষ্কার করা দরকার। জামা-কাপড়ে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারও প্রয়োজন। অবসর সময়ে গৃহকর্ত্রী জামা তৈয়ারী করিতে বা সেলাই ও রিপু করিয়া পুরাতন বস্ত্র ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন। ইহাতেও গৃহের আয় বাড়ে।

ঘরভাড়া—মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল গৃহ। গৃহের জন্য ব্যক্তিগত আয়ের শতকরা ১৪-১৫ ভাগ ব্যয়িত হওয়া দরকার। বর্তমান যুগে বিশেষ করিয়া বড় বড় শহরে ঘন বাড়ীর জন্য গৃহের স্থান সংকুচিত হইয়াছে। ছোট ছোট গৃহের ভাড়া কম ও মেরামত, চুনকাম ইত্যাদি করিতে আনুষঙ্গিক খরচও কম পড়ে। এই জন্য ছোট ঘরের ভিতরে গৃহস্থালীর যাবতীয় আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি রাখিয়া যাহাতে অল্প ব্যয়ে গৃহের বন্দোবস্ত করা যায় তাহা করাই উত্তম ব্যবস্থা।

অনেকের মতে ছোট গৃহে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি রাখা খুব অসুবিধাজনক। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। যাহাদের আর্থিক সঙ্গতি থাকে তাহারা বড় বাড়ী ব্যবহার করিতে পারে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের যত অল্পব্যয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ

করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অল্প খরচের গৃহের বন্দোবস্ত করা উচিত। বৃদ্ধ লোকদের বাড়ীর ভিতরে চলাফেরা করিতে অনেক সময় বিপদ ঘটে। এই জন্য ভাল আলোর বন্দোবস্ত করা উচিত অথবা ঘরের মেঝে যাহাতে পিচ্ছিল না হয় সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

গৃহ পরিচালনা করিতে গেলে অনেক সময় গৃহের খুঁটিনাটি জিনিসপত্রের মেরামত করিতে হয়। এইজন্য ছোট করাত, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার, ফুটো করিবার ও মোচড় দিবার যন্ত্রের দরকার। প্রয়োজন হইলে মিস্ত্রীর শরণাপন্ন না হইয়া যাহাতে গৃহকর্তা নিজেই গৃহের মেরামতের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা রাখা উচিত। জানালা-দরজার রঙ নষ্ট হইলে ব্রাশ ও তুলির সাহায্যে যাহাতে সেগুলি পুনরায় ভালভাবে পালিশ বা রঙ করা যায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাতে সংসারের অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়।

গার্হস্থ্য জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গৃহ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এইজন্য প্রত্যেক লোকেরই আর্থিক সঙ্গতি থাকিলে একখানি নিজস্ব গৃহ থাকা উচিত। একবারে টাকা দিয়া ঘর তৈয়ারী করিতে পারিলে ইহা একটি স্থায়ী সম্পত্তি হয়। প্রয়োজন হইলে গৃহের অংশ ভাড়া দিয়া সংসারের আয় বাড়ানো যাইতে পারে। গৃহের মালিক হইলে সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। নিজের সুখ-সুবিধা মত গৃহের গঠন করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে গৃহের অংশবিশেষ ভাঙ্গিয়া নূতনরূপে তৈয়ার করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রে ভাড়াটে গৃহে গৃহস্বামী চুক্তিপত্রের সাহায্যে ভাড়াটেদের অনেক অধিকার সংকুচিত করিয়া থাকে। তবে ভাড়াটে বাড়ীর সুবিধা এই যে, গৃহের মেরামত, ট্যাক্স, রাস্তাঘাট প্রভৃতি

সারানোর পূর্ণ দায়িত্ব গৃহস্বামীর। ভাড়াটে বাড়ীর চাহিদা কম হউক বা বেশী হউক সব সময় ভাড়াটিয়াদের একই নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হয়। গৃহস্বামীর আর একটি অসুবিধা এই যে, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই স্থাণু ও অচল হইয়া নিজ নিজ গৃহে স্থায়িভাবে বসবাস করে। জায়গা পরিবর্তন বা নূতনত্বের দিকে তাহাদের কোন ঝোঁক থাকে না।

স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization-এর) মতে স্বাস্থ্য বলিতে শুধু রোগের অভাব বা শারীরিক ক্ষমতা বুঝায় না, ইহা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সব কিছুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বুঝায়। বর্তমান কালে দৈহিক স্বাস্থ্য বলিতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনের সর্বাবস্থাকেই বুঝি। সুচিকিৎসার দ্বারা ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করিয়া আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারি। প্রত্যেক পরিবারেই চিকিৎসার ব্যয় একটি বড় সমস্যা। শিশুর জন্ম-মুহূর্ত হইতেই পরিবারকে তাহার চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিতে হয়। শৈশবের কয়েকটি আশঙ্কাজনক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিলেই ছোট ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা ভয় কাটিয়া যায়। কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি ও আকস্মিক দুর্ঘটনা এই সময়ের চিন্তার বিষয়। শিশুদের নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দাঁতের যত্ন নেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সব সময় দৃষ্টি রাখা উচিত।

অসুখের জন্য আর্থিক বাজেট করা খুব দুষ্কর। কারণ কখন অসুখ দেখা দিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত কোন কোন পরিবারে অসুখ দেখা না দিতে পারে, তারপর হয়ত উপর্যুপরি অনেক অসুখ ঘটিতে পারে।

অসুখের জন্য নিয়মিত বাজেট করিতে না পারিলেও স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় শিশুর জন্ম পর্যন্ত তিন-চারি বার চিকিৎসক দ্বারা তাহার শরীর পরীক্ষা করানো, দন্ত-চিকিৎসক ও চক্ষু-চিকিৎসকের দ্বারা দন্ত ও চক্ষু পরীক্ষা করা এই সব বিষয়ে নিয়মিত বাজেট করা যাইতে পারে। আমেরিকান পরিবারের লোকেরা তাহাদের আয়ের শতকরা ৪ ভাগ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যয় করিয়া থাকে।

আমরা দুই উপায়ে চিকিৎসার ব্যয় কমাইতে পারি—(১) রোগ নিবারণের পন্থা অবলম্বন করিয়া, (২) হেল্‌থ ইনস্যুরেন্সের সাহায্যে। পাব্লিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট (Public Health Department) রোগ নিবারণের ব্যাপারে সাহায্য করে। ইহারা প্রধানতঃ সাত প্রকারে রোগ নিবারণে সাহায্য করিয়া লোকের আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে। এই সংস্থা (১) সঠিক রেকর্ড রাখে, (২) সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা দেয়, (৩) স্বাস্থ্য-বিধি পালনের জন্য আবশ্যকীয় বাধ্যতামূলক নিয়মের ব্যবস্থা করে, (৪) গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতির জন্য স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপন করে ও শিশুর স্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে, (৫) জনস্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার স্থাপন করে, (৬) স্বাস্থ্য-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে এবং (৭) পুরাতন রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করে। রোগ নিবারণের মুখ্য দায়িত্ব গভর্নমেণ্টের হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তিই গভর্নমেণ্টকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থা ভারতবর্ষে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই।

শিক্ষা—যে সব পরিবারে ছেলেমেয়ে আছে সেই সব পরিবারে শিক্ষার দায়িত্ব আছে। শিক্ষার বিষয়ে পারিবারিক ব্যয় সাধারণতঃ কম। অনেক সময় শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয় অন্যান্য বিবিধখাতে লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা মোটেই বাঞ্ছনীয়

নয়। ডাঃ ডাবলিন বলিয়াছেন যে, একজন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সম্পন্ন শিশু পরবর্তী বংশধরের ভিত্তি সদৃশ। যখন এই সব শিশু আঠারো বৎসরে উপনীত হয় তখন তাহাদের মূল্য তাহাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ শিশুরা জাতীয় সম্পদ। তবে পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত ব্যয় কিরূপ হইবে ইহা ব্যক্তিগত রুচি ও প্রতিভার উপর নির্ভর করিবে। কোন শিশুর সঙ্গীতের উপর ঝোঁক থাকিতে পারে, কাহারও অঙ্কন, সেলাই বা খেলাধুলার দিকে আকর্ষণ থাকিতে পারে। সেই ভাবে তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য সেই অনুপাতে ব্যয় করিতে হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিন্ন পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করা হইলে তাহার ফল মোটেই ভাল হয় না।

গৃহের অপরাপর ব্যক্তির মানসিক রুচি ও আকর্ষণ দ্বারা শিশুর শিক্ষা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। গৃহের অন্যান্য ব্যক্তি যদি প্রতিদিন মনোযোগের সহিত খবরের কাগজ বা অন্য গ্রন্থাদি পাঠ করে তবে তাহা অনুকরণ করিয়া শিশুর মনেও সংবাদপত্র বা বই পড়িবার আগ্রহ জন্মে।

আর একটি ব্যাপারে পরিবারের লোকেরা শিশুকে সাহায্য করিতে পারে—যেমন শিশুর নিজ হাতে টাকা খরচ করা। স্কুল-কলেজে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শৈশব অবস্থায় ভালভাবে টাকাপয়সা ব্যয় করিতে শিখিলে পরবর্তী জীবনে তাহার অনেক সুবিধা হয়। অনেকে এই মতের বিরুদ্ধে বলেন যে, যদি শিশুর হাতে টাকাপয়সা দেওয়া হয় তবে আর্থিক সমস্যার দরুণ সে চিন্তান্বিত হইতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিনাটি বাদ দিয়া পিতামাতাদের শিশুদের কাছে পরিবারের মোটামুটি অবস্থা সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ শিশুকে বলা যাইতে পারে যে

অসুখের দরুণ পরিবারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে অথবা বাড়ী ক্রয়ের দরুণ তাহাকে ধার করিতে হইবে। যদি তাহারা পরিবারের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে পরিচিত হয় তবে সহজে তাহারা বিচলিত হইবে না।

শিক্ষার দায়িত্ব পরিবারের সবচেয়ে বেশী। যাহাতে শিশু শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাজেট প্রণয়ন করা দরকার।

অবসর বিনোদন—দৈনন্দিন কর্মজীবনের মধ্যে আমরা অবসর সময় লাভ করিয়া থাকি। চিত্তবিনোদনের জন্য সেই সময় কাজে লাগান দরকার। শুধু নিছক হাসি-ঠাট্টা বা গল্প-গুজবের ভিতর দিয়া সময় কাটাইলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে যাহাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। পারিবারিক বাজেট করিবার সময় এই অবসর বিনোদনের ব্যয়ের তালিকাও প্রস্তুত করিতে হইবে। রেডিও, সঙ্গীতচর্চা, রসালাপ, বইপড়া, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি আমাদের অবকাশ সময় সুষ্ঠুভাবে যাপন করিবার জন্য প্রশস্ত। সামাজিক পরিবেশে ভালভাবে কথাবার্তা বলা একটি বিশেষ আর্ট। প্রত্যেক ব্যক্তিই অবসর সময়ে কথা বলার আর্ট আয়ত্ত করিয়া সহজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে।

যাহাদের সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক থাকে তাহারা সঙ্গীতচর্চা করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং অর্থ উপার্জন করিতে পারে। অবসর সময়ে উলের মোজা বা সোয়েটার তৈয়ারী করিয়া কিংবা কাপড়-জামা সেলাই করিয়া পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বাগান করিয়া শাক-সব্জী উৎপাদন করিলে সাংসারিক খরচ কম হয়।

অনেকে অবসর সময়ে স্ট্যাম্প সংগ্রহ (Stamp collecting) ব্যাপারে মনোনিবেশ করে। ইহার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক তথ্য ও দেশ-বিদেশের প্রধান জননায়কদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করা যায়। ভালভাবে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করিতে পারিলে সেই অ্যালবাম (Album)-এর দামও অনেক হয়। নিজের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী অবসর সময় যাপন করিয়া আনন্দ পাওয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে পারিবারিক আয়ের সংস্থানও হইতে পারে।

যাহাদের বই পড়িবার প্রবৃত্তি থাকে তাহাদের ঐ প্রবৃত্তি যাহাতে পূর্ণবিকাশের সুযোগ পায় সেই দিকেও গৃহে ব্যবস্থা থাকা উচিত। যে বই পড়িয়া শিশু আনন্দ পায় সেই বইই পড়িতে দেওয়া দরকার। সে বই যাহাতে সে দ্রুত পড়িতে পারে—অভিধানের সাহায্যে শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেই দিকেও অভিভাবকের দৃষ্টি রাখা উচিত। কয়েকখানা বই ভালভাবে পড়িতে শিখিলে পরে অন্যান্য বই নিজেই বাছিয়া লইতে পারিবে। প্রয়োজনবোধে অভিভাবক ও শিক্ষক তাহাকে বইএর নাম বলিয়া দিলে সে লাইব্রেরী হইতে বই বাছিয়া নিতে পারে।

ট্যাক্স—প্রত্যেক গৃহের মালিককেই গভর্নমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনকে কিছু না কিছু ট্যাক্স দিতে হয়। গভর্নমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স নিয়মিতরূপে না দিলে ইহারা জমি, গৃহ বা গৃহের আসবাবপত্র ক্রোক্ করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকে। এজন্য গৃহস্বামীকে এই বিষয়ে অবহিত থাকিতে হয়। জমির খাজনা তহশীলদারগণ আদায় করিয়া থাকে। তাহারা করদাতাকে কোর্টের সীল (Seal) সহ খাজনার রসিদ দেয়। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স সাধারণতঃ বৎসরে ৪ বার করিয়া নেওয়া হয় এই রসিদেও সব কিছু লেখা থাকে।

ইহা ছাড়া যাহাদের মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা অন্যান্য যানবাহন থাকে তাহাদেরও মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনকে নিয়মিত ট্যাক্স দিতে হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য অনেক সময় ট্যাক্স লওয়া হয়—ইহাকে প্রমোদকর বা অ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স (Amusement Tax) বলা হয়। শহরের প্রেক্ষাগৃহে থিয়েটার ও সিনেমার বিভিন্ন শ্রেণীর টিকিটের মূল্যের সঙ্গে প্রমোদকর বাঁধা থাকে।

যাহারা রেডিও রাখে তাহাদের রেডিওর লাইসেন্স দিতে হয়। যাহাদের মাসিক বা বার্ষিক আয় বেশী তাহাদের বাৎসরিক আয়কর বা ইনকাম ট্যাক্স (Income tax) দিতে হয়। ইহা ছাড়া মৃত্যুকর (Death tax) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ট্যাক্স অনেক সময় ধার্য করা হয়। নিয়মিতভাবে ট্যাক্স না দিলে যে কোন সময়ে গৃহস্থের বাড়ীঘর নীলাম হইয়া যাইতে পারে, এজন্য সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

আয়ের উপায় ও উপকারিতা—সাংসারিক লোকদের সর্বদাই ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিতে হয়। জীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেকেরই খরচের মাত্রা কম থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের জনসংখ্যাও বাড়িয়া যায় এবং খরচের মাত্রাও বাড়িতে থাকে। ছেলেমেয়ের শিক্ষা, বিবাহ, আকস্মিক বিপদ, অসুখ-বিসুখের জন্য কিছু সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই উচিত। তবে সব সময় ভাবিতে হইবে কি ভাবে অর্থ নিয়োজিত করিলে বেশী অর্থাগম হয় এবং কি ভাবে সেই অর্থ নিরাপদ ভাবে সঞ্চিত রাখা যায়।

অর্থ নিয়োগ করিবার সময় পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) যে প্রতিষ্ঠানে অর্থ গচ্ছিত রাখা হইবে তাহার স্বরূপ কি—ইহা সরকারী কি বেসরকারী, (২) সিকিউরিটি চালু-

কারীদের বাজারে সুনাম কিরূপ, (৩) কিরূপ সিকিউরিটি সমূহ ক্রয় করা হইয়াছে—বণ্ড, প্রেফারেন্স স্টক ও সাধারণ স্টক কি ধরনের, (৪) কি কি বিভিন্ন প্রকারের ইন্‌ভেস্টমেণ্ট, (৫) ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা কি প্রকার। সর্বপ্রথম দেখিতে হইবে যে আসল টাকা যেন নিরাপদ থাকে। টাকা নিয়োগের উদ্দেশ্য হইল আয় বাড়ানো, তবে দেখিতে হইবে আসল টাকা খাটাইয়া যাহাতে বেশী আয় হয়।

একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, অনেক সময় আয় বেশী হইলেও টাকার নিরাপত্তা থাকে না। এই জন্য টাকা নিরাপদে রাখিয়া যাহাতে আয় বেশী হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্ক, ইন্‌স্যুওরেন্স, পোস্ট অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখার সুবিধা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার এইসব প্রতিষ্ঠানে তাহাদের অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার (Share holder) হিসাবে টাকা জমা রাখা যায়। সেইসব কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে জানিবার পরে শেয়ার ক্রয় করা উচিত।

ধানের জমি ক্রয় করিয়া অনেক সময় সারা বৎসরের ফসল পাওয়া যায়। আংশিক ভাবে ধান বিক্রয় করিয়া পারিবারিক আয় বাড়ানো যায়।

যাঁহাদের অধিক টাকা আছে তাঁহারা বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়া দিয়া আয়ের মাত্রা বাড়াইতে পারেন। বর্তমানে ধনী সম্প্রদায়ের অনেকেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

অবসর সময়ে নানারূপ কাজ করিয়া পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা যায়। ব্যক্তিগত প্রবণতা, রুচি ও ঝোঁক সকলের সমান নয়।

সেজন্য কোন লোককে নির্দিষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া যায় না যে তাহার অবসর সময় সে কি ভাবে ব্যয় করিবে। প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত যে সমগ্র পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রত্যেকেই দায়ী। বর্তমান জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থা অতীব জটিল। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের আয়দ্বারা সাংসারিক যাবতীয় খরচ নির্বাহ হয় না। এই জন্য বাড়ীর মেয়েদেরও পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে প্রচুর অবকাশ থাকে। সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আর্ট বা শিল্পের চরম উৎকর্ষ হয় গৃহশিল্পে। কুটীর-শিল্প শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। ভারত গভর্নমেন্ট দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটীর-শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। সূক্ষ্ম এম্‌ব্রয়ডারীর কাজ, সুন্দর কাঁথা সেলাই, বিছানার ঢাকনী (Bed cover), আসন প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া সংসারের ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়। শান্তিনিকেতনের বাটিকের কাজ, চামড়ার উপর সুন্দর সুন্দর ছবির কাজ চারুশিল্পের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ইহা দেশ-বিদেশে সমাদৃত হইতেছে। বেতের বাস্কেট, ঝুড়ি, ফুলের সাজি কত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ার করা যাইতে পারে। ইচ্ছামত সুন্দর নকশা করিয়া কাপড়ের পাড়, জরির পাড়, নানারূপ কারুকার্য-খচিত সুন্দর পাড় তৈয়ার করিয়া কাপড়ে লাগান যায়। গৃহের অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস (যাহা প্রায়ই ফেলিয়া দেওয়া হয়, যেমন—ছেঁড়া কাপড়, কাগজ, সিগারেটের বা দেশলাইয়ের বাক্স প্রভৃতি) দিয়া কত সুন্দর সুন্দর খেলনা এবং গৃহের নানারূপ প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে।

আবার অনেকে অবসর সময়ে নানারূপ আচার, আমসত্ত্ব, পাঁপর প্রভৃতি নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া লোকের তৃপ্তি সাধন করে ও

পরিবারের আয় বৃদ্ধি করে। বাজারে তৈয়ারী এসব জিনিস অনেক সময় সুলভ হয় না এবং উৎকর্ষের দিক দিয়াও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। দুর্দিনে অথবা রোগীর মুখরোচক খাদ্য হিসাবে এসব আচার, আমসত্ত্ব প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঘরে নানারূপ খাবার তৈয়ার করিলে খরচ কম হয়; পরন্তু ভেজাল থাকে না বলিয়া স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুস্বাদু হয়।

ইহা ছাড়া অবকাশ সময়ের কিয়দংশ আধ্যাত্মিক চিন্তা বা সমবেত প্রার্থনা করিয়াও যাপন করা যায়। যাহারা মানসিক উৎকর্ষের দিকে বেশী নজর দেয় তাহারা বিভিন্ন ধরনের বই পড়িয়া আনন্দলাভ করিতে পারে। যদি সাহিত্যে বা চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা থাকে তবে মাসিক পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি লিখিয়া, ছবি আঁকিয়াও বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারে। সর্বদাই পরিবারের কল্যাণ চিন্তা করিয়া অবসর সময় নানারূপ কাজের মধ্য দিয়াই যাপন করিতে হইবে—এই নীতি গ্রহণ করিয়াই আমাদের জীবনের পথে চলিতে হইবে।

সংসারের সঞ্চয়—অর্থকে বিনা কারণে আটক করিয়া না রাখিয়া ইহার সচল গতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেকে, বিশেষ করিয়া আগের যুগের মানুষেরা সোনার গহনা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। নারীর সৌন্দর্যের আভরণ ছাড়াও ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল অর্থ সঞ্চয় করা। ইহাতে অর্থ সঞ্চিত হয় সন্দেহ নাই, তবুও এই অর্থ সঞ্চয়ের বিনিময়ে আর কোন অর্থ আসে না। অর্থকে এমন ভাবে সঞ্চয় করিতে হইবে যেন তাহা হইতে আয় হয়। এই জন্য টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা, জীবন বীমা করা, ক্যাশ সার্টিফিকেট প্রভৃতি ক্রয় করা যাইতে পারে। পূর্বযুগে জমিদারেরা ভূমির উপর অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন। এখন জমিদারী

প্রথার লোপ হওয়াতে আর তাঁহাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই। তাই আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় তাঁহাদের অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন।

ব্যাঙ্ক ঃ

পুরাকালে আমাদের দেশে গচ্ছিত ধন কলসী বা ঘড়ায় ভরিয়া গুপ্তস্থানে মাটির নীচে রাখা হইত। তখনকার দিনে ব্যাঙ্কের প্রচলন ছিল না—বাড়ীর সিন্দুকেই সাধারণতঃ টাকাপয়সা রাখা হইত। এজন্য গুপ্ত তথ্যের সন্ধান পাইলে চোর-ডাকাতের সুবিধা হইত। কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙ্কের প্রচলন হওয়ায় বেশ নিরাপদ ভাবে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা চলে। ইহাতে নিয়মিতভাবে সুদ পাওয়া যায় এবং দরকার হইলে টাকা তুলিয়া আনিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

তিনপ্রকারে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারে ঃ (১) চলতি হিসাব (Current account), (২) মেয়াদী জমা (Fixed deposit), (৩) সেভিংস্ হিসাব (Savings account).

চলতি হিসাব (Current account)—এই প্রকারে টাকা জমা দিবার একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক থাকে; ইহার কম হইলে টাকা জমা রাখা চলে না। এই টাকার অঙ্ক সব ব্যাঙ্কে সমান নয়। সাধারণতঃ ৫০০৲ টাকার নীচে হইলে চলতি হিসাব বা Current account খোলা চলে না। জমা দিবার পর সমস্ত টাকা তুলিতে হইলে সর্বনিম্ন অঙ্কের নির্দিষ্ট টাকাটা বাদ দিয়া বাকীটা উঠান যায়। চলতি হিসাবে জমা টাকার সুদ অত্যন্ত কম। কোন কোন ব্যাঙ্কে সুদ নাই বলিলেই চলে। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীরা ও শিল্পপতিরা এই হিসাবে টাকা জমা রাখেন। প্রতিদিন ইচ্ছামত এই হিসাব হইতে টাকা তোলা যায় এবং জমা দেওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের যে কোন মুহূর্তে

This receipt is not valid unless it is signed by the Cashier and the Agent/Acctt.

The Bank of Bankura Ltd.

CURRENT
Cheques ________19

Credit ____________________

of ____________________

Rupees ____________________

________ *as detailed below* :—

Cheque No.	DRAWEE	Rs.	As.	P.
	TOTAL Rs.			

Cashier. *Agent/Acctt.* *By* ____________

This receipt is not valid unless it is signed by the Cashier and the Agent/Acctt.

THE BANK OF BANKURA LTD.

CURRENT A/C,
No. ________

Cheques only. **Folio** ________ ________19

CREDIT ____________________

of ____________________

RUPEES ____________________

________ *as detailed below* :—

Cheque No.	DRAWEE	Rs.	As.	P.
	TOTAL Rs.			

Cashier, *Agent/Acctt.* *L. Keeper.* *By* ____________

চেক্ জমা দিবার স্লিপ

This receipt is not valid unless it is signed by the Cashier

BANK OF BANKURA LTD.

CURRENT

__________ *Branch*

Cash only __________ 19 .

CREDIT __________

of __________

RUPEES __________

__________ as detailed below :—

G.C. Notes Rs. 100 each			
,, 10 ,,			
,, 5 ,,			
,, 2 ,,			
Silver & 1 Rupee notes,			
Coins.			
Total Rs.			

Cashier. By __________

This receipt is not valid unless it is signed by the Cashier

BANK OF BANKURA LTD.

CURRENT A/C.

__________ BRANCH. NO. __________

Cash only. Folio No. __________ __________ 19 .

CREDIT __________

of __________

RUPEES __________

__________ *as detailed below* :—

G. C. Notes : at Rs. 100 each			
,, 10 ,,			
,, 5 ,,			
,, 2 ,,			
Silver & 1 Rupee notes,			
Coins.			
TOTAL Rs.			

Cashier. Agent/Acctt. L. Keeper. By __________

নগদ টাকা ও নোট জমা দিবার স্লিপ

টাকার দরকার হইতে পারে, সেজন্য উহাদের পক্ষে এই হিসাব সুবিধাজনক।

৫।

ব্যাঙ্কের ছাপানো ফর্মে চেক্, নোট বা টাকা সবই লিখিয়া জমা দিতে হয়। জমা দিবার দুই রকম ফর্ম (Pay-in slip) আছে এবং এই দুই রকম ফর্মই বাঁধানো আকারে থাকে—চেক্ জমা দিবার জন্য একটি এবং টাকা ও নোট জমা দিবার জন্য আর একটি। যে টাকা জমা দেয় সে টাকার পরিমাণ, তারিখ ও নিজের সহি ফর্মের উপর লিখিয়া দিবে। টাকা জমা হইলে পর ব্যাঙ্কের কর্মচারী ব্যাঙ্কের সীল (Seal) সহ 'Received' কথাটি লিখিয়া দেয়। উহার একটি অংশ ব্যাঙ্কে থাকে এবং অপর অংশটি (Counter foil) জমাকারী নিজে রাখিয়া দেয়। জমাকারী এই অংশের সাহায্যে তাহার পাশ বই (Pass book) মিলাইয়া দেখিতে পারে।

মেয়াদী জমা (Fixed deposit)—এই প্রকারের হিসাবে সুদের পরিমাণ বেশী পাওয়া যায়। তবে ইহা ইচ্ছামত তোলা যায় না। এক বৎসর কি ছয় মাস অন্তর টাকা তোলা যায়। সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুদের হার লেখা থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে সুদসমেত আসল তুলিতে হয়। ইহার পরে আর সুদ দেওয়া হয় না। মেয়াদী জমাতেও ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ফর্মে আগে টাকার অঙ্ক, কত সময়ের জন্য মেয়াদী জমা ও অন্যান্য বিষয়াদি লিখিতে হয়।

সেভিংস্ হিসাব (Savings Account)—গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকদের ইহাতে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সেভিংস্ হিসাবে চার আনা হইতে আরম্ভ করিয়া যত টাকা ইচ্ছা জমা রাখা যায়। ইহাতে সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক, তবে মেয়াদী জমা হইতে অনেক কম। চলতি হিসাবে বেশী টাকা জমা দিতে হয় বলিয়া

সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকা সপ্তাহে একবার তোলা যায়। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে চেকের সাহায্যে অথবা পে-ইন্ স্লিপ, (Pay-in slip)এর সাহায্যে টাকা উঠান যায়। চেক্ বা ফর্মে তারিখ, টাকার পরিমাণ সব লেখা থাকে।

হোম্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (Home Savings Bank)—'গৃহে সঞ্চয়' বা 'হোম্ সেভিংস্' নামে ব্যাঙ্কে আরও একটি হিসাব-পদ্ধতি আছে। ব্যাঙ্ক হইতে একটি তালাবন্ধ সচ্ছিদ্র বাক্স গৃহস্থকে দেওয়া হয়। নিজের দৈনন্দিন খরচ হইতে কিছু অংশ বাঁচাইয়া গৃহস্থ তাহা ঐ বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। প্রতিদিন এইভাবে সঞ্চয় করার ফলে মাসের শেষে কিছু টাকা জমে। তারপর ঐ ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ঐ টাকা গুণিয়া জমাকারীর নামে জমা করিয়া নেন। বাক্স তালাবন্ধ থাকাতে গৃহস্থ ইচ্ছামত টাকা তুলিয়া খরচ করিতে পারে না। গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ইহাতে বেশ সুবিধা হয়।

চলতি হিসাব, সেভিংস্ ও মেয়াদী জমা—এই তিন প্রকারেই ব্যাঙ্কে নিরাপদভাবে টাকা জমা রাখা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে টাকা কি ভাবে উঠান যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

ফর্ম (Pay-in slip)এর সাহায্যে যেমন টাকা জমা দেওয়া যায় সেইরূপ টাকা উঠানও যায়। ব্যাঙ্কের টাকা উঠাইবার ফর্মে (Withdrawal form), টাকার অঙ্ক লিখিয়া সহি (Signature) করিয়া জমাকারী টাকা উঠাইতে পারে। অনেকে এই উপায়ে টাকা তোলা সহজ-সাধ্য নয় বলিয়া চেকের ব্যবহার করিয়া থাকে।

চেক্—যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা হয় জমাকারীকে বা জমাকারীর মনোনীত ব্যক্তিকে টাকা দিবার জন্য ঐ ব্যাঙ্কের উপর

The Central Bank of India, Ltd.

Name Renuka Roy

A/c No. 5789

Date 25.1.62

Notes ...	15	-
Silver ...	-	25
Cheques	-	-
	-	-
	-	-
Rs.	15	25

Rupees fifteen and twentyfive N.P.

Receiving Cashier.

"Home Savings Safe"

PARTICULARS OF PAYMENT IN THE "HOME SAVINGS SAFE" ACCOUNT.

Notes ...	15	-
Silver ...	-	25
Cheques	-	-
	-	-
	-	-
Total Rs.	15	25

Account No. 5789

THE CENTRAL BANK OF INDIA, LIMITED.

200/2C, Rash Behari Avenue,

Calcutta, 25. 1. *19*62

Paid-in to the credit of Renuka Roy

the sum of Rupees fifteen and twentyfive N.P.

By

Entd. ______ *Cashier* ______ *Folio* ______ *Ledger-keeper.*

হোম সেভিংস্ সেফ্ (Safe)-এর টাকা জমা করার স্লিপ

জমাকারীর হুকুমনামাকেই 'চেক্' বলা হয়। জমাকারীকে ব্যাঙ্ক হইতে পুস্তকাকারে বাঁধানো ছোট চেক্ বই বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ইহাতে ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট নম্বরের পর পর নম্বর দেওয়া থাকে। পে-ইন্ স্লিপ (Pay-in slip)-গুলিতে এবং তাহাদের মুড়িগুলিতে (Counter-foil-এ) সমস্ত বিষয় ছাপানো থাকে। টাকার পরিমাণ, তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া নীচে ব্যাঙ্কে দেওয়া নাম-সহির নমুনা অনুযায়ী সহি করিয়া দিলেই উহা হুকুমনামায় পরিণত হইল এবং ঐ অংশটি লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেই টাকা পাওয়া যায়। জমা-ফর্মের ন্যায় চেকেরও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাকী অংশটিতে টাকার পরিমাণ, তারিখ, যাহাকে দেওয়া হইল তাহার নাম প্রভৃতি লিখিয়া রাখিতে হয়।

চেক্ সাধারণতঃ তিন প্রকার।

(১) **বেয়ারার চেক্** (Bearer cheque)—প্রত্যেক চেকের উপর ইংরেজীতে 'Pay' অর্থাৎ 'টাকা দাও' এই কথা লেখা থাকে। এই শব্দের পর যাহার নামে চেক্ কাটা হইবে তাহার নাম লিখিবার নিয়ম। ঐ লাইনের শেষ প্রান্তে লেখা থাকে 'অথবা বাহককে' (or Bearer)। কেবলমাত্র গ্রহীতার নাম লিখিয়া উহার পরে 'অথবা বাহককে' (or Bearer) এই শব্দ দুইটি-সহ দাতার নাম সহি করিয়া ব্যাঙ্কে ছাড়িয়া দিলে উহা 'বেয়ারার চেক্' হইল। গ্রহীতা ছাড়া আর যে কোন লোক চেক্ দিয়া টাকা উঠাইয়া আনিতে পারে। যে টাকা উঠাইবে, চেকের পিছনে তাহার নাম সহি করিলেই চলে।

(২) **অর্ডার চেক্** (Order cheque)—ইহাতে যাহার নামে টাকা লেখা হয় সে-ই কেবল সহি করিয়া টাকা উঠাইতে পারে, অন্য কেহ পারে না। ইহাতে 'অর বেয়ারার' (or Bearer)

CLS/25 No. A057590

Rs. ....

Name ....

Last Balance ....
Deposit ....
Total ....
Withdrawn ....
Balance ....

Date ....

A/C ____

CLS/25 No. A057590

CALCUTTA .... 19..

United Bank of India Ltd.

COLLEGE STREET BRANCH

Fol.

Pay ________ or Bearer

Rupees ________

Entd.

Rs. ________

বেয়ারার চেক

কথাটি কালি দিয়া কাটিয়া দাতার একটি ছোট সহি তাহার নীচে দিতে হইবে। অনেক চেক্ বহিতে আবার গ্রহীতার নামের লাইনের শেষের দিকে by Order or Bearer লেখা থাকে; or Bearer কথাটি কাটিয়া সহি করিয়া দিলেই উহা 'অর্ডার চেক্' হইল। অর্ডার চেক্ ভাঙ্গাইতে যদি গ্রহীতা নিজে না যায় তবে অপরকে দিয়া চেকের পিছনে গ্রহীতার নাম-সহির নমুনা অনুযায়ী সহি করাইয়া ব্যাঙ্কে পাঠাইলেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়া যাইবে।

(৩) **ক্রস্ড্ চেক্** (Crossed cheque)—এই প্রকার চেক্ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইহাতে জাল-জুয়াচুরির সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণ চেকের বাম দিকে উপরের কোণে কোণাকুণি করিয়া সমান্তরাল ভাবে কালি দিয়া দুইটি লাইন টানিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কোং (& Co) কথা দুইটি লিখিয়া এবং বাকী জায়গায় অন্যান্য চেকের মত টাকার অঙ্ক, তারিখ, নাম ইত্যাদি যথাযথ ভাবে লিখিয়া দিলেই 'ক্রস্ড চেক্' হইল। 'ক্রস্ড্ চেক্' 'বেয়ারার চেক্' বা 'অর্ডার চেক্'এর মত যখন তখন ভাঙ্গান চলে না। ক্রস্ড্ চেকে টাকা পাইতে অন্ততঃ ৪।৫ দিন সময় লাগে।

ক্রস্ড্ চেক্ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে তাহার একাউণ্ট (account) থাকিলে ক্রস্ড্ চেকের পিছনে নিজের নাম সহি করিয়া নিজ ব্যাঙ্কে জমা দেয়। ব্যাঙ্ক তাহাকে চেক্ জমা দিবার দরুন টাকার অঙ্ক সমেত একটি রসিদ দেয়। পরে এই ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্কের উপর দাতার দেয় চেক্ কাটা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্ক হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া লয়। মনে কর তোমার স্টেট্ ব্যাঙ্কে (State Bank-এ) টাকা গচ্ছিত আছে। একজন ব্যবসায়ী মাল বিক্রয় করিয়া তোমার নিকট ৩০০৲ টাকা পায়। তুমি

CLS/25 No. A057590

Rs. 10=00

Name A. K.

Sarker & Co

Last Balance

Deposit

Total

Withdrawn

Balance

Date 25·1·62

& Co.

UNITED BANK OF INDIA LTD.

A/C

Fol.

Entd.

CLS/25 No. A057590

CALCUTTA 25. 1. 1962

United Bank of India Ltd.

COLLEGE STREET BRANCH

Pay A. K. Sarker & Co or ~~Bearer~~ Order

Rupees Ten only

Rs. 10=00

R. Sen

ক্রসড্ চেক

ব্যবসায়ীর নামে স্টেট্ ব্যাঙ্কের একটি ৩০০৲ টাকার ক্রস্‌ড্ চেক্ দিলে। সে ঐ চেক্‌খানি লইয়া পিছনে নাম সহি করিয়া জমা-ফর্মে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি লিখিয়া তাহার যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে সেই ব্যাঙ্কে জমা দিবে। যদি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কে তাহার টাকা থাকে তবে ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক সেই চেক্ গ্রহণ করিবে। ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক স্টেট্ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আদায় করিয়া ব্যবসায়ীর নামে তাহা জমা করিবে। আর ব্যবসায়ীর যদি ব্যাঙ্কের কোন হিসাব না থাকে তবে ব্যাঙ্কের সহিত লেন-দেন আছে এরূপ কোন ব্যক্তির নামে ঐ চেক্‌খানি এণ্ডোর্স (Endorse) করিয়া দিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি তখন এণ্ডোর্স-করা চেক্‌খানি পূর্বোক্ত উপায়ে নিজের হিসাবে জমা করিয়া পরে ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবে। এণ্ডোর্স করিতে হইলে চেকের অপর পৃষ্ঠায় 'Pay to' লিখিয়া উহার নীচের লাইনেই যাহাকে এণ্ডোর্স করা হইল তাহার নাম লিখিতে হয় ও তারিখ দিতে হয়।

নির্দিষ্ট সময় ৩—৬ মাস পর্যন্ত চেক্ না ভাঙ্গাইলে পুনরায় চেক্ লিখিয়া আনিতে হয়। সেভিংস্ একাউণ্টে (Savings account) নিজের নামে চেক্ জমা হইতে পারে। অন্য নামের চেক্ জমা করিতে অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। একমাত্র কারেণ্ট একাউণ্টেই সব চেক্ জমা হয়।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহাদের কয়েকটির ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ

ড্রয়ার (Drawer)—ইহা দ্বারা তাহাকে বুঝায় যে টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে অর্থাৎ যে ব্যাঙ্কের চেক্ কাটিতেছে। একমাত্র টাকা গচ্ছিতকারীরাই চেক্ কাটিতে পারে।

ড্রয়ী (Drawee)—যাহাকে চেকের লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার জন্য অনুরোধ করা হয় তাহাকে বলে ড্রয়ী; এককথায় ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে ড্রয়ী বলা হয়।

পেয়ী (Payee)—যাহাকে চেকের মারফত টাকা দেওয়া হয় তাহাকে পেয়ী (Payee) বলিয়া গণ্য করা হয়।

চেক্ গ্রহণ করা ও চেক্ কাটা—চেক্ গ্রহণ ও কাটা সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইবে।

চেক্ গ্রহণ—(১) যথেষ্ট পরিচিত না হইলে কাহারও নিকট হইতে চেক্ গ্রহণ না করাই শ্রেয়। অনেক সময় বহু প্রতারক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা না রাখিয়া চেক্ কাটিয়া থাকে।

(২) কাটাকুটি বা অস্পষ্ট লেখাযুক্ত চেক্ সহজে গ্রহণ করিবে না, কারণ কাটাকুটি থাকিলে সেই চেক্ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিবে না।

(৩) চেক্দাতা গ্রহীতার নামের বানানের অনুরূপ বানান চেকে লিখিয়াছে কি না ইহাও দেখিতে হইবে।

(৪) চেক্ লইবার সময় উহার তারিখ ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইবে। পরবর্তী তারিখযুক্ত চেক্ গ্রহণ না করাই যুক্তিযুক্ত।

চেক্ কাটা—(১) চেক্ বা ব্যাঙ্কের কোন কাগজপত্রে সংক্ষেপে নাম সহি করিতে নাই।

(২) সর্বদা কালিতে চেক্ লিখিতে হইবে—যেন কোনরূপ কাটাকুটি না থাকে।

(৩) নীচে নাম সহি করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে উহার বানান ও লিখনভঙ্গি ব্যাঙ্কে জমা রাখা নাম-সহির নমুনা অনুযায়ী হয়। একরকম সহি না হইলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দেওয়া হইবে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্যাঙ্ক যে আমাদের সুদ দেয় ইহাতে

ব্যাঙ্কের কি স্বার্থ আছে। ব্যাঙ্ক টাকা জমাকারীদের যে সুদ দেয় তাহার হার অতি কম। শতকরা ৩-৪ টাকার বেশী সুদ বোধহয় খুব কম ব্যাঙ্কেই আছে। ব্যাঙ্ক জমাকারীদের কাছ হইতে টাকা লইয়া ব্যবসায়ীদের অধিকতর প্রয়োজনে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। এই ভাবে ব্যাঙ্কের লাভ হয়। আর ব্যাঙ্কের টাকার সাহায্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

পোস্ট অফিস ঃ

ব্যাঙ্কের সেভিংস্ একাউন্টের মত পোস্ট অফিসের সেভিংস্ হিসাব আছে। পোস্ট অফিসের সুদের হার কম। তবে পুরাপুরি গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া এখানে টাকা বেশ নিরাপদে রাখা যায়। পোস্ট অফিসের আইন অনেকটা ব্যাঙ্কের আইনের অনুযায়ী। নমুনার সহিত সহি মিলিলেই টাকা দেওয়া হয়। এক টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন পরিমাণ টাকা রাখা যায়।

পাশ বুক ঃ—টাকা উঠাইবার সময় ব্যাঙ্কের ন্যায় পোস্ট অফিসের পাশ বহিতে ঐ টাকার সংখ্যা, উঠাইবার তারিখ ইত্যাদি লেখা হয়। পাশ বহিতে টাকা জমা দেওয়ার বা তুলিবার তারিখ সহ সীল (Seal) দেওয়া হয়। সেভিংস্ বিভাগ হইতেই পাশ বহি, টাকা তুলিবার ফর্ম ইত্যাদি দেওয়া হয়; ইহার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না।

জীবন বীমা ঃ

মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে জীবন বীমায় টাকা গচ্ছিত রাখা বিশেষ সুবিধাজনক। বীমার দুইটি উদ্দেশ্য ঃ—(১) ইহাতে টাকাটা সহজেই সঞ্চিত হয়, কারণ বাধ্য হইয়া মাসে মাসে, তিন মাসে বা ছয় মাসে অথবা এক বছরে বীমা কোম্পানীকে প্রিমিয়াম

(Premium) পাঠাইতেই হয়। বীমাকারীর নিজের স্বার্থেই ইহা করিতে হয়। ব্যাঙ্কে টাকা থাকিলে প্রয়োজনবোধে টাকা যে কোন সময় উঠাইয়া লইতে পারা যায়। বীমা কোম্পানীও অবশ্য প্রয়োজন হইলে ধার দেয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা আবার পরিশোধ করিতে হয়।

(২) ইহা জীবনের ঝুঁকি (Life risk) গ্রহণ করে। একটা প্রিমিয়াম দিয়াও যদি বীমাকারী মারা যায় তাহার ছেলেমেয়েরা যে পরিমাণের টাকা ইনসিওর (Insure) করা হয়, তাহা সমস্তই একসঙ্গে পায়। তবে এক বৎসরের মধ্যে আত্মহত্যা করিলে বীমাকারীর টাকা তাহার মনোনীত প্রার্থীরা পাইবে না।

বীমা কোম্পানীর নাম ইনস্যুরেন্স কোম্পানী (Insurance company), বীমাকারীকে পলিসি হোল্ডার (Policy holder) আর বীমার চুক্তিপত্রকে পলিসি (Policy) বলা হয়। পলিসিতে সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাহা লেখা থাকে। তবে যেগুলি 'পলিসি উইথ্ প্রফিটস্' (Policy with profits), সেগুলির বোনাস (Bonus) জমাকারীর নামে জমা থাকে এবং তাহাকে জানানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সমস্ত বোনাস সহ টাকা পাওয়া যায়। অনেক পলিসিতে বয়সের প্রমাণ লিখিত থাকে। তবে বীমা করিতে উত্তম স্বাস্থ্যসম্পন্ন হওয়া দরকার। রুগ্ণ ব্যক্তির জীবন বীমা হয় না; কোন কোন ক্ষেত্রে হইলেও বেশী প্রিমিয়াম দিতে হয়।

বীমা অনেক প্রকার আছে; তন্মধ্যে প্রধানতঃ দুই প্রকার— (১) মেয়াদী বীমা (Payable at matuiity) অথবা এনডাওমেণ্ট পলিসি (Endowment policy), (২) আজীবন বীমা বা Whole life policy.

মেয়াদী বীমা—ইহা বীমাকারী নিজের জীবদ্দশায় (বেশীর ভাগ) ভোগ করিয়া থাকে। যদি বীমাকারী চুক্তিমত নির্দিষ্টকালের পূর্বেই মারা যায় তবে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী বীমার টাকা লাভ করে।

আজীবন বীমা—বীমাকারীর মৃত্যুর পর তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী যাহাতে টাকাটা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যায়। ইহাই আজীবন বীমা (Whole life policy)।

বর্তমানে আরও অনেক প্রকারের পলিসি হইয়াছে—যথা, ম্যারেজ স্কীম (Marriage scheme); এডুকেশন পলিসি (Children's education policy), ডেফার্ড এ্যান্নুয়িটি (Deferred annuity), হোল লাইফ এণ্ড লিমিটেড পেমেণ্ট।

ন্যাশানাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট—ন্যাশানাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট আর কিছুই নয়—গচ্ছিত টাকার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সুদসহ টাকা ফিরিয়া পাইবার একরূপ প্রতিশ্রুতি-পত্র। পোস্ট অফিস বা ব্যাঙ্কের মারফত জনসাধারণ এই সুবিধা লাভ করিয়া থাকে।

প্রাইজ বণ্ড—টাকা গচ্ছিত রাখিবার আর এক প্রকার ব্যবস্থা অধুনা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাইজ বণ্ড। প্রাইজ বণ্ডগুলি ৫৲ টাকার এবং ১০০৲ টাকার আছে। পাঁচ বৎসর পর এই টাকা সুদ ছাড়া ফেরৎ পাওয়া যায়। সরকারের পক্ষ হইতে প্রতি বৎসর যে কয়েক বার লটারী করা হয়, এই প্রাইজ বণ্ড-ক্রেতাদের ক্রীত বণ্ডগুলি তাহাতে স্থানলাভ করে। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে পুরস্কার বাবদ মোটা টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার বা অংশীদার হইলে বেশ মোটা রকমের ডিভিডেণ্ড পাওয়া যায়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মাসিক বাজেটের নমুনা

পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন (স্বামী, স্ত্রী আর পাঁচ বৎসরের ও দুই বৎসরের দুইটি সন্তান)।

আয় বা জমা (Income বা Credit)		ব্যয় বা খরচ (Expenditure বা Debit)	
মাসিক আয়—	৩৫০৲	খাদ্য (দুধ ও টিফিন সহ)—	১৪৫৲
		জ্বালানি—	৮৲
		পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়, মেরামতি ও কাচানোর ব্যয়—	২০৲
		বাড়ীভাড়া—	৫৫৲
		ইলেক্‌ট্রিক আলো ইত্যাদির ব্যয়—	৮৲
		শিক্ষা—	১৫৲
		চিকিৎসাদির ব্যয়—	১০৲
		খবরের কাগজ—	৫৲
		আমোদ-প্রমোদ, সামাজিক পূজা-পার্বণ, উৎসব, লৌকিকতা ইত্যাদির ব্যয়—	২৮৲
		ঝি-চাকরের বেতন—	১৪৲
		যাতায়াত, ভ্রমণ ইত্যাদি—	১৪৲
		ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম—	১৮৲
		জমা—	১০৲
			৩৫০৲

শখ বা প্রিয় বিষয়ঃ তাহার দ্বারা আয় বাড়ানো এবং বিশ্রামের সদ্ব্যবহার (Hobbies for supplementing family income and wise use of leisure)

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে কোন শখ (hobby) বা প্রিয় বিষয় থাকে যাহার অনুশীলনে সে আনন্দ পায়। সাধারণতঃ অবসর সময়েই মানুষের নিজের শখ মিটাইবার আকাঙ্ক্ষা হয়। সমস্ত দিনের অবসাদের পর নিজের খেয়াল-খুশিমত কাজ করিয়া সময়ও কাটে ভাল এবং ক্লান্তিও দূর হয়। এই অবসর সময়ের কাজের দ্বারা কোন কিছু তৈয়ারী করিতে পারিলে মানুষের মনে সৃষ্টির আনন্দ ও তৃপ্তি আসে।

প্রত্যেক মানুষেরই শখ বা রুচি বিভিন্ন। স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা, সেলাই করা, গান-বাজনার চর্চা করা, বই পড়া, চিত্রাঙ্কন করা, বাগান করা, রান্না করা, বাঁশ ও বেতের কাজ করা অর্থাৎ নানারূপ কুটির-শিল্প উৎপাদন করা, চরকায় সূতা কাটা, খেলনা তৈয়ারী করা, ঘরসাজান, সাহিত্যালোচনা ও বই লেখা, ভ্রমণ করা, ফটো তোলা, নানারূপ খেলাধূলা করা, পুরানো জিনিস সংগ্রহ করা, আমোদ-প্রমোদ ও গল্প-গুজব করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শখ, বিভিন্ন রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্রামের সময় নিজের শখ মিটাইবার জন্য কাজ করিলে বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না, অথচ একটা প্রয়োজনীয় কাজও হয়। এই সৃষ্টি মানুষকে প্রচুর আনন্দ দেয়।

স্ট্যাম্প সংগ্রহ করিয়া এলবাম (Album) করিলে নানা দেশ-বিদেশের, নানা সময়ের অনেক চিত্তাকর্ষক খবর পাওয়া যায় এবং ইহার সাংস্কৃতিক মূল্যও অনেক। প্রয়োজন বোধ করিলে অনেক সময় এই এলবাম চড়া দামে বিক্রয়ও হয়।

সেলাই নানা রকম হইয়া থাকে। এমব্রয়ডারি, টেলারিং, উলের কাজ, লেস বোনা, টেবিল ক্লথ, বেড কভার ইত্যাদিতে নানারূপ নকশা তৈয়ারী করা সবগুলিই সেলাইয়ের অন্তর্গত।

এমব্রয়ডারি কাজ করিয়া, জামা তৈয়ারী করিয়া, উলের জামা তৈয়ারী করিয়া, লেস বুনিয়া এবং টেবিল ক্লথ ইত্যাদিতে নকশা আঁকিয়া নিজেদের শখ ও প্রয়োজন যেমন মিটান যায়, তেমনি আয়ও বেশ হয়। আজকাল অনেক মেয়ে অবসর সময়ে এই কাজ করে এবং বাজারে বিক্রয় করিয়া বেশ রোজগার করিতেছে। সেলাইয়ের মেসিনের সাহায্যে অতি দ্রুত সেলাই হয় বলিয়া অনেক সুবিধা হইয়াছে। এমব্রয়ডারি মেসিনেও অনেক বড় বড় বেড কভার, টেবিল ক্লথ ইত্যাদিতে নকশা করিয়া বিক্রয় করা চলে। তবে হাতে তৈয়ারী জিনিসের সৌন্দর্য আলাদা, তা ছাড়া এগুলি বেশী টেকসই হয়।

এমব্রয়ডারি কাজ

উলের মোজা, টুপি, সোয়েটার, পুলোভার ইত্যাদি বোনা এবং লেসের কাজ গল্প করিতে করিতেও করা যায়, হয়ও খুব তাড়াতাড়ি। ইহা বিক্রয় করিয়া লাভও হয় প্রচুর। যাহারা ইহা করিতে ভালবাসে তাহারা বাসে ট্রামে যাতায়াত করিবার সময়ও করিতে থাকে, অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা কখনও সময় নষ্ট করিতেন না। অবসর সময় অলসভাবে না কাটাইয়া তাঁহারা সুন্দর সুন্দর নকশার সাহায্যে কাঁথা সেলাই করিতেন। তাঁহাদের অবসর সময়ে তৈয়ারী কাঁথা আজ কাঁথা-শিল্প রূপে আমাদের অমূল্য ঐতিহ্য বলিয়া পরিগণিত, অথচ ইহার জন্য কোন খরচ করিতে হইত না। পুরানো কাপড় ও পুরানো পাড়ের সূতার সাহায্যেই তাঁহারা সুন্দর সুন্দর কাঁথা তৈয়ারী করিতেন। এইগুলি গায়ে দিতে খুবই আরামদায়ক, সেজন্য শীতের দিনে অনেকেই গায়ে দিত। এই কাঁথা সৌন্দর্যে সকলকেই মুগ্ধ করিত, এজন্য বেশ উচ্চমূল্যে এইগুলি বিক্রয়ও হইত। অনেকে আবার চরকায় বা তক্‌লিতে সূতা কাটিয়া বেশ উপায় করিতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজকাল এই দুইটি শিল্পই লুপ্তপ্রায়।

অকেজো কাগজের মণ্ড তৈয়ারী করিয়া, পুরানো কাপড় ও তূলার সাহায্যে নানারূপ পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী করিয়াও অনেকে অবসর সময়ে বেশ আয় করিয়া থাকেন। যাঁহাদের হাতের কাজ সুন্দর তাঁহারা নিজের খুশিমত মাটির খেলনা, মূর্তি ইত্যাদি তৈয়ারী করেন। এইগুলি বাজারে বিক্রয় করিয়াও বেশ রোজগার হয়।
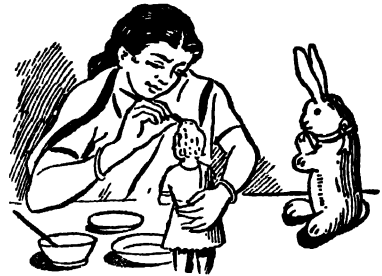
অকেজো কাগজ, তূলা ও পুরানো কাপড়ের দ্বারা পুতুল তৈয়ারী

যাঁহাদের গান-বাজনা করার শখ আছে তাঁহারা গান করিয়া ও বাজাইয়া নিজেও আনন্দ পান, অপরকেও আনন্দ বিতরণ করেন। গান-বাজনায় পরিবেশ এত সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠে যে, সেখানে

সকলেই পরমানন্দে মগ্ন হয়। রেডিওতে, নানা জলসা ও আসরে গান গাহিয়া বা বাজনা বাজাইয়া অর্থাগম হইতে পারে এবং খ্যাতি লাভও হয়। সঙ্গীত মানুষের মনের শোক-দুঃখ অপনোদনে বিশেষ ফলপ্রসূ।

বই পড়াও একটি অত্যুৎকৃষ্ট শখ। মহৎ ভাবের ভাল ভাল বই পড়িলে জ্ঞানের পরিধি ও ভাবের প্রসারতা বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন মনীষীর ও বিভিন্ন দেশের ভাব ও আদর্শের বিনিময়ে পরস্পরের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। যাঁহাদের লিখিবার শখ ও ক্ষমতা আছে তাঁহারা বই পড়িয়া লাভবান হন অনেক বেশী। কারণ বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন রুচি ও ভাবধাবার সহিত পরিচিত হইতে হইলে ভ্রমণ যেমন সহায়ক, বই পড়াও কম নয়। বিভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি জানিবার পক্ষে ভ্রমণ যেমন সহায়ক, বই পড়াও তদ্রূপ।

বই পড়িয়া নানা প্রকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমালোচনা করার দক্ষতা বাড়ে। সমালোচনা-সাহিত্যও সাহিত্যের একটি প্রধান স্থান জুড়িয়া আছে। গল্প, কবিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই লিখিয়া যেমন অর্থোপার্জন করা যায় তেমনি সমালোচনা-সাহিত্যের দ্বারাও উপার্জন করা যায়।

ছবি আঁকাও কাহারও কাহারও শখ থাকে। ছবি আঁকা একটি উঁচুদরের আর্ট। শিল্পী তাঁহার নিজের খেয়ালমত আঁকিয়া যান, তাহা তাঁহার মনের ও কল্পনার খোরাকও যেমন যোগায় তেমনি অর্থোপার্জনও হয়। এক একখানা ছবি অনেক দামে বিক্রয় হয়। যাঁহাদের খুব ভাল আঁকার হাত তাঁহাদের তো কথাই নাই—একটু যাহারা আঁকিতে পারে তাহারা পট পেণ্টিং, ফুলদানি, পিঁড়ি, ডালা-কুলা চিত্র করিয়া নিজেদের মনের খেয়াল ও শখ

মিটাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা বিক্রয় করিয়া রোজগারও করিতে পারে। আজকাল গৃহসজ্জায় এই সকল জিনিসের প্রচলন খুব বেশী।

চামড়ার কাজ করা অনেকের শখ থাকে। তাঁহারা নানা রকম সুন্দর সুন্দর মোড়া, টুল, ব্যাগ, লাইট-শেড, পেজ-মার্ক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে প্রচুর আয় করিতে পারেন। বাটিকের কাজ চামড়া ও কাপড় দুইয়ের উপরই হইতে পারে।

ইহা অতি উচ্চ ধরনের শিল্প। ইহা নিজের শখ মিটানের পক্ষে যেমন চমৎকার উপায়, উপার্জনের পক্ষেও তেমনি চমৎকার। কারণ বাটিকের কাজ করা চামড়ার জিনিস ও কাপড়ের জিনিস খুব চড়া দরে বাজারে বিক্রয় হয়।

অনেকে বেত, বাঁশ ও রাকিয়া ইত্যাদির ঝুড়ি, ঘর সাজাইবার ছোট ছোট থালা, মোড়া ও অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী করিতে ভালবাসে। এইগুলি বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করা যায়।

ঘর সাজান এক একজনের, বিশেষ করিয়া অধিকাংশ মেয়েদেরই শখ থাকে। ইহা গৃহের পরিবেশ মনোরম করিয়া গৃহে শুচি-স্নিগ্ধ ভাব আনিতে সাহায্য করে। আজকাল ঘর সাজানের প্রতি অধিকাংশ গৃহিণীই মনোযোগ দিতেছেন। ইহা মনের মালিন্য দূর করিয়া আনন্দের খোরাক যোগায়।

বাগান করা সময় কাটাইবার এবং মনের জটিলতা দূর করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট শখ। ইহা প্রয়োজনের দিক হইতেও উৎকৃষ্ট। কারণ ফলফুল ও শাকসব্‌জীর বাগান করিতে পারিলে কিছুটা টাট্‌কা ফলমূল, শাকসব্‌জী পাওয়া সহজ হয়। তাহাতে যেমন

স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তেমনি মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। আর্থিক প্রয়োজন হইলে শাকসব্‌জী, ফলমূল বিক্রয় করিয়া তাহাও মিটান যায়। ফুলেব গাছ থাকিলে ফুল দ্বাবা ও ফুলেব মালা গাঁথিয়া নিজের শখ মিটানো ও ঘর সাজানো দুইই হয়; আবাব সেগুলি

ফুল-বাগানেব কাজ

বিক্রয় কবিতে চাহিলে তাহাতেও লাভ হয়। ঘব সাজানের পক্ষে ফুল অপবিহার্য।

কেহ কেহ বান্না কবিতে এবং লোককে খাওয়াইতে খুবই পছন্দ করেন। জলখাবার তৈয়ারী করা, নানা প্রকার রান্না করা, আচার, চাটনী, জ্যাম, জেলী, বড়ি, পাঁপর ইত্যাদি তৈয়ারী তাঁহাদের একটি বিশেষ শখ। এই সকল উপাদেয় খাদ্য আত্মীয়-পরিজনকে পরিবেশন

করিয়া তাঁহারা নিজেরা যেমন তৃপ্তি পান, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবেরাও তেমনি আস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করেন। এদিকে আচার, চাট্‌নী, জ্যাম, জেলী, পাঁপর ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় করিয়াও লাভ হইতে পারে।

ছবি তোলার (ফটোগ্রাফি) দিকে এক একজনের খুব ঝোঁক থাকে। ইহাও একটি উঁচুদরের শখ। যখন যেখানে যান সেখানকার প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেই জায়গার পুরানো কীর্তি ইত্যাদির ছবি তুলিয়া তাঁহারা আনন্দ পান প্রচুর। তা ছাড়া এই ছবির ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। এইগুলি মিউজিয়ামে, একজিবিশনে বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালের মূর্তি, মুদ্রা, লিপি, জিনিসপত্র ও পুঁথি সংগ্রহ করার শখ এক একজনের ঝোঁকে পরিণত হয়। ইহাও উঁচুদরের খেয়াল। ইহা সংগ্রহকারীকে প্রচুর আনন্দ দেয়, জনসাধারণকেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। এইগুলি মিউজিয়ামে এবং ধনী লোকদের বাড়ীতে সংরক্ষিত হয় এবং এই কারণে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়।

ভ্রমণ নানা রকমের হইয়া থাকে। অনেকের অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া একা একা ভ্রমণ করিবার শখ থাকে, আবার অনেকে দলবদ্ধ-ভাবে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। সাধারণতঃ স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে তাহাদের সামাজিক মেলামেশার সুযোগও থাকে, আবার স্থানীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাহারা শিক্ষালাভ করে। আবার অনেক সময় প্রমোদ-ভ্রমণ—যেমন বনভোজন ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ পরিবেশনের উদ্দেশ্যই প্রধান থাকে।

ইতিহাসবেত্তা, ভূগোলবিদ ও লেখকদের ভ্রমণ কিছুটা

তাঁহাদের শখ মিটানের জন্য, কিছুটা তথ্য আহরণের জন্য। তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যাদি সংকলন করিয়া তাঁহারা অর্থোপার্জন করিতেও পারেন।

খেলাধূলার শখ এক একজনের অত্যন্ত প্রবল থাকে। তাহারা খেলাধূলায় সময় অতিবাহিত করিতেই ভালবাসে। খেলাধূলা মনের ও দেহের দুইয়ের পক্ষেই বিশেষ উপকারী। খেলাধূলায় শরীর সুগঠিত ও স্বাস্থ্য সুন্দর হয় এবং মনও প্রফুল্ল থাকে। মনের প্রফুল্লতা মানুষের সকল বিষয়েই, সকল কাজেই একান্ত প্রয়োজন। খেলাধূলার সাহায্যেও আজকাল অনেক রোজগার হয়। কারণ বড় বড় খেলোয়াড় বিভিন্ন ক্লাবে খেলিয়া ও খেলা শিখাইয়া মোটা টাকা রোজগার করিয়া থাকেন।

গল্পগুজব করা, অভিনয় করা অনেকের শখ থাকে। গল্পগুজবের মাধ্যমে মনের প্রফুল্লতা বাড়ে, মনের ভার লাঘব হয়।

এই ভাবে নানা উপায়ে অবসর সময় যাপন করা বাঞ্ছনীয়। কারণ কাজের মাধ্যমে অবসর যাপন মানুষকে সৃষ্টির আনন্দ প্রদান করে, আবার আলস্য হইতে মুক্তি দেয়। অলস মস্তিষ্ক দুর্বুদ্ধির যোগায়—এইটি অনেক দিনের প্রবাদ। নিজের মনোনীত কাজ মানুষকে দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি দেয়, দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে।

সকল কাজের ভিতরেও সৎচিন্তা ও সৎআলোচনায় অবসর সময়ের কিছুটা যাপন করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কারণ জীবনের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন একান্ত আবশ্যক।

অনুশীলনী

1. What is a cheque ? What are its advantages ? (চেক্ কাহাকে বলে ? ইহার সুবিধা কি কি ?)

2. Write short notes on any one of the following—(a) Life Insurance. (b) Cash Certificate. [নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন একটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—(ক) লাইফ ইন্‌সিওরেন্স (জীবনবীমা), (খ) ক্যাশ সার্টিফিকেট।]

3. Make a budget plan for a family consisting of husband, wife and two children of 2 and 7 with an income of Rs. 350 per month and say how much he ought to spend on clothes, food and education. How much should he save ? (এক ব্যক্তি, তাহার স্ত্রী এবং ৭ বৎসরের ও ২ বৎসরের দুইটি সন্তান অর্থাৎ মোট ৪ জনের পরিবারে মাসিক ৩৫০৲ টাকা আয় সম্পন্ন এক ব্যক্তির পারিবারিক বাজেট তৈয়ারী কর এবং তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও শিক্ষায় কতটা ব্যয় করা উচিত তাহা লিখ। ঐ ব্যক্তির কতটা সঞ্চয় করা উচিত ?)

4. State the difference between a Current account and a Savings account in a Bank ? Point out their advantages and disadvantages ? (ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব এবং সেভিংস্ হিসাবের মধ্যে প্রভেদ কি ? উহাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি দেখাও।)

5. What are the principles of making a family budget ? What are the main factors that you should take into consideration in preparing such a budget ? ['পারিবারিক বাজেট' প্রস্তুত করিবার মূলনীতিগুলি কি ? এইরূপ একটি

বাজেট (আয়-ব্যয় বরাদ্দ) তৈয়ারী করিবার সময় তুমি কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিবে লিখ।]

6. Write a short essay on thrift and economy in the home. (মিতব্যয়িতা এবং গার্হস্থ্য জীবনে ব্যয়-সংক্ষেপ সম্বন্ধে একটা রচনা লিখ।)

7. What is Insurance ? State what form of Life Insurance you would prefer—Whole life or Endowments ? Justify your statement. [ইনস্যুরেন্স (জীবনবীমা) কাহাকে বলে ? হোল লাইফ অথবা এনডাউমেণ্ট—কি ধরনের ইনস্যুরেন্স তুমি পছন্দ কর এবং কেন পছন্দ কর লিখ।]

8. How does the budget of a poor, a middle class and a rich family differ from one another ? What are the factors that influence the budget of a family ? (দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের মাসিক খরচের আনুমানিক হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? কোন্ কোন্ অবস্থায় মাসিক খরচের আনুমানিক হিসাবের তারতম্য হয় ?)

9. Write short notes on any one of the following : (a) Crossed cheque, (b) Fixed deposit. [নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন একটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—(ক) ক্রস্‌ড চেক্, (খ) ফিক্সড্ ডিপোজিট।]

10. What is a cheque ? What are 'Bearer cheque' and 'Crossed cheque' ? What are their advantages and disadvantages ? (চেক্ কাহাকে বলে ? 'বেয়ারার চেক্' ও 'ক্রসড চেক্' বলিতে কি বোঝ ? ইহাদের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?)

11. Name and discuss some useful hobbies by which you can utilise your leisure to increase your family

income ? (কয়েকটি প্রয়োজনীয় শখের নাম ক'র এবং তাহাদের বিষয় বর্ণনা কর যাহাদের সাহায্যে অবসর সময়ে তোমার পরিবারের আয় বাড়াইতে পার ।)

12. (a) Why is planning necessary for good management —Discuss. (b) What are the rules for opening and maintaining a Bank account ? [(ক) সুপরিচালনার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন—বর্ণনা কর। (খ) ব্যাঙ্কের একাউণ্ট খুলিবার এবং টাকা রাখিবার নিয়ম কি ?]

13. What are the benefits of saving ? What form of saving will you recommend for a middle class family ? (সঞ্চয়ের উপকারিতা কি ? মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কি ধরনের সঞ্চয়-ব্যবস্থা তুমি অনুমোদন কর ?)

14. What are the different types of cheques ? What are their advantages and disadvantages ? (কত রকমের চেক্ আছে ? তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?)

15. What is leisure ? Discuss the value of spending one's leisure on books, music and painting. What else can one do with leisure ? (অবসর সময় বলিতে কি বোঝ ? বই পড়া, গান গাওয়া ও চিত্রাঙ্কন—অবসর বিনোদনে ইহাদের মূল্য কি আলোচনা কর। অবসর সময়ে আর কি করা যাইতে পারে ?)

16. Write short notes on any one of the following :— (a) National Savings Certificate, (b) Savings Bank Account. [নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন একটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—(ক) ন্যাশানাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট, (খ) সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট ।]

17. State briefly how you would use your leisure time wisely? (কি করিয়া তোমার অবসর সময় সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইবে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

18. What do you understand by family budget? What factors should you consider when planning it? (পারিবারিক বাজেট বলিতে কি বোঝ? বাজেট পরিকল্পনায় তুমি কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে?)

19. State the difference between a Savings account and a Current account. Why should cheques always be made payable to some person? How would you endorse a cheque? [সেভিংস্ একাউন্ট ও চলতি একাউন্টের মধ্যে পার্থক্য কি? চেক্ ব্যক্তি বিশেষের নামে লেখা উচিত কেন? কি ভাবে চেক্ এণ্ডোর্স করা হয়?]

তৃতীয় অধ্যায়

পুষ্টিকর খাদ্য ও রন্ধন-প্রণালী

খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

পূর্বে আমরা খাদ্য, খাদ্যের গুরুত্ব ও বিভিন্ন কার্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখন বিভিন্ন খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ, তাহাদের খাদ্যমূল্য ও কি কি উপায়ে আমরা তাহা পাইতে পারি সেই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

খাদ্যদ্রব্যকে প্রধানতঃ সাত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে— (১) কার্বোহাইড্রেট, (২) প্রোটীন, (৩) স্নেহ-জাতীয় পদার্থ, (৪) ভিটামিন, (৫) লবণ-জাতীয় পদার্থ, (৬) ছিবড়া জাতীয় পদার্থ, (৭) জল।

কার্বোহাইড্রেট Carbohydrate)

গাছের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামে এক প্রকার সবুজ পদার্থ আছে। ইহা সূর্যকিরণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এবং জলের সাহায্যে শ্বেতসার (Starch)-জাতীয় পদার্থ বা কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই শ্বেতসারের সঞ্চিত শক্তি সূর্যকিরণ হইতে দেহের ইন্ধন যোগায়। কার্বোহাইড্রেটকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) মনোস্যাকারাইড্‌স্ (Monosaccharides)

(২) ডাইস্যাকারাইড্‌স্ (Disaccharides)

(৩) পলিস্যাকারাইড্‌স্ (Polysaccharides)

মনোস্যাকারাইড্‌স্ : এই কথার অর্থ হইল এই যে, এই জাতীয়

কার্বোহাইড্রেটের অণুতে Mono মানে এক রকম চিনি জাতীয় পদার্থ থাকে ('Single Sugarness')। এই মনোস্যাকারাইডস্-গুলি দ্রবীভূত করা যায়। সম্পৃক্ত দ্রবণে ইহা স্ফটিক দানার মত (Crystalline—কেলাসিত) রূপ ধারণ করে। পাচকতন্ত্রের পাচক রস ইহাদের স্বাভাবিক ধর্মের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। গ্লুকোজ (Glucose), ফ্রুক্টোজ (Fructose), গ্যালেক্টোজ (Galactose), ম্যানোজ (Mannose) এই চারি প্রকার মনোস্যাকারাইড্স্ জীবদেহে গ্লাইকোজেন (Glycogen) নামে পদার্থ উৎপাদন করে এবং রক্তের স্বাভাবিক গ্লুকোজ উপাদানের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করে। এই মনোস্যাকারাইড্স্-গুলি এক শ্রেণীভুক্ত হইলেও প্রকৃতিতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ইহাদের পাইয়া থাকি এবং ইহাদের পুষ্টিমূল্যও বিভিন্ন ধরনের।

গ্লুকোজ (Glucose)—জীবদেহের রক্তের সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, রক্তের শতকরা এক ভাগ উপাদানের দশ ভাগের এক ভাগ গ্লুকোজ থাকে এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ (Fructose) ও সুক্রোজের (Sucrose) সঙ্গে ফলের রসের ভিতর সঞ্চিত থাকে। আঙ্গুরের প্রায় শতকরা ২০ ভাগই গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত। পেঁয়াজ ও কাঁচা আলুর ভিতরে বেশী পরিমাণ গ্লুকোজ আছে। অম্লরস অথবা দেহের স্বাভাবিক জারক রসের শর্করা-জাতীয় পদার্থের আর্দ্র-বিশ্লেষণ (Hydrolyses)* দ্বারা গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়।

গ্লুকোজ দেহের পুষ্টি সাধন করে ও শরীরের উন্নতির জন্য প্রয়োজনমত দেহের ক্ষয় সাধন ও ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। হজমতন্ত্র হইতে অধিক মাত্রায় গ্লুকোজ শোষিত হইলে ইহা

* জলের সহিত কোন বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়াকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ বলে।

গ্লাইকোজেন রূপে রূপান্তরিত হয় এবং দৈহিক প্রয়োজনমত পুনরায় ইহাকে গ্লুকোজে পরিবর্তন করা যাইতে পারে। প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতে গ্লুকোজ ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় পদার্থগুলি গ্লুকোজরূপে দেহের কোষ ও তন্তু বৃদ্ধির সহায়তা করে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় গ্লুকোজের জারণের (Oxidation) ফলে মানবদেহে অর্ধেক কর্মশক্তি (Energy) যোগান সম্ভবপর হইয়া থাকে।

ফ্রুক্টোজ (Fructose)—ফল ও গাছের রসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়, বিশেষ করিয়া মধুর মধ্যে ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। ইক্ষু চিনির (Cane sugar) আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে গ্লুকোজের সঙ্গে সমপরিমাণে ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। গ্লুকোজের মত ফ্রুক্টোজও গ্লাইকোজেন উৎপাদনের সহায়তা করে। লঘু ক্ষারজাতীয় (Alkali) পদার্থের দ্বারা গ্লুকোজকে ফ্রুক্টোজে ও ফ্রুক্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়।

গ্যালেক্টোজ (Galactose)—অম্ল-জাতীয় পদার্থ বা জারক রসের দ্বারা দুগ্ধ শর্করার আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মত গ্যালেক্টোজও পাওয়া যায়। অক্সিজেন-পরমাণুর তারতম্যের জন্য গ্লুকোজ ও গ্যালেক্টোজের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মেমারি গ্রন্থির (Mammary gland) ক্রিয়ার ফলে গ্লুকোজ প্রথমে গ্যালেক্টোজে রূপান্তরিত হয় এবং পরে ইহা ল্যাক্টোজে পরিণত হয়। ল্যাক্টোজের বহুরূপী রূপান্তর (Polymers) উদ্ভিদ্‌জগতে পাওয়া যায়। গ্যালেক্টোজ অনেক প্রোটীন-জাতীয় পদার্থের একটি উপাদানও বটে।

ম্যানোজ (Mannose)—কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় পদার্থের নগণ্য অংশ হইলেও ইহা অনেক প্রোটীনের ভিতর পাওয়া যায়।

ডাইস্যাকারাইড্‌স্ : এই জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের প্রত্যেকটি অণুকে দুইটি মনোস্যাকারাইড্‌স্ অণুতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর শর্করা-জাতীয় পদার্থের ভিতরে তিনটি বিশেষ পদার্থ থাকে—(১) সুক্রোজ (Sucrose)—ইক্ষু শর্করা অথবা বীট শর্করা হইতে পাওয়া যায় ; (২) ল্যাক্টোজ (Lactose)—দুগ্ধ শর্করা এবং (৩) মল্টোজ (Maltose)—মল্ট শর্করা।

সুক্রোজ—ইহা উদ্ভিদ্‌জগতে ব্যাপকভাবে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। শিল্পপদ্ধতিতে বীট চিনি, ইক্ষু ও তাল চিনি হইতে সুক্রোজ প্রস্তুত হয়। আনারস বা অনেক শ্রেণীর গাজরের ভিতরেও সুক্রোজ পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা তাহাদের খাদ্য ক্যালোরীর প্রায় ⅛ ভাগ সুক্রোজ হইতে লাভ করে। (১ কিলোগ্রাম জলকে ১° সেণ্টিগ্রেড উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে ক্যালোরী বলে।)

ল্যাক্টোজ—স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধে ইহা পাওয়া যায়। মনুষ্য-দুগ্ধে শতকরা ৬—৭ ভাগ এবং গরু ও ছাগলের দুগ্ধে শতকরা ৪.৫—৫ ভাগ লাক্টোজ পাওয়া যায়। ল্যাক্টোজের উপর অম্ল অথবা জারক রসের আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে ল্যাক্টোজের অণু ভাঙ্গিয়া একটি গ্লুকোজের অণু ও আর একটি গ্যালেক্টোজের অণুতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং ল্যাক্টোজ গ্রহণের ফলে আমরা সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও গ্যালেক্টোজ পাই। কোন কোন চিকিৎসক ও জীবাণুবিদ সুক্রোজ অপেক্ষা ল্যাক্টোজের ব্যবহার বেশী পছন্দ করেন। পাকস্থলীর উপর ইহা অনেক কম গাজন ক্রিয়া (Fermentation) সম্পন্ন করে। ইহার দ্রবণ-শক্তি কম বলিয়া পাকস্থলীর আবরণীর উপর ইহা প্রদাহের সৃষ্টি করে না। পরীক্ষা দ্বারা

প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেশী পরিমাণে ল্যাক্টোজ গ্রহণ করার ফলে কোন কোন লোকের ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্রিয়া বেশ ভালভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মল্টোজ—অঙ্কুরিত শস্য ও যব-জাতীয় উদ্ভিদে মল্টোজ পাওয়া যায়। মানবদেহে শ্বেতসার (Starch) হজম হইবার পূর্বে প্রথমে মল্টোজে পরিবর্তিত হয়।

মল্টোজ আহার করিলে দেহে শোষিত হয় না। ইহা হজম-তন্ত্রে ভাঙ্গিয়া গিয়া দুইটি গ্লুকোজের অণুতে রূপান্তরিত হয়। জীবের মুখের লালাগ্রন্থির জারক রস টায়ালিন (Ptyalin)-এর সাহায্যে অথবা অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) এমাইলোপসিন (Amylopsin) জারক রসের সাহায্যে শ্বেতসার অথবা ডেক্স্ট্রিন-জাতীয় পদার্থ মল্টোজে পরিবর্তিত হয়। লঘু জাতীয় খনিজ অম্লরস দ্বারা মল্টোজ আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া যায় এবং ইহার ফলে ইহা দুইটি গ্লুকোজ অণুতে রূপান্তরিত হয়।

পলিস্যাকারাইড্স্ঃ জটিল শর্করা-জাতীয় পদার্থ—বহু মনো-স্যাকারাইড্সের অণুর সমবায়ে গঠিত। তন্মধ্যে খাদ্য হিসাবে শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ, ডেক্স্ট্রিন, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ—অনেক উদ্ভিদ শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থকে কার্বোহাইড্রেট সংরক্ষণ হিসাবে দেহে সঞ্চিত রাখে। অনেক গাছের বীজে, মূলা, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতিতে বহুল পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়। শস্যবর্গের (cereals) $\frac{1}{2}$ হইতে $\frac{3}{4}$ অংশ শ্বেতসার দ্বারা গঠিত। আলুর প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ শ্বেতসারে পরিপূর্ণ। অপক্ক আপেল এবং কলাতে শ্বেতসার থাকে। পাকিবার সময় এই শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। শ্বেতসারের

দানাগুলি শীতল জলে অদ্রবণীয়। উত্তাপ প্রয়োগে শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ জল গ্রহণ করিয়া ফুলিয়া উঠে ও অর্ধদ্রবণে পরিণত
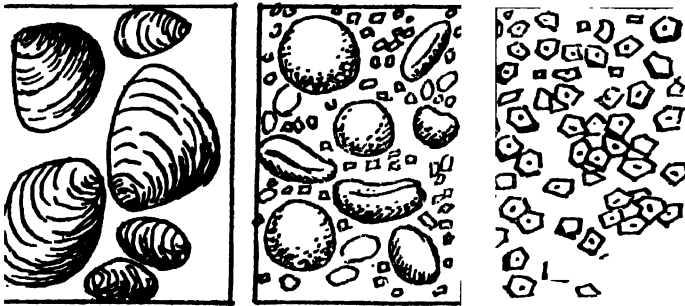
গোল আলু গম শস্য

[গোল আলু, গম ও শস্য হইতে উৎপন্ন শ্বেতসার-দানা]

হয়। এই অবস্থায় শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ বেশ সহজেই হজম করা যায়। হজম-প্রক্রিয়ার সময় এই শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিস্যাকারাইড্‌সে রূপান্তরিত হয়—যেমন ডেক্‌স্ট্রিন। এই ডেক্‌স্ট্রিন আবার ডাইস্যাকারাইড্‌স্ মল্টোজে পরিণত হয়। সর্বশেষে মল্টোজ গ্লুকোজে পরিণত হয়। শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থের হজমের শেষ পরিণতি গ্লুকোজেই দাঁড়ায়।

ডেক্‌স্ট্রিন—শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ দেহের জারক রস, অম্লরস ও উত্তাপের সাহায্যে ডেক্‌স্ট্রিনে রূপান্তরিত হয়। অঙ্কুরিত শস্যের ভিতর অল্প পরিমাণ ডেক্‌স্ট্রিন পাওয়া যায়। ডেক্‌স্ট্রিন শ্বেতসার অপেক্ষা জলে অধিক দ্রবণীয়। ডেক্‌স্ট্রিনের অণুগুলি শ্বেতসার-অণুর চেয়ে অনেক ছোট। লালারস ও অগ্ন্যাশয়ের রস দ্বারা ডেক্‌স্ট্রিন মল্টোজে পরিণত হয়।

গ্লাইকোজেন—শ্বেতসার যেরূপ উদ্ভিদদেহে কাজ করে গ্লাই-

কোজেনও জীবদেহে সেইরূপ কাজ করিয়া থাকে। ইহা একটি সাদা অনিয়তাকার বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন পদার্থ। জলে দ্রবীভূত হইলে ইহা কলয়েড (Colloid) দ্রবণ সৃষ্টি করে। বারবার পরিস্রাবণে তাহা দূরীভূত হয় না। গ্লাইকোজেনের জলীয় দ্রবণে অ্যালকোহল (Alcohol) দিলে নীচে তলানি পড়ে। আয়োডিনের সঙ্গে ইহা হল্‌দে, হল্‌দে বাদামী বা লাল রঙ ধারণ করে। গ্লাইকোজেনের আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে গ্লুকোজ পাওয়া যায়। গ্লাইকোজেন জীবদেহের সর্বাংশে, বিশেষ করিয়া যকৃতে অধিক মাত্রায় সঞ্চিত থাকে। কোন কোন জীবের মাংসপেশীতে গ্লাইকোজেন থাকে। বিশ্রামের সময় গ্লাইকোজেন দেহে সঞ্চিত হয় ও পেশীর কার্যে সাহায্য করে।

সেলুলোজ (Cellulose)—ইহা আঁশযুক্ত পদার্থ; উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে বা তন্তুতে অবস্থান করে। ইহা গ্লুকোজের একটি পলিস্যাকারাইড্ এবং শ্বেতসার অপেক্ষা বেশী প্রতিরোধক; কেবল রান্নার সাহায্যেই ইহাকে নরম করা যায়। পুষ্টি হিসাবে সেলুলোজের বিশেষ কোন মূল্য নাই। খাদ্যে সেলুলোজ থাকিলে হজমতন্ত্রের ক্রিয়া ভালভাবে চলে ও হজমের সুবিধা হয়। ইহা পাচকতন্ত্রের মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যকে নীচের দিকে নামিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই খাদ্যের সঙ্গে সেলুলোজ গ্রহণ করে। ব্যক্তির প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী ইহার পরিমাণ নির্ভর করে।

কার্বোহাইড্রেটের অভাব জনিত ব্যাধি—সাধারণতঃ শস্যজাতীয় পদার্থের আবরণের উপর ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। এই জন্য কলের সাহায্যে ইহাদিগকে ঘষামাজা করা মোটেই যুক্তি-সঙ্গত নয়। চাউলের খোসার ভিতরে বিশেষ করিয়া উপরের লাল অংশে ভিটামিন বি, (Vitamin B_1) বা থিয়ামিন (Thiamine) জাতীয় পদার্থ আছে। চাউল অতিরিক্ত ঘষিলে বা মাজিলে

ইহার অপচয় হয়। ভিটামিন বি (Vitamin B) অতিরিক্ত মাত্রায় কমিয়া গেলে বেরিবেরি রোগ সৃষ্টি হয়। পরিশোধিত (Refined) কার্বোহাইড্রেট—ময়দা, সুজি প্রভৃতি দেখিতে সুন্দর হইলেও ইহাদের খাদ্যমূল্য কম। দন্তচিকিৎসকগণ বলেন, এই সব পরিশোধিত দ্রব্য খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ দিলে দন্তরোগ হইতে অনেকে অব্যাহতি পাইতে পারে। নিখিল ভারত কুটীর-শিল্পের গ্রামোদ্যোগ কমিটি যাঁতাভাঙ্গা চাউল, গুড় এবং মধুর পুষ্টিকর মূল্যের কথা দেশের সর্বত্র প্রচার করিতেছেন।

কার্বোহাইড্রেট হইতে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের উৎপত্তি—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে শর্করা-জাতীয় পদার্থ হইতে জীব ও গাছের দেহে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন দেহে গ্লাইকোজেনের মাত্রা বাড়াইবার কোন প্রয়োজন থাকে না তখন কার্বোহাইড্রেটের অতিরিক্ত অংশ স্নেহ-জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

প্রোটীন (Protein)

প্রোটীন নাইট্রোজেন-ঘটিত জৈব পদার্থ। ইহা খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ উপাদান। ইহা দেহের কোষ ও তন্তুর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দেহের বিবিধ জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শরীরের যে অপচয় ঘটে তাহা প্রোটীন পূরণ করিয়া দেয়। প্রোটীন ব্যতীত মানবদেহ কোন দিনই সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। মাটি ও জল হইতে বিবিধ অজৈব পদার্থের সাহায্যে উদ্ভিদ্ প্রোটীন সৃষ্টি করিয়া থাকে। জীব কোন দিনই নিজের দেহে এই সব পদার্থের সাহায্যে প্রোটীন তৈয়ার করিতে পারে না। এই জন্য তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রোটীন ও অ্যামাইনো এসিড (Amino

acid) দেহ ও তন্তুর বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে প্রোটীন অনেক প্রকার অ্যামাইনো এসিডে (Amino acid) রূপান্তরিত হয়। তন্মধ্যে একুশটি প্রধান। বিশেষ করিয়া দশটিকে বলা হয় পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক ('Nutriently essential')।

দশটি প্রোটিনের নাম :—

১। আর্জিনাইন (Arginine)
২। হিস্টিডাইন (Histidine)
৩। আইসোলিউসাইন (Isoleucine)
৪। লিউসাইন (Leucine)
৫। লাইসাইন (Lysine)
৬। মেথিয়োনাইন (Methionine)
৭। ফেনিলঅ্যামাইন (Phenylamine)
৮। থ্রিওনাইন (Threonine)
৯। ট্রিপ্টোফেইন (Tryptophane)
১০। ভ্যালাইন (Valine)

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যদি উল্লিখিত একটি অ্যামাইনো এসিডের অভাব হয় তবে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ভবপর হইবে না। রক্তের সাহায্যে এই সব বিভিন্ন অ্যামাইনো এসিড দেহের বিভিন্ন কোষ ও তন্তুকে সরবরাহ করিলে ইহারা প্রোটীন জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রোটীন প্রোটোপ্লাজমের (Protoplasm) একটি প্রধান উপাদান। সক্রিয় কোষতন্তুর পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। জীবদেহের বিভিন্ন জারক রস (Enzyme) এবং অনুঘটকের (Catalyst) কার্যাবলী প্রোটীন খাদ্য হজম হইলেই ভালভাবে চলে। রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন

(Haemoglobin) যাহা ফুস্‌ফুস হইতে তন্তুসমূহকে অক্সিজেন দান করে তাহা এক প্রকার প্রোটীন-জাতীয় দ্রব্য। রক্তের সমতা রক্ষা করিবার জন্য প্রোটীন-জাতীয় দ্রবণ দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের জন্য অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড তাহাদের অ্যামাইনো গ্রুপ (Amino group) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্নেহ-পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

প্রোটীন সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর—(১) জৈব, (২) উদ্ভিজ্জ। খাদ্য হিসাবে জৈব শ্রেণীর প্রোটীনের মূল্য উদ্ভিজ্জ প্রোটীন হইতে অনেক বেশী। ডাল, ছোলা, বাদাম, ঈস্ট (Yeast), তরকারী প্রভৃতি হইতে উদ্ভিজ্জ প্রোটীন পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া মসুরী ও মাষকলাই ডালে উদ্ভিজ্জ প্রোটীন বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়। ছানা, মাছ, মাংস, ডিম, পনীর প্রভৃতি পদার্থ হইতে জান্তব প্রোটীন পাওয়া যায়। জান্তব প্রোটীনের উপকারিতার দিক লক্ষ্য করিয়া শস্য ও ডাল-জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। কতটা প্রোটীন একজনের গ্রহণ করা আবশ্যক তাহা বয়স ও কার্যক্ষমতা বিচার করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পূর্ণবয়স্ক লোকদের অপেক্ষা বেশী পরিমাণ প্রোটীনের দরকার। শিশুদের নিজেদের দেহের ওজনের অনুপাতে প্রতি পাউণ্ডে ১·৫ গ্রাম প্রোটীন আবশ্যক। প্রোটীনের প্রয়োজন দিন দিনই বাড়িয়া চলে যে পর্যন্ত না মেয়েদের ১৫ বৎসর ও ছেলেদের ২০ বৎসর বয়স হয়। এই বয়সে বালিকাদের ৭০ গ্রাম ও বালকদের ৮০ গ্রাম প্রোটীন দরকার। বয়স্কদের ৬০-৭০ গ্রাম প্রোটীন হইলেও চলে।

প্রোটীনের অভাব জনিত ব্যাধি—দেহে প্রোটীনের অভাব হইলে রক্ত বেশী মাত্রায় তরল হইয়া যায়, মাংসপেশী সংকুচিত ও শরীর

থল্‌থলে (Flabby) হয়। শিশুদের দেহের বৃদ্ধি হয় না। যকৃতের দোষ (Liver troubles), ইডিমা (Oedema) এবং মাংসপেশীর বৃদ্ধির অভাব জনিত অন্যান্য রোগেরও সম্ভাবনা থাকে।

স্নেহ-জাতীয় পদার্থ (Fat)

কার্বোহাইড্রেটের মত প্রকৃতিতে স্নেহ-জাতীয় পদার্থও পাওয়া যায়। দেহের পুষ্টিকর শক্তি উৎপাদনে ইহা ঘন কেন্দ্রীভূত ইন্ধনের ন্যায় কাজ করে। রাসায়নিক মতে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ-গুলি ট্রাইগ্লিসারাইডের (Triglycerides) সমষ্টি। স্নেহ-জাতীয় পদার্থের একটি অণু হজমের পর একটি গ্লিসিরল ও তিনটি ফ্যাটি এসিডের (Fatty acid) অণুতে রূপান্তরিত হয়। খাদ্যের স্নেহ-জাতীয় পদার্থের ভিতরে থাকে (১) ট্রাইস্টিয়ারিন (Tristearin)—যাহার ভিতর তিনটি স্টিয়ারিক এসিড (Stearic acid) অণু আছে; (২) একটি ওলিও-ডাইপামেটিন (Oleo-Dipalmetin)—যাহার ভিতর একটি ওলিইক এসিড (Oleic acid) ও দুইটি পামিটিক এসিড (Palmitic acid) অণু আছে; (৩) স্টিয়ারো-ওলিও-পামেটিন (Stearo-oleo-palmitin) যাহার ভিতর স্টিয়ারিক, ওলিইক ও পামেটিক এসিড আছে। ইহা ছাড়া মাখনের ভিতর বিউটিরিক এসিড (Butyric acid) পাওয়া যায়।

এইসব স্নেহ-জাতীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না; পেট্রোলিয়াম, ইথার বা ক্লোরোফর্মে দ্রবীভূত করা যায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আহারের জন্য এই সমস্ত দ্রাবক ব্যবহৃত হয় না। বাজারে প্রচলিত স্নেহপদার্থের ভিতরে দুধ হইতে মাখন ও চর্বি (Lard), সোয়েট (Suet) ও মারজারিন (Margarine) হইতে কর্ন অয়েল (Corn oil), ভুট্টার তৈল (Maize oil), শস্যের ভ্রূণ সয়াবিন (Soya Bean) হইতে সয়াবিন তৈল, নারিকেল তৈল, তিল তৈল, অলিভ তৈল

(Olive oil) প্রভৃতি পাওয়া যায়। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ উঁচুদরের ইন্ধনের মত দেহে কাজ করে। ইহা হজমতন্ত্রে, বিশেষ করিয়া পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে।

পাকস্থলী খালি থাকিলে মাংসপেশীর সংকোচনে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। পাশ্চাত্য দেশে (ইউরোপ ও আমেরিকা) খাদ্যে ক্যালোরীর $\frac{1}{3}$ অংশ হইতে $\frac{1}{2}$ অংশ স্নেহ-জাতীয় পদার্থ থাকে। কিন্তু মাত্রা বেশী হইলে পাকস্থলী অবসাদগ্রস্ত হয় এবং তাহাতে অসুখ হওয়ার আশঙ্কাও হয়।

স্নেহ-জাতীয় পদার্থ দেহে সঞ্চিত থাকে। অনাহার বা অসুখের সময় ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। দেহের প্রধান যন্ত্রগুলিকে ইহা আঘাত হইতে রক্ষা করে। ইহার প্রভাবে শৈত্য ও তাপ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ দেহের সৌন্দর্য, গঠন ও মসৃণ ত্বক লাভে সাহায্য করে।

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনন্দিন খাদ্যে ২ আউন্স স্নেহ-জাতীয় পদার্থ থাকা প্রয়োজন।

ভিটামিন (Vitamin)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটীন ও খনিজ দ্রব্য খাদ্যের একমাত্র অঙ্গ। ভিটামিন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন ব্রিটিশ নাবিক টাট্‌কা ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাদ্যের অভাবে স্কার্ভি (Scurvy) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। টাট্‌কা লেবু খাওয়ার পরে তাহাদের এই অসুখ সারিয়া গিয়াছিল। অসুখের জন্য তাহাদের অস্থিসন্ধিতে খুব যন্ত্রণা অনুভূত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Dr. Eijhman দেখিয়াছিলেন যে, কয়েকটি পলিনিউরাইটিস্ (Polyneuritis)

রোগে আক্রান্ত মুরগীর বাচ্চাকে ধানের লাল অংশ খাইতে দেওয়ায় তাহারা ঐ রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে Sir Frederik Gowland Hopkins পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও খনিজ পদার্থ জীবের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই খাদ্যের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা দুধ যোগ করিলে প্রাণীর জীবন রক্ষা ও তাহার শরীরের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। আরও গবেষণার পর দেখা গেল যে, দুধের স্নেহ-জাতীয় ও জলীয় অংশে উভয় ক্ষেত্রেই এই বৃদ্ধিকারক পদার্থ বিদ্যমান থাকে। হপ্‌কিন্‌স্ এইগুলিকে অতিরিক্ত খাদ্যগুণ (Accessory Factors) এই আখ্যা দিলেন এবং ইহাদিগকে জলে দ্রবণীয় ও স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।

Dr. Casimir Funk ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন যে, খাদ্যে কোন্ পদার্থ থাকিলে বেরিবেরির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পরীক্ষার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, খাদ্যের মধ্যে 'অ্যামাইন'-জাতীয় পদার্থের ন্যায় এমন নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ আছে যাহার সাহায্যে স্কার্ভি (Scurvy), পেলেগ্রা (Pellagra), বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। তিনি এই খাদ্যদ্রব্যকে 'ভিটামিন' আখ্যা দিলেন।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে বহু দেশে ভিটামিন সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে। ভিটামিন আবিষ্কারের বহু পূর্বে লোকেরা জানিত যে, কোন কোন খাদ্যদ্রব্যের রোগনিবারক ক্ষমতা আছে। গর্ভাবস্থায় মেয়েদের ধানের লাল অংশ খাইতে দিলে তাহাদের বমনেচ্ছা বন্ধ হয়, কাঁচা শাকসব্‌জী খাইতে দিলে জিহ্বার ক্ষত

সারিয়া যায়। কামলা (Jaundice) রোগের পক্ষে যকৃৎ (Liver) বা যকৃৎরস বিশেষ উপযোগী।

বর্তমান সময়ে ভিটামিনের সঙ্গে আমরা খুব সুপরিচিত। এই ভিটামিনগুলি জৈব পদার্থ এবং খাদ্যে খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য এগুলি একান্ত অপরিহার্য। শরীরের ভিতর ভিটামিনের উৎপত্তি হয় না। খাদ্যের সাহায্যে এইগুলিকে সরবরাহ করিতে হয়। প্রোটীন বা শর্করা-জাতীয় পদার্থের মত ভিটাসিনগুলি দেহে শক্তি দান করে না। প্রোটীন বা খনিজ পদার্থের মত ইহারা দেহগঠনে সহায়তাও করে না। অনুঘটকের (Catalyst) মত অন্যান্য পদার্থ হইতে সার অংশ গ্রহণ করিয়া দেহের কাজে লাগানই ইহাদের কার্য। তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ যেরূপ ইঞ্জিনকে সচল করিয়া রাখে ভিটামিনও সেইরূপ দেহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

স্বাভাবিক খাদ্যে ভিটামিন চোখে দেখা যায় না বা ইহার স্বাদ বা গন্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমাদের দেহের জন্য ভিটামিনের মাত্রা খুব কমই লাগে। সেইজন্য মিলিগ্রাম ও মাইক্রোগ্রামের সাহায্যে ইহাদের ওজন নির্ধারিত হয়। এক মিলিগ্রাম এক গ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ অথবা এক আউন্সের $\frac{১}{২৮৩৫০}$ অংশ। এক মাইক্রোগ্রাম এক মিলি-গ্রামের $\frac{১}{১০০০}$ অংশ। ইহা হইতে ভিটামিনের অন্তর্নিহিত শক্তি বুঝিতে পারা যায়। এই সমস্ত ভিটামিনের অভাবে রিকেটস (Rickets), ওস্টিওমেলশিয়া (Osteomalcia), রাতকানা, স্কার্ভি, পেলাগ্রা প্রভৃতি গুরুতর রোগ জন্মে। আংশিকভাবে ভিটামিনের অভাব ঘটিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের ব্যাঘাত জন্মে। অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ, অনিদ্রা, খেলাধূলায় নিরুৎসাহ, স্নায়বিক দৌর্বল্য,

খিটখিটে মেজাজ, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, চর্মের অমসৃণতা ও শুষ্কতা, নখ, চুল ও ওষ্ঠের বিবর্ণতা এই সব নানাবিধ অসুখ ভিটামিনের অভাবে জন্মিয়া থাকে।

অনেক সময় খাদ্য কম গ্রহণ করার ফলে ভিটামিনও শরীরে কম মাত্রায় প্রবেশ করে। ভিটামিন যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন খেয়াল-খুশিমত ইহাদিগকে A, B, C আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এখন রাসায়নিক গবেষণার ফলে তাহাদের গুণ ও কার্যাবলী জানা গিয়াছে। ভিটামিন 'এ'কে এন্টি জেরোপ্‌থেলমিল (Anti Xeropthalmil), ভিটামিন বি$_1$কে এন্টি নিউরিটিক (Anti Neuritic), ভিটামিন 'সি'কে এন্টি স্করবিউটিক (Anti Scorbutic) এবং ভিটামিন 'ডি'কে এন্টিরেকিটিক (Anti rechitic) ভিটামিন বলা হয়। 'বি' ভিটামিন ও 'সি' ভিটামিন জলে দ্রবণীয়। রন্ধনের দোষে এই ভিটামিনগুলি নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। অনেক বৎসর পর্যন্ত ভিটামিন 'বি' একক হিসাবে ধরা হইত। ইহার পর আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, আমাদের শরীরের জন্য ১২ প্রকারের ভিটামিন সহ ভিটামিন 'বি' কম্‌প্লেক্স একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে তিনটি—থিয়ামিন (Thiamine), রাইবোফ্লেভিন (Riboflavain) এবং নিয়াসিন (Niacin) একান্ত অপরিহার্য। ভিটামিন 'বি' কম্‌প্লেক্সের অন্যান্য ভিটামিনগুলির নাম—পাইরিডিঅক্সিন (Pyridioxine), প্যাণ্টোথিনিক এসিড (Pantothenic acid), কোলাইন (Choline), বাইওটিন (Biotin), আইনোস্টিয়ল (Inostiol), প্যারা অ্যামিনোবেঞ্জয়িক এসিড (Para Aminobenzoic acid), ফলিক এসিড (Folic acid), ভিটামিন বি$_{10}$, ভিটামিন বি$_{11}$, ভিটামিন বি$_{12}$।

স্নেহপদার্থে দ্রবীভূত ভিটামিনগুলি দেহে কিছু মাত্রায়

সঞ্চিত থাকিতে পারে, বিশেষ করিয়া যকৃতে এগুলি রক্ষিত থাকে। বেশীর ভাগ ভিটামিন 'বি' শরীরে সঞ্চিত থাকে না, এইজন্য দৈনন্দিন আহার্য বস্তুর সহিত এগুলি শরীর রক্ষার জন্য সরবরাহ করিতে হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন গ্রহণ করিলে তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। আধুনিক গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অন্ত্রের ভিতর একপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন 'বি' প্রস্তুত করিতে পারে। প্রায় সব রকম খাদ্যের ভিতরেই ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সের বেশীর ভাগ ভিটামিন বর্তমান থাকে। সুতরাং ভিটামিন 'বি' শ্রেণীর কোন একটি ভিটামিনের অভাবে রোগের সৃষ্টি হয় না। কোন ব্যক্তির শরীরে থিয়ামিনের অভাব ঘটিলে তাহার সঙ্গে রাইবোফ্লেবিন ও নিয়াসিনেরও অভাব হয়। খুব পরিশোধিত শর্করা ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থে ভিটামিন পাওয়া যায় না। উদ্ভিদেরা তাহাদের পাতায়, ফলে, বীজে, কন্দে ও কাণ্ডে ভিটামিন সৃষ্টি করে ও সঞ্চিত রাখে। জীবজন্তু সেই সমস্ত উদ্ভিদের অংশ ভক্ষণ করিয়া এবং সূর্যকিরণ হইতে ভিটামিন সংগ্রহ করে। মানুষও উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ এবং সূর্যকিরণ হইতে ভিটামিন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

আজকাল রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন তৈয়ার করা হয় এবং ঔষধ হিসাবে বাজারে বিক্রীত হয়। যদি আমরা প্রাকৃতিক খাদ্য হইতে ভিটামিন সংগ্রহ করিতে পারি, তবে কৃত্রিম ভিটামিন-বটিকা আহারের প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীত কৃত্রিম ভিটামিনগুলি খুব দামী এবং গ্রামাঞ্চলে সব সময় পাওয়াও যায় না। খাদ্যবস্তুর গুণ ও ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকিলেই আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ (well-balanced) খাদ্য লাভ করিতে পারি।

এইবার বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ভিটামিন 'এ'—এই ভিটামিনের অভাবে লোক রাতকানা হয়। শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি—বিশেষ করিয়া দন্ত ও অস্থি বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন 'এ' আবশ্যক। দেহে সংক্রামক জীবাণুর আক্রমণকে ইহা প্রতিরোধ করে। মানবদেহের বহির্দিকের কোষগুলিতে ভিটামিন 'এ' উপস্থিত থাকিয়া বাহিরের রোগ-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ভিটামিন 'এ'র অভাবে শরীরের বৃদ্ধি ঘটে না, ক্ষুধামান্দ্য হয়, ত্বক রুক্ষ হয় এবং মানুষ নিরুৎসাহ বোধ করে। বেশী অভাব হইলে চক্ষে ক্ষত হয়। কারাটোম্যালেশিয়া (Kerato malacia) রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগী অন্ধ হইয়া যায়। ভিটামিন 'এ' প্রজনন-ক্রিয়ার সহায়তা করে। ভিটামিন 'এ'র অভাবে স্ত্রীলোক অনেক সময় বন্ধ্যাত্ব দোষ প্রাপ্ত হয়।

উত্তাপের দ্বারা ভিটামিন 'এ' নষ্ট হয় না। অনেক গাছ ও ফলের হল্‌দে বর্ণজনক পদার্থের (Pigment) ভিতরে ক্যারোটিন (Carotin) নামে এক প্রকার পদার্থ আছে যাহা সহজেই ভিটামিন 'এ'তে রূপান্তরিত হইতে পারে। যেহেতু ভিটামিন 'এ' যকৃতে রক্ষিত হইতে পারে, সেইজন্য ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া একান্ত দরকার। ভিটামিন 'এ' এবং ক্যারোটিন নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য হইতে পাওয়া যায়।

সবুজ শাক ও পাতা—ছোলা গাছের পাতা, পান, ধনে পাতা, পুদিনা, নিমপাতা, কপিপাতা, মেথি পাতা, লেটুস শাক প্রভৃতি।

হল্‌দে শাকসব্‌জী ও ফল—মিষ্টি-আলু, গাজর, কুমড়া, আম, কাঁঠাল, ভুট্টা, টমাটো, কমলা, তরমুজ, পেঁপে, কলা প্রভৃতি।

অন্যান্য খাদ্য—লাল ও সবুজ লঙ্কা, খেজুর, যকৃৎ, ডিমের হল্‌দে

অংশ, পনীর, মাখন, ক্রিম, দই, কড্‌লিভার অয়েল, মটরশুঁটি প্রভৃতি।

একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ৫০০০ আন্তর্জাতিক একক (International Units) ভিটামিন 'এ' এবং একটি এক বৎসর বয়সের শিশুর ১৫০০ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন 'এ' দরকার। দুই আউন্স সবুজ শাকসব্‌জী, এক টেবিল চামচ কড্‌লিভার অয়েল অথবা ছয় পেয়ালা দুধ ভিটামিন 'এ'র অভাব মিটাইতে পারে। এক আন্তর্জাতিক একক (International Unit) ছয় মাইক্রো-গ্রাম ক্যারোটিনের সমান।

ভিটামিন বি১ বা থিয়ামিন (Vitamin B_1 or Thiamine)—ওলন্দাজ চিকিৎসক Eijhman জেলের বন্দীদের বেরিবেরি রোগ চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখেন যে, কলে-ছাঁটা চাউলের ভাত খাওয়ানোর দরুন তাহাদের এই রোগ হয়, ঢেঁকি-ছাঁটা লাল চাউল খাওয়ানোর ফলে তাহাদের কোন অসুখ হয় না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, চাউলের লাল অংশে অত্যাবশ্যক পুষ্টি-মূল্য থাকে। ভিটামিন বি১ বা থিয়ামিনকে 'ক্ষুধা ভিটামিন' (Appetite-vitamin) বলা হয়। কারণ ইহা শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে, ক্ষুধার উদ্রেক করে এবং খাদ্য পরিপাক করিতে সহায়তা করে। ইহা স্নায়ুতন্ত্রকে রক্ষা করে এবং কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় পদার্থ হইতে শক্তি উৎপাদন করে। অপ্রচুর থিয়ামিন গ্রহণ করার ফলে ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অবসাদ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, অনিদ্রা, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন 'বি'র অভাব হইলে বেরি-বেরি রোগও হয়। এই রোগের লক্ষণ—পা অবসাদগ্রস্ত, সর্বশরীরে বেদনা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত প্রভৃতি

নানা প্রকার উপসর্গ দেখা দেয়। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্য ·৪ মিলিগ্রাম, বালক-বালিকাদের জন্য ১·৩—১·৭ মিলিগ্রাম এবং পূর্ণবয়স্ক মেয়ে ও পুরুষদের জন্য ১·২—১·৫ মিলিগ্রাম থিয়ামিন আবশ্যক। অন্যান্য 'বি' ভিটামিনের মত থিয়ামিন জলে দ্রবণীয়। খাদ্যদ্রব্য ও শস্য বেশীক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে থিয়ামিন নির্গত হয়। যদি এই জল এবং রন্ধনের পরে জল ফেলিয়া দেওয়া
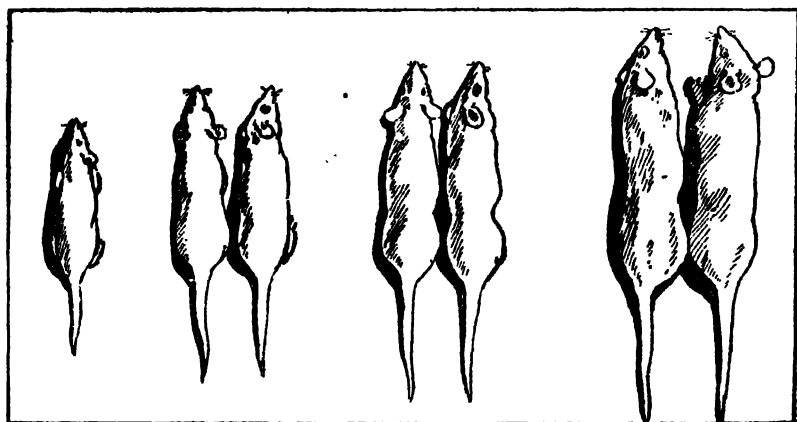
উপযুক্ত থিয়ামিনের প্রভাবে সুস্থ জীবের বৃদ্ধি

হয় তাহা হইলে ভিটামিনের অপচয় হয়। উত্তাপে ইহা নষ্ট হয় এবং দেহে সংরক্ষিত থাকে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আতপ চাউলের পরিবর্তে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার দেখা যায়। এক রাত্রি জলে রাখিয়া অল্প সিদ্ধ করার ফলে তুষ ও লাল অংশ হইতে ভিটামিন নির্গত হইয়া শর্করা অংশে প্রবেশ করে ও সংরক্ষিত থাকে। এজন্য সিদ্ধ চাউল খাইলে অনেক ক্ষেত্রে বেরিবেরি রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

রাইবোফ্লেবিন (Riboflavin)—ইহা সবুজ আভাযুক্ত হলদে

পদার্থ। ইহা শারীরিক বৃদ্ধি ও দেহের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে। দেহে কোষের শ্বাসকার্য, নার্ভতন্তুর উন্নতি সাধনের জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয়। ইহা জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে। ইহা জলে দ্রবণীয়; সুতরাং অন্যান্য 'বি' ভিটামিনের মত ইহার জলের দ্রবণ ফেলিয়া দিলে ভিটামিনের অপচয় ঘটে। ইহা আলোর সংস্পর্শে নষ্ট হয় বলিয়া রাইবোফ্লেবিনযুক্ত খাদ্য কখনও আলোর সম্মুখে উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। ইহা দেহে সংরক্ষিত হয় না বলিয়া খাদ্যের সহিত প্রতিদিন ইহা সরবরাহ করা উচিত। রাইবোফ্লেবিনের অভাবে হজমের ব্যাঘাত, শরীরের অপুষ্টি, নিরুৎসাহ, চর্ম ও চক্ষুর রোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার অভাবে অনেক সময় জিহ্বা ও ঠোঁটে ঘা প্রভৃতি রোগও দেখা যায়। এই ভিটামিনের অভাবে চক্ষুগোলকে (Cornea) রক্ত সঞ্চিত হইয়া কর্নিয়েল ভাস্কুলারিজেশন (Corneal vascularization) নামক রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। বেশী মাত্রায় অভাব হইলে চোখে ছানি পড়ার আশঙ্কাও থাকে। ঈস্ট, যকৃৎ, ডিম, দুধ, সরষে শাক, বাঁধাকপি, লেটুস শাক, মটরশুঁটি প্রভৃতি পদার্থে রাইবোফ্লেবিন পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে ১'৫ হইতে ২'৫ মিলি-গ্রাম রাইবোফ্লেবিন দরকার।

নিয়াসিন (Niacin)—পূর্বে ইহাকে নিক্টোনিক এসিড (Nictonic acid) বলা হইত। ইহা দেহের বৃদ্ধি সাধন করে ও সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করে। ইহা হজমতন্ত্রের গ্রন্থি সমূহের (Digesting glands) ও চর্মের স্বাভাবিক কার্যের সহায়তা করে। অন্যান্য 'বি' ভিটামিনের মত ইহা খাদ্য হইতে শক্তি যোগায়। আলো, বাতাস ও উত্তাপের সংস্পর্শে ইহা নষ্ট হয় না। তবুও জলে দ্রবণীয় বলিয়া রন্ধন করিবার সময় ইহা রক্ষা করিবার জন্য

সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ইহা দেহে সংরক্ষিত থাকে না। নিয়াসিনের অপ্রাচুর্যে পেলেগ্রা রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে মুখ ও চর্মের ক্ষত ও ক্ষুধামান্দ্য হয়। চর্ম লাল হয়, বিশেষ করিয়া তালু ও কনুই যাহা সর্বদাই আলোর সংস্পর্শে আসে তাহাই বেশী করিয়া লালবর্ণ ধারণ করে। নিয়াসিনের অভাবে অনেক সময় মানসিক অবসাদ, ভ্রান্তি প্রভৃতি রোগের সমাবেশের জন্য পেলেগ্রাকে বলা হয় Disease of three D's—Diarrhoea, Dementia and Dermatitis (পেটের অসুখ, মানসিক দুর্বলতা ও চর্মরোগ)। যকৃৎ, মাংস, চালের লাল অংশ, চিনাবাদাম, আলু, দুধ, সরষে শাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে নিয়াসিন ভিটামিন পাওয়া যায়। অল্প দামের জিনিসের মধ্যে চিনাবাদামে প্রচুর নিয়াসিন থাকে। যুবক ও পূর্ণবয়স্ক লোকদের ১২ হইতে ১৮ গ্রাম পর্যন্ত নিয়াসিন দরকার।

অন্যান্য 'বি' ভিটামিন (Other B Group Vitamins)—পাইরিডোক্সিন (Pyridoxine) অথবা ভিটামিন $বি_৬$ (Vitamin B_6) জারক রসের সঙ্গে থাকে এবং অ্যামাইনো এসিড ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থকে কাজে লাগাইতে সহায়তা করে। প্যাণ্টোফিনিক (Pantophenic) এসিড স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। কোলিন (Choline) স্নেহ-জাতীয় পদার্থকে কাজে লাগায় এবং যকৃতে চর্বি জমিতে বাধা প্রদান করে। প্যারা-অ্যামাইনো বেঞ্জয়িক এসিড (Para-Amino Benzoic acid) চুলের অকালপক্কতা নিবারণ করে। বাইওটিন (Biotin), আইনোসিটল (Inositol), ভিটামিন 'পি' (Vitamin P) সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। ফলিক এসিড (Folic acid), ভিটামিন $বি_{১২}$ (Vitamin B_{12}) রক্তশূন্যতা (Anaemia) দূর করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ঈস্ট, চিনাবাদাম, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিমের কুসুম, শাকসব্জী প্রভৃতি ভিটামিন 'বি'র প্রধান উৎস। তবে থিয়ামিন, রাইবোফ্লেবিন ও নিয়াসিন এই তিনটি ভিটামিন থাকিলে অন্যান্য ভিটামিনও তাহার সঙ্গে থাকে।

অ্যাস্করবিক এসিড (Ascorbic acid) বা **ভিটামিন 'সি'**—ভিটামিন 'সি'র অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। উত্তর ও মধ্য ইউরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। টাট্‌কা খাদ্য, বিশেষ করিয়া টাট্‌কা শাকসব্জীর অভাবে নাবিকদের মধ্যে এই রোগ দেখা দিত। এই রোগের উপসর্গ—পা ফুলিয়া যায়, বাতের আক্রমণের মত অস্থিসন্ধিতে দারুণ ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভূত হয়, সর্বশরীরে লাল লাল দাগ দেখা যায়, দাঁতের মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে, মাড়ী হইতে দাঁত আল্‌গা হইয়া যায়। রোগী অবসাদগ্রস্ত ও খিটখিটে মেজাজী হয় এবং অবসাদগ্রস্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে। দন্ত ও অস্থিগঠন, দেহের তন্তুর ক্ষয়-পূরণ ও ক্ষত নিরাময়ের জন্য ভিটামিন 'সি' প্রয়োজনীয়। উত্তাপে বা বায়ুর সংস্পর্শে ইহার অপচয় হয়। ইহা জলে দ্রবণীয় বলিয়া ইহার দ্রবণ ফেলিয়া দিলেও ভিটামিনের অপচয় ঘটে। অম্ল-দ্রবণে ইহার স্থায়িত্ব বজায় থাকে, কিন্তু ক্ষারদ্রবণে ইহা নষ্ট হয়।

অ্যাস্করবিক এসিডের (ভিটামিন 'সি') স্বচ্ছ দানা

ভিটামিন 'সি'-যুক্ত খাদ্যদ্রব্য কখনও ছোট ছোট টুকরা করিয়া

কাটা উচিত নয়। ইহা অল্প জলে সিদ্ধ করা উচিত। ইহা দেহে সঞ্চিত থাকে না বলিয়া প্রতিদিন খাদ্যের সহিত ইহা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ভিটামিনের অভাবে যুবকদের ভিতরে বার্ধক্যের ছাপ দেখা যায়। আমলকীর ভিতরে সবচেয়ে বেশী ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। একটি কমলালেবুতে বা অর্ধপেয়ালা অঙ্কুরিত ছোলা বা তিনটি লেবুতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' থাকে, একটি ক্ষুদ্র আমলকীতে সেই পরিমাণ পাওয়া যায়। আম, পেঁপে, টমাটো, বাঁধাকপি, সবুজ শাকসব্জী, ফুলকপি, কাঁচালঙ্কা প্রভৃতিতে ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের ৩০ মিলিগ্রাম এবং যুবক ও বয়স্কদের ৫০-৭৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' গ্রহণ করা উচিত।

ভিটামিন 'ডি'—ভিটামিন 'ডি'কে সূর্যকিরণজাত ভিটামিন বলা হয়। অন্যান্য খাদ্য ছাড়াও এই ভিটামিন সূর্যকিরণ হইতে পাওয়া যায়। অস্থি ও দন্তের বৃদ্ধির জন্য এই ভিটামিন বেশী প্রয়োজনীয়। শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের বয়স্কদের অপেক্ষা এই ভিটামিন বেশী মাত্রায় পাওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে শিশুদের সরিষার তেল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখা হইত শুধু ভিটামিন 'ডি' পাওয়ার জন্য।

জানুরোগ (Knock-Knees), ফুস্‌ফুস ও চোয়ালের হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, পৃষ্ঠের কুব্জতা, অস্বাভাবিক বুক (Pigeon chest) প্রভৃতি রোগ ভিটামিন 'ডি'র অভাবে হইয়া থাকে। ভিটামিন 'ডি' জলে দ্রবণীয় নয় এবং উত্তাপেও ইহা নষ্ট হয় না। সূর্যের আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে চর্মের স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ভিটামিন 'ডি'তে রূপান্তরিত হয়। পরীক্ষাগারে আলোক-রশ্মির সাহায্যে এই ভাবে ভিটামিন 'ডি' প্রস্তুত করা যাইতে

পারে। অনেক মাছের যকৃতে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' সঞ্চিত থাকে। হাঙ্গরের যকৃতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' পাওয়া যায়। দুধ, ক্রিম এবং মাখনে প্রচুর ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। খালি গায়ে সূর্যকিরণ সেবন করিলেই সর্বোৎকৃষ্ট ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। আমাদের দৈহিক প্রয়োজনের জন্য প্রায় ৪০০ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন 'ডি' দরকার।

লবণজাতীয় পদার্থ (Salts)

ধাতব লবণ (Mineral Salts)—আমাদের দেহে ৩০ প্রকারের ধাতব লবণ (খনিজ উপাদান) আছে। তন্মধ্যে দেহের কার্যের জন্য ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস্‌, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, কোবাল্ট ও আয়োডিন প্রধান। এই ধাতব লবণগুলি দেহগঠনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

(১) শরীরের কঠিন তন্তুগুলি—যেমন হাড় ও দাঁত প্রভৃতিকে ইহারা স্থায়ী ও শক্ত করে। ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস এবং ম্যাগ্‌নে-সিয়াম এই কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২) দেহের নরম তন্তু—প্রোটীন, কোষ ও মাংসপেশীর কার্যের জন্য ইহারা দায়ী।

(৩) দেহের তরল পদার্থের অংশরূপে ইহারা রক্ত, মাংসপেশী ও নার্ভতন্ত্রের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত এবং দেহে রক্ত ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করিয়া থাকে।

ক্যাল্‌সিয়াম (Calcium)—মানবদেহে ক্যাল্‌সিয়ামের মাত্রাই সব ধাতুর চেয়ে বেশী। আমাদের অস্থি ও দন্তে ফস্‌ফরাসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ক্যাল্‌সিয়াম পাওয়া যায়। মাংসপেশীর কার্যে এবং রক্ত জমাট বাঁধিবার জন্য ক্যাল্‌সিয়াম দরকার। হৃৎপিণ্ডের

পেশীকে সংকুচিত করিতে ক্যাল্‌সিয়াম সাহায্য করে ও পটাসিয়াম ইহাকে প্রসারিত করে। শিশুদের বৃদ্ধির জন্য ক্যাল্‌সিয়াম দরকার। পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যাল্‌সিয়াম গ্রহণ না করলে অস্থি হইতে রক্তে ক্যাল্‌সিয়াম সঞ্চালিত হয়—ইহার ফলে অস্থি নরম হইয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সদ্যোজাত শিশুর প্রচুর পরিমাণ ক্যাল্‌সিয়াম গ্রহণ করার ফলে জীবনী শক্তি বাড়িয়া যায়। দুধের ভিতর সবচেয়ে ভাল ক্যাল্‌সিয়াম পাওয়া যায়। ডিমের কুসুম, মাংসের হাড়, মাছ, মেথি শাক, সবুজ শাকসব্‌জীতে ক্যাল্‌সিয়াম প্রচুর পরিমাণে থাকে। পানের সঙ্গে আমরা চুন খাই, ইহাও আমাদের ক্যাল্‌সিয়াম যোগাইয়া থাকে। শিশুদের ১ গ্রাম হইতে ১.৫ গ্রাম, বয়স্কদের ১ গ্রাম এবং গর্ভবতী মেয়েদের ১.৫ গ্রাম হইতে ২ গ্রাম পর্যন্ত ক্যাল্‌সিয়াম প্রয়োজন। ভিটামিন 'ডি' ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস গ্রহণ ও সঞ্চয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।

ফস্‌ফরাস (Phosphorus)—ক্যাল্‌সিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' সহযোগে ফস্‌ফরাস দাঁত ও হাড় গঠনে সহায়তা করে। ফস্‌ফরাস জীবন্ত কোষের একটি অপরিহার্য পদার্থ। ইহা খাদ্য হইতে আমাদিগকে শক্তি দান করিয়া থাকে। দেহের তরল অংশ গঠনে ফস্‌ফরাস সাহায্য করে। এই তরল অংশ জীবনী শক্তির নানাবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম, মাংস, মাছ, শস্য, সবুজ শাকসব্‌জী হইতে প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফরাস পাওয়া যায়।

লৌহ (Iron)—রক্তের লাল রঙের মুখ্য কারণ লৌহের অস্তিত্ব। লৌহের শতকরা ৭০ ভাগ হিমোগ্লোবিন (লাল পদার্থ) রূপে রক্তে বর্তমান থাকে। যকৃৎ, বৃক্ক ও প্লীহাতে লৌহ রক্ষিত

থাকে। ইহা তন্তুব জাবণ ক্রিয়ায় (Oxidation) সাহায্য করে। সাধাবণ অবস্থায আমাদেব ১৫ মিলিগ্রাম লৌহ আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় মেযেদেব অতিবিক্ত লৌহ প্রযোজনীয়। অধিক মাত্রায় বক্ত উৎপাদনেব জন্য শিশু ও বালকদেব খাদ্যে লৌহ গ্রহণ কবা বাঞ্ছনীয। সদ্যোজাত শিশুর যকৃতে লৌহ সঞ্চিত থাকে। ছয়মাস কাল পর্যন্ত ইহা স্থাযী হয়। ইহাব পবে শিশুকে দুধেব সহিত লৌহসমৃদ্ধ খাদ্য—যকৃৎ, ডিম, সবুজ শাকসবজী প্রভৃতি গ্রহণ করানো উচিত। লৌহেব অভাবে বক্তশূন্যতা বোগ হইবাব আশঙ্কা থাকে। সর্বপ্রকাব জৈব খাদ্যে, যকৃৎ ও ডিমের কুসুমে প্রভূত পবিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। সবুজ শাকসবজী, মটব-কডাইশুঁটি, কিস্‌মিস্, খেজুব, বববটী, পেঁয়াজ প্রভৃতিতেও লৌহ আছে।

আয়োডিন (Iodine)—ইহা থাইবয়েড গ্রন্থিব (Thyroid gland) একটি অংশ। ইহা গলদেশেব নিম্নভাগে অবস্থিত। ইহার গোলাকাব দুইটি গুটিকা অংশ শ্বাসনালীব দুই পাশে অবস্থিত। শ্বাসনালীব সামনে একটি নল দ্বাবা ইহা সংযুক্ত। আযোডিন শরীরেব বিভিন্ন ক্রিযাকে নিয়ন্ত্রিত কবে।

যদিও শবীবেব জন্য আমাদেব খুব অল্প পবিমাণ আয়োডিন আবশ্যক তবুও ইহা একেবাবে অপবিহার্য। পবীক্ষা দ্বাবা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদেব শাবীবিক ওজনেব শতকবা '০০০০৪ ভাগ আয়োডিন আবশ্যক। আয়োডিনেব অভাবে আমাদেব শবীরেব বৃদ্ধি ঘটে না। ইহাব অভাব হইলে গলগণ্ড (Cretin) বোগ দেখা দেয়। সেই বোগেব দরুন বোগীব মানসিক বা শাবীবিক কোন উন্নতিই হয় না। সাধাবণতঃ যুবকদেব এই রোগ দেখা যায়। বয়স্কদেরও আয়োডিনেব অভাবে গয়টাব (Goitre) নামক আর এক প্রকার

গলগণ্ড রোগ হইতে পারে। স্ফীত চক্ষু ও কর্মে নিরুৎসাহ ভাব আয়োডিন অভাবের আর একটি লক্ষণ। যে সমস্ত মাটিতে আয়োডিন থাকে—সেখানের শাকসব্‌জী, সামুদ্রিক মৎস্য, ঝিনুক, সামুদ্রিক গাছ প্রভৃতিতে আয়োডিন পাওয়া যায়। হিমাচল প্রদেশের মাটিতে আয়োডিনের অভাব থাকার দরুন সেখানের অধিবাসীদের মধ্যে গলগণ্ড রোগ বেশী দেখা যায়। আয়োডিন-ঘটিত লবণ আমাদের খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশাইলে এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণ খাদ্য লবণের (Common Salt) সঙ্গে আয়োডিন মিশাইয়া দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

তামা (Copper)—রক্তের লোহিত কণিকাযুক্ত কোষের সৃষ্টির জন্য লোহার সহিত তামা আবশ্যক।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)—ইহা খাদ্য হইতে শক্তি দান করে।

সোডিয়াম এবং **ক্লোরিন** (Sodium & Chlorine)—দেহের তরল পদার্থে শতকরা ·৯ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। ইহা জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। লবণের অভাব থাকিলে মাংস-পেশীর খিঁচুনি দেখা দেয়। গ্রীষ্মকালে বিশেষ করিয়া ভারতের যেসব স্থানে গরম অত্যন্ত অধিক হয়, সেখানে ঘর্মাকারে অনেক লবণ চলিয়া যায়; এজন্য একটু অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করা উচিত।

অসার অংশ (Roughage)

শুধু প্রোটীন, স্নেহ-জাতীয়, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি খাদ্য খাইলেই চলে না। ইহারা অল্প মাত্রায় থাকিলে পেটও ভরে না। এইজন্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে শাকস্‌বজী ও তরিতরকারী গ্রহণ করা উচিত। এই সকলের অপ্রয়োজনীয় অংশকে রাফেজ (Roughage) বা অসার অংশ বলা হয়। এই সব অসার পদার্থ মল বৃদ্ধি করে ও

খাদ্যদ্রব্যের অসার অংশকে মলরূপে দেহ হইতে বহির্গত হইতে সাহায্য করে।

জল (Water)

শরীরের পক্ষে একটি অপরিহার্য দ্রব্য জল। আমাদের দেহের বিবিধ ক্রিয়া জলের সাহায্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। মানবদেহের ওজনের শতকরা ৭০ ভাগই জল। তরল পদার্থ ও আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের জারণ (Oxidation) ক্রিয়ার ফলে দেহে জল পাওয়া যায়। বৃক্ক, অন্ত্র, ফুস্‌ফুস এবং ত্বকের মাধ্যমে দেহ হইতে জল নির্গত হয়। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মানুষ জল গ্রহণ ও জল বর্জনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলে। ইহার ফলে দেহের স্বাভাবিক তাপ বজায় থাকে। দেহের হজমজাত দ্রব্যগুলিকে শোষণ করিতে জল সহায়তা করে। ঘর্ম ও মূত্ররূপে অতিরিক্ত জল দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। একজন লোকের দৈনিক ছয় গ্লাস হইতে আট গ্লাস জল গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য (Calorie value of Food)

দেহের ব্যয়িত শক্তি উত্তাপ শক্তিতে পরিণত হয়। এইজন্য বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের দেহের তাপ উৎপাদনের উপর কতটা খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১ কিলোগ্রাম জলকে ১° ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রায় পৌঁছাইতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকেই ক্যালোরী বলে। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট অথবা এক গ্রাম প্রোটীন আমাদের দেহে চার ক্যালোরী তাপ উৎপাদন করে। এক গ্রাম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ নয় ক্যালোরী তাপ উৎপাদন করে। এক আউন্স দুধে ·৯ গ্রাম প্রোটীন, ১·১

গ্রাম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ এবং ১'৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে। এক কাপ বা বাটিতে সাধারণতঃ ৮ আউন্স দুধ ধরে। সুতরাং এক কাপ বা ৮ আউন্স দুধে

৮×'৯×৪ =২৮'৮ ক্যালোরী প্রোটীনের সাহায্যে

৮×১'১×৯=৭৯'২ ক্যালোরী স্নেহজাতীয় পদার্থের সাহায্যে

৮×১'৪×৪=৪৪'৮ ক্যালোরী কার্বোহাইড্রেটের সাহায্যে

সর্বশুদ্ধ মোট ১৫২'৮ ক্যালোরী পাওয়া যায়।

কতকগুলি সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের ক্যালোরী মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল।

			প্রতি আউন্সে ক্যালোরী মূল্য
১।	সমস্ত শস্যবর্গ	...	৮৭—১০০
২।	ডাল-জাতীয় পদার্থ	...	৯[illegible]—১১৮
৩।	সয়াবিন	...	১২৩
৪।	শাকসব্জী	...	১০—২০
৫।	পেঁয়াজ	...	১৪—১৭
৬।	মূলা	...	৬—১০
৭।	আলু	...	২৮
৮।	কলা	...	৪৩
৯।	খেজুর	...	৮০
১০।	ডিম	...	৫০
১১।	মাছ	...	২৬—২৮
১২।	দুধ	...	১৮
১৩।	চিনি	...	১১০
১৪।	সবরকম তৈল	...	২৫০

শক্তির চাহিদা (Energy requirements)—শক্তির চাহিদা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বয়স, আকৃতি, ওজন, দেহের

প্রশস্ততা, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, মাংসপেশীর ক্রিয়া, বিভিন্ন রকমের খাদ্য-দ্রব্য, শরীরের রুগ্ণতা—এই সব নানাবিধ অবস্থার উপর আমাদের খাদ্যের শক্তি নির্ভর করে। একটি বর্ধিষ্ণু শিশুর তাড়াতাড়ি বাড়িবার ফলে একজন বয়স্ক লোক অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি ব্যয়িত হয়। একজন লম্বা মানুষের বেঁটে মানুষের অপেক্ষা খাদ্য ক্যালোরী বেশী হওয়া দরকার। বার বৎসর বয়সের আগে ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান খাদ্য ক্যালোরী প্রয়োজন। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের খাদ্য ক্যালোরী বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যায়াম করিলে অথবা মাংসপেশীর সঞ্চালন করিলে শক্তি ব্যয়িত হয়। কাজেই ক্ষয় পূরণের জন্য অধিক ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা আছে। দেহের তাপের মাত্রার আধিক্য হইলে শক্তির ব্যয়ের মাত্রা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। জ্বরের সময় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শীতল প্রদেশে দেহকে উত্তপ্ত রাখিবার জন্য আরও বেশী ক্যালোরীর প্রয়োজন হয়। অনাহারে বা দেহের অপুষ্টির সময় শক্তির চাহিদা আপনা হইতেই কমিয়া যায়। তখন দেহের সঞ্চিত খাদ্যের সাহায্যেই তাপের সৃষ্টি হয়। গর্ভাবস্থায় এবং তাহার পরে মেয়েদের অতিরিক্ত মাত্রায় ক্যালোরী গ্রহণ দরকার।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শক্তির চাহিদা মিটাইবার জন্য নিম্নলিখিত ক্যালোরীর দরকার :—

(১) শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি দেহের কার্য সম্পন্ন করিতে = একজনের কিলোগ্রাম প্রণালীতে ওজন অর্থাৎ

$$\frac{\text{ওজন (পাউণ্ডে)}}{২\cdot২} \times ২৪ \text{ ক্যালোরী ;}$$

(২) দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের জন্য = ব্যক্তির ওজন × কাজে লিপ্ত ঘণ্টার সংখ্যা × কাজে উন্নতির হার ;

(৩) ব্যায়াম জনিত শক্তি = ব্যক্তির ওজন × কাজে লিপ্ত ঘণ্টার সংখ্যা × কাজের উন্নতির হার।

যদি কোন লোক তাহার দৈনন্দিন কার্যের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে, তবে অতিরিক্ত খাদ্য মেদরূপে দেহে সঞ্চিত হইবে, আবার কম মাত্রায় খাদ্য গ্রহণ করিলেও দেহ শীর্ণ হইয়া যাইবে। একজন সাধারণ লোকের ২৪০০ ক্যালোরী ও একজন সাধারণ স্ত্রীলোকের ২০০০—২১০০ ক্যালোরী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। হাল্কা কাজের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৭৫ ক্যালোরী, মাঝারি ধরনের কাজের জন্য ৭৫—১৫০ ক্যালোরী এবং শক্ত কাজের জন্য ১৫০—৩০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন।

সুষম খাদ্য (Balanced Diet)

শরীরের বৃদ্ধি, দেহের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সব খাদ্য গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী দরকার তাহাকে সুষম খাদ্য বলে। এই সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় আমাদের এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে—(১) দৈনন্দিন পরিপুষ্টির জন্য খাদ্য চাহিদার জ্ঞান, (২) যে সমস্ত খাদ্য এই চাহিদা মিটাইবে তাহার নির্বাচন, (৩) সেই সব নির্বাচিত খাদ্যের সাহায্যে প্রাতঃকালীন, মাধ্যাহ্নিক ও রাত্রির খাদ্যের আয়োজন করা, (৪) সুষ্ঠুভাবে ইহাদের রন্ধনের ব্যবস্থা, (৫) খাদ্য পরিবেশন করা।

খাদ্য নির্বাচন: ক্যালোরী, প্রোটীন, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন সম্বন্ধে শুধু জ্ঞান থাকিলেই খাদ্য নির্বাচন করা সম্ভবপর হয় না। কোন্ কোন্ খাদ্য এই সমস্ত অভাব পূরণ করিবে সেই বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। কোন্ ঋতুতে কোন্ স্থানে কি খাদ্য পাওয়া যায়, ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা, রুচি ও ধর্ম অনুযায়ী

কোন্ রকম খাদ্য তাহার সাধ্যায়ত্ত ও অভ্যাসগত ইহাও বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সমস্ত খাদ্যই দেহের শক্তিবর্ধক, গঠনকারক, ক্ষয়পূরক ও রোগ-নিবারক। খাদ্য বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ দেহে শক্তি উৎপাদন করে। প্রোটীন ও খনিজ পদার্থ দেহের ক্ষয়পূরণ করে ও দেহবৃদ্ধির সহায়তা করে। ভিটামিন, প্রোটীন ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য দেহরক্ষার কাজ করে এবং সেলুলোজ, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি দ্রব্য খাদ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা এসব খাদ্য কোন্ কোন্ জিনিসে পাই তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

কার্বোহাইড্রেট—চাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, রুটি, আলু, চিনি, বিস্কুট, মধু প্রভৃতি।

প্রোটীন—অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মসুর, সয়াবিন, ডিম, দুধ, দই, পনীর, মাংস, মাছ, চিনাবাদাম, কাজু বাদাম প্রভৃতি।

স্নেহ-জাতীয় পদার্থ—মাখন, ক্রিম, জান্তব চর্বি, ঘি, মাছ, নারিকেল তেল, সরিষার তেল, তিল তেল—হাইড্রোজেনেটেড চর্বি (দালদা, বনস্পতি প্রভৃতি)।

সেলুলোজ—আঙ্গুর, পেয়ারা, কাঁঠাল, জাম, লেবু, আম, আনারস, টমাটো, তেঁতুল, বেল ইত্যাদি। ঢেঁড়স, কলার খোসা, বরবটী প্রভৃতিতেও সেলুলোজ পাওয়া যায়।

লৌহ—সবুজ শাকসব্জী, বাঁধাকপি, গাজরের পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা, ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে লৌহ পাওয়া যায়।

ফস্ফরাস—গম, চাউল, মাছ, দুধ, দই, পনীর, ডিম, শাকসব্জী।

ভিটামিন 'এ'—সবুজ শাকসব্জী, বাঁধাকপি, ধনে পাতা, মাখন, ক্রিম, ডিমের কুসুম, দুধ, কড্লিভার অয়েল, পেঁপে, আম, যকৃৎ প্রভৃতি।

থিয়ামিন—গম এবং শস্যের লাল অংশ, আছাঁটা সিদ্ধ চাউল, ছোলা, মাংস, ডিমের কুসুম, ঈস্ট (Yeast)।

ভিটামিন 'সি'—লেবুজাতীয় ফল—কমলা, পাতিলেবু, কাগজী লেবু, মোসম্বী, আঙ্গুর, আমলকী, টাটকা সব্জী, অঙ্কুরিত ছোলা, ধনে পাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি।

রাইবোফ্লেবিন—সবুজ শাকসব্জী, বাঁধাকপি, ধনে পাতা, দুধ, ডিম, যকৃৎ, মাংস, মাছ, ঈস্ট প্রভৃতি।

খাদ্যদ্রব্যের এই সমস্ত গুণের বিচার করিয়া আমরা নিম্নলিখিত ভাবে বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।

দুধ : বাড়ন্ত শিশুর জন্য—২ পেয়ালা হইতে ৪ পেয়ালা
(১ হইতে ২ পাউণ্ড)

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য—৪ পেয়ালা (২ পাউণ্ড)

অন্যান্যদের জন্য—১ অথবা ২ কাপ (১ পাউণ্ড)

শাকসব্জী :	শিশুদের—	২ আউন্স
	বড়দের—	৪ আউন্স

টমাটো, লেবুজাতীয় ফল অথবা অঙ্কুরিত ছোলা :

	শিশুদের—	১ আউন্স
	বড়দের—	২ আউন্স
অন্যান্য তরকারী :	শিশুদের—	২ আউন্স
	বড়দের—	৩ আউন্স

মূলা অথবা কন্দ জাতীয় তরকারী :

	শিশুদের—	২ আউন্স
	বড়দের—	৩ আউন্স
ফল :	শিশুদের—	২ আউন্স
	বড়দের—	৩ আউন্স

ডিম : আমিষ খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্য ১টি

(নিরামিষ খাদ্য-গ্রহণকারীদের ১-২ আউন্স চিনাবাদাম বা অন্য বাদাম ; ডিমের পরিবর্তে দুধ)

মাছ এবং মাংস : আমিষ খাদ্য-গ্রহণকারীদের জন্য—৩ আউন্স

(নিরামিষাশীরা মাছ ও মাংসের পরিবর্তে ৩ আউন্স ডাল খাইবে)

শস্য : (চাউল, ময়দা, আটা)

	শিশুদের—	৮-১০ আউন্স
	বড়দের—	১৪ আউন্স
ডাল :	শিশুদের—	২ আউন্স
	বড়দের—	৩ আউন্স
স্নেহ-জাতীয় পদার্থ :		
	শিশুদের—	১ আউন্স
	বড়দের—	৩ আউন্স (ইহার মধ্যে ½ আউন্স মাখন ও ঘি)
চিনি ও গুড় :	শিশুদের-	১½ আউন্স
	বড়দের—	২ আউন্স
		ছয়-সাত গ্লাস।

সুষম খাদ্য কোন ব্যক্তি ঠিকমত পাইতেছে কিনা তাহা ঠিক করিবার জন্য একটা হিসাবের কার্ড (score card) রাখা উচিত। সুষম খাদ্য হইতে এই সব হিসাব বাদ দেওয়া হইবে : চা বা কফি শিশুদের পক্ষে দশ, সোডা অথবা রঙিন সরবৎ দশ, অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া করার জন্য দশ, খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া দশ, খাবার কোন একবার না খাইলে দশ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্যের হাল্কা, মাঝারি বা ভারী গুণ নির্ভর করে ব্যক্তির কর্মের গুরুত্বের উপর এবং পরিবারের আয়ের উপর। দুপুরবেলাতেই শিশুদের সবচেয়ে বেশী

খাদ্য খাওয়া উচিত। প্রাতরাশের সময় মোট দৈনন্দিন খাদ্য-দ্রব্যের প্রায় ½ অংশ দেওয়া উচিত। কারণ রাত্রির আহারের পর

পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা

সকালের প্রাতরাশের মধ্যে প্রায় ১২ ঘণ্টা ব্যবধান থাকে। সেজন্য মানসিক তৎপরতা বাড়াইবার জন্য ও অবসাদ দূর করিবার জন্য এই সময় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ½ অংশ বৈকালিক

ভোজন, মধ্যাহ্নের টিফিন প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া বাকী খাদ্য রাত্রির জন্য রাখা উচিত।

আদর্শ খাদ্য কি ধরনের হওয়া উচিত তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

	খাদ্য	সর্বাপেক্ষা কম দৈনিক কতটা দরকার	মান (Score)
১	দুধ বা চিনাবাদামের দুধ	২ কাপ (১ পাউণ্ড)	২০
২	টমাটো বা লেবুজাতীয় দ্রব্য	২ আউন্স	১৫
৩	সবুজ শাকসব্জী	৪ „	১৫
৪	অন্যান্য তরকারী	২ „	৫
৫	ফল	২ „	১০
৬	ডিম অথবা বাদাম	১ „	১০
৭	মাংস, ডাল বা দই	২ „	১০
৮	শস্যবর্গ (চাউল, ময়দা, আটা)	১২ „	৫
৯	স্নেহ-জাতীয় পদার্থ	১ „	৫
১০	জল	৬ গ্লাস অথবা অধিক	৫
			১০০

খাদ্য রন্ধন-প্রণালী

খাদ্যের উপর রন্ধনের প্রভাব (Effects of cooking on food)—তাপের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করাকে রন্ধন বলা হয়।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা আছে—

(১) অনিষ্টকারী পরজীবী ও জীবাণুদের ধ্বংস করিয়া ইহা খাদ্যের গুণ বর্ধিত করিয়া থাকে।

(২) রন্ধনের ফলে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বাড়ে।

(৩) উদ্ভিদ-কোষের প্রাচীর হইতে সেলুলোজ ভাঙ্গিয়া খাদ্যকে সহজপাচ্য করে। শ্বেতসার (Starch)-জাতীয় পদার্থের দানাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং খাদ্যবস্তুকে সহজেই হজম করা যায়।

খাদ্যের উপর তাপের প্রভাব খুব বেশী। অধিক উত্তাপে প্রোটীন জমিয়া যায়, শক্ত হয় ও হজমের বিঘ্ন জন্মায়। শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ শুষ্ক অবস্থায় জলে অদ্রবণীয়। রান্না করার ফলে ইহা সুঘ্রাণযুক্ত এবং সহজপাচ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা দুষ্পাচ্য। চাউল, চিনাবাদাম, পাঁউরুটীর উপর শুষ্ক উত্তাপ দিলে এইগুলি বেশ সহজেই হজম করা যায়। আর্দ্র উত্তাপে শস্যবর্গ (চাউল, ময়দা, আটা প্রভৃতি) জল শোষণ করে এবং সহজেই নরম হয়। তাপের সাহায্যে চিনি জাতীয় পদার্থকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করা হয়। বেশী উত্তাপ দিলে ইহা প্রথমে সিরাপের মত এবং পরে বাদামী চকোলেটের বর্ণ ধারণ করে। বেশী উত্তাপে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া বিকৃত ভাব ধারণ করে—ইহার গন্ধ নষ্ট হয় এবং হজমতন্ত্রের ব্যাঘাত জন্মায়।

কোন কোন খাদ্যদ্রব্যের গুণ রন্ধনের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এই নষ্ট হওয়া নির্ভর করে জলে পদার্থের দ্রাবণের মাত্রার উপরে। রন্ধনের সময় খোলা বাতাসে রাখিলে বা বেকিং সোডা দিলে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ভিটামিন পাইতে হইলে কোন কোন সব্‌জী বা তরকারী রন্ধনের পরিবর্তে কাঁচা অবস্থায় খাওয়া বাঞ্ছনীয়। টমাটো, মূলা, লেটুস শাক, ফুলকপি, শশা, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, পেঁয়াজকলি প্রভৃতি দ্রব্য কাঁচা খাওয়াই ভাল। বিশেষ করিয়া ভিটামিন 'সি' যে সব পদার্থে আছে সেগুলি রন্ধন না করাই উচিত। রন্ধন করিবার সময় আমাদের পরবর্তী কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভোজন, মধ্যাহ্নের টিফিন প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া বাকী খাদ্য রাত্রির জন্য রাখা উচিত।

আদর্শ খাদ্য কি ধরনের হওয়া উচিত তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্য	সর্বাপেক্ষা কম দৈনিক কতটা দরকার	মান (Scor
১। দুধ বা চিনাবাদামের দুধ	২ কাপ (১ পাউণ্ড)	২০
২। টমাটো বা লেবুজাতীয় দ্রব্য	২ আউন্স	১৫
৩। সবুজ শাকসব্জী	৪ „	১৫
৪। অন্যান্য তরকারী	২ „	৫
৫। ফল	২ „	১০
৬। ডিম অথবা বাদাম	১ „	১০
৭। মাংস, ডাল বা দই	২ „	১০
৮। শস্যবর্গ (চাউল, ময়দা, আটা)	১২ „	৫
৯। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ	১ „	৫
১০। জল	৬ গ্লাস অথবা অধিক	৫
		১০০

খাদ্য রন্ধন-প্রণালী

খাদ্যের উপর রন্ধনের প্রভাব (Effects of cooking on food)—তাপের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করাকে রন্ধন বলা হয়।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা আছে—

(১) অনিষ্টকারী পরজীবী ও জীবাণুদের ধ্বংস করিয়া ইহা খাদ্যের গুণ বর্ধিত করিয়া থাকে।

(২) রন্ধনের ফলে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বাড়ে।

(৩) উদ্ভিদ-কোষের প্রাচীর হইতে সেলুলোজ ভাঙ্গিয়া খাদ্যকে সহজপাচ্য করে। শ্বেতসার (Starch)-জাতীয় পদার্থের দানাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং খাদ্যবস্তুকে সহজেই হজম করা যায়।

খাদ্যের উপর তাপের প্রভাব খুব বেশী। অধিক উত্তাপে প্রোটীন জমিয়া যায়, শক্ত হয় ও হজমের বিঘ্ন জন্মায়। শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ শুষ্ক অবস্থায় জলে অদ্রবণীয়। রান্না করার ফলে ইহা সুঘ্রাণযুক্ত এবং সহজপাচ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা দুষ্পাচ্য। চাউল, চিনাবাদাম, পাঁউরুটীর উপর শুষ্ক উত্তাপ দিলে এইগুলি বেশ সহজেই হজম করা যায়। আর্দ্র উত্তাপে শস্যবর্গ (চাউল, ময়দা, আটা প্রভৃতি) জল শোষণ করে এবং সহজেই নরম হয়। তাপের সাহায্যে চিনি জাতীয় পদার্থকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করা হয়। বেশী উত্তাপ দিলে ইহা প্রথমে সিরাপের মত এবং পরে বাদামী চকোলেটের বর্ণ ধারণ করে। বেশী উত্তাপে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া বিকৃত ভাব ধারণ করে—ইহার গন্ধ নষ্ট হয় এবং হজমতন্ত্রের ব্যাঘাত জন্মায়।

কোন কোন খাদ্যদ্রব্যের গুণ রন্ধনের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এই নষ্ট হওয়া নির্ভর করে জলে পদার্থের দ্রাবণের মাত্রার উপরে। রন্ধনের সময় খোলা বাতাসে রাখিলে বা বেকিং সোডা দিলে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ভিটামিন পাইতে হইলে কোন কোন সব্জী বা তরকারী রন্ধনের পরিবর্তে কাঁচা অবস্থায় খাওয়া বাঞ্ছনীয়। টমাটো, মূলা, লেটুস শাক, ফুলকপি, শশা, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, পেঁয়াজকলি প্রভৃতি দ্রব্য কাঁচা খাওয়াই ভাল। বিশেষ করিয়া ভিটামিন 'সি' যে সব পদার্থে আছে সেগুলি রন্ধন না করাই উচিত। রন্ধন করিবার সময় আমাদের পরবর্তী কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভোজন, মধ্যাহ্নের টিফিন প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া বাকী খাদ্য রাত্রির জন্য রাখা উচিত।

আদর্শ খাদ্য কি ধরনের হওয়া উচিত তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদ্য	সর্বাপেক্ষা কম দৈনিক কতটা দরকার	মান (Score)
১। দুধ বা চিনাবাদামের দুধ	২ কাপ (১ পাউণ্ড)	২০
২। টমাটো বা লেবুজাতীয় দ্রব্য	২ আউন্স	১৫
৩। সবুজ শাকসব্জী	৪ ,,	১৫
৪। অন্যান্য তরকারী	২ ,,	৫
৫। ফল	২ ,,	১০
৬। ডিম অথবা বাদাম	১ ,,	১০
৭। মাংস, ডাল বা দই	২ ,,	১০
৮। শস্যবর্গ (চাউল, ময়দা, আটা)	১২ ,,	৫
৯। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ	১ ,,	৫
১০। জল	৬ গ্লাস অথবা অধিক	৫
		১০০

খাদ্য রন্ধন-প্রণালী

খাদ্যের উপর রন্ধনের প্রভাব (Effects of cooking on food)—তাপের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করাকে রন্ধন বলা হয়।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা আছে—

(১) অনিষ্টকারী পরজীবী ও জীবাণুদের ধ্বংস করিয়া ইহা খাদ্যের গুণ বর্ধিত করিয়া থাকে।

(২) রন্ধনের ফলে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বাড়ে।

(৩) উদ্ভিদ-কোষের প্রাচীর হইতে সেলুলোজ ভাঙ্গিয়া খাদ্যকে সহজপাচ্য করে। শ্বেতসার (Starch)-জাতীয় পদার্থের দানাগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং খাদ্যবস্তুকে সহজেই হজম করা যায়।

খাদ্যের উপর তাপের প্রভাব খুব বেশী। অধিক উত্তাপে প্রোটীন জমিয়া যায়, শক্ত হয় ও হজমের বিঘ্ন জন্মায়। শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ শুষ্ক অবস্থায় জলে অদ্রবণীয়। রান্না করার ফলে ইহা সুঘ্রাণযুক্ত এবং সহজপাচ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা দুষ্পাচ্য। চাউল, চিনাবাদাম, পাঁউরুটীর উপর শুষ্ক উত্তাপ দিলে এইগুলি বেশ সহজেই হজম করা যায়। আর্দ্র উত্তাপে শস্যবর্গ (চাউল, ময়দা, আটা প্রভৃতি) জল শোষণ করে এবং সহজেই নরম হয়। তাপের সাহায্যে চিনি জাতীয় পদার্থকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করা হয়। বেশী উত্তাপ দিলে ইহা প্রথমে সিরাপের মত এবং পরে বাদামী চকোলেটের বর্ণ ধারণ করে। বেশী উত্তাপে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ভাঙ্গিয়া বিকৃত ভাব ধারণ করে—ইহার গন্ধ নষ্ট হয় এবং হজমতন্ত্রের ব্যাঘাত জন্মায়।

কোন কোন খাদ্যদ্রব্যের গুণ রন্ধনের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এই নষ্ট হওয়া নির্ভর করে জলে পদার্থের দ্রাবণের মাত্রার উপরে। রন্ধনের সময় খোলা বাতাসে রাখিলে বা বেকিং সোডা দিলে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ভিটামিন পাইতে হইলে কোন কোন সব্‌জী বা তরকারী রন্ধনের পরিবর্তে কাঁচা অবস্থায় খাওয়া বাঞ্ছনীয়। টমাটো, মূলা, লেটুস শাক, ফুলকপি, শশা, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, পেঁয়াজকলি প্রভৃতি দ্রব্য কাঁচা খাওয়াই ভাল। বিশেষ করিয়া ভিটামিন 'সি' যে সব পদার্থে আছে সেগুলি রন্ধন না করাই উচিত। রন্ধন করিবার সময় আমাদের পরবর্তী কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। তরিতরকারী বা ফলের খোসার নীচেই ভিটামিন 'সি' থাকে। সেইজন্য যতটা সম্ভব ইহাদের খোসা না ছাড়াইয়া রন্ধন করা উচিত।

২। রান্না করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তরকারী কাটা দরকার। তরকারীর টুকরাগুলি যাহাতে বড় হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার ফলে রন্ধন করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্যের কম জায়গা বায়ুর ও উত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে আসে।

৩। খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন বেশীক্ষণ জলে থাকিলে জলের সঙ্গে মিশিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য বেশী জল দিয়া রান্না করিতে নাই।

৪। ডিম, মাংস এবং অন্যান্য প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ কম আঁচে রান্না করা ভাল—তাহা না হইলে প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৫। গরম খাদ্যদ্রব্যের ভিতর বাতাস ঢুকিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা খাদ্যদ্রব্যের ভিটামিন 'সি' নষ্ট করিতে পারে।

৬। একবার কোন খাদ্যদ্রব্য রান্না করিলে উহাকে পুনরায় গরম করা উচিত নয়।

আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ খাদ্যের উপর তাপের প্রভাব

দুধ—দুধকে উত্তপ্ত করিলে ইহার বর্ণ ও স্বাদের পরিবর্তন হয়। দুধ হইতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। দুধের উপরে সর পড়ে এবং পাত্রের তলায় ক্যাল্‌সিয়াম লবণ সঞ্চিত হয়। বেশী উত্তাপ দিলে ক্যাসিন জমিয়া যায় এবং পরে বাদামী ক্যারামেলের মত পদার্থ ও দুগ্ধ-শর্করায় পরিণত হয়।

তরকারী—তরকারীর বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কঠিন জলে তরকারী রান্না করা উচিত নয়। অনেক সময় অতিরিক্ত

সিদ্ধ করিলে তরকারীর স্বাদ ও পুষ্টি-মূল্যও কমিয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন সবুজ শাকসব্জী রান্নার বেলায় পাত্রের ঢাকনা খোলা রাখিলে ইহাদের রঙ ও গন্ধ বজায় থাকে, আবার অন্য ক্ষেত্রে পাত্রে ঢাকনা দিয়া রাঁধিলে সময় কম লাগে।

শস্যবর্গ (চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতি)—রন্ধনের ফলে ইহাদের রূপ বদলাইয়া যায়—ইহারা স্বাদযুক্ত ও সহজপাচ্য হয়।

ডাল-জাতীয় পদার্থ—এইগুলি রান্না করিবার আগে চার-পাঁচ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে অতি অল্প সময়েই রান্না করা যায়।

মাংস—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত উত্তাপে প্রোটীন জমিয়া যায়। অল্প আঁচে রান্না করিলে মাংস খাইতে সুস্বাদু, আকর্ষণীয় ও সহজপাচ্য হয়। নরম মাংস শুষ্ক উত্তাপে এবং শক্ত মাংস (যেমন মাংসের সুপ ইত্যাদি) আর্দ্র উত্তাপে রান্না করা হয়।

মাছ—মাংসের মত মাছও অতি সতর্কতার সহিত বিশেষ করিয়া অল্প আঁচেই রান্না ভাল। বেশী উত্তাপের ফলে ইহারও প্রোটীন অংশ জমিয়া যাইতে পারে।

ডিম—খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ডিম খুব প্রয়োজনীয়। কাস্টার্ড, পুডিং, অমলেট, কেক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ডিমের দরকার। ডিমের শ্বেতাংশ অ্যালবুমিন ও জলের একটি দ্রবণ। ডিমের কুসুমের প্রোটীন স্নেহপদার্থের চারিদিকে ইমালসানের (Emulsion) মত অবস্থান করে। ১৯৪° ফাঃ তাপে ইহারা জমিয়া যায়। এইজন্য ডিম বা ডিম্বজাত খাদ্যদ্রব্য অল্প আঁচে রান্না করা উচিত। খোসাশুদ্ধ ডিমকে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিলে হাইড্রোজেন সালফেট নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। ইহা ডিমের উপরিভাগে সবুজ রঙের মত দেখায়।

স্নেহ-জাতীয় পদার্থ—স্নেহ-জাতীয় পদার্থকে অতিরিক্ত মাত্রায় গরম করিলে তাহা হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। ইহার ফলে হজমের ব্যাঘাত হয়।

অনুশীলনী

1. Make a list of food that supply energy to our body. Compare Carbohydrate and Fat as sources of Calorie. (যে সকল খাদ্য আমাদের দেহে শক্তি যোগায় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। শর্করা-জাতীয় পদার্থের ক্যালোরী মূল্যের সহিত স্নেহ-জাতীয় পদার্থের ক্যালোরী মূল্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।)
2. Classify Carbohydrates and give an account of each of them. (শর্করা-জাতীয় পদার্থের শ্রেণীবিভাগ কর এবং তাহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।)
3. What is the effect of shortage of Calcium in diet? How can it be supplied properly? (খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাব ঘটিলে তাহার প্রভাব কি হয়? কি ভাবে ইহা সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ করা যাইতে পারে?)
4. What are the chief faults in the diet of an average family in West Bengal? State how they can be corrected. (পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ একটি পরিবারের খাদ্যে কি কি অভাব আছে, লিখ। ইহা কি ভাবে পূরণ করা যাইতে পারে?)
5. How may foods be classified? State what foods are used for repair and growth of body-tissue. (কি ভাবে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে? দেহতন্তুর ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য কি কি খাদ্য দরকার লিখ।)

6. What are Vitamins? How can they be classified? Give the names of some important Vitamins. (ভিটামিন কাহাকে বলে? ইহাদের শ্রেণীবিভাগ কি ভাবে করা যাইতে পারে? কতগুলি প্রয়োজনীয় ভিটামিনের নাম উল্লেখ কর।)
7. What are the important Amino acids? What part do they play in nutrition? (প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড সম্বন্ধে কি জান? পুষ্টি সম্পর্কে ইহার অবদান কি?)
8. What do you understand by balanced diet? Prepare a list of balanced diet for the Bengalees. (সুষম খাদ্য বলিতে কি বুঝ? বাঙ্গালীর একটি সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর।)
9. Give reasons of the following :—(i) Meat should be served with vegetables, (ii) Carbohydrates should be cooked in plenty of water. [নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কারণ নির্ণয় কর :—(১) মাংসের সঙ্গে শাকসব্জী পরিবেশন করা উচিত, (২) শর্করা-জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণ জলের সঙ্গে রন্ধন করা উচিত।]
10. Name the different constituents of food and describe their functions. (খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলির নাম কর এবং তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।)
11. Write a short essay on food as fuel. (ইন্ধন হিসাবে খাদ্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।)
12. What are the effects of cooking on food? (খাদ্যের উপর রন্ধনের প্রভাব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
13. Why Protein is of special importance in the diet? What is the difference between Protein from animal

and Protein from vegetable foods? Which is the better source of Protein—egg or dal, milk or whey? (খাদ্যে প্রোটীনের গুরুত্ব বেশী কেন? জান্তব প্রোটীন ও উদ্ভিজ্জ প্রোটীনের পার্থক্য কি? কোন্ রকম প্রোটীন উৎকৃষ্ট ধরনের—ডিম অথবা ডাল, দুধ অথবা ঘোল?)

14. What Vitamins are readily lost during cooking? What other nutrients may be affected by faulty cooking processes? Suggest some of the measures by which such losses may be reduced? (রন্ধনের সময় কোন্ কোন্ ভিটামিন নষ্ট হয়? রন্ধনের দোষে কোন্ পুষ্টিকর খাদ্যের অপচয় ঘটে? কি ভাবে এই অপচয় নিবারণ করা যাইতে পারে?)

15. Name some mineral elements present in our diet? What purpose do they serve in human body? (আমাদের খাদ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থগুলির নাম কর। মানবদেহে এইসব পদার্থ কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়?)

———

চতুর্থ অধ্যায়

বস্ত্র ও বস্ত্রধৌতি

জল

জল শ্রেষ্ঠ দ্রাবক। কোন দ্রব্যকে পরিষ্কার করিতে হইলে জলের বিশেষ প্রয়োজন। ইহা যে কোন জিনিসের উপরিভাগ হইতে অপরিষ্কৃত দ্রব্য দ্রবীভূত করিয়া দূরীভূত করে। ধোওয়ার ব্যাপারে ইহা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে, কারণ যে কোন প্রকার বস্ত্রের তন্তুর ভিতর হইতে পুঞ্জীভূত ময়লাকে ইহা দ্রবীভূত করিয়া ধুইয়া লইয়া যায়। জলের অণুগুলির গতিশীলতা অন্যান্য তরল পদার্থের অণুর গতিশীলতা অপেক্ষা অনেক বেশী; এইজন্য তন্তুর উপরিভাগের সঞ্চিত ময়লা জলের সাহায্যে সহজেই ঘর্ষণের দ্বারা দূরীভূত হইয়া যায়।

দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতিতে খুব পরিষ্কার জল পাওয়া দুষ্কর। প্রাকৃতিক জলের ভিতর বৃষ্টির জল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। তবে এক পশলা বৃষ্টির পর এই জল সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার কারণ বায়ুর ভিতর অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রিক এসিড এবং অন্যান্য দূষিত জৈব পদার্থ—যেমন ধূলা, ধোঁয়া, কালি ইত্যাদি রহিয়াছে। এগুলি এক পশলা বৃষ্টিতে ধুইয়া যাইবার পরে বৃষ্টির জল ধরিলে পরিষ্কার জল পাওয়া সম্ভবপর।

বৃষ্টির জল মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় মাটির ভিতরের অনেক রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত করিয়া লইয়া যায়। তারপর নদী, হ্রদ ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয় অথবা মাটির ভিতর দিয়া

চুয়াইয়া অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে জমিয়া থাকে। সেখান হইতে প্রস্রবণের ভিতর দিয়া উপরের দিকে উত্থিত হইতে থাকে।

জলের দ্রবণ-শক্তি আছে বলিয়া ইহার সংস্পর্শে যে সকল দ্রব্য আসে তাহার কিছু অংশ দ্রবীভূত হইয়া যায়। জল যখন সাজিমাটি (Sodium Carbonate), লবণ (Sodium Chloride), ইপ্‌সম সল্ট (Epsom Salt—Magnesium Sulphate) প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে তখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগকে দ্রবীভূত করে। জল চক (Calcium Carbonate), ম্যাগ্‌নেসিয়ান লাইম স্টোন (Magnesian Lime Stone) প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় সালফেট অথবা কার্বোনেট অব ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম গঠন করে। বিশুদ্ধ জলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট অদ্রবণীয়, কিন্তু জলের ভিতর কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকার ফলে ইহা ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেটকে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম বাইকার্বোনেটে রূপান্তরিত করে।

ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট + জল + কার্বন ডাইঅক্সাইড = ক্যাল্‌সিয়াম বাইকার্বোনেট ;

ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেট + জল + কার্বন ডাইঅক্সাইড = ম্যাগ্‌নেসিয়াম বাইকার্বোনেট।

এই বাইকার্বোনেটগুলি জলে দ্রবণীয়। উপরিউক্ত লবণ-জাতীয় পদার্থ থাকার দরুন ইহাদিগকে কঠিন জল বলা হয়। ইহা ধৌতি-শিল্পে বিশেষ ক্ষতিকর। কঠিন জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় না, এবং তাহা দ্বারা ডাল রাঁধিলে তাহা সুসিদ্ধ হয় না, হজমের ব্যাঘাত জন্মায়। কেট্‌লীর গায়ে কঠিন জলের একটা আস্তরণ (crust) পড়িয়া যায়। রেলওয়ে এঞ্জিনের বয়লারের ভিতরেও

এইরূপ আস্তরণ দেখা যায়। যে জলে সহজে সাবানের ফেনা হয় তাহাকে কোমল জল বলে। প্রস্রবণ, কূয়া ও নদীর জল সাধারণতঃ কঠিন।

কঠিন জল দুই প্রকার—(১) স্থায়ী, (২) অস্থায়ী। ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম লবণ সাবানের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করে বলিয়া ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সাবান সৃষ্টি করে। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না—ঘোলাটে ভাব সৃষ্টি করে অথবা সরের মত উপরে ভাসে। সহজে সাবানের ফেনা হয় না বলিয়া কঠিন জলে প্রচুর সাবানের অপব্যয় হয়। কতটুকু সাবানের অপচয় ঘটিবে ইহা ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম লবণের শতকরা ভাগের উপর নির্ভর করে। জলের কঠিনত্ব ডিগ্রীতে প্রকাশিত হয়—এক গ্যালন জলের সহিত এক গ্রেন ক্যাল্‌সিয়াম বাইকার্বোনেটের দ্রবণকে ১° ডিগ্রী বলা হয়।

যেহেতু জল কঠিন হওয়ার দরুন সাবানের অপচয় হয় সেইজন্য পরীক্ষাগারে জলের কাঠিন্য পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কঠিন জলে সাবানের ফেনা উৎপাদন করিতে কতটা সাবানের দরকার হয়—ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে। তারপর সেই একই পরিমাণ কোমল জলে কতটা সাবানের দরকার হয়—এই দুইটি বিভিন্ন ফলের তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা জলের কঠিনত্ব নির্ধারিত করা হয়। এই পরীক্ষা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় এক গ্রেন সোডিয়াম কার্বোনেট ১০ গ্রেন সাবানের সহিত প্রতিক্রিয়া করে। ৪০ ডিগ্রীর কম কঠিন জলকে কোমল জল বলা যাইতে পারে।

কঠিন জলের দরুন যে সব সর জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়—তাহা ময়লার সঙ্গে মিশিয়া কাপড়ের আঁশের সঙ্গে স্থায়িভাবে থাকে।

কোমল জল ব্যতীত ইহাকে সহজে দূরীভূত করা যায় না। এই জাতীয় পদার্থ থাকার দরুন কাপড়ের রঙ বিবর্ণ হইয়া যায়, আঁশ শক্ত হয় এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।

অস্থায়ী খরত্ব ও উহার দূরীকরণ—জলকে উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধ করিলেই অনেক সময় অস্থায়ী খরত্ব দূরীভূত হইয়া যায়। অস্থায়ী খরজলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম বাইকার্বোনেট দ্রবীভূত থাকে। এই জল গরম করিলে বাইকার্বোনেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বোনেট ও জলে বিয়োজিত হইয়া যায়।

ক্যাল্‌সিয়াম বাইকার্বোনেট = ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + জল।

ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট জলে অদ্রবণীয় বলিয়া নীচে থিতাইয়া পড়ে। তারপর পরিস্রাবণ-ক্রিয়ার ফলে ময়লাগুলি ফিল্টার কাগজে আটকাইয়া পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেট জলে কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত হয় বলিয়া ইহা সিদ্ধ করিয়া জল হইতে পৃথক্ করা যায় না। সুতরাং এই দ্রবণের সঙ্গে ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Caustic Soda) দিলে নীচে অদ্রবণীয় কার্বোনেট থিতাইয়া পড়ে।

স্থায়ী খরত্ব ও উহার দূরীকরণ—ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড ও সাল্‌ফেট জলে দ্রবীভূত থাকিয়া স্থায়ী খরত্বের সৃষ্টি করে। বর্তমানকালে বহু প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্থায়ী খর জলকে মৃদু করা হয়। তন্মধ্যে জিওলাইট পদ্ধতি (Zeolite Process), সোডিয়াম পারমুটিট (Sodium Permutit), সোডিয়াম সিলিকেট ও এলুমিনেটের দ্রবণ, রেজিনাস আয়ন একচেঞ্জ (Resinous Ion Exchange), ওয়াশিং সোডা, কাপড় কাচার সোডা প্রভৃতির সাহায্যে খর জলকে মৃদু করা হয়।

ম্যাগ্‌নেসিয়াম সাল্‌ফেট + সোডিয়াম কার্বোনেট = সোডিয়াম সাল্‌ফেট + ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেট ;

ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড + সোডিয়াম কার্বোনেট = ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেট + সোডিয়াম ক্লোরাইড ;

ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফেট + সোডিয়াম কার্বোনেট = ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট + সোডিয়াম সাল্‌ফেট ;

ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড + সোডিয়াম কার্বোনেট = ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট + সোডিয়াম ক্লোরাইড ।

সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম সাল্‌ফেট জলে দ্রবীভূত থাকিলেও দেহের পক্ষে তত অনিষ্টকর নয়। কাপড়চোপড় ধোওয়া সম্বন্ধে কঠিন জল আর্থিক দিক হইতে ক্ষতিকর।

একটি পরীক্ষা-নলে (Test tube) কিছু সাবানের দ্রবণ নেওয়া হইল। তাহার সঙ্গে পরীক্ষা করিবার জলের নমুনা দেওয়া হইল। তারপর পরীক্ষা-নলটি ঝাঁকানো হইল—যদি তৎক্ষণাৎ সাবানের ফেনা উৎপত্তি হয় তবে মনে করিতে হইবে ইহা কোমল জল। আর যদি ফেনার পরিবর্তে ইহা ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে তবে মনে করিতে হইবে ইহা খর জল।

জল সিদ্ধ করিয়াও জলের খরত্ব নির্ধারিত করা যাইতে পারে। যদি কতক্ষণ উত্তপ্ত করিলে পর নীচে থিতানো পড়ে তবে ইহা অস্থায়ী আর যদি কোন অধঃক্ষেপ না পড়ে তবে ইহা স্থায়ী খর জল। প্রায় সব রকম জলেই অল্প-বিস্তর স্থায়ী কঠিন ও অস্থায়ী কঠিন জল মিশানো থাকে। এই জন্য উভয় প্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী জল দূরীভূত করা দরকার। এইজন্য ওয়াশিং সোডা (কাপড় কাচিবার সোডা অথবা সোডিয়াম কার্বোনেট) সবচেয়ে সুবিধাজনক। ইহা উভয় প্রকার খরত্বকেই দূরীভূত করে, এবং

খুব সহজে পাওয়া যায়। সোডার পরিমাণ এই ভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে ইহা কম বা বেশী না হয়। বেশী হইলে জলের দ্রবণ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষারভাবাপন্ন হইবে। কড়া জলকে কোমল করিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে ইহা নির্ভর করিবে তাপমাত্রার উপর। খুব উত্তপ্ত জলে এক মিনিটের মধ্যে খর জল মৃদু হইয়া যাইবে আর ঠাণ্ডা জলে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিতে পারে। খর জলকে মৃদু করিতে কতটা সোডা লাগে ইহাও মোটামুটি নির্ধারিত করা যায়। প্রতি গ্রেন ক্যাল্‌সিয়াম বাইকার্বোনেটের জন্য ২ গ্রেন সোডা দরকার। ৪৫০ গ্রেনে এক আউন্স হয়। ২০ ডিগ্রীর ৩০ গ্যালন জলকে কোমল করিতে $২০ \times ২ \times ৩০ = \frac{১২০০}{৪৫০} = ২\frac{২}{৩}$ আউন্স সোডা লাগিবে।

কঠিন জলকে কোমল করিবার সময় সোডা ও সাবান একসঙ্গে ব্যবহার করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। সাবান জলে দেওয়া মাত্র কঠিনত্বের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া করে, সেইজন্য সোডা কোন কাজ করিতে পারে না—ইহার যথেষ্ট অপচয় হয়। সাবান দিবার ১০ মিনিট পূর্বে সোডা দিলে ভাল হয়। এ্যামোনিয়া দ্রবণ (Liq. ammonia-NH_4OH) কড়া জলকে কোমল করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা এইভাবে সম্পন্ন হয়—

এ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড + ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড = অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড + ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

ইহা ব্যয়সাধ্য। সোডার প্রক্রিয়া হেতু ধৌতি-শিল্পের যে সব তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা এ্যামোনিয়ার সাহায্যে পুনরুদ্ধার করা যায়। সোহাগার (Borax) সাহায্যেও কাপড় ধোওয়া যায়। তবে ইহা ক্ষীণজাতীয় ক্ষার। ২০ ডিগ্রী কঠিন জলের পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

কাপড় পরিষ্কার করিবার দ্রব্য (Cleaning agents)

সাবান, সোডা, রিঠা, সাবানের টুকরা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য ধৌতিশিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে সাবানের স্থান সর্বাগ্রে। ইহা ময়লা ও তৈলাক্ত পদার্থ দূরীভূত করে।

সাবান : ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম লবণ (Sodium Salt of Fatty acids)—কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের সহিত ফ্যাটি এসিড বা তৈলজাতীয় পদার্থের মিশ্রণে সাবান প্রস্তুত হয়। পূর্বে লোকে সাবানের ব্যবহার জানিত না। ইহা আকস্মিক ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে।

আদিম অধিবাসীরা তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করিতে কাঠ-পোড়ানো ছাই ব্যবহার করিত। এখন আমাদের দেশের লোকেরা থালা-বাসন মাজিতে ছাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ছাইয়ের ভিতর সোডিয়াম, পটাসিয়াম নাইট্রেট ও হাইড্রোক্সাইড থাকে ; সেইজন্য ছাইয়ের ভিতর ক্ষার-জাতীয় পদার্থের গুণ থাকে। তৈলজাতীয় পদার্থ রান্না করিবার সময় ইহা পাত্র হইতে পড়িয়া ছাইয়ের সঙ্গে মিশিবার ফলে সাবানের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে ফ্যাট মিশাইয়া সাবান তৈয়ারী করা হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও সাবান-শিল্প গৃহশিল্প হিসাবে চলিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছোট ছোট সাবানের কারখানার সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতে ও পৃথিবীতে বড় বড় বহু সাবান-শিল্পের প্রবর্তন হইয়াছে। বড় সাবান-শিল্পের সুবিধা এই যে, সাবান প্রস্তুত করিবার সময় যে গ্লিসারিনের উপজাত পদার্থ (By-Product) পাওয়া যায় তাহা তাহারা ধরিয়া রাখে এবং বিক্রয় করে। কিন্তু ছোট সাবান-শিল্পে ইহা রাখার কোন সুবিধা নাই।

সাবানের কাজ—সাবান জলকে আঁশের মধ্যে সহজে ঢুকিতে সাহায্য করে। কাপড়ের আঁশের উপর জল ঢুকিবার জন্য যে বাধা আছে তাহা সাবানের সাহায্যে দূরীভূত হয়। সুতরাং খালি জলের পরিবর্তে সাবানের দ্রবণ ব্যবহার করিলে ইহা সহজে কাপড়ের তন্তুকে ভিজাইতে পারে। ময়লাজাতীয় পদার্থের ভিতর তৈল জাতীয় পদার্থ ও ধূলাবালি মিশ্রিত থাকে। সাবানের দ্রবণ এই তৈলাক্ত পদার্থকে ছোট ছোট অণুতে ভাঙ্গিয়া ফেলে; তারপর এই অণুগুলি তন্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্রবণের মধ্যে ভাসিতে থাকে এবং ধূলাবালির কণাগুলি আল্‌গা হইয়া যায়। জলীয় কণাগুলির সচলতার দরুন ধূলাকণাগুলি সহজেই দূরীভূত হয়।

সাবানের শ্রেণীবিভাগ—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রকারের চর্বি, উদ্ভিজ্জ তৈল, সুগন্ধ দ্রব্য ও রঙের সাহায্যে (১) শক্ত সাবান, (২) নরম সাবান, (৩) তরল সাবান প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের সাবান তৈয়ারী হয়। তরল সাবান দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় না—শিল্প-পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয়। শক্ত সাবান বস্ত্রের উপরিভাগে সহজে ঘষিয়া লাগানো যায় না, কারণ এইগুলি সহজে জলে দ্রবীভূত হয় না। এইজন্য এই সাবানের খুব অপচয় হয়। নরম সাবান জলে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং ইহাতে প্রচুর ফেনা হয়। সুতরাং ইহার প্রচলন খুব বেশী।

সাবানের কঠিনতা ও কোমলতা নির্ভর করে তিনটি দ্রব্যের উপর—(১) বিভিন্ন প্রকারের ফ্যাট, (২) ক্ষারীয় দ্রবণ, (৩) সাবান প্রস্তুতের পদ্ধতি। উচ্চ শ্রেণীর ফ্যাটি এসিড—যেমন স্টিয়ারিন (Stearin), পামেটিন (Palmatin) এবং ট্যালো (Tallow) ও নারিকেল তৈলে শক্ত সাবান তৈয়ারী হয়। রেড়ির তেল এবং তিসির তৈল দ্বারা নরম সাবান প্রস্তুত করা হয়।

সাবান প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত ক্ষারীয় দ্রবণ সমূহের মধ্যে দুইটিই প্রধান—(১) কস্টিক সোডা (NaOH) এবং (২) কস্টিক পটাশ (KOH)। কস্টিক সোডার দ্বারা প্রস্তুত সাবান শক্ত হয় আর পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাবান নরম হয়। কস্টিক পটাশের দাম কস্টিক সোডার দাম অপেক্ষা বেশী। সাবান ঠাণ্ডা ও গরম দুই পদ্ধতিতেই তৈয়ারী হয়। গরম পদ্ধতিতে উৎপন্ন সাবান ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে উৎপন্ন সাবান অপেক্ষা অধিকতর শক্ত হয়।

ধৌতি-শিল্পে সাবান ছাড়াও আরও অনেক রকম সাবান—যেমন গায়ে মাখিবার সাবান, নির্বীজক সাবান, দাড়ি কামানোর সাবান, স্বচ্ছ সাবান প্রভৃতির প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রকারের তৈল, গন্ধদ্রব্য ও রঙের সাহায্যে এগুলি প্রস্তুত হয়। যে সব সাবান নির্বীজক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলির ভিতর শতকরা ৫ ভাগ বা শতকরা ১০ ভাগ কার্বোলিক এসিড (Carbolic acid) ব্যবহার করা হয়। বাজারে খুব প্রচলিত লাইফবয় সাবান বা কার্বোলিক সাবানে কার্বোলিক এসিড মিশানো থাকে। অনেক সময় জীবাণু-দোষ মুক্ত করিবার জন্য গন্ধকও (Sulphur) ব্যবহার করা হয়। তরল সাবান লাইজল, ডেটল প্রভৃতিতেও জীবাণুনাশক দ্রবণ (Antiseptic lotion) ব্যবহার করা হয়। কাপড় কাচিবার সাবানের কোন বিশেষ রঙ বা গন্ধ থাকে না। ইহারা সাদা, ক্রিম, হলদে অথবা কালো রঙের হয়। এগুলি বাজারে লম্বা পুরু পাতের আকারে, কেকের আকারে অথবা চূর্ণরূপে বিক্রয় হয়। লাক্স জাতীয় সাবান অতি পাতলা টুকরা ধরনের। এইগুলির সাহায্যে দামী জামা-কাপড় ধোওয়া হয়।

অনেক সাবানের রঙ গাঢ় ধরনের। রজন (Resin)-জাতীয় পদার্থের জন্য এই রকম রঙের উৎপত্তি হয়। রজন-জাতীয় পদার্থ

কাপড় পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা অনেকখানি কমাইয়া দেয়। সোডিয়াম কার্বোনেট, ক্লোরাইড অথবা সোডিয়াম সাল্‌ফেট সাবানের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু এইসব ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকার জন্য সাবান শক্ত হয়। ইহাদের উপস্থিতিতে রজন-জাতীয় পদার্থ এবং জলের মাত্রার আধিক্যও সাবানে থাকে।

সাবানের টুকরা (Soap flakes)—এই সাবানগুলি প্রশমিত (Neutral) সাবান। ইহাদের ভিতর পৃথক্ ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকে না। এই সাবান দেখিতে সাদা রঙের। বেশ শক্ত ভাল সাবান গুঁড়া করিয়া এইগুলি তৈয়ারী হয়। ইহাদের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা খুব বেশী। পশম ও রেশম বস্ত্রে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

উৎকৃষ্ট সাবানের গুণ—(১) ভাল সাবানে শতকরা ৩০ ভাগ জল এবং ৬১—৬৪ ভাগ ফ্যাটি এসিড থাকে, (২) ভাল সাবান রজন-জাতীয় পদার্থ ও পৃথক্ ক্ষারদ্রবণ হইতে মুক্ত, (৩) ভাল সাবান সহজেই জলে ফেনা উৎপাদন করে।

সাবান তৈয়ারীর উপকরণ :—

সাবান প্রস্তুতের জন্য দুইটি প্রধান উপাদান ব্যবহৃত হয়—(১)চর্বি বা তৈল-জাতীয় পদার্থ, (২) ক্ষারজাতীয় পদার্থ। ইহা ছাড়া সিলিকেট, স্টার্চ এবং সোপ স্টোন (Soap stone) ব্যবহৃত হয়।

ফ্যাট—ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারিনের সংমিশ্রণে ফ্যাটের উৎপত্তি। স্টিয়ারিন, পামিটিন, অলিন বিশুদ্ধ ফ্যাটের উদাহরণ। এইসব ফ্যাটের সঙ্গে এস্টার-জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাবান-শিল্পে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ চর্বি-জাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ট্যালো (Tallow), লার্ড (Lard) প্রাণিজ চর্বি আর নারিকেল তৈল, তূলা-বীজের

তৈল, তিসির তৈল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ চর্বি-জাতীয় পদার্থ। ট্যালোর ভিতরে স্টিয়ারিন, পামিটিন এবং অলিন এই তিন প্রকার ফ্যাটি এসিড আছে। ট্যালো-যুক্ত সাবান বেশ মসৃণ হয়। যদিও এই সাবানে প্রচুর ফেনার উৎপত্তি হয় না তবুও ইহার পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে। সাবানকে শক্ত করিবার জন্য ট্যালোর সহিত অন্যান্য তেল এবং চর্বি মিশানো হয়। গরু, শূকর ও ছাগলের চর্বি হইতে এইগুলি প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ইহার অভাব বলিয়া, বিদেশ হইতে—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া হইতে এই ট্যালো আনা হয়।

লার্ড (Lard)—স্টিয়ারিন ও অলিন দ্বারা লার্ড গঠিত। ইহা ট্যালো সাবান অপেক্ষা ভাল সাবান প্রস্তুত করে। ইহাতে সহজে সাবানের ফেনা হয়, কিন্তু ইহা মহার্ঘ বলিয়া কেবল গায়ে মাখা সাবানের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

নারিকেল তৈল—ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার সাহায্যে ভাল শ্বেত সাবান তৈয়ার করা যায়। ইহা কস্টিক সোডা বা পটাশের সঙ্গে খুব দ্রুত কার্যকরী হয় বলিয়া ঠাণ্ডা উপায়ে ইহার সাহায্যে সাবান তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

তূলা-বীজের তৈল—তূলা-বীজের তৈলের সাহায্যে ভাল সাবান তৈয়ার করা যায়। ভারতের অনেক জায়গায় তূলা-বীজ পাওয়া যায়। এই তৈল-যুক্ত সাবান সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় ও ফেনা উৎপন্ন করে, কিন্তু ফেনাগুলি স্থায়ী হয় না। ইহার সঙ্গে ট্যালো মিশাইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই সাবান তৈয়ার করিতে খরচ অনেক কম পড়ে। রেড়ির তৈল, চীনাবাদামের তৈল, মহুয়া-তৈল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তৈল ট্যালোর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বিভিন্ন রকমের সাবান প্রস্তুত হয়।

ক্ষার—কস্টিক সোডা অথবা কস্টিক পটাশ এই দুই রকমের ক্ষার ব্যবহার করা হয়। কস্টিক সোডার সাবান কস্টিক পটাশের সাবান হইতে বেশী শক্ত হয়। কস্টিক সোডা ছোট ছোট খণ্ডে পাওয়া যায়। সাবান-শিল্পে ব্লক কস্টিক সোডাই ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম সিলিকেট—ইহা একটি ভঙ্গুর পদার্থ এবং দেখিতে অনেকটা কাচের মত স্বচ্ছ। তরল সোডিয়াম সিলিকেট একটি চট্‌চটে তরল পদার্থ। ইহা ক্ষারজাতীয় পদার্থ এবং ভাল পরিষ্কার করিবার গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য। প্রশমিত সিলিকেটে শতকরা ৫ ভাগ হইতে ২৫ ভাগ সোডা থাকে। যদি বেশী সোডিয়াম সিলিকেট ব্যবহৃত হয় তবে সাবানের অপচয় হয়।

স্টার্চ—ক্ষারজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে ইহা একটি চট্‌চটে পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহা জলে দ্রবণীয় এবং সাবানকে শক্ত করিতে সাহায্য করে। ইহা সাবানের আকৃতির কোন পরিবর্তন করে না, কিন্তু ইহার পরিষ্কার করার ক্ষমতা কমিয়া যায়। শতকরা ১ ভাগ হইতে ২ ভাগ স্টার্চ ব্যবহার করা নিরাপদ ; ঠাণ্ডা অবস্থায় শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে।

সোপ স্টোন (Soap stone)—অনেক সময় শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ সোপ স্টোন ব্যবহার করা যায়। সোপ স্টোনের সিলিকেটের মত পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই বা স্টার্চের মত চট্‌চটে পদার্থ গঠন করিবার ক্ষমতা নাই।

লবণ (Sodium chloride)—তৈল ও ক্ষারীয় দ্রবণের মিশ্রণে দানা বাঁধিবার জন্য লবণ ব্যবহার করা হয়। ১০০ ভাগ তেলে ১২½ ভাগ লবণ ব্যবহার করা হয়।

রজন (Resin)—সাবানের দাম কমাইবার জন্য অনেক সময় রজন ব্যবহার করা হয়। রজনের কাপড় পরিষ্কারের ক্ষমতা কম।

ইহা সাদা পদার্থকে হলদে করে। চর্বি-জাতীয় পদার্থে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ বেশী রঞ্জন পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাবান প্রস্তুতকরণ :—

পূর্বেই বলা হইয়াছে যখন চর্বি বা তৈল-জাতীয় পদার্থ ক্ষার-জাতীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা হয় তখন চর্বি-জাতীয় ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারিনে বিশ্লিষ্ট হয় ; ফ্যাটি এসিড ও ও ক্ষার দ্রবণের সংস্পর্শে সাবান তৈয়ারী হয়।

সিদ্ধ করিয়া সাবান প্রস্তুতকরণ—(১) চর্বি, তৈল এবং ক্ষার-জাতীয় পদার্থ বিশুদ্ধ করা হয় এবং চর্বি-জাতীয় (প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ) পদার্থ বড় পাত্রে গলাইয়া লওয়া হয়।

(২) ক্ষীণশক্তি সম্পন্ন কস্টিক সোডার দ্রবণ ধীরে ধীরে মিশ্রণের উপর দেওয়া হয় এবং বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়।

(৩) কিছু চর্বি সাবানের (Saponified) আকার ধারণ করে এবং সাবান সমগ্র মিশ্রণের সঙ্গে ইমালসনের মত দেখায়। কস্টিক সোডার দ্রবণ ধীরে ধীরে মাঝে মাঝে যোগ করা হয়। এই কাজ তিন-চারি দিন ধরিয়া করা হয়।

(৪) সাবানের পাত্রে কস্টিক সোডার অতিরিক্ত দ্রবণ, সাবান, গ্লিসারিন ও অন্যান্য অশুদ্ধি থাকে। তারপর লবণজল দেওয়া হইলে সাবান পৃথক্ হইয়া আসে এবং উপরে ভাসিতে থাকে। ইহার নীচে তরল গ্লিসারিন ও অন্যান্য পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে। ইহাকে স্পেণ্ট লাই (Spent lye) বলা হয়।

(৫) স্পেণ্ট লাই পাতিত করিয়া গ্লিসারিন সংগ্রহ করা হয়।

(৬) উপরের সাধারণ স্তরের সঙ্গে জল মিশাইয়া সিদ্ধ করা হয় এবং ইহার ভিতর অবিকৃত (unsaponified) অবস্থায় পেইস্টের মত চর্বি থাকিতে পারে। আরও কস্টিক সোডা দ্রবণের সাহায্যে

সমগ্র চর্বিকেই সাবানে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। পূর্বের মত আরও লবণজল ব্যবহার করিয়া স্পেণ্ট লাইকে পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে।

(৭) সাবানকে তারপর বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করিতে হইবে যে পর্যন্ত না চারিটি স্তরের উৎপত্তি হয়। সকলের উপরের স্তরে শুধু ফেনা থাকিবে। দ্বিতীয় স্তরে খাঁটি সাবান, তৃতীয় স্তরে অশুদ্ধ কালো সাবান এবং চতুর্থ স্তরে ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকে।

(৮) তারপর খাঁটি সাবান ছোট ছোট পাত্রে লইয়া তাহার সঙ্গে রঙ ও গন্ধ মিশাইতে হইবে। ইহার পর ছাঁচে ফেলিয়া ছোট ছোট আকারে গড়িয়া ফেলিতে হয়।

ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুতকরণ—এই পদ্ধতিতে সহজভাবে অল্প সময়ে সাবান তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তৈলজাতীয় পদার্থের সহিত কস্টিক সোডা দ্রবণ মিশাইতে হয়। এই মিশ্রণের ফলে যে তাপের উদ্ভব হয় ইহা দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিতে দুই-এক দিন সময় লাগে। এই ভাবে সাবান প্রস্তুত হইলে তাহার পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা বেশী থাকে।

কি ভাবে গৃহে ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

উপকরণ ঃ—কস্টিক সোডা $\frac{1}{8}$ কিলোগ্রাম, জল ৪ কাপ (বড় কাপের), নারিকেল তৈল ১ কিলোগ্রাম, বেশন $\frac{1}{8}$ কিলোগ্রাম।

ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত-প্রণালী—(১) কস্টিক সোডা জলে দ্রবীভূত করিয়া একটি মাটির পাত্রে ৩ হইতে ৪ ঘণ্টা রাখিবে।

(২) একটি বড় পাত্রে বেশন এবং তৈলের মিশ্রণ করিবে।

(৩) তারপর ধীরে ধীরে কস্টিক সোডার দ্রবণ তেল ও বেশনের

দ্রবণের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হইবে। বারংবার হাতার সাহায্যে এই মিশ্রণকে ভালভাবে নাড়িতে হইবে যে পর্যন্ত না ইহা ঘন ভাব ধারণ করে।

(৪) তারপর ছাঁচে ঢালিয়া রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে শক্ত সাবান প্রস্তুত হয়।

নারিকেল তৈলের পরিবর্তে জান্তব চর্বিও ব্যবহৃত হয়।

ওয়াশিং সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট (Washing Soda or Sodium Carbonate)ঃ অল্প খরচে সোডা ও জলের সাহায্যে সিদ্ধ করিয়া কাপড় পরিষ্কার করা হয়। সাবানের মত পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা সোডার নাই। তবে ইহা চর্বি-জাতীয় পদার্থকে ভাঙ্গিয়া ইমালসানের মত পৃথক্ করে। ইহা এসিডের ক্রিয়া প্রশমিত করে। তূলা ও লিনেন জাতীয় বস্ত্রে এসিডের দাগ উঠাইতে এক পাঁইট জলে এক টেবিল চামচ সোডা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রিঠাঃ ইহা একটি গাছের ফল। বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে ইহা প্রচুর জন্মে। এই ফলের উপরের অংশের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে। গরম জলের সঙ্গে ইহা প্রচুর ফেনা উৎপন্ন করে। ইহা তূলা ও পশম-জাতীয় বস্ত্র অপেক্ষা রেশমী বস্ত্র ধুইতে ভাল ফল দেয়।

বাজারে শুষ্ক রিঠা ফল পাওয়া যায়। ইহার দাম খুব সস্তা। সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

ব্যবহার ঃ—রিঠার বীজ ফেলিয়া দিয়া খোসাটা নিতে হইবে। প্রায় ৮ আউন্স খোসা দুই পাঁইট গরম জলে ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা রাখিয়া নাড়িতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফেনা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়িবে। ধুইবার বস্ত্রটিকে ভালভাবে রিঠার জল দ্বারা ঘষিয়া

পরে প্রথমে গরম জলে রিঠার দ্রবণ ধুইয়া ফেলিতে হইবে। তারপর রঙ ফিরাইয়া আনিবার জন্য ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লইতে হইবে।

শিকাকাই (Shikakai) : ইহাও গাছেব ফল। দাক্ষিণাত্যে চুল স্যাম্পু করিবার জন্য ইহা ব্যবহার কবা হয়। ইহাও বস্ত্র পরিষ্কারের কাজে রিঠার মতই ব্যবহৃত হয়, তবে রিঠার মত পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

উপরিউক্ত জিনিসগুলি ছাডা আবও অন্যান্য দ্রব্য কাপড় পরিষ্কারেব জন্য ব্যবহৃত হয় ; তাহাদের কথা বলা হইতেছে।

সাবানের দ্রবণ—ইহা বেশ সস্তা। গৃহস্থালী সাবানকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বায়ু চলাচল যুক্ত ঠাণ্ডা ঘবে রাখা হয়। সাবানের পাতলা টুকরা (Soap flakes) দামী রেশমী ও পশমী কাপড়ের জন্য আর অন্যান্য সাবান গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। ১ পাঁইট জলে সাবানের টুক্‌রা মিশাইয়া পাত্রে সিদ্ধ করা হয়। সাবান জলে গলিয়া গেলে ঠাণ্ডা হইবার পর বোতলে রাখা হয়। ঘর্ষণদ্বারা পরিষ্কাব করিবার জন্য এই দ্রবণ ব্যবহাব করা চলে না ; আর সবরকম পরিষ্কার কবিবাব ব্যাপারেই ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

পরিষ্কার করিবার তরল পদার্থ (Cleansing fluid)—ছয়ভাগ টুকরা সাবান (সানলাইট বা বাব সোপ), চারিভাগ অ্যামোনিয়া, দুইভাগ গ্লিসাবিন, চারিভাগ মেথিলেটেড্ স্পিরিট পরিমাণমত জলে মিশাইয়া এই দ্রবণ হয়। প্রথমে সাবানের টুকরাগুলিকে জলে দিয়া আগুনেব তাপে দ্রবীভূত করা হয়, তাবপর বাকী উপকরণগুলি দেওয়া হয়। পরে সমস্ত তরল পদার্থটিকে শিশিতে রাখা হয়। এই দ্রবণে রেশমী ও পশমী বস্ত্র ধোওয়া সুবিধাজনক। ইহা ব্যবহারে বস্ত্রের উপরিভাগ বেশ মসৃণ হয়।

সোপ জেলী (Soap Jelly)—একভাগ সাবান ও পাঁচভাগ জলে এই জিনিস প্রস্তুত হয়। সাবান জলে মিশাইয়া ধীরে ধীরে আগুনের সাহায্যে উত্তপ্ত করিতে হয় যে পর্যন্ত না একটি জেলীর মত পদার্থের সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা হইলে ইহা কোন পাত্রে রাখা হয়। সাবানের দ্রবণের মতই ইহা ব্যবহার করা চলে।

সোপ পাউডার (Soap Powder)—কাপড় ধোওয়ার জন্য অনেক সময় বিভিন্ন প্রকারের পাউডার ব্যবহার করা হয়। তাহার মধ্যে সোডিয়াম কার্বোনেট ও সোডিয়াম পারবরেট (Sodium Perborate) প্রধান। ক্ষারীয় দ্রবণের জন্য তৈলাক্ত পদার্থ সহজেই দূরীভূত হয়, তবে বেশী ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করিলে কাপড়ের তন্তুর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই জন্য সব সময় জানাশোনা ভাল পাউডার ব্যবহার করা উচিত।

সালফোনেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহল (Sulphonated Fatty Alcohol or SFA Powder)—ইহা দেখিতে সোপ পাউডারের মত; কিন্তু এসিড বলিয়া ক্ষারীয় দ্রবণের ঠিক বিপরীত। ইহার সাহায্যে পশমী বস্ত্র ও রঙিন কাপড় ধোওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা বা ঈষদুষ্ণ জলে ইহা হইতে সহজেই ফেনা উৎপন্ন হয়। ইহা খুব দামী; সেইজন্যই সাবানের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা চলে না।

গমের খোসার দ্রবণ (Bran Solution)—গমের উপরি-ভাগের (তুষের) মধ্যে স্টার্চ, গ্লুটেন, সব্জী ও খনিজ পদার্থ আছে। জলের সঙ্গে ইহার দ্রবণ হইলে ইহাতে ক্ষার-জাতীয় পদার্থ থাকে না। ইহার ভিতর খনিজ লবণ থাকে বলিয়া ইহা কাপড়ের রঙের কোন পরিবর্তন করে না। এইজন্য কাপড়ে কাঁচা রঙ থাকিলেও ইহা কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। একভাগ গমের তুষের সঙ্গে চারি ভাগ জল মিশাইবার পরে এই মিশ্র পদার্থকে একটি পাত্রে লইয়া

এক ঘণ্টা ধরিয়া আগুনে উত্তপ্ত করিতে হইবে। জলের সঙ্গে গমের তুষের দ্রবণ প্রচুর পরিমাণে যোগ করিলে সাবানের ফেনার মত পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই দ্রবণের ভিতর রগড়াইয়া কাপড় ধোওয়া চলে। কাপড় বেশী ময়লা হইলে ইহার সহিত কিছু সাবান ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নিশাদলের দ্রবণ (Ammonium Chloride Solution)—চায়ের চামচের এক চামচ নিশাদল লইয়া জলের সহিত পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া গরম ও ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া ইহাকে এক গ্যালন করা হইল। ভারী পর্দা এবং পশমী বস্ত্র ধুইতেই এই দ্রবণের বেশী প্রয়োজন। ধুইবার বস্ত্রগুলি এই দ্রবণে ১০।১৫ মিনিট রাখিয়া পরে আস্তে আস্তে নিংড়াইয়া গরম জলে ধুইয়া লইতে হয়।

আঠার দ্রবণ (Glue wash)—এক আউন্স আঠা এক পাঁইট জলে দ্রবীভূত করিয়া ইহাকে বার ঘণ্টা রাখিবার পরে আর একটি ফুটন্ত-জলপূর্ণ পাত্রে ঢালা হইল। তারপর গলিত আঠার দ্রবণকে অর্ধ গ্যালন গরম জলের সহিত মিশানো হইল।

গ্যাবারডিন, সার্জ, কম্বল প্রভৃতি কাপড় ধুইবার জন্য এই দ্রবণ প্রশস্ত। ইহাতে সমস্ত তৈলের দাগ উঠিয়া যায়। ধুইবার কাপড়গুলি প্রায় ৩০ মিনিট উত্তপ্ত দ্রবণে রাখিতে হয়। প্রতি ৫ মিনিট অন্তর এই কাপড়গুলি নিংড়ানো দরকার এবং কয়েকবার গরম জলে ধোওয়া আবশ্যক।

প্যারাফিনে ধুইবার পদ্ধতি (Paraffin wash)—এই পদ্ধতিতে ধোওয়ার জন্য দুই গ্যালন গরম জল, এক আউন্স সোডিয়াম কার্বোনেট, দুই আউন্স সানলাইট সাবান, দুই চামচ প্যারাফিন—এই সকল উপকরণের দরকার। সোডা, সাবান ও জল একটা পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে সাবান গলিয়া যাইবে এবং

জল স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছিবে। পাত্রটি আগুনের উপর হইতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করা হইলে প্যারাফিন মিশাইয়া নাড়িতে হইবে। ধুইবার বস্ত্রগুলি এই দ্রবণে রাখিতে হইবে যাহাতে সহজে ইহারা দ্রবণ শুষিয়া লইতে পারে। তারপর আবার ৩০ মিনিট পর্যন্ত সিদ্ধ করা প্রয়োজন। সিদ্ধ করার সময়ে মাঝে মাঝে কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে নাড়িতে হইবে। প্যারাফিনের গন্ধ দূর করিবার জন্য বস্ত্রগুলিকে উন্মুক্ত বায়ুতে শুকানো দরকার। তৈলাক্ত পদার্থের সহিত ময়লা জমিলে এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা খুব সুবিধাজনক।

কাপড়ের দাগ তোলা (Removal of Stains) :

কাপড়ের সহিত অন্য কোন জিনিসের সংস্পর্শ ঘটিলে কাপড়ের তন্তু উহাদিগকে শোষণ করে, ইহাকে দাগ বলা হয়। এই সকল দাগ অনেক সময় জল ও সাবানের সাহায্যে তুলিয়া ফেলা যায়। কিন্তু কোন কোন দাগ উঠাইতে হইলে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। দাগগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, যেমন—(১) প্রাণিজ, (২) উদ্ভিজ্জ, (৩) চর্বিজাতীয়, (৪) বিভিন্ন প্রকারের রঙ, (৫) খনিজ।

প্রাণিজ দাগ—রক্ত, ডিম, দুধ, মাছ-মাংসের দাগ এই শ্রেণীতে পড়ে। এইগুলির ভিতরে প্রোটীন থাকার জন্য কোন অবস্থাতেই দাগযুক্ত বস্ত্র উত্তপ্ত করা বাঞ্ছনীয় নয় ; কারণ তাহা হইলে প্রোটীন তন্তুর গায়ে লাগিয়া থাকিতে পারে।

উদ্ভিজ্জ দাগ—চা, কফি, কোকো, ফল ও মদের জন্য এই দাগের সৃষ্টি হয়। এইগুলি অম্লজাতীয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রশমিত করিতে ক্ষারজাতীয় পদার্থের দরকার।

চর্বি-জাতীয় দাগ—তৈল বা চর্বি-জাতীয় পদার্থের সহিত কোন রঙ মিশানো থাকিলে এইরূপ দাগের সৃষ্টি হয়। এইগুলির ভিতরে

মাখন, অয়েল 'পেইণ্ট, বার্নিশ, আলকাতরার দাগ প্রভৃতি পড়ে। এইসব দাগ উঠাইবার আগে যে দ্রাবকে এইগুলি দ্রবীভূত হয় তাহা ব্যবহার করিয়া রঙ উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার রঙের দাগ—রঙ অম্ল ও ক্ষারজাতীয় উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। তদনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়।

খনিজ পদার্থের দাগ—এইগুলির মধ্যে লোহা, ছাপার কালি (কার্বনযুক্ত), কতগুলি বিভিন্ন প্রকারের ঔষধের দাগ ধরা হয়। প্রথমে অম্লজাতীয় পদার্থের দ্বারা দাগ পরীক্ষা করা হয়—তারপর অম্লজাতীয় পদার্থকে প্রশমিত করিতে ক্ষারজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয়।

ঘামের দাগ—ইহা প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ কোন শ্রেণীতেই পড়ে না। কারণ ইহার ভিতর প্রোটীন নাই বা উদ্ভিজ্জ প্রোটীনের মত ইহা অম্লজাতীয় নয়।

ঘাসের দাগ—ঘাস উদ্ভিদ্-শ্রেণীভুক্ত হইলেও এই দাগের ভিতর সবুজ ক্লোরোফিল থাকার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়।

দাগ তোলার সাধারণ নিয়ম—

(১) কাপড়ে দাগ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় জল ও সাবানের সাহায্যে সহজে দাগ উঠান যায়।

(১) প্রথমে কি ধরনের কাপড় তাহা চিন্তা করিতে হইবে—সূতী, রেশমী, পশমী বা কৃত্রিম তন্তুর (Synthetic fibre) কাপড় কিনা। তারপর কোন্ কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হইবে তাহার বিষয় ভাবিতে হইবে। রেশমী ও পশমী কাপড়ের জন্য খুব লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা উচিত। হাইড্রোজেন প্যারঅক্সাইড

পূর্বেই বলা হইয়াছে কাপড় বিভিন্ন তন্তু হইতে তৈরী হয়। এইজন্য বিভিন্ন উপায়ে দাগ উঠাইবার জন্য বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। নিম্নে ইহার একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

দাগ	অবস্থা	সাদা তুলা এবং লিনেন	রঙিন তুলা এবং লিনেন	রেশমী ও পশমী বস্ত্র	কৃত্রিম তন্তু
চা, কফি, কোকো ও চকোলেটের দাগ	সদ্য লাগা	গরম জল ঢালিতে থাক	১। গরম জলে ডুবাও ২। সোহাগার জলে ডুবাও। দুই কাপ জলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ সোহাগা মিশাও	রঙিন তুলার মত একই পন্থা	সোডিয়াম পারবোরেট দ্রবণে সিক্ত কর। ১ পাইটে এক টেবিল চামচ
ঐ	শুকনো	১। সোহাগার গুঁড়া বিছাইয়া দিয়া গরম জল ঢাল। ২। গ্লিসারিন দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ যে পর্যন্ত না দাগ উঠে।	১। পূর্বের মত সোহাগার দ্রবণে ডুবাও। ২। গরম জলে ডুবাও, গ্লিসারিন দিয়া ঘষ যে পর্যন্ত না দাগ উঠে।	১। সোহাগার দ্রবণে ডুবাও। ২। লঘু হাইড্রোজেন পারঅকসাইডের দ্রবণে রাখ।	ঐ

কোকোর দাগ এই ভাবে না উঠিলে বেনজিন ব্যবহার কর। ব্লটিং পেপারের সাহায্যে ধীরে ধীরে চাপ দাও।

দাগ	অবস্থা	সাদা তুলা এবং লিনেন	রঙিন তুলা এবং লিনেন	রেশমী ও পশমী	কৃত্রিম তন্তু
রক্ত, প্রোটীন	সন্ত লাগা	ঠাণ্ডা জলে ধোও	ঠাণ্ডা জলে ধোও	ঠাণ্ডা জলে ধোও	ঠাণ্ডা জলে ধোও
রক্ত, প্রোটীন	শুকনো	ঠাণ্ডা জল এবং লবণে ডুবাইয়া রাখ যে পর্যন্ত না দাগ উঠে।	সাদা তুলার মত একই পদ্ধতি	সাদা তুলার মত একই পদ্ধতি। যে সব বস্ত্র ধোওয়ার উপযোগী নয়, সেখানে স্টার্চের লেই ব্যবহার কর। বারবার এই পদ্ধতি অবলম্বন কর যে পর্যন্ত না দাগ উঠে।	
চর্বি জাতীয় পদার্থ	সন্ত লাগা	গরম সাবানজলে ধুইয়া ফেল	সাদা তুলার মত একই পদ্ধতি	১। সাবানের দ্রবণে ভিজাইয়া রাখ ২। ফ্রেঞ্চ চক দাগের উপরে দাও। দাগযুক্ত কাপড়কে ব্লটিং কাগজ দিয়া চাপ দাও। গরম ইস্ত্রির সাহায্যে ইস্ত্রি কর।	
চর্বি-জাতীয় পদার্থ	শুকনো	সাবানের দ্রবণ ব্যবহার কর	সাদা তুলার মত একই পদ্ধতি	”	
তরকারীর হলুদ ও তৈল-জাতীয় পদার্থের দাগ		১। সাবানজলে ধুইয়া ফেল। ২। সূর্যকিরণ ও বায়ুতে বিরঞ্জিত কর	১। সাবানের দ্রবণ ব্যবহার কর। ২। ১% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গেনেট দ্রবণের পর ৮% সোডিয়াম বাই-সালফেট দ্রবণ ব্যবহার কর।	১। সাবানের দ্রবণ ব্যবহার কর। ২। পটাশিয়াম পার-ম্যাঙ্গেনেটের দ্রবণের পর অ্যামোনিয়া দ্রবণে সিক্ত কর।	১। সাবান জলে ধুইয়া ফেল ২। সোডিয়াম পারবোরেট দ্রবণে বিরঞ্জিত কর।

দাগ	অবস্থা	সাদা তুলা এবং লিনেন	রঙিন তুলা এবং লিনেন	রেশমী ও পশমী	কৃত্রিম তন্তু
ডিমের দাগ	সদ্য লাগা	প্রথমে ঠাণ্ডা জলে, পরে সাবান ও গরম জলে ধুইয়া লও	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি
ডিমের দাগ	শুকনো	লবণ দিয়া তারপর গরম জল ঢাল	লবণের দ্রবণে ভিজাইয়া রাখ যে পর্যন্ত না দাগ উঠে	লবণের দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ	লবণের দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ
রঙের দাগ		১। জলে ডুবাইয়া রাখ ২। সাবানজলে ধুইয়া ফেল ৩। লঘু ক্ষারক বা এসিডে ডুবাও ৪। কোহল, অ্যামোনিয়া ও লঘু এসেটিক এসিড দ্রবণ ব্যবহার কর ৫। ব্লিচিং পাউডারের ঠাণ্ডা দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ (এক আউন্স ২ পাইট জলে দ্রবণ কর) ৬। জ্যাভেল (Javelle) দ্রবণ দিয়া বিরঞ্জিত কর	প্রথম তিন প্রকারের পদ্ধতি সাদা তুলার মত ৪। কোহল, অ্যামোনিয়া এবং লঘু এসিড দ্রবণ ব্যবহার কর ৫। পাকা রঙ হইলে ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ অথবা জ্যাভেল (Javelle) দ্রবণ তাড়াতাড়ি ব্যবহার কর	১। কোহল অথবা অ্যামোনিয়া ব্যবহার কর ২। হাইড্রোজেন পারঅকসাইড দ্বারা বিরঞ্জিত কর	১। সাবানজল ব্যবহার কর ২। ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ ব্যবহার কর

দাগ	অবস্থা	সাদা তুলা এবং লিনেন	রঙিন তুলা এবং লিনেন	রেশমী ও পশমী বস্ত্র	কৃত্রিম তন্তু
ঘাসের দাগ		১। কেরোসিনে ডুবাও ২। কোহলে ডুবাও	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি	কেরোসিনে ডুবাও
কালির দাগ (ছাপার কালি ব্যতীত)	সদ্য লাগা	১। দাগের উপরে লেবু অথবা টমাটো দিয়া ঘষ। ২। টক দুধ অথবা দইয়ের ভিতর আধ ঘণ্টা রাখিয়া দাও। দুধ যেন না শুকায়। তারপর সাবান জল ব্যবহার কর।	একই পদ্ধতি	টক দুধ বা দই বা দইয়ের দ্রবণে রাখ	একই পদ্ধতি
কার্বন যুক্ত কালো কালি (ইহা সহজে উঠে না)		লঘু আয়োডিন দ্রবণ অথবা লঘু সোডিয়াম থাইও সালফেট অথবা পোটাসিয়াম সায়নাইড (অত্যন্ত বিষাক্ত) দ্রবণে বার বার একের পর আর এক দ্রবণে ডুবাও।	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি
লোহের মরিচার দাগ		১। লঘু অকজ্যালিক এসিড দ্রবণে ডুবাইয়া লঘু সোহাগার (Borax) দ্রবণে ঘষ।	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি

দাগ	সাদা তূলা এবং লিনেন	রঙিন তূলা এবং লিনেন	রেশমী ও পশমী	কৃত্রিম তন্তু
১। ঘামের দাগ	১। ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখ। ২। অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ। ৩। ভিজা অবস্থায় কাপড়টিকে বিরঞ্জিত হইবার জন্য রৌদ্রে রাখ। ৪। Javelle (জ্যাভেল) জল দ্বারা বিরঞ্জিত কর।	১। পাকা রংয়ের জন্য সাদা তূলার মত একই পদ্ধতি। ২। প্রথমে লঘু অ্যামোনিয়ার দ্রবণে রাখ। তারপর লঘু হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও সোড়িয়াম হাইনো সালফাইট দিয়া ধুইয়া ফেল।	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি
শিশুদের ন্যাপ-কিনে প্রস্রাবের দাগ।	১। ফ্রেঞ্চ চক ও জলের একটি লেই ব্যবহার কর। দ্রাবক সাবান ব্যবহার কর। প্রথমে ইথাইল অ্যালকোহল দ্বারা বাষ্পীভবন কর, তারপর ক্লোরোফর্ম ব্যবহার কর। ইহাকেও বাষ্পীভূত হইতে দাও।		চর্বি-জাতীয় দাগ যেভাবে উঠানো হয়, সেই পন্থা অবলম্বন কর। এক ঘণ্টা রাখ। তারপর পাউডার-গুলি ঝাড়িয়া ফেল।	

দাগ	অবস্থা	সাদা তুলা এবং লিনেন	রঙিন তুলা এবং লিনেন	রেশমী ও পশমী	কৃত্রিম তন্তু
লাল কালি	সদ্য লাগা	১। সাবান জলে ধুইয়া লও। ২। সোহাগার দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ।	সোহাগার দ্রবণে ডুবাও।	লঘু অ্যামোনিয়ার দ্রবণে ডুবাও।	রেশমের মত একই পদ্ধতি
লাল কালি	শুকনো ও পাকা রং	১। পাকা রং উঠানোর মত পদ্ধতি। ২। ডিমের সাদা ও কুসুম মেশাইয়া তাহাতে ২।১ ফোঁটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দাও। এই দ্রবণে ইহা ধুইয়া লও যে পর্যন্ত না সব দাগ উঠিয়া যায়। ৩। তারপর লবণ দ্রবণের সাহায্যে ডিমের দাগ উঠাইয়া ফেল।	একই পদ্ধতি		
ঔষধের দাগ		১। গরম জলে ডুবাও। ২। অকজ্যালিক অ্যাসিডে ডুবাও, তারপর সোহাগার দ্রবণে ডুবাও। ৩। মিথাইল অ্যালকোহলে ডুবাও।	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি	একই পদ্ধতি
অয়েল, পেইণ্ট ও বার্নিশ		১। কেরোসিন বা তার্পিণ তেলে ডুবাও। সাবান দিয়া ধুইয়া ফেল। ২। কোহলে ডুবাও, সাবানে ধুইয়া ফেল।	কেরোসিন অথবা টারপেণ্টাইনে ডুবাও। সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেল।		রেয়ন তন্তুতে অ্যালকোহল ব্যবহার অনুচিত।

ব্যবহার করিতে হইলে এক পাঁইট জলে এক চামচ হাইড্রোজেন প্যারঅক্সাইড ব্যবহার করা উচিত। রেশম ও পশম জাতীয় জিনিসে ইহা ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম তন্তুর (যেমন—রেয়ন) পক্ষে হাইড্রোজেন প্যারঅক্সাইড ক্ষতিকর। রেয়ন ধুইবার জন্য সোডিয়াম পারবোরেট ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের পরে কাপড়কে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত করিতে হইলে বার বার ঠাণ্ডা জলে ধোওয়া উচিত।

(৩) দাগের স্বরূপ জানা থাকিলে ঠিক সেই রকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত।

(৪) অজানা দাগযুক্ত কাপড়কে প্রথমে ঠাণ্ডা অথবা গরম সাবান-জলে ভিজাইয়া ধুইতে হয়। তারপর প্রথমে মৃদুশক্তি-সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ, পরে গাঢ় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে কৃতকার্য না হইলে সম্পূর্ণরূপে বিরঞ্জন পদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

(৫) সমস্ত অম্লজাতীয় পদার্থ ক্ষারজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রশমিত করিতে হইবে।

(৬) যদি স্পঞ্জের সাহায্যে দাগ উঠাইতে হয় তবে দাগ উঠানোর রাসায়নিক দ্রবণে স্পঞ্জ ভিজাইয়া লইয়া দাগের ঠিক বাহিরের দিক হইতে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে আসিতে হইবে। ইহার ফলে দাগ ছড়াইয়া পড়িতে পারে না।

কাপড় ধুইবার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মুলনীতি সমূহ

কাপড় ধুইবার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য—(১) কাপড়ের ভিতরের ময়লা দূরীভূত করা, (২) তারপর মাড়, নীল, টিনোপল প্রভৃতির সাহায্যে ইস্ত্রি করিতে হয় যাহাতে ইহা বেশ পরিষ্কার দেখায়।

কাপড়ে 'শুধু ময়লা কিংবা চর্বির সহিত মিশ্রিত ময়লা থাকিতে পারে। শুধু ময়লা ঝাড়িয়া মুছিয়া বা সাবান-জলের দ্রবণে রাখিয়া দূর করা যায়। ময়লার সঙ্গে চর্বি-জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে প্রথমে দ্রাবকের সাহায্যে ইহাকে শুষিয়া লওয়া হয় অথবা ইমালসানরূপে (ছোট ছোট তৈলবিন্দু রূপে) কাপড় হইতে পৃথক্ করা হয়। এই ময়লা পরিষ্কার করিতে হইলে কাপড়কে রগড়াইতে বা আছড়াইতে হয়। তাহার জন্য কাপড়ের উপর চাপ দেওয়া প্রয়োজন। এই চাপ চারি রকম ভাবে দেওয়া যাইতে পারে—(১) জোরে রগড়ানো, (২) হাল্‌কাভাবে রগড়ানো, (৩) শোষণযন্ত্রের ব্যবহার, (৪) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার।

জোরে রগড়ানো—শক্ত ও টেকসই আঁশযুক্ত তূলা ও লিনেনের কাপড় এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা হয়। হাতের সাহায্যে ঘষা যায় অথবা ব্রাশ, স্ক্রাবিং বোর্ডের (Scrubbing Board) সাহায্যেও ঘষা যাইতে পারে। আমাদের দেশে ধোপারা যেমন শক্ত জিনিসের উপর কাপড় আছড়ায়, সেইরূপ গৃহেও সিমেন্টের উপর কাপড় আছড়ান হয়। ইহাতে কাপড়ের তন্তুর উপর সমানভাবে চাপ পড়ে না, ইহার ফলে কাপড় শীঘ্রই ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। যে সকল কাপড় ছোট ও হাল্‌কা (যেমন—ব্লাউজ, রুমাল প্রভৃতি) সেইগুলি হাতের সাহায্যে রগড়াইলেই চলে।

প্রথমে জামা বা কাপড়টি গরম সাবানজলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর ধীরে ধীরে রগড়াইলেই পরিষ্কার হয়। অনেকে ভিজানো অবস্থায় কাপড়ের উপর সাবান লাগাইয়া পরে ইহাকে রগড়ায় বা আছড়ায়। এই পদ্ধতিতে সাবানের অপচয় হয়। খুব শক্ত আঁশযুক্ত কাপড়—ঝাড়ন, এপ্রন প্রভৃতি আর যেগুলি খুব ময়লাযুক্ত সেগুলি ব্রাশ বা স্ক্রাবিং বোর্ডের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে

হয়। প্রথমে কাপড়টিকে গরম জলে রাখা হয়, পরে গরম জল নিংড়াইয়া বাহির করিয়া ইহাকে পাতিয়া রাখা হয়। তাহার পর সাবান লাগানো হয় যতক্ষণ না প্রচুর ফেনার উৎপত্তি হয়। অবশেষে স্ক্রাবিং বোর্ডের সাহায্যে রগড়াইয়া ময়লা দূরীভূত করা হয়।

হাল্কাভাবে বা অল্প চাপে রগড়ানো—রেশমী, পশমী প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্র এই উপায়ে ধৌত করা হয়। একটি পাত্রে গরম জলের ভিতরে কিছু সাবানেব টুকরা বা রিঠার দ্রবণ লইবে। পরে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া তন্তুর উপযোগী উত্তাপে আনিবে। যাহাতে প্রচুর ফেনার উৎপত্তি হয়, সেইজন্য ইহাকে ভালভাবে নাড়িতে হয়। তারপর বস্ত্রটি সেই দ্রবণে রাখিয়া হাতের সাহায্যে রগড়াইতে হয় যে পর্যন্ত না সমস্ত ময়লা দূরীভূত হয়। যদি ফেনা না থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত ময়লা দূরীভূত হয় নাই। তখন আরও সাবান জলে গুলিয়া রগড়াইতে হইবে।

শোষণযন্ত্রের ব্যবহার—যে কোন রঙের যে কোন তন্তুজাত বস্ত্র এই যন্ত্রের সাহায্যে ধোওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ কম্বল, পাজামা, কোট প্রভৃতি ভারী দ্রব্য এই শোষণযন্ত্রের সাহায্যে ধৌত করা হয়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে। এই যন্ত্রের বিষয় তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ।

একটি পাত্রে গরম জলের সাহায্যে সাবানের দ্রবণ তৈয়ার করিয়া তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া ইহাকে তন্তুর উপযোগী উত্তাপে আনয়ন করিতে হইবে। তারপর বস্ত্রটি দ্রবণের ভিতর রাখিয়া শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে চাপ দিবে। শোষক-নলটি ক্রমাগত উঠা-নামার ফলে এই কাজ ধীরে ধীরে হইতে থাকে। যদি সাবান-জল নষ্ট হইয়া যায় তবে নূতন সাবান-জল ব্যবহার করা

আবশ্যক। যে সব সাবান-জল কাপড়ে লাগিয়া থাকে তাহা গরম জলের সাহায্যে ধুইয়া ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—কাপড় ধোওয়ার কল (Washing machine)—পাশ্চাত্য দেশে কাপড় ধোওয়ার ছোট বড় নানা ধরনের কল গৃহে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। ইহার দুইটি প্রধান অংশ থাকে—একটি পাত্র আর একটি সচ্ছিদ্র নলের মত। ঘূর্ণনের ফলে নলটি দ্রবণের মধ্যে ডুবানো কাপড়কে ভালভাবে বগড়াইতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই মেসিন পাওয়া যায়। তবে গৃহকর্ত্রীর জানিতে হইবে এই মেসিনের সাহায্যে আর্থিক সুবিধা হইবে কিনা, কি ভাবে এই মেসিন কার্যকরী করিতে হইবে এবং কি ভাবে ইহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

পরিপাটিরূপে ভাঁজ করা (Finishing): কাপড় ধোওয়ার পর ইহা কুঁচকানো অবস্থায় থাকে, ইহার কোন ভাঁজ থাকে না। এইজন্য ইহাকে পরিপাটি করিয়া ভাঁজ করিতে হয় যাহাতে ইহা নূতন অবস্থার মত দেখায়। ইস্ত্রি করিয়া, চাপ দিয়া বা বাষ্পের সাহায্যে পরিপাটিরূপে কাপড় ভাঁজ করা হয়। এই কাজের জন্য তন্তুর পক্ষে আর্দ্রতা একান্ত দরকার। কারণ তন্তুগুলি নরম অবস্থায় চাপ দিলে সহজে এগুলিকে সোজা করা যায়। এই জন্যই তুলা বা তন্তুর কাপড় ইস্ত্রি করিবার পূর্বে জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়। রেশমী এবং পশমী বস্ত্রও এইভাবে ভিজাইয়া নিতে হয়। কিন্তু বস্ত্রের উপরে যদি সমানভাবে জল না পড়ে ইহা ইস্ত্রি করিবার পূর্বে অর্ধশুষ্ক অবস্থায় রাখিলেই ভাল।

ভিজান (Damping)—তন্তুকে নরম করিবার জন্য ভিজানো দরকার।

ভিজানোর নিয়ম :—

(১) গরম জল কাপড়ের তন্তুকে তাড়াতাড়ি প্রসারিত করে বলিয়া গরম জল ব্যবহার করা প্রয়োজন।
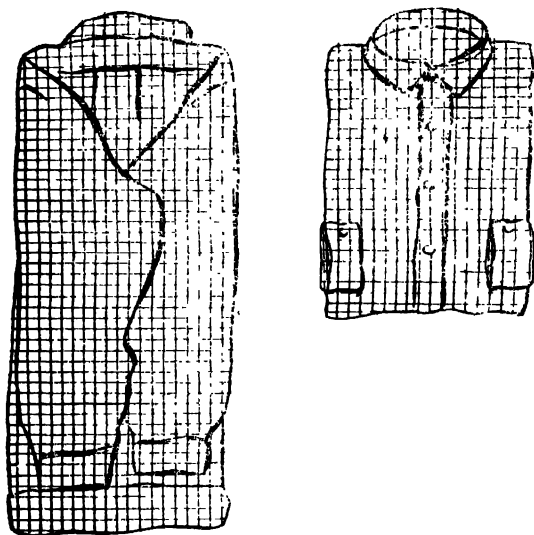
শার্ট ভাঁজ করার পদ্ধতি

(২) প্রথমতঃ কাপড়ের মুড়ি, ভাঁজ ও প্লিটগুলি আঙ্গুলের সাহায্যে ভিজাইয়া লইতে হইবে।

(৩) কাপড়টিকে একটি পরিষ্কার টেবিলের উপরে রাখিয়া ইহার উপরে ধীরে ধীরে জলের ছিটা দিতে হইবে।

(৪) তারপর কাপড়টিকে গুটাইয়া একটি তোয়ালে দিয়া মুড়িয়া ১৫ হইতে ২০ মিনিট রাখিলেই ঠিক হইবে।

ইস্ত্রি করা (Ironing) : উত্তপ্ত ইস্ত্রিকে চাপের সহিত কাপড়ের উপর সামনে পিছনে চালানকেই ইস্ত্রি করা বলে। তন্তুর গুণ অনুযায়ী উত্তাপের মাত্রার তারতম্য হইবে। রেশমী কাপড়ও

গরম ইস্ত্রির সাহায্যে ইস্ত্রি করা চলে, তবে তাহার তাপমাত্রা খুব কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। পশম ও লিনেন বস্ত্রের উপর তাপের মাত্রা বেশী হওয়া প্রয়োজন। পশমী কাপড় ইস্ত্রি করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ক্রেপ ও মখমল (Velvet) কাপড়ের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

ইস্ত্রি করিবার পদ্ধতি—(১) ভালভাবে ইস্ত্রি করিতে হইলে একটি পরিষ্কার গরম ইস্ত্রি ও শক্তপ্যাডযুক্ত বিছানা দরকার।

(২) শাড়ী, টেবিল ক্লথ প্রভৃতি ইস্ত্রি করিবার জন্য ৪ ফুট লম্বা, ২½ ফুট চওড়া এবং ৩ ফুট উঁচু টেবিল এবং একটি পাত্রে জল রাখা দরকার।

(৩) একটি টেবিলের উপর কম্বল রাখিয়া তাহার উপরে একটি পরিষ্কার কাপড় রাখিতে হইবে। কুঁচকানো জায়গাগুলি যেন মসৃণ হইয়া যায় এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

জামা ইস্ত্রি করা

(৪) ভিজানো কাপড়টি খুলিয়া টান করিয়া পাতিতে হইবে। কাপড়ের মুড়ির দুই দিকেই সমানভাবে ইস্ত্রি করিতে হয়। গরম ইস্ত্রি কাপড়ের উপর সামনে পিছনে চালাইয়া ইস্ত্রি করিতে হয়।

চাপ দেওয়া (Pressing)—ইস্ত্রির সাহায্যেই চাপ দেওয়া হয়। তবে ইস্ত্রি করার মত সামনে পিছনে চাপ দেওয়া হয় না। শুধু যেখানে যেখানে কুঁচকানো বা অমসৃণ থাকে সেইখানেই চাপ দেওয়া হয়। জর্জেট, ক্রেপ প্রভৃতি কাপড় এইভাবে চাপ দিয়া সমান করা হয়।

বাষ্পের সাহায্যে ধৌতকরণ (Steaming)—মখমল (Velvet)

জাতীয় কাপড় এইভাবে পরিষ্কার করা হয়। কাপড়টিকে ভিজাইয়া লইয়া কেটলীর গরম বাষ্পের সামনে রাখিলে বাষ্প কাপড়ের তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাকে সোজা করিয়া তোলে।

ম্যাঙ্গলিং (Mangling)—ঝাড়ন, সতরঞ্চি প্রভৃতি ভারী জিনিস ধোওয়ার পর চাপ দিয়া সমান করা হয়; ইহাকে ম্যাঙ্গলিং বলে।

ক্যালেণ্ডারিং (Calendaring)—ব্যবসাক্ষেত্রে তুলা, লিনেন বস্ত্র প্রভৃতি ধৌত করিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হয়। দুইটি উত্তপ্ত রোলারের ভিতর কাপড় নিয়া ভালভাবে ঘোরানো হয়। এইভাবে জল শুকাইয়া যায় এবং রোলার ঘোরানোর ফলে কাপড় ইস্ত্রি হয়।

তুলা ও লিনেন বস্ত্র ধুইবার প্রণালী—(১) প্রথমে যাহাতে কাপড়ের তন্তু নষ্ট না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাপড় ধুইতে হইবে।

(২) যাহাতে কাপড়ের রঙ নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে।

(৩) মাড় দেওয়ায় ও ইস্ত্রি করার ফলে কাপড় যেন প্রায় নূতনের মত দেখায়।

কাপড়ে দাগ বা ছেঁড়া জায়গা থাকিলে প্রথমে দাগ উঠাইয়া পরে ধোওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। ময়লা কাপড়গুলি একটি পাত্রে সাবানজলের মধ্যে রাখিবে। দেখিতে হইবে পাত্রটিতে যেন মরিচার দাগ না থাকে। বেশী ময়লা থাকিলে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা দরকার। মোটা কাপড়, ঝাড়ন, বিছানার চাদর, শাড়ী, ধুতি, টেবিল ক্লথ, রুমাল এইগুলি আলাদা রাখিয়া পরে কাচা উচিত।

রেশমী বস্ত্র ধুইবার প্রণালী—রেশমী বস্ত্র প্রাণিজ তন্তুদ্বারা

নির্মিত বলিয়া ইহা ধৌত করিতে বেশ যত্নের দরকার। উগ্র ক্ষার, উত্তাপ ও জোরে ঘর্ষণ রেশম-তন্তুর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহার ভিতর নাইট্রোজেন-ঘটিত দ্রব্য আছে বলিয়া ক্ষারজাতীয় পদার্থ ও উত্তাপ এই তন্তুকে শক্ত করে এবং রঙ বিবর্ণ করিয়া দেয়; বিশেষ করিয়া সাদা তন্তু হলদে হয়। অত্যধিক মাত্রায় ঘর্ষণও রেশম তন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর।

রেশম নানা রকমের; যেমন—মখমল, জর্জেট, ক্রেপ। কোন কোন রেশমে পশম, তূলা এবং লিনেন মিশ্রিত থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উত্তাপ, অত্যধিক ঘর্ষণ ও উগ্র ক্ষার বর্জনীয়।

প্রথমে ছেঁড়া বা দাগ থাকিলে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর ধুইতে দেওয়া উচিত। কি ভাবে দাগ উঠাইতে হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সাবানজলে ডুবানো—তূলার কাপড়ের মত রেশমী কাপড় সাবান-জলে ডুবাইবার দরকার করে না। ইহা সহজেই পরিষ্কার হয়। অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে যে সমস্ত রেশমী কাপড়ে ময়লা জমিয়াছে বা যাহার রঙ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা অল্প সময়ের জন্য গরম জলে ডুবাইয়া লওয়া যাইতে পারে। একটু সোহাগা দিলে আর একটু ভাল ফল পাওয়া যায়। রেশমী তন্তু দামী বলিয়া ইহার জন্য খুব ভাল ধরনের সাবান (যেমন—লাক্স ইত্যাদি) অথবা রিঠার দ্রবণ ব্যবহার করা দরকার। ধোওয়ার জল নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কঠিন জল হইলে তাহার সহিত ১ আউন্স সোহাগা অথবা অ্যামোনিয়া দ্রবণ ব্যবহার করা উচিত। সাবানজলে রেশমী বস্ত্র রাখিয়া হাতের সাহায্যে রগড়ানো দরকার। অতিরিক্ত চাপ দেওয়া কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। যদি অতিরিক্ত ময়লা থাকে তবে সোহাগা অথবা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ যোগ করা উচিত। রেশমের

কাপড়গুলি দুই-তিনবার গরম জলে ধোওয়া প্রয়োজন যাহাতে ইহার সাবান ধুইয়া যায়। তারপর ঠাণ্ডা জলে দুই-এক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড অথবা এসেটিক এসিড দিয়া ধোওয়া দরকার।

রেশমী বস্ত্রে কলপ দেওয়া (Stiffening Silk)—রেশম তন্তুতে স্বাভাবিক আঠা বা গঁদের মত পদার্থ আছে। ঠাণ্ডা জলে ডুবাইলে ইহা শক্ত হইয়া যায়। যদি আরও শক্ত করিবার প্রয়োজন হয় তবে এক কোয়ার্ট জলে ২ চামচ আঠা—এই ধরনের আর একটা আঠার জল ব্যবহার করা উচিত। শার্ট, কলার প্রভৃতির জন্য বেশী আঠার জল ব্যবহারের প্রয়োজন।

রেশমী বস্ত্র শুকানো (Drying)—রেশমী বস্ত্র শুকাইতে হইলে সূর্যের তাপ ও অন্য উত্তাপ পরিহার করা উচিত। ছোট ছোট রেশমী বস্ত্র শুকাইবার দরকার করে না। জল শুকাইবার পর এই বস্ত্র শুকনো কাপড়ে আধ ঘণ্টা রাখা হয়। পুরু ও বড় রেশমী কাপড় ছায়াযুক্ত জায়গায় বা ঘরের ভিতরে ঝুলানো অবস্থায় রাখা উচিত।

রেশমী বস্ত্র ইস্ত্রি করা—তূলার কাপড়ের মত রেশমের কাপড়কে ইস্ত্রি করিবার আগে ভিজাইয়া লইবার প্রয়োজন নাই। রেশমী বস্ত্র জল শুষিতে পারে না বলিয়া ইহাতে জলের দাগের চিহ্ন থাকিতে পারে, কারণ জল ছিটাইলে ইহা বস্ত্রের উপর সমানভাবে পড়িবে না। সেইজন্য রেশমী কাপড় একেবারে না শুকাইয়া একটু ভিজা রাখা দরকার; কিন্তু ইস্ত্রি করিবার পূর্বে একেবারে শুকাইয়া লওয়া উচিত। কারণ ইহার ভিতর স্বাভাবিক আঠা আছে। ইস্ত্রি দিয়া গরম করিবার সময় ইহা গলিয়া যায় এবং কাপড়কে মসৃণ করিয়া তোলে।

রেশম প্রাণিজ তন্তু বলিয়া ইহা খুব সাবধানে ইস্ত্রি করা উচিত। যদি উত্তাপ বেশী হয় তাহা হইলে রেশমের কাপড় পুড়িয়া

যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর উত্তাপ কম হইলে কাঁপড় মসৃণ হইবার পরিবর্তে কুঁচকাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ইস্ত্রির উত্তাপ একখণ্ড কাগজের উপরে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। যদি ৩।৪ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে কাগজে কোন দাগ না পড়ে তবে বুঝিতে হইবে যে ইস্ত্রির উত্তাপ ঠিক।

সমস্ত গাঢ় রঙের রেশমী কাপড়ের উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিতে হয়। ইহার ফলে রঙ উঠিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রেশমী বস্ত্র সম্পূর্ণ শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত ইস্ত্রি করা উচিত নয়; কারণ ইহাতে উল্টা দিকে কুঁচকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাকা রঙের রেশমী কাপড় সাদা রেশমী কাপড়ের মতই ধুইতে হয়। রঙের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখিবার জন্য শেষবার ধুইবার সময় ভিনিগার বা এসেটিক এসিড ব্যবহার করা হয়। পাকা রঙ স্থায়ী করিবার জন্য কখনও লবণ ব্যবহার করিবে না; কারণ ইহাতে অনেক সময় কাপড় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যে সকল রেশমী বস্ত্রের রঙ সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জন্মে তাহার ভিতরকার দিক বা অপ্রয়োজনীয় অংশ প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। অস্থায়ী রঙের রেশমী বস্ত্রকে দুই-এক মিনিট ঠাণ্ডা জলে ডুবাইতে হইবে ও তাহার সঙ্গে দুই-এক চামচ ভিনিগার অথবা কয়েক ফোঁটা এসেটিক এসিড যোগ করিতে হইবে। তারপর ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুইয়া পরে কয়েকবার ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হইবে।

ধোওয়ার পর কাপড় নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে; তারপর রেশমী বস্ত্রটি দুইটি তূলার কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া জল শুকাইয়া ফেলিতে হইবে। এই অর্ধশুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করিলেই চলিবে। পাকানো রেশমী বস্ত্র ভিজা অবস্থায়

কোন মতে টানা বা প্রসারিত করা উচিত নয়। টার্কিশ তোয়ালের সাহায্যে ইহার জল নিংড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই কাপড়কে যতদূর সম্ভব সমান করিয়া পাতিবে যাহাতে ইহা কোনরূপে প্রসারিত না হয়। ভিজা অবস্থায় উল্টা দিকে চাপ দিয়া ইস্ত্রি করিতে হয়। ইহার ফলে রেশম তন্তু প্রসারিত হইয়া যায়।

রেয়ন বস্ত্র ধৌত করিবার প্রণালী—রেয়ন সেলুলোজ-জাত কৃত্রিম তন্তু। ইহা রিজেনারেটেড্ সেলুলোজ অথবা সেলুলোজ এসিটেট হইতে উৎপন্ন। এইজন্য সব সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত এই কাপড় ধুইতে হয়। জল, উত্তাপ, দাগ উঠাইবার রাসায়নিক পদার্থগুলি রেয়ন তন্তুর ক্ষতিসাধন করিতে পারে। উত্তাপের ফলে বা অ্যাল্‌কোহল মিশাইবার ফলে রেয়নের সেলুলোজ এসিটেট নষ্ট হইতে পারে। জলে ডুবাইলে রিজেনারেটেড সেলুলোজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন্‌টা কি ধরনের রেয়ন বাহিরের দিক হইতে বিচার করা চলে না। তবে জলে ডুবানো, উত্তাপ দেওয়া বা উগ্র রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা রেয়নের পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। রেয়ন তন্তুর স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা নাই। সুতরাং ইস্ত্রি করিবার সময় প্রসারিত করিলে ইহা ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। পাকানো রেয়ন কাপড় সতর্কতার সঙ্গে ধোওয়া আবশ্যক।

রেয়ন তন্তুকে অনেক সময় পোকায় কাটে এবং কাপড়ের অনেক জায়গা ফুটা-ফুটা করিয়া ফেলে। সেইজন্য কাপড় ধুইবার আগে এগুলি রিপু করিয়া লওয়া দরকার। রেয়নের দাগ উঠানো বেশ কষ্টসাধ্য। রেয়ন বস্ত্র ভিজাইবার পূর্বে ইহার রঙ পাকা কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। দামী ও ভাল রেয়ন ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে ধোওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রেয়ন বস্ত্র রেশমী বস্ত্রের মত ধোওয়া উচিত। রেয়ন বস্ত্র ধোওয়ার জন্য প্রশমিত (Neutral) সাবান এবং কোমল জল ব্যবহার করা দরকার। জলের তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইটের বেশী হওয়া উচিত নয়। প্রথমে সাবান মিশাইয়া জলে ফেনার উৎপত্তি করা দরকার। তারপর রেয়ন বস্ত্র ইহার মধ্যে দিয়া আস্তে আস্তে রগড়াইতে হয়। রেয়ন বস্ত্রকে বেশীক্ষণ জলের মধ্যে রাখা উচিত নয়। জল হইতে উঠাইয়া হাতের উপর রাখা দরকার। বাতাসে ঝুলাইয়া দিলে রেয়ন তন্তু প্রসারিত হইয়া ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বেশী ময়লাযুক্ত অংশকে সাবানের জল দ্বারা ধোওয়া দরকার ; শক্ত সাবান ব্যবহার করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। রেয়ন বস্ত্রকে দুই হাতের তালুর মধ্যে রাখিয়া চাপ দিয়া জল বাহির করিতে হয়। একটি তোয়ালে জড়াইয়া রেয়ন বস্ত্রকে একসঙ্গে নিংড়াইলে ভাল হয়। রাবার রিঙ্গার (Rubber wringer) ব্যবহার করা যুক্তিসম্মত। সর্বাবস্থায় হাত দিয়া জল নিংড়ানো অনুচিত। বিশেষ করিয়া ইহার ফলে পাকানো রেয়ন বস্ত্রের আকার একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

রেয়ন বস্ত্র শুকানো (Drying)—রেয়নকে তাপ হইতে রক্ষা করা উচিত। এই জন্য ইহাকে রৌদ্রে শুকানো উচিত নয়। রেয়ন বস্ত্রকে ঠিকভাবে প্রসারিত করিয়া বায়ুর সাহায্যে শুকান দরকার। অসমানভাবে শুকাইলে জায়গায় জায়গায় জলের দাগ থাকিতে পারে। ইস্ত্রি করিবার পূর্বে কাপড়ের যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকা দরকার, তবে কোন অবস্থাতেই কাপড়ে যেন বেশী জল না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কাপড়টিকে তারের উপর ঝুলানো হয়, তবে সব দিকেই সমান ভার পড়ে এবং রেয়ন তন্তু প্রসারিত হইবার সুযোগ পায় না। এক দিকে ভার পড়িলে

তন্তু প্রসারিত হইবে। ক্লিপ ব্যবহার করা উচিত নয়। সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা সমান টেবিলের উপরে রাখা, অথবা রেয়ন ব্লাউজের ভিতর একটি তোয়ালে-ঢাকা বালিশ অথবা কুশন (cushion) ঢুকাইয়া ইহা খাড়া করিয়া অথবা শোয়াইয়া রাখা। ইহাকে ১৫।২০ মিনিট পর পর এক এক দিকে রাখিয়া শুকাইয়া ফেলা দরকার।

রেয়ন বস্ত্র ইস্ত্রি করা (Ironing)—রেয়ন বস্ত্র ইস্ত্রি করিবার জন্য স্কার্ট (Skirt) ও শ্লিভ বোর্ড (Sleeve Board) দরকার। একটি বড় মসলিনের টুক্‌রা এবং একটি জলপূর্ণ পাত্রও আবশ্যক। যে সব ইস্ত্রির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেইরূপ ইস্ত্রি ব্যবহার করা উচিত। ইহার ফলে কাপড়ের তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি বা কয়লার ইস্ত্রি ব্যবহার করিতে হইলে খুব সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। ঈষদুষ্ণ ইস্ত্রির সাহায্যে কাপড়ের উল্টা দিকে ইস্ত্রি করা দরকার। যদি যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্রতা না থাকে তবে উহার উপর মসলিন কাপড় রাখিয়া ইস্ত্রি করা উচিত, কিন্তু কোন অবস্থাতে উহার উপর জলের ছিটা দেওয়া উচিত নয়। কাপড়ের কিনারা, পুরু মুড়ি বা দুই ভাঁজ করা অংশ প্রথমে ইস্ত্রি করা উচিত নয়। কারণ ইহার ফলে সমগ্র কাপড়ের তন্তু প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইস্ত্রি করার পর রেয়ন কাপড়ের আর্দ্রতা থাকিতে পারে। এগুলি দূরীভূত না করিলে ইস্ত্রি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কাপড়ের তন্তুরও ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। রেশম তন্তুর পরিবর্তে রেয়ন ব্যবহার করা হয়। রেশম তন্তু পাকাইয়া ও বুনিয়া নানা ধরনের করা হইয়া থাকে। এইজন্য রেশম বস্ত্রের মত রেয়ন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য প্রায় একই পন্থা অবলম্বন করা হয়। তবে ইহাতে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

রেয়ন অপেক্ষা নাইলন বস্ত্র ধোয়া সুবিধাজনক। নাইলন তন্তু শুকনো অবস্থায় যে কোন কৃত্রিম তন্তু অপেক্ষা মজবুত ও শক্ত। ক্ষারজাতীয় পদার্থের প্রয়োগের ফলে নাইলন তন্তুর ক্ষতি হয় না। খুব প্রখর সূর্যালোকে নাইলন তন্তুর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

পশমী বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি—পশম প্রাণিজ তন্তু। এজন্য পশমী বস্ত্র ধুইবার জন্য খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই তন্তু জিলেটিন প্রকৃতির আঁইশ দ্বারা আবৃত। আর্দ্রতা, উত্তাপ ও ক্ষারজাতীয় পদার্থের প্রয়োগের ফলে এই আঁইশ নরম হইয়া যায় এবং আঁইশগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জড়াইয়া যায়। ইহার ফলে তন্তু সংকুচিত হয়। ক্ষারজাতীয় পদার্থ প্রয়োগের ফলে ইহা শক্ত ও হল্‌দে বর্ণ ধারণ করে। অসমান উত্তাপ প্রয়োগের ফলে ইহার আঁইশগুলি হঠাৎ সংকুচিত হয় ও তন্তুগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হইয়া যায়। পশম অনেকখানি আর্দ্রতা ধরিয়া রাখে এবং ভিজা অবস্থায় অত্যন্ত ভারী হয়। এই অবস্থায় ইহা ঝুলাইয়া রাখিলে ইহার তন্তু প্রসারিত হইয়া যায়। সুতরাং পশমী বস্ত্র ধুইবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্জন করিবে—(১) ঘর্ষণের ব্যবহার, (২) অসমান ও উচ্চ তাপ, (৩) কাপড়কে ভিজা অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখা, (৪) ক্ষারের ব্যবহার।

পশমী বস্ত্রের তন্তুগুলি আল্‌গা ধরনের, সেইজন্য ইহার ভিতর ধূলিকণা আটকাইয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমে এই বস্ত্র-গুলি নাড়িয়া ধুলা দূর করা দরকার। ছেঁড়া পাতলা জায়গাগুলি রিপু করিয়া নিতে হয়; কারণ ধুইবার ফলে এগুলি বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। হাতে বুনানো পশমী বস্ত্রগুলির আকৃতি একেবারে বদলাইয়া যাইতে পারে, কারণ এগুলি খুব আল্‌গাভাবে

বুনানো হইয়া থাকে। যাহাতে কাপড়ের গঠন না.বদলাইতে পারে সেইজন্য ভিজাইবার আগে কাপড় বা জামাকে একটি সাদা কাগজের উপর রাখিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার চারিদিকের মাপ পেন্‌সিলের সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ধোওয়ার পরে আর্দ্রতা দূরীভূত করিয়া কাপড় বা জামাটিকে সেই পেন্‌সিলে আঁকা মাপে ফেলিয়া পুনরায় মাপিয়া লওয়া প্রয়োজন।

গরম জামা-কাপড়ের মাপ ঠিক রাখিবার জন্য উহা ঝুলাইয়া শুকাইতে না দিয়া পাতিয়া শুকাইতে হয়। কাঠের পরিবর্তে বেতের জিনিসের উপরে রাখিয়া শুকাইলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ ইহাতে বায়ু চলাচল ভাল হয়।

পশমী বস্ত্র তাড়াতাড়ি রঙ শোষণ করে না। এজন্য সদ্য-দাগ উঠাইতে কোন কষ্ট হয় না। এই দাগযুক্ত কাপড় দাগের প্রকৃতি অনুসারে ঠাণ্ডা অথবা গরম জলে ডুবানো দরকার। পুরানো দাগ উঠাইবার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের লঘু এসিড জাতীয় পদার্থ লঘু ক্ষারজাতীর পদার্থ অপেক্ষা কম ক্ষতিকর। যদি বিরঞ্জনের (Bleaching) দরকার হয় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অথবা সোডিয়াম পারবোরেটের দ্রবণ পরিমিত তাপমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। কোন অবস্থাতেই পশমের উপর জ্যাভেলি (Javelle) ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

পশমী বস্ত্র সাধারণতঃ জলে ডুবানো হয় না। কারণ বেশীক্ষণ জলে রাখিলে ইহার তন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নূতন পশমী বস্ত্রগুলি ধোওয়া দরকার, কারণ বিরঞ্জনের সাহায্যে সালফিউরাস এসিডকে দূরীভূত করা দরকার। একটু সোহাগা মিশাইয়া পাঁচ-ছয় মিনিট গরম জলে ডুবাইলেই হইবে। শিশুদের পোশাকে বেশী ময়লা জমে। সেইজন্য ইহা ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত ধোওয়া উচিত।

পশমী বস্ত্র ধুইতে হইলে প্রথমে জল ঠিক করা উচিত। জল কোমল এবং ঈষৎ গরম হওয়া ভাল। পশমী বস্ত্র স্থায়ী উত্তাপে ধুইতে হইবে। এই উত্তাপ ১০০°-১১০° ফারেনহাইট অথবা কিছু বেশী হওয়া উচিত। সোহাগা ব্যতীত যে কোন ক্ষার-জাতীয় পদার্থ পশম তন্তুকে নষ্ট করে। যদি জল কঠিন হয় তবে কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া ব্যবহার করা উচিত। রঙিন পশমের জন্য সোহাগা ব্যবহার করা চলে। যে কোন প্রশমিত সাবান পশমের পক্ষে ভাল। সাবানের সহিত তৈলজাতীয় পদার্থের দ্রাবক ব্যবহার করিলে বেশী ময়লা কাপড়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। সব সময়ই সাবানের দ্রবণ ব্যবহার করা দরকার।

পশমী বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি—টুক্‌রা সাবান (লাক্স বা সার্ফ) গরম জলের সহিত মিশাইলে প্রচুর ফেনার উৎপত্তি হয়। যদি পশমী বস্ত্রগুলি ভারী হয়, তবে অ্যামোনিয়ার সহিত সোপ জেলী (Soap jelly) মিশাইয়া ফেনা উৎপাদন করিতে হইবে। একটি পশমের জ্যাকেটের জন্য এক কাপ সোপ জেলী, দুই চামচ অ্যামোনিয়া অথবা সোহাগা দরকার।

ছোট ছোট পশমী বস্ত্র রগড়াইয়া ধুইতে হয়। বড় বস্ত্র ও পোশাক যন্ত্রের সাহায্যে ধোওয়া দরকার। যদি ময়লা দূরীভূত না হয়, তবে পুনরায় নূতন দ্রবণ লইতে হইবে। একই উত্তাপের জলের সাহায্যে বারবার ধুইয়া আল্‌গা সাবান দূর করিবে। সাদা পশমী পোশাকের জন্য এবং রঙিন পশমী বস্ত্রের জন্য সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস ব্যবহার করা উচিত। পোশাকের উপর ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকিলে এই এসিড তাহাকে প্রশমিত করিতে সাহায্য করিবে।

আর্দ্রতা দূরীভূত করা আর একটি প্রধান কাজ। পশম

বহুল পরিমাণে আর্দ্রতা গ্রহণ করে এবং শুকাইতে অনেক সময় লাগে। শুকাইবার পূর্বে আর্দ্রতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না করিলে আর্দ্রতার ভারে একদিক প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তবে আর্দ্রতা দূরীভূত করিবার জন্য ইহাকে কোন অবস্থাতেই নিংড়ানো ঠিক হইবে না। সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইবে একটি শুকনো কাপড় বা তোয়ালের দ্বারা ইহা মোড়ানো অথবা বস্ত্রটি আকারে ছোট হইলে হাতের সাহায্যে উহার উপর চাপ দেওয়া। ভারী পশমী বস্ত্র শোষকযন্ত্র অথবা কাঠের রোলারের সাহায্যে চাপ দেওয়া দরকার। ম্যাঙ্গেল থাকিলে তাহার সাহায্যেও চাপ দেওয়া চলে। ম্যাঙ্গেলের ভিতর দুই-তিন বার চাপ দিলে সমস্ত আর্দ্রতা দূরীভূত হইবে।

পশমী বস্ত্র কখনও বাহিরে শুকাইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রখর সূর্যকিরণ ও অধিক উত্তাপ পশম তন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর। পশমী বস্ত্রগুলি শুষ্ক ও গরম জায়গায় শুকানো উচিত। কাপড়ের গঠন ঠিক রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করা দরকার। বড় কাপড়গুলি শাড়ীর মত দুইটি কি তিনটি লাঠির উপর শুকাইবার র‍্যাকে রাখা উচিত যাহাতে উহারা ঝুলিয়া পড়ে।

পশমী বস্ত্র ইস্ত্রি করা (Ironing)—বেশী ইস্ত্রি করিলে পশম তন্তুর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ইস্ত্রির উত্তাপ খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। সাধারণতঃ পশমী বস্ত্রগুলি চাপ দিয়া ইস্ত্রি করা হয়, তবে ফ্লানেল ও সার্জ কাপড় আস্তে আস্তে অন্য কাপড়ের মত ইস্ত্রি করা চলে। যখন পশম বস্ত্রগুলি শুকাইয়া যায় তখন তাহাদের আর্দ্র মসলিন কাপড় দ্বারা চাপ দেওয়া উচিত। বুনানো পশমী জামা ইস্ত্রি করার দরকার হয় না। শুষ্ক অবস্থায় কাপড়ের রঙ ও গুণ অনুযায়ী উল্টা বা ঠিক দিকে চাপ দিয়া ইস্ত্রি

করা হয়। ভিজানোর জন্য তন্তুর ভিতরকার আর্দ্রতাই যথেষ্ট। বুনানো পশমী জামা শুষ্ক অবস্থায় উল্টা বা ঠিক দিকে বাষ্পের সাহায্যে চাপ দেওয়া দরকার। ক্রেপ পশম ধুইবার সময় খুব বেশী সংকুচিত হয়, সেইজন্য খুব সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। ক্রেপ পশম তন্তুর পক্ষে ড্রাই ক্লিনিং প্রয়োজনীয়।

রঙিন পশমী কাপড়ের রঙ ঠিক রাখার জন্য উত্তাপ, ক্ষারের প্রয়োগ, বেশীক্ষণ ধরিয়া জলে ডুবাইয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। কাপড়ের রঙ ঠিক রাখিবার জন্য ভিনিগার, এসেটিক এসিড বা লেবুর রস প্রয়োজনীয়। যে সব পশমী বস্ত্রের রঙ পাকা নয় সেগুলি রিঠার দ্রবণে ধোওয়া উচিত; এই দ্রবণের সহিত এসেটিক এসিড বা ভিনিগার দিলে ভাল হয়। রঙ ঠিক রাখিবার জন্য সতর্কতার সহিত আর্দ্রতা দূরীভূত করিতে হইবে। পুরানো ন্যাকড়ার ভিতরে পশমী কাপড় রাখিয়া জল নিংড়ানো দরকার। যতদূর সম্ভব ইহা সমান করিয়া কোন ভাঁজ না রাখিয়া পাতিয়া শুকানো উচিত। সমস্ত রঙিন পশম বস্ত্রের উল্টা দিকেই ইস্ত্রি করিতে হয়। যদি ইস্ত্রির উপর দাগ থাকে তবে তাহা দূর করিয়া লইতে হইবে।

কম্বল, ওভারকোট প্রভৃতি ধুইবার নিয়ম—এইসব বস্ত্রে ময়লার পরিমাণ খুব বেশী থাকে। এইজন্য শোষক যন্ত্রের (Suction Pump) সাহায্যে এগুলি ধোওয়া দরকার। রিঠার দ্রবণও এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রিঠার দ্রবণে ফেনার উৎপত্তি হইলে কিছু গরম জল কম্বলের উপর ঢালা উচিত। এই দ্রবণের সহিত ১½ চামচ হইতে ২ চামচ সোহাগা ও দুই আউন্স মেথিলেটেড স্পিরিট ঢালিয়া দিতে হইবে। ৫ মিনিট কাল কম্বল বা ভারী পশম বস্ত্র এই দ্রবণে রাখা উচিত। যদি কম্বল বেশী ময়লা হয়, তবে ময়লা দূর না হওয়া পর্যন্ত বারংবার দ্রবণ ব্যবহার করা দরকার।

ভারী পশমী বস্ত্র বার বার একই তাপ বিশিষ্ট জলে ধোওয়া উচিত। তাহা না হইলে উহাদের মধ্যে ঐ দ্রবণ লাগিয়া থাকিতে পারে। ম্যাঙ্গেলের সাহায্যে চাপ দিয়া আর্দ্রতা দূর করা চলে। ভারী পশমী বস্ত্রের ভিতর আর্দ্রতার মাত্রাধিক্য থাকে বলিয়া এগুলি ঠাণ্ডা জায়গায় ঘরের বাহিরে শুকানো উচিত। কম্বলগুলি দুই ভাঁজ করিয়া টান করিয়া শুকানো দরকার। কাঠের দণ্ড বা হ্যাঙ্গারের সাহায্যে ভারী অংশগুলি ঝুলানো উচিত। অনেক ক্ষেত্রে বাষ্প-চাপের প্রয়োগ হইতে পারে।

শাল ধুইবার নিয়ম—শাল খুব সূক্ষ্ম ও নরম পশম তন্তুর দ্বারা গঠিত। শাল ধুইবার জন্যও রিঠা দ্রবণ এবং শোষক যন্ত্র (Suction washer) ব্যবহার করা উচিত। শেষবার ধুইবার সময় দুই চামচ লেবুর রস ও এক চামচ গ্লিসারিন দেওয়া ভাল। শালখানি তোয়ালের ভিতর রাখিয়া জল শোষণ করিয়া লইতে হইবে।

সার্জ এবং গ্যাবারডিন ধুইবার নিয়ম—এই সব পশম বস্ত্র ধুইতে ম্যাগ্‌নেসিয়াম লবণ ব্যবহার করা হয়। সেই জন্য সাবান ব্যবহার করিলে ইহা উঠানো খুব দুষ্কর হইয়া পড়ে। সাবান পশমী বস্ত্রের উপর সাদা দাগ রাখিয়া যায়। ইহা রঙিন পশমী বস্ত্রে খুব খারাপ দেখায়, সেইজন্য ইহা আঠা বা সল অ্যামোনিয়ার (Sal ammoniac) সাহায্যে ধোওয়া উচিত। খুব ময়লা জমিলে রিঠার দ্রবণ এবং অর্ধেক সল অ্যামোনিয়া দ্রবণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। রঙিন সার্জ বিশেষ করিয়া নীল রঙের সার্জ উষ্ণ নীল জলের সাহায্যে ধোওয়া উচিত। ইহার ফলে নীল রঙ নষ্ট হয় না।

সমস্ত তন্তুর পক্ষে সাবান ও জলের সাহায্য লওয়া উচিত নয়। দামী রেশম, রেয়ন ও পশম বস্ত্রের তন্তুর পক্ষে সাবানজল ক্ষতিকর। ইহাতে ঐসব বস্ত্রের রঙও উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। 'ড্রাই

ক্লিনিং'কে ঠিক .শুষ্ক পন্থা বলা যায়। ড্রাই ক্লিনিংয়ে সাবান ছাড়া অন্য পদার্থ ব্যবহৃত হয়। সেইগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) শোষক (Absorbents) : (ক) ফ্রেঞ্চ চক্, (খ) ফুলারস আর্থ, (গ) ট্যালকম পাউডার, (ঘ) গন্ধকের গুঁড়া।

(২) দ্রাবক (Solvents) : (ক) পেট্রোল, (খ) বেঞ্জিন (Benzene : (C_6H_6), কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4)। গ্রীজ শোষক (Grease absorbents) পদার্থগুলি ময়লা উঠাইতে খুব বেশী কার্যকরী হয় না। এইগুলি কাপড়ের তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করা খুবই শক্ত ব্যাপার, সেইজন্য তৈলাক্ত পদার্থগুলি এইসব রাসায়নিক দ্রব্য শুষিয়া লইতে পারে না।

গ্রীজ দ্রাবক (Grease solvents) অনেক প্রকারের আছে ; তাহার মধ্যে কতকগুলি দাহ্য আর কতকগুলি অদাহ্য। দাহ্য পদার্থের মধ্যে পেট্রোল, বেঞ্জয়ল, এসিটোন এবং বেঞ্জিন আর অদাহ্যের ভিতরে বেঞ্জিন ও কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। ইথার এবং এসিটোনও দাহ্য, তবে খুব দামী। এই জন্য ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে এইগুলি ব্যবহার করা চলে না। বেঞ্জিন ও কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অদাহ্য বটে, কিন্তু খুব দামী। শুধু দাগ উঠাইতে এগুলি ব্যবহার করা চলে। বেঞ্জয়ল কম দামী, কিন্তু খুব দাহ্য। পেট্রোল কম দামী ও কম বিপজ্জনক বলিয়া ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতি :

(১) গ্রীজ দ্রাবকে পোশাকগুলি ডুবানো হয়—যাহাতে সমস্ত গ্রীজ উঠিয়া যাইতে পারে।

(২) নোংরা দাগগুলি স্পঞ্জের সাহায্যে গ্রীজ দ্রাবক দিয়া দূরীভূত করিতে হয়।

(৩) পাউডারের সাহায্যে গ্রীজ শুষিয়া লইতে হইবে।

ড্রাই ক্লিনিং করার সাধারণ নিয়ম—(ক) প্রথমে ধুইবার কাপড়-চোপড়গুলি পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। (খ) কাপড় টুটা বা ছেঁড়া থাকিলে তাহাকে রিপু বা সেলাই করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। (গ) ব্রাশের সাহায্যে সমস্ত ময়লা দূর করিতে হইবে। (ঘ) সমস্ত দাগ উঠাইতে হইবে। কেবল গ্রীজের দাগ না উঠাইলে চলিবে, কারণ কাপড় ধুইবার সময় গ্রীজের দাগ আপনি উঠিয়া যায়। সমস্ত দাগ উঠাইয়া এই কাপড়গুলি শুকাইতে হইবে।

পরিষ্কার করার পদ্ধতি—কাপড়গুলি প্রচুর পেট্রোলে ভিজাইতে হইবে। এইজন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি প্রয়োজন—(ক) কাপড় ও পেট্রোল রাখিবার পাত্র, (খ) একটি লম্বা হাতাযুক্ত কাঠের চামচ, (গ) একটি কাঠের দণ্ড অথবা শোষক যন্ত্র, (ঘ) একটি ছোট-মুখ পাত্র। পাত্রটির মুখ যেন বড় না হয়, তাহা হইলে বহু পেট্রোল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। একটি সরুমুখবিশিষ্ট চোঙ্গাকৃতি পাত্রের দরকার, একটি মাঝারি আকারের পুরাতন ড্রামও ব্যবহার করা চলে। পাত্রের মুখে একটি ঢাকনা রাখা দরকার যাহাতে পেট্রোলের বাষ্প হওয়ার কিংবা আগুন জ্বলিবার ভয় না থাকে। যেখানে কাপড়গুলি ধোওয়া হইবে, সেই স্থান আগুন হইতে যেন অনেক দূরে হয়।

প্রথমে পাত্রে প্রচুর পরিমাণ পেট্রোল ঢালিয়া কাপড়গুলি তাহার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তারপর কাঠের দণ্ডের উপর ধীরে ধীরে চাপ দিয়া বেশ ভালভাবে নাড়িতে হইবে। ঢাকনা বন্ধ করিয়া পাত্রটিকে নাড়িতে হইবে যাহাতে পেট্রোল ও কাচিবার কাপড় ক্রমাগত নড়িতে পারে। কাঠের দণ্ডের পরিবর্তে শোষক যন্ত্র ব্যবহার করা চলে। ময়লার পরিমাণ

ও কাপড়ের আকৃতি অনুযায়ী ৫ হইতে ১৫ মিনিট পর্যন্ত কাপড়গুলি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। কাপড় উঠাইয়া কাঠের দণ্ডে পেঁচাইতে হইবে, তারপর কাঠের চামচের সাহায্যে যতটা সম্ভব পেট্রোল নিংড়াইয়া লইয়া কাপড়টি পাত্রে রাখিয়া চামচের সাহায্যে আরও জল নিংড়াইতে হইবে। তারপর ফিল্টার পেপার বা ব্লটিং পেপারের সাহায্যে পেট্রোল শুষিয়া লইতে হইবে।

যদি পেট্রোল বেশী ময়লা হইয়া যায় তবে পুনরায় নূতন পেট্রোল ব্যবহার করিতে হইবে। ধোয়ার পর লেবেল-আঁটা শিশিতে পেট্রোল রাখিয়া লেবেলে 'এই পেট্রোল একবার ব্যবহার করা হইয়াছে' এই কথা কয়টি লিখিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়। যাহাতে পেট্রোল বাষ্পীভূত না হইতে পারে সেইজন্য তাড়াতাড়ি কাপড় ধোওয়া উচিত। কাপড়গুলি আগুন ও সূর্যালোক হইতে দূরে একটি ছায়াযুক্ত জায়গায় ঝুলাইয়া শুকাইতে দেওয়া প্রয়োজন। অন্ততঃ একদিন এই ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে সমস্ত পেট্রোল ঝরিয়া যায় এবং গন্ধ দূরীভূত হয়। পেট্রোলের গন্ধ থাকা পর্যন্ত কাপড় ইস্ত্রি করা চলিবে না।

প্রথমে কোটের নীচ বা অন্যান্য যেসব জায়গা বেশী ময়লা হয় সেগুলি ধোওয়া দরকার। একটি ব্লটিং পেপার টেবিলের উপর রাখিয়া প্রথমে বেশী ময়লাযুক্ত অংশটি এইরূপভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে ইহা ব্লটিং পেপারের সংস্পর্শে আসে। একটি মসলিনের টুকরা পেট্রোলে ভিজাইয়া ময়লাযুক্ত কাপড়ের উপর রাখিতে হইবে। তারপর স্পঞ্জের সাহায্যে কিনারা হইতে মধ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া যে পর্যন্ত না সমস্ত ময়লা দূর হইয়া যায় ক্রমাগত এইভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। সমস্ত কাপড়টি ইস্ত্রি করিবার পূর্বে বায়ুতে রাখিতে হইবে।

কাপড় ধুইবার মূল পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এবার কাপড় ধোওয়া সংক্রান্ত অন্যান্য প্রক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করা হইবে।

ঘর্ষণ (Rubbing)ঃ সব কাপড়ই সাবান-দ্রবণে বা পেট্রোলে ডুবাইয়া ঘর্ষণ করা দরকার। এ বিষয় পূর্বেও বলা হইয়াছে।

জল দিয়া পরিষ্কার করা (Rinsing)ঃ কাপড় কাচিবার পর তাহা গরম জলে বার বার ধুইতে হয় যাহাতে কাপড়ে একটুও সাবান না থাকে। তার পরে জল দূরীভূত করা দরকার।

স্টার্চ দেওয়া ও নীলের ব্যবহার (Starching and blueing)ঃ একটি স্টার্চের দ্রবণ করিয়া তাহার সঙ্গে প্রয়োজনমত নীল মিশাইতে হইবে। সাদা কাপড়গুলি সব সময় নীলের দ্রবণে ভিজানো দরকার। যাহাতে জলের অপচয় না হয় এবং ভাল ফল পাওয়া যায় সেইজন্য স্টার্চ ও নীলরঙ একসঙ্গে মিশানো ভাল। সমস্ত তূলা এবং লিনেন জাতীয় জামায় স্টার্চ ও নীলরঙ দেওয়া হয়। টেবিল ক্লথ, ট্রে-ক্লথ, ন্যাপকিনের সঙ্গে বেশী পরিমাণ স্টার্চ ব্যবহার করা উচিত। সর্বদা পরিধানের ধুতি ও শাড়ীর উপর স্টার্চ কম দেওয়া দরকার। নার্সের টুপি, শার্ট এবং কলার প্রভৃতিতে বেশী স্টার্চ দেওয়া প্রয়োজন।

কাপড় ডুবানোর পূর্বে স্টার্চ ও নীল জলে গুলিয়া ভালভাবে মিশাইতে হইবে। তাহা না হইলে নীলের টুকরা নীচে জমিয়া কাপড়ে দাগের সৃষ্টি করিতে পারে। যাহাতে স্টার্চ কাপড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সমস্ত কাপড়ের বর্ডার অথবা লেস থাকে সেইসব খুব যত্ন সহকারে ধোওয়া দরকার। বর্ডার বা লেসের উপর স্টার্চ দেওয়া হইলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কিনারাগুলির উপর লঘু স্টার্চের দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আর্দ্রতা দূরীভূত

করিতে হইলে ম্যাঙ্গেলের ব্যবহার দরকার। কাপড়গুলি ভাঁজ করিয়া তারপর ম্যাঙ্গেলের মধ্যে চাপ দিতে হইবে। সূক্ষ্ম তন্তুর জন্য রবার রিঙ্গার (Rubber wringer) ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার ফলে কাপড়ের তন্তু প্রসারিত হয় না বা ছিঁড়িয়া যায় না।

কাপড় শুকাইবার নিয়ম (Drying) : সমস্ত সাদা কাপড়ের পক্ষে সূর্যালোক প্রশস্ত। সূর্যকিরণ সহজেই কাপড়কে শুকাইতে সাহায্য করে, জীবাণুমুক্ত করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদকে সুন্দর করে। তবে বেশীক্ষণ সূর্যালোকে রাখা মোটেই সঙ্গত হইবে না। শুকাইবামাত্র ইহা ঘরে আনিতে হইবে। প্রখর সূর্যালোকে সাদা কাপড়ও হল্‌দে ধরনের হইতে পারে।

ইস্ত্রি করা (Ironing) : তূলা ও লিনেন কাপড়ে স্টার্চ দেওয়া হয়, এইজন্য ভালভাবে ইস্ত্রি করা দরকার। ভেলভেট কাপড়ে কেবল বাষ্প দেওয়া হয়, কখনও ইস্ত্রি করা হয় না। ভালরূপে ইস্ত্রি করিতে হইলে স্টার্চযুক্ত কাপড় সম্পূর্ণ শুকানো দরকার। যদি স্টার্চ ভালরূপে না শুকায় তবে ইস্ত্রি করা ভাল হয় না।

ইস্ত্রির দ্রব্য প্রস্তুতকরণ—(১) প্রথমে কাপড়গুলি ভিজাইয়া লইতে হইবে। (২) প্রত্যেকটি কাপড় পৃথক্‌ভাবে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পর্যন্ত গুটাইয়া রাখা প্রয়োজন। (৩) একটি টেবিল বা ইস্ত্রি করার বোর্ড (Ironing Board) রাখা দরকার। (৪) একটি ঠাণ্ডা জলের পাত্র এবং টেবিলের এক কোণে একটুকরা মসলিন কাপড় রাখিতে হইবে। (৫) ডান দিকে একটি স্ট্যাণ্ড এবং স্ট্যাণ্ডের উপর ইস্ত্রি রাখা প্রয়োজন। (৬) বিভিন্ন আকারের ইস্ত্রি রাখা সুবিধাজনক। টেবিল ক্লথ, পর্দা, বিছানার চাদর প্রভৃতি ইস্ত্রি করিতে বড় ও ভারী ইস্ত্রি লাগে। অর্গ্যাণ্ডি, মসলিন প্রভৃতি কাপড় ইস্ত্রি করিতে ছোট ইস্ত্রি দরকার হয়। (৭) ইস্ত্রিকে গরম

করার সময় ইস্ত্রির ঠিক উত্তাপ অতি আবশ্যকীয়। প্রয়োজনীয় তাপে সংকুচিত ভাঁজগুলি দূরীভূত করিয়া কাপড় সমান ও মসৃণ করাই ইস্ত্রি করার উদ্দেশ্য। এমন তাপ দিতে হইবে যাহাতে কাপড় পুড়িয়া নষ্ট না হয়।

ইস্ত্রির তাপ পরীক্ষা—ইস্ত্রিটি হাতের উল্টা দিকে রাখিয়া তাপ অনুভব করা উচিত। এক ফোঁটা জল ইস্ত্রির উপর ফেলিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। জল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্ষীণ শব্দ হয় আর লোহার উপর দাগ পড়ে তবে মনে করিতে হইবে ইস্ত্রি ঠাণ্ডা, যদি মাঝারি রকমের আওয়াজ হয় এবং ক্ষীণ দাগ পড়ে তবে মনে করিতে হইবে ইস্ত্রিও মাঝারি ধরনের উত্তপ্ত হইয়াছে। আর যদি শব্দ বেশী হয় আর কোন চিহ্ন লোহার উপর না থাকে, তবে মনে করিতে হইবে ইস্ত্রি পুরাপুরি গরম হইয়াছে।

ইস্ত্রি করিবার সাধারণ নিয়ম—(১) ইস্ত্রির উপরিভাগ পরিষ্কার, মসৃণ এবং দাগশূন্য হইবে। ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি ক্রোমিয়াম বা নিকেলের তৈয়ারী বলিয়া খুব মসৃণ ও সহজেই পরিষ্কৃত হয়। (২) ইস্ত্রি করিবার কাপড়গুলি ভিজানোর পর ঠিক সমানভাবে টেবিলের উপর পাতিতে হইবে যাহাতে ইহার গঠন নষ্ট না হয়। কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করিবার জন্য বা ইস্ত্রিকে ধরিয়া রাখার জন্য সবসময় বাম হাতের ব্যবহার দরকার। (৩) সমান বস্ত্র অথবা প্লিটের জন্য ভারী ইস্ত্রির পূরা চাপের প্রয়োজন, আর প্রান্তদেশ, বর্ডার বা লেসের জন্য ইস্ত্রির অগ্রভাগের প্রয়োজন। কাপড়ের মুড়ি, পাড় হইতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমানভাবে ইস্ত্রি করা প্রয়োজন। (৪) যে সব কাপড় চক্‌চকে হওয়া দরকার তাহা সোজা দিকেই ইস্ত্রি করা উচিত। এমব্রয়ডারী-যুক্ত কাপড় বা লেস উল্টা দিকে ইস্ত্রি করা দরকার। (৫) সমস্ত দুই-ভাঁজ-করা অথবা পুরু অংশগুলি প্রথমে উল্টা দিকে

ইস্ত্রি করিতে হইবে। মুড়িকরা অংশগুলিকে আগে ইস্ত্রি করিতে হইবে, তারপরে ছোট ছোট অংশ—হাতা, কফ ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবে। (৬) কাপড়গুলি পুরাপুরি শুকাইয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে।

ভাঁজ করা (Folding):

শাড়ী—সূতী শাড়ীতে স্টার্চ দেওয়া হয়। এইজন্য ইহা ভিজানো দরকার। ইস্ত্রি করিবার জন্য আধ গজ কাপড় লইতে হইবে। কাপড়ের পাড় হইতে ইস্ত্রি করা আরম্ভ করিবে। তারপর এক পাড় হইতে অন্য পাড় ইস্ত্রি করিতে হইবে। এইভাবে সমস্ত শাড়ী ইস্ত্রি করিতে হয়। প্রথমে শাড়ীর দৈর্ঘ্য ভাঁজ করিবে, তারপর পর পর ভাঁজ করিয়া আট বারের মত ভাঁজ করিবে যে পর্যন্ত না ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। শাড়ীর প্রস্থও চার ভাঁজ করিবে; কিন্তু ভাঁজের উপর কখনও চাপ দিবে না।

ব্লাউজ—ভিজানো ব্লাউজকে খুলিয়া তাহার মুড়ি ও ডবল অংশ উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিবে। হাতাগুলি স্লিভ বোর্ডের উপর রাখিয়া ইস্ত্রি করিবে। প্রথমে ব্লাউজের ডানদিক, তারপর পিঠের দিক এবং সর্বশেষে বামদিক ইস্ত্রি করিবে। ইস্ত্রির পর হ্যাঙ্গারের (Hanger) সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। ভাঁজ করিবার সময় ব্লাউজটিকে আটকাইয়া টেবিলের উপর নীচের দিকে মুখ করিয়া রাখিতে হইবে। কাঁধের মাঝখান হইতে ব্লাউজের দুই অংশ কেন্দ্রের দিকে রাখিতে হইবে। দুই ভাঁজে ব্লাউজটিকে ভাঁজ করিতে হইবে, তারপর হাতা দুইটি ইহার উপর রাখিতে হইবে।

ব্লাউজ সংরক্ষণ (Storing)—ইস্ত্রি করার পর ব্লাউজ আলমারিতে না রাখিয়া হ্যাঙ্গারের সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখা বাঞ্ছনীয়। ট্রাঙ্ক বা বাক্সে রাখিতে হইলে ভাঁজ করা একান্ত দরকার। কাপড়গুলি

যাহাতে পোকায় না কাটে সেইজন্য ইহার উপর ন্যাপ্‌থালিন বিছাইয়া দেওয়া উচিত।

শার্ট—ভিজানো শার্ট খুলিয়া প্রথমে ইস্ত্রির সাহায্যে উল্টা দিক, ডবল অংশ, মুড়ি প্রভৃতি ইস্ত্রি করিতে হইবে। তারপর সোজা দিক খুলিয়া আবার সেই ভাবে ইস্ত্রি করিতে হইবে। প্রথমে উল্টা দিকের কলারের অংশ ইস্ত্রি করিতে হইবে, তারপর ডানদিকের অংশ ইস্ত্রি করিতে হইবে। শার্টের কাফ (calf) ও হাতাগুলি ইস্ত্রি করিবার পরে শার্টটিকে স্কার্ট বোর্ডের (Skirt board) উপর রাখিয়া পিঠের দিক ইস্ত্রি করিতে হইবে। তারপর সামনের দিক কাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া আবার ইস্ত্রি করিবে। ভাঁজ করিবার জন্য প্রথমে বোতাম লাগাইবে। তারপর শার্টটিকে পিঠের অংশ উপর দিকে রাখিয়া কাঁধের মাঝখান হইতে দুইদিক মধ্যখানে নিয়া আসিতে হইবে। চিত্র অনুযায়ী শার্ট ভাঁজ করিতে হইবে (১৯৩ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সেলাই কলের যত্ন (Care of the Sewing Machine)

ঘরে সেলাই করিবার জন্য একটি সেলাই কল অত্যাবশ্যক। সেলাই কলকে চালু রাখিবার জন্য কতকগুলি বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকা খুব দরকার। প্রথমতঃ সেলাই কলের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। কি ভাবে সূচ ফিট করিয়া সূতা পরাইতে হয়, কি করিয়া মেসিন ঠিক ভাবে চালাইতে হয়, ববীনে কি প্রকারে সূতা পরাইয়া ববীন-কেস ভরিতে হয়, শাটল-রেস (Shuttle-race) কি ভাবে পরিষ্কার রাখিতে হয়, মেসিনের বিভিন্ন অংশে তেল দিয়া কি ভাবে ইহা চালু রাখিতে হয়—এসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সেলাই কলের যন্ত্রাংশের পরিচয়—মেসিনের উপরিভাগের নাম হেড। ডান দিকের বড় চাকার নাম ফ্লাই হুইল। পা মেসিনে ড্রাইভিং হুইলের সহিত ফ্লাই হুইল বেল্ট দ্বারা যুক্ত থাকে। মেসিনকে চালু রাখিবার জন্য প্রথমে ফ্লাই হুইল হাত দিয়া চালাইতে হয়। মেসিনের বিভিন্ন অংশের নাম (১) নীড্‌ল্‌ প্লেট, (২) শ্লাইড প্লেট, (৩) প্রেসার ফুট, (৪) নীড্‌ল্‌ বার, (৫) প্রেসার ফুট লিফ্‌টার, (৬) থ্রেড টেন্‌সন ডিভাইস, (৭) প্রেসার বার রেগুলেটিং স্ক্রু, (৮) টেক আপ লিভার, (৯ থ্রেড গাইড, (১০) স্পুন পীন, (১১) ফ্লাই হুইল, (১২) ববীন বাইণ্ডার, (১৩) স্টীচ্‌ রেগুলেটিং স্কেল স্ক্রু, (১৪) ববীন বাইণ্ডিং টেন্‌সন এঙ্গল, (১৫) হ্যাণ্ডেল ড্রাইভার।
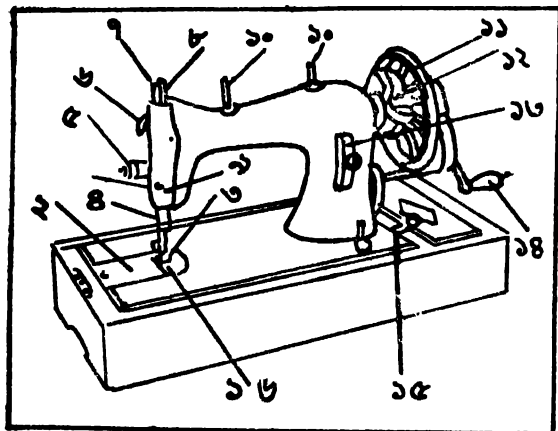
সেলাই কল

সূচ কি ভাবে ফিট করা যায়—ফ্লাই হুইলকে নিজের দিকে সামান্য ঘুরাইয়া
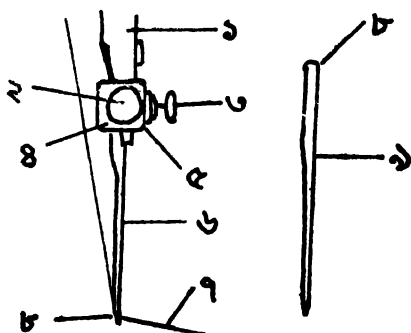
সূচ-সংলগ্ন অংশসমূহ

নীড্‌ল্‌-বারকে উঁচু করিতে হইবে। তারপর ক্ল্যাম্প স্ক্রুকে ঢিলা করিতে হইবে। এখন সূচের চ্যাপ্টা পিঠ ক্ল্যাম্প স্ক্রুর দিকে রাখিয়া নীড্‌ল্‌-বারের ঘাটে ঠিকমত ঢুকাইয়া ক্ল্যাম্প স্ক্রু কষিয়া দিতে হইবে। এই কাজ ঠিকভাবে না করিলে অথবা সূচ বাঁকা ফিট করিলে সূচ ভাঙ্গিয়া যাইবে বা নীড্‌ল্‌-প্লেট দাগী হইয়া যাইবে।

সূচে সূতা পরানো—সূতার রীল মেসিনের উপরে পিনে বসাইয়া দিতে হইবে। সূতার আগা ফেস্‌ প্লেটের (২) বামদিকের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া টেন্‌সন ডিস্কের (৭) মধ্য দিয়া নামাইয়া থ্রেড গার্ডের (৪) উপর দিয়া আনিতে হইবে। এখন থ্রেড টেক আপ স্প্রিং (৫) এবং ফাঁসের মধ্য দিয়া সূতা আসিয়া টেক আপ লিভারের (৩) ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূতাকে ফেস্‌ প্লেটের আই লেট (৬) ও নীড্‌ল্‌ বারের আই লেটের (৮) ভিতর দিয়া আনিতে হইবে। পরে নীড্‌ল্‌ বার সবচেয়ে উঁচু করিয়া সূচের ছিদ্র (৯) পরিষ্কার করিতে হইবে। সূতার অগ্রভাগ বাম হাতেব অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে পাকাইয়া সূতা পরাইতে হইবে। ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সূতা দুই-তিন ইঞ্চি টানিয়া বাহির করিতে হইবে।
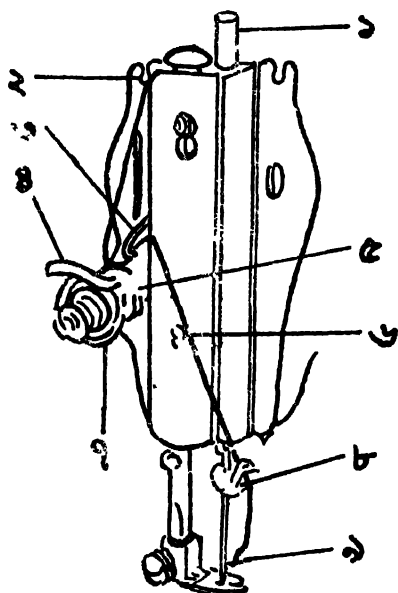
সূচে সূতা পরানোর পদ্ধতি

মেসিন চালানোর সঠিক কায়দা—মেসিন ব্যবহারের পূর্বে ইহার উপযুক্ত স্থানে ও বেয়ারিংএ মেসিন তৈল ব্যবহার করিতে হইবে। কিছুক্ষণ খালি মেসিন চালান প্রয়োজন যাহাতে মেসিনের সমস্ত জায়গায় তৈল লাগিয়া যায় এবং অতিরিক্ত তৈল বাহির হইয়া আসে। এবার মেসিন চালাইবার উপযুক্ত হইল।

এখন ববীন-কেসে ও সূচে সূতা পরাইতে হইবে। সেলাই আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রেসার ফুট লিফ্‌টারের সাহায্যে প্রেসার ফুট নীচে নামাইয়া বাম হাত দিয়া সূতার অগ্রভাগ ধরিয়া ডান হাত দিয়া ফ্লাই হুইল নিজের দিকে ঘুরাইয়া সূতা পরাইতে হইবে। সূতা-পরান সূচ নীচের দিকে যাইবে এবং ববীন-কেসের সূতা সহ একত্রে মিলিয়া নীড্‌ল্ প্লেটের ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। সূতা দুইটি পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর সূতার দুই প্রান্ত একত্রে প্রেসার ফুটের বিপরীত দিকে নীচে ফেলিয়া সেলাই শুরু করিতে হইবে।

সেলাই শুরু করিবার পূর্বে সেলাই করিবার জিনিসটি প্রেসার ফুটের নীচে রাখিয়া ফ্লাই হুইল নিজের দিকে ঘুরাইয়া সেলাই শুরু করিতে হইবে। কাপড়টি টানিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে সেলাই ঠিক চলিবে। মেসিন চালাইবার সময় অঙ্গুলী দ্বারা কোমলভাবে কাপড় সরাইয়া যাইতে হইবে। সেলাইয়ের সময় জোরে কাপড় ঠেলিতে বা টানিতে গেলে সূচ বাঁকিয়া অথবা ভাঙ্গিয়া সেলাই খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাপড়ের জোড়মুখ ডানদিকে রাখিয়া সেলাই করা সঙ্গত।

সেলাই করা কাপড় বাহির করিতে হইলে ডান হাত ফ্লাই হুইলের উপর রাখিয়া মেশিন বন্ধ করার পর নীড্‌ল্-বার একেবারে উঁচু করিয়া ও প্রেসার ফুট উঁচু করিয়া লইয়া নিজের দিকে সেলাই করা

কাপড় টানিয়া লইয়া সূতা কাটিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সূতা একেবারে ছোট করিয়া কাটা উচিত নয়, তাহাতে সূতা সূচ হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে।

মেসিনে তেল দেওয়া—মেসিন ঠিকভাবে চলিবার জন্য চিহ্নিত স্থান সমূহে তেল ঢালিতে হইবে। মেসিনে সাধারণ মাত্রায় তেল দিয়া মেসিন কয়েক মিনিট খুব তীব্রবেগে চালাইলে সব জায়গায় তেল ঢুকিবে। যদি সর্বদা মেসিনে কাজ হয় তবে সপ্তাহে দুইদিন
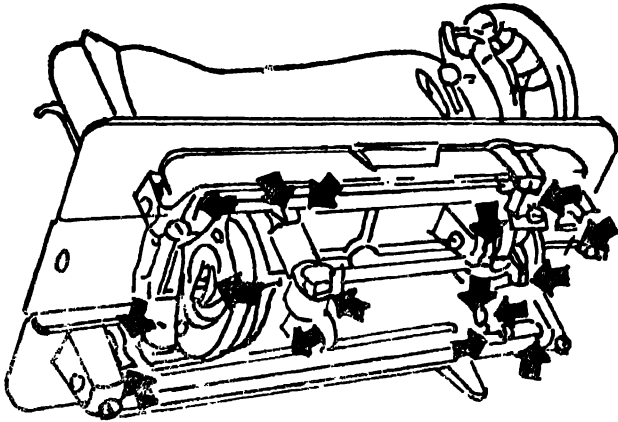
তীর-চিহ্নিত স্থানসমূহে তেল দিতে হয়

তেল দেওয়া আবশ্যক। স্ট্যাণ্ডে সপ্তাহে একবার তেল দেওয়া চাই। মেসিনে তেল দেওয়ার সময় সূচ সবচেয়ে নীচু করিয়া রাখিবে। কখনও কেরোসিন ও নারিকেল তেল মিশ্রিত করিয়া মেসিনে ব্যবহার করিবে না—ইহাতে মেসিন খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কেবল 'সিঙ্গার তৈল' বা 'উষা তৈল' ব্যবহার করিবে। মেসিনের উপরিভাগে (head) তীর-চিহ্নিত স্থানগুলিতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তেল দিতে হইবে।

মেসিনের কতগুলি সাধারণ অসুবিধা ও তাহা দূর করিবার নিয়ম ঃ

সূচ ভাঙ্গা—নিম্নলিখিত অবস্থায় সূচ ভাঙ্গিবার আশঙ্কা থাকে।

(১) যদি নীডল্ ক্ল্যাম্প স্ক্রু কসা (টাইট) না হয়।

(২) যদি সূচ কাপড়ের অনুকূলে না হয়।

(৩) যদি সূচ ক্ল্যাম্পের মধ্য দিয়া পুরাপুরি ভাবে ঢুকানো না হয়।

(৪) যদি সূচ বাঁকা বা ভোঁতা হয়।

(৫) যদি সেলাই করিবার সময় কাপড় আটকাইয়া যায়।

উপরের সূতা ছিঁড়িয়া যাওয়ার কারণ—(১) যদি সূচে সূতা ঠিকমত পরান না হয়, (২) যখন সূতার টান বেশী হয়, (৩) যদি সূচ অনুযায়ী সূতা না হয়, (৪) যদি সূচ বাঁকা হয়, (৫) থেড্রেগুলেটার ঢিলা থাকার জন্য থেড্ টেক আপ স্প্রিং লাফাইতে থাকিলে, (৬) থেড্ টেক আপ স্প্রিং ভাঙ্গা থাকিলে, (৭) সূচ ঠিকমত লাগান না হইলে, (৮) স্পুল পিনে সূতা জড়াইয়া গেলে।

নীচের সূতা ছিঁড়িবার কারণ—(১) যদি নীচের সূতার টান অধিক হয়, (২) যদি ববীনে সূতা ঠিকভাবে পরান না হয়, (৩) যদি সূচ বাঁকা হয়, (৪) যদি ববীন থেড্ গর্তে ধুলা বা সূতার আঁশ জমা হইয়া থাকে।

সেলাইর মাঝে মাঝে গাঁট না পড়া বা ফাঁক যাওয়ার কারণ—(১) যদি সূচ ঠিকভাবে লাগানো না হয়, (২) যদি সূচ বাঁকা বা ভোঁতা হয়, (৩) যদি শাটলের অগ্রভাগ ভাঙ্গা থাকে, (৪) যদি প্রেসার রেগুলেটিং থাম্ব স্ক্রু ঠিকমত কসা না হয়।

সেলাই কোঁচকান—সাধারণতঃ অসমান টানের জন্য সেলাই কুঞ্চিত হয়। সীবনীয় বস্তুর উপর চাপ ও সূতার টানের প্রতি রাখিতে হইবে।

সেলাইয়ে গিঁট পড়া—সূতার টান সমান না হইলে অথবা থে্রড টেক আপ স্প্রিং বিকল হইলে সেলাইয়ে গিঁট পড়ে।

প্রতিকার—(১) সূতা ঠিকমত পরান, (২) সূতা সূচের উপযুক্ত এবং থে্রড টেক্ আপ স্প্রিং অবিকল থাকা, (৩) উপরের পিঠে গিঁট হইতে লাগিলে উপরের সূতার টান নিয়মিত করা।

মেসিন ভারী চলা বা আওয়াজ করা—মেসিনে কিছুকাল কাজ বন্ধ থাকিলে তেল জমিয়া যায় ও মেসিন ভারী চলে। সেজন্য মেসিন পরিষ্কার করিয়া পুনরায় তেল দিতে হয়। শাটল ও শাটল-রেসের ভিতর সূতা আটকাইয়া গেলেও মেসিন ভাল চলে না।

শাটল-রেস পরিষ্কার—শাটল-রেস পরিষ্কার রাখা অত্যাবশ্যক। যদি শাটল-রেসের কোথাও সূতার আঁশ জমা থাকে তবে আলপিন দিয়া উহা পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রয়োজনমত তেল লাগাইয়া শাটল-রেস যথাস্থানে বসাইয়া দিতে হইবে। শাটল-রেসের ভিতরে সামান্য ধূলিকণা বা সূতার আঁশ কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পার। শাটল-রেসকে বসাইতে হইলে নীড্‌ল্‌-বারকে উঁচু করিয়া লইতে হইবে। শাটলকে রেসের ডানদিকে ঘোরাও এবং শাটলকে এই প্রকারে বসাইতে হইবে যাহাতে শাটলের উভয় শির শাটল ড্রাইভারের শিরের সহিত মিশিয়া যায় এবং 'রেস' হোল্ডারের গর্তের মধ্যে ঠিক বসে। দুই অঙ্গুষ্ঠ দিয়া উহাকে একটু চাপিয়া দাও,—স্ক্রুর ছিদ্র হোল্ডারের ছিদ্রের ঠিক উপরে যেন পড়ে। দুইটি স্ক্রু এখন টাইট করিয়া দিতে হইবে। শাটল-রেস খোলা, পরিষ্কার করা এবং পুনরায় ফিট করা খুব সাবধানতার সহিত করা চাই। যদি এই কার্য ঠিকমত না হয় তবে মেসিন চলিবে না। সেলাইয়ের কাজ হইয়া গেলে মেসিনের ঢাকনা দিয়া মেসিনকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশে পূর্বে সিঙ্গার সিউয়িং মেসিন (Singer Sewing Machine) ব্যবহৃত হইত। ইহা ভাল, কিন্তু খুব দামী। বর্তমানে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কস-এ 'উষা' মেসিন তৈরী হইতেছে। ইহা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের লোকের ইহার প্রতি সহানুভূতি থাকা দরকার।

অনুশীলনী

1. What is hard water and what is soft water? How can you make hard water? How can you make hard water soft? (কঠিন এবং নরম জল বলিতে কি বুঝ? কি ভাবে জল কঠিন করা যাইতে পারে? কঠিন জলকে কি ভাবে নরম করা যায়?)
2. What are the characteristics of a rayon-fibre? How do they differ from those of natural silks? (রেয়ন তন্তুর বৈশিষ্ট্য কি? স্বাভাবিক রেশম তন্তুর সঙ্গে ইহার পার্থক্য কোথায়?)
3. What precautions would you take in washing a rayon cloth? (রেয়ন বস্ত্র ধৌত করিতে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবে?)
4. What are the properties of a good laundry soap? How does soap clean dirt of clothes? (ভাল কাপড়-কাচা সাবানের গুণ কি কি? কি ভাবে সাবানের সাহায্যে ময়লা দূরীভূত করা যায়?)
5. Narrate the effects of using washing soda and borax in the washing of a white cotton pillow-case and

white silk blouse? (সাদা বালিশের ওয়াড় এবং সাদা রেশমী ব্লাউজ ধৌত করিতে সোডা ও সোহাগা কি ভাবে সাহায্য করে?)

6. Describe the method of washing white cotton clothes and state the effect of starch and blue on them. (সাদা সুতীর কাপড় কি ভাবে ধোওয়া যায়? ইহার উপর স্টার্চ ও নীলের প্রভাব কি?)

7. Describe briefly the process of washing a coloured cotton Sari. (একটি রঙিন সুতী শাড়ী ধুইবার প্রণালী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।)

8. Describe the procedure you should follow in removing grease stain from a cotton cloth. (কি ভাবে সুতী শাড়ী হইতে চর্বি বা তেলের দাগ উঠানো যাইতে পারে বর্ণনা কর।)

9. How can you remove ink stain from a piece of cloth? (কাপড় হইতে কালির দাগ কি ভাবে দূরীভূত করা যায়?)

10. Give reason of the following:—(i) White silk becomes yellow after wash, (ii) Strong alkali should not be used on woollen clothes. [(ক) সাদা রেশম ধোওয়ার পর হলদে হয় কেন? (খ) উগ্র ক্ষারজাতীয় পদার্থ পশমী বস্ত্রের উপরে ব্যবহার করা উচিত নয় কেন?]

11. How can soap be prepared at home? (গৃহে কি ভাবে সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে?)

12. What materials are used as dry wash? Give the names of some of them. (ড্রাই ওয়াশে কি কি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়? ইহাদের কয়েকটির নাম কর।)

13. Which things should be given preference in dry wash ? Mention the dry washing process used in washing woollen clothes. (ড্রাই ওয়াশে কি কি জিনিসের প্রাধান্য দেওয়া দরকার ? পশম বস্ত্র ধুইতে কোন্ 'ড্রাই ওয়াশ' পদ্ধতি অবলম্বন করিবে বর্ণনা কর।)

14. How would you proceed to iron out a man's shirt and a handkerchief ? (কি ভাবে পুরুষের শার্ট ও রুমাল ইস্ত্রি করিবে ?)

15. How would you proceed to wash and iron an woollen garment ? (কি ভাবে পশমী পোশাক ধুইবে ও ইস্ত্রি করিবে ?)

16. What are the main parts of a sewing machine and how will you take care of it ? (সেলাই কলের প্রধান অংশগুলি কি ? কি ভাবে সেলাইয়ের কলের যত্ন লইবে ?)

আধুনিক গৃহবিজ্ঞান

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক প্রতিবিধান

গৃহের অনিষ্টকারী প্রাণী (Household Pests)

আমাদের গৃহ, দোকানঘর ইত্যাদি জায়গায় সর্বদাই নানা রকমের কীটপতঙ্গের উৎপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কীটপতঙ্গ নানা প্রকার রোগ-জীবাণু বহন করিয়া আমাদের ক্ষতি সাধন করে। অন্ধকার সেঁতসেঁতে, ময়লা, নোংরা স্থানেই কীটপতঙ্গ জন্মে। সুতরাং গৃহ ও গৃহপরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারিলে ইহাদের উৎপাত হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গের বাসস্থান যথাসম্ভব ধ্বংস করিয়া যাহাতে ইহারা না জন্মিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই ইহাদের হাত হইতে বাঁচিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আবার অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাহারা আমাদের আসবাবপত্র, বই প্রভৃতিতে বাস করে এবং আমাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

এই সকল কীটপতঙ্গের মধ্যে মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, পিস্সু, আরসোলা, রূপালী পোকা, উই প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

মশা (Mosquito) ঃ

মশা পতঙ্গ-শ্রেণীর প্রাণী। ইহা প্রধানতঃ ডোবা, নালা, ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতির বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। স্ত্রী-মশা রোগ বহন ও রক্ত শোষণ করে। কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়াইয়া সংক্রামিত না হইলে মশা নিজে খুব মারাত্মক প্রাণী নয়। ইহার জীবনে ডিম, শূক, মূক ও পূর্ণাঙ্গ এই চারিটি অবস্থা দেখা যায়। ডিম, শূক, মূক এই তিন অবস্থা জলেই কাটায়; পূর্ণাঙ্গ মশার ডানা গজায় এবং তখন স্থলে বাস করে। সাধারণতঃ তিন রকমের মশা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

(১) এনোফেলিস (Anopheles) মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ছড়ায়।

(২) কিউলেক্স (Culex) মশা গোদ রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে।
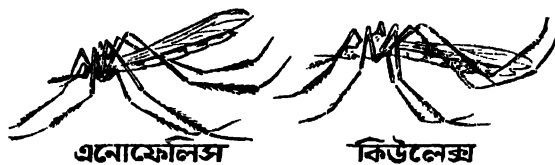
মশা

(৩) স্টিগোমিয়া বা এডিস্ (Stegomyia or Edes) মশা ডেঙ্গুজ্বর বা পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে।

আমরা যদি মশককুলকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারি তাহা হইলে ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের আশঙ্কা দূর হয়।

মশা নিবারণ ও ধ্বংসের উপায়—বাড়ীঘর ও বাড়ীর চারি পাশ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। গৃহমধ্যে

কেরোসিন তৈল বা ডি. ডি. টি. (D. D. T.) লোশনের স্প্রে ছিটাইলে মশার উপদ্রব নিবারণ করা যায়। আমাদের দেশে সন্ধ্যার সময় যে ধূপধুনা, গন্ধক ইত্যাদি জ্বালান হয় তাহার গন্ধে ও ধোঁয়ায় মশা অনেকটা নিবারিত হয়। ঘুঁটে বা পাট পোড়ান ধোঁয়াও মশার উপদ্রব নিবারণে সাহায্য করে। মশার বেশী উপদ্রব হইলে ঘরের বারান্দা, জানালা ইত্যাদি সরু তারের জাল দ্বারা আবদ্ধ করিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ইউরোপ, আমেরিকাতে মশার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য দরজা-জানালায় সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত সরু তারের জাল পর্দার ন্যায় ব্যবহার করা হয় এবং উহাদের উপর শতকরা ২ ভাগ ক্লোরডোন (Chlordone), ৫ ভাগ লিণ্ডেন (Lindane) এবং ৫ ভাগ ডি. ডি. টি. (D. D. T.) ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

রাত্রিবেলা মশারি ব্যবহারে মশার কামড় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বেশী বাতাস চলাচল করিলেও মশা কামড়াইতে পারে না। এইজন্য বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে মশার হাত হইতে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। রাত্রিবেলা অনাবৃত দেহে বাহিরে যাওয়া উচিত নয়। মশারি ব্যবহারে অপারগ গরীব লোকেরা হাতে, পায়ে, গায়ে, মুখে অনেক সময় এইজন্য কেরোসিন মাখিয়া ঘুমাইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেখানে মশারি ব্যবহারের সুবিধা নাই) লেবু ঘাসের তৈল (Lemon grass oil), ল্যাভেণ্ডার তৈল (Lavender oil), ইউক্যালিপ্‌টাস্ তৈল (Eucalyptus oil), লবঙ্গ তৈল (Clove oil), কার্বলিক তৈল (Carbolic oil), তার্পিন তৈল (Tarpentine oil) অল্প করিয়া শরীরে মাখিলে ইহাদের উগ্র গন্ধে মশা দূর হয়।

বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ব খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। জঙ্গল, খাল, বিল, ডোবা নালা, ড্রেন, পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

পুকুরের ভিতরে কেরোসিন তৈল দিলে মশার শূককীট শ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া মারা যায়। নর্দমা, ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি যেখানে জল জমে সেখানে মশককুল ধ্বংস করিবার জন্য কেরোসিন, পেট্রোল বা প্যারাফিন, প্যারিস-গ্রীন বা অন্য কোন জীবাণুনাশক লোশন ব্যবহার করা উচিত। মশা যাহাতে না জন্মিতে পারে সেজন্য জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। গর্ত, কাঁচা ড্রেন, খানা-ডোবা প্রভৃতি যে সকল স্থানে জল জমিবার সম্ভাবনা সেগুলি ভরাট করা উচিত। বাড়ীর উঠানে, রাস্তায় এবং মাঠে যাহাতে জল জমিতে না পারে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত।

মাছি (Fly) ঃ

মাছি কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু ছড়াইয়া মানুষের অশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহা পতঙ্গ-শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণী। ইহা লম্বায় সিকি ইঞ্চি এবং মাথা, বুক, পেট এই তিন অংশে বিভক্ত। ইহার হুল নাই, তবে শুঁড় আছে এবং শুঁড় দ্বারাই খাদ্য চুষিয়া লয়। ইহার এক জোড়া ডানা ও তিন জোড়া পা। পাগুলি ও দেহ লোমশ। এইজন্য জীবাণুদুষ্ট মলমূত্র, কফ, থুথু ইহার পায়ে আটকাইয়া যায় এবং দেহে ও
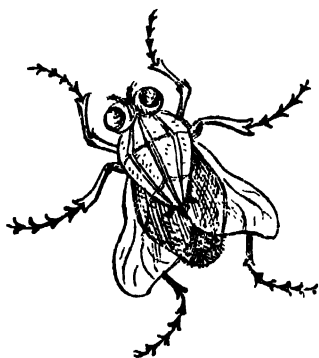
মাছি

পাখায় লাগিয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্যের উপর যখন মাছি বসে তখন পাখা ও শুঁড় ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকে এবং ঘন ঘন বমন

ও মলত্যাগ করে। ইহাতেই খাদ্যদ্রব্যাদি জীবাণু-মিশ্রিত ও দূষিত হইয়া থাকে।

মল, মূত্র, কফ, থুথু, আস্তাকুঁড়, আবর্জনা, পচা গোবর ইত্যাদি নরম ও নোংরা জিনিসই মাছির আবাসস্থান ও খাদ্য। মাছির জীবনেও ডিম, শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ মাছি—এই চারিটি অবস্থা।

মাছি নিবারণের উপায়—মাছির উপদ্রব নিবারণের প্রধান উপায় বাড়ীঘর ও তাহার চারিদিক সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। বাড়ীর আশেপাশে যাহাতে আবর্জনা জমিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তরকারীর খোসা, মাছের আঁইশ ইত্যাদি আবর্জনা পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। কার্বলিক এসিড, ক্রেসল, ফিনাইল ও সোহাগা (২।৩ গ্যালন জলে এক পোয়া)—এই সকল রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা মাছির ডিম বা শূককীট নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ মাছি নিবারণ করিতে হইলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

(১) রন্ধনগৃহ বা ভাঁড়ার ঘরের দরজা-জানালা সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট সরু তারের জাল দ্বারা আবৃত করিবে।

(২) খাদ্যাদি যথাসম্ভব কাচের আলমারির মধ্যে রাখিবে।

(৩) ৫ ভাগ রেড়ীর তৈল, ৮ ভাগ রজন (গুঁড়া করিয়া) একত্রে জ্বাল দিয়া এক টুকরা আঠা-লাগানো কাগজে (Adhesive Paper) মাখাইয়া দেওয়ালে লাগাইয়া রাখিবে।

(৪) এক প্রকার সরু তারের ফাঁসের মধ্যে পচা ডিম বা কাঁঠাল রাখিলে ইহাদের লোভে ইহার মধ্যে মাছি প্রবেশ করে। একবার প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না।

(৫) এক পাঁইট চুনের জল আর এক চামচ ফর্মালিন

(Formalin) এবং কিছু চিনি, গুড় কিংবা মধু মিশাইয়া পাত্রে ঢালিয়া স্থানে স্থানে রাখিলে মাছিগুলি তাহাতে পুড়িয়া মরে। ইহা মানুষের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়।

(৬) সোডিয়াম আর্সেনাইট (Sodium Arsenite) মাছির পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

(৭) বিষাক্ত জল-ছিটান (Spraying Fluids), পেট্রোলের ধোঁয়া (Petrol fumes) এবং মাছি-মারা যন্ত্রাদি (Fly killers) দ্বারাও মাছি ধ্বংস করা যায়।

ছারপোকা (Bed Bug) ঃ

আকারে ছোট হইলেও ছারপোকা অত্যন্ত অনিষ্টকর প্রাণী। ইহার আকৃতি চ্যাপ্টা এবং রঙ বাদামী। ছারপোকা মারিলে উগ্র, উদ্ভট গন্ধ বাহির হয়। ছারপোকা কালাজ্বর ও বহু প্রকার চর্মরোগের জীবাণু বহন করে; সুতরাং হাতে টিপিয়া ছারপোকা মারা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এইভাবে হাতে টিপিয়া মারিলে রোগসংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। অন্য উপায়ে ইহাকে মারা উচিত। খাট,
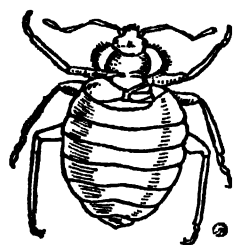
ছারপোকা

ময়লা বিছানা, বেতের চেয়ার, মেঝে ও দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে ছারপোকা থাকে। ইহাদের কামড়ের সহিত মানুষের শরীরে এক প্রকার বিষাক্ত রস প্রবেশ করার ফলে সেই স্থান ভীষণ চুলকায় ও রক্তবর্ণ ধারণ করে। ছারপোকা যাহাতে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে সেদিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ একবার প্রবেশ করিলে সেখান হইতে তাহাদের দূর করা কঠিন ব্যাপার। ছারপোকা এক

বৎসর এবং ইহার বাচ্চা চারি বৎসর পর্যন্ত অনাহারে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ছারপোকা নিবারণের উপায়—(১) বিছানায়, খাট-পালঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে, দেওয়ালের ফাটলে ৫% ডি. ডি. টি. দ্রবণ, ফ্লীট স্প্রে করিয়া দিলে ছারপোকা ধ্বংস হয়।

(২) বিছানাপত্র, খাট রৌদ্রে দিলে, ন্যাপ্থালিনের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে, টিক ২০ বা ডায়োজিনস কেরোসিন তৈলের সহিত মিশাইয়া স্প্রে করিলেও ছারপোকা অনেক কমিয়া যায়।

(৩) গরম বা ঠাণ্ডা জলের সহিত কোরোসিভ সাব্লিমেট (Corrosive Sublimate) মিশ্রিত করিয়া ছারপোকাবহুল স্থানে ঢালিয়া দিলেও ছারপোকার উপদ্রব অনেকাংশে কমিয়া যায়। তবে খুব সাবধানে ইহা ব্যবহার করা উচিত; কারণ ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

(৪) পাইরেথ্রাম সহ কেরোসিন ব্যবহার করিলেও ছারপোকা ধ্বংস হয়।

উকুন (Louse) ঃ

দশম শ্রেণীর পাঠ্যাংশে ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন উকুনের আকৃতি ও উহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে। উকুন পরজীবী (Parasitic), ডানাবিহীন রক্তপায়ী কীট। রক্ত শোষণ করিয়াই ইহারা জীবনধারণ করে। নোংরা, ময়লা হইতেই উকুনের উৎপত্তি। যে সমস্ত লোক অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকে তাহাদের গায়ে ও চুলে উকুন বাস করে। মাথায় উকুন হইলে মাথা চুলকায়। বাড়ীতে একজনের মাথায় উকুন হইলে

উকুন

সহজেই বাড়ীর অন্যদের মাথায়ও উকুন হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য উকুনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্বদা পৃথক্ রাখা উচিত। তাহার ব্যবহৃত চিরুনি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা প্রভৃতি কাহারও কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রবল বাতাসেও অনেক সময় উকুন একজনের মাথা হইতে অপরের মাথায় যায়। কখনও কখনও গৃহপালিত কুকুরের দ্বারাও মানুষের শরীরে আসে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদের ও শিশুদেরই উকুনে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। উকুন রোগের জীবাণুও বহন করে। টাইফয়েড, কুষ্ঠ, চর্মরোগ, আবর্তিত জ্বর প্রভৃতি রোগ উকুনের দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

উকুন নিবারণের উপায়—(১) মাথায় প্যারাফিন তৈল (Paraffin-oil) ঘষিয়া মাখিলে উকুন সহজেই মরিয়া যায়। মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটিয়া বাদাম তৈল ও কেরোসিন তৈল বা পেট্রোল সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মাখিলে উকুন মরে। ভিনিগার ও জল সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মাখিলেও মরে। উকুনগ্রস্ত রোগীর মাথা পরিষ্কার রাখিবার জন্য সরু চিরুনি ব্যবহার করা উচিত।

(২) উকুনগ্রস্ত রোগীর বিছানাপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং মাথা সাবান দিয়া ধোওয়া উচিত।

(৩) উকুনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা উচিত।

(৪) উকুনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যে শুশ্রূষা করিবে রোগীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে তাহার পোশাক সম্পূর্ণরূপে নির্বীজন করা উচিত।

(৫) ডেটল, লাইসল বা ডি. ডি. টি. দ্রবণ চুলে মাখাইয়া তোয়ালে বাঁধিয়া চার-পাঁচ ঘণ্টা রাখিতে হইবে। পরে ভাল করিয়া সাবান দিয়া চুল ধুইয়া শুকাইয়া আঁচড়াইলেও উকুন কমে।

(৬) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে সমবয়সীদের নিকট হইতে মাথায় উকুন নিয়া আসে। ইহাতে বাড়ীর অন্যান্যদের মাথায়ও ইহা সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ইঁদুর (Mouse) :

ইঁদুর মানুষের অনেক ক্ষতিসাধন করে।

"উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার,
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার।
কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়,
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়।"

হয়ত এই কবিতাটি অনেকেরই জানা। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে ইঁদুর আর উই মানুষের কত ক্ষতি করে।

ইঁদুর

ইহা ছাড়া ইঁদুরের মাধ্যমে অনেক রোগের জীবাণুও মানব-দেহে সংক্রামিত হয়। তন্মধ্যে প্লেগ একটি মারাত্মক রোগ। ইঁদুরের গায়ে এক প্রকার পিসু বা উপমক্ষিকা (Flea) জন্মায়। ইহা রোগ-বাহকের কাজ করে এবং জীবাণু সমূহের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে।

ইঁদুরগুলি প্লেগরোগে আক্রান্ত হইলে ইহাদের মধ্যে মড়ক (Epidemic) দেখা দেয়। এইসব উপমক্ষিকা পরজীবী। তাহারা ইঁদুরের গায়ে থাকিয়া তাহার রক্ত পান করে। তাহার ফলে ইহাদের মুখনিঃসৃত প্লেগ-জীবাণু ইঁদুরের পাকস্থলীতে প্রবেশ

করে। ইঁদুর মরিয়া গেলে কোন মানুষকে কাছে পাইলে ইহারা ইঁদুরের দেহ ছাড়িয়া মানুষের পায়ে দংশন করে। ইহার ফলে রক্তের সঙ্গে প্লেগ-জীবাণু মিশিয়া মনুষ্য-শরীর আক্রমণ করে। ইহা ব্যতীত ইঁদুরের দংশন বিপজ্জনক ও বেদনাদায়ক। অনেক সময়, বিশেষ করিয়া রাত্রিবেলা বৃথা ছুটাছুটি ও শব্দ করিয়াও ইহারা গৃহস্থের বিরক্তি উৎপাদন করে। ইঁদুরের গায়ের গন্ধও খারাপ।

ইঁদুর ধ্বংসের উপায়—ইঁদুরের গর্তগুলি বুজাইয়া দিতে হইবে। গর্তের উপর ন্যাপ্‌থালিন গুঁড়া করিয়া ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। ইঁদুর মারার কলের সাহায্যেও ইঁদুর মারা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে যাহাতে ইঁদুর দালানে প্রবেশ করিতে না পারে বিশেষজ্ঞের মত লইয়া সেইভাবে দালান তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। সেঁকো বিষ, ফস্‌ফরাস, বেরিয়াম কার্বোনেট প্রভৃতির সাহায্যে ইঁদুর মারা যায়।

এইসব জিনিসের মধ্যে বেরিয়াম কার্বোনেট নিরাপদ, সস্তা ও আশানুরূপ ফলপ্রদ। এক পাউণ্ড বেরিয়াম কার্বোনেট, তিন পাউণ্ড ময়দা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পরিমাণমত জল দিয়া ছোট ছোট গুলি তৈয়ার করিয়া ইঁদুরকে খাইতে দিলে ইঁদুর মরিয়া যায়। খাবারঘরের জিনিসপত্র সর্বদা ঢাকিয়া রাখা দরকার যাহাতে ইঁদুর ঢুকিতে না পারে।

পিসু বা উপমক্ষিকা (Flea) :

ইঁদুরের গায়ে যেসব উপমক্ষিকা জন্মায় সেগুলি প্লেগের জীবাণু বহন করে। প্লেগ মারাত্মক ব্যাধি এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। প্লেগরোগী যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। প্লেগ-

রোগের উপমক্ষিকা ছাড়া আরও নানা প্রকারের উপমক্ষিকা দেখা যায়। তাহারা বিবিধ রোগের জীবাণু বহন করে।

উপমক্ষিকা পতঙ্গ-শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার মাথা, বক্ষ ও উদর আছে। ইহার দুই চোখের পরিবর্তে মাত্র একটি চোখ, শরীরের দুই পাশ চ্যাপ্টা ও চামড়া শক্ত। অন্যান্য কীটপতঙ্গের মত ইহাদের ডানা নাই বলিয়া উড়িতে পারে না। পিছনের পা এমন ভাবে গঠিত যে, ইহা সহজেই লাফাইতে পারে। তবে ইহা লাফাইয়া বেশী উঁচুতে উঠিতে পারে না বা বেশী দূর অগ্রসর হইতেও পারে না—বড় জোর ২৫।৩০ গজ যাইতে পারে।
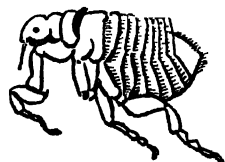
পিসু বা উপমক্ষিকা

ইঁদুর ছাড়া কুকুর ও বিড়ালের গায়েও এই উপমক্ষিকা দেখা যায়। এই সব জন্তু ইহাদের গায়ে উপমক্ষিকাদের বহন করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমন করিতে পারে। উপমক্ষিকার মুখে রক্ত শোষণ করিবার এবং দংশন করিবার জন্য উপাঙ্গ আছে। দংশনস্থলে একটি ক্ষুদ্র লাল রঙের দাগ পড়ে; ইহাতে যন্ত্রণা হয় এবং কিছুক্ষণ পরে দাগ অদৃশ্য হয়।

উপমক্ষিকা নিবারণের উপায়—কুকুর উপমক্ষিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহার গায়ে ১০% ডি. ডি. টি. পাউডার অথবা লিণ্ডেন পাউডার ছড়াইয়া দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরিওসলের (Areosol) সঙ্গে মিশানো লিণ্ডেন পাউডারও ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিড়াল যদি উপমক্ষিকার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তাহার গায়ে রোটনোন (Rotenone) বা পাইরেথ্রাম (Pyrethrum) পাউডার ছড়াইয়া দিতে হইবে। বিড়ালেরা যেখানে ঘুমায় সেখানে ডি. ডি. টি. ছিটাইয়া না দেওয়াই উচিত। ঔষধ প্রয়োগে বা অন্য

উপায়ে ইঁদুর মারিয়া ফেলা উচিত। কারণ ইঁদুর গৃহস্থের কোনরূপ ইষ্ট সাধন না করিয়া অনিষ্টই করিয়া থাকে। কেরোসিন বা পোস্টারিনেও উপমক্ষিকা মরিয়া যায়।

আরসোলা (Cockroach) :

এই অবাঞ্ছিত অতিথি কেবল খাইবার জন্যই গৃহস্থের ঘরে আসে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি ঘরের যেখানেই খাবার পায় সেখানেই ঘন ঘন যাতায়াত করে। রান্নাঘর, মিটসেফ এবং খাবার-ঘরেই ইহারা বেশী যাতায়াত করে। মাছি বা মশার মত ইহারা দলে দলে না আসিয়া একা আসিতেই বেশী পছন্দ করে। যেখানে একটি আরসোলাকে দেখা যায় সেখানে তাহার পিছনে অন্ধকারে খাওয়ার প্রত্যাশায় আরও বহু আরসোলা অপেক্ষা করে।

আরসোলা

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনও আরসোলার পিছন দিকে একটি থলি প্রলম্বিত অবস্থায় আছে। উহা একটি স্ত্রী-আরসোলা ; উহার থলির ভিতর ডিম থাকে। অপরিচ্ছন্ন ও অন্ধকার জায়গায় আরসোলা ডিম পাড়ে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চা হইতে পরিণত অবস্থায় পৌঁছিতে আরসোলার প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। ঘর-দুয়ার ভালভাবে পরিষ্কার করিলে আরসোলার ডিম ধ্বংস হয় ও উহার বাসস্থানও নির্মূল হইয়া যায়।

আরসোলার খাওয়া খাদ্য কখনও খাইবে না। আরসোলা বেশী খাইতে পারে না বটে, তবে তাহার মলমূত্র, হজমতন্ত্রের রস

দ্বারা যে কোন মুহূর্তে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইতে পারে। মিষ্ট জিনিস আরসোলার প্রিয় খাদ্য। তা ছাড়া পুরানো ভিজা কাপড়, বই, চামড়া, তরিতরকারী, ফলের খোসা, সকল রকমের ছড়ানো খাদ্যের প্রতি তাহার আসক্তি কোন অংশে কম নয়।

আরসোলা দূর করিবার উপায়—রান্নাঘরের ড্রেনের ভিতর দিয়া আরসোলা যাতায়াত করে। এই ড্রেনগুলি পরিষ্কার রাখিলে আরসোলা নিবারণের সমস্যা ঘুচিয়া যায়। প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ কীটাণুনাশক দ্রব্য যেমন গ্যামেক্সেন (Gamexane) ড্রেনের সব জায়গায় এবং বাড়ীর চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ড্রেনগুলির মুখে কেরোসিন অথবা তীব্র জীবাণুনাশক দ্রবণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর ফুটন্ত গরম জল ঢালা উচিত। ইহার ফলে আরসোলার গায়ের বিশ্রী গন্ধ দূর হয় এবং আরসোলার বাচ্চা জন্মিবার স্থানগুলিও নষ্ট হইয়া যায়। যেখানেই আরসোলার উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সেখানেই কীটাণুনাশক পাউডার, গন্ধক, সোহাগা (Borax), পাইরেথ্রাম (Pyrethrum) পাউডার ব্যবহার করা উচিত। দালানের সমস্ত গর্ত ও ফাটল প্লাস্টার অব প্যারিস (Plaster of Paris) অথবা সিমেন্ট দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কাগজ ও আঠার সাহায্যে অস্থায়িভাবে এই গর্তগুলি বুজানো যায়। যদি আরসোলারা অন্য কোন খাবার না পায় তবে কাগজ খাইয়া উহার ভিতর দিয়া রাস্তা করিয়া চলিয়া আসিতে পারে।

সোডিয়াম ফ্লুরাইড (Sodium Fluoride) অথবা ১০% ক্লোরডেন (Chlordane) পাউডার আরসোলার পক্ষে তীব্র বিষ। ১০% ডি.ডি.টি. পাউডার এবং দ্রবণও ভাল। পাউডার আরসোলার

গায়ে লাগিয়া সেখান হইতে মুখে যায়। ইহা খাইয়া আরসোলা সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ঘরবাড়ী পরিষ্কার রাখিলেই আরসোলার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

রূপালী পোকা (Silver Fish) :

এই কীট দেখিতে রূপার মত সাদা। ইহা দেখিতে অনেকটা মাছের মত। ইহার দেহের ক্রমশঃ সরু সূচালো প্রান্তে তিনটি লম্বা লেজের মত বাড়ানো অংশ আছে। ইহাদের সাহায্যে ইহারা বেশী তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করিতে পারে। বইয়ের পাতায় পাতায় ইহাদের খুব দেখা যায়। এই রূপালী পোকা আঠা ও শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ খাইতে ভালবাসে। এইজন্য ইহারা বই ও কাগজের খুব অনিষ্ট সাধন করে। যে সব বই অব্যবহৃত থাকে অথবা যাহাদের ধূলাবালি ঝাড়া না হয় তাহাদের বাইণ্ডিংগুলি এই রূপালী পোকা খাইয়া ফেলে।
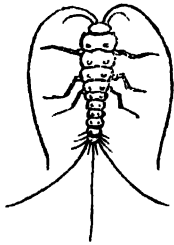
রূপালী পোকা

আলো, নির্মল বায়ু ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রূপালী পোকাকে দমন করিতে পারে। নিয়মিত ভাবে মাঝে মাঝে কীটাণুনাশক পাউডারের সাহায্যে এই সব পোকাকে ধ্বংস করা যাইতে পারে। রাশীকৃত ও স্তূপীকৃত কাগজ ও পত্রিকা এক জায়গায় জড়ো করিয়া রাখিলে রূপালী পোকার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জামা-কাপড়, বিশেষ করিয়া যে সব কাপড়ে মাড় দেওয়া থাকে সেই সব কাপড়ও রূপালী পোকা আক্রমণ করিয়া থাকে। এইজন্য যে সমস্ত কাপড়-চোপড় বাক্সে রাখা দরকার তাহাতে

মাড় দেওয়া উচিত নয়। নিমপাতা, কালোজিরা, ন্যাপ্থালিন, কর্পূর, তামাকপাতা ইত্যাদি কাপড়ের ভাঁজে রাখিলে ও মাঝে মাঝে কড়া রৌদ্রে দিলে জামা-কাপড় ভাল থাকে।

মথ (Moth) ঃ

ইহারা দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত। প্রাণিজগতে নানা প্রকার মথ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে এক জাতীয় মথ আছে যাহারা কাপড়ে বাস করে ও তাহার ক্ষতি করে। যদি কোন পোশাকে বা কাপড়ের উপর মথকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহারা কাপড়কে চিরতরে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সব রকম কাপড়, পশমী জামা, কম্বল, পালকের বস্ত্র প্রভৃতি মথ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

মথ

পোশাক-পরিচ্ছদের উপর স্ত্রী-মথ ডিম পাড়ে; তাহা হইতে শূককীট (Larva) জন্মিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ খাইতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়, তারপর সাদা অল্প লোমযুক্ত পোকাগুলি পোশাক-পরিচ্ছদ খাইতে আরম্ভ করে ও এই ভাবে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত না হইলে তাহারা অনির্দিষ্টকালের জন্য আনন্দের সহিত পোশাক-পরিচ্ছদ ভক্ষণ করিতে থাকে।

বিভিন্ন ঋতুর পোশাকগুলি স্থায়িভাবে বাক্সে রাখিতে হইলে সর্বপ্রথম মথের ডিমগুলি ধ্বংস করিতে হইবে। তাহা না করিলে যতই ন্যাপ্থালিন বা কর্পূর দেওয়া হউক অথবা বায়ুশূন্য বাক্সে বস্ত্রগুলি রাখা হউক না কেন, শূককীটগুলি অবশ্যই তাহার ধ্বংস সাধন

করিবে। ময়লা গরম কাপড়-চোপড় ও কম্বল শুষ্ক পদ্ধতিতে ধৌত করা উচিত। ধোওয়া কাপড়-চোপড়গুলি বাক্সে রাখিবার পূর্বে শক্ত ব্রাশের সাহায্যে ইহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলা দরকার। কাপড়ের মুড়ি, ভাঁজ ও ছোট ছোট ফাঁকে মথের ডিম থাকিবার আশঙ্কা আছে বলিয়া শক্ত ব্রাশের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমে পোশাকগুলির উপরে প্রচুর পরিমাণে ন্যাপ্‌থালিনের গুঁড়া ছড়াইয়া সাদা কাগজ দিয়া জড়াইয়া রাখিতে হইবে। তারপর লম্বা খবরের কাগজে এইগুলিকে জড়াইতে হইবে। মথ কালি পছন্দ করে না, তবে কালির দ্বারা জামা-কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। তারপর পোশাকগুলি প্যাকেটে মুড়িয়া ট্রাঙ্ক অথবা আলমারিতে গুছাইয়া রাখিবে। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে পোশাকগুলি ভাল করিয়া দেখা দরকার।

নিমগাছের পাতা ও ল্যাভেণ্ডার গাছের শুষ্ক কচি ডালের সাহায্যে মথ তাড়ানো যাইতে পারে। তামাকপাতা, কর্পূর, পাইরে-থ্রাম ইত্যাদিও জামা-কাপড়ে দেওয়া চলে। ঠিক এই ভাবে কুশন, বিছানা, পর্দা প্রভৃতি হইতে মথের ডিম দূর করিবার জন্য শক্ত ব্রাশ দিয়া ঘষিতে হইবে। মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক পাউডার বা জীবাণু-নাশক দ্রবণ ছিটাইয়া মথকুল ধ্বংস করা যাইতে পারে। মথ যদি পোশাকের কোন কোন জায়গায় গর্ত করিয়া দেয় তাহা হইলে সেগুলি রিপু করিয়া লওয়া উচিত। যদিও ইহাতে কিছু খরচ পড়ে তবুও নূতন কাপড় কেনা অপেক্ষা ইহা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ।

উই এবং ঘুনধরা পোকা (White ants & Termites)ঃ

উই এবং ঘুনধরা পোকার ক্ষুধা অন্যান্য পতঙ্গ হইতে অনেক বেশী। আরসোলা ঘরের একটু খাদ্যাংশেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু ইহারা সমগ্র

গৃহখানির দিকেই দৃষ্টি দেয়। ইহাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করিলে ইহারা ঘরের বা দালানের কাঠ, কাঠামো ও ভিত্তিকে খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ঘরের দরজা, জানালা, ফ্রেম ইত্যাদি ভিতর দিক হইতে ঘুন ধরিয়া ঝাঁঝ্‌রা করিয়া দেয়। ইহার ফলে সমস্ত বাড়ীখানি যে কোন মুহূর্তে ধ্বসিয়া পড়িতে পারে।

উই

এই সমস্ত ধ্বংসকারী ছোট কীট এক সঙ্গে বাস করে এবং ইহাদের বাসাগুলি সহজেই চিনিতে পারা যায়। মাটিতে, গাছে অথবা কাঠের পাল্লাতে ইহারা বাস করে। ইহাদের বাসস্থান আবিষ্কার করা মাত্র সেখানে কেরোসিন ও গরম জল ঢালা দরকার। কেরোসিনের সহিত ডি. ডি. টি. মিশাইলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়।

কাউয়ানের (Cowan) উই ও ঘুন নষ্ট করিবার পাউডার খুব কার্যকরী। বাড়ীর কাঠগুলি ক্রিয়োজোট আলকাতরা (Creosote tar) দিয়া প্রলেপ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কাঠের উপর রঙ বা বার্নিশ না থাকিলে সহজেই উই পোকা আক্রমণ করিতে পারে।

পানীয় জল পরিশোধন

জল কি ভাবে বিশুদ্ধ করা হয় ও শহরে কি ভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, ইহা আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কারণ অনেক ব্যাধি (যেমন—কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি) জলবাহিত হইয়া সংক্রামিত হয়। ইহা ব্যতীত জলের মধ্যে বহু রাসায়নিক পদার্থ ও দূষিত দ্রব্য থাকিতে পারে যাহা মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কঠিন জল ও নরম জল সম্বন্ধেও আমরা

পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। স্থায়ী কঠিন জলের মধ্যে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড বা সাল্‌ফেট, ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড বা সাল্‌ফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সুতরাং তাহা খাইলে অগ্নিমান্দ্য, ডিসপেপ্‌সিয়া প্রভৃতি রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জল পরিষ্কার করিবার বিভিন্ন উপায় আছে ঃ যেমন (১) আস্রাবণ (Decantation)—অর্থাৎ একটি পাত্রে জল রাখিয়া যাহাতে তলার গাদ বা তলানি আলোড়িত না হয় এই ভাবে ধীরে ধীরে উপরের পরিষ্কার জল ঢালিয়া ফেলা।

(২) পরিস্রাবণ (Filtration)—ফিল্টার কাগজের সাহায্যে জল ছাঁকিয়া ফেলা। এই ভাবে জলকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা যাইতে পারে না।

পাতন-প্রণালীতে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। তবে পাতন-প্রণালীতে পরিস্রুত জল (Distilled water) পান করিতে বিস্বাদ লাগে, কারণ ইহার ভিতর কোন রাসায়নিক লবণ থাকে না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জল পরিশুদ্ধি হয় দুই প্রকারে—(১) অধঃক্ষেপের সাহায্যে (Precipitation), (২) জীবাণুনাশক পদার্থের সাহায্যে (By use of germicides)।

ঘোলা জলে কিছুটা ফটকিরি (Alum) মিশাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে জলের ময়লা তলায় পড়িয়া যায় এবং জল পরিষ্কার হয়; কিন্তু ইহাতে জল জীবাণুশূন্য হয় না। চুন, তুঁতে (অল্প পরিমাণ) প্রভৃতি দ্বারা জলের জীবাণু ধ্বংস হয়। সোডাক্ষার জলে মিশাইলে জলের ক্ষারত্ব নষ্ট হয় ও জল পরিষ্কার হয়।

জীবাণু-ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে জল পরিশুদ্ধি—পটাশ পারম্যাঙ্গানেট জলে মিশাইলে জলের জীবাণু

নষ্ট হয়। সাধারণতঃ কূয়ার জলে ইহা ব্যবহার করা হয়। ২৫ ঘন ফুট জল পরিশুদ্ধ করিতে ৬০ গ্রেন (১ ড্রাম) পটাশ পারম্যাঙ্গানেট আবশ্যক হয়। পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারের পরে অন্ততঃ ২।১ দিন ঐ জল ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহা জলে গুলিলে জলের রঙ বেগুনী হইলেই জল বিশোধনের পক্ষে যথেষ্ট। বেগুনী রঙ অদৃশ্য হইয়া গেলে আরও পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দিতে হয়, যতক্ষণ না বেগুনী রঙ স্থায়ী হয়। ইহা ব্যতীত পারক্লোরাইড অব আয়রন (Perchloride of Iron), ক্লোরিন (Chlorine), ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder) দ্বারা জল বিশোধিত করা যাইতে পারে।

(১) পারক্লোরাইড্ অব আয়রন :—ইহার সাহায্যে জল বিশুদ্ধ করিতে হইলে পাঁচ সের জলে আড়াই গ্রেন পরিমাণ ক্লোরাইড আবশ্যক।

(২) ক্লোরিন :—ক্লোরিন দ্বারা পরিষ্কৃত জল সহজে দূষিত হয় না। শহরে যে জল সরবরাহ করা হয় তাহাতে ক্লোরিন মিশান থাকে। ইহা অতি ক্ষমতাশালী জীবাণুনাশক।

(৩) ব্লিচিং পাউডার :—স্বাভাবিক উত্তাপে চুনের সহিত ক্লোরিন মিশ্রিত করিলে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত হয়। জলের সহিত মিশ্রিত হইলেই ইহা হইতে ক্লোরিন গ্যাস আপনা-আপনি নির্গত হয় এবং জলকে বিশুদ্ধ করে। ২৯০ ঘন ফুট জল পরিষ্কার করিতে প্রায় ১ আউন্স ব্লিচিং পাউডার দরকার হয়।

গার্হস্থ্য পরিস্রাবণ দ্বারা জল পরিশুদ্ধি—গৃহে অল্প পরিমাণ জল পরিশুদ্ধ করিবার জন্য (১) বার্কফেল্ড (Berkefeld) ফিল্টার (২) পাস্তুর-চেম্বারল্যাণ্ড (Pasteur-chamberland) ফিল্টারই অধিক ব্যবহৃত হয়। এই সকল ফিল্টারের অভ্যন্তর দুইটি কক্ষে বিভক্ত। উপরকার কক্ষের সছিদ্র তলদেশ খোলা ও মধ্যস্থল ফাঁপা।

একটি কিংবা দুইটি চীনামাটির বাতি বা চোঙ্গা থাকে। উহার সাহায্যে জল পরিস্রুত হইয়া নীচের কক্ষে জমা হয়। ফিল্টারের উপর দিকে ঢাক্‌না থাকে। ঢাক্‌না খুলিয়া ফুটানো জল ঢালিয়া দিলে ঐ জল চীনামাটির চোঙ্গার ভিতর দিয়া চুয়াইয়া পরিশুদ্ধভাবে ক্রমশঃ নীচের কক্ষে আসিয়া জমা হয়। চীনামাটির মধ্য দিয়া চুয়াইবার সময় জীবাণু ও অন্যান্য আবর্জনা সেখানে আটকাইয়া যায়। এই প্রকার ফিল্টারের অসুবিধা এই যে, জল চুয়াইবার সময় জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ আটকাইয়া যাইবার ফলে চীনামাটির বাতির ছিদ্রগুলি ময়লা দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য মাঝে মাঝে সোডার জল ও ব্রাশের সাহায্যে এগুলি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই ফিল্টারগুলি সব সময় নির্ভরশীল নয়। ঘোলা জল যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া ফিল্টারের মধ্যে ঢালা উচিত।

পাস্তুর-চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টারের বাতি বা চোঙ্গাগুলি ফাঁপা ও পোর্‌সিলিনের তৈয়ারী। বার্কফেল্ড ফিল্টারের চোঙ্গাটি চীনামাটির দ্বারা প্রস্তুত এবং তাহাতে ছিদ্র কম থাকে। সেই জন্য পাস্তুর-চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টারের জল দ্রুত পরিস্রুত হয়। পাস্তুর-চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টারের জলের চাপ ও বার্কফেল্ড ফিল্টারের মহাকর্ষ (gravitation) দ্বারা জল পরিস্রুত হয়। উভয় ফিল্টারে ঘোলা জল পরিস্রুত হইবার সময় একটা পর্দা পড়ে এবং ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। তখন বেশী চাপ দিলেও জল সহজে বাহির হয় না। চীনামাটির বাতি থাকে বলিয়া এই সব ফিল্টার খুব ভঙ্গুর, বিশেষ করিয়া বার্কফেল্ড ফিল্টারকে যেখানে-সেখানে স্থানান্তরিত করা যায় না। বারে বারে পরিষ্কার করিতে গেলেও ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

যেসব জায়গায়, বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামে পানীয় জল সরবরাহের

সুব্যবস্থা নাই। সেখানে জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া, ঠাণ্ডা করিয়া পান করা উচিত। প্রয়োজনবোধে একটু কর্পূরও মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহু আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। খেলিবার সময় বা অন্য কোন ভাবে আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙ্গা, রাস্তা চলিতে চলিতে মোটর চাপা পড়া, দেহের কোন স্থান বিশেষ করিয়া হাত-পা অসাবধানতা বশতঃ কাটিয়া যাওয়া, জলে ডোবা, কাপড়-জামায় আগুন লাগা, সর্প বা বিষাক্ত কীটের দংশনে জীবন বিপন্ন হওয়া—অনেক কিছুই ঘটিয়া থাকে। ইহার জন্য মৃত্যুর হারও নেহাৎ কম নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে দুই হইতে সাতাইশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত লোকের মৃত্যু হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মৃত্যু না হইয়া আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। প্রাথমিক চিকিৎসায় অভিজ্ঞ হইলে অনেককেই বাঁচানো যায়। চিকিৎসকগণ না আসা পর্যন্ত আহত ও পীড়িত ব্যক্তির প্রাথমিক শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করাকে ফার্স্ট এইড (First aid) বলা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার ভার গ্রহণকারী ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে।

(১) ভীতি উৎপাদন না করিয়া কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী পর পর ধীরভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজ করিতে হইবে।

(২) স্বীয় জ্ঞান বা বুদ্ধির বাহিরে রোগীর জন্য বেশী কিছু করা বাঞ্ছনীয় নয়। যাহাতে রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন না হয় এবং ক্রম অবনতির দিকে না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) যে কোন প্রকারের রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিতে হইবে। কারণ রক্তপাত বন্ধ না হইলে ১৫ হইতে ২০ মিনিটের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

(৪) নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৫) রোগী শক্ (shock) পাইলে তাহার দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিতে হইবে। রোগীর দেহ যাহাতে ঠাণ্ডা না হইয়া গরম থাকে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীকে বেশী নড়িতে চড়িতে দেওয়া উচিত হইবে না। তাহার ব্যথার যাহাতে উপশম হয় সেই দিকে নজর রাখিতে হইবে।

(৬) প্রয়োজন না হইলে রোগীর জামা-কাপড় খুলিয়া দিবে না, কারণ জামা-কাপড় রোগীর দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করে এবং শকের প্রকোপন হইতে রক্ষা করে।

(৭) রোগীর ও তাহার আশেপাশের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা ভয় না পায় ও ধৈর্য না হারায়।

(৮) নির্মল বায়ু রোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এইজন্য রোগীর চারিপাশে যাহাতে ভিড় না জমে তাহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৯) যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আঘাত সাংঘাতিক হয় তবে পুলিসকে জানাইয়া দিতে হইবে।

(১০) প্রাথমিক চিকিৎসায় ভিজা কাপড় ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল মাত্র কোন কোন ক্ষেত্রে পুড়িয়া গেলে তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভিজা কাপড় ব্যবহারের ফলে সংক্রমণ

প্রসার লাভ করিতে পারে। রোগীর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য সুশিক্ষিত নার্স অথবা ডাক্তারের উপদেশের প্রয়োজন।

শক্ (Shock) :

দেহ ও মনের অস্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে 'শক্' কথাটি জড়িত। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হইল শক্। শক্ কথাটি নানা ভাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর মনে নানা বিভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। কতকগুলি শক্ যেমন শেল শক্ (Shell shock), স্নায়ুদৌর্বল্য জনিত বা মনস্তাত্ত্বিক শক্, ইলেক্‌ট্রিক শক্, বিষজনিত রাসায়নিক শক্; বেশীমাত্রায় ইনসুলিন (Insulin) ব্যবহার জনিত বহুমূত্র রোগীর শক্—এইসব প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর পক্ষে মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়।

শক্ বলিতে এখানে আমরা বুঝিব যে, রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে দেহের অন্যান্য যন্ত্রের কাজকর্ম বন্ধ থাকা, অতিরিক্ত রক্তপাত, পুড়িয়া যাওয়া, অস্থিভঙ্গ, বুলেটের আঘাত, মাথা ও বুকে আঘাত বা শরীরের যে কোন অংশে সাংঘাতিক আঘাতের ফলে শকের সৃষ্টি হইতে পারে। শক্ অতি সাধারণ হইতে ভীষণ আকার হইতে পারে যাহার ফলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হইয়া থাকে।

সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত যে কোন লোকের শক্ লাগিতে পারে, সেই জন্য শকের উপসর্গ যাহাতে না বাড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শকের লক্ষণ—শক্-পাওয়া ব্যক্তি খুব দুর্বলতা অনুভব করে, অনেক সময় মূর্ছা যায়, মাথা ঘোরে ও বমি ভাব হয়। তাহার

চক্ষুতারকা জ্যোতিহীন ও ফ্যাকাশে হয় এবং ইহা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনিয়মিত হয়। হৃৎপিণ্ডের ও নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত ও দুর্বল হয়। নাড়ীর স্পন্দন অনেক সময় অনুভব করা যায় না। অনেক সময় বমি-বমি ভাব ও বমি হইয়া থাকে। ত্বক বিশীর্ণ ও আর্দ্র হয়। এই সমস্ত উপসর্গ রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাতের ফলেই সংঘটিত হইয়া থাকে।

শকৃপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত— রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাতের দরুন শকের উৎপত্তি হয় বলিয়া যাহাতে মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র-সমূহে রক্ত সরবরাহ হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। সেই জন্য যে পর্যন্ত না প্রাথমিক শকের অবস্থা দূরীভূত হয় সেই পর্যন্ত রোগীকে শুইয়া থাকিতে দেওয়া উচিত। মুখের স্বাভাবিক রঙ ও নাড়ীর স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরিয়া আসিলে মনে করিতে হইবে রোগীর দেহের পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে।

যদি রোগীর পা না ভাঙ্গে তবে পা দুইটি তোশক ও বালিশের উপর রাখিয়া ভূমি হইতে ৯ ইঞ্চি উপরে রাখিবে । যাহাতে রোগী ব্যথা না পায় সেই ভাবে তাহাকে ধরিতে বা উঠাইতে হইবে। রক্তপাত প্রথমেই বন্ধ করিতে হইবে; তাহা না হইলে শকৃজনিত অন্যান্য উপসর্গের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। রোগীর পরিচ্ছদ না খুলিয়া যাহাতে তাহার দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি দেহের কোন স্থান অনাবৃত রাখার প্রয়োজন হয় তবে পোশাক-পরিচ্ছদ আংশিক ভাবে খুলিয়া বা ভাঁজ করিয়া তাহা করা উচিত। মাটির ঠাণ্ডা যাহাতে রোগীর গায়ে না লাগে সেই জন্য খুব ভালভাবে তাহাকে কম্বল দিয়া জড়ানো উচিত। গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে দেহের উত্তাপ সংরক্ষিত করা যাইতে পারে। কোন অবস্থায় রোগীর দেহ হইতে

ঘর্ম নিঃসরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া বেশী মাত্রায় উত্তাপ প্রদান করার কোন প্রয়োজন থাকে না। গরম চা অথবা কফি শরীরের উত্তাপ সংরক্ষিত রাখে এবং অভাবপ্রাপ্ত তরল পদার্থের পারপূরক হিসাবে কাজ করে। অচৈতন্য অবস্থায়, বুকের বা পেটের আঘাত জনিত অবস্থায় কখনও এইসব দিবে না।

পোড়া (Burns) ঃ

আগুনের উত্তাপজনিত আঘাতকে সাধারণতঃ পোড়া বলা হয়। যখন উষ্ণ তরল দ্রব্য বা আর্দ্র বাষ্পের দ্বারা দেহের কোন অংশ পুড়িয়া যায় তখন তাহাকে স্কাল্ড (Scald) বলা হয়। শুষ্ক আর্দ্র উত্তাপ অথবা বিদ্যুতের উত্তাপে দেহের বিভিন্ন অংশ পুড়িতে পারে। বিদ্যুৎজনিত পোড়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ দেহের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ভিতরকার কোষ ও তন্তুর ক্ষতি সাধন করে। সেই অবস্থায় ভিতর অপেক্ষা বাহিরের আঘাত কম বোধ হইতে পারে। এইরূপ আঘাত নিরাময় করা সময় সাপেক্ষ। (২) যখন বৈদ্যুতিক আলোর ঝলসানোর জন্য দেহের উপরের অংশে আঘাত লাগে।

অনেক রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন উগ্র এসিড বা ক্ষারজাতীয় দ্রব্য) দেহের কোষ ও তন্তুর ক্ষতি সাধন করে। এগুলিকে রাসায়নিক দ্রব্যজনিত পোড়া বলা যাইতে পারে।

এই পোড়া দুই প্রকার—(১) চামড়া লাল হইয়া যায়, আর (২) চামড়া পুড়িয়া কালো হইয়া যায়। শরীর পুড়িয়া গেলে শক্, ব্যথা, সেপসিস, দাগ পড়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

(১) শক্—প্রত্যেক পুড়িয়া যাওয়ার ক্ষেত্রেই শক্ মিশ্রিত থাকে। দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুখ, ঘাড়, বুক, তলপেট প্রভৃতি পুড়িয়া গেলে

শকের মাত্রা বেশী হয়। আর হাত-পা পুড়িয়া যাওয়া ব্যক্তির শক্ সাধারণ পুড়িয়া যাওয়া ব্যক্তির শকের চেয়ে বেশী। প্রাথমিক শক্ হয়ত সহজেই সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহার ৬ ঘণ্টার পরে দ্বিতীয় বার শক্ দেখা দিলে তাহা অনেক সময় মারাত্মক হইতে পারে।

(২) ব্যথা—চামড়া যেখানে পুড়িয়া যায় সেইখানে খুব ব্যথা হয়। পোড়া জায়গা উন্মুক্ত রাখিলে ব্যথা আরও বাড়ে। এই জন্য শরীরের পোড়া জায়গা, হাত-পা-মুখ সব সময় আবৃত করিয়া রাখা উচিত।

(৩) সেপসিস্ (Sepsis)—পুড়িয়া যাওয়ার দরুন যেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেখানে সেপসিস্ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ পুড়িয়া যাওয়ার ফলে ক্ষতস্থানের কোষ ও তন্তুগুলির ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি কমিয়া যায়। ইহাতে জীবাণুগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রক্তকে বিষাক্ত করিয়া তোলে।

(৪) দাগ পড়া (Scarring)—যে স্থান পুড়িয়া যায় সেই স্থানে দাগ পড়ে। সেই দাগ যাহাতে না পড়ে সেই জন্য যত শীঘ্র সম্ভব গ্র্যাফটিং (Grafting) অর্থাৎ চামড়া জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা করা উচিত। সেপসিস্ থাকা পর্যন্ত এই কাজ করা সম্ভব হয় না।

পোড়া সামান্য হইলে বা চামড়ায় ক্ষত না হইলে স্পিরিট দিয়া ভিজাইলে যন্ত্রণা লাঘব হয়। ফোস্কা পড়িলে জায়গাটি গরম জলে পরিষ্কার করিয়া কাঁচা ডিম ভাঙ্গিয়া প্রলেপ বা মধুর প্রলেপ দিলে অথবা আলু বাটিয়া লাগাইলে খুব উপকার পাওয়া যায়। ফোস্কা যেন না গলিয়া যায়। পুড়িয়া ঘা

হইলে চুনের জল ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণে ফেটাইয়া লাগাইলে যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। আজকাল বার্নল ইত্যাদি নানা প্রকার মলমও পোড়া ঘায়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভাপে পুড়িলে সামান্য ভিজা লবণ পুরু করিয়া দিলেও বিশেষ কার্যকরী হয়।

পোড়ার প্রতিবিধান—পুড়িয়া যাওয়া যদি সাংঘাতিক ধরনের হয় তবে রোগীকে কম্বল দিয়া জড়াইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার আর সাধারণ অবস্থায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিবে।

(১) রোগীকে টান করিয়া শোয়াইয়া দাও। আগুন লাগিলে কোন অবস্থায় দৌড়াইতে বা দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে না। বেশী দৌড়াদৌড়ি করিলে আগুনের শিখা বাড়িয়া উঠে ; আর দাঁড়ানো অবস্থায় নিঃশ্বাসের সহিত আগুনের উত্তাপ তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আগুন লাগা মাত্র সেই ব্যক্তিকে মাটিতে ফেলিয়া কম্বল অথবা কোন ভারী বস্ত্র দিয়া চাপা দিতে হইবে।

(২) পুড়িয়া যাওয়া ব্যক্তির দেহে উত্তাপ সংরক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে কম্বল দিয়া জড়াইয়া রাখিবে।

(৩) প্রয়োজনবোধে উষ্ণ পানীয়—মিষ্টি চা বা কফি দিতে পার।

(৪) যত আস্তে ও যত কম সম্ভব রোগীর গায়ে হাত দিবে।

(৫) পেট্রোলে না ভিজাইয়া কখনও জামা-কাপড় খুলিবে না।

বায়ু ও রোগ-জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য—নির্বীজক তূলা ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করিবে। গজ অথবা লিণ্ট বাইকার্বোনেট অব সোডার দ্রবণে ভিজাইয়া ব্যবহার করা চলে।

* যত শীঘ্র সম্ভব ডাক্তার ডাকিবে অথবা রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।

* পুড়িয়া যাওয়া ফোস্কা কখনও খুলিবে না।

* কখনও ট্যানিক এসিড ব্যবহার করিবে না।

* আগুনে পুড়িয়া যাওয়া ব্যক্তির গায়ে ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিবে না।

আগুনে পুড়িয়া যাওয়া ছাড়াও সূর্যের উত্তাপে বা রাসায়নিক ক্রিয়ায় দেহের অংশ বিশেষ পুড়িয়া যাইতে পারে।

সূর্যের উত্তাপে দেহের ক্ষতি হইলে ক্যালামিন লোশন (Calamine Lotion) খুব স্নিগ্ধকারক। ইহা ব্যবহার করিলে কাপড়ের উপর দাগ পড়ে না। অলিভ অয়েল, কোকো, মাখন অনেক সময় উপকার দেয়। ইপ্‌সম লবণের দ্রবণ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। যদি শরীরের বেশী অংশ পুড়িয়া যায় ও জ্বর হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া উচিত।

রাসায়নিক দ্রব্যজনিত পোড়া:—কার্বলিক এসিডে পুড়িয়া গেলে এলকোহল স্পঞ্জিং চলিতে পারে। চুন অথবা অন্যান্য ক্ষার-জাতীয় পদার্থের দ্বারা চোখ পুড়িয়া গেলে দুধ কার্যকরী হয়। পরিষ্কার অলিভ অয়েল অথবা ক্যাস্টর অয়েল কয়েক ফোঁটা দিলেও সুফল পাওয়া যায়।

কাটা বা ক্ষত (Cuts or Wounds):

চামড়া ছিঁড়িয়া গেলে ক্ষতের উৎপত্তি হয়, দেহের তন্তুগুলির নিরবচ্ছিন্নতা নষ্ট হইয়া যায়। যদি ক্ষত গভীর হয় তাহা হইলে রোগ সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সামান্য কাটা-ছেঁড়ায় ক্ষতস্থানটি স্পিরিট দ্বারা পরিষ্কার করিয়া আইওডিন বা টিংচার বেঞ্জিন লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। একটু বেশী কাটা হইলে স্টিকিং প্ল্যাস্টার দিয়া ক্ষতের মুখ আটকাইয়া দিলেও উপকার হয়।

পাড়াগাঁয়ে সাধারণ কাটা-ছেঁড়ার জন্য গাঁদাফুলের পাতার রস ও দূর্বাঘাসের রসও ব্যবহার করা হয়। ইহাতেও ভাল ফল পাওয়া যায়, তবে পাতাগুলি যেন খুব ভাল করিয়া বাছিয়া ও ধুইয়া লওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ পাতায় অনেক সময় পোকামাকড়ের বাসা এবং ময়লা লাগিয়া থাকে ; উহাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইবার সম্ভাবনা।

শরীরের কোন অংশ থেঁতলাইয়া গেলে সেই জায়গায় বরফ লাগাইলে বা ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাইলেও উপকার হয়।

ক্ষত চারি রকমের হইয়া থাকে ঃ—

(১) এব্রেসন (Abrasion)—শরীরের উপরের চামড়ায় ঘর্ষণের ফলে এইরূপ ক্ষত হয়। জুতার ঘষায় এবং রাস্তায় আছাড় খাইলে এরকম ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বেশী জায়গা কাটিয়া যায় বলিয়া শরীরে রোগের জীবাণু সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

(২) ইনসাইজড উণ্ড (Incised wound)—ধারালো ছুরি, কাঁচি বা ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরায় এইসব ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্ত-শিরাগুলি কাটিয়া যাওয়ার দরুন এইসব ক্ষতে খুব বেশী রক্তপাত হয়। এইসব আঘাতে খুব কম জায়গাই থেঁতলাইয়া যায়। এইজন্য চিকিৎসা করিলে খুব তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময় হয়।

(৩) ল্যাসিরেটেড উণ্ড (Lacerated wound)—ভোঁতা যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের আঘাত লাগিলে, হিংস্র পশুর থাবাতে, বোমার স্প্লিণ্টারে, বুলেট প্রভৃতিতে এইসব আঘাত হয়। ইহাতে রক্তপাত কম হয়। তাহার কারণ রক্তের শিরার প্রাচীরগুলি ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষতের চারিধার এবড়ো-খেবড়ো হয় ও মুখ প্রসারিত হয়। থেঁতলাইয়া যাওয়ার দরুন ইহার ভিতরে ময়লা জমিবার আশঙ্কা থাকে। এইসব ক্ষতে

কোষতন্তুর ক্ষতির দরুন রক্তপাতের অপ্রাচুর্য হেতু ক্ষত না ধুইয়া যাওয়ার জন্য সেপ্টিক (Septic) হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৪) পাঙ্কচার্ড উণ্ড (Punctured wound)—ছুরি, বেয়নেট, বুলেটের দ্বারা এইরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। উপরের ক্ষতটা খুব ছোট হয় এবং বুলেটের আঘাতে বুলেট প্রবেশের ক্ষত অপেক্ষা বুলেট বাহির হইবার ক্ষতটি অনেক বড় হয়। এইসব ক্ষতেও গ্যাস গাংগ্রিণ, ধনুষ্টঙ্কার রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা—

(১) কাটা বা ক্ষত অঙ্গটিতে ব্যথা না দিয়া যত আস্তে পার হাত দিবে।

(২) রোগীকে বসাইয়া কি শোয়াইয়া রাখিবে। যদি ক্ষত অঙ্গটির মধ্যে ভাঙ্গা হাড় না থাকে তবে সেই অঙ্গটি উঠাইয়া ধরিতে হইবে যাহাতে কোন রক্তপাত না হয়।

(৩) রক্তপাত বন্ধ করা :—যদি রক্তপাত প্রচুর হয় তবে বিশোধিত ব্যাণ্ডেজ অথবা পরিষ্কার রুমালের সাহায্যে ক্ষতস্থানের উপর চাপ দিবে। তবে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ইহার ভিতরে যেন ভাঙ্গা কাচের টুকরা বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ না থাকে। রক্ত জমিয়া গেলে সে স্থানে ব্যাঘাত জন্মাইবে না, কারণ তাহার ফলে আবার রক্তপাত আরম্ভ হইতে পারে। ক্ষতস্থান হইতে কাচের টুকরা বা অন্য কোন জিনিস সহজে বাহির না হইলে কষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে না। ইহার ফলে বৃহত্তর রক্তের শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া আরও রক্তপাত হইতে পারে।

(৪) যদি সময় থাকে তবে শুশ্রূষাকারী নিজ হাত জীবাণুনাশক দ্রব্য বা সাবান দ্বারা ধুইয়া লইবে। রক্তপাতের গুরুত্ব অনুভব করিয়া কাছে সাবান বা জল না পাইলে খালি হাতেই রোগীর ক্ষতস্থান

বাঁধিয়া দিবে। কারণ রক্তপাত বন্ধ না হইলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

(৫) ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় ব্যাণ্ডেজের কিনারায় হাত দিবে। ব্যাণ্ডেজের যে অংশ রোগীর আঘাতের উপর স্থাপন করিতে হইবে সেখানে যেন কোন প্রকারেই হাত না পড়ে। ফিল্ড ড্রেসিং, (Field dressing) এইসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল। এইরূপ ড্রেসিংএর উপর ব্যাণ্ডেজ করার নিয়মাবলী লেখা থাকে। এই রকম ড্রেসিং ব্যবহার করিতে হইলে বিশোধিত গজ (Gauge) এইরূপ ভাবে ব্যাণ্ডেজের সংলগ্ন থাকে যে, হাতের স্পর্শ ছাড়াই রোগীর ক্ষতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৬) ক্ষতের উপর শুষ্ক ড্রেসিং করা উচিত। যদি রক্তপাত বেশী হয় তবে ক্ষতের উপর তূলার প্যাড দিতে হইবে।

(৭) ব্যাণ্ডেজ বেশ আঁট করিয়া বাঁধিবে। রক্তপাত হইলে তাহার উপর তূলার প্যাড দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

(৮) রোগী যেন ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিতে না পারে। প্রয়োজন-বোধে আর্ম-স্লিং ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৯) শকের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

(১০) ডাক্তারের কাছে রোগীকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আঘাত (Injuries) :

পথ চলার সময়ে পা পিছলাইয়া মানুষের হাত-পা ভাঙ্গিয়া যায়। মোটর চাপা পড়িয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে। এইরূপ নানা প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনার দরুন আমরা প্রতিদিনই নানা প্রকার ব্যথা অনুভব করিয়া থাকি। ইহার মধ্যে স্প্রেইন (Sprain) ও স্ট্রেইন (Strain) নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

স্প্রেইন (Sprain) বা মচকানো—মচকানোর দরুন অস্থি-সন্ধি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মচকানোর ফলে (১) শরীরে প্রচণ্ড ব্যথার উৎপত্তি হয়। (২) আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ফুলিয়া যায়। (৩) অস্থি-সন্ধি নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় না। (৪) অনেক সময় রক্ত নির্গমনের দরুন দেহ বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহা প্রথম দেখা যায় না। একবার ঘটিলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা—বিশ্রাম গ্রহণ আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গের অবলম্বন এবং সেই জায়গায় ঠাণ্ডা কম্প্রেস দিলে ফল ভাল হয়। প্রথম অবস্থাতে অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কি মচকাইয়া গিয়াছে ইহা ভালভাবে বুঝা যায় না। তবে হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ইহা ধরিয়া লইয়াই চিকিৎসা শুরু করা উচিত। পা যদি না ফুলিয়া উঠে, তবে জুতা খোলার দরকার নাই। প্রয়োজনবোধে পায়ের উপরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইবে। পা উঠানো অবস্থায় মোটরে করিয়া রোগীকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিবে। অনেক সময় পথে চলার সময় পায়ের গোড়ালী ভাঙ্গিয়া গেলে পা ব্যাণ্ডেজ করিয়া রোগীকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে রোগী কিছুদূর পায়ে হাঁটিয়া ডাক্তারের কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারে।

স্ট্রেইন (Strain)—কয়েকটি মাংসপেশী অথবা মাংসপেশীর রজ্জুবন্ধনের (tendon) আঘাতপ্রাপ্তিকে স্ট্রেইন বা মোচড় বলা হয়। হঠাৎ কোন ভারী জিনিস উঠাইতে গিয়া এইসব মাংসপেশী বা টেণ্ডনের উপর চোট লাগে। অনেক কোম্পানী তাহাদের শ্রমিকদের পিঠের মাংসপেশীর উপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে উরু ও পায়ের মাংসপেশীর উপর জোর প্রয়োগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, যাহাতে শরীরের কোন বিশেষ অংশে জোর না দিয়া সহজে ভারী বস্তা উঠানো যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই রকম আঘাতপ্রাপ্তির সময় শরীরে খুব বেদনা হয়। আঘাত-প্রাপ্ত অঙ্গটি শক্ত হইয়া যায় এবং নাড়াচাড়া করিতে কষ্ট বোধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্ত মাংসপেশীর বাণ্ডিল অথবা টেণ্ডনটি ছিঁড়িয়া যায় এবং রক্তপাতের দরুন সেই অংশটি ফুলিয়া যায়। অত্যন্ত যন্ত্রণা হওয়ায় শরীরের সেই অংশটি নাড়াচাড়া করা সম্ভবপর হয় না।

প্রতিকারের উপায়—রুমাল, তোয়ালে বা একখণ্ড লিনেন কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া কোল্ড কম্প্রেস (Cold compress) দিলে আস্তে আস্তে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া ভালভাবে ঘটে এবং ইহাতে উপকার হইলেও হইতে পারে। কম্প্রেসানের সঙ্গে এডহেসিভ প্লাস্টার (Adhesive plaster) দিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

অস্থিভঙ্গ (Fracture) :

শরীরের কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়াকে অস্থিভঙ্গ বা ফ্র্যাক্‌চার (Fracture) বলা যাইতে পারে। অস্থিভঙ্গ নানা প্রকারের হইতে পারে—(১) সরল (Simple), (২) কম্পাউণ্ড অথবা খোলা

বিভিন্ন প্রকারের অস্থিভঙ্গ

(Compound or open), (৩) জটিল (Complicated), (৪) সম্পূর্ণ (Complete), (৫) অসম্পূর্ণ অথবা গ্রীনস্টিক (Incom-

plete or Greenstick), (৬) কমিনিউটেড (Comminuted), (৭) ইম্প্যাক্টেড্ (Impacted), (৮) ডিপ্রেস্ড্ (Depressed)।

(১) **সরল**—এই রকম অস্থিভঙ্গ হইলে কোন আঘাতের চিহ্ন বর্তমান থাকে না। ভাঙ্গা হাড়ের উপর দিয়া অনায়াসে বায়ু চলাফেরা করিতে পারে। জঙ্ঘার বৃহৎ অস্থিভঙ্গ ইহার উদাহরণ।

(২) **কম্পাউণ্ড**—এইরূপ অস্থিভঙ্গের সহিত ভাঙ্গা অস্থির নীচের নরম তন্তুগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদাহরণ—পায়ের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া গেলে অনেক সময় পায়ের অস্থি টিবিয়া (Tibia) ভাঙ্গিয়া চামড়ার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া থাকিতে পারে।

(৩) **জটিল**—এই সব ক্ষেত্রে হাড়ভাঙ্গা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ধমনী বা শিরা কিংবা নার্ভতন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় অস্থির সন্ধিবিচ্যুতিও ঘটিয়া থাকে।

উদাহরণ—বুকের পাঁজরার একখানি হাড় ভাঙ্গিয়া ফুস্ফুসের ভিতর ঢুকিয়া তাহার ক্ষতি সাধন করিতে পারে।

(৪) **সম্পূর্ণ** (Complete)—যখন হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া যায়, তাহা লম্বালম্বি বাঁকাভাবে নানা প্রকারে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

(৫) **অসম্পূর্ণ অথবা গ্রানস্টিক**—এই ক্ষেত্রে অস্থি আংশিক ভাবে বাঁকিয়া যায় ও আংশিক ভাবে ভাঙ্গিয়া যায়। শিশুদের অস্থি নরম বলিয়া তাহাদেরই এই রকম অস্থিভঙ্গ দেখা যায়।

(৬) **কমিনিউটেড**—এই রকম অস্থিভঙ্গ হইলে সমস্ত অস্থিখানি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। এই প্রকার রোগীর ভার গ্রহণ করা খুব দুষ্কর। সরল অস্থিভঙ্গ অপেক্ষা এই রকম অস্থিভঙ্গে অনেক বেশী যত্ন নেওয়া দরকার।

(৭) **ইম্প্যাক্টেড্‌**—এই রকম অস্থিভঙ্গে একখানা ভাঙ্গা অস্থি অন্যখানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। হাতের রেডিয়াস অস্থির নীচের দিকটা এই ভাবে অন্য অস্থির ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। যখন টুকরা-গুলির একটা অপরটার ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে তখন খটখট (crepitus) শব্দ নাও হইতে পারে। যদি প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী মনে করে যে এই রকম অস্থিভঙ্গ হইয়াছে তবে নিজে কোন ব্যবস্থা না করিয়া ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দিবে।

(৮) **ডিপ্রেস্‌ড্‌**—ইহার ফলে মাথার খুলির একখানি হাড় মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকিয়া যায় ও রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

অস্থিভঙ্গের উপসর্গ ও লক্ষণ ঃ

প্রথমে আঘাতের ইতিহাস জানিতে হইবে—

(ক) কি কারণে আঘাতপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে তাহা রোগী বা পার্শ্ববর্তী লোকেরা বলিয়া দিতে পারে। আঘাত সাধারণতঃ পতন-জনিত কিংবা যানবাহন চলাচলের দুর্ঘটনা হইতে হইয়া থাকে।

(খ) আঘাতের ফলে জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে বা কর্দমাক্ত হইতে পারে।

(গ) বাহির হইতেও অনেক সময় অস্থিভঙ্গ অনুভব করা যায়।

উপসর্গ ঃ

(১) অস্থিভঙ্গের কাছে বেদনা।

(২) ভাঙ্গা প্রত্যঙ্গের শক্তি ক্ষয় হয়।

লক্ষণ ঃ

(১) (ক) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিকৃতি।

(খ) অস্থিভঙ্গের নীচের অঙ্গটা অতি-প্রাকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

(২) আঘাতের নিকটস্থ স্থানসমূহ নিম্নলিখিত কারণে ফুলিয়া যাইতে পারে।

(ক) ভাঙ্গা এক অংশ অপর অংশের উপর উঠিয়া আসিতে পারে।

(খ) মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া যাইতে পারে।

(গ) দেহ হইতে রক্ত নির্গমন হইতে পারে।

(৩) আঘাতপ্রাপ্তির স্থানে অস্থি হইতে রক্ত ক্ষরণ হয়। যদি মাংসপেশী ও নরম তন্তুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে সেই অঙ্গ হইতে রক্ত ক্ষরণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আঘাতপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুদিন পরেও ইহা দেখা দিতে পারে।

(৪) হাড়ের ভাঙ্গা অংশ একটির উপর আর একটি উঠিয়া গেলে, সেই অঙ্গটি ছোট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে

(৫) যদি ত্বকের নীচে আঘাত লাগে তবে অস্থিভঙ্গ হইয়াছে কিনা হাত দিয়া সহজে অনুভব করা যায়।

যে কোন রকম অস্থিভঙ্গ হইলে ডাক্তারের নির্দেশমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম—এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যাহাতে রোগের প্রসার না ঘটে, রোগীর ব্যথার উপশম হয় এবং রোগী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। যদি রোগীর ভাঙ্গা অঙ্গ ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়—যাহাতে সে ইহা নাড়াচাড়া করিতে পারে, তাহা হইলে এই সব উদ্দেশ্য সফল হয়।

অস্থিভঙ্গের স্থানে যত কম হাত দিয়া সরলভাবে চিকিৎসা করা যায় ততই মঙ্গলজনক। কোন কোন প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী অনেক সময় অতিরিক্ত মাত্রায় রোগীর যত্ন নিতে চেষ্টা করেন এবং স্প্লিণ্টার (Splinter) ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করেন। ইহার ফলে ব্যথার উপশম

না ঘটিয়া অনেক সময় ব্যথা বাড়ে এবং রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। শুশ্রূষাকারীর প্রধান কর্তব্য হইবে যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো, অবশ্য ডাক্তারকে সাহায্য করিবার জন্য শুশ্রূষাকারীর ব্যাণ্ডেজ সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত থাকা দরকার।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ঃ

(ক) রোগীর আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গটির অবলম্বনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থায় থাকিতে দিতে হইবে।

(খ) কাপড়-জামা খুলিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময় কাপড়-জামা স্প্লিন্টারের কাজ করে ও দেহের উত্তাপ সংরক্ষিত রাখে। প্রয়োজনবোধে কাপড় মুড়িয়া আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা যাইতে পারে।

(গ) রোগীর গায়ে যত কম সম্ভব হাত দিবে।

(ঘ) শকের চিকিৎসা করিতে হইবে।

(ঙ) আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি ব্যাণ্ডেজ ও স্লিং (Sling) দিয়া ভালভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেগুলি না নড়ে।

আর্ম স্লিং

(চ) কোন প্রকারে হাড় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিবে না।

(ছ) কখনও খাদ্য বা পানীয় দিবে না ; কারণ রোগীকে যে কোন মুহূর্তে চেতনানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইতে পারে। বড় জোর শকের দরুন গরম চা বা কফি রোগীকে খাইতে দেওয়া চলে।

জটিল হাড়ভাঙ্গার প্রাথমিক ব্যবস্থা ঃ

ইহা সরল অস্থিভঙ্গেরই অনুরূপ। তা ছাড়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি দরকার।

(ক) আঘাতের জায়গাকে বিশোধিত দ্রব্যের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ করিতে হইবে।

(খ) প্যাড ও ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ করিবে। রক্তপাত বেশী হইলে টুর্নিকেট ব্যবহার করিবে।

(গ) শকের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা দরকার।

(ঘ) কোন অস্থি বাহির হইয়া থাকিলে তাহা জায়গায় ফিরাইয়া রাখিতে কোন প্রকার চেষ্টা করিবে না।

রোগীকে ব্যাণ্ডেজ করিতে হইলে কি কি জিনিসের দরকার ঃ
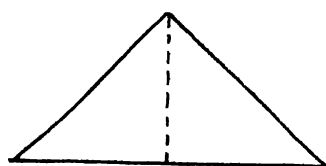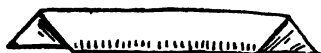
ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ

১। ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ (Triangular Bandage)—ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োজনবোধে বহু রকম ভাবে ভাঁজ করা যায়। (ক) চওড়া ভাবে, (খ) একবার ভাঁজ করা, (গ) একের অধিক ভাঁজ করা।

ব্যাণ্ডেজ কি ভাবে ভাঁজ করিতে হইবে পাশের চিত্র হইতে ভালভাবে বুঝা যাইবে

সব সময়ে গ্র্যানি নট্ (Granny knot)-এর পরিবর্তে রীফ নট্ (Reef knot) দিবে। রীফ নট্ দিতে হইলে ব্যাণ্ডেজের শেষ প্রান্ত যাহা বাম হাতে আছে, তাহা ডান হাতের উপর দাও, তারপর ডান হাতের

প্রান্ত বাম হাতের প্রান্তের উপর দাও। গ্র্যানি নট্ সহজে খুলিয়া যায়। নিম্নের চিত্র হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।
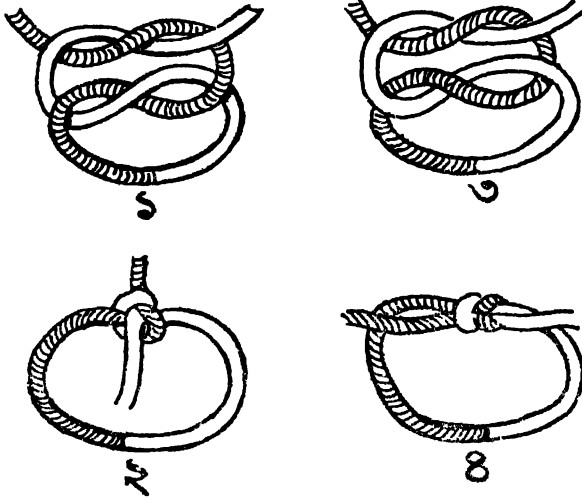
গ্র্যানি নট্ (১-২) ও রীফ নট্ (৩-৪)

২। স্‌প্লিণ্ট (Splint)—চামড়া, ধমনী বা স্নায়ু যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেইজন্য স্‌প্লিণ্টযুক্ত প্যাড ব্যবহার করিতে হয়।

ইহা ছাড়া তূলা, আয়োডিন, এডহেসিভ প্লাস্টার (Adhesive Plaster), গজ (Gauge), লিণ্ট (Lint) প্রভৃতি রাখা দরকার।

৩। গরম জলের ব্যাগ, বরফের ব্যাগ প্রভৃতিরও প্রয়োজন।

৪। ঔষধ হিসাবে আয়োডিন, স্পিরিট অব অ্যামোনিয়া, মেথিলেটেড স্পিরিট, সোডি বাই-কার্বোনেট, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি রাখিলেও ভাল হয়।

বিভিন্ন অঙ্গ ব্যাণ্ডেজের নিয়ম ঃ

হাতের ব্যাণ্ডেজ—প্রথমতঃ ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজটি টেবিলের উপর রাখ। হাতের তালু নীচের দিকে রাখিয়া খোলা হাতটি ব্যাণ্ডেজের

উপর রাখ। ইহা ব্যাণ্ডেজের নীচের দিক হইতে যেন ৩ ইঞ্চি দূরে হয়। তারপর ব্যাণ্ডেজের আগার দিকটা হাত ও হাতের কব্জির উপর স্থাপন কর। দুই প্রান্ত হাতের পিছনে আন।
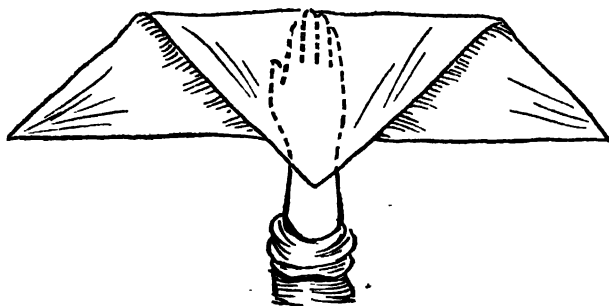
হাতের ব্যাণ্ডেজ (আরম্ভের সময়ে)

কব্জির উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া কব্জির পিছনে বাঁধিয়া দাও। ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগ হাতের পিছনে পিনের সাহায্যে আটকাইয়া দাও। পিন না পাইলে অর্ধেক গিঁট দিয়া ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগটি নীচের দিকে আন এবং গিঁটটি সম্পূর্ণ কর। গিঁটের দুই অংশে অগ্রভাগটি থাকিবে।

হাতের ব্যাণ্ডেজ
(সম্পূর্ণ হইলে)

কনুইএর ব্যাণ্ডেজ—কনুইকে সমকোণে বাঁকাও। ব্যাণ্ডেজের নীচের দিকের ৩ ইঞ্চি মুড়িয়া লও। এই ভাবে ব্যাণ্ডেজটি কনুইএর পিছনে রাখ। ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগটি যেন বাহুর পিছনে অর্ধপথে থাকে। নীচের দিক বাহুর অগ্রভাগের ঠিক মাঝামাঝি থাকিবে। দুইটি প্রান্ত একত্র করিয়া একটির উপর আর একটি দিয়া কনুইএর উপরে পিছনের দিকে আন এবং বার বার ঘুরাইয়া কনুইএর ৩ ইঞ্চি উপরে বাঁধ। অগ্রভাগ গিঁট ও কনুইএর উপর দিয়া বাহুর অগ্রভাগের পিছনে পিন দিয়া আটকাইয়া দাও।

কাঁধের ব্যাণ্ডেজ—কাঁধের ব্যাণ্ডেজ করিতে হইলে তুইখানা ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ দরকার। একটি ব্যাণ্ডেজের কেন্দ্র কাঁধের উপর রাখ। সেই ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগ যেন কাঁধের উপর বা কানের নীচের দিকে থাকে। ব্যাণ্ডেজের নীচের দিকটা ৩ ইঞ্চি মুড়িয়া লও। এই অগ্রভাগ একত্র করিয়া বার বার ঘুরাইয়া বাহুর মধ্যে বাঁধ।

তারপর আর একটি সরু আর্ম স্লিং (Arm sling) আঘাতপ্রাপ্ত কাঁধের উপরে রাখ। কাঁধের গিঁটটি আঘাতপ্রাপ্ত কাঁধের সামনে থাকিবে। প্রথমে ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগ গিঁটের উপর দিয়া নিয়া কাঁধের একটু উপরে পিন দিয়া আটকাইয়া দাও।

কাঁধের ব্যাণ্ডেজ

বুকের ব্যাণ্ডেজ—রোগীর সামনে দাঁড়াও। রোগীর বুকের উপর একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ রাখ। ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগ যেন একটা কাঁধের

১

২
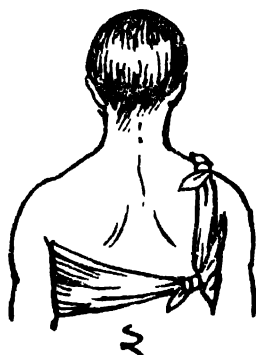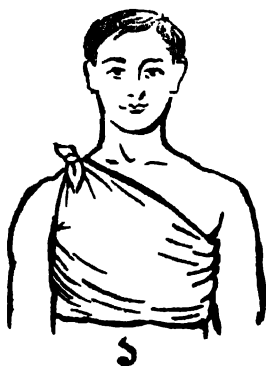
বুকের ব্যাণ্ডেজ

উপরে ভালভাবে থাকে। নীচের দিকটা ভিতরে ৩ ইঞ্চি মুড়িয়া দাও। তুইটি প্রান্ত একত্র করিয়া রোগীর দেহের উপর দিয়া পিছনে লইয়া

যাও। দুইটি প্রান্ত কাঁধের পিছনে একটি লম্বালম্বি সরল রেখায় বাঁধ। গিঁট দেওয়ার পর লম্বা প্রান্তটি উপর দিকে কাঁধের উপরে বাঁধ।

পিঠের ব্যাণ্ডেজ—রোগীর পিছনের দিকে দাঁড়াও। ত্রিকোণ
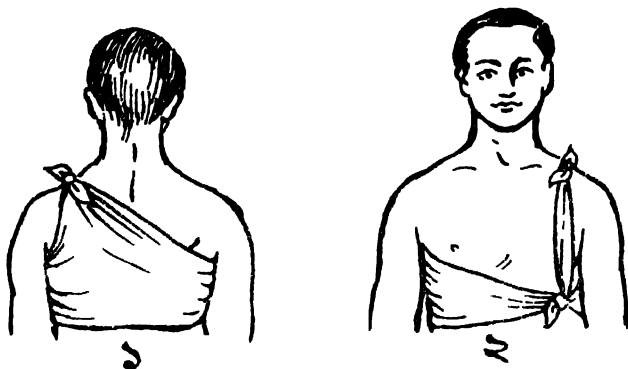
পিঠের ব্যাণ্ডেজ

ব্যাণ্ডেজ পিঠের উপরে রাখ। ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগটি একটি কাঁধের উপরে রাখ। নীচের অংশটিকে ৩ ইঞ্চি মুড়িয়া দাও। দুইটি
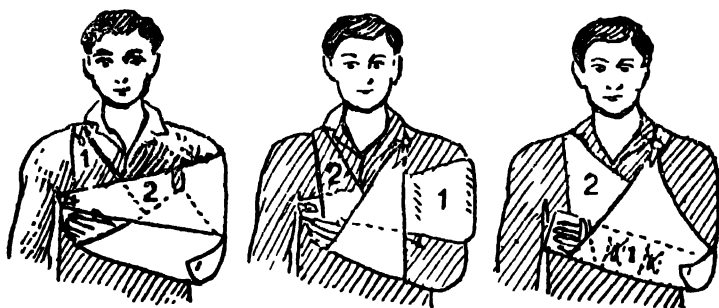
ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের অন্যান্য ব্যবহার

প্রান্ত একত্র করিয়া শরীরের উপর দিয়া সামনের দিকে আন। প্রান্তদ্বয় সামনের দিকে বাম কাঁধে লম্বালম্বি সরল রেখায় বাঁধ। দীর্ঘতর প্রান্তটি উপর দিকে লইয়া কাঁধের উপরে বাঁধ।

হাঁটুর ব্যাণ্ডেজ—আছাড় খাইয়া হাঁটুর প্যাটেলা ভাঙ্গিয়া গেলে ব্যাণ্ডেজ করার প্রয়োজন হয়। একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ হাঁটুর সামনে রাখ যাহাতে ব্যাণ্ডেজের অগ্রভাগ উরুর মাঝামাঝি আসে। নীচের অংশটি ২ ইঞ্চি ভিতর দিকে মুড়িয়া দাও। উরুসন্ধির পিছনে দুইটি প্রান্ত একের উপর আর একটা রাখ এবং তাহাদের সামনের দিকে আন এবং প্যাটেলার উপর সামনের দিকে বাঁধ দাও। ব্যাণ্ডেজ আঁট না হওয়া পর্যন্ত অগ্রভাগটি সামনের দিকে টান তারপর ইহাকে বাঁধের উপর ভাঁজ করিয়া রাখ এবং হাঁটুর সামনে ব্যাণ্ডেজ করিয়া পিন আটকাইয়া দাও

হাঁটুর ব্যাণ্ডেজ

ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ ছাড়াও নানা প্রকার ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুর্ঘটনা যে কোন জায়গায় হইতে
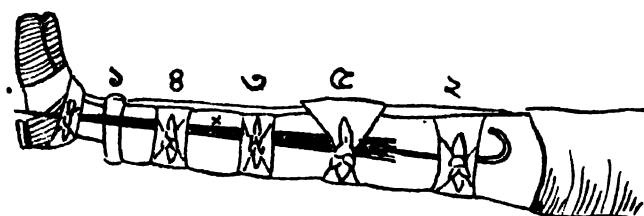
পায়ের অস্থিভঙ্গে ছাতার ব্যবহার

পারে। এইজন্য হাতের কাছে কোন জিনিস না পাইলে ছাতার মত জিনিসই স্প্লিণ্টের কাজ করিতে পারে। উপরে পায়ের অস্থিভঙ্গের একটি চিত্র দেওয়া হইল। এই ক্ষেত্রে স্প্লিণ্ট (Splint) সমেত গাঁটটি বাঁধা হইয়াছে।

প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীরা ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করেন।
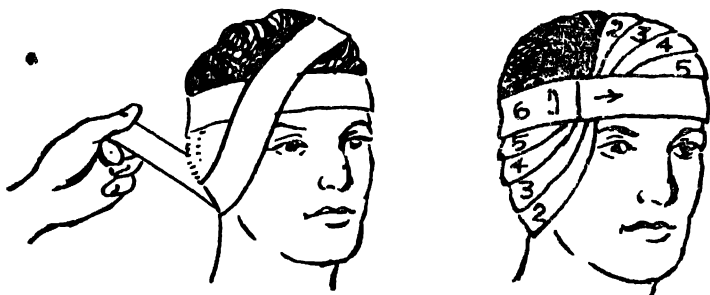
মাথায় রোলার ব্যাণ্ডেজ

ইহা ছাড়া স্পাইকা (Spica), রোলার (Roller) ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি নানা ধরনের ব্যাণ্ডেজ আছে। এই সঙ্গের চিত্রে মাথা ও পায়ের পাতায় এই ধরনের ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার দেখান হইল।

জলে ডোবা (Drowning):

কৃত্রিম শ্বাসগ্রহণের ব্যবস্থা (Artificial respiration)—যখন কাহারও স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় তখন কৃত্রিম-উপায়ে তাহার শ্বাসকার্য শুরু করিবার ব্যাপারকে কৃত্রিম শ্বাসগ্রহণ বলা যাইতে পারে। জলেডোবা বা বুকে আঘাত পাওয়ার দরুন অনেক সময় নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। তখনই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থা এক ঘণ্টা পর্যন্ত চালানো উচিত; কারণ দেখা যায় এইরূপ রোগীকে আপাতদৃষ্টিতে মৃত মনে হইলেও কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে।
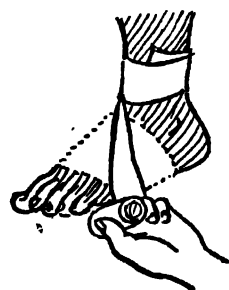
পায়ে রোলার ব্যাণ্ডেজ

জলে ডুবিলে শ্বাসনলে বা ফুস্‌ফুসে জল ঢুকিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া অনেকের মৃত্যু হয়। জলে-ডোবা লোককে সময়মত জল হইতে তুলিতে পারিলে এবং অত্যন্ত দ্রুত বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিলে বাঁচান সম্ভবপর হয়। রোগীর জ্ঞান থাকিলে পেট হইতে সমস্ত জল বাহির করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে পারিলে অধিকাংশ রোগীকে বাঁচান যায়। কারণ শ্বাস বন্ধ হইবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত হার্টের (Heart) কাজ চলিতে থাকে। সেইজন্য একমুহূর্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না।

যখন এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় তখন শুশ্রূষাকারী সহকর্মীর উচিত রোগীর ঘাড় ও কোমরের কাপড় আল্‌গা করিয়া দেওয়া। কোন অবস্থাতে মুখে কিছু আটকাইয়া যেন শ্বাসপথ রুদ্ধ না করে।

কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার ব্যবস্থা অনেক রকমের আছে। তন্মধ্যে তিনটির নাম উল্লেখ করা হইল—(১) শেফার পদ্ধতি, (২) সিলভেস্টার পদ্ধতি, (৩) ইভ পদ্ধতি।

শেফার পদ্ধতি—(১) রোগীর মুখ নীচ দিকে রাখিয়া ও মাথা এক ধারে রাখিয়া হাত দুইটি মাথার উপর দিকে দাও।

(২) সব সময় লক্ষ্য রাখিবে মুখের ও নাকের যেন কোন বাধা না থাকে।

(৩) রোগীর জঙ্ঘার কাছে শুশ্রূষাকারী রোগীর দিকে মুখ করিয়া বসিবে।

(৪) শুশ্রূষাকারীর হাত রোগীর পিছনে রাখিবে। ইহা যেন জঙ্ঘাস্থির ঠিক উপরের অংশে পঞ্জরাস্থির উপরে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠিদ্বয় যেন পরস্পর মধ্যভাগে সরলরেখায় স্পর্শ করে। আঙ্গুলগুলি কোমরের দিকে থাকিবে। শুশ্রূষাকারী গোড়ালির উপর বসিবে।

কোন মতেই তাহার শরীরের ভার যেন রোগীর উপর না পড়ে। অবশ্য সব সময়ই বোগীর পিঠের উপরে থাকিবে।

(৫) জানু হইতে ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হইবে। বাহুদ্বয় সব সময় রোগীব উপব সোজা ভাবে রাখিবে। ইহার

শেফার পদ্ধতি

ফলে রোগীব দেহে নিয়মিতভাবে চাপ পডিবে। এইরূপ অবস্থায় ২ সেকেণ্ড পর্যন্ত থাকিবে। ইহাতে ভূমিব উপব রোগীর তলপেটের চাপ পড়ে এবং ফুস্‌ফুস হইতে কিছু বায়ু বাহির হইয়া যায়।

(৬) শুশ্রূষাকারী হাত ও বাহু সোজা ও ঠিক অবস্থায় রাখিয়া আল্‌গা করিয়া চাপ দিবে। নিজের গোড়ালিব দিকে পিছনে হেলিয়া পড়িবে। এইভাবে ৩ সেকেণ্ড থাকিবে, তারপর আবার সামনের দিকে অগ্রসর হইবে। ইহাতে কিছু বায়ু ফুস্‌ফুসে ঢুকিবে। এইরূপ ভাবে আসা-যাওয়া মিনিটে অন্ততঃ ১২ হইতে ১৫ বার করিতে হইবে। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া ফিরিয়া আসার পরেও অন্ততঃ ১৫ মিনিট এইরূপ প্রক্রিয়া চালাইবে। রোগী আরোগ্য হওয়ার পর তাহাকে গরম দুধ খাওয়াইয়া গরম বিছানায় শোয়াইবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া তাহাকে শুইতে দিবে না।

সিলভেস্টার পদ্ধতি—রোগীর ঘাড়ের নীচে শক্ত কম্বল বা

কুশন (cushion) রাখ, তাহার মাথা পিছনের দিকে পড়িতে দাও। রোগীর মাথার দুইপাশে দুই হাঁটু গাড়িয়া বস। রোগীর বাহুর উপরে নিজের বাহুর অগ্রভাগদ্বয় স্থাপন কর। কনুইএর উপর তাহাদিগকে ভালভাবে ধর। তারপর বাহুগুলিকে টানিয়া
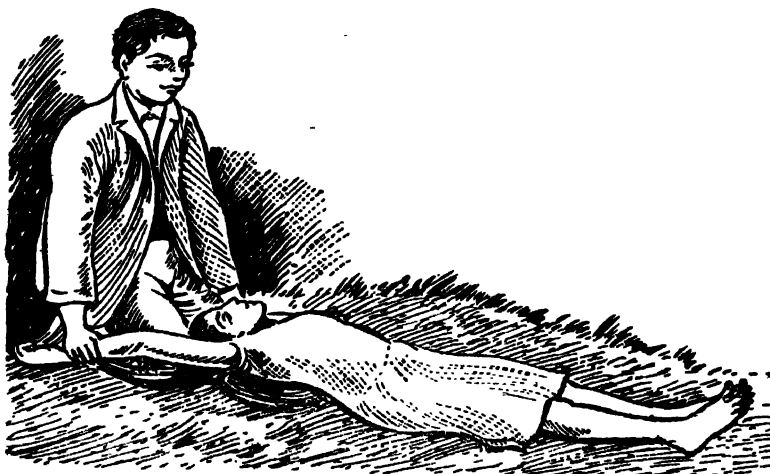
সিলভেস্টার পদ্ধতি

যতদূর সম্ভব নিজের দিকে লইয়া আস। প্রায় ২ সেকেণ্ড এই ভাবে ধরিয়া থাক। তারপর আবার পাশের দিকে হাত দুইটি নাও। তারপর আবার ২ সেকেণ্ড শক্ত করিয়া চাপিয়া ধর। এইরূপ ভাবে সমানে ১৫ মিনিট কাজ করিবে যে পর্যন্ত না রোগীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

ইভ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে মাত্র একজন লোক অনায়াসে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে। রোগীর হাত ও পা স্ট্রেচারের মধ্যে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া মাটি হইতে ৩ ফুট উপরে দুইটি কাঠের দণ্ডের উপর এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছামত

স্ট্রেচারটিকে উঠা-নামা করানো যায়। ১ মিনিটে ১২ বার করিয়া
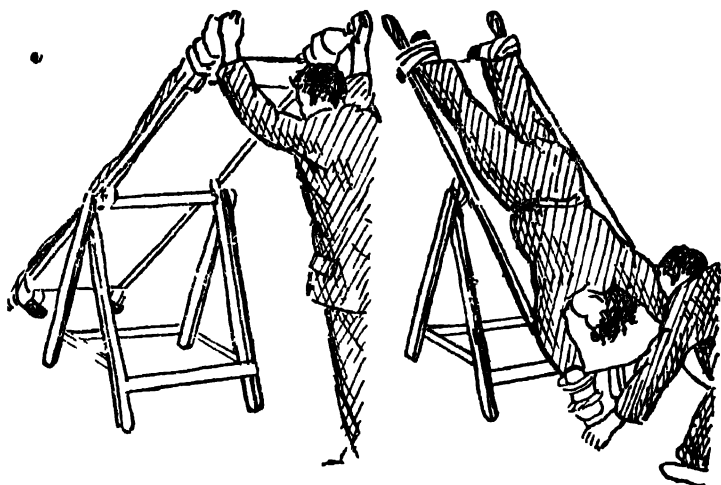
ইভ পদ্ধতি

দোলাইতে হইবে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের ফলে রোগীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

দংশন ও হুল ফুটান (Bites and Stings) :

পাগলা কুকুর, শিয়াল, সাপ অনেক সময় অতর্কিত অবস্থায় মানুষকে দংশন করিয়া বিপদে ফেলে এবং ভীমরুল, বোলতা, বিছা প্রভৃতি কীটসমূহ হুল ফুটাইয়া মানুষকে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়।

কুকুরে কামড়াইলে শুষ্ক ড্রেসিং করিয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কুকুর পাগলা হইলে কুকুর-দষ্ট রোগীর জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাপের বিষ যেরূপ রক্তস্রোতের সাহায্যে মিশিয়া যায়, কুকুরের বিষ শরীরে তেমন ভাবে ছড়ায় না। ইহা নার্ভতন্ত্রের ভিতর দিয়া দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে জলাতঙ্ক রোগ পূর্ণমাত্রায় ছড়াইয়া পড়িতে প্রায় ছয় সপ্তাহ লাগে।

সাপ আঙ্গুলে কামড়াইলে সেখানে বাঁধ দিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে। তারপর চুষিয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলা উচিত। ক্ষতস্থান কার্বোলিক এসিড বা নাইট্রিক এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সর্পদংশন—আমাদের দেশে গোক্ষুরা, কেউটে, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি বিষধর সর্পের দংশনে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে জায়গায় সাপে কামড়াইয়াছে তাহার ঠিক উপরে টুর্নিকেটের সাহায্যে শক্ত বাঁধ দিবে যাহাতে রক্ত চলাচল হইতে না পারে। বিষধর সাপে কামড়াইলে দুইটি দাঁতের দাগ থাকে। আর নির্বিষ সাপে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে বহু দাগ দেখা যায়। গরম জলে ধুইয়া বা চুষিয়া ঐ স্থানের রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। পরে এই বিষাক্ত রক্ত মুখ হইতে
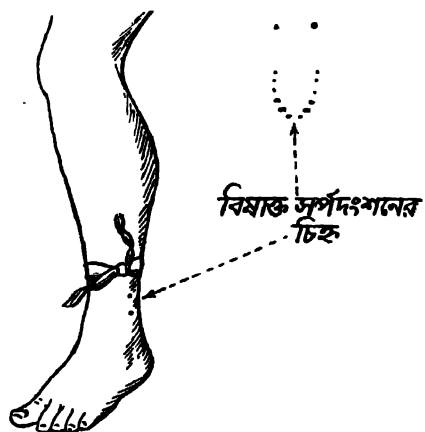
ফেলিয়া দিবে। যদি মুখে কোন ক্ষত থাকে তবে উহা না চোষাই ভাল। আধ ঘণ্টার অধিক বাঁধ দিয়া রাখা উচিত নয়, কারণ তাহার ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গ্যাংগ্রিন প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। তীব্র অ্যামোনিয়া অথবা স্পিরিট ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নড়াচড়া করিতে দিবে না; নড়াচড়া করিলে সমস্ত দেহে বিষ সংক্রামিত হইতে পারে। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। রোগীর শক্ দূর করিবার জন্য

প্রয়োজনবোধে তাহাকে এক কাপ গরম কফি বা চা দিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে কৃত্রিম শ্বাস গ্রহণের ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে।

নিজের হাতে দায়িত্ব না রাখিয়া রোগীকে অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠাইবে।

হুল ফুটানো—হুল ফুটানো আর দংশনের চিকিৎসা অনেকটা এক ধরনের। যেখানে বিছা বা অন্য কোন বিষাক্ত কীট হুল ফুটাইয়াছে সেখানে জোরে চাপ দিয়া হুল ও বিষাক্ত তরল পদার্থ বাহির করিয়া লইবে।

ক্ষতস্থানে এক ফোঁটা তীব্র অ্যামোনিয়া দিবে। আঘাত মুখের ভিতরে হইলে সোডিয়াম কার্বোনেটের তীব্র দ্রবণের সাহায্যে মুখ ধুইয়া ফেলিতে হইবে অথবা দষ্টস্থানে দিয়াশলাইয়ের সাহায্যে তীব্র অ্যামোনিয়া লাগাইয়া দিবে।

হুল ফুটানোর জন্য দেহের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইতে পারে। রোগী শীত-শীত অনুভব করে, মূর্ছা যায় ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, বমি এবং হাত, মুখ ও পা ফুলিয়া যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাইতে পারে। রোগীর মানসিক বিকারের ফলে প্রলাপও বকিতে পারে। অবিলম্বেই রোগীর দায়িত্ব ডাক্তারের হাতে সঁপিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফিট ও মূর্ছা (Fits and Faintings) :

কাজ করিতে করিতে হঠাৎ কেহ কেহ ক্ষণকালের জন্য চেতনা হারাইয়া ফেলে। শরীরের অনৈচ্ছিক (involuntary) মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে ইহা হয়। মৃগী, হিষ্টিরিয়া, ইউরেমিয়া,

ইক্ল্যামশিয়া, মস্তিষ্কে গণ্ডগোল প্রভৃতি কারণে এই রোগের সৃষ্টি হয়। শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কখনও কখনও ফিট হয়। এই বিষয়ে শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য—

(১) রোগীর জিহ্বা দেখিয়া তাহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা করা। যাহাতে রোগী নিজের নড়াচড়ার দরুন নিজেই ব্যথা না পায় সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

(২) অপরের দৃষ্টি হইতে রোগীকে আড়াল করিয়া রাখা।

(৩) ফিটের সময় রোগীর কি কি অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহা লিখিয়া রাখা।

মূর্ছা যাওয়া (Fainting)—হৃৎপিণ্ডে মস্তিষ্কের প্রচুর পরিমাণে রক্ত সরবরাহ না করার দরুন মূর্ছার উৎপত্তি হয়। অনেক সময় জনবহুল প্রকোষ্ঠের উত্তাপ, ভয়, রক্তস্রাব, অতিরিক্ত ক্ষুধা, পরিশ্রম ও রক্তশূন্যতার ফলে মূর্ছা হইয়া থাকে। এই রোগের লক্ষণ অস্থিরতা, মুখ ও কপালে প্রচুর ঘর্মনিঃসরণ এবং জ্ঞান হারানো।

চিকিৎসার ব্যবস্থা—যদি রোগী জনবহুল ঘরে থাকে তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া তাহার মাথা তাহার দুই হাঁটুর মধ্যে স্থাপন কর। যে পর্যন্ত না তাহার মুখ লালবর্ণ হয় সেই পর্যন্ত তাহাকে এই অবস্থায় থাকিতে দাও। তারপর তাহাকে মুক্তবায়ুতে আনিয়া চিৎ হইয়া শুইতে দাও। তাহার জামা-কাপড় আল্‌গা করিয়া দিবে। জ্ঞান ফিরিলে গরম চা, কফি অথবা ঠাণ্ডা জল দেওয়া চলে। যে পর্যন্ত না তাহার জ্ঞান ফিরে সেই পর্যন্ত তাহাকে স্মেলিং সল্ট শুঁকিতে দিবে।

হৃৎপিণ্ডের অসুখের দরুন অনেক সময় মূর্ছা রোগ হয়। তাহা মারাত্মক হইতে পারে। তখন ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া কোরামিন ইন্‌জেকশন দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফরেন বডিজ (Foreign Bodies) ঃ

অনেক সময় আকস্মিক দুর্ঘটনার দরুন আমাদের মুখ, নাক, চোখ, কাঁন প্রভৃতিতে কোন কোন জিনিস ঢুকিয়া যায়। সেইগুলি বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনেক কষ্ট অনুভব করি।

কানের ভিতর পোকা ঢুকিতে পারে। যে কানে পোকা ঢুকিয়াছে তাহা উপর দিকে রাখিয়া মাথাটি নীচে রাখিতে হইবে। কানের ভিতর ক্যাস্টর অয়েল, অলিভ অয়েল বা সরষের তেল গরম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়েরা পেন্সিল বা খড় কানের ভিতর ঢুকাইয়া দেয়। যদি ইহার ডগা হাতের সাহায্যে ধরিতে পারা যায় তবে খুব আস্তে আস্তে টানিবে। জোরে টানিলে অনেক সময় কানের পর্দা জখম হইতে পারে। পেন্সিল, বোতাম ঢুকাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিবে। বাহির করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, সেগুলি বাহির না হইয়া আরও ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে পারে। কাজেই নিজে চেষ্টা না করিয়া ডাক্তারের সাহায্যে যত শীঘ্র সম্ভব এগুলি বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

যে জিনিস ভালভাবে চোখের সঙ্গে লাগিয়া থাকে তাহা কখনও জোর করিয়া বাহির করা উচিত হইবে না। চোখের জলের সাহায্যেই ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে ধুইয়া যাইবে। তাহা না হইলে আই-লোশনের সাহায্যে বারবার চক্ষু ধুইয়া দিবে। কখনও চোখ রগড়াইবে না। চোখের জলে বা আই-লোশন ব্যবহারে উপকার না হইলে ক্যাস্টর অয়েল বা অলিভ অয়েল দিয়া চোখ বাঁধিয়া রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠাইবে।

নাকের ভিতরেও বোতাম, মটরদানা প্রভৃতি ঢুকিতে পারে।

তেমন রোগীকে খুব জোরে হাঁচিতে দিবে। ইহাতে ফল না হইলে তাহাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

কোন কোন সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পয়সা, মার্বেল, সেফটিপিন ইত্যাদি গিলিয়া ফেলে। এগুলি অনেক সময় জিহ্বার দুই পাশেই আটকাইয়া থাকে; কখনও ইসোফেগাস্ ও উইণ্ড-পাইপের ভিতর দিয়াও ঢুকিয়া যায়। সেইজন্য এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত :—

১। জিহ্বার পিছনে আঙ্গুল ঢুকাইয়া ঐ সব জিনিস আনিবার চেষ্টা করিবে।

২। শিশুকে উল্‌টা করিয়া ধরিয়া রাখিলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়।

যদি কোন ক্ষুদ্র মসৃণ পদার্থ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তবে তাহা ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়া মলের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাহা না হইলে ডাক্তারের উপদেশমত অপারেশন করা দরকার।

1. A book-case in your reading room is badly infested with white ants. How would you treat it and what measures would you adopt to prevent future attack? (তোমার পাঠাগারের একটি আলমারি উইপোকার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। তুমি এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিবে? ভবিষ্যতের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার কি করা উচিত?)
2. Give the names of some household pests. What harm do they cause? (গৃহের কয়েকটি অনিষ্টকর কীটপতঙ্গের নাম কর। তাহারা আমাদের কি ক্ষতি করে?)
3. How are the germs of Plague spread? How can you

check it? (কি ভাবে প্লেগ রোগের জীবাণু ছড়াইয়া পড়ে? কি ভাবে ইহা দমন করিতে পার?)

4. How can you get purest form of drinking water? Why does pure drinking water possess no taste? (কি ভাবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইতে পার? বিশুদ্ধ জলের স্বাদ থাকে না কেন?)

5. What are the commonest types of filter used in house? Describe them. (গৃহে কি প্রকার ফিল্টার ব্যবহৃত হয়? তাহাদের বর্ণনা দাও।)

6. What are the disinfectants used in the purification of water? Describe their functions. (জল জীবাণুমুক্ত করিতে কি কি বিশোধক ব্যবহৃত হয়? তাহাদের কার্যাবলী বর্ণনা কর।)

7. How will you treat a patient who is burnt? What is the difference between burns and scalds? (পুড়িয়া যাওয়া রোগীর প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? পুড়িয়া যাওয়া ও স্কাল্ডের মধ্যে পার্থক্য কি?)

8. Why is it that you should give special importance to a person who is bleeding? How can bleeding be prevented? (যে ব্যক্তির রক্তপাত হইতেছে তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব কেন দিবে? রক্তপাত কি ভাবে বন্ধ করা যায়?)

9. What are the essential qualifications a man giving first aid should require? (প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর কি কি আবশ্যকীয় জ্ঞান থাকা দরকার?)

10. Distinguish between sprains and fractures. What measures would you adopt for a case of sprains? (মচকানো ও হাড়ভাঙ্গার মধ্যে পার্থক্য কি? মচকানো রোগীর জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?)

11. What are the different types of fractures ? How would you treat a patient whose leg is fractured ? (অস্থিভঙ্গের বিভিন্ন প্রকার কি কি ? পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এরূপ ব্যক্তির প্রতি কিরূপ প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ?)
12. What are the different types of artificial respiration ? Describe them. (কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার ব্যবস্থা কত রকমের আছে ? তাহাদের বর্ণনা দাও ।)
13. How will a case of snake-bite be treated ? How can you recognise that a snake is poisonous one ? (সর্পদষ্ট ব্যক্তির কিরূপ চিকিৎসা করিবে ? তুমি কি ভাবে বুঝিতে পার যে কোন সর্প বিষাক্ত কিনা ?)
14. What will you do when a person is stung by a poisonous insect ? (কোন ব্যক্তিকে বিষাক্ত কীটপতঙ্গ কামড়াইলে কি করিবে ?)
15. What is the difference between fit and faintings ? How are they caused ? How will you give first aid to a person who is fainting ? (ফিট ও মূর্ছার মধ্যে পার্থক্য কি ? ইহা কি ভাবে সংঘটিত হয় ? মূর্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য কিরূপ প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ?)
16. What would you do when dust particles enter in your eye ? Why is it not advisable to rub the eyes when any foreign substance enters in it ? (যখন ধূলিকণা চোখে ঢুকে তখন কি করিবে ? বাহির হইতে চোখের ভিতর ময়লা প্রবেশ করিলে চোখ রগড়ানো উচিত নয় কেন ?)
17. What is shock ? What precautionary measures would you adopt to prevent shock ? (শক্ কাহাকে বলে ? শক্ নিবারণ করিতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ?)

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ গৃহ-পরিচালনার পরিকল্পনা

(Planning for good management)

সৃষ্টির আদিম মুহূর্তে যখন সভ্যতার উন্মেষ হয় নাই, তখন মানুষ ছিল একক, অসহায়। সে যাযাবরের মত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত—পরিবারের কোন বন্ধন তাহার ছিল না। সভ্যতার সূত্রপাতে সে যাযাবর-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৃহ-কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল—শুরু হইল তাহার পারিবারিক বন্ধন। পারিবারিক জীবন সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন হইল পরিবারের একজন গৃহকর্ত্রীর বা গৃহকর্তার। সমগ্র পরিবারের দায়িত্বের ভার রহিল সেই গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর উপর।

পাশ্চাত্য দেশে ও আমেরিকায় গৃহনেতৃত্বের মূলে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অবদান অনেকখানি রহিয়াছে। বাইবেলের Proverbs 31 গ্রন্থে ধর্মপ্রাণা গৃহিণীকে সুষ্ঠুভাবে গৃহকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। Proverbs 31-এ লেখা আছে—"সুগৃহিণী পশম ও ফ্লাক্স অন্বেষণ করেন, বাড়ীর লোকদের খাদ্য বিতরণ করেন। তিনি বিবেচনা করিয়া শস্যক্ষেত্র কিনিয়া অনুভব করেন যে তাঁহার বাণিজ্যদ্রব্যগুলি ভাল। তিনি বাড়ীর সকলের জন্য শীতের পোশাক-পরিচ্ছদ যোগাড় করেন।" গৃহকর্ত্রীর কাজ এবং গৃহের উন্নতির জন্য সময় ও শক্তির ব্যবহারের প্রশংসা বাইবেলে আছে—"বেশী ঘুমাইও না, তাহা হইলে দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে। হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও, তাহার জীবনধারা দেখ এবং জ্ঞান সঞ্চয় কর। তাহার চালক

শাসক বা পথপ্রদর্শক কেহই নাই, তথাপি সে শরৎকালের জন্য মাংস যোগাড় করে এবং শস্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করে।"

গৃহ, পরিবার ও সামাজিক জীবনধারা সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের নিকট অনেকাংশে ঋণী।

গ্রীক ইস্কোমেকাস অতি ধৈর্যসহকারে তাঁহার পত্নীকে তাহার নির্ধারিত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেন। সংসারের যাবতীয় জিনিসের হিসাব রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। গৃহে আনীত কাঁচা পশম হইতে যাহাতে গৃহের প্রত্যেকের প্রয়োজনমত পোশাক তৈয়ারী হয় সেই দিকে তাহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রীতদাস অসুস্থ হইলে সেবাশুশ্রূষার ভার তাহার উপরে। অদক্ষ ক্রীতদাস-কন্যাকে নিপুণভাবে সূতা কাটা শিখাইবার দায়িত্ব তাহার উপর নির্ভর করে। গৃহের কোন্ স্থানে ভালভাবে শস্য সঞ্চয় করা যায় সে বিষয়ে তাহাকে ভালভাবে জানিতে হইবে। কোথায় গৃহের যাবতীয় সরঞ্জাম, কৌচের ঢাকনি, ফুলদানি, থালা-বাসন, রান্না করিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি রাখিতে হইবে এ বিষয়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ (Aristotle) তাঁহার Politics নামক গ্রন্থে গৃহকর্ত্রীর ও গৃহকর্তার দায়িত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "প্রকৃতিজাত দ্রব্যগুলিকে সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহের প্রয়োজনে ব্যবহার করার দায়িত্ব গৃহকর্তার। তাহাদের তন্তুবায়দের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যে তন্তুবায় পশম তৈয়ার করে না, পশমকে প্রয়োজনমত গৃহের কাজে লাগায়, তাহাকে জানিতে হইবে, কোন্ পশম প্রয়োজনীয়, কোন্ পশম অপ্রয়োজনীয়। তাহাকে আরও জানিতে হইবে কোন্ জিনিসের মূল্য বেশী, হাজারমূল্য কম।" সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় লেখক সিসেরো (Cicero)

বলিয়াছেন, "আমি মনে করি মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত পরিবারের ও রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" ক্যাটো (Cato) এবং ভার্জিল (Virgil) মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।

বর্তমান আমেরিকায়ও গৃহ ও অর্থনীতি আন্দোলনে ছয়টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে :—(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পদ্ধতি (Method of cleaning), (২) মেঝের যত্ন (Care of floors), (৩) কাজের পরিকল্পনা (Planning of work), (৪) আয়ের বণ্টন (Division of income), (৫) পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (Household accounts), (৬) পরিবারের আয়-ব্যয়ের অংশীদারদের সম্মিলিত সভা (Consumers' League).

এই সব আন্দোলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে :—প্রত্যেক গৃহে অর্থনীতির মূলমন্ত্র হইবে, 'প্রত্যেক মেয়েকে তাহার গৃহদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা। সে মা হউক বোন হউক বা স্ত্রী হউক, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইবে পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা।' পাশ্চাত্য দেশ ও আমেরিকা গৃহনীতির অনুশীলনের ফলে অনেক আগাইয়া গিয়াছে।

অতীত যুগে ভারতের মুনিঋষিরাও সংসারধর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। পরিবারে নারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অনেক উপদেশ রহিয়াছে। ভারতীয় দর্শন ভগবৎতত্ত্বের দিকে অন্তর্মুখী হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ঋষি উচ্চারণ করিয়াছেন, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি সুতৈরপি।" অর্থাৎ নিজকে সব সময়ে রক্ষা করিবে—নিজের পুত্রকলত্রের সাহায্যেও রক্ষা করিবে। তপোবনের ঋষি কণ্বমুনি শকুন্তলাকে স্বামিগৃহে যাইবার পূর্বে গৃহধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব অনেকখানি। প্রথমতঃ পরিবারের সকলকে পরিবারের মূলনীতি অনুযায়ী চালাইতে হইবে। যাঁহাতে তাহারা পারিবারিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহের খাদ্য-তালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা যাহাতে পূর্ব হইতেই ঠিক করা যায় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। ইহার ফলে পরিবারের অন্যান্য সকলেই তাহার উপর আস্থা রাখিতে শিখিবে। সর্ববিষয়ে সহকর্মীদের আস্থাভাজন হইতে হইবে। অন্যান্য সহকর্মীরা প্রশংসনীয় কাজ করিলে মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অপরের সময়ের মূল্য ও শক্তি সম্বন্ধে সব সময় বিবেচনা করিতে হইবে। নিজের ব্যক্তিত্ব, কার্যাবলী ও কথার দ্বারা অপরের প্রাণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে হইবে।

সুদক্ষ গৃহিণী অপরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করেন। যদি ইহাতে তিনি অপরের নিকট সমাদৃত নাও হন, তবুও তিনি মনে কিছু করেন না। সব সময়ে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, গৃহকর্তব্যের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার। পরিবারের অপর সকলে মিলিয়া যাহাতে আনন্দ ও আমোদ উপভোগ করিতে পারে সেইদিকে তাঁহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। রসালাপের সাহায্যে তিনি অপরের মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিবেন। অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাহাতে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি উপকৃত হইতে পারে তাঁহার সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। নিজের কোন বিশেষ গুণ থাকিলে তাহার সাহায্যে অপরকে আনন্দিত করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

খাওয়া-পরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলতি সমস্যা—সব ব্যাপারেই যুগের সঙ্গে চলিতে হইবে। নিজের মত যে সব সময়েই ঠিক

হইবে ইহা না ভাবিয়া অপরের মত ভাল হইলে তাহাও গ্রহণ করা দরকার। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন থাকিতে পারে—সেই সব বিষয় ভাবিতে হইবে এবং দেখিতে ও শুনিতে হইবে। পরিবারের প্রত্যেকের প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। জীবনযাত্রার মান হ্রাস না করিয়া স্বীয় পরিকল্পিত পন্থানুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে হইবে। সাধারণ পুষ্টির জন্য যে সব খাদ্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা ক্রয় করিয়া দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যেন সমগ্র গৃহ ও তাহার আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহের আসবাবপত্র ও সব সামগ্রীর প্রতি যেন প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকে। গৃহসজ্জা, ফুলদানি, থালাবাসন ও আসবাবপত্র যেন সুরুচি-সম্পন্ন হয়। গৃহকার্য করার জন্য সর্বদা প্রত্যেক কাজের সময় সুনির্দিষ্ট রাখিতে হইবে। কার্যের পরিকল্পনা যেন পূর্ব হইতেই সুগঠিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। পারিবারিক আয়-ব্যয়ের বাজেটের জন্য তাহার পরিপক্ব জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরকে প্রভাবান্বিত করিতে ও বুঝিতে হইবে। প্রতিদিনের হিসাবপত্র নিজের হাতে লেখা দরকার। যাহাতে জল, বায়ু, উত্তাপের দরুন গৃহের জিনিসপত্র অপচয় না হয় সেইদিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহকার্যের ক্রমোন্নতি বা অবনতির দিকেও অবহিত হওয়া কর্তব্য। তাঁহাকে সব সময় কষ্ট-সহিষ্ণু, কৌশলী ও তৎপর হইতে হইবে। সর্বদাই তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির সুখ-দুঃখের দায়িত্ব একমাত্র তাঁহারই।

পরিবারের সংস্থান অনুযায়ী পরিবারের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে যে বিভিন্ন নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় তাহার উপর গৃহ-

পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এইজন্য ক্রমান্বয়ে তিনটি পর্যায়ে গৃহব্যবস্থা সম্পন্ন করিতে হয়—(১) পরিকল্পনা, (২) ব্যক্তিগত
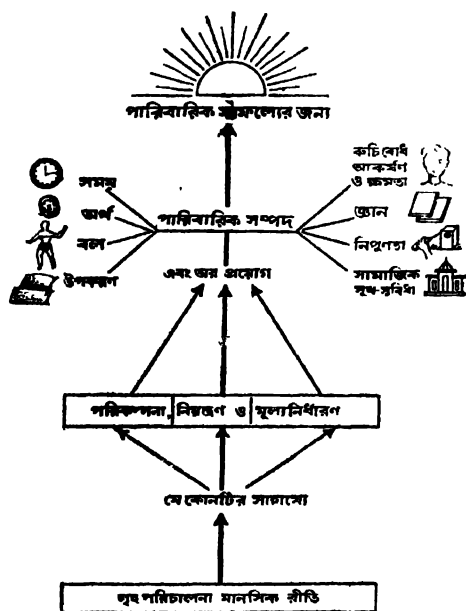
ভাবেই হউক বা সমষ্টিগত ভাবেই হউক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সময় উত্তমরূপে তত্ত্বাবধানে তৎপর হওয়া ; (৩) ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য চালু পরিকল্পনার গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করা।

আশু বা গৌণ উদ্দেশ্য সার্থক করিতে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহাকে পরিকল্পনা (Planning) বলে। গৃহের পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধান বলিতে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার অবস্থা বুঝায়। পরিকল্পনার সঠিক স্বরূপ বুঝিতে হইলে

ইহা কার্যকরী হইবার পর ইহার গুণাগুণকে বুঝায়। চালু পরিকল্পনার দোষত্রুটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইতে পারিলে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করা অনেক সহজ হয়।

গৃহ-পরিচালনার দায়িত্ব গৃহকর্ত্রীর উপর অনেকখানি বর্তায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে একমাত্র সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা গৃহকর্ত্রীরই আর পরিবারের বয়স্ক লোকের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নাই ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এবং অবস্থাভেদে পরিবারের যে কেহ ঐ কার্য গ্রহণ করিতে পারে। গৃহ-পরিচালনা বলিতে কাজ করা এবং করান দুইই বুঝায়।

শুধু মাত্র জন্মগত শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে সুগৃহিণী হওয়া যায় না। সুবুদ্ধি, সুবিবেচনা ও কর্মনৈপুণ্য গৃহিণীকে নিপুণভাবে গৃহকর্ম পরিচালনা করিতে সহায়তা করে, তবে ইহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য সুশিক্ষারও প্রয়োজন। বর্তমান যুগে এই বিষয়ে অনেক বই বাহির হইয়াছে। ভালভাবে এ বিষয় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

গৃহে শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দয়ামায়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই গৃহ-পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সহিত গৃহের যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন হইলেই গৃহিণীর গৃহ-পরিচালনা সার্থক। ইহাতেই সুগৃহিণীর পরিচয় মিলে। এইজন্যই সুগৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্যবৎ বলা হয়। সুচারুরূপে গৃহ-পরিচালনা করিতে হইলে গৃহিণীকে পরিশ্রমী হইতে হইবে। সুপরিচালিত পরিচ্ছন্ন গৃহে একটি লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠে যাহা সকলকেই আনন্দ দেয়।

গৃহ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। সুনিয়ন্ত্রিত, শ্রীমণ্ডিত গৃহ সমাজের তথা সমগ্র জাতির সম্পদ। কারণ গৃহেই ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্ম,

শিক্ষা, দীক্ষা সব কিছু হইয়া থাকে। শিশুর পরিচর্যা, তাহার শিক্ষার সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি সুগৃহিণীর কর্তব্য।

পরিবারের লোকদের মধ্যে কর্মবিভাগ

(Division of work among family members)

গৃহের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রত্যেককে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে এবং সমবেত চেষ্টার দ্বারা গৃহের সমগ্র কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। কাহার কিরূপ কাজ হইবে সে বিষয়ে ধরাবাঁধা নিয়ম করিয়া দেওয়া যায় না। তবে মেয়েদের কাজ ঘরের ভিতরে ; এজন্য রান্নাবান্না, গৃহের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম পরিষ্কার রাখা ও সাজানো প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব মেয়েদের আর বাহিরের কাজ, হাটবাজার প্রভৃতির দায়িত্ব ছেলেদের উপর নির্ভর করে। এই বিভিন্ন কাজের সমাধানকল্পে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াও আবশ্যক।

কোন কোন সময় পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতানৈক্যের ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিমতের প্রাধান্যের জন্য অথবা জোর করিয়া অপরকে নিজের মতে আনায় এই ভাবে তিক্ততার সৃষ্টি হইতে পারে। তবে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বাধা-প্রদান করাই কর্তব্য নয়—পরিবারের সমগ্র কল্যাণের জন্য বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়াই প্রধান কাম্য।

বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যাহা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর মনে হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যাহাতে পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে পারে সেদিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিবারের

আদর্শের মান বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্পৃহা ও নিষ্ঠা থাকা দরকার। সৃজনী প্রতিভার বিকাশ সাধন প্রয়োজন। স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতীত কালে জীবনযাত্রা সহজ সরল অনাড়ম্বর ছিল। যানবাহনের প্রচলন না থাকায় মানুষের সহিত মানুষের এত ব্যাপক সম্বন্ধ ছিল না। জীবনও ধীর গতিতে চলিত; কিন্তু এই এরোপ্লেনের যুগে মানুষ মানুষের অনেক নিকটে আসিয়াছে—সব কিছুরই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে মানুষকে মানাইয়া চলিতে হইবে। সেইজন্য পরিবারের সকলের মধ্যে কাজগুলি ভাগ করিয়া দেওয়াও সুগৃহিণীর কর্তব্য। সমাজে যেমন কাজের বিভাগ আছে, পরিবারেও বয়স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

একটি পরিবারে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ আছে; তাহারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পরিবারের কতগুলি কাজ শিশুরাও করিতে পারে। যেমন শিশুর নিজের কাপড়চোপড়, খেলনা ইত্যাদি শিশু নিজেই ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে ও গুছাইয়া রাখিতে পারে। ছোট ছোট জিনিস মা-বাপের বা পরিবারের অন্যান্য লোকদের হাতের কাছে আগাইয়া দিতে পারে। একটু বড় হইলে মেয়ে মায়ের কাজে এবং ছেলে বাবার কাজে সাহায্য করিতে পারে। ঘরবাড়ী ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা ও তোলা, কাপড়চোপড় শুকাইতে দেওয়া ও তুলিয়া রাখা—এইগুলি মেয়েরা একটু বড় হইলেই করিতে পারে। তা ছাড়া খাদ্য-পরিবেশন, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-যত্ন করা ইত্যাদিও করিতে পারে। ছেলেরা দোকানের জিনিস আনা, ছোটখাটো মেরামতি কাজ করা, বাইরের অন্যান্য কাজ এবং বই,

খাতাপত্র গুছাইয়া রাখা এগুলি অনায়াসেই করিতে পারে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করার কাজটি করিতে পারেন।

এই ভাবে কাজের ভাগ হইলে পরিবারের প্রত্যেকেরই কাজের চাপ কমিয়া বিশ্রামের অবসর মিলে। কর্মবিভাগের দ্বারা পরিবারের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মে। তাহার ফলে প্রত্যেকেই কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হইতে শিখে। সকলেই পরিবারের সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হয়। শিশুদের শিক্ষার ও চরিত্রগঠনের ইহা একটি প্রধান উপায়। ইহাতে তাহারা আত্মনির্ভরশীল, বিবেচক ও পরিশ্রমী হইতে শিক্ষা লাভ করে।

রান্নাবান্নার কাজ মেয়েদেরই। সেই কাজগুলি বিভিন্ন রকমের; যেমন—ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব, তরকারী কাটা, মসলা করা ইত্যাদি। এইসব কাজ পুত্রবধূ ও কন্যাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা নিজেরা রান্না করেন, পুত্রবধূ ও কন্যাদের দ্বারা তাহা পর্যায়ক্রমে করান যাইতে পারে।

দৈনন্দিন বাজার করার মধ্যে অনেকখানি বিবেচনা করিতে হয়, সেজন্য বয়স্ক পুরুষদের ইহা করা বাঞ্ছনীয়। নিজেদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য জামা-কাপড় নিজেদেরই ধুইয়া লওয়া উচিত। কেবল বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কাপড়-চোপড় দাসদাসী বা অন্য কেহ ধুইয়া দিবে।

দাসদাসী থাকিলে তাহাদের মধ্যেও কর্মবিভাগ করিয়া দেওয়া সুগৃহিণীর কর্তব্য—যাহাতে একজনের উপর বেশী চাপ না পড়ে অথবা কেহ ফাঁকিও দিতে না পারে। আশ্রিত-পরিজন কেহ থাকিলে বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত তাহাদেরও সমানভাবে কাজে নিয়োগ করিতে হইবে যেন তাহারা নিজেদের পরিবারেরই একজন মনে করিতে পারে।

আকস্মিক বিপদ-আপদে বা রোগে প্রয়োজনমত পরিবারের প্রত্যেকেরই সক্রিয় সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক। সংসারের আয়-ব্যয়, সঞ্চয়-ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের নির্দিষ্ট তালিকা সুগৃহিণীর নিয়ন্ত্রণাধীনেই থাকা উচিত। এই ভাবে সুষ্ঠু কর্মবণ্টনের ও সুপরিচালনার ফলে সংসারে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং পরিবারের লোকদের পরস্পরের সম্পর্ক মধুর থাকার ফলে জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও সুন্দর হইয়া উঠে।

শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায়

সময়, প্রচেষ্টা এবং অঙ্গচালনা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহারিক জ্ঞান :

বর্তমান যুগের মেয়েরা শুধু গৃহেই আবদ্ধ নয়—প্রয়োজনের তাগিদে ও কর্মপ্রেরণায় তাহাদিগকে বাহিরের কাজেও অংশ গ্রহণ করিতে হইতেছে, অথচ গৃহই মেয়েদের একান্ত প্রিয়; তাহাকে অবহেলা করা চলে না। সেজন্য গৃহকর্মের শ্রম লাঘব ও সময় বাঁচাইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যেও নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টা হইতেছে। চলাফেরার মধ্যেও যাহাতে অল্প সময়ে অল্প আয়াসে কাজ করা যায় সেজন্য গবেষণা হইতেছে। মানুষের হাতের কাজে যে সময় লাগে যন্ত্রের সাহায্যে সেই কাজে অর্ধেক সময়ও লাগে না।

পাশ্চাত্য দেশগুলি এবিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে অধিকাংশ লোকেরই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া জুটে না। তাছাড়া আমাদের যন্ত্রপাতিও খুবই কম, বেশীর ভাগ যন্ত্রপাতিই বিদেশ হইতে চড়া দামে কিনিতে হয়। কাজেই গৃহস্থালীর

কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে যাহা যাহা সম্ভব, সেগুলি ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন বিজলী বাতি ও পাখা এখন অনেক সস্তা; কাজেই এগুলি ব্যবহার না করিবার কোন কারণ নাই। বিভিন্ন ধরনের স্টোভ, কেরোসিন কুকার, ইলেক্‌ট্রিক হিটার প্রভৃতিও সকলে ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে কয়লা ভাঙ্গা, উনুন নিকানো ইত্যাদির জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না, সময়ও কম লাগে এবং ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। কাপড় ইস্ত্রি করিতে ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রিতে ঝামেলা কম, কাজ হয়ও তাড়াতাড়ি। এইসব যন্ত্রপাতি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আমরা শ্রম ও সময় বাঁচাইতে পারি।

প্রত্যেক কাজেরই একটা নিয়ম, শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনা থাকা দরকার। উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে হইলে কোন্ কাজ কখন দরকার, সেই কাজে কতটা সময় প্রয়োজন হইতে পারে সেই সম্বন্ধে গৃহিণীর বাস্তব জ্ঞান ও সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। যখন যে কাজের দরকার তাহা গুছাইয়া রাখিলে এবং ঠিক সময়ে করিতে পারিলে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সময় বাঁচে। সময়ের সামান্য এদিক ওদিক হইলে সব কাজেই গোলমাল হয়, সেজন্য সময়ানুবর্তিতা সংসার সুপরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তারপর কতকগুলি কাজ—যেমন রান্না, খাওয়া, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ; কিন্তু সাবানকাচা, ঘরের জানালা-দরজা ইত্যাদি ঝাড়ামোছা করা সপ্তাহে একদিন বা দুই-তিন দিন অন্তর করিলেই হয়। সমস্ত বাড়ীটি পরিষ্কার করা বা তোলা বাসনকোসন ইত্যাদি পরিষ্কার করা—এই কাজগুলি মাসে একদিন করিলেই চলে। এই ভাবে একটা পরিকল্পনা করিয়া কাজ করিলে সময়, শ্রম সব কিছুই লাঘব হয়, কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

তারপর আসে কাজ বণ্টন করার কথা। এক একজন এক একটি কাজ করিতে ভালবাসে এবং এক একজনের এক একটি কাজ ভাল হয়। কাজেই ব্যক্তি বিশেষের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দিলে সেই কাজটি অল্প পরিশ্রমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন রান্নার জন্য বাসনকোসন, মসলাপতি, কাপড় কাচার জন্য সাবান, সোডা, বালতি ইত্যাদি দরকার হয়। বিভিন্ন কাজের জিনিসপত্র যদি প্রয়োজন অনুযায়ী গুছানো থাকে তবে সময় ও শ্রমের দিক হইতে কাজের অনেক সুবিধা হয়, কাজ করিতেও আগ্রহ জন্মে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বাসনকোসন আলাদা রাখা, মসলাপাতি পাত্রে লেবেল লাগাইয়া একটা তাকে রাখা, পরিষ্কার করিবার জিনিসগুলি একটা আলাদা তাকে রাখা—এই নিয়মে কাজ করিলেও অনেক সুবিধা হয়। তাছাড়া যে ঘরে যাহা প্রয়োজন—যেমন রান্নাঘরে রান্নার জিনিসপত্র, খাবার-ঘরে থালা-গ্লাস এই ভাবে প্রত্যেক জিনিস ঠিক জায়গামত রাখিলেও অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ে সুশৃঙ্খলভাবে কাজটি নির্বাহ হয়।

এই কাজগুলি করিতে কোন অর্থ ব্যয় হয় না ; একটু বিবেচনা, মনোযোগ ও আন্তরিক ইচ্ছা আর প্রচেষ্টা দ্বারাই এগুলি সম্পন্ন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব।

ইহা ছাড়া আমাদের চলাফেরার সুবিধার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা করিবারও কতগুলি নিয়ম মানিয়া চলিলে শ্রম লাঘব হয়, সময় বাঁচে, শারীরিক কষ্টও হয় না।

এ যুগের মেয়েরা শুধু রান্নাঘরে আবদ্ধ নয়—ছেলেদের মত তাহারা স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করে, কেহ বা অর্থোপার্জনের জন্য বাহিরে গমন করে। এইজন্য বৃথা সময় অপচয় করিলে তাহার

অনেক কাজই অবহেলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে, তাহারাও যদি হাতে খানিকটা সময় পায়, সেই সময় পুস্তক পাঠে বা সূচী-শিল্পে কিংবা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কাজে লাগাইতে পারে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশ ও আমেরিকা অনেক উন্নত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত উপায়ের সাহায্যে শুধু সময় বাঁচানো নয়, আর্থিক বিষয়েও অনেক উপকার লাভ করা যায়।

লোহার ইস্ত্রির পরিবর্তে বৈহ্যুতিক ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে অনেক সময় বাঁচানো সম্ভবপর। এই ইস্ত্রির সাহায্যে পশমী, রেশমী যে কোন রকমের কাপড় ইস্ত্রি করা যাইতে পারে। কাপড় ধৌত করিবার জন্য ভ্যাকুয়াম কোন্ অনেক সুবিধাজনক। ইহাতে সময় অনেক কম লাগে। বৈহ্যুতিক ঘড়ির দম দেওয়ার দরকার হয় না। সেইজন্য ভিন্ন ভাবে চাবি দেওয়ার জন্য পরিশ্রমের ও সময়ের দরকার হয় না। বৈহ্যুতিক চুল্লী (Electric heater), বৈহ্যুতিক সেলাই কল সময় বাঁচানোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অভ্যাসের দ্বারা সময়ের অপচয় নিবারণ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। স্কুলগৃহ কয়েকবার নিজ হাতে পরিষ্কার করার ফলে অনেক অভিজ্ঞতা হয়। সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরবর্তী কালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুনিপুণভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা যায়। পাশ্চাত্য দেশ ও আমেরিকার লোকেরা সময়ের বৃথা অপচয় ঘটিতে দেয় না। শিল্পে ও গৃহকর্মে কি ভাবে অল্প শক্তির সাহায্যে বেশী ফল লাভ করা যায় এ বিষয়ে তাঁহারা বহু গবেষণা করিয়াছেন ও জীবনযাত্রাকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ শিল্প-গবেষণা-পদ্ধতি হইতেই ইহা শুরু হইয়াছে, তারপর গৃহকর্মের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শয্যা রচনা, গৃহ পরিষ্কার রাখা, কাপড় কাচা, খাদ্য প্রস্তুত করা, বাসনকোসন ধোওয়া—এই সব কাজ কি ভাবে অল্প সময় ও শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় ইহার জন্য দিন দিন নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। কাজকে সহজতর করিবার জন্য মেণ্ডেল (Mendel) ইহাকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্রতম বিষয় হইতে ধীরে ধীরে অন্যান্য কাজে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মেণ্ডেলের মতে এই ভাবে কর্মপন্থাকে শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে ঃ (১) শরীরের অবস্থান ও গতি, (২) যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও কাজের ব্যবস্থা, (৩) উৎপাদনের ক্রমোন্নতি, (৪) উৎপন্ন দ্রব্য ও (৫) কাঁচা মালের পরিবর্তন।

শরীরের অবস্থান ও গতি ঃ

বসা অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় শারীরিক কৌশল গৃহস্থালীর কাজকর্মে সহায়তা করে। ইহা অল্প শক্তি ব্যয়ে কাজ করিতে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতেও সহায়তা করে। শারীরিক কৌশল লাভ করিতে হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে—(১) শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে সরল রেখায় রাখিতে হইবে। (২) শরীর এবং যে সব দ্রব্য লইয়া কাজ করিতে হয়, সেগুলির যত্ন লইতে হইবে। (৩) শক্তির অপব্যয় না করিয়া যাহাতে মাংসপেশীর সুযোগ আমরা গ্রহণ করিতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (৪) চলমান পদার্থের বলের (Movements) সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। (৫) শারীরিক ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে।

শরীরের বিভিন্ন অংশকে এক সরল রেখায় রাখার গুরুত্ব ঃ— এই ভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ অবস্থান করিলে শরীরের বিভিন্ন ওজনগুলি ঠিক থাকে, প্রত্যেকটিই অবলম্বনের উপর কেন্দ্রীভূত

থাকে। বসা, দাঁড়ান বা কাজ করিবার সময় শরীরের অবস্থান ঠিক থাকিলে মাংসপেশীর সাহায্যেই সব কাজ করা যায়। আর শরীরের ভঙ্গি সঠিক না হইলে যে মাংসপেশী সেই কাজের জন্য
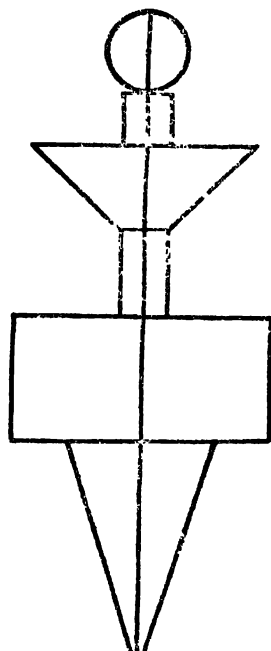
শরীরের বিভিন্ন অংশের সুষম বিন্যাস

গঠিত হয় নাই তাহার সাহায্যেই কাজ করিতে হইবে ও তাহার ফলে সেই মাংসপেশীর উপর অনাবশ্যক জোর পড়িবে। ইহা উপরের চিত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

শরীরের অবস্থান ঠিক না থাকিলে দেহের কি রকম পরিবর্তন হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত উদাহরণ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আমেরিকানরা ইস্ত্রি করিবার জন্য সাধারণতঃ ৩১ হইতে ৩২ ইঞ্চি উঁচু বোর্ড ব্যবহার করেন। একটি মেয়ে তাহার পরিবর্তে

৩৪—৩৫ ইঞ্চি উঁচু বোর্ড ব্যবহার করিয়াছিলেন; ইহার ফলে

এই ভাবে করিবে না   এই ভাবে করিবে

তাঁহার শারীরিক কি কি পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

শারীরিক পরিবর্তন	৩১ ইঞ্চি বোর্ডের পরিবর্তে ৩৪-৩৫ ইঞ্চি বোর্ড ব্যবহারের ফলে শারীরিক উপাদানের বৃদ্ধি-মাত্রা
১। ইস্ত্রি করিবার বোর্ডের উপর যে শক্তি নিয়োগ করা হয়	২৪—৪৮% বেশী
২। প্রয়োজনীয় ক্যালোরী (Heat energy)	১৪—৩২% বেশী
৩। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া	২৮—৩০% বেশী
৪। ফুস্‌ফুস সম্বন্ধীয় (Pulmonary) বায়ুপ্রবাহ	১০—৫১% বেশী
৫। রক্তের চাপ	২—২১% বেশী
৬। ক্লান্তিজনিত অভিযোগ	অনেক বেশী
৭। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেদনা	২—১১টি ক্ষেত্রে হইয়া থাকে।

১। ইস্ত্রি করিবার ভাল চেয়ারের একটা বসিবার জায়গা ও পিঠ থাকিবে, যেন স্ক্রুর সাহায্যে ইহাকে উঠানো নামানো যাইতে পারে। যেখানে কাজের লোক সবচেয়ে নিজেকে বেশী আরামদায়ক বোধ করে তাহাই সব চেয়ে ভাল বসিবার স্থান।

২। কাজ করিবার জিনিস নাগালের ভিতর থাকিলে কাজ-কর্মের সুবিধা হয়।

মাংসপেশীর সদ্ব্যবহার—কোন ভারী কাজ করিতে হইলে সবচেয়ে শক্তিশালী মাংসপেশীরই প্রয়োগ করা উচিত। কোন বোঝা উত্তোলন করিবার সময় ধীরে ধীরে মাংসপেশী সংকোচন ও তালে তালে মাংসপেশীর উঠানো নামানো অভ্যাস করিতে হইবে। কাজ করিবার সময় ছোট মাংসপেশীগুলি সহজে ক্লান্তি অনুভব করে। বড় মাংসপেশীগুলি বড় কাজ করিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। পায়ের মাংসপেশীগুলি পিঠের মাংসপেশী অপেক্ষা শক্ত বলিয়া এইগুলি ভার উত্তোলনে প্রয়োগ করা দরকার।
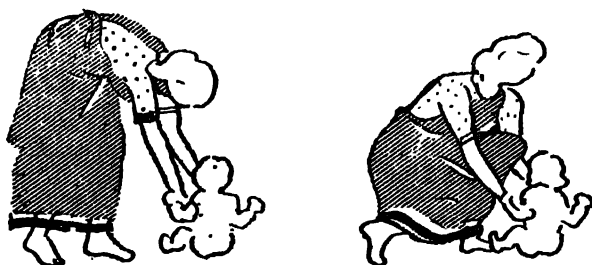
ভার তোলার কাজে পায়ের মাংসপেশীর ব্যবহার শ্রেয়

গৃহস্থালীর কাজে কোন জিনিস কাটিবার জন্য হাতের অথবা কব্জির মাংসপেশী অপেক্ষা বাহুর মাংসপেশী ব্যবহার করা উচিত। বিস্তৃত অবস্থায় মাংসপেশী বেশী জোর প্রয়োগ করে, সংকুচিত অবস্থায় জোর অনেক কম হইয়া থাকে।

ছন্দ (Rhythm)—ঠিক একরকম ভাবে মাংসপেশীর পুনঃ পুনঃ আন্দোলনকে ছন্দ বলা হয়। নাচ, গান এবং শিল্পকলার অন্যান্য বিষয়ে ছন্দোময় স্পন্দন বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। গৃহস্থালীর ব্যাপারে থালা-বাটী ধোয়ার কাজে বিশেষ করিয়া থালা-বাটী যখন একই আকৃতির হয় তখন বিশেষ ছন্দ অনুভূত হয়।

টেবিল, জানালা প্রভৃতি পালিশ করা, ঝাঁট দেওয়া, ইস্ত্রি করা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ছন্দ অনুভব করা যায়। তালে তালে কাজ করিলে অল্প সময়ে বেশী কাজ করা যায়।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিচার—কোন বোঝা তুলিতে, বহন করিতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিচার করা দরকার। সব সময় নিজের খুব কাছে বোঝা রাখা বাঞ্ছনীয়। পূর্বের চিত্রে ইহা ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, শিশুটি মায়ের শরীরের কত কাছে। এইভাবে শিশুকে তোলা অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত।

চলমান পদার্থের বলের সুযোগ গ্রহণ (Taking advantage of the momentum)—চলমান পদার্থের বলের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে বেগের পরিবর্তন করিতে বা থামিতে হয় না। সামনের দিকে ঝুঁকিয়া কাজ করিলে শারীরিক আন্দোলন জনিত অবসাদ কম হয়। এই রকম আন্দোলন একবার শেষ করিয়া পুনরায় যেখান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছিল সেইখান হইতে শুরু করা ভাল। বিছানার চাদরগুলি এইভাবে হঠাৎ না থামিয়া ইস্ত্রি করা হয়।

যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও কাজের ব্যবস্থা:

শরীর ও তাহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে কি ভাবে কাজ করিতে হয় তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করা সম্বন্ধে বলিব। পাশ্চাত্য

দেশ ও আমেরিকাতে একটি সুসজ্জিত রান্নাগৃহে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার (Vacuum cleaner), টি কার্ট (Tea cart), কিচেন্ গ্যাজেট্ (Kitchen gadgets) প্রভৃতি জিনিসের বন্দোবস্ত থাকে। আমাদের দেশে ভ্যাকুয়াম্ ক্লীনারের পরিবর্তে ঝাড়ু এবং পটেটো পীলারের পরিবর্তে বঁটি-দা ব্যবহার করা হয়। ইহা ছাড়া আলো, হাওয়া প্রভৃতিরও বহু সুবন্দোবস্ত সেখানে থাকে।

যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করায় শুধু শরীর ও হাতের সাহায্যে কাজ করা অপেক্ষা বেশী ফল পাওয়া যায়। তবে যন্ত্রপাতিতে অসুবিধা এই যে, তাহাতে খরচ অনেক বেশী হয়। আধুনিক যুগের শিল্পী ও উৎপাদনকারীরা এইসব সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। হিল্ড্ গ্রেড নীল্যাণ্ড (Hilde Grade Kneeland) নামক একজন বিখ্যাত আমেরিকান বলিয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ গৃহকর্ত্রীকে এইসব আধুনিক যন্ত্রপাতির পদ্ধতির সহিত পরিচিত করার চেয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী ও উৎপাদনকারীকে এইসব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা অনেক সুবিধাজনক। আধুনিক যুগের উৎপাদনকারীরা এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন।

এইসব কাজ সহজ করিবার আর একটি দিক্ হইল অনুকূল ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইহার ভিতর আবহাওয়া, শব্দ, আলো প্রভৃতি ধরা যাইতে পারে।

আবহাওয়া—বায়ুর উপাদানগুলি সব অবস্থায় প্রায় এক রকমই থাকে। আর্দ্রতা ও তাপের তারতম্য হেতুই বায়ুর অবস্থার পরিবর্তন হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুতে কর্মশক্তি অনেক কমিয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে এই উষ্ণতা ও আর্দ্রতার দরুন জাতির কর্মক্ষমতা অনেক কম।

শব্দ—দেখা গিয়াছে একটি ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর অবাঞ্ছিত

গোলমালের প্রভাব তাহার রক্তচাপ, মাংসপেশীর প্রসারণ জাগ্রত অবস্থার রক্তচাপ ও মাংসপেশীর প্রসারণের মত বাড়াইয়া দেয়। কোন জার্মান ফ্যাক্টরীতে তাপনিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কতকগুলি শ্রমিককে বয়লার-সংশ্লিষ্ট কক্ষ হইতে অপর একটি নির্জন শান্ত কক্ষে নিয়া যাওয়ার ফলে তাহাদের শারীরিক কষ্টের অনেক উপশম হয়। গৃহকর্ত্রীদের কোলাহল নিবারণ করিবার সুযোগ নাই, তবে তাঁহারা দিবসের নিরিবিলি সময়ে ইচ্ছামত কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে পারেন।

আমেরিকার অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত প্রবর্তন করার ফলে দেখা গিয়াছে যে, মজুরেরা অনেক বেশী কাজ করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, সঙ্গীত প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের একঘেয়েমি দূর হয়। আনন্দের অভাবের দরুন অনেক সময় তাহারা গল্পগুজব, কল্পনার স্বপ্ন ও গানের চর্চায় মশগুল থাকে। গল্পগুজবের ফলে কাজকর্মের ক্ষতি হয়। সমস্ত কাজেই একাগ্রতা দরকার। এইজন্য ইহা কোনরূপেই বরদাস্ত করা যায় না। কল্পনার স্বপ্ন দেখাও অনেকের মতে ক্ষতিকারক।

আলো—প্রচুর আলো থাকিলে কাজ ভাল হয়—উৎপাদনের মাত্রাও অধিক হয়। অন্ধকারে ভালভাবে মনোনিবেশ করা যায় না, উৎপাদন কম হয় এবং কাজও ভালরূপে সম্পন্ন করা যায় না।

উৎপাদনের ক্রমোন্নতি (Gradual Improvement in Production):

একই জিনিস অল্প চেষ্টায় ও অল্প সময়ে তৈয়ার করা যাইতে পারে, যদি কোন জিনিস তৈয়ারের পদ্ধতির ভিতর কতগুলি অপসারণ করা হয় বা কয়েকটা একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয় অথবা তাহাদের শ্রম-পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। কাচের থালা বাসনগুলি

ধুইয়া না পুছিয়াই বাতাসে শুকানো যাইতে পারে। কেক তৈয়ার করিবার বিভিন্ন কাজ—যেমন মাখন ঠিক করা, ডিম ফেটানো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না করিয়া একবারে কেক তৈয়ার করা যাইতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী কাজ করিলে শুধুমাত্র সময়ের সুবিধা হয় না, উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বেশ ভাল হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য ও কাঁচামালের পরিবর্তন (Changes in finished product and raw materials) ঃ

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্তন ও কাঁচামালের পরিবর্তনের ভিতর কোন্‌টা বেশী পরিবর্তন ঘটায় সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। ন্যায়তঃ কাঁচামালের পরিবর্তনের ফলে অনেকখানি পরিবর্তন সাধিত হয়। এই উভয়বিধ পরিবর্তনের ফলে খুব অল্প হইতে অনেক বেশী পরিমাণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নূতন উৎপন্ন দ্রব্য ভালও হইতে পারে, খারাপও হইতে পারে; বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, অবাঞ্ছনীয়ও হইতে পারে, তবে সব ক্ষেত্রেই ইহা পার্থক্যের সৃষ্টি করে। এই সব পরিবর্তনের ফলে পূর্বেকার দ্রব্যের প্রচলনের পরিবর্তে, বর্তমান দ্রব্যের প্রচলন সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের মত এই—প্রচলিত অভ্যস্ত পন্থাই সব সময়ে বাঞ্ছনীয়। যদি কেহ এই নীতি অমান্য করিয়া নূতন কিছু করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে তাহার স্বামী, বয়স্ক পুত্র অথবা প্রতিবেশীর কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। গোলাকৃতি বিস্কুটের পরিবর্তে চতুষ্কোণ বিস্কুটের প্রচলন করিলে অনেক মেয়ের মনেই প্রশ্ন উঠিবে। ২৫টি গোলাকৃতি বিস্কুটকে বিস্কুট কাটিবার যন্ত্রের সাহায্যে কাটিতে গেলে ২৫ বার সময় লাগিবে। ঠিক একই সংখ্যক চতুষ্কোণ বিস্কুট কাটিতে লম্বালম্বি ভাবে ৪ বার ও পাশাপাশি ৪ বার মোট আটবার সময় লাগিবে। ইহাতে দেখা যায় যে চতুষ্কোণ বিস্কুট

কাটিতে ১৭ বার সময় লাগে। তবে বর্তমান যুগে মেয়েরা গোল বিস্কুট (Rolled cookies)-এর পরিবর্তে স্লাইজ করা রুটিতেই (Sliced bread) অভ্যস্ত। এই সব পরিবর্তনের জন্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তি থাকা দরকার এবং পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়েও ভাবা দরকার।

কার্য সহজতর করিবার জন্য গবেষণা

পাশ্চাত্য দেশ ও আমেরিকাতে কাজকে সহজতর করিবার উদ্দেশ্য পরীক্ষাগারে নানা প্রকার গবেষণা চলে। তবে পরীক্ষাগারের গবেষণার ফল ও তাহার প্রয়োগ অনেক ব্যয়সাধ্য। একমাত্র শিল্পে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন হইতে পারে। গৃহের পক্ষে তাহা মোটেই সম্ভবপর নয়। এই সব ব্যতীত আরও অনেক সহজ পন্থা আছে, যাহা গৃহের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার (Symbols used)—গবেষণার সবচেয়ে অবশ্যকীয় বিষয় শব্দকোষের সঙ্গে সঠিক পরিচয় লাভ করা। যদি বিভিন্ন শ্রমিক শব্দগুলির একই অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়। গতি জিনিসটা খুবই জটিল পদার্থ। ইহা ভালভাবে বুঝিতে হইলে গতিকে সরলভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। গিলব্রেথস (Gilbreths) এই সব বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইহাদের নাম 'therblig' দিয়া প্রতীকগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। Gilbrethsএর নামের অক্ষরগুলি উল্টাইয়া দিলে 'therbligs' হয়। এই পদ "therbligs" বলিতে হাতের আঙ্গুল, বাহু, হাত বা সমগ্র শরীরকে বুঝায়, কখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশকে বুঝায় না। Grasp বলিতে 'G' অথবা horse shoe (ঘোড়ার খুর) বুঝায়। অনেকগুলি প্রতীক

চিহ্ন দেখিলেই বুঝা যায়, আর কতগুলির ব্যাখ্য দরকার। নিম্নে প্রতীক ও তাহার সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হইল।

প্রতীকের নাম (Name of the symbol)	সংক্ষিপ্ত করণ	প্রতীক (Symbol)
Search (খোঁজা)	Sh	[illegible]
Find (অনুসন্ধান করা)	F	[illegible]
Select (নির্বাচন করা)	St	—>
Grasp (চাপিয়া ধরা)	G	∩
Transport loaded (বোঝাই করা)	TL	[illegible]
Position (অবস্থান)	P	9
Assemble (জড় করা)	A	#
Use (ব্যবহার করা)	U	U
Disassemble (ভাঙ্গিয়া দেওয়া)	DA	[illegible]
Inspect (পরিদর্শন করা)	I	0
Pre position (পূর্বাবস্থা)	PP	8
Release load (মাল খালাস)	RL	[illegible]
Transport Empty (যানবাহন খালি করা)	TE	◡
Rest for overcoming fatigue (পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি দুর করিবার জন্য বিশ্রাম)	R	[illegible]
Unavoidable delay (অপরিহার্য বিলম্ব)	UD	[illegible]
Avoidable delay (পরিহার্য বিলম্ব)	AD	[illegible]
Plan (প্ল্যান করা)	Pn	[illegible]
Hold (ধরা)	H	[illegible]

গতি ও সময়ের মান নির্ধারণ—আধুনিক যুগে পরীক্ষাগার, পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে গতি ও সময়ের মান নির্ধারণ করিতে বহু গবেষণা চলিতেছে। ইহার ভিতর রেখাচিত্র (Graphic analysis), স্টপ ওয়াচ ব্যবস্থা (Stop watch technique), মাইক্রোমোশন ফিল্ম এনালিসিস (Micro-motion film analysis) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি বিশেষ কার্যকরী মাইক্রো-ক্রোনোমিটার (Micro-chronometer) নামে একটি অতি দ্রুত সঞ্চালিত ঘড়ির সাহায্যে $\frac{১}{২০০০}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত নির্ধারিত করা যায়। তবে পারিবারিক ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুইটি অচল।

পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে সময় ও গতির মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। ফ্লো প্রসেস চার্ট (Flow process chart), অপারেশন চার্ট (Operation chart), মাল্টিম্যান চার্ট (Multi-man chart) প্রভৃতি ব্যবস্থার সাহায্যে সময় ও গতি নির্ধারিত হইতে পারে। ফ্লো প্রসেস চার্টের সাহায্যে শ্রমিকের গতি ও সময় ধাপে ধাপে নির্ধারিত করা যায়। এইজন্য শ্রমিকের সাধারণ গতিবিধি হইতে ইহার পার্থক্য অনেক বেশী। এই চার্টের সৃষ্টিকর্তা শিল্প হইতে কিছু প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

প্রতীক	প্রতীকের নাম	প্রতীক	প্রতীকের নাম
o	একস্থান হইতে অন্য স্থানে গতি (Movement from place to place)	□	চক্ষুর সাহায্যে পরীক্ষা (Inspection with eyes)
○	কাজ করা (Operation)	◁	দেরী করা (Delay)

ছোট বৃত্তের সাহায্যে বোঝান হয় যে, শ্রমিক কোথাও যাইতেছে। বৃহৎ বৃত্তের সাহায্যে বোঝান হয় যে, শ্রমিক এখনও দাঁড়াইয়া আছে ও হাতের সাহায্যে কাজ করিতেছে। বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে বোঝান হয় যে, শ্রমিক তাহার কাজের ফলাফল বিচার করিতেছে। ত্রিভুজের সাহায্যে বোঝান হয় যে, কাজ মোটেই অগ্রসর হইতেছে না, অনর্থক দেরী হইতেছে।

একটি টেবিল সাজানোর ব্যাপারে যখন কর্মকর্তা হাঁটে তখনই ছোট বৃত্ত বুঝায়। যখন শুধু তাহার হাতগুলি কাজ করে তখন বড় বৃত্ত বুঝায়। যখন সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার কার্যের ফলাফল বিচার করে তখন বর্গক্ষেত্র নির্দেশ করে। চক্ষুর গতি বা কেন্দ্রীভূত অবস্থা হইতে বোঝা যাইবে যে, তাহার অনর্থক দেরী হইতেছে কিনা।

এই প্রতীকগুলি ব্যবহারের সুবিধা এই যে, কোন ব্যক্তি বর্ণনার সাহায্যে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিষয় সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গণনা করিতে পারে। ফ্লো প্রসেস (Flow process) চার্ট সম্পন্ন করিতে দুইজন লোকের দরকার। একজন কাজ করিবে আর একজন, পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার রেকর্ড করিবে। গৃহকার্যের ব্যাপারে কর্মকর্তাকে সব সময় অনুসরণ করিতে হইবে এবং এই ফ্লো চার্টকে (Flow chart) চার্টম্যান (Chartman)-এর বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এই প্রতীক গণনার সাহায্যে একদৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে কোথায় পদ্ধতির উন্নতি করা যাইতে পারে।

পরপৃষ্ঠায় ফ্লো চার্টের বিবরণ দেওয়া হইল। ইহাতে চারিবার স্থান পরিবর্তন এবং দুই বার দেরী লইয়া ১২টা ধাপ আছে। ইহা দেখিয়া বোঝা যাইবে যে, কোন্‌গুলি বাদ দিতে হইবে আর কোন্‌গুলি রাখিতে হইবে।

ফ্লো প্রসেস চার্ট ঃ টেবিল সাজানো।

ধাপ	একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন	হাতের কাজ	দেরী	পরিদর্শন	বর্ণনা
১	○	○	▽	□	পরিবেষণ টেবিলের দিকে যায়।
২	○	●	▽	□	চায়ের টেবিলের কাছে চায়ের বাসন নেয়।
৩	○	○	▽	□	ইতস্ততঃ করে।
৪	○	●	▽	□	খাবার টেবিলের ড্রয়ার হইতে প্যাড নেয়।
৫	○	○	▽	□	খাবার টেবিলের কাছে যায়।
৬	○	●	▽	□	প্যাড রাখে।
৭	○	○	▽	□	প্যাডগুলি রাখা ঠিক হইল কিনা দেখে।
৮	○	●	▽	□	প্যাডগুলি সোজা করে।
৯	○	○	▽	□	পরিবেষণের পাত্রের জন্য টেবিলের কাছে যায়।
১০	○	●	▽	□	ডানহাতে পরিবেষণ-পাত্র নেয়।
১১	○	○	▽	□	ইতস্ততঃ করে।
১২	○	○	▽	□	খাবার টেবিলে ফিরিয়া আসে।
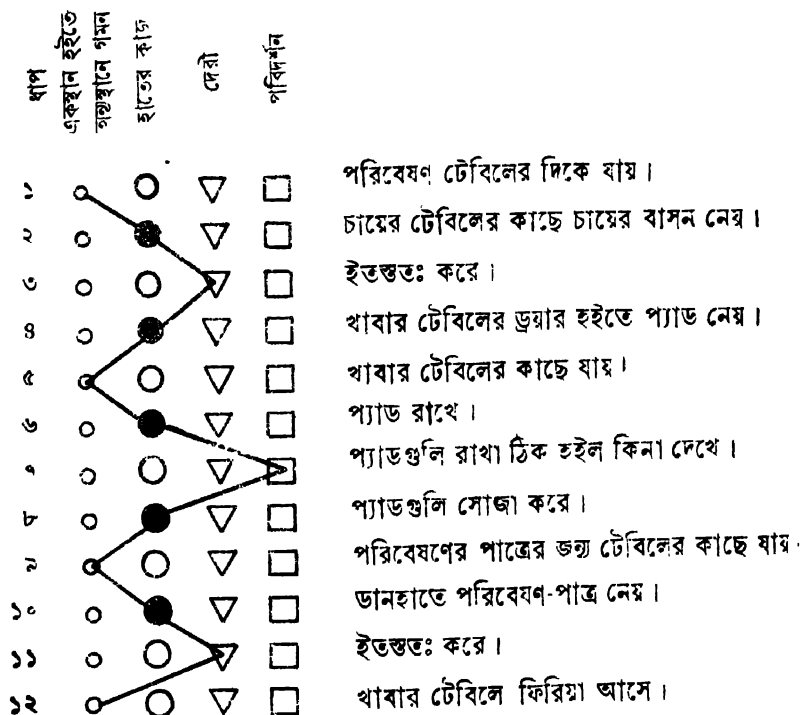
যে সমস্ত প্রতীক ভালভাবে দেখিতে হইবে সেগুলি চিহ্নিত করা হইল। এই ফ্লো প্রসেস চার্টের সারাংশ লইলে এই দাঁড়ায় ঃ

০	৪ বার স্থান পরিবর্তন
◯	৫ বার হাতের কাজ
□	১ বার পরিদর্শন
▽	২ বার দেরী
	১২ ধাপ

আমেরিকাতে এই ভাবে অপারেশন চার্ট, মাল্‌টিম্যান (Multi-man) চার্ট প্রভৃতির সাহায্যে দৈনন্দিন কাজের অনেক কিছু অল্প সময়ে সহজভাবে করার চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশে এইসব ব্যবস্থার প্রচলন নাই। প্রচলন হইলে কাজ সহজ হইবে ও অনেক সময় বাঁচিয়া যাইবে। এইসব আধুনিক গবেষণামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমেরিকার অধিবাসীরা গৃহস্থালীর নানা ব্যাপারে কত উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শয্যারচনা ঃ—	পুরাতন	আধুনিক
দূরত্ব ভ্রমণ	২৬২ ফুট	২৩ ফুট
সময়	৬ মিঃ ২৮ সেঃ	২ মিঃ ৪২ সেঃ
শুধু হাতের কাজ	২৬	২০
হাঁটার সহিত হাতের কাজ	১২	০
নড়াচড়া	২১	৬

২। ২৫ জন গৃহকর্ত্রীর ঘর ধোওয়ার ব্যাপারে ফিল্‌মের সাহায্যে একটি গড়পড়তা হিসাব খাড়া করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে শতকরা ১০০ ভাগ সময় কম লাগে। পরপৃষ্ঠার ছবির সাহায্যে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

এইভাবে করিবে

পাত্রটি মাটির উপর না রাখিয়া সুবিধামত উঁচু জায়গায় রাখিবে।

সাবান ছাড়া পরিষ্কার করিবার অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিবে।

লম্বা লম্বা টান দিয়া ধুইবে।

বাঁ দিকের কোমরের কাপড়ে শুকনো কাপড় রাখিবে। বাঁ হাতের সাহায্যে পাল্লা মুছিয়া শুকাইবে।

খাদ্য তৈয়ার ব্যাপারে	পুরাতন পদ্ধতি	নূতন পদ্ধতি
পায়ে হাঁটা	১৬৯	৯০
সময়	৪ ঘঃ ৩৭ মিঃ	৪ ঘঃ ৭ মিঃ
থালা ধোওয়ার ব্যাপারে		
চলাফেরা	১,৯৫৪	১০০৮
সময়	২২ মিঃ ৫৮ সেঃ	২৮ মিঃ ৮ সেঃ

এই ভাবে দেখা যায় দৈনন্দিন কাজের প্রায় সর্ববিধ ব্যাপারে তাহারা সময় কম ব্যয় করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যান্ত্রিক ব্যাপারে শিক্ষালাভ করিতে হইলে (১) প্রথমে জানিতে হইবে যে কি ভাবে যন্ত্র চালাইতে হয়। (২) কি উদ্দেশ্যে যন্ত্র চালানো হয় এবং সময় ও আর্থিক দিক দিয়া ইহার সুবিধা কি। (৩) যন্ত্রের সাহায্যে বেশী উৎপাদন করিতে পারা যায় ইহা সকলকে বোঝানো দরকার। যন্ত্র চালানোর ব্যাপারে ৭টি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয় ঃ—

(১) যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা, (২) যন্ত্রের কার্যকরী পরীক্ষা, (৩) উপক্রমণিকা, (৪) অভ্যাস, (৫) পর্যবেক্ষণ, (৬) অনুশীলন, (৭) ভুল সংশোধন।

যান্ত্রিক শিক্ষানবিশীতে সাফল্য লাভ করিতে কেবল 'চিন্তা' ব্যতীত এই সব বিষয়গুলি একান্ত আবশ্যক। যন্ত্র চালানোর ব্যাপারে আর একটা দিক দেখা যায় যে, যাহারা যন্ত্রবিষয়ে অধীত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হয় আর যাহারা বার বার অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশী। যে ক্ষেত্রে অধীত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া কোন ব্যক্তি ৮৫ বার কাজ করে, সে ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি শুধু অভ্যাসের

দ্বারা কাজ করিলে তাহাকে ৪৪০ বার কাজ করিতে হয়। সুতরাং যন্ত্রপাতির কাজ করিতে হইলে পূর্ব হইতেই সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পরে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতকগুলি জিনিসের ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, রেডিও, সেলাইর কল, জল তোলার পাম্প প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাতি, পাখা, রেডিও প্রভৃতি বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা চলে। এইজন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ কি ভাবে কার্যকরী হয় সে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান রাখিতে হইবে। সেলাই-কল, গ্রামোফোন, মেসিন প্রভৃতির অংশ খুলিয়া তাহার ভিতর ভেজলীন, গ্রীজ ও রেড়ির তৈল প্রভৃতি দেওয়া দরকার। এই সব তৈলাক্ত পদার্থ মরিচা পড়াকে নিবারণ করে। মেসিনকে চালু রাখিবার জন্য ও তাহা হইতে যাহাতে কর্কশ আওয়াজ বাহির না হয় এই জন্য মাঝে মাঝে গ্রীজ ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত। অনেক সময় অসাবধানতার দরুন গ্রামোফোনের স্প্রীংটি কাটিয়া যায়। একটু চেষ্টা করিলেই স্প্রীংটি গ্রামোফোনে লাগাইয়া পুনরায় ইহাকে চালু করা যাইতে পারে। সেলাই-কলের কোন্ কোন্ অংশে তৈল দেওয়া দরকার, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক প্রবাহ কি ভাবে নিয়মিত হয় এই সম্বন্ধে জানিতে হইবে। কারণ: আধুনিক যুগে বাতি, পাখা, ইস্ত্রি, রেডিও সব কিছুই বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। বৈদ্যুতিক শক্তি যেখানে উৎপন্ন করা হয় তাহাকে তড়িৎশক্তি-গৃহ (Power House) বলে। তড়িৎশক্তি-গৃহ হইতে একখানি বৈদ্যুতিক তার আমাদের গৃহের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই তারটির নাম জীবন্ত তার (Live wire)। এই তারটি স্পর্শ করিলেই বৈদ্যুতিক শক্ (shock) লাগিবে। জীবন্ত তারটি আমাদের গৃহে আসিয়া সুইচের ভিতর দিয়া বাল্‌বের (Bulb) সহিত

সংযুক্ত হয়। এই বাল্‌ব হইতে আর একখানি তার বরাবর মাটিতে গিয়া মিশিয়াছে। এই তারখানির নাম পৃথিবীস্পর্শী তার।

বাল্‌ব জীবন্ত তার ও পৃথিবীস্পর্শী তারের মধ্যে থাকিয়া দুই তারকে সংযুক্ত করে। সুইচ্ চালু করিলে তড়িৎশক্তি-গৃহ হইতে তড়িৎপ্রবাহ জীবন্ত তারের সাহায্যে বাল্‌বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাল্‌ব ও মাটির সহিত সংযুক্ত তারের মধ্য দিয়া মাটিতে চলিয়া যায়। সুইচ্ চালু থাকিলেই আমাদের বাতি জ্বলে; পাখা, রেডিও, ইস্ত্রি প্রভৃতি কার্যকরী হয়। সুইচ্ বন্ধ হইলেই বিদ্যুৎসরবরাহ ও বিদ্যুতের গতি বন্ধ হইয়া যায়। ইহা কতকগুলি কারণে হইতে পারে, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান—(১) ফিউজড্ (Fused) হইয়া যাওয়া, (২) বাল্‌বের ফিলামেণ্ট (Filaments) তার নষ্ট হইয়া যাওয়া, (৩) জীবন্ত তার বা পৃথিবীস্পর্শী তারের কোন অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়া।

ফিউজ সরু সীসার তার। প্রতি গৃহের প্রবেশপথেই 'জীবন্ত তার'-এর সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে। বিদ্যুৎপ্রবাহের ভোল্ট বাড়িয়া গেলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া হঠাৎ কোনও কারণে তাপ বাড়িলে সীসার তার উত্তপ্ত হইয়া গলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে বাতি নিভিয়া যায়, পাখা ও রেডিও বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই 'ফিউজ হওয়া' বলে এবং ঐ তারটিকেই 'ফিউজ তার' বলা হয়। ফিউজ তার অন্যান্য তারকে পোড়ার হাত হইতে রক্ষা করে। বাল্‌বের ফিলামেণ্টগুলি নষ্ট হওয়ার ফলেও বিদ্যুৎপ্রবাহ নষ্ট হয়। জীবন্ত তার বা পৃথিবীস্পর্শী তারের কোন অংশ কাটিয়া গেলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়।

জলপ্রবাহের সহিত বিদ্যুৎপ্রবাহের তুলনা করা যাইতে পারে। পাহাড়ের উপর সঞ্চিত জলকে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশাইবার প্রয়োজন হইলে স্বাভাবিক ভাবেই হউক বা কৃত্রিম ভাবেই হউক

সমুদ্রের সঙ্গে পাহাড়ের পথের সংযোগ করা দরকার। সেইরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহকে চালু করিতে হইলে মাটির সহিত ইহার সংযোগ করা সর্বাবস্থায় দরকার।

বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইবার কারণ যদি ফিউজ তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে তবে ফিউজটি পাল্টাইয়া লইলেই চলিবে। যদি ইহা বাল্বের তার নষ্ট হইবার ফলে হয়, তবে বাল্বটিকে ফেলিয়া দিয়া অন্য বাল্ব নিতে হইবে। আর জীবন্ত তার বা পৃথিবীস্পর্শী তারের ব্যতিক্রমের দরুন যদি বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি বাড়িয়া যায়—তবে সেই সব তার মেরামত করা দরকার।

প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরের যাবতীয় খুঁটিনাটি মেরামত করিবার জন্য ছোট করাত, হাতুড়ি, পাঞ্চিং মেসিন (Punching Machine), স্ক্রু-ড্রাইভার প্রভৃতি যন্ত্র গৃহে রাখা উচিত। গৃহের ছোটখাট কাজ, যেমন দরজার কব্জা লাগানো, কলের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি খুলিয়া তেল দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে এই সবের প্রয়োজন হয়। তবে কেহই আশা করেন না যে গৃহকর্ত্রীরা প্রত্যেকেই যন্ত্র বিষয়ে পারদর্শিনী হইবেন। প্রয়োজনমত মিস্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে যাহাতে ছোটখাট কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে, অন্ততঃ সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা উচিত। ইহাতে সংসারের আর্থিক দিক্ হইতেও কিছু সুবিধা হয়।

এইরূপে শ্রম লাঘবের ও সময় বাঁচাইবার নানারূপ উপায় আছে। পাশ্চাত্য দেশে শ্রম লাঘব ও সময় বাঁচাইবার জন্য অনেকগুলি যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের মত বিজ্ঞানে অনগ্রসর দেশে এইগুলি এখনও তৈয়ারী হয় না। বিদেশ হইতে যেগুলি আসে সেগুলিও এত দুর্মূল্য যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশে সাধারণ লোকের পক্ষে সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে যেগুলি অপেক্ষাকৃত

সস্তা এবং যাঁহাদের ইহা ক্রয় করিবার মত সামর্থ্য আছে তাঁহারা প্রয়োজনমত যাহাতে ব্যবহার করিতে পারেন সেজন্য কয়েকটি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এই সকল যন্ত্রপাতির সুবিধা এই যে, এইগুলি অনেক দিন কাজ দেয় এবং খুব টেকসই হয়। কাজেই উপযুক্ত ও নিয়মিত কাজ পাইতে হইলে এইগুলি কি কাজে লাগে, কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয় এবং কি ভাবে ইহাদের যত্ন করিতে হয় তাহা জানা দরকার।

ভ্যাকুয়াম ক্লীনার (Vacuum Cleaner) ঃ

আয়তন, আকার, ওজন ও কার্যকারিতায় বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন মূল্যের ভ্যাকুয়াম ক্লীনার পাওয়া যায়। যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে সেখানে পরিষ্কার করিবার জন্য ইহা একটি মূল্যবান ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। ঘরদুয়ার, কার্পেট, চেয়ার, পর্দা, ছবি এমন কি যে কোন টাঙান জিনিস অতি অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে খুব পরিপাটিরূপে পরিষ্কার করিতে ইহা অদ্বিতীয়। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত কার্যকরী যন্ত্র। ইহা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। কাজ করিবার সময় ইহাতে ধূলা উড়ে না। সাধারণতঃ দুই রকমের ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দেখা যায়—(১) বাহিরের দিকে লাগান থলি, (২) ভিতরে আবদ্ধ থলি। যন্ত্রপাতির সামান্য বিভিন্নতা ছাড়া ইহার গঠন ও ব্যবহারের মূল পদ্ধতি একই।

ইহার প্রধান অংশটি (Body) এলুমিনিয়াম এবং ক্রোমিয়ামে তৈয়ারী। যন্ত্রটির বডির চারিদিকে একটি রবারের বাফার (Buffer) বা ফার্নিচার গার্ড (Furniture guard) থাকে।

হাতলটি ধাতুর তৈয়ারী; হাত দিয়া ধরিবার জায়গাটি

রবারের। সুইচ্‌টি হাতলের ঠিক নীচেই থাকে। গতিবেগ (speed) বাড়ানো-কমানোর ব্যবস্থা আছে।
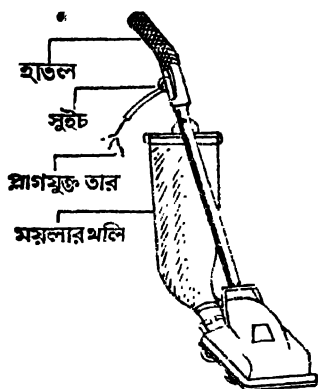
ভ্যাকুয়াম ক্লীনার

ভ্যাকুয়াম ক্লীনারে মোটর (Motor) লাগান আছে। মোটরটি দ্রুতগতি ও মন্থরগতি এই দুই রকমেরই শক্তি সম্পন্ন।

পরিষ্কার করার দ্রব্যের ঘনত্ব অনুযায়ী মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। বায়ুসঞ্চালক ছিদ্র দিয়া বায়ু টানিয়া লয়। মোটরের ঠিক নীচেই একটি পাখা (fan) বসান। এই পাখাটিই ধূলাবালি টানিয়া লইতে মেসিনটিকে সাহায্য করে। মোটরটিতে কখনও হস্তক্ষেপ করিতে নাই কিংবা ইহা অনাবৃত রাখিতে নাই। ব্যাগটি রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা সংশোধিত থ্রিপ্লাই সূতার দ্বারা তৈয়ারী। ইহা এমন ভাবে তৈয়ারী যে পাখাটি চালানমাত্র বায়ু বাহির হয়, কিন্তু ধূলাবালি ইত্যাদি বাহির হইতে পারে না। ঐ বায়ু ধূলাবালি প্রভৃতি টানিয়া ব্যাগে লইয়া আসে।

ইহার মধ্যে দুইটি লম্বা বার (Bar) ও দুইটি ব্রাশ যুক্ত একটি রোলার (Roller) আছে। এই রোলারটিই প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার করিবার যন্ত্র। ইহাকে এজিটেটার (Agitator) বলে। একটি পুরু রবারের বেল্ট দ্বারা ইহা পাখার কপিকলের (Pulley) সহিত দৃঢ়সংলগ্ন।

ব্যাগের বদলে কনভার্টার প্লেটও (Converter plate) ব্যবহার করা যায়। ইহাতে শুষিয়া না নিয়া জোরে বাতাস বহে। ইহা

পিয়ানো, রেডিও ইত্যাদির ধূলা বাহির করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহারের নিয়ম—পরিষ্কার করিবার প্রয়োজনমত যন্ত্রটি ঠিক করিয়া বসাইয়া দেওয়ালের প্লাগের সহিত যুক্ত করিবার পর সুইচ্‌টি চালাইয়া দিতে হইবে। হাতলের সুইচ্‌টির সাহায্যে ইহার গতি নিয়ন্ত্রণ করিবে। যন্ত্রটি বা যন্ত্রের নলটি ধীরে ধীরে সমানভাবে ও নিয়মিতরূপে পরিষ্কার করিবার জায়গাটির উপর চালাইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

যন্ত্রটি পরিচালনা করিবার সময় ব্যাগটি দরজার হাতলে বা চেয়ারের উপরে ঝুলাইয়া রাখা যাইতে পারে। আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি ভাবে অন্ততঃ দুইবার চালাইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দড়ির উপর দিয়া চালান উচিত নয়। ইহা দ্বারা চুলের কাঁটা, পেরেক, কাচের টুকরা কিংবা কোন ছোট, তীক্ষ্ণ বা শক্ত জিনিস তুলিতে নাই। তাহাতে যন্ত্রটির ক্ষতি হইতে পারে। ইহা তুলিয়া রাখিবার সময় খাড়াভাবে, পরিষ্কার করিবার সময় স্বাভাবিক ভাবে, আসবাবপত্রের তলা পরিষ্কার করিবার সময় মুখ নীচু করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি—প্রতিবার কাজ করিবার পরে ব্যাগটি খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। খবরের কাগজের উপর অথবা কাগজের থলির মধ্যে ব্যাগটি খুলিয়া ঝাড়িতে হইবে। ব্যাগের ভিতর দিকটাও উল্টাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। ঘূর্ণ্যমান ব্যাগ বা মোটরে যাহাতে সূতা, চুল বা অন্য কিছু আটকাইয়া কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে সেদিকে সতর্ক হইতে হইবে। তিন সপ্তাহ অন্তর একবার যন্ত্রটিতে মেসিন তৈল দিয়া রাখিতে হইবে।

লম্বা-হাতলযুক্ত বুরুশ (Broom) ঃ

ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিতে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের মত জিনিস আর নাই; কিন্তু যাঁহারা ইহা ক্রয়ে অসমর্থ তাঁহারা সাধারণ ঝাঁটার পরিবর্তে লম্বা-হাতলযুক্ত বুরুশ (Broom) ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে নীচু হইয়া কাজ করিতে হয় না বলিয়া পরিশ্রম কম হয়। দাঁড়াইয়া চালান যায় বলিয়া তাড়াতাড়ি অনেক দূরে চলে; ফলে সময় কম লাগে।

রান্নাঘর ও ঘরের বাহিরের অংশ পরিষ্কার করার জন্য আলাদা আলাদা বুরুশ ব্যবহার করিতে হইবে। বুরুশের কুঁচিগুলি যাহাতে চ্যাপ্টা হইয়া না যায় সেদিকে খেয়াল রাখিবে। পরিষ্কার করিবার জিনিস হিসাবে বুরুশও আলাদা হওয়া উচিত। ব্যবহারের পর সূতার ফুঁপি, সূতা কিংবা সূতার আঁশ বা অন্য কিছু থাকিলে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বুরুশগুলি সাবানজলে ধুইয়া ঝাড়িয়া শুকাইবার জন্য ঝুলাইয়া দিবে। শুকাইবার সময় কয়েকবার নাড়িয়া জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

কার্পেট সুইপার (Carpet Sweeper) ঃ

কার্পেট, সতরঞ্চি, রাগ অর্থাৎ ভারী জিনিস পরিষ্কার করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ভ্যাকুয়াম ক্লীনার না থাকিলে পুরু জিনিস পরিষ্কার করার জন্য ইহা ব্যবহারে পরিশ্রম বাঁচে, সময়ও কম লাগে। ইহাতে একটি পালিস-করা কাঠের বাক্স চারিটি চাকার উপরে লাগান থাকে বলিয়া ইহাকে বক্স-সুইপারও বলা হয়। তলার দিকে দুইটি ডাস্টপ্যানের (Dust-pans) মধ্যে একটি ঘূর্ণ্যমান বুরুশ আছে। সমস্তটাই একটি লম্বা মসৃণ কাঠের হাতলের সাহায্যে চালান যায়। বাক্সটিতে একটি পুরু শক্ত সূতার বিনুনির কুশন (কোণায় রবারযুক্ত)

আছে যাহাতে পরিষ্কার করিবার সময় কোন আসবাবপত্রে লাগিয়া গেলে আসবাবপত্রের ক্ষতি না হয়। চাকাগুলিতে রবারের টায়ার থাকে। কার্পেটের উপরে সামনে-পিছনে (Backwards and forwards) চালাইলে ঘূর্ণ্যমান ডাস্টপ্যানে ধূলা ফেলিয়া দেয়। ধূলা বাহির করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলেই হয়।

সুইপারটি মাঝারি ওজন ও মাঝারি আকারের হওয়া প্রয়োজন। খুব ছোট বা খুব হাল্কা সুইপার অকেজো এবং বেশী ভারী হইলে ব্যবহারে কষ্ট হয়। বুরুশের কুঁচিগুলি পর্যাপ্ত, ভাল ও মাঝারি লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে হাতলটি খুলিয়া কুশনটি সরাইয়া ঘূর্ণ্যমান বুরুশটি গরম সাবানজলে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। নেট কাপড় সাবানজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ডাস্টপ্যান ও বাক্সের ভিতরটি মুছিয়া নেওয়া প্রয়োজন। ভিতরটি যেন বেশী না ভিজে। কাঠের বাক্স ও হাতলটি ধূলা ঝাড়িয়া ধুইয়া মাঝে মাঝে পালিস করিতে হইবে। মাঝে মাঝে রবারটি প্যারাফিনে পরিষ্কার করিলে ভাল। কাপড়ের সাহায্যে বিয়ুনিগুলি ঘষিয়া দিলে পরিষ্কার হইবে প্রয়োজন হইলে চাকায় তেল দিতে হইবে। কয়বার এবং কখন এই যন্ত্রটি পরিষ্কার করিতে হইবে গৃহিণী নিজের বিচার-বিবেচনার দ্বারাই তাহা ঠিক করিবেন।

স্টীলউল ও স্টীলউলপ্যাড

বাসনের উপরে দাগ পড়িলে বা পুড়িয়া দাগ হইলে তুলিতে খুবই কষ্ট হয়। আমাদের দেশে সাধারণভাবে তেঁতুল, খোল ইত্যাদির সাহায্যে ছাই দিয়া বা মাটি দিয়া বাসন পরিষ্কার করা হয়। এই ভাবে পোড়ার দাগ বা যে কোন দাগ তুলিতে খুবই কষ্ট হয়, সময়ও লাগে। কিন্তু স্টীলউলের প্যাড যে কোন

দাগ তুলিবার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। স্টীলউল ভিজাইয়া ব্যবহার করিতে হয়, কারণ শুক্‌না স্টীলউল ভাঙ্গিয়া বাতাসে উড়িয়া যাইবে। চোখে বা গায়ে স্টীলউল যেন না পড়ে সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

স্টীলউলের প্যাডটি কয়েক টুকরা করিয়া ব্যবহার করিলে মরিচা-পড়া প্যাড ব্যবহার করিতে হইবে না। প্যাডটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ভাগ করিলেই ভাল হইবে। একটা টুকরায় যদি ভাল কাজ হয় তবে গোটা প্যাডটির অপচয় করিবার প্রয়োজন নাই।

ডিম ফেটাইবার যন্ত্র (Egg Beater) ঃ

ইলেক্‌ট্রিক এগ্‌ বীটারের অপেক্ষা হাতে চালান এগ্‌ বীটারে ডিম ফেটাইতে বেশী সুবিধা। কারণ ইলেক্‌ট্রিক এগ্‌ বীটারটি চালু করিতে যে সময় লাগে হাতে চালাইবার যন্ত্রটির সাহায্যে ততক্ষণে ডিম ফেটান হইয়া যায়।
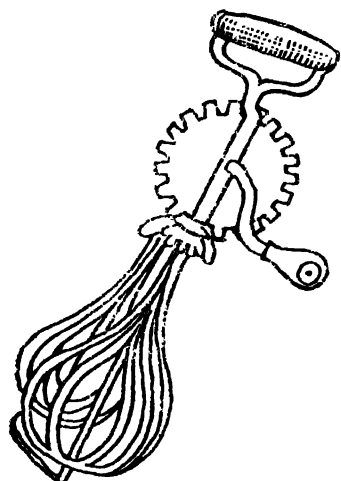
ডিম ফেটাইবার যন্ত্র

এইগুলি ব্যবহারে সুবিধা এই যে, ইহাতে শব্দ প্রায় হয় না। কাজ হইয়া গেলে ধুইয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে যেন চাকায় মরিচা না পড়ে। মাঝে মাঝে ফ্রেমের গর্তে এক এক ফোঁটা তেল দিলে এগ্‌ বীটারটি ভাল থাকে।

ভেজিটেবল পীলার (Vegetable Peeler) ঃ

ফল ও তরকারীর খোসা ছাড়াইতে এই যন্ত্র খুব সুবিধাজনক। কারণ ইহা দ্বারা এত পাত্‌লা ভাবে খোসা ছাড়াইতে পারা যায় যে, খোসার নীচে যে খাদ্য-উপাদান থাকে তাহার অপচয় হয় না। ইহার সাহায্যে ঢেউ-খেলান, কোঁকড়ান অর্থাৎ যে কোন ডিজাইনে ফল বা তরিতরকারী কাটা যায়। আবার এই যন্ত্রটির সাহায্যে বাদামের তৈয়ারী খাবার, কেক ইত্যাদি সরু সরু ফালি করিয়া কাটা যায়। কাজ করিবার পর ইহা ধুইয়া ভাল করিয়া মুছিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে, নতুবা মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

টোস্টার (Toaster) ঃ

আধুনিক টোস্টার একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। কারণ আজকাল আমাদের সকালবেলার জলখাবারে প্রায় বেশীর ভাগ লোকই টোস্ট করিয়া পাঁউরুটি ব্যবহার করেন। তাহা ছাড়া বিকালবেলার জলখাবার বা শরীর অসুস্থ হইলেও রুটি টোস্ট করিয়া প্রায়ই খাওয়া হয়। কাজেই টোস্টারটি বেশ কাজের যন্ত্র। ইহা খুব মজবুত এবং দামও খুব বেশী নয় বলিয়া অনেকের পক্ষেই সংগ্রহ করা সহজ। ইহাতে রুটি খুব তাড়াতাড়ি পছন্দমত গরম, মচ্‌মচে ও বাদামী রঙ হয়—যাহা মাখন বা জেলী মাখাইয়া খাইতে বেশ সুস্বাদু। এই টোস্টারে ঠাণ্ডা টোস্ট আবার গরম করিয়া লইলেও পুড়িয়া যায় না। ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রপাতির মধ্যে টোস্টার এই ভাবে আমাদের অনেক ঝামেলার হাত হইতে বাঁচায় এবং সময়ও বাঁচে।
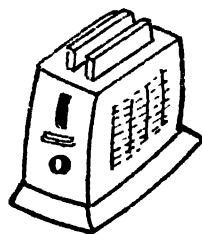
টোস্টার

টোস্টার ব্যবহারের ও যত্নে রাখার নিয়ম—

(১) স্বয়ংচালিত কিংবা বেশী বা কম ওয়াটেজের (wattage) যে কোন রকম টোস্টার (automatic or non-automatic) যখন প্লাগ-পয়েণ্টে লাগান থাকিবে তখন অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা চলিবে না।

(২) ইহা একটি ট্রের উপরে বসাইতে হইবে যাহাতে রুটির টুকরাগুলি পড়িয়া না যায়।

(৩) কতটা পুরু রুটি টোস্টারে চলিবে তাহা আগেই জানিতে হইবে।

(৪) যে পরিমাণ বাদামী রঙ পছন্দ তদনুযায়ী ডায়াল করা প্রয়োজন।

(৫) একটি দণ্ডের সাহায্যে বা স্বয়ংচালিত হইয়া রুটি টোস্টারের ভিতরে নামান হয়। রুটিটি আপনি টোস্ট হইতে থাকিবে এবং 'পটাস্' শব্দ হইলে, ঠিক মত টোস্ট হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৬) ট্রে সরাইয়া রুটির গুঁড়া পরিষ্কার করিতে হইবে, নতুবা ছাতা পড়িবার আশঙ্কা থাকে।

(৭) প্ল্যাস্টিকের ঢাকনা দিয়া টোস্টারটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে যেন ধূলাবালি না পড়িতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে টোস্টারটি যেন গরম থাকিতে ঢাকা না হয়।

(৮) গুঁড়া পরিষ্কার করিয়া নরম কাপড়ের দ্বারা মুছিয়া টোস্টারটি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। যদি ইহাতে পরিষ্কার না হয় তবে সিলভার পালিস বা অন্য পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কফি-মেকার (Coffee-maker) ঃ

আজকাল আমাদের দেশে কফি বেশ প্রিয় পানীয় রূপে অনেকের কাছেই সমাদর লাভ করিয়াছে। ভাল কফি তৈয়ারী করার জন্য কফি-মেকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কফি-মেকার দুই রকমের—(১) ভ্যাকুয়াম কফি-মেকার, (২) কফি-পারকোলেটার।

ভ্যাকুয়াম কফি-মেকার ঃ ভ্যাকুয়াম (Vacuum) কফি-মেকারের দুইটি পাত্র আছে; একটির উপরে আর একটি নলদ্বারা সংযুক্ত।

ভ্যাকুয়াম কফি-মেকারে কফি তৈয়ারীর নিয়ম—

(১) নীচের পাত্রটিতে মাপিয়া জল দিতে হইবে।

(২) উপরের পাত্রটি ছাঁকনি সহ নীচের পাত্রটির উপরে দৃঢ়ভাবে যেন বন্ধ হয়।

(৩) পরিমাণমত কফি উপরের পাত্রটিতে রাখিয়া উত্তাপে বসাইতে হইবে। কাচের কফি-মেকার হইলে আগুনে বসাইবার আগে পাত্রের বাহিরের দিক যেন সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখিতে হইবে।

(৪) উপরের পাত্রে জল প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একবার নাড়িয়া দিতে হইবে।

ভ্যাকুয়াম কফি-মেকার

(৫) নীচের পাত্রে কফি পড়িবামাত্র উপরের পাত্রটি সরাইয়া নিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ পরিবেশন করিলেই কফি সুস্বাদু হইবে।
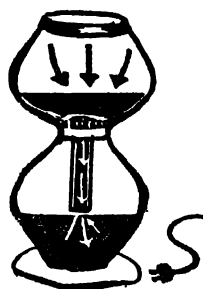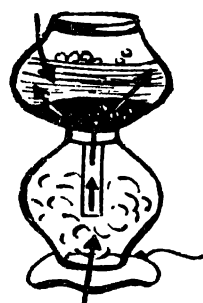
কফি-পারকোলেটার (Coffee Percolator) : ইহা একটি শোধনকারী পাত্র। এই পাত্রটিতে শোধনকারী ব্যবস্থা আছে। ইহার ফলে জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প পাত্রটির শোধনকারী নলের ভিতর দিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া উঠে এবং একই সময়ে জলও উপরের দিকে উঠে। বাষ্প এবং জল নল দিয়া বেগে নির্গত হইয়া ছোট পাত্রে রক্ষিত কফির গুঁড়ার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ে।

জল অল্প অল্প করিয়া পড়ে বলিয়া কফির স্বাদ ও সুগন্ধ বহন করে এবং তখন পাত্রের তলার ছিদ্রপথ দিয়া নীচে পড়ে। এখানে যতক্ষণ না বেশ উত্তপ্ত হয় ততক্ষণ বারবার আরও বাষ্পের চাপ পড়ে। উত্তপ্ত বাষ্পের চাপেই জল উপরে উঠে।

পারকোলেটারে কফি তৈয়ারীর নিয়ম—পরিমাণমত কফি দিয়া উহা পাত্রের ভিতর রাখিবার পর পরিমাণমত জল শোধনকারী পাত্রে (Percolator) লইতে হইবে। এখন পাত্রটি উত্তাপে বসাইয়া দিবে। ক্রমশঃ জল ক্ষরণ বা চুয়ান আরম্ভ হইলে উত্তাপ কমাইতে হইবে। এই ভাবে ৭ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত জল ক্ষরণ হইলে কফির পাত্রটি বাহির করিয়া অবিলম্বে পরিবেশন করিতে হইবে।

প্রতিবার ব্যবহারের পরেই কফি-মেকারটি ধুইয়া মুছিয়া রাখিতে হইবে। যে অংশটিতে ইলেকৃট্রিকের যোগাযোগ আছে তাহাতে যেন জল না লাগে; কারণ জল লাগিলে ইলেকৃট্রিক যোগাযোগ ব্যাহত হইয়া নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

গার্লিক প্রেস (Garlic Press) :

ইহা পেষণ করিয়া পেঁয়াজ ও রসুনের রস বাহির করিবার যন্ত্র। ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে সহজেই রস বাহির হয় বলিয়া

পেঁয়াজ কুঁচি করিবার প্রয়োজন হয় না; অথচ খাদ্য সুস্বাদু হয়। কাজের পরে যন্ত্রটি ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা দরকার।

পটেটো ম্যাশার (Potato Masher):

এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজে আলু চট্‌কান যায়। ধাতু-নির্মিত পটেটো ম্যাশার ব্যবহারের পরে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া রাখিয়া স্টার্চ তুলিয়া ফেলিতে হইবে। আলুর মধ্যে যে স্টার্চ থাকে তাহা ব্যবহারের সময় যন্ত্রে লাগিয়া যায়। যন্ত্রটি সাবানজলের ন্যাকড়া দিয়া ঘষিয়া ধুইয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া রাখিতে হইবে, নতুবা মরিচা ধরিতে পারে। রৌদ্রে বা যে কোন গরম জায়গায় রাখিয়া শুকাইলেই ভাল।

ফ্রুট জুসার বা স্কুইজার (Fruit Juicer or Squeezer)

এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি ও অল্প পরিশ্রমে ফলের রস করা যায়। ফলের মুখটি একটু কাটিয়া লইয়া ঐ কাটা জায়গাটি যন্ত্রটির উপরে রাখিয়া বার বার চাপ দিলেই রস বাহির হইবে। কাজ হইয়া গেলে যন্ত্রটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে।

মীট-মিন্সিং মেসিন (Meat Mincing Machine):

এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে মাংস কাটা যায়। বিশেষতঃ মাংসের কিমা তৈয়ারী করিতে ইহা খুব সাহায্য করে। কাজ হইয়া গেলে যন্ত্রটির অংশগুলি খুলিয়া কাঁটার সাহায্যে

মাংসের কণাগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে প্রয়োজন হইলে চাঁচিয়া ফেলিয়া গরম সাবানজলে বা সোডার ধুইয়া
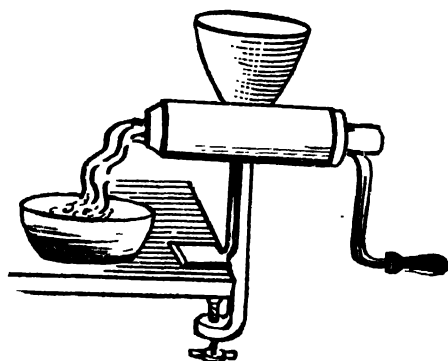
কিমা বানাইবার যন্ত্র

রাখিতে হইবে। পরে বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে লাগাইয়া ড্রয়ার বা কাবার্ডে তুলিয়া রাখিলেই ইহা ভাল থাকিবে।

ইলেক্ট্রিক রোস্টার (Electric Roaster) ঃ

একবারের সম্পূর্ণ আহার তৈয়ারী করিতে ইহা সময় বাঁচায় এবং বিভিন্ন রান্না বারে বারে করিবার পরিশ্রম কমায়। ইহা স্থানান্তরে ব্যবহারে সুবিধা বলিয়া সর্বদাই গরম খাদ্য সঙ্গে রাখা সম্ভব হয়। তা ছাড়া ভাজা ও সেঁকা ইহাতে খুব চমৎকার হয়।

ব্যবহারের নিয়ম—টেম্পারেচার কনট্রোল ও টাইমারের সাহায্যে যে পরিমাণ তাপে যতটুকু সময়ে ভাজিতে বা সেঁকিতে ইচ্ছা হইবে তাহা ঠিক করিয়া লওয়া প্রয়োজন। সুইচ্‌টি লাগাইয়া রোস্টারটি একটু গরম করিতে হয়। রোস্টারটি কাজের জন্য প্রস্তুত কিনা তাহা সাঙ্কেতিক আলোই বলিয়া দিবে। রোস্টারের ভিতরের তাকে ডিশগুলি রাখিয়া তাকসহ বাহির করিয়া আনিতে

হইবে। সব রকমের রান্নার জন্য ইহার ভিতরের পাত্র ব্যবহার করিতে হয়।

রোস্টারটি একটু গরম হইলে খাদ্যদ্রব্যগুলি রোস্টারের ভিতরে দুই পাশে আধ ইঞ্চি জায়গা রাখিয়া সাজাইতে হইবে। দুই পাশে জায়গা না থাকিলে রান্নার সময় খাদ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে উত্তাপ ভাল করিয়া সঞ্চালিত হইতে পারে না।

রোস্টারে ভাজা, ভাপে সিদ্ধ করা বা সিদ্ধ করার ব্যবস্থা আছে। ইহার মধ্যে ঢাক্‌নাসহ ডিম্বাকৃতি (oval shaped) এনামেলের ডিশ থাকে। এই ডিশটির নীচের অংশটি এমন ভাবে তৈয়ারী যাহাতে ইহা উত্তাপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে পারে। সহজে বহন করা যায় এরূপ তাকসহ (shelves) উনুনটি তৈয়ারী। রোস্টারটি গরম হইয়া খাদ্য তৈয়ারী হইতে ৩০।৪০ মিনিট সময় লাগে। ঠাণ্ডা বা ঘনীভূত (frozen) খাদ্য তৈয়ারী হইতে ৪০ মিনিট বা তাহা হইতে বেশী সময়ও লাগিতে পারে।

সেঁকিবার জন্য সর্বাপেক্ষা নীচের তাকে বেকিং প্যানটি (Baking pan) স্থাপন করিতে হয়। ভাপে সিদ্ধ করার জন্য তাকের নীচের গর্তটিতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জল দিয়া মুখটি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

রান্না হইয়া গেলে সুইচ্‌টি খুলিয়া ফেলিয়া রোস্টারটি ঠাণ্ডা হইলে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। তাকটি নামাইয়া ডিশগুলি বাহির করিতে হইবে। ভিতরের ডিশগুলি গরম সাবানজলে ধুইয়া মুছিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে। রোস্টারের ভিতরের গর্তটির চারিপাশ পরিষ্কার ভিজা অথচ নিংড়ান কাপড়ের সাহায্যে মুছিবে। রোস্টারের বাহিরের দিকের চারিপাশও ঐ ভাবেই পরিষ্কার করিবে। ভিতরের গর্তটি ধুইতেও পারা যায়।

কিন্তু রোস্টারটি জলে ডুবাইতে নাই, কারণ তাহাতে ইলেক্‌ট্রিক সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। মাঝে মাঝে ঢাকনা তুলিয়া রোস্টারটি বাতাসে রাখিলে ভাল থাকে।

রিফ্রিজারেটার (Refrigerator) ঃ

রিফ্রিজারেটার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র। ইহা খাদ্য রাখিবার পক্ষে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, বিশেষ উপযোগী। কারণ

রিফ্রিজারেটার

গরমের দিনে খাদ্য সংরক্ষণ করিতে হইলে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার প্রয়োজন। ইহাতে কাঁচা ও রন্ধন-করা খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।

ইহা একটি ভাঁড়ার ঘরের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। যাঁহাদের লোকবল কম এবং সময় কম, তাঁহারা একদিন বাজার করিয়া কয়েক দিন রাখিয়া খাইতে পারেন। আবার এক বেলা রান্না করিয়া দুই বেলা অনায়াসে খাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে শ্রম লাঘব হয়, সময় বাঁচে, তেমনি খরচও বাঁচে।

রিফ্রিজারেটার ক্রয় করিবার সময় পারিবারিক প্রয়োজন ও উৎসব-আনন্দের দিনের কথা ভাবিয়াই ক্রয় করা উচিত। লম্বা বোতল বা তরমুজ জাতীয় ফল রাখিবার মত যথেষ্ট জায়গা যন্ত্রটিতে আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া উহা ক্রয় করিতে হয়। যদিও যন্ত্রটি খুব দামী তবু একবার কিনিতে পারিলে বহু বৎসর কাজ চলিতে পারে।

ব্যবহারের নিয়ম—রিফ্রিজারেটারে রাখিবার পূর্বে গরম খাবার সম্পূর্ণরূপে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিতে হইবে।

খাবার ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা শুকাইয়া যাইতে পারে এবং এক খাবারে অন্য খাবারের গন্ধ হইবার সম্ভাবনা। শাকসব্জী ঢাকিয়া রাখিতে নাই, কারণ তাহাতে বেশী কুঁক্‌ড়াইয়া যায়।

রিফ্রিজারেটারে বেশী জিনিস বোঝাই করিতে নাই, কারণ ইহাতে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া জিনিস নষ্ট হইতে পারে।

রিফ্রিজারেটারে খুব বেশী সময় খাদ্য রাখিতে নাই। এমনভাবে খাবার রাখিতে হইবে যেন ঠাণ্ডা বাতাস চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পুরাপুরিভাবে ঠাণ্ডা লাগে। যেসব খাবার সহজেই নষ্ট হইতে পারে সেগুলি বরফ জমাট বাঁধার প্রকোষ্ঠের খুব কাছে, তারপর যেগুলি খুব সহজেই নষ্ট হয় না সেগুলি ঐ প্রকোষ্ঠের আর একটু দূরে রাখিতে হয়। যেগুলির জন্য বেশী ঠাণ্ডার প্রয়োজন নাই সেগুলি ঐ প্রকোষ্ঠের বেশ দূরে রাখিলেই চলিবে। বরফ

জমাট বাঁধার প্রকোষ্ঠের ঠিক নীচের জায়গাটি সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা, তার পরেই ঠাণ্ডা জায়গা ঐ প্রকোষ্ঠের ঠিক পাশের জায়গাটি।

খাবার রিফ্রিজারেটারে রাখিবার পূর্বে কাগজ-জড়ান প্যাকেট খুলিয়া রাখিতে হয়, কারণ প্যাকেটের জিনিস ঠাণ্ডা হইতে অনেক সময় লাগে। রিফ্রিজারেটারে প্রত্যেকটি জিনিস রাখিবার জায়গা আছে। বোতল, বয়াম ইত্যাদি বোতলের র‍্যাকে (Rack), ডিম না ধুইয়া ডিমের র‍্যাকে, সদ্য-ধোওয়া শাকসব্জী ক্রিস্পারে (Crisper), মাখন, মাংস ইত্যাদি কণ্ডিসনারে (Conditioner) —এই ভাবে প্রত্যেকটি জিনিস বিভিন্ন জায়গায় রাখা প্রয়োজন। মাখন, পনীর ইত্যাদি আর্দ্রতা সহ্য করিতে পারে এরূপ প্যাকেটে রাখিলে ভাল।

রিফ্রিজারেটার কনটেইনারের (Container) আকার অনুযায়ী বা খাদ্যদ্রব্যের রাখিবার স্থান সংকুলানের জন্য রিফ্রিজারেটারের তাকগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বা ভিতরে বাহিরে হেলান দিয়া রাখিয়া জিনিস রাখিবার তাকগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে তাকগুলি ঘুরান যায় সেগুলি উপরে নীচে ঘুরাইবার জন্য তাকের সামনে লাগান বাটনে (Button) চাপ দিলেই ঘড়ির কাঁটার মত নামান উঠান যায়। একবার সম্পূর্ণ ঘুরাইলে উহা সহজেই ঘুরে। বড়, পুরু কোন জিনিস রাখিবার সময় অব্যবহৃত ক্রিস্পারটি সরাইয়া রাখা যাইতে পারে। যেসব খাবার বা জিনিস সর্বদা ব্যবহারে লাগে সেইগুলি সহজেই বাহির করা যায়, দেখা যায় এবং অন্য জিনিসগুলি না সরাইয়াই আনা যায় এইরূপ জায়গায় রাখিতে হইবে। বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ হইতে পারে এইরূপ ভাবে অতিরিক্ত জিনিস রিফ্রিজারেটারে রাখিতে নাই।

আইস কিউব ট্রেতে (Ice cube tray) চারিভাগের তিনভাগ

বিশুদ্ধ টাট্‌কা জল ভরিয়া কিউব ডিভাইডার ট্রেতে রাখিয়া উত্তোলনদণ্ড (levers) চ্যাপ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হইবে। আইস কিউব (ice cube) তাড়াতাড়ি জমাইবার জন্য লোয়ার রিফ্রিজারেটার ব্যবহার করিবে, কিন্তু বরফ জমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে স্থাপন করিবে। উত্তোলনদণ্ডটি উঠাইয়া এবং কিউব ডিভাইডারটি তুলিয়া বরফের খণ্ড বাহির করিতে হইবে।

রিফ্রিজারেটারের যত্ন লইবার নিয়ম—রিফ্রিজারেটারে সর্বদা পরিষ্কার খাদ্যদ্রব্য রাখিবে। যে পাত্রে খাবার ভরিয়া রাখিবে তাহাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে—যেমন দুধের বোতলটি ভাল করিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রিফ্রিজারেটারে ভরিতে হইবে। রিফ্রিজারেটারের দরজাটি বন্ধ রাখিবে। ফ্রিজারের জায়গা ও রিফ্রিজারেটারের জন্য আলাদা দরজা থাকিলে ভাল, কারণ ফ্রিজারের উত্তাপ শূন্য-ডিগ্রী বা খুব কম থাকে। রিফ্রিজারেটারের দরজা আলাদা থাকিলে উহা খুলিবার সময় ফ্রিজারের দিকে কোন চাপ পড়ে না।

রিফ্রিজারেটারের ভিতরটা সপ্তাহে একদিন ঈষদুষ্ণ জলে অল্প বেকিং সোডা মিশাইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। বাহিরটা ভিজা কাপড় বা ছিদ্রবিহীন স্পঞ্জের সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করিতে নাই, কারণ উগ্র সাবান জাতীয় পদার্থ এনামেল নষ্ট করিয়া দেয়। আইস কিউব ট্রে এবং ডিভাইডার ঈষদুষ্ণ সাবানজলে পরিষ্কার করিবে; বেশী উগ্র সাবান বা বেশী গরম জল কখনও ব্যবহার করিবে না। কাঁকর-মিশ্রিত কোন মাজন বা বালু-মিশ্রিত কোন কিছু দ্বারা কখনও ইহা পরিষ্কার করিতে নাই। উহাতে জিনিসটি নষ্ট হইয়া যাইবে।

সপ্তাহে একদিন অথবা যখন হিমকণা ¼" ইঞ্চির চেয়ে বেশী

ঘন হয় তখন একবার হিমকণা বাহির করিয়া দিতে হইবে। মাঝে মাঝে এইরূপ করিলে রিফ্রিজারেটার ভালভাবে কাজ করে। নূতন তৈয়ারী রিফ্রিজারেটারে হিমকণা বাহির করার ব্যবস্থা আছে। কন্ট্রোল সুইচ্ ঘুরাইয়া 'Defrost'-এর উপরে আনিলেই হিমকণা বাহির হইতে থাকে। এই ভাবে যতক্ষণ না হিমকণা গলিয়া যায় ততক্ষণ সুইচ্‌টি 'Defrost'-এর উপরে রাখিতে হইবে। হিমকণা বাহির করার পরে মৃদু সোডা-দ্রবণের সাহায্যে রিফ্রিজারেটারের ভিতরটি ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ভিতরের ট্রেগুলিও সোডার জলে ধুইয়া ফেলিলে গন্ধ নষ্ট হইয়া পরিষ্কার হইবে। বাহিরের দিকে মোম বা গালার কোটিং থাকিলে মাঝে মাঝে শুক্‌না কাপড় দিয়া ঘষিয়া পালিস করিয়া দিতে হইবে, নতুবা ঈষদুষ্ণ মৃদু সাবানজলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। যে কোম্পানীর তৈয়ারী জিনিস তাহাদের নির্দেশমত মাঝে মাঝে তৈল দেওয়া, পরিষ্কার করা এবং মোটরটি খুলিয়া পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে। নরম ব্রাশের সাহায্যে মোটরটির ধূলাবালি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভাবে পরিষ্কার করিলে রিফ্রিজারেটারটি নূতনের মতই থাকিবে। মাঝে মাঝে গ্যাস্কেট বা দরজার উপরের রবার সীলটি (Rubber Seal) বেশ শক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রয়োজনমত উহা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে।

সাধারণভাবে রিফ্রিজারেটারের ব্যবহার ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হইল।

স্যালাড বা যাহা রান্নার প্রয়োজন হয় না এইরূপ খাদ্যদ্রব্যের জন্য রিফ্রিজারেটার ব্যবহার করা ভাল।

সপ্তাহে একদিন বাজার করিয়া ইহাতে রাখিলে সময় ও কাজের পরিশ্রম দুইই কম লাগে। যখন হাতে সময় থাকে তখন খাবার

তৈয়ারী করিয়া রিফ্রিজারেটারে রাখিয়া দেওয়া যায়; পরে প্রয়োজনমত বাহির করিয়া রান্না করিয়া, সেঁকিয়া খাওয়ার উপযোগী করিয়া লওয়ায় শ্রম লাঘব হয় এবং সময়মত সব পাওয়া যায়। আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি, ফলের রস ইত্যাদি খাওয়ার পূর্বেই তৈয়ারী করিয়া রিফ্রিজারেটারে রাখিয়া দিলে প্রয়োজনমত খাওয়ার সুবিধা হয়।

খাবার তৈয়ারী করার জন্য ময়দা ইত্যাদি আগেই মাখিয়া রিফ্রিজারেটারে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেকের শুক্‌না উপকরণগুলি রাত্রিতে মিশাইয়া রিফ্রিজারেটারে রাখিলে পরের দিন সকালবেলা তরল উপকরণগুলি মিশাইয়া খুব তাড়াতাড়ি ও সহজে কেক তৈয়ারী করা যায়। মাংস, ডিম, শাকসব্‌জী ইত্যাদি দুই-চারিদিন রাখিয়া ব্যবহার করা চলে। রান্না-করা তরকারী ঢাক্‌নাযুক্ত পাত্রে রাখা বাঞ্ছনীয়। এইরূপে রিফ্রিজারেটার নানা রকমে আমাদের অনেক কাজে লাগে। ইহা শ্রম লাঘব করে ও সময় বাঁচায় যাহার ফলে অন্যান্য কাজে সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায়।

ইলেক্‌ট্রিক মিক্সার (Electric Mixer) ঃ

ইলেক্‌ট্রিক মিক্সারে কোন জিনিস নাড়িয়া মিশান, চূর্ণ করা, ফেটান, দুইটি জিনিস জোড়া করিয়া মিশান অর্থাৎ ভাঁজ করা, নিংড়ান বা রস বাহির করা প্রভৃতি নানা রকম কাজই হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহারের ফলে প্রতিদিন অনেক সময় বাঁচে এবং ডান হাতের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। হাতের সাহায্যে কোন কিছু মিশাইতে যে সময় লাগে, এই যন্ত্রটির দ্বারা মিশাইতে তাহার অর্ধেক সময়ও লাগে না। তা ছাড়া হাতের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না বলিয়া হাতে ব্যথা হয় না।

ব্যবহারের নিয়ম—যে সমস্ত উপাদান মিশাইতে হইবে সেইগুলি বায়ুর উষ্ণতায় (temperature) রাখিতে হইবে।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে, এই মিশ্রণে যে খাবার তৈয়ারী হইবে তাহা কত দ্রুত তৈয়ারী হওয়া দরকার।

কঠিন জিনিস ভাঙ্গিবার জন্য এবং দুইটি জিনিস একসঙ্গে বসাইবার বা ভাঁজ করিবার জন্য যন্ত্রটি মৃদুগতিতে, আবার ফেটান বা ক্রিম মিশান ইত্যাদির জন্য দ্রুত গতিতে চালান প্রয়োজন।

মিক্সারে যে গতি (speed) নির্দেশ করা আছে তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে, নতুবা যন্ত্রটিতে ভাল কাজ হইবে না।

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি মিশ্রণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ফেটাইবে। বেশী মিশাইলে বা বেশী ফেটাইলে বেকিং পাউডার-মিশ্রিত দ্রবণে (mixture) অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হয় বলিয়া মিশ্রণটি খুব ভারী হয়। মিশ্রণের সময় ও গতি ঠিক রাখিতে পারিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। মিশাইবার সময় বাটীর মধ্যে আঙ্গুল রাখিতে নাই। চামচ, চাঁচিবার বা ছুলিবার যন্ত্রটিও যেন ঘূর্ণায়মান ফলায় (ব্লেড) না লাগে সে বিষয়ে খেয়াল রাখিতে হইবে। রবারের চাঁচাছোলার যন্ত্র ব্যবহার করাই ভাল। মিশ্রিত করিবার সময় রবারের চাঁচাছোলার যন্ত্রের (স্ক্রেপারের) সাহায্যে বাটীটির চারিদিক চাঁচিয়া দিতে হইবে। রবারের ছুরির (spatula) সাহায্যে চাঁচিলেই যন্ত্রটি ভাল থাকে।

ক্রিম বা মাখন মিক্সারের সাহায্যে ভালভাবে ফেটাইতে হইলে মিশ্রণ করিবার বাটী বা পাত্রটি (Mixer bowl) শুক্‌না ও ঠাণ্ডা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ক্রিম বা মাখন একদিন আগের হইলে ভাল হয়। বেশী পরিমাণ ক্রিম বা মাখন ফেটাইতে হইলে মাঝে মাঝে বীটারটি (Beater) তুলিয়া বায়ুপ্রবেশের পথ করিয়া দিতে

হইবে। মিশ্রণ যত ঘন হইতে থাকিবে মিক্সারের গতিও বাড়াইতে হইবে। নিরাপদে ব্যবহারের জন্য মিক্সার-হেডটি সরানো ও বদলানোর নিয়ম জানা এবং বীটারটি বাহির করা ও বদলানোর উপায় জানা দরকার।

যদি বীটারগুলি সমান না হয় তবে যথাস্থানে ঐগুলি বসাইতে জানাও দরকার। ঠিক জায়গায় দৃঢ়ভাবে লাগান না থাকিলে কখনও মিক্সার ব্যবহার করিতে নাই। যন্ত্রটি যে কোম্পানীর তৈয়ারী, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ব্যবহারের নিয়ম-পদ্ধতি সেই কোম্পানীর নিকট হইতে জানিয়া লওয়া উচিত।

মিক্সারটিতে সংলগ্ন বিভিন্ন যন্ত্রের (Mixer attachments) দ্বারা মাংসের কিমা করা, স্যালাডের জন্য তরিতরকারী টুকরা করা বা ছাঁটিয়া ছোট করা, ফলের রস বাহির করা, কফি চূর্ণ করা, মটরশুঁটি ইত্যাদির খোসা ছাড়ান, আইস ক্রিম জমান প্রভৃতি কাজ হইয়া থাকে। নানারূপ দ্রব্য মিশাইবার যন্ত্রও ইহাতে থাকে।

বীটারটি পরিষ্কার করিবার পূর্বে সুইচ্‌টি খুলিয়া লইতে হইবে। বীটারটি একটি পাত্রে ঈষদুষ্ণ জল লইয়া তাহার মধ্যে চালাইয়া চালাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। বাটী বা পাত্রটিও গরম জলে ধুইতে হইবে, তবে খেয়াল রাখিতে হইবে জল যেন খুব গরম না হয়। কারণ বেশী গরম হইলে কাচপাত্র ফাটিয়া যাইতে পারে।

মোটরটি, তার ও মিক্সারের ফ্রেমটি ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া তাহার দ্বারা মুছিয়া দিতে হইবে; কিন্তু কখনও জলে ডুবাইয়া ধুইবে না, তাহাতে ইলেক্‌ট্রিক সংযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে।

মিক্সার যন্ত্রটি একটি ভাল ঢাক্‌নার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে ধূলাবালি না ঢুকিতে পারে। গরম মোটরের চারিধারে তারটি (cord) কখনও রাখিবে না। তারটি পাত্রের

উপরে রাখা যাইতে পারে। মিক্সারটির রবারের পায়া (feet) গরম স্থানে কখনও রাখিতে নাই, কারণ তাপে রবার গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যেখানে যেখানে তৈল দেওয়া দরকার যন্ত্র-প্রস্তুতকারক কোম্পানীর নির্দেশমত সেই সব অংশে তৈল দিবে। মিক্সার বসাইবার স্থানটি সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

সহজে বহন করা যায় এরূপ হাল্‌কা মিক্সারও আছে। উহার সুবিধা এই যে উহা আলমারির ড্রয়ারেও রাখা যায়, আবার দেওয়ালে ব্র্যাকেটেও ঝুলাইয়া রাখা যায়। তবে খুব ভারী বা বেশী দ্রব্য মিশ্রণের কাজে ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

ইলেক্‌ট্রিক ব্লেণ্ডার (Electric Blender) :

এই যন্ত্র খাবার তৈয়ারীর সময় সংক্ষেপ করিয়া থাকে অর্থাৎ এই যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ কাজ অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে সুশৃঙ্খলভাবে আরামে হইয়া থাকে। রান্নার জন্য খাদ্যদ্রব্যগুলি তৈয়ারী করিয়া লইতে ইহা খুব সাহায্য করে। ইহা দ্বারা অনেক বিরক্তিকর ও অপ্রীতিকর কাজ সহজে করা চলে। ইহাতে আঙ্গুলের সাহায্য ছাড়াও আলু টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে পারা যায়, চোখের জল না ফেলিয়াও পেঁয়াজ কুচি কুচি করা যায় এবং বিনা পরিশ্রমে বাঁধাকপিও সরু করিয়া কাটা যায়।

ইলেক্‌ট্রিক ব্লেণ্ডারের সাহায্যে মাংসের বা তরিতরকারীর সুপ (soup) তৈয়ারী, নানাবিধ উপকরণের মিশ্রণ, ফেটান, চূর্ণ করা, টুকরা টুকরা করা, দ্রবীভূত করা অর্থাৎ তরল করা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যে বাগান হইতে সদ্য-তোলা শাকসব্‌জীর সুপ বা ফলের রস সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী করা যায়। ইহাতে পানীয় তৈয়ারী করা যায়, ঠাণ্ডা পানীয়ের জন্য

বরফের টুকরা করা এবং বাড়ীতে যে কোন উপকরণ মিশ্রণের কাজ হয়। ইহাতে ঘূর্ণায়মান ফলা (Rotating blades) আছে যাহার সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে খাবার তৈয়ারী হয়। ব্লেণ্ডারে খাদ্যদ্রব্য যাহাতে রাখা হয় (Container) তাহা একটি পরিমাপের ফলের জার (Fruit jar); সূতাদ্বারা ব্লেণ্ডারটি জারের সহিত লাগানো। এই ফলের জারটির মধ্যে রান্না এবং খাওয়ার সময় পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ও সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে, যাহার ফলে আলাদা পাত্র দরকার হয় না বলিয়া ধোওয়ার পাত্রও কম হয়।

সাধারণতঃ ফল বা শাকসব্জী তরল করা হয়। প্রথমে তরল পদার্থ রাখিয়া তাহার মধ্যে টুকরা-করা ফল বা তরিতরকারী অল্প পরিমাণে দিয়া ক্রমশঃ যত ঘন হইতে থাকিবে আরও তরল পদার্থ তাহাতে যোগান দিতে হইবে।

ঘন তরল পদার্থে জারের এক-তৃতীয়াংশ ভরিলে উহা বদলাইয়া অন্য একটি জার বসাইতে হইবে। পাতলা তরল পদার্থ জারের তিন-চতুর্থাংশ ভরিলেই বদলাইতে হইবে।

ব্লেণ্ডারটির ব্লেডগুলি নির্মাতার নির্দেশ অনুযায়ী খুলিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ব্লেণ্ডারের বডিটি ভিজা কাপড় বা ছিদ্রবিহীন স্পঞ্জ দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়।

ইলেক্‌ট্রিকে রান্না (Cooking by electricity) ঃ

ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ, হীটার বা ইলেক্‌ট্রিক কুকার রান্নার জন্য ব্যবহার করিলে অতি সহজেই রান্না করা যায়। ইহাতে উনুন ধরান ইত্যাদির জন্য এক মিনিটও সময় নষ্ট হয় না বলিয়া খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং জ্বালানির ঝামেলা নাই বলিয়া রান্নার জায়গাটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

ইলেক্‌ট্রিক কুকারে যে প্যান থাকে তাহাতেই রান্না করা ভাল। বেকিংএর ডিশগুলি র‍্যাকে বসাইলে ভাল হয়। ইলেক্‌ট্রিক কুকারে মাংস রান্নায় জল দিতে নাই; শাকসব্‌জীতে খুব অল্প জল দিতে হয় এবং সর্বদা ঢাকিয়া দিতে হয়। ইলেক্‌ট্রিকের উনুনে উত্তাপ বেশী হয়, ছাই হয় না, ধোঁয়া হয় না, আগুনের শিখা উঠে না এবং উত্তাপও নষ্ট হয় না। কারণ রান্না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ্‌টি খুলিয়া দিলেই উনুন নিভিয়া যায়। সেজন্য ইলেক্‌ট্রিক উনুন অত্যন্ত সুবিধাজনক।

ইলেক্‌ট্রিক কুকার ব্যবহারের নিয়মও অত্যন্ত সহজ এবং যে কেহ অতি অল্প সময়ে ইহা ব্যবহারের নিয়মাবলী শিখিতে পারে। ইহাতে চুল্লী (oven), গ্রিল ও বয়েলিং প্লেট্‌স এই তিনটি অংশ আছে। প্রত্যেকটি অংশের জন্য আলাদা সুইচ্‌ আছে। সুইচের হাই, মিডিয়ম ও লো এই তিন রকম উত্তাপ আছে। কাজেই ইচ্ছামত বেশী বা কম উত্তাপ পাওয়া যায়। একবার জ্বালাইলে সমানভাবে উত্তাপ দেয়; ইচ্ছা করিয়া না বাড়াইলে কিংবা কমাইলে উত্তাপ বাড়ে না বা কমে না। একটু হিসাব করিয়া ব্যবহার করিলে খরচও বেশী পড়ে না।

ইলেক্‌ট্রিকে রান্না খাদ্যের দ্রব্যগুণ অনেক বেশী থাকে। ইলেক্‌ট্রিকে রান্না করিলে ঘর যেমন পরিষ্কার থাকে, বাসনকোসনও পরিষ্কার থাকে। সিদ্ধ করিবার জন্য যে বাসন ব্যহার করা হয় সেইগুলি আগুনে বেশী পোড়ে না, সেজন্য পরিষ্কার করিতে খুবই কম কষ্ট হয়।

রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুইচ্‌টি খুলিয়া ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং সামান্য একটু গরম থাকিতেই ভিজা ন্যাকড়া নিংড়াইয়া তাহার সাহায্যে কুকারটি মুছিয়া দিতে হইবে।

একটু গরম থাকিতে মুছিলে সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া যাইবে। ধাতুনির্মিত অংশগুলি খবরের কাগজের সাহায্যে মুছিয়া দিতে হয়। কোন দাগ পড়িলে ভিজা ন্যাকড়া নিংড়াইয়া মুছিয়া দিতে হইবে। ভিতরের রান্নার পাত্র, ঢাকনা ইত্যাদি অন্যান্য বাসন যে ভাবে পরিষ্কার করে সেভাবেই পরিষ্কার করা দরকার। যেগুলি সর্বদা ব্যবহারে লাগে না সেগুলি তুলিয়া রাখা ভাল এবং ব্যবহারের আগে ধুইয়া লওয়া প্রয়োজন।

প্রতিদিন উনুনের (Oven) ভিতর ও বাহিরের অংশ খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করা দরকার। হট-প্লেটগুলি (Hot-plates) শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘষিয়া একটু তৈল মাখাইয়া রাখিলে ভাল থাকে। খুব সাবধানে কাজগুলি করিতে হয়, নতুবা জিনিসটি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পরিষ্কার করিবার জন্য কখনও কোন অমসৃণ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

গ্যাসের উনুন (Gas Cooking Stoves)

নানা ধরনের নানা আকারের গ্যাস কুকারের মধ্যে যাহার যেরকম প্রয়োজন তাহার সেই রকম কেনাই ভাল।

গ্যাসের উনুনে শ্রম লাঘব হয় এবং সময় বাঁচে। কারণ ইহার জন্য কোন জ্বালানির প্রয়োজন হয় না। ইহাতে রান্না করিলে ঘর খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কারণ ইহাতে ধোঁয়া হয় না, কোন গুঁড়া পড়ে না, রন্ধনপাত্রেও কালি পড়ে না। ইহা পরিষ্কার করাও খুব সুবিধা, ব্যবহার করার নিয়মও খুবই সহজ। ইহার উত্তাপে সহজে ঘর গরম হয় না বলিয়া রান্নাঘর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। ইহার দামও খুব বেশী নয়; রান্নার খরচও কম। তবে ইহার অসুবিধা এই যে, গ্যাস প্রয়োজনমত সরবরাহ না হইলে মোটেই জ্বলিবে না। সর্বত্র গ্যাস সরবরাহও হয় না।

গ্যাস কুকারের বডি লোহার তৈয়ারী, বাহিরের দিকের সমস্তটা পেন্টিং করা বা এনামেল করা থাকে। এজন্য খুব মসৃণ হয়, সুন্দর দেখায় এবং পরিষ্কার করিতেও খুব সুবিধা। উনুনের দরজা পিছন দিকে ও পাশে দুইটি করিয়া থাকা দরকার। উনুনের ভিতরের দিকে এক বা ততোধিক বার্নার এবং খোলা যায় এরূপ র‍্যাক থাকে যাহা প্লেট গরম করিতে সাহায্য করে।

স্টোভের সঙ্গে হট-প্লেট বসান থাকে। হট-প্লেটের ইস্পাতের বা এনামেল-করা ফ্রেমের উপর বার্নার এবং গ্রিলার (কাবাব করার জন্য) থাকে। এই ফ্রেমে লোহার বার বা প্যান বসাইবার ব্যবস্থা আছে, সিদ্ধ করার জন্য বা অল্প আঁচে রান্নার জন্য বার্নার আছে, টোস্টার বা গ্রিলার আছে। এই অংশগুলি খুলিয়া নাড়াচাড়া করা যায়।

উনুনের উপরে এনামেল-করা লোহার ঢাক্না থাকে। কোন কোন কুকারে প্লেট রাখার র‍্যাকের জায়গায় প্লেট ও খাবার গরম রাখিবার জন্য জায়গা (Hot closets) থাকে।

কোন কিছু সেঁকিবার জন্য প্রথমে উনুনটি সম্পূর্ণরূপে গরম করিয়া তবে সেঁকিতে আরম্ভ করিতে হইবে। সর্বদা পরিষ্কার এবং হাল্কা সস্প্যান ব্যবহার করিবে। যে রান্নার জন্য যে রকম বার্নার প্রয়োজন তদনুযায়ী ছোট বার্নার ব্যবহার করিতে হইবে। খুব বেশী আগুনের শিখায় রান্না করিতে নাই; আগুনের শিখা যেন পাত্রের চারিদিকে বাহিরে ছড়াইয়া না পড়ে এইরূপ আঁচে রান্না করিবে। পোর্সিলিনের উপর গরম পাত্র বসাইতে নাই, কারণ উহাতে পোর্সিলিনের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায় এবং ফাটিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। ইহার উপরে অ্যাসবেসটসের প্যাড বসাইয়া লওয়া ভাল। পাত্র উনুন হইতে নামাইবার আগে গ্যাস বন্ধ করিয়া লইতে হয়।

বিভিন্ন রকমের রান্না একবারে করিতে হইলে উনুনের উপরে লুচি, কচুরি ইত্যাদি, মাংস এবং অন্যান্য যে রান্নায় পরিমিত অর্থাৎ মাঝামাঝি উত্তাপ প্রয়োজন সেগুলি মাঝখানে এবং দুধের পুডিং ইত্যাদি নীচের ঠাণ্ডা জায়গায় কিংবা নীচের দিকের প্লেটে রান্না করিলেই সুবিধা হয়, রান্নাও ভাল হয়। যখন একসঙ্গে কয়েকটি পাত্রে রান্না করিবার দরকার হয় তখন লোহার একটি পাত হট-প্লেটের উপরে পাতিয়া লইলে একটি বার্নার হইতে যে উত্তাপ পাওয়া যাইবে তাহাতে দুই-তিনটি পাত্রে ভাল সিদ্ধ হইতে পারিবে এবং অন্যগুলি অল্প আঁচে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

দেশলাই বা ছোট বাতি দিয়া গ্যাস জ্বালাইবার সময় গ্যাস জ্বলিবার সঙ্গে যেন ঘরঘর শব্দ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। যে নলটির সাহায্যে গ্যাস সরবরাহ হয় আগুন জ্বালানোর পূর্বমুহূর্তেই তাহা খুলিয়া দিতে হইবে। যে সব সরবরাহ-নল খুলিলে আপনি জ্বলিয়া উঠে, সেইগুলির জন্য দেশলাই দরকার হয় না। ওভেন রেগুলারেটারটি এবং সময়-নিরূপক যন্ত্রটি যেন যথাযথভাবে ব্যবহার হয় সেদিকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

স্টোভের ভিতরের দিক, দরজার ভিতরের দিক এবং এনামেল-করা উপরের দিক প্রত্যেক বার ব্যবহারের পর, স্টোভটি গরম থাকিতে থাকিতে, ভিজা ন্যাকড়া নিংড়াইয়া মুছিয়া দিতে হইবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার এই অংশগুলি গরম জল, সাবান কিংবা পরিষ্কার করিবার সাধারণ পাউডারের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বার্নারগুলি পরিষ্কার রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। যদি উহার ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায় তবে তার বা সরু শিকের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হইবে। দণ্ড (Bar) বা আংটীর (Ring) মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ পড়িলে গরম সাবানজল বা সোডার

জল দ্বারা রগড়াইয়া তুলিয়া শুক্‌না ন্যাকড়ার সাহায্যে শুক্‌না করিয়া মুছিয়া আবার বসাইয়া দিতে হইবে। ট্রে এবং র‍্যাকগুলি মৃদু সাবান ও জলে পরিষ্কার করিতে হয়। কাচনির্মিত অংশ ঠাণ্ডা হইলে মৃদু সাবান ও জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। গ্রিলার ব্যবহার করিলেই পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। অমসৃণ, খড়খড়ে দ্রব্য পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করিবে না। দুধ, লেবু এবং ভিনিগারের মধ্যে যে এসিড থাকে তাহাতেই সমস্ত দাগ উঠিয়া যায়। গ্যাসের ভাঁড়ারের জায়গাটি সর্বদা পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। অন্ততঃ মাসে একবার দণ্ডগুলি এবং যে অংশগুলি খোলা যায় সেগুলি খুলিয়া পরিষ্কার করা বাঞ্ছনীয়।

মাঝে মাঝে সব বার্নার কয়েক মিনিট জ্বালাইয়া ঠিক জ্বলে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ইহাতে বার্নারগুলি পরিষ্কার করার পর শুকাইবার কাজ হয়। সমস্ত ব্যবহৃত বাসনপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দূরে সরাইয়া রাখিবে। প্রয়োজন বোধে স্টোভের চারিদিকের মেঝে ঘষিয়া পরিষ্কার করা ভাল। ইস্পাত, পিতলের বা ক্রোমিয়ামের অংশগুলি পালিস করা প্রয়োজন। গ্যাস কুকারের সমস্ত অংশ সর্বদা পরিষ্কার রাখিলে গ্যাস কম খরচ হয়।

তেলের স্টোভ বা কুকার (Oil Cooking Stoves) :

আমাদের দেশে সাধারণতঃ কেরোসিন তৈলেই এই স্টোভ বা কুকারগুলি জ্বলে।

ইহা দুই রকমের—(১) পলিতা ছাড়া আর (২) পলিতাসহ। এইগুলি নানা ধরনের, ছোট বড় নানা রকমেরই পাওয়া যায়। সাধারণ কয়লার উনুন অপেক্ষা স্টোভে রান্না অনেক সুবিধাজনক। এগুলি জ্বালানো সহজ, ময়লা হয় না, সেজন্য পরিশ্রম অনেক কম।

তেল ভরিয়া জ্বালাইয়া লইলেই হয়। যেখানে ইলেক্‌ট্রিক বা গ্যাস নাই সেখানে এইগুলি অতি প্রয়োজনীয়। ইহাতে কয়লার উনুন অপেক্ষা ঘর ঠাণ্ডা থাকে, রান্নাঘর ছোট হইলে ভাঁড়ার ঘরেও রান্না করা চলে। স্টোভ বেশী ভারী নয় বলিয়া সহজে নাড়াচাড়া করা যায়, তেলের খরচও বেশী পড়ে না। তবে প্রত্যহ ভাল করিয়া পরিষ্কার করা দরকার এবং কেরোসিন খুব সহজে জ্বলিয়া উঠে বলিয়া খুব সাবধানে কাজ করা উচিত।

(১) পলিতা ছাড়া স্টোভের মধ্যে প্রাইমাস স্টোভই বেশী চলে। ইহা জ্বালানের পদ্ধতি সর্বজনবিদিত। কাজেই বিশেষ কিছু বলিবার নাই। স্টোভের তেল ভরিবার জায়গাটির তিনভাগের দুই ভাগ তেলে ভরিতে হয়, সম্পূর্ণ ভরিতে নাই। তারপর মুখ বন্ধ করিয়া বাটীটিতে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া জ্বালাইয়া দিতে হয়। স্পিরিট প্রায় পুড়িয়া শেষ হইয়া আসিলে পাম্প করিতে হয়। তাহার আগে পাম্প করিলে বার্নারটি যথেষ্ট গরম হয় না বলিয়া ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ হয়। বার্নারটি প্রতিদিন পরিষ্কার করা দরকার। পিন্ দ্বারা নলের ছিদ্রটি প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। পরিষ্কার তেল ব্যবহার করা উচিত। খুব বেশী পাম্প করিতে নাই, উহাতে স্টোভ ফাটিবার ভয় থাকে।

(২) পলিতার স্টোভে বা কুকারে একটি বড় তৈলাধার থাকে যাহাতে বার্নারগুলি বহুক্ষণ জ্বলিতে পারে। বারে বারে দেখিবার প্রয়োজন হয় না। তৈলাধারের দুই-তৃতীয়াংশ তেলে ভরিতে হয়। দুইটি বার্নারের কুকারের তৈলাধারে যে তেল ধরে তাহাতে ছোট পরিবারের প্রায় দুই দিনের রান্না চলিতে পারে। পলিতাগুলি যত্নের সহিত ছাঁটিয়া দিতে হয়, কখনও কালো হইতে দিতে নাই। পলিতাটি চারিদিকে সমানভাবে জ্বালাইয়া চিম্‌নিটি তাড়াতাড়ি

নামাইয়া দিতে হইবে, তখন পলিতাটি অল্প বাড়াইয়া দিতে হয় উত্তাপ বাড়াইবার বা কমাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহা হাওয়ায় রাখিলে ভাল জ্বলিবে না। ভাল স্টোভে আগুনের শিখা নীলবর্ণের হয় এবং তাপও খুব বেশী হয়।

ইহা খুব পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। ভাল তেল ব্যবহার করিতে হইবে এবং তেল খুব নীচে থাকিলে জ্বলিতে দেওয়া উচিত নয়। তেলের স্টোভে রান্না করিবার পক্ষে টিনের, এনামেলের বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রই সুবিধাজনক, কারণ এইগুলি হাল্‌কা বলিয়া সহজে উত্তপ্ত হয়।

সর্বদা দিনের আলোয় ইহা পরিষ্কার করা ভাল। পলিতা বাড়াইয়া খবরের কাগজ দিয়া পলিতার পোড়া অংশটি ফেলিয়া দিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কাঁচি ব্যবহার করা যাইতে পারে। বার্নারের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। উনুনের ভিতর দিকটা গরম সাবানজল ও নেট কাপড় (Net cloth) দিয়া মুছিয়া দিতে হয়। মাঝে মাঝে স্টোভটির সমস্ত অংশ খুলিয়া পরিষ্কার করিবে। বার্নারগুলি গরম সোডার জলের সাহায্যে পুরান ব্রাশ দিয়া ঘষিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিবার পর শুকাইতে দিবে। তৈলাধারের তৈল অন্য পাত্রে ঢালিয়া একটি বড় চামচ পরিমাণ তৈল তৈলাধারটিতে রাখিয়া নীচের গাদগুলি ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। পরে ঐ গাদের তৈল ফেলিয়া আবার তৈল ভরিয়া তৈলাধারের বাহির দিক পালিস করিয়া দিতে হইবে। স্টোভের এনামেলের অংশগুলি গরম সাবান-জলে ধুইয়া নেট কাপড়ের সাহায্যে শুকাইয়া লইতে হইবে।

উনুনের ভিতরটা ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। স্টোভের বাহিরের দিক সামান্য একটু প্যারাফিন সহযোগে পালিস করা

ভাল। সমস্ত অংশ পরিষ্কার করিবার পরে স্টোভটির অংশগুলি যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে।

প্রেসার কুকার (Pressure Cooker) ঃ

এই কুকারে এক প্রকার বিশেষভাবে নির্মিত সস্‌প্যান বা পাত্রে বাষ্পের সাহায্যে রান্না হয়। ইহার ভিতর হইতে একটু বাষ্পও বাহির হইতে পারে না। সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টীলে এই পাত্রগুলি নির্মিত। এই পাত্রগুলি খুব মজবুত এবং ঢাক্‌নাটি খুব শক্ত করিয়া আটকান থাকে। স্বয়ংচালিত (automatic) প্রেসার কুকারে নিজস্ব ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা আছে। চাপ নিয়ন্ত্রণ, বাষ্প নির্গম, সময় নিরূপণ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় অর্থাৎ নিজ হইতেই হইয়া থাকে। ইহাতে রান্না করিতে সময় বাঁচে, জ্বালানি বাঁচে, পরিশ্রম কম হয়, খাদ্যগুণ বেশী পাওয়া যায় এবং খাদ্যের রঙ সুন্দর হয়।

এই পাত্রে বায়ুপ্রবেশের পথ থাকে না এবং একটু বাষ্পও বাহির হইতে পারে না বলিয়া বাষ্পের চাপ এবং উত্তাপ দুইই বেশী হয়। এইজন্যই জলে সিদ্ধ করা (Boiling) কিংবা সাধারণ ভাপে সিদ্ধ (Steaming) করা অপেক্ষা ইহাতে খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়।

ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা ছাড়া কতগুলি প্রেসার কুকারের পাত্র এমনভাবে তৈয়ারী করা হয় যাহাতে ইলেক্‌ট্রিক, গ্যাস, তৈল বা জ্বালানির উনুনেও সেগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐগুলির তলার দিক একটু পাতলা থাকে।

আজকাল দুই রকমের প্রেসার কুকার পাওয়া যায়। এক রকমের কুকারে একটি খাদ্যই রান্না হয়। আর এক ধরনের কুকারের ভিতরে

সচ্ছিদ্র র‍্যাক এবং কন্‌টেইনার, ধাতুনির্মিত ডিশ এবং প্যান সাজাইবার ব্যবস্থা থাকে যাহাতে একই সময়ে বিভিন্ন রান্না হইতে পারে। কুকারটি যে রকমেরই হউক না কেন, ঢাক্‌নাটি খুব শক্তভাবে আটকান প্রয়োজন। একটি হাতলযুক্ত আড়াআড়ি ভাবে সংলগ্ন দুইটি হুড়কা (Cross bar) বা কুকারটির ধারে থাম-স্ক্রু (Thumb-screw) দ্বারা শক্ত করিয়া আটকান একটি সকেটের (Socket) সাহায্যে ঢাক্‌নাটি শক্ত করিয়া আটকাইবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শক্ত করিয়া আটকান যায় এরূপ ভাবে ঢাক্‌নাটি তৈয়ারী হইলেও চলে, কিংবা পাত্রটি ও ঢাক্‌নাটির মধ্যে একটি ওয়াশার (Washer) থাকিলেও বায়ু ঢুকিতে পারিবে না এবং বাষ্পও বাহির হইতে পারিবে না।

কাঁচা খাদ্যদ্রব্য এবং খুব সামান্য জল কুকারে দিয়া ঢাক্‌নাটির দ্বারা ঢাকিয়া উত্তাপ দিতে হইবে। শীঘ্রই জল বাষ্পে পরিণত হইবে। ঢাক্‌নার ছোট ছিদ্র দিয়া বাষ্পের চাপে পাত্র হইতে বায়ু বাহির হইয়া গেলে তবেই সত্যিকারের প্রেসারে রান্না প্রস্তুত হইল।

প্রথমে একটি ছোট ঢাক্‌নি দিয়া প্রেসার কুকারের ঢাক্‌নাটির গর্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে বাষ্প বাহির হইয়া যাইতে না পারে। এইভাবে স্টোভের উত্তাপে বাষ্পের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবে। এই অতি উষ্ণ বাষ্পে খাদ্যদ্রব্যও খুব বেশী উত্তপ্ত হয়। বাষ্প প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়া উহাদিগকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করে বলিয়া খুব অল্প সময়ে রান্না হইয়া যায়।

কুকার বেশী বোঝাই করিতে নাই। পাত্রটির দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ভরিবে না। কারণ যদি খাদ্যদ্রব্য ঢাক্‌নি স্পর্শ করে তবে বাষ্প নির্গমনের নল বা সেফ্‌টি রিলিজ ভাল্‌ভ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। পাত্রে ঢাক্‌নাটি দেওয়ার আগে বাষ্প নির্গমনের

পথটিতে কোন খাদ্যকণা লাগিয়া আছে কিনা দেখিয়া লইতে হইবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম জল কখনও ব্যবহার করিবে না।

শাকসব্জী রান্নার সময় গরম জল দিয়া বসাইলে তাড়াতাড়ি উষ্ণ চাপ আসে। মাংস প্রথমে ভাজিয়া লইলে মাংসের রঙ ও স্বাদ দুইই ভাল হয়। ভাজিবার পরে র‍্যাকে বসাইয়া দিলে বাকীটা বাষ্পের চাপে রান্না হইবে। ঠিক প্রেসার আসার সঙ্গে সঙ্গে সময় দেখিবে। পাত্রটি ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া এবং ঢাক্‌নাটি ঠিকভাবে বসাইবার পরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া, বার্নারের উপরে বসাইয়া সুইচ্ খুলিবে।

একসঙ্গে কয়েকটি খাবার রান্না করিতে হইলে যেসব খাবার একই উত্তাপে ও একই সময়ে হইতে পারে এই রকম খাবার করাই ভাল। রান্না হইয়া গেলে বার্নারের উপর হইতে পাত্র নামাইয়া ঢাক্‌না তুলিবার আগে উহার চারিধারে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া কিংবা ঠাণ্ডা জলের পাত্রে বসাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তবে ঢাক্‌না তুলিতে হয়, নতুবা বাষ্প চারিদিকে ছড়াইয়া দেহে ফোস্কা পড়িতে পারে।

অ্যালুমিনিয়ামের বাসন যে ভাবে পরিষ্কার করা হয় পাত্রটি সেই ভাবেই পরিষ্কার করিতে হইবে। নলটি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। একটি তার বা সরু বোঁটার সাহায্যে নলটি পরিষ্কার করা যাইতে পারে। সস্‌প্যানের ধার খাঁজকাটা হইলে ঢাক্‌নাটি শক্ত হইয়া আটকায় না। গরম জলে ভিনিগার দিয়া ফুটাইলে সস্‌প্যানের ভিতরের দাগ উঠিয়া যায়। কুকারের বাহিরের দিকটি সিলভার পালিসের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হইতে।

ইকমিক কুকারও সময় এবং শ্রম লাঘবে সাহায্য করে, তবে প্রেসার কুকারের মত উহাতে অত তাড়াতাড়ি রান্না হয় না। ইকমিক কুকার সম্বন্ধে পূর্বেই (নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশে) বলা হইয়াছে, এজন্য এখানে বিশেষ আলোচনা করা হইল না।

ওয়াশিং মেসিন (Washing Machine) :

বর্তমানে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই কাপড় কাচা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। আজকাল লোকের আর্থিক অনটনও যেমন ইহার একটি কারণ, অপরপক্ষে ধোপার অভাব এবং অত্যধিক চার্জও উহার অন্যতম কারণ। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিতে যেমন আরাম ও আনন্দ হয়, সুস্বাস্থ্যের জন্যও ইহা অত্যাবশ্যক। কাজেই গৃহিণীদের কাপড় পরিষ্কার করা ও পরিষ্কার রাখা একটি অতিরিক্ত কাজে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই দুই-চারিখানা ছাড়া ধোপার বাড়ী বা ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় দেওয়া হয় না। বিশেষ করিয়া মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আসার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা দুইই বাড়িয়াছে। বাহিরের কাজে সময় ব্যয় হয় বলিয়া ঘরের কাজে সময় সংক্ষেপ করা দরকার। সুতরাং যন্ত্রের সাহায্যে এবিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হয়। কাপড় কাচা যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এজন্যই খুব বেশী। কিন্তু আমাদের সাধারণের আথিক সঙ্গতিতে কুলায় না বলিয়া ইহার ব্যবহার সম্ভব হয় না। এখন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সস্তায় এই যন্ত্র পাওয়া যায়। যাঁহাদের সামর্থ্যে কুলায় তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিতে পারেন এবং অদূরভবিষ্যতে আরও সস্তা হইলে হয়ত অনেকেই ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন এই ভরসায় ওয়াশিং মেসিন সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইল।

আজকাল ছোট বড় নানা আকারের ও নানা ধরনের ওয়াশিং মেসিন পাওয়া যায়। এইগুলির সাহায্যে গৃহিণীরা অনেকটা অবসর লাভ করিয়া বিশ্রামের অবকাশ পাইতে পারেন।

হাতে চালাইবার মেসিনও আছে ; তবে অধিকাংশই ইলেক্‌ট্রিকে চলে।

প্রধানতঃ তিন রকমের ওয়াশিং মেসিন আছে ঃ—

(১) এক ধরনের মেসিনের ভিতরে এক দিকে পালসেটার (Pulsator) অর্থাৎ আছড়াইবার যন্ত্র আছে যাহার দ্বারা কাপড়ের ভিতরে জল চলাচল করে। সাধারণতঃ ইহার ভিতরে হাতে চালান রিঙ্গার (Wringer) সংলগ্ন থাকে। একবারে অল্প কাপড় ধোয়া যায় এবং হাল্‌কা বলিয়া নাড়াচাড়া করার পক্ষে সুবিধাজনক। ছোট পরিবারের কাজ ইহাতেই সুসম্পন্ন হয়।

(২) আর এক ধরনের যন্ত্রের ঠিক মধ্যস্থলে প্রক্ষিপ্ত নল (Flanged cylinder) আছে যাহা দোলে এবং তুলিবার সময় কাপড় ও জল দুইই নাড়াচাড়া দেয় ; তাহাতেই কাপড় পরিষ্কার হয়। এই ধরনের যন্ত্রে সাধারণতঃ বিদ্যুৎচালিত রবার রোলার রিঙ্গার সংলগ্ন থাকে।

(৩) উপরি উক্ত দুই রকমের যন্ত্র ছাড়া অপর ধরনের যন্ত্রের মধ্যে ছিদ্রযুক্ত ড্রাম আছে যাহার মধ্যে কাপড় রাখা হয়। এই ড্রামটি লম্বালম্বি বা আড়াআড়ি ভাবে (অর্থাৎ যে মেসিনে যে ভাবে থাকে) সাবানজলের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। যেভাবেই ঘুরিতে থাকুক, কাপড়গুলি পর্যায়ক্রমে জলে ভিজে এবং নিংড়ান হয়। এই ভাবে ছিদ্রযুক্ত ড্রামটি দ্রুত ঘুরাইলে কাপড় হইতে জল নিংড়াইয়া কাপড়ের সমস্ত জল ঝরিয়া যায়।

কাপড়কাচার মেসিনগুলি স্বয়ংক্রিয় নয়। তাহাদের মধ্যে একটি বড় আছড়াইবার যন্ত্র আছে, তাহাকে এজিটেটার (Agitator) বলে। ইহা টবভর্তি গরম জলের মধ্যে কাপড়গুলিকে বারে বারে সামনে পিছনে নাড়াচাড়া করে। এই এজিটেটারটি একটি ইলেকৃট্রিক মোটরের সাহায্যে উপরে নীচে ঘুরিতে থাকে।

ইলেকৃট্রিক মোটর-চালিত চাকাটি একদিকে ঘুরিতে থাকে। এই

চাকাটির সহিত একটি রড্ লাগান আছে। চাকাটি যখন ঘোরে তখন রড্টিও সামনে-পিছনে ঘুরিতে থাকে। রড্টির অন্যদিক এজিটেটারের সহিত আটকান থাকায় উহা উপরে-নীচে ঘুরিতে পারে। এই ভাবে কাপড়গুলি জলের মধ্যে চারিদিকে ঘুরিতে থাকে।

কাপড়গুলি ধোওয়া হইয়া গেলে রিঙ্গার বা স্পিন ড্রায়ারের সাহায্যে কাপড়ের জল নিংড়ান হয়। রিঙ্গারে দুইটি রবারের রোলার আছে যাহা ভিজা কাপড় হইতে জল নিংড়াইয়া বাহির করে।

পার্শ্বে ছিদ্রযুক্ত একটি টবকে (Tub) স্পিন ড্রায়ার বলা হয়। এই টবের মধ্যে ভিজা কাপড়গুলি রাখিয়া মোটরটি চালাইয়া দিলে টবটি কাপড় সহ ঘুরিতে থাকে। এই রকম ঘুরিবার ফলে টবের ছিদ্র দিয়া জল ঝরিতে থাকে এবং কাপড়গুলি প্রায় শুকাইয়া যায়।

স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেসিনে প্রায় সমস্ত কাজই আপনা আপনি হইয়া যায়। একবার কাপড়গুলি টবে বোঝাই করিয়া একটি হাতল ঘুরাইয়া দিলেই মেসিনটিতে কাজ আরম্ভ হয় এবং আধঘণ্টা বা তাহার চেয়ে কিছু বেশী সময়ে সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া মেসিনটি বন্ধ হইয়া যায়। প্রথমে কাপড়গুলি পরিষ্কার গরম জলে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভিজিয়া যায়, পরে গরম সাবানজলে ধুইয়া যায়ঃ এবং সর্বশেষে পরিষ্কার গরমজলে কয়েকবার রগড়াইয়া বা কচলাইয়া ধোওয়া হইয়া যায়।

প্রায় সমস্ত জল ঝরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত মেসিনটি দ্রুত ঘুরিতে থাকে। জল ঝরিয়া গেলে মেসিনটি নিজে নিজেই বন্ধ হইয়া যায়।

স্বয়ংক্রিয় মেসিনে একটি সময়-নিরূপক যন্ত্র (Timer) আছে যাহা ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি কাজের সময় ঠিক রাখে।

ইলেকৃট্রিক মোটরটির সাহায্যেই মেসিন চলে; ইলেকৃট্রিক মোটরটি চালাইবার ও বন্ধ করিবার জন্য একটি সুইচ্ আছে।

একটি ভাল্‌ভ গরমজলে ঘুরিতে থাকে। যখন টবটি যথেষ্ট ভরিয়া যায় তখন ঘূর্ণনও বন্ধ হইয়া যায়।

আর একটি ভাল্‌ভ ঠাণ্ডা জলে ঠিক অনুরূপ কাজই করে। গরম ও ঠাণ্ডা জলের মিশ্রণে উত্তাপ যাহাতে ঠিক থাকে সেজন্য গরম ও ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি থার্মোস্ট্যাট (Thermostat) থাকে। ড্রেইন পাইপের ভিতর দিয়া ব্যবহৃত জলগুলি বাহির হইবার জন্য একটি ড্রেইন ভাল্‌ভ আছে।

ব্যবহারের নিয়ম—জলের সীমানা (level) অর্থাৎ যে পর্যন্ত জল ধরে ততটুকু পর্যন্ত কাপড়-চোপড় ভরিতে হয়। মেসিনটি অতিরিক্ত বোঝাই করিতে নাই।

যখন মেসিন বা রিঙ্গার চলিতে থাকে তখন প্লাগটি (Plug) লাগাইতে নাই। রিঙ্গারের রোলারে সমানভাবে অর্থাৎ উঁচু নীচু না হয় এইরূপে কাপড় রাখিবে যাহাতে রোলার সমানভাবে কাজ করিতে পারে।

মেসিন ব্যবহারের সময় মেসিন-নির্মাতার নির্দেশ অনুসরণ করিবে। ব্যবহারের পরে স্ট্রেইনারটি পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিবে। প্রতি বার কাপড় ধুইবার পরে এজিটেটারটি পরিষ্কার করিয়া সরাইয়া রাখিবে। কাপড় ধুইবার পরে পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ার দ্বারা রিঙ্গার রোলারটি সর্বদা মুছিয়া ফেলিবে।

ভিজা মেঝের উপরে তারটি (Cord) পড়িতে পারে, কাজেই নিরাপত্তার জন্য তারটি সর্বদা মেরামত করিয়া ঠিক রাখিবে এবং যখন তার নাড়াচাড়া করিবে হাত যেন শুক্‌না থাকে সেদিকে সতর্ক হইবে। নির্মাতার নির্দেশ অনুযায়ী মেসিনে তেল দিতে হইবে। মেসিনটির ভিতর বাহির সবটা রগড়াইয়া পরিষ্কার করিবার পরে শুক্‌না কাপড় দিয়া মুছিয়া শুকাইয়া রাখিবে।

রিঙ্গার (Wringer) ঃ

এই যন্ত্র ওয়াশিং মেসিনের সহিত সংলগ্নও হইতে পারে, আবার সম্পূর্ণ আলাদা এবং হস্তচালিতও হইতে পারে। ইহা একটি বিশেষ ধরনের স্ট্যাণ্ডের উপর বসান আলাদা একটি যন্ত্র। আবার সিঙ্কের (Sink) সহিত প্রয়োজনমত স্ক্রু দিয়া আটকান মেসিনও হয়। ইহার একটি রবারের রোলার (Roller) আছে বলিয়া বোতামসহ পোশাক-পরিচ্ছদ যত্ন করিয়া এবং খেয়াল করিয়া ভাঁজ করিয়া দিলে বোতাম ইহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। তাহাতে পোশাকের ও বোতামের কোন রকম ক্ষতি হয় না।
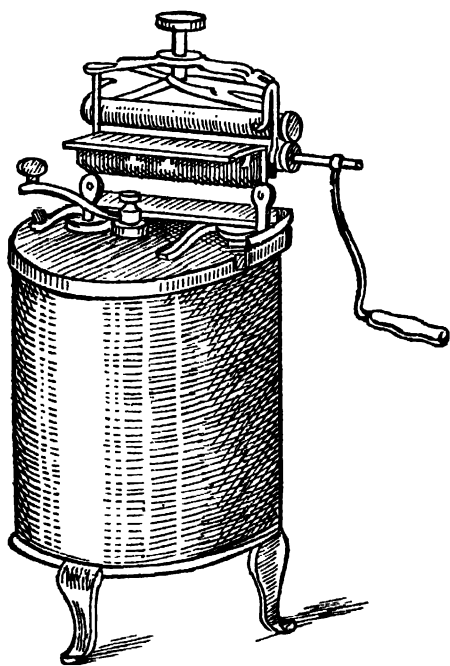
রিঙ্গার

ইলেক্ট্রিক ইস্ত্রি (Electric Iron) ঃ

ইলেক্ট্রিক ইস্ত্রি আমাদের অনেক পরিশ্রম ও সময় বাঁচায়। আজকাল ধোপার সমস্যার যুগে কাপড় কাচা প্রায় প্রত্যেক বাড়ীরই একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ, ইহা পূর্বেই আলোচনা

করা হইয়াছে। কাপড় ধুইয়া পরিতে হইলে ইস্ত্রি না করিলে চলে না। ইস্ত্রি করিলে কাপড় ভাল দেখায়, কুঁচকান থাকে না বলিয়া চারিদিক সমান হয় এবং পরিতেও আরাম লাগে। কতকগুলি ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রির উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র থাকে, প্রয়োজনমত গরম হইলে আপনা হইতেই কারেণ্ট বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই পরিশ্রম কম হয়, কষ্টও হয় না।

ব্যবহারের নিয়ম—ইস্ত্রি বেশী গরম করিতে নাই। স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রি যে কাপড় ইস্ত্রি করিবে সে কাপড়ের প্রয়োজনীয় উত্তাপে বসাইতে হইবে।

যখন ইলেক্‌ট্রিক সংযোগ বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে তখন ইস্ত্রির প্লাগটি না টানিয়া দেওয়ালের গর্ত (Outlet) হইতে প্লাগটি টানিয়া লইবে এবং তারটি টানিয়া তারের শেষে যে প্লাগটি লাগান আছে তাহা ধরিয়া টানিয়া নামাইবে। গরম ইস্ত্রির তার স্পর্শ করিবে না। ভিজা মেঝেতে দাঁড়াইয়া কখনও ইস্ত্রি করিবে না। অপরিবাহী ফিতায় (Insulating tape) কোন ছেঁড়া থাকিলে কারেণ্ট যখন বন্ধ থাকিবে সেই সময় মেরামত করিবে। ল্যাম্পের সকেটে না লাগাইয়া দেওয়ালের ছিদ্রে লাগাইবে।

ইস্ত্রি ঠাণ্ডা হইলে অল্প ভিজা পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে মোলায়েম কোন পরিষ্কারক দ্রব্যের সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। পরে শুক্‌না কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিবে। অল্প গরম থাকিতে ওয়াক্সড্‌ পেপারের (Waxed paper) উপরে চালাইয়া লইলে ভাল।

ইস্ত্রি পাতিয়া রাখিতে নাই, স্ট্যাণ্ডের উপরে অথবা ইস্ত্রির গোড়ার দিকে ভর দিয়া রাখিবে।

সেলাই কল (Sewing Machine) ঃ

সেলাইয়ের কল থাকিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কত সুবিধা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সেলাই হাতে করিতে ৩০ মিনিট লাগে, কলে তাহা করিতে ৫ মিনিটও লাগে না। ফলে পরিশ্রম যেমন বাঁচে, সময়ও বাঁচে ; উপরন্তু নিজে সেলাই করার আনন্দ পাওয়া যায় এবং খরচও বাঁচে। পূর্বে সেলাই কল সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে, এখন মোটামুটি আলোচনা করা হইল।

ব্যবহারের নিয়ম—বিভিন্ন অংশ ব্যবহারের নিয়মগুলি শিখিয়া লইতে হইবে। প্রথমে সোজাভাবে সেলাই করিতে শিখিবে। ঠিক ঠিক আকারের সূচে তদনুযায়ী সুতা ব্যবহার করিতে হইবে। কিছু সেলাই করিবার পূর্বে স্টিচ্‌টি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

মেসিনের উচ্চতার সহিত সমান আসনে বসিয়া আরামে সেলাই করিবে।

প্রায়ই মেসিনটি পরিষ্কার করিয়া তেল দিতে হইবে। উপরের অংশের (Head) প্রত্যেকটি গর্তে এক ফোঁটা করিয়া তেল দিতে হইবে। পরে পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া চারিদিকের তেল মুছিয়া রাখিবে। যখন মেসিনে কাজ করিবে না সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে এবং পা-মেসিনের বেল্টটি খুলিয়া রাখিবে। মেসিন ভাল না চলিলে দক্ষ মিস্ত্রিকে দেখাইবে।

সেলাই কলটি প্রায় প্রত্যেক পরিবারের পক্ষেই ব্যবহার করা সহজ এবং ইহা এক প্রকার অপরিহার্য বলিলেও চলে।

আজকাল ইলেক্‌ট্রিক এমব্রয়ডারী মেসিনও পাওয়া যায়, তবে ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়ও নয়, তেমনি সহজ-লভ্যও নয়। কাজেই এবিষয়ে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও ফ্যান আজকাল প্রায় অনেকেই ব্যবহার করেন। ইহাতে পরিশ্রম ও সময় বাঁচিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

ইলেক্‌ট্রিক ঘড়িও আজকাল বাহির হইয়াছে, যদিও খুব বেশী প্রচলন হয় নাই। ইহাতে একদিন দম দিলে কয়েক দিন চলে; কাজেই পরিশ্রমের দিক হইতে এবং সময়ের দিক হইতে সুবিধাজনক। দামও খুব বেশী নয়।
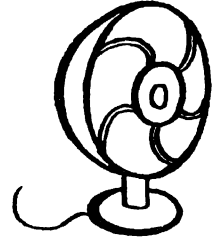
ইলেকট্রিক টেবিল ফ্যান

ইহা ছাড়া গরম জলের কেট্‌লি, ডিশ-ওয়াশার প্রভৃতি নানা রকমের যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে মানুষের অনেক শ্রম লাঘব হইয়াছে ও সংক্ষেপে কার্য নির্বাহ হইতেছে।

গরম জলের কেট্‌লিটিতে জল দিয়া সুইচ্‌ টিপিয়া দিয়া বসাইলে জল খুব তাড়াতাড়ি গরম হইয়া যায়। ইহা সর্বসাধারণের ব্যবহার-যোগ্য; কিন্তু ডিশ-ওয়াশার আমাদের দেশের পক্ষে তেমন ব্যবহার-যোগ্য নয়, কারণ আমাদের দেশে নগণ্য কয়েকটি বাড়ী ছাড়া সচরাচর ডিশ ব্যবহার করা হয় না। তা ছাড়া ইহার দামও বেশী বলিয়া সাধারণের ইহা কেনার সামর্থ্য নাই।

অনুশীলনী

1. What points are to be taken care of in planning a budget? (বাজেট করার সময়ে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে?)
2. What is the value of planning co-operatively with the

family-members ? (পরিবারের সকলের সহযোগিতায় পরিকল্পনা করার সার্থকতা কি ?)

3. How is home management influenced by the location, size and condition of the home ? (গৃহ-পরিচালনায় গৃহের অবস্থান, লোকসংখ্যা এবং অবস্থা কতখানি প্রভাব বিস্তার করে ?)

4. What is the utility of division of work among the family members ? Name some devices with which you can save your labour and time ? (পরিবারের লোকদের মধ্যে কর্ম বিভাগের প্রয়োজনীয়তা কি ? শ্রম ও সময় লাঘবের কয়েকটি উপায়ের বিষয় উল্লেখ কর।)

5. Write short notes on any two of the following :—
Vacuum Cleaner, Refrigerator, Toaster, Wringer, Coffee maker. (নিম্নলিখিত যে কোন দুইটির বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ :— ভ্যাকুয়াম ক্লীনার, রিফ্রিজারেটার, টোস্টার, রিঙ্গার, কফি মেকার।)

6. What forms of leisure do you enjoy by yourself ? (কি ভাবে অবসর যাপন করিতে তোমার ভাল লাগে ?)

7. What is the necessity of planning in the management of a home ? (গৃহ-পরিচালনায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি ?)

8. Do you plan your work and act accordingly ? (তুমি কি নিজের কাজের পরিকল্পনা করিয়া সেই অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হও ?)

9. What is the correct posture of taking a baby in arm ? What are the disadvantages of taking a baby on arms without bending the knees ? (একটি শিশুকে কোলে নেওয়ার সুষ্ঠু পদ্ধতি কি ? হাঁটু না বাঁকাইয়া শিশুকে কোলে নিলে কি কি অসুবিধা হয় ?)

10. What is your duty in your home ? How would you

maintain a good relationship with your family members? (বাড়ীতে তোমার কর্তব্য কাজ কি কি? পরিবারের লোকদের সহিত তুমি কি ভাবে সদ্ভাব রক্ষা করিবে?)

11. What are the qualifications of a good housewife? What things should be borne in mind in doing household duties? (সুগৃহিণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক? সুচারুরূপে গৃহকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য গৃহিণীর কি কি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন?)

12. What is an ideal home? Name the duties that mother has to perform in a home. What are your responsibilities at home? (আদর্শ গৃহ কাহাকে বলে? গৃহে মায়ের কর্তব্য কি কি? গৃহে তোমার দায়িত্ব কতটুকু?) (H. S. 1960)

13. What are some indications that a home is well-managed? (কি কি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া সুপরিচালিত গৃহ বোঝা যায়?)

14. What do you understand by simple labour-saving devices at home? Suggest some possible ways of saving labour and time without using mechanical appliances at home. (বাড়ীর সাধারণ শ্রম লাঘবের উপায় বলিতে কি বোঝ? যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া বাড়ীতে শ্রম লাঘবের ও সময় সংক্ষেপের কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় উল্লেখ কর।) (H. S. 1961)

15. How can you cook more than one food at a time? (একই সময়ে একটির বেশী খাবার রান্না করা যায় কিরূপে?)

16. How a home-maker can improve her method of washing and ironing? (গৃহিণী কি উপায়ে উন্নততর পদ্ধতিতে কাপড় ধুইতে ও ইস্ত্রি করিতে পারেন?)

17. How can you arrange kitchen equipment to save time and work? (শ্রম ও সময় বাঁচাইবার জন্য রান্নাঘরের সাজসরঞ্জাম কি ভাবে সাজাইবে?)

তৃতীয় অধ্যায়

পুষ্টিকর খাদ্য ও রন্ধন-প্রণালী

বয়স অনুযায়ী সুষম খাদ্যের পরিকল্পনা

(Planning of balanced diets for different age levels.)

খাদ্য বস্তুর প্রোটীন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, শর্করা, ভিটামিন প্রভৃতির বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সেই গুণের উপর ভিত্তি করিয়া কি ভাবে বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী আমাদের খাদ্য-তালিকা রচনা করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে এখন বলা হইবে।

আমাদের ভারত দরিদ্রের দেশ। জীবন-সংগ্রামের জন্য যতটুকু খাদ্য দরকার তাহা আর্থিক অনটনবশতঃ সবসময় আমাদের যোগানো সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া ভেজাল, সংমিশ্রণ ও কোল্ড স্টোরেজ (Cold storage) প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীর্ঘকাল সংরক্ষণের ফলে খাদ্যদ্রব্যের গুণ অনেক কমিয়া যায়। তবুও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচারপূর্বক খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়া যাহাতে আমরা দীর্ঘজীবন ও পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারি সেই বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে।

খাদ্যের সাতটি প্রধান শ্রেণী ('Basic Seven Food groups') —(১) সবুজ ও হলুদে শাকসব্জী, (২) লেবুজাতীয় ফল, টম্যাটো, সবুজ স্যালাড, কাঁচা লঙ্কা, আনারস, (৩) গোলআলু, অন্যান্য ফল ও শাকসব্জী, (৪) দুধ ও তাহার বিভিন্ন রূপ—দই, ঘোল, ক্ষীর, পনীর, ছানা প্রভৃতি, (৫) মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম,

ডাল ইত্যাদি, (৬) রুটি, আটা, সুজি ইত্যাদি এবং ধান্য, গোধুমাদি শস্য, (৭) মাখন, ঘি, তৈল, চর্বি, মারজারিন (imitation of butter) ইত্যাদি। এই সব নানা প্রকার উপাদান ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বাছিয়া লইয়া দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিলে আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিপুষ্টি লাভের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আমাদের দেশে খাদ্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ রূপে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা না হইলেও পাশ্চাত্য দেশে ও আমেরিকায় ইহা লইয়া নিত্য নূতন গবেষণায় আমাদেরও উপকার হইতেছে। National Food Allotment পরিকল্পনায় একজন স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তির এক সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে ঃ

দুধ—	৫ কোয়ার্ট
গোলআলু ও মিষ্টি আলু—	৪ পাউণ্ড
শুষ্ক বরবটী, মটর ও বাদাম—	৮ পাউণ্ড
টম্যাটো এবং লেবুজাতীয় ফল—	৮ আউন্স
সবুজ ও হলদে শাকসব্জী—	১½ পাউণ্ড
অন্যান্য শাকসব্জী এবং ফল—	২ পাউণ্ড, ৪ আউন্স
ডিম—	৪টি
মাছ-মাংস—	১½ পাউণ্ড
ময়দা ও অন্যান্য গমজাতীয় পদার্থ—	১২ আউন্স

এই তালিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য হইল জাতিকে অপুরিপুষ্টির হাত হইতে রক্ষা করা। এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গিলেট (Gillett) খাদ্যের জন্য অর্থের একটি সোজা বাজেট স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে খাদ্যের জন্য অর্থের

½ ভাগ পরিমাণ (কিছু বেশী বা কম) শাকসব্জী ও ফলের জন্য

$\frac{১}{৫}$ ভাগ অথবা বেশী দুধ ও পনীর জাতীয় পদার্থের জন্য

$\frac{১}{৫}$ ভাগ অথবা কিছু কম মাছ, মাংস ও ডিমের জন্য

$\frac{১}{৫}$ ভাগ অথবা কিছু কম বেশী রুটি এবং ধান্যজাতীয় দ্রব্যের জন্য

$\frac{১}{৫}$ ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থ, চিনি এবং অন্যান্য খাদ্যের জন্য ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণভাবে এই নীতি অনুযায়ী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিলেও ইহা শুধু গড়পড়তা বয়স্ক লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু মানবজীবন বলিতে মাত্র বয়স্ক লোকের জীবনকেই সম্পূর্ণরূপে বুঝায় না। শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া মানুষ জীবনের পথে আগাইয়া চলে। ইহা ব্যতীত শৈশব হইতে যৌবন মানবজীবনের ক্রমবর্ধমান কাল। তখন দেহের বৃদ্ধিসাধন হইয়া থাকে। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার সঙ্গে মানুষের শরীর ধীরে ধীরে ক্ষয় হইতে থাকে, বার্ধক্যে দেহের বৃদ্ধিই থাকে না। যৌবনে মানুষের যতটা কর্মক্ষমতা থাকে বার্ধক্যে তাহা নিস্তেজ হইয়া যায়। এইজন্য খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় দৈহিক ক্ষয় ও বৃদ্ধির নিয়মগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা প্রণয়ন করা উচিত। ষোল-সতের বৎসরের ছেলেমেয়েদের জন্য দেহের বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রোটীনজাতীয় পদার্থ, ঘি, মাখন, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং ভিটামিন ও লবণযুক্ত টাটকা ফল, শাকসব্জী, ছানা, ডাল ইত্যাদি দেওয়া উচিত। ছাব্বিশ-সাতাইশ বৎসর হইতে যখন দেহের আর বৃদ্ধি হয় না তখন প্রোটীন খাদ্যের মাত্রা কমাইয়া শ্বেতসারের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হয় এবং উহার সহিত ফলমূলের ব্যবস্থা করিতে হয়। বৃদ্ধবয়সে হজম করিবার শক্তি কমিয়া আসে, সেইজন্য সে সময় দুধ ও মাছ ব্যতীত অপর কোনও প্রোটীনের তেমন

প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এসময় প্রচুর ফলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ফলের রসে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকার জন্য দেহ সতেজ রাখিতে ইহা বিশেষভাবে সহায়তা করে। জীবনের সর্বাবস্থায় ফলের রস অত্যন্ত উপকারী।

শিশুর খাদ্য

খুব ছোট শিশুর দাঁত থাকে না। এইজন্য তাহার পক্ষে কঠিন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করা অসম্ভব। সেইজন্য শিশু তরল বস্তু, বিশেষ করিয়া দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করে। জন্মের পরমুহূর্ত হইতেই শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে। মাতৃদুগ্ধ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। ইহা দূষিতজীবাণুবর্জিত বলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। জন্ম হইতে আট-নয় মাস পর্যন্ত অর্থাৎ যত দিন পর্যন্ত দাঁত না উঠে ততদিন শিশুকে মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই জন্য মাতার সব সময় তাহার নিজের শরীর যাহাতে ভাল থাকে সেদিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ; কারণ মাতার শরীর রুগ্‌ণ হইলে শিশুরও রোগ হওয়া স্বাভাবিক।

সাধারণতঃ শিশুকে ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর দিনে পাঁচ-ছয় বার খাওয়ান উচিত। শিশুর হজম-ক্রিয়া যাহাতে সুসম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য নিয়মিতভাবে শিশুকে দুধ খাওয়ান দরকার। নিয়মানুবর্তিতার অভাব হইলে শিশুর হজমের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুকে খাওয়ান উচিত নয়। তাহাতে পরিপাক-ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

শিশুকে আট-নয় মাস পর্যন্ত কেবল মাতৃদুগ্ধ পান করাইয়া অপর খাদ্য একবারেই না খাওয়ান মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এতদিন অভ্যাসের পরে হঠাৎ মাতৃদুগ্ধ ছাড়িয়া অন্য খাদ্য খাইতে

আরম্ভ করিলে শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে ধীরে ধীরে কড্‌লিভার অয়েল, কমলালেবু বা টম্যাটোর রস বা ডিমের সাদা অংশ ও হল্‌দে কুসুম প্রভৃতি খাদ্য অভ্যস্ত করাইলে ভাল।

শিশুর জন্য নিয়মিত ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তাহা না করিলে দেখা যায় শিশুদের লিভারে ব্যথা হয় যাহাকে ইন্‌ফ্যানটাইল লিভার (Infantile liver) রোগ বলে। এই ব্যাধি অত্যন্ত মারাত্মক। আর শিশুদের মধ্যে অনেক সময় ভিটামিন 'ডি'র অভাবে রিকেট (Ricket) রোগ দেখা যায়। কড্‌লিভার অয়েলের সাহায্যে রিকেট নিবারিত হয়। শিশুদের তেল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিলে শিশুরা সূর্যকিরণ হইতে ত্বকের সাহায্যে ভিটামিন 'ডি' গ্রহণ করিতে পারে।

জন্মের দুই-তিন সপ্তাহ পরে দিনে দুই-এক ফোঁটা করিয়া কড্‌-লিভার অয়েল দিয়া এক বৎসর পর্যন্ত ১$\frac{১}{২}$ চামচ করিয়া দিনে দুইবার দেওয়া যাইতে পারে। দাঁতের গঠন ও নানা প্রকার চর্মরোগের প্রতিরোধের জন্য শিশুর পক্ষে ভিটামিন 'সি' একান্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য জন্মের দুই মাস পর হইতেই শিশুকে ছোট চামচের এক চামচ করিয়া কমলালেবুর রস বা বড় চামচের এক চামচ টম্যাটোর রস দেওয়া দরকার। তার পর ধীরে ধীরে ডিমের সাদা অংশ ও কুসুম, ভিটামিন-বহুল শস্য, ফল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বাভাবিক নিয়মে একই সময়ে ধীরে ধীরে মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করিয়া অন্যান্য দ্রব্য আহারে যাহাতে শিশু অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুর আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুকে এক মাস হইতে এক বৎসর পর্যন্ত কিরূপ ভাবে ধীরে

ধীরে নূতন খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :

প্রথম মাস—আগেই বলা হইয়াছে যে, শিশুকে ঠিক একই সময়ে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর দিনে ৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার স্তন্য পান করান উচিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি প্রতি বার দুগ্ধপানের পরে কড্‌লিভার অয়েল দেওয়া উচিত।

তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে কড্‌লিভার অয়েলের পরিমাণ বাড়াইয়া চায়ের চামচের ½ চামচ করা দরকার। ধর, সকালে ৬টায় একবার দেওয়া হইল, তারপর ১০টায়, তারপর ২টায়। এইরূপে রাত্রিতেও ৬টায়, ১০টায় এবং ২টায় দিতে হয়।

দ্বিতীয় মাস—প্রতি ক্ষেত্রেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে। যাহাতে শিশুর হজমের ব্যাঘাত না হয় সেইজন্য বেশী রাত্রে শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। চায়ের চামচের এক চামচ কমলালেবুর রসে এক চামচ জল মিশাইয়া সকালে ৮টার সময় দেওয়া উচিত। কমলালেবুর রসের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া যাইতে হইবে এবং জলের অংশ কমাইতে হইবে। অনেকে মিছরির জল অথবা গ্লুকোজও দিয়া থাকেন। মাসের শেষে জলশূন্য কমলালেবুর রস দেওয়া যাইতে পারে। টম্যাটোতে ভিটামিন 'সি' থাকে। কমলালেবুর পরিবর্তে টম্যাটোও দেওয়া যাইতে পারে। তবে টম্যাটো দিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। ছোট চামচের ½ চামচ কড্‌লিভার অয়েল দিনে দুইবার দেওয়া উচিত।

তৃতীয় মাস—কড্‌লিভার অয়েলের পরিমাণ ক্রমশঃ ছোট চামচের এক চামচ হইতে বাড়াইয়া দুই চামচ খাওয়ান দরকার। কমলালেবুর রস বড় চামচের এক চামচ হইতে তিন-চার চামচ

পর্যন্ত বাড়ানো যাইতে পারে। প্রয়োজনবোধে শিশুকে অল্পপরিমাণ বিশুদ্ধ মধুও খাওয়ান যাইতে পারে।

চতুর্থ মাস—এই সময় শিশুর কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে। সেইজন্য চাউল, ওট প্রভৃতি খাদ্যশস্য উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া ছোট চামচের এক চামচ করিয়া শিশুকে সকাল ও সন্ধ্যায় খাইতে দেওয়া দরকার। এই সমস্ত শস্যজাতীয় খাদ্যে থিয়ামিন (Thiamin) নামক ভিটামিন থাকে। ইহা শিশুর দেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ক্রমশঃ এই খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রতি বারে দুই চামচ দেওয়া প্রয়োজন। আরও পরে দিনে ২টার সময় মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করিয়া উহার পরিবর্তে থিয়ামিন-বহুল খাদ্য খাওয়ান উচিত।

ডিমের সাদা অংশে ও কুসুমে ক্যাল্‌সিয়াম থাকে। ইহা শিশুর দন্ত ও অস্থি গঠনের পক্ষে সহায়ক। দিনের বেলায় এক-চতুর্থাংশ ডিমের কুসুম খাইতে দেওয়া ভাল। তারপর ক্রমশঃ পরিমাণ বাড়াইয়া ৮ মাসে শিশুকে একটি পুরা কুসুম দেওয়া যাইতে পারে।

পঞ্চম মাস—রাত্রি ১০টার সময় মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই সময় শিশুর দেহে লৌহবহুল শাকসব্‌জীর দরকার। সেইজন্য গাজর, শালগম, পালং প্রভৃতি শাকসব্‌জী জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া দুপুরে ছোট চামচের এক চামচ করিয়া দিতে হইবে। ক্রমশঃ পরিমাণ বাড়াইয়া বড় চামচের এক চামচ দিতে হইবে। কমলালেবুর রস বাড়াইয়া বড় চামচের ৪ হইতে ৫ চামচ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ মাস—এই সময় হইতে শিশুকে নানাবিধ ফল খাইতে অভ্যস্ত করানো দরকার। সেইজন্য পাকা কলা (মর্তমান হইলে ভাল হয়), আপেল, পেঁপে প্রভৃতি ফল যথেষ্ট নরম করিয়া ছোট

চামচের এক চামচ দুপুরবেলা দিলে ভাল হয়। ক্রমশঃ উহার পরিমাণ বাড়াইয়া বড় চামচের দুই চামচ করিতে হইবে। অবশ্য ইহার সহিত দুধ, কমলালেবুর রস এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় খাদ্যও থাকিবে।

সপ্তম মাস—এই সময় শিশুর কয়েকটি দাঁত দেখা দেয়। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর অনেক সময় জ্বর ও পেটের অসুখ দেখা দিতে পারে, সেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। দাঁত উঠিবার সময় শিশু শক্ত জিনিস কামড়াইতে চায়। সেইজন্য ছোট ছোট রুটির টুকরা বা অন্য কোন শক্ত দ্রব্য—যেমন এলেনবেরী রাস্ক (Allenbury Rusk) দিলে ভাল হয়। ইহাতে শিশুর ধীরে ধীরে চিবাইবার অভ্যাস গড়িয়া উঠে। সন্ধ্যা ৬টায় আলুসিদ্ধ বা অন্য কোন স্টার্চজাতীর পুষ্টিকর নরম খাদ্য দিতে হইবে।

অষ্টম মাস—এই অবস্থায় আহারের সময় সামান্য পরিবর্তন করিয়া সকালে ৭টায়, মধ্যাহ্নে ১২টায় ও সন্ধ্যা ৬টার সময় খাওয়ার অভ্যাস করাইতে হইবে।

সকালের খাবার—৬-৭ আউন্স গরুর দুধ; ২ আউন্স দুধের সহিত বড় চামচের থিয়ামিন-বহুল সিদ্ধ করা শস্যজাত খাদ্য দেওয়া ভাল। গম, ওট (oat), বরবটী, মটরশুঁটি প্রভৃতি শস্যজাত দ্রব্যে প্রচুর থিয়ামিন থাকে। ইহার সহিত ছোট এক টুকরা শক্ত রুটি দিতে হইবে। ছোট চামচের ১-১½ চামচ কড্‌লিভার অয়েল সকালের দিকে খাওয়ান খুব উপকারী।

দুপুরের খাবার—ডিমের কুসুম, বড় চামচের ২-৪ চামচ সব্‌জী সিদ্ধ। অল্প মাখন সহ ২-৪ চামচ ভাত অথবা আলুসিদ্ধ। ২-৪ চামচ কলা, আপেল প্রভৃতি নরম (সিদ্ধ করা) ফল, ৬-৮ আউন্স দুধ।

সন্ধ্যার খাবার—৮ আউন্স দুধ। বড় চামচের ৩-৫ চামচ

থিয়ামিন-বহুল শস্যজাত খাদ্য দুই আউন্স দুধ সহ খাওয়াইতে হইবে। কডলিভার অয়েল দুই-এক চামচ দিতে হইবে।

নয় মাস হইতে এক বৎসর পর্যন্ত এই রকম খাদ্যই দিতে হইবে। শুধু পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াইতে হইবে।

এই ভাবে নিয়ম করিয়া শিশুকে খাওয়াইলে তাহার পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ সহায়তা হয়। ইহা ব্যতীত শিশুর দেহ বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য যে সব দ্রব্য দরকার তাহারও সামঞ্জস্য থাকে। শিশুর জলের প্রয়োজন অত্যধিক। এইজন্য দুই আহারের ব্যবধানে শিশুকে প্রচুর পরিমাণে ফুটানো জল ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ান আবশ্যক।

মাতৃদুগ্ধের অভাবে গরুর দুধ—মা পীড়িত হইলে বা মায়ের দুগ্ধের স্বল্পতা ঘটিলে শিশুকে গরুর দুধ প্রয়োজনমত জল মিশাইয়া খাওয়ানো দরকার। গরুর দুধে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ থাকিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া এই দুধকে ফুটাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। গরুর দুধ মাতৃদুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই কারণে জলশূন্য দুধ শিশুর পক্ষে হজম করা কষ্ট। উভয় প্রকার দুগ্ধে স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ প্রায় সমান। কিন্তু মাতৃদুগ্ধে ল্যাক্টোজের (Lactose) পরিমাণ অধিক। মাতৃদুগ্ধে ল্যাক্টোজ ৬-৭% আর গরুর দুধে ৪·৫-৫%। গরুর দুগ্ধে প্রোটীনের পরিমাণ ৩·৫% আর মাতৃদুগ্ধে ২·৩%। গরুর দুধের প্রোটীন মাতৃদুগ্ধের প্রোটীন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। মাতৃদুগ্ধের প্রোটীনাংশের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী ল্যাক্‌ট-অ্যালবুমিন (Lactalbumin), কিন্তু গরুর দুধে উহার প্রায় চার-পাঁচ গুণ বেশী ক্যাসীন (Caesin) পাওয়া যায় এবং এই কারণেই গরুর দুধ হজম করা কঠিন। মায়ের দুধ ছাড়াও নানা রকম জমানো দুধ খাওয়ান চলে। বাজারে অনেক সময় জমানো দুধ, বোতলের ফড—যেমন গ্ল্যাকসো, এলেনবেরী ফুড, কনডেনসড মিল্ক

প্রভৃতি দেখা যায়। বোতলের দুধ ক্রয় করিবার সময় দেখা উচিত উহা শিশুর প্রয়োজন মিটায় কিনা। চূর্ণীকৃত দুধের পরিমাণ অনেকটা এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ—

প্রোটীন ১২.৮%	ল্যাক্টোজ—৫৫.৫%
স্নেহাংশ ৩০%	ধাতব লবণ—১.৭%

দুগ্ধ

দুগ্ধ একটি আদর্শ খাদ্য। আমাদের আহার্য দ্রব্যের ভিতরে দুগ্ধের মত হিতকারী বস্তু আর কিছুই নাই। দেহের তাপ সংরক্ষণ, মাংসপেশী, নার্ভতন্ত্র ও বিভিন্ন তন্তুর বৃদ্ধির জন্য স্নেহজাতীয় ও শর্করা-জাতীয় পদার্থ দরকার। দুগ্ধে তাহার সব কিছুই প্রায় সমপরিমাণে আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম টাটকা দুধে ৬৯ ক্যালোরা, ৩.৩ গ্রাম প্রোটীন, ৪.০ গ্রাম স্নেহজাতীয় পদার্থ, ৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে। শর্করাজাতীয় পদার্থের ভিতরে ল্যাক্টোজ (Lactose) অন্ত্রের হিতকারী জীবাণু বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শরীর ও মস্তিষ্কের কোষতন্তুর পক্ষেও ইহা হিতকর। দেহের তাপ সংরক্ষণের জন্য ও 'মাংসপেশীর কার্যে সহায়তা করিবার জন্য যে স্থৈতিক শক্তির (Potential energy) প্রয়োজন তাহা স্নেহপদার্থের ভিতরে সঞ্চিত আছে। দুধের ভিতরে ক্যাসিন (Caesin) ও ল্যাক্ট-অ্যালবুমিন (Lactalbumin) নামে দুইটি প্রোটীন আছে। ইহাকে বিজ্ঞানে 'সম্পূর্ণ প্রোটীন' বলা হয়। জীবন সংরক্ষণ ও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে ইহা খুব সহায়ক। দুধের ভিতরে স্নেহপদার্থের বিন্দুগুলি ইমালশানরূপে (Emulsified) থাকে। এই জন্য সহজেই ইহা হজম করা যায়। ইহা ছাড়াও দুধের ভিতরে খনিজ পদার্থ, ক্যাল্‌সিয়াম, লৌহ, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি ; বিভিন্ন প্রকারের

ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, এস্করবিক এসিড (Ascorbic acid), থিয়ামিন (Thiamin), রিবোফ্লেবিন (Riboflavin) প্রভৃতি সব কিছুই আছে। ইহা শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকল বয়সের ব্যক্তির পক্ষেই অমৃততুল্য। পাকস্থলীতে দুধ জমিয়া যায় বলিয়া হজম করিতে কষ্ট হয় না। ইহা দেহের কান্তি, মেধা, স্মৃতি রক্ষা করিয়া যৌবনের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে। চাউল জাতীয় শস্যের ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস ভিটামিন জাতীয় দ্রব্যের অভাব দুধের দ্বারা পূরণ করা যায়।

প্রতি ১০০ গ্রাম দুধে '১১৮ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম, ০'০৯৩ গ্রাম ফস্‌ফরাস, ০'০০০২ গ্রাম লোহ, ২'১—২'২ এস্ককরবিক এসিড (Ascorbic acid), ৪০-৬৫ মাইক্রোগ্রাম থিয়ামিন·(Thiamin), ১৯৫-২৪০ রিবোফ্লেবিন, ১৬০-২২৫ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ক্যাল্‌সিয়াম ও উল্লিখিত ভিটামিন সমূহ দেহের পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। স্বাভাবিক শিশুর দেহে বেশ প্রচুর পরিমাণে লৌহ সংরক্ষিত থাকে। জন্মের সময় দেহে লৌহের মাত্রা বেশী থাকিলে শিশু পরিপূর্ণভাবে বাড়িয়া উঠে। মায়ের দুধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায়ে মাতৃগর্ভে লৌহ গ্রহণ করিতে প্রকৃতি শিশুকে সহায়তা করে। সংরক্ষিত লৌহ হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। দুধের ভিতরে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। ইহা ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস গ্রহণ করিতে সহায়তা করে। দুধের গুণাগুণ বিচার করিয়া প্রত্যেক সভ্য দেশেই দৈনন্দিন খাদ্যে প্রচুর দুগ্ধের ব্যবস্থা আছে।

পূর্বে আমরা এক বৎসর পর্যন্ত শিশুর প্রাতঃকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় কি খাওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন ৪ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত কি ভিত্তির উপর খাদ্য-তালিকা রচনা করা দরকার সে বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

শিশুদের পক্ষে	ফল, দুধ ও সবজী হইতে শতকরা কত ক্যালোরীর প্রয়োজন
১—২ বৎসর	৭০—৮৫
২—৩ বৎসর	৬৫—৭২
৩—৪ বৎসর	৬২—৬৯
৪—৫ বৎসর	৫৯—৬৮
৬—৭ বৎসর	৫৪—৬০
৮—৯ বৎসর	৫৩—৫৮
১০—১২ বৎসর	৫১—৫৬
স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের যাহাদের ২০০০ ক্যালোরী দরকার	৪৮—৫৩
যাহাদের ২৫০০ ক্যালোরী প্রয়োজন	৪২—৪৫
নিম্ন ও মধ্য আয়ের বয়স্ক লোকদের	৩৭—৪২

৪—১২ বৎসরের শিশুদের বিভিন্ন খাদ্যের শতকরা কত ক্যালোরীর দরকার তাহার তালিকা।

বয়স	শস্যজাতীয় খাদ্য	দুধ	ফল ও সবজী	স্নেহজাতীয় পদার্থ	শর্করা ও মিষ্ট দ্রব্য	ডিম, মাংস ইত্যাদি
৪—৫	২৩—২৫	৪৫—৫০	১৪—১৮	৫—৮	২—৫	৫—৬
৫—৬	২৩—২৫	৪৫—৫০	১৪—১৮	৫—৮	২—৫	৫—৬
৬—৭	২০—২৫	৪০—৪৫	১৪—১৫	১০—১২	৩—৪	৪—৫
৮—৯	২০—২৫	৩৮—৪২	১৫—১৬	১২—১৩	৪—৬	৫—৬
১০—১২	২০—২৫	৩৪—৩৮	১৭—১৮	১৩—১৪	৬—৮	৭—৮

সুষম খাদ্যের তালিকায় বয়স্কদের কিরূপ খাদ্য-তালিকা হওয়া উচিত তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। তবে চাষী শিল্প-

মজুর, মেহনতী সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষদের খাদ্য-তালিকা বিভিন্ন ধরনের হওয়া উচিত। অত্যধিক পরিশ্রম করার দরুন তাহাদের ডাল ও অন্যান্য শস্যজাত দ্রব্য বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

কৃষিজীবী ও মেহনতী সম্প্রদায়ের খাদ্য

খাদ্যদ্রব্য	নিরামিষাশী (আউন্স)	আমিষাশী (আউন্স)	খাদ্যদ্রব্য	নিরামিষাশী (আউন্স)	আমিষাশী (আউন্স)
শস্যবর্গ	১৬	১৬	চিনি ও গুড়	২	
ডাল	৪	৪	তৈল ও স্নেহজাতীয় পদার্থ	২	
সব্জী	৩	৩			
কন্দ ও মূল	৪	৪	দুধ	১০	
পাতা ছাড়া অন্যান্য সব্জী			মাছ ও মাংস	—	
			চিনাবাদাম	১	

এই সঙ্গে $\frac{1}{8}$ আউন্স মাখন অথবা ঘি দেওয়া যাইতে পারে। যদি শ্রমিকদের টাটকা দুধ কিনিবার পয়সা না থাকে তবে তাহারা টোন্‌ড (Toned) মিল্ক বা মিল্ক পাউডার ব্যবহার করিতে পারে।

বৃদ্ধদের খাদ্যের ব্যবস্থা

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের কার্যকরী শক্তি কমিয়া যায়। দেহের পেশী পরিচালনা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও শ্লথ হইয়া আসে। দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্রুতগতিও ক্রমশঃ শ্লথ হয়। এইজন্য দেহের প্রয়োজনে ক্যালোরীর মাত্রা কমিয়া আসে। শুধুমাত্র দেহের কার্যকরী শক্তিকে অটুট রাখিবার জন্য বৃদ্ধদের খাদ্য দরকার। বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে শীঘ্রই স্থূলকায় হইয়া পড়িবে। স্থূলকায় হওয়ার

দরুন তাহার অনেক রকম রোগই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; তন্মধ্যে বহুমূত্র, রক্তের উচ্চচাপ, হৃৎপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা বেশী। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেহ সংরক্ষক নিম্নমানের ক্যালোরী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মঠ লোকের দৈনিক ২০০০ ক্যালোরীর প্রয়োজন হয়। সেই অবস্থায় ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের প্রয়োজন হয় ১৮০০ ক্যালোরী। যাহারা বেশী পরিশ্রম করে তাহাদের খাদ্যে ক্যালোরীর মাত্রা আরও অধিক হওয়া দরকার। তবে বৃদ্ধদের পক্ষে যুবকদের মত কর্মঠ হওয়া স্বাভাবিক নয়। এইজন্য তাহাদের খাদ্যে ক্যালোরীর পরিমাণ কম থাকাই বাঞ্ছনীয়।

চিনিতে ক্যালোরীর মাত্রা অধিক। এইজন্য বৃদ্ধদের খাদ্যে চিনির মাত্রা কমাইয়া দিবে। বিশেষ করিয়া বহুমূত্র-রোগীর চিনি খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। যে সব বৃদ্ধ ব্যক্তি চা-পানে অভ্যস্ত, তাঁহারা চিনির পরিবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করিতে পারেন। চিনির সঙ্গে শর্করা-জাতীয় পদার্থ—অর্থাৎ রুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতির পরিমাণও কমাইয়া দিতে হইবে। স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ কমাইয়া ভিটামিন 'এ'-বহুল শাকসব্জী দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হইবে। ফলের রসে, বিশেষ করিয়া কমলালেবু ও টম্যাটোর রসে ভিটামিন 'সি'র পরিমাণ খুব বেশী।

দাঁত ও দেহচর্মের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভিটামিন 'সি' খুব আবশ্যকীয়। ভিটামিন 'সি'র সাহায্যে দুর্বলতা, শারীরিক ক্লান্তি ও রক্তশূন্যতা দূর হয়।

বৃদ্ধবয়সে পরিপাক-গ্রন্থির ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়। এইজন্য হজমের ব্যাঘাত যাহাতে না ঘটে সেইজন্য স্নেহপদার্থের পরিমাণও অনেক কমাইয়া দেওয়া উচিত। স্নেহপদার্থ দেহের স্বাভাবিক তাপ

বজায় রাখে। এইসব পদার্থ খাদ্য হইতে বাদ দিলে বৃদ্ধের শরীরের তাপ সংরক্ষণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। এইজন্য বৃদ্ধদের ঠাণ্ডার পরিবর্তে যতদূর সম্ভব গরম খাদ্য দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর বৃদ্ধদের একবারে বেশী করিয়া না খাওয়াইয়া বার বার খাইতে দিলে ভাল হয়। দুপুর ও রাত্রির খাওয়ার ভিতর মাঝে মাঝে উষ্ণ পানীয়—দুধ, গরম চা, কোকো, বোর্ণভিটা, ওভালটিন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। এইরূপ ব্যবস্থা বৃদ্ধের কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে ও স্বাভাবিক মূত্র নিষ্কাশনেও সহায়তা করে। কোন মানুষই এক-ঘেয়ে খাদ্য পছন্দ করে না, সেইজন্য বৃদ্ধদেরও খাদ্য-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে।

যকৃতের অসুখগ্রস্ত রোগীদের খাদ্য

যে সমস্ত লোক যকৃৎ, মূত্রাশয় ও অন্ত্রের পীড়ায় কষ্ট পায়, তাহাদের খাদ্যে প্রোটীনের মাত্রা অধিক থাকা দরকার। মাছ-মাংস, ডিমের কুসুম, ঘি-মাখন ব্যতীত অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য শরীরে প্রচুর এমাইনো-এসিড দান করিয়া শরীরের তন্তুসমূহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। এই রোগীদের $\frac{১}{২}$ হইতে $\frac{১}{৩}$ ভাগ জান্তব প্রোটীন গ্রহণ করা দরকার। অপুষ্টি ও যকৃতের পীড়াগ্রস্ত এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ১২০-৩০০ গ্রাম প্রোটীন দৈনিক গ্রহণ করা দরকার।

যকৃৎ ও পিত্তরোগগ্রস্তদের খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থের মাত্রা কম হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী ৬০ গ্রাম স্নেহজাতীয় পদার্থ কমাইয়া দিলেও রোগীর পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মিবে না।

দুধ	২ কাপ
ডিম	১ টি

মাংস	৫ আউন্স
শস্যজাতীয় দ্রব্য	½ কাপ (রান্না-করা)
রুটি	৩ টুকরা
আলু	৪ আউন্স
সবুজ শাকসব্জী	৪ আউন্স
অন্যান্য তরকারী	৪ আউন্স
ফল	৮ আউন্স
লেবু জাতীয় ফল	২ আউন্স
মাখন	১ আউন্স

বহুমূত্র-রোগীর খাদ্য

বহুমূত্র-রোগীর খাদ্য-তালিকা তাহার ক্যালোরী চাহিদার উপর নির্ভর করে। ইহা রোগীর দৈহিক ওজন ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। একজন সুস্থ ও কর্মঠ ব্যক্তির পক্ষে তাহার 'আদর্শ' দৈহিক ওজনের প্রতি পাউণ্ডের অনুপাতে ২০ ক্যালোরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'আদর্শ' দেহের ওজন বলিতে বুঝায়—শরীরের উচ্চতা অনুযায়ী দেহের ওজন। সাধারণ কর্মক্ষম বহুমূত্র-রোগীর আদর্শ দৈহিক ওজনের প্রতি পাউণ্ড অনুযায়ী ১৫ ক্যালোরী হওয়া দরকার। কোন বহুমূত্র-রোগীর আদর্শ ওজন যদি ১২০ পাউণ্ড হয়, তবে তাহার ১৮০০ ক্যালোরী গ্রহণ করা উচিত।

স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত বহুমূত্র-রোগীর প্রোটীন একই রূপ হওয়া উচিত। বহুমূত্র-রোগীর খাদ্য-তালিকা প্রোটীন : স্নেহজাতীয় পদার্থ : শর্করা অনুযায়ী—৮০ : ৮০ : ১৮৫ হওয়া উচিত।

উচ্চ রক্তচাপের রোগীর খাদ্য

প্রাণীর কোষ ও তন্তুর মধ্যে কোলেস্টিরল (Cholesterol) পাওয়া যায়। যকৃৎ, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন

প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টিরল থাকে। তরিতরকারীর ভিতর কোলেস্টিরল থাকে না, তবে ইহারা কোলেস্টিরল প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে। কোলেস্টিরলের মাত্রা কমাইবার জন্য স্বাভাবিক খাদ্য হইতে ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বাদ দিলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীর উপকার হয়। এইরূপ খাদ্যের বৃহৎ ত্রুটি এই যে এইগুলি তত স্বাদযুক্ত নয়; স্নেহজাতীয় পদার্থের সুগন্ধ ইহাদের ভিতরে থাকে না।

উচ্চ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য

জ্বরের সময় দেহের তাপের আকস্মিক বৃদ্ধি ও হ্রাসের ফলে স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় হয়। এই অবস্থায় উচ্চ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য দেওয়া হয়। এক ডিগ্রী উত্তাপের বৃদ্ধিতে দেহের পুষ্টিক্রিয়া (metabolism) শতকরা তের ভাগ বাড়িয়া যায়। বিষক্রিয়ার (Toxic) দরুন দেহতন্তুর ধ্বংস হয়। ইহা নিবারণের জন্য আরও শতকরা ১০ ভাগ ক্যালোরী বাড়ানো দরকার। জ্বরের উত্তাপের আধিক্যে প্রোটীনও ধ্বংস হয়। উচ্চ ক্যালোরী সম্পন্ন খাদ্য প্রোটীন, ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যের চাহিদা মিটাইয়া থাকে।

টাইফয়েড জ্বরে দৈনন্দিন ৪,০০০ হইতে ৬,০০০ ক্যালোরীর খাদ্য দরকার। ক্ষুধা না থাকার দরুন রোগী প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য চিনি ও স্নেহজাতীয় পদার্থের সাহায্যে ক্যালোরী সরবরাহ করা উচিত। খাদ্য সব সময় নরম, তরল ও স্নিগ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ হইবার আশঙ্কা থাকে। যক্ষ্মা-রোগীকে ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উচ্চ ক্যালোরী সম্পন্ন খাদ্য দেওয়া উচিত। ইহার সহিত যেন প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে। যাহাতে খাদ্য সহজে হজম হয় এই ভাবে খাদ্য নির্বাচন করিতে হইবে।

খাদ্য-পরিকল্পনা (Meal Planning)

খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এবার বিভিন্ন খাদ্যের সমাবেশ, তাহাদিগকে রান্না করিয়া কি ভাবে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

আমরা ২৪ ঘণ্টার ভিতরে সাধারণতঃ চার-পাঁচ বার খাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান খাদ্য থাকে—প্রাতরাশ (Breakfast), মধ্যাহ্ন-ভোজন (Dinner) এবং নৈশভোজন (Supper)। আমাদের দেশে বিকালে জলখাবার প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু খাইয়া থাকেন। খাদ্য হাল্‌কা, মাঝারি কি ভারী ধরনের হইবে ইহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে।

খাদ্য-পরিকল্পনার পূর্বে পরিবার বৃহৎ কি ক্ষুদ্র, পরিবারের ব্যক্তিদের বয়স কত, তাহাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী, পরিবারের আয়, আচার-নিষ্ঠা, রুচি, ঋতুভেদ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব কিছু বিচার করিয়া খাদ্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। সর্বাগ্রে বয়সের কথা বিবেচনা করা দরকার; কারণ বৃদ্ধ ব্যক্তির রুচি, হজম-শক্তি, শরীরের চাহিদা ও শরীর গঠনের উপযোগিতা, কার্যক্ষমতা প্রভৃতি শিশুদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবুও অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অপ্রাচুর্যের দরুন বা অন্যান্য কারণে পরিবারে তিন বৎসরের শিশু ও আশী বৎসরের ঠাকুরমাকে একই খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। আর্থিক সুবিধার জন্য খাদ্য-পরিকল্পনা এইরূপ ভাবে করিতে হইবে যাহা গৃহের প্রত্যেক অধিবাসীর পুষ্টির চাহিদা মিটায়। যদি কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বতন্ত্র খাদ্য নেহাৎ আবশ্যক হয় তখন সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেই হইবে।

পরিবারের লোকদের বৃত্তি, কর্ম ও খেলাধুলার বিষয়ও চিন্তা

করিতে হইবে। যাহারা অফিসে কাজ করে, তাহাঁদের অপেক্ষা কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত দিনমজুর, চাষী প্রভৃতির দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য বেশী খাদ্য দরকার। তাহাদের খাদ্য-তালিকাও সেই ভাবে করা উচিত। যে সব মেয়ে ঘরের কাজে বা ধানের গোলাতে বেশী পরিশ্রম করে তাহাদিগকেও বেশী খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়।

গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে মায়েরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে পারেন। খাদ্য-পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা প্রধান বিবেচ্য বিষয় আর্থিক সঙ্গতি। গৃহস্থ খাদ্যের দরুন কতটা অর্থ ব্যয় করিতে পারে তাহাই সর্বপ্রথম ভাবা উচিত।

অল্প আয়ের লোকদের প্রকৃত আয়ের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করিতে হয়। এইজন্য দেহের পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ভাবে খাদ্য-পরিকল্পনা করা উচিত। অর্থের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও দরিদ্রদের ক্ষুধা-উদ্দীপক ও পুষ্টিকর খাদ্য বর্জন করা বাঞ্ছনীয় হইবে না। অনেক খাদ্য আছে যাহাদের পুষ্টিমূল্য খুব বেশী অথচ দাম সস্তা। যেখানে সম্ভব নিজের গৃহের আশেপাশে আমরা যদি সব্জী, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করি তাহাতেও আমাদের আর্থিক সমস্যার লাঘব হয়। বার মাসে বিভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকার ফল ও তরিতরকারী জন্মে। পেয়ারা, আম, জাম, লিচু, কমলা, কলা, মটরশুঁটি, গাজর, পালং, মূলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি তরিতরকারীর সাহায্যে উত্তম খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ঋতু, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতির বিভিন্নতার জন্য এক এক সময়ে এক এক খাদ্য খাইতে বেশ ভাল লাগে। শীতকালের জন্য গরম খাদ্য ও গ্রীষ্মের জন্য ঠাণ্ডা খাদ্যের প্রচলন আবশ্যক।

শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি বা গর্ভবতী নারীদের জন স্বতন্ত্র ধরনের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

আদর্শ খাদ্য-তালিকা

আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরী দৈনন্দিন বিভিন্ন সময়ের খাদ্যের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়াই আদর্শ খাদ্য-তালিকার মূল কথা।

খাদ্যের ক্যালোরী যাহাতে প্রত্যেক বারের খাদ্যে ভাগ হইয়া পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে সাধারণ বাঙ্গালীদের ২৪ ঘণ্টায় দুইবার মাত্র প্রধান খাদ্য গ্রহণ করিবার সুযোগ হয়—একবার দিনে আর একবার রাত্রে। এইজন্য খাদ্য ক্যালোরী অর্ধেক অর্ধেক করিয়া দিলে ভাল হয়। খাদ্যদ্রব্যগুলির পুষ্টি-মূল্যের সহিত উহারা চিত্তাকর্ষক, বর্ণ-বৈচিত্র্যময় ও সুগন্ধযুক্ত হওয়া দরকার।

খাদ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য, রান্না ও পরিবেশনের পারিপাট্য ক্ষুধার উদ্রেক করে ও রুচি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। খাদ্যের একঘেয়েমি, প্রত্যেক আহারের সময়ে একই খাদ্য পরিবেশন করা হইলে অনেক সময় খাদ্যের আগ্রহ ও রুচি কমিয়া যায়। বর্ণ-বৈচিত্র্য ও গন্ধের সমাবেশে যে খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করা যায়। ইহার সঙ্গে আচার জাতীয় অম্ল পদার্থ খাদ্যরুচি আনয়ন করে ও আহারে তৃপ্তি দেয়। দৈনন্দিন খাদ্যে আমরা সাধারণতঃ ভাত, ডাল, মাছ, ডিম, তরিতরকারী গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহার সহিত মাঝে মাঝে মাংসের ব্যবস্থা থাকা ভাল। ফল কাঁচা অবস্থায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে শাকসব্‌জীগুলির অধিকাংশই রান্না করা দরকার। বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করিলে স্বাদ-বৈচিত্র্য খাদ্যে আগ্রহ বাড়ায় ও তৃপ্তি দেয়।

কোমল স্নিগ্ধ গন্ধের সহিত তীক্ষ্ণ স্বাদ ও গন্ধ যুক্ত ব্যঞ্জনের সমাবেশ করিলে ভাল হয়। ভাতের সহিত পরিমিত ঝালযুক্ত ব্যঞ্জন বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। দুইটি তীব্রগন্ধযুক্ত দ্রব্য—যেমন, পেঁয়াজ ও ফুলকপি একসঙ্গে রন্ধন করা বাঞ্ছনীয় নয়। একবার আহারের সময় একই খাদ্য বার বার পরিবেশন করিলে তাহাকে ভাল পরিকল্পনা বলা চলে না।

প্রকৃতিতে এত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, ফল এবং তরিতরকারী পাওয়া যায় যে কোনমতেই বর্ণবিহীন খাদ্য পরিবেশন করা উচিত নয়। বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ সব সময়ে চিত্তাকর্ষক। টম্যাটো, স্যালাড শাক, বাদামী রঙের তরকারী, সিদ্ধ সবুজ কড়াইশুঁটি এবং আলুসিদ্ধ অথবা রঙীন গাজর, ভাজা ঢেঁড়স, বাদামী আলু বা বাদামী রঙের তরকারী অনেক চিত্তাকর্ষক।

স্বাদের জন্যই ব্যঞ্জনের বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। নরম খাদ্যের সহিত সব সময় কঠিন খাদ্যের সমাবেশ হওয়া উচিত।

বর্ণ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের আকৃতিও বিভিন্ন ধরনের হওয়া দরকার। কোপ্তা, ডালের বড়া, চাপাটী, পুডিং, কেক, চপ, কাটলেট্ প্রভৃতির আকার রুচি ও বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খাদ্য তৈয়ারীর ব্যাপারে পুষ্টি ও আকর্ষণের দিক্ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

পুষ্টিজনিত প্রয়োজনীয়তা ঃ

শক্তি	...	...	১৫
প্রোটীন	...	...	১০
খনিজ দ্রব্য (ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস ও লৌহ)		...	১০
ভিটামিন (এ, বি, সি, বি কম্‌প্লেক্স)		...	১০

সংরক্ষণকারী দ্রব্য	...	...	১০
খাদ্য নির্বাচনে পরিমাণ	...	...	১০
নির্বাচন হজমের সহায়ক কি না	...	...	১০
			৭৫

চিত্তাকর্ষক করিবার ব্যবস্থা ঃ

খাদ্য প্রস্তুতে বৈচিত্র্য আছে কি না	...	...	৫
গন্ধে আকৃষ্ট করে কি না	...	...	৫
খাদ্যের বর্ণ চিত্তাকর্ষক কি না	...	...	৫
খাদ্যে আকারের বিভিন্নতা ও পারিপাট্য আছে কি না			৫
খাদ্যের সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিধান	...	...	৫
			২৫

৭৫+২৫=১০০

গৃহিণী তাঁহার কর্মোৎসাহ, সময়, সঙ্গতি উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যয় করিয়া থাকেন। পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে পুষ্টিকর খাদ্য-পরিকল্পনা, বিবেচনার সহিত বাজার করা সব কিছুরই দায়িত্ব গৃহিণীর স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত খাদ্য গ্রহণ করিলে গৃহিণীর মনও আনন্দ এবং তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। তাঁহার আনন্দ আরও বেশী হইবে যখন তিনি জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার নির্বাচিত খাদ্যদ্রব্য পুষ্টিসম্মত।

একক হিসাবে দিনের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন সময় অনুযায়ী তাহা ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

প্রাতঃকালীন ভোজন—উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আমরা ভোরবেলা হইতেই দিনের কাজ শুরু করি। এইজন্য আমাদের আহারের প্রাথমিক ব্যবস্থা বেশ ভাল হওয়া দরকার। যদি প্রাতঃকালীন ভোজের সুব্যবস্থা হয় তবে কঠোর পরিশ্রমী লোকেরা

ভাল কাজ করিতে সমর্থ হয়। শিশুরা, মায়েরা, আফসগামা ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্তব্য ভালভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন।

প্রতি ঋতুর এক একটা ফল—পেয়ারা, আপেল, পেঁপে, আম, কলা ইত্যাদি প্রাতঃকালীন ভোজের মধ্যে থাকা উচিত। আটার রুটি, পাঁউরুটি টোস্ট বা লুচিও সঙ্গে থাকিতে পারে। অর্ধসিদ্ধ ডিম, মামলেটও বেশ মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য। শিশুদের অন্ততঃ অর্ধগ্লাস দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাদ্য খাওয়া উচিত। বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই রুটি টোস্ট ও ডিমের সহিত চা পান করেন। ইচ্ছা করিলে এক কাপ চায়ের বদলে কোকো অথবা ওভালটীন খাইতে পারেন। সম্ভব হইলে দুধ খাওয়া উচিত।

শীতের দিনে খেজুরের রসের পিঠা বা পায়েস শিশুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। মাঝে মাঝে আহারে রুচি আনয়ন করিবার জন্য এই সব পরিবেশন করা মন্দ নয়। সুজির হালুয়া, পেঁপে বা গাজরের হালুয়াও মাঝে মাঝে খাওয়া ভাল।

যে সব শিশুর কৃমি রোগ আছে তাহারা পূর্ব দিনের ভিজানো চিরতা বা কোয়াসিয়ার রস গ্রহণ করিলে অনেক উপকার পাইবে।

সকালবেলায় যাহারা ব্যায়ামচর্চা করে, তাহারা ব্যায়ামের অব্যবহিত পরে আখের গুড়ের সহিত কয়েকটা ভিজানো ছোলা এবং এককাপ দুধ খাইয়া পরে অন্য কিছু আহার্য বস্তু গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকই বিশেষ করিয়া গ্রামের লোকেরা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। তাহা ছাড়া আহারাদি ব্যাপারের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণাও নাই। গ্রামে সকালবেলা মুড়ি-চিড়ার প্রচলন আছে। খাদ্য হিসাবে মুড়ি-চিড়ার মূল্য কম নয়। দুধের সহিত মুড়ি-চিড়া খাইতেও ভাল, উপকারীও।

অনেক দিনমজুর পান্তাভাত খাইয়া কাজ করিতে যায়। ভাত নষ্ট না হইলে পান্তা খাওয়া চলে। পান্তাভাত কর্মোদ্দীপোক, উপকারীও। ভাতের পচন (Fermentation) দ্বারা অ্যালকোহল (Alcohol) জাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় ও নেশা জন্মে। গরম দেশে এবং গরম কালে অনেকে সকালবেলা ঘোল পান করেন; ইহাও অত্যন্ত উপকারী এবং উপাদেয়।

দুপুরবেলার খাবার—এই সময় আহারের পরিমাণ একটু বেশী হওয়া দরকার। আমাদের দেশে অনেককেই ১০।১১ টার মধ্যে স্কুল, কলেজ, অফিস প্রভৃতিতে দৈনন্দিন কাজে বাহির হইতে হয়। সেইজন্য ঘরে রান্না করা ভাল আহারের বন্দোবস্ত করিলে তাহাদের বেশ সুবিধা হয়। কাজকর্ম করিতেও বেশ উৎসাহ জন্মে। এই সময় ভাত, ডাল, তরিতরকারী, মাছ অথবা মাংস, ডিম, মেটুলি খাদ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। যাহারা নিরামিষাশী তাহারা আলু-কপির ডালনা, অন্য তরকারী কি ছানার ডালনা প্রভৃতি খাইতে পারেন। প্রয়োজনবোধে এক কাপ দুধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলেও ভাল হয়। আহারের পর দই কি অম্লজাতীয় পদার্থ থাকিলে বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া উপভোগ করা যায়।

যাহারা এই সময় খাইয়া যায় তাহাদের টিফিনের বেশ ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিত। টিফিনে কি কি খাদ্য থাকা উচিত তাহা পরে আলোচনা করা হইবে।

ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় দিনের খাওয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একটি জলখাবার, অপরটি মধ্যাহ্ন-ভোজন। মধ্যাহ্ন-ভোজন অপেক্ষা জলখাবার হাল্‌কা ধরনের হইয়া থাকে। জলখাবারে ডালের অথবা মাছ-মাংসের সুপ, রান্না-করা শাকসব্‌জী এবং কাঁচা শাকসব্‌জী (স্যালাড জাতীয়) অথবা অঙ্কুরিত ছোলা

বা ফলের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আহারের প্রাচুর্য থাকা উচিত। মাঝে মাঝে খাবারের সহিত মিষ্ট দ্রব্য—পিঠা, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি তালিকাভুক্ত করিলে ভাল হয়। বর্ধিষ্ণু শিশুদের, কর্মঠ বয়স্ক ও অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের ভারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এক গ্লাস দুধ, কাঁচা বা ভাজা চীনাবাদাম, অথবা ছোলা ভিজানো, ফল অথবা রুটি হইলে ভাল হয়।

সপ্তাহ অনুযায়ী খাদ্য-পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার এবং যাহাতে বিভিন্ন ঋতু অনুসারে ফল ও তরিতরকারী থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। এইরূপ ভাবে পরিকল্পনা করিলে আর্থিক সুবিধা হয়। প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভিটামিন—এই চারি প্রকারের খাদ্যদ্রব্য যাহাতে আহারের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় সেই দিকে নজর রাখিতে হইবে। আহারের বৈচিত্র্য রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। যদি ভিটামিনসমৃদ্ধ টম্যাটো না পাওয়া যায় তাহার পরিবর্তে লেবু জাতীয় ফল, অঙ্কুরিত ছোলা অথবা আমলকী ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমলকী ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মে। ইহার নানাবিধ গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে তাহারা দুধ, ডিম প্রভৃতি উচ্চস্তরের প্রোটীনের আরও ব্যবস্থা করিতে পারেন।

নৈশ ভোজন—অনেকটা দুপুরবেলার অনুরূপ। তবে দুপুরের খাদ্যের তুলনায় রাত্রের খাদ্য লঘুপাক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে রাত্রে ভাতের পরিবর্তে রুটি খাওয়া ভাল।

সাত দিনের একটি খাদ্য-তালিকা পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

সাত দিনের খাদ্য-তালিকা

প্রাতরাশ

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
অঙ্কুরিত ছোলা, কলা, আটার রুটি, মাখন অথবা পাঁউরুটি টোস্ট, ডিম, দুধ।	চীনাবাদাম, কমলালেবু, চিড়া, মুড়ি, ডিম, ডাল-মুট, দুধ।	কড়াইশুঁটি, পেঁপে, ডিম, দুধ, রুটি, (লমন-জেলি) অথবা হালুয়া।	ছোলা, আম, স্যাণ্ডউইচ অথবা চিড়া, মুড়ি, ডিম, দুধ, অঙ্কুরিত ছোলা।	চীনাবাদাম, আপেল, লিচু, লুচি বা পুরী, আলুর দম, দুধ।	ছোলা, পেয়ারা, ডিম, ডালের খুপ, দুধ।	কিসমিস, শশা, আপেল, সুজি, ডিম, দুধ, মাখন, রুটি।

মধ্যাহ্ন-ভোজন

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
ডাল, ডালের বড়া, মাংস বা মেটুলি, কাঁচা টম্যাটো, রুটি অথবা ভাত, পাঁপর, আলুর দম বা যে কোন আচার।	ডাল, ধোঁকা ও ডাল বা মাছ, ডিম, ভাত বা রুটি, পাঁপরভাজা, চাটনী।	ডাল, পোস্ত বড়া, মাংস, রুটি বা ভাত, আলুভাজা, কাটা শশা, তরকারী (শাকসব্জী) দই।	ডাল, ডিম বা মেটুলি, পালংশাক, কাঁচা গাজর বা ছানার-ডালনা, রুটি বা ভাত, যে কোন ভাজা, চাটনী।	ডাল, মাংস বা মেটুলি, টম্যাটো, ভাত বা রুটি, তরকারী (শাকসব্জী), আচার।	ডাল, বাঁধাকপি, ভাত অথবা রুটি, আচার, দই, মাছ অথবা ডিমের ডালনা, বড়ি, পোস্ত।	ডাল, ভাজা, কুমড়া অথবা লাউর তরকারী, রুটি অথবা ভাত, মাছ, আচার।

নৈশ ভোজন

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
ডাল, বেগুন ভাজা, রুটি অথবা ভাত, তরকারী, আচার।	ডাল, পাঁউরুটি অথবা ভাত, যে কোন ভাজা, মাংস ব মেটুলি, পায়েস।	ডাল, পোস্ত বড়া, ফুলকপি, রুটি অথবা ভাত, ডিমের কারী।	ডাল, সিম, বরবটি, আলু ভাজা, রুটি বা ভাত, মাছ, আটার পুডিং অথবা ক্ষির।	ডাল, আলু, কড়াইশুঁটি অথবা ছোলা, রুটি অথবা ভাত, মাংস ও আচার।	ডাল, বাঁধাকপি বা যে কোন তরকারী, ভাত অথবা চাপাটি, ডিম বা মেটুলি, দই।	ডাল, লাউ অথবা কুমড়া, রুটি অথবা ভাত, মাছ, মেটুলি, হালুয়া।

মাঝে মাঝে খাওয়া

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
চীনাবাদাম, মাখন, বিস্কুট, টম্যাটো।	ছোলা ভাজা, মুড়ি, ছানা।	কলা, কড়াইশুঁটি-ভাজা, শশা।	রাঙ্গা আলু সিদ্ধ, মুড়ি, কড়াইশুঁটি।	সিদ্ধ ছোলা, ছানা, পেঁপে।	মুড়ি, নারকেল বা গুড়, টম্যাটো।	কলা, ছানা, মাখন, বিস্কুট।

বয়স্ক লোকেরা প্রয়োজনমত চা, কফি বা কোকো খাইতে পারেন। নানা প্রকারের ডাল—মসুর, ছোলা, অড়হর, মুগ, মাষকলাই, মটর—বাজারে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এইসব ডাল বদলাইয়া দিলে ভাল হয়। প্রয়োজনমত এবং ব্যক্তিগত রুচি অনুয়ায়ী প্রত্যেকেই খাদ্য-তালিকা তৈয়ারী করিতে পারেন।

জিনিসপত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা

পূর্ব হইতেই মাসের বা সপ্তাহের বাজেট ঠিক করিয়া বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিলে দামে সুবিধা পাওয়া যায় এবং খাদ্য-তালিকা উন্নত ধরনের হইতে পারে। কোন কোন বাজারে শুধু শাক-সব্জী ও তরিতরকারী পাওয়া যায়, কোথাও চাউল, আটা, ময়দা, আবার কোথায়ও মাছ-মাংস পাওয়া যায়। আহারের দ্রব্যগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া সেই ভাবে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিলে অর্থের দিক হইতে অনেক সুবিধা হয়। বাজার করিবার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

১। অপরকে বাজার করিবার ভার না দিয়া যথাসম্ভব নিজে বাজার করিবে।

২। বিভিন্ন দোকানের জিনিসপত্রের গুণ ও মূল্য বিচার করিয়া ক্রয় করিবে।

৩। যে ঋতুতে যে রকম ফল বা তরকারী পাওয়া যায় ঠিক সেইগুলিই ক্রয় করিবে।

৪। বেশী ভিড়ের মধ্যে জিনিস না কিনিয়া সপ্তাহের হাটে বা বাজারে জিনিস ক্রয় করা ভাল।

৫। বেশী করিয়া জিনিস ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

৬। সব সময় টাটকা তরিতরকারী, ফল, ডিম ও মাংস কিনিবে।

৭। কো-অপারেটিভ ফার্ম, ডেয়ারী ফার্ম অথবা কৃষিজাত গোলা হইতে জিনিস কিনিলে বেশ টাটকা জিনিস সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

৮। বাকী খরিদ করার পরিবর্তে নগদ দামে জিনিস কিনিলে অনেক সময় সুবিধা হয়।

৯। ওজন করিয়া জিনিস কেনা ভাল। দোকানদারের বাটখারা ঠিক আছে কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে।

১০। চাউল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, কুমড়ো প্রভৃতি জিনিস প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য ভালভাবে সঞ্চিত রাখা প্রয়োজন।

১১। ডিম অথবা মাংস খুব বেশী মহার্ঘ হইলে তাহাদের পরিবর্তে অন্য জিনিস ব্যবহার করা চলিতে পারে।

১২। প্যাকেটের উপর লেবেল আঁটা থাকিলে তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবে যে তাহার ভিতর কি আছে।

চা-পানের পরিকল্পনা

বর্তমান সময় ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে অনেকেই সকালে ও সন্ধ্যায় চা-পানে অভ্যস্ত। ছোট ছেলে-মেয়েদের চা না দেওয়াই ভাল। কারণ চায়ের কিছুটা মাদকতা আছে। একবার চা-পানের নেশা হইলে চা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। বেশী কড়া চা পান করিলে অনেক সময় যকৃতের পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে। চায়ের ট্যানিক এসিড (Tanic Acid) শরীরের পক্ষে ভাল নয়। তবে অল্প পরিমাণে লঘু চা দুধ সহযোগে পান করা যাইতে পারে। চা সাময়িক ভাবে কর্ম করিবার প্রেরণা যোগায়। খুব ক্লান্ত অবস্থায় চা খাইলে

শরীরের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়। খালি পেটে চা খাওয়া মোটেই উচিত নয়। আজকাল চায়ের সঙ্গে সাধারণতঃ বিস্কুট, হাতরুটি দেওয়া হয়।

এই বিস্কুটগুলি যাহাতে মিয়াইয়া না যায় সেইজন্য বায়ুরুদ্ধ (air-tight) টিনসমেত বিস্কুট কেনা উচিত। কাগজের প্যাকেটের বিস্কুট প্রায়ই মিয়াইয়া যায়, সেইজন্য কাগজের প্যাকেটের বিস্কুট না কেনাই ভাল। বিস্কুট মাখনের সহিতও খাওয়া যাইতে পারে। বিস্কুট ছাড়া মাখন-মাখানো টোস্ট বা জেলি-মাখানো রুটি ও ডিম চায়ের সঙ্গে ভাল লাগে। কেক বা প্যাস্ট্রি (Pastry)ও চায়ের সহিত দেওয়া চলে। ঘি-মাখানো মুড়ি অথবা নারিকেলের সহিত মুড়ি ও চিনি চায়ের সহিত পরিবেশন করা যাইতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন প্রকারের চা-এর ভিতর দার্জিলিং চা-এর গন্ধ (flavour) ও আসাম চা-এর রঙ (liquor) ভাল। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎকৃষ্ট চা তৈয়ারী হয়।

চা-এর জল বেশী ফুটাইলে চা সুস্বাদু হয় না, আবার কম ফুটাইলেও চা ভাল হয় না। এইজন্য পরিমিত উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া গরম জল চীনামাটির পাত্রে রাখা চা-এর পাতার উপর ঢালিলে ভাল গন্ধযুক্ত চা তৈয়ার করা যাইতে পারে।

চা-এর সঙ্গে সাধারণতঃ হাল্‌কা খাবারেরই বন্দোবস্ত করা হয়। অনেকে আবার অপরের দুধ-চিনি দেওয়া চা পছন্দ করে না। তাহাদের কাছে চা-এর লিকার (liquor), দুধ, চিনি ট্রেতে করিয়া সাজাইয়া দিলে তাহারা তাহাদের রুচি ও প্রয়োজনমত দুধ-চিনি দিয়া চা তৈয়ার করিতে পারে। বর্তমান সামাজিক জীবনের প্রধান অঙ্গ চা, ইহা অনস্বীকার্য। এইজন্য চা-এর সঙ্গে

সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যাহাতে সু ের সম্পন্ন হয় সেই দিকে সুগৃহিণীর সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার।

জলখাবার (Tiffin)

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ও অফিসে যাঁহারা চাকরি করেন তাঁহারা ১০-১১টার সময় স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে যান, আর ৪-৫টার সময় ফিরিয়া আসেন। সেইজন্য কাজের অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁহাদের টিফিনের প্রয়োজন হয়। টিফিনের ব্যবস্থা না করিলে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয় এবং কর্মে নিরুৎসাহ ও অনিচ্ছা জন্মে। কর্মস্থলে রান্নার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এইজন্য অফিসে স্কুলে, কলেজে ছেয়েমেয়েদের টিফিন বাক্স বা টিফিন-ক্যারিয়ারে করিয়া লইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মচারী বা ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সস্তাদরে ক্যান্টিন (Canteen) খুলিয়া থাকেন। কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকার দরুন ক্যান্টিনের ব্যবস্থা-কারীরা খাদ্যে ভেজাল মিশাইতে পারে না। তবুও যাঁহারা পারেন তাঁহাদের গৃহে তৈয়ারী খাবার গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা বাড়ীতে থাকেন তাঁহাদেরও বিকালবেলা জলখাবার খাওয়া উচিত। কারণ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, নৈশ-ভোজনের মাঝে অনেকটা সময়ের ব্যবধান। প্রায় আট-নয় ঘণ্টা একটানা না খাইলে ক্ষুধায় শরীরে ক্লান্তি আসে এবং স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়।

টিফিনের খাবার মাঝামাঝি ধরনের হওয়া উচিত। দুই-তিন ঘণ্টা একটানা কাজের পর ক্ষুধা পায়। সেই সময় জলখাবার না পাইলে কর্মে উৎসাহ থাকে না। টিফিনের সময় যাঁহারা চা-পানে অভ্যস্ত, তাঁহারা চা ছাড়া কফি, কোকো, ওভালটীনও গ্রহণ করিতে পারেন। টিফিনে পরটা, লুচি, টোস্ট, আলুর দম বা মাংস খাওয়া

যাইতে.পারে। ডিমের ভিতর উৎকৃষ্ট প্রোটীন পাওয়া যায় বলিয়া ডিম সিদ্ধ বা মামলেট্ ইত্যাদি চলিতে পারে। গরমের দিনে স্নিগ্ধ পানীয়—ঘোল, সরবৎ বা আইসক্রীমও প্রয়োজনমত গ্রহণ করা যাইতে পারে। নারিকেল বা দই মুড়ি-চিঁড়ার সহিত খাওয়া উপকারী এবং দামেও সস্তা। কিছু কিছু ফল খাওয়াও প্রয়োজন।

ক্যান্টিনে চপ, কাটলেট্, মাংস প্রভৃতি সব কিছুই খাওয়া যায়। রুচি অনুযায়ী সে সব জিনিসও মাঝে মাঝে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চিনির সঙ্গে ছানাও বেশ পুষ্টিকর। বৃদ্ধ, যুবা, বালক সকল বয়সের লোকের পক্ষেই ছানা হিতকর।

খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার সময় প্রত্যেকের আয়, প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। তবে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচনের প্রতিই সর্বাগ্রে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা উচিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শৈশব হইতে কৈশোরের প্রান্তসীমা পর্যন্তই মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক অগ্রগতি হইতে থাকে। যৌবনে দৈহিক বৃদ্ধি বিশেষ হয় না, কিন্তু যৌবনই মানুষের কর্মের শ্রেষ্ঠ কাল বলিয়া শক্তিক্ষয় হয় যথেষ্ট। আবার বৃদ্ধদের দেহের বৃদ্ধি নাই, কাজও কম, সেজন্য শক্তিক্ষয়ও হয় খুব সামান্য। কাজেই খাদ্য-পরিকল্পনার সময় শিশুদের এবং কিশোরদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক খাদ্য নির্বাচন করিতে হইবে। যুবকের খাদ্য আবার তেমনি দৈহিক ক্ষয়পূরণের উপযুক্ত হওয়া দরকার। সেইজন্যই বয়স, আবহাওয়া, দৈহিক প্রয়োজন ও শ্রমের তারতম্য বিবেচনা করিয়া খাদ্য-পরিকল্পনা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন তো আছেই। স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা রক্ষা মানুষের জীবনের প্রধান কর্তব্য। কাজেই খাদ্য-পরিকল্পনায় তৎপ্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া

প্রয়োজন। ব্যক্তিগত রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান ঐগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিলেই ভাল। যে খাদ্যে এইসব দিকে নজর দেওয়া হয় সেইগুলিই সুষম খাদ্য, অর্থাৎ যে খাদ্যে দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা দান করে এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় তাহাকেই সুষম খাদ্য বলা হয়।

যে কোন সুস্থ লোকের পক্ষে প্রতিদিন ভোরবেলা অন্য কিছু খাওয়ার আগে ভিজানো ছোলা (অঙ্কুরিত) বা মুগ আখের গুড়ের সহিত খাওয়া খুব উপকারী।

কচি শিশুর আহারের তালিকা

অতি প্রত্যূষে :—মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ।

সকালবেলা :—কমলালেবুর রস বা টম্যাটোর রস, মাছের লিভারের তেল (যেমন—কড্‌লিভার অয়েল) ইত্যাদি কিংবা ভিটামিন 'ডি'-যুক্ত অন্য কিছু।

দুপুরবেলা :—মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ।

বিকালবেলা :—মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ, কমলালেবুর রস বা টম্যাটোর রস। বিকালবেলা শিশুকে বেশী জলপানে উৎসাহ দিতে হইবে।

সন্ধ্যাবেলা :—মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ।

রাত্রিবেলা :—মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ। তবে শিশু যদি জাগিয়া না থাকে তবে না খাওয়াইলেও চলিবে।

শিশুর জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে কমলালেবুর রস, মাছের লিভারের তেল বা ভিটামিন 'ডি'-যুক্ত অন্য কিছু দেওয়া চলিতে পারে। ভেজিটেবল সুপও বেশ উপকারী। তার পরে ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে ক্রমে ক্রমে সামান্য পরিমাণ ভাত বা গম, ডাল,

ডিমের কুসুম, সবুজ এবং হলুদ শাকসব্জী, ফল, মাংস, আলু, রুটি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া ভাল। আমাদের দেশের মুড়ি-চিঁড়াও ভাল। শিশুর দাঁত উঠিলে শুক্‌না রুটি চিবাইতে দেওয়া দরকার। বেশীর ভাগ শিশুই পাকা কলা ও আপেল (চাঁচিয়া), পেঁপে খাইতে পারে। প্রথম দিকে মাংসের ছিবড়া খাইতে দিতে নাই। একবৎসর বয়সে শিশু একটা গোটা ডিম খাইলে খাইতে পারে। শিশুর খাদ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করিতে হয়। নূতন খাদ্য প্রথমে অল্প পরিমাণে দিয়া শিশুর পছন্দ হইলে আবার তাড়াতাড়ি ঐ খাদ্যই দিতে হয় যাহাতে শিশু ঐ খাদ্যের সহিত পরিচিত হইতে পারে। যে খাদ্য খাইতে চায় না কয়েক দিন বাদে আবার ঐ খাদ্য দিয়া অভ্যাস করাইতে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়, তবে জোর করা উচিত নয়।

২ বৎসর বয়সের শিশুর খাদ্য

প্রাতরাশ ঃ—কমলালেবু, টম্যাটো, পেঁপে, আম ইত্যাদি যে কোন ফলের রস, এক কাপ দুধ (চিনি সহ), রুটিমাখন বা চিঁড়া-মুড়ি, সন্দেশ বা ছানা, জেলি-স্যাণ্ডউইচ বা ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ।

মধ্যাহ্ন-ভোজন ঃ—অল্প পরিমাণে রুটি বা ভাত, ডাল, মাছ বা ডিম, তরিতরকারী। মেটে সিদ্ধও খুব উপকারী। এক কাপ দুধ। শিশুদের পক্ষে ডিমের পোচই উপকারী।

জলখাবার (বিকালে) ঃ—এক কাপ দুধ, বিস্কুট বা রুটিমাখন, একটু ফল, বাদাম, সন্দেশ। আলু বা রাঙ্গা আলু সিদ্ধও চলিতে পারে। ফলের বা ভেজিটেবল স্যালাড, পায়েস এইগুলি শিশুর উপাদেয় খাদ্য।

নৈশ-ভোজন ঃ—দুধ, ভাত বা রুটি, মাছ, মাছ বা মাংসের সুপ

অথবা ডালের স্যুপ। ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে ভাত না দিয়া চিঁড়ার মণ্ডও দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিবারেই শিশুদের খাবার অল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত। সেজন্য বারে বারে খাওয়ান দরকার।

কড্‌লিভার অয়েল বা অন্য কোন মাছের লিভারের তেল এখনও খাওয়াইতে হইবে।

৪ বৎসর বয়সের শিশুর খাদ্য

প্রাতরাশঃ—এক কাপ দুধ, ফল, দুই টুকরা রুটি টোস্ট (মাখন সহ), বা ঘি-মাখন রুটি, চিড়া, মুড়ি (দুধ, দই, বা নারিকেল সহযোগে), ছানা বা সন্দেশ, ডিমের পোচ বা অর্ধসিদ্ধ ডিম, জেলি-স্যাণ্ডউইচ বা ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ।

মধ্যাহ্ন-ভোজনঃ—রুটি বা ভাত, ডাল, মাছ বা ডিম বা মাংস, তরকারী, আলুসিদ্ধ বা ভাজা, (যে কোন) সিম, বরবটি বা কড়াই-শুঁটি সিদ্ধ, দুধ বা দই। মাঝে মাঝে মেটে সিদ্ধ দেওয়া ভাল।

জলখাবারঃ—এক কাপ দুধ, গাজর তিন-চার টুকরা, রুটি-মাখন বা ঘি-মাখান রুটি দুই টুকরা, হালুয়া (সুজি বা গাজরের), যে কোন ফল, ছানা বা সন্দেশ, ফল বা ভেজিটেবল স্যালাড, পায়েস ইত্যাদি।

নৈশ-ভোজনঃ—রুটি বা ভাত, ডাল, মাছ বা মেটে, যে কোন তরকারী, দুধ। মাঝে মাঝে মাংসের স্যুপ দেওয়া ভাল।

শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। সেই অনুপাতে শস্যজাতীয় খাদ্য, রুটি, মাখন, ঘি ইত্যাদি, আলু এবং অন্যান্য খাদ্যও বাড়ান দরকার। প্রোটীন, ভিটামিন, মিনারেল প্রভৃতির বাড়তি চাহিদা মিটাইবার জন্য বারে বারে আরও বেশী পরিমাণে ফল, ডিম, মাছ, মাংস, তরিতরকারী দেওয়া প্রয়োজন।

প্রধান খাদ্যের মাঝে মাঝে ফল, দুধ, রুটিমাখন, বাদাম, চিঁড়া, মুড়ি ইত্যাদি যে কোন একটি খাইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের রুচি বিভিন্ন, ক্ষুধাও সমান নয়। কাজেই প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদান সহযোগে খাদ্য-পরিকল্পনা তৈয়ারী করা বাঞ্ছনীয়। শিশুরা সাধারণতঃ সাদাসিধা খাদ্যই পছন্দ করে ; যেমন আলুসিদ্ধ, আলুভাজা, আলুর পায়েস বা আলু-দুধের সুপ, তরিতরকারী (মাখন বা ঘি সহযোগে), ফল, ফলের স্যালাড, ভেজিটেবল স্যালাড, পায়েস ইত্যাদি।

দাঁত উঠিবার পরে শিশুকে ফলের রস না দিয়া ফল গোটা অথবা কাটিয়া দেওয়া উচিত।

মাঝে মাঝে টম্যাটো-সস্ ও আপেল-সস্ দিলে রুচি পরিবর্তন হয় এবং স্বাদও ভাল লাগে।

৯-১০ বৎসরের ছেলেমেয়েদের খাদ্য

প্রাতরাশ ঃ—দুধ এক কাপ, মাখন, ঘি বা জেলিসহযোগে টোস্ট, বা জেলি-স্যাণ্ডউইচ বা যে কোন স্যাণ্ডউইচ অথবা রুটিমাখন, টম্যাটোর রস, যে কোন ফল, দুধ বা দই সহযোগে চিঁড়া-মুড়ি কিংবা বাদাম, ছোলা বা কড়াইশুঁটি সহযোগে চিঁড়াভাজা বা মুড়ি, হালুয়া ইত্যাদি, ছানা, সন্দেশ যাহা সম্ভব।

মধ্যাহ্ন-ভোজন ঃ—ভাত, ডাল, মাছ বা ডিম, মেটে বা মাংস, যে কোন শাকসব্জীর তরকারী, যে কোন ভাজা, দুধ, দই অথবা চাট্‌নী। ভেজিটেবল স্যালাড, ফলের স্যালাড, আইসক্রিম, পায়েস বা পুডিং।

জলখাবার ঃ—দুধ এককাপ, যে কোন ফল, স্যাণ্ডউইচ, ছানার সন্দেশ, রুটি-মাখন বা রুটি-তরকারী, যে কোন স্যালাড বা পায়েস,

যে কোন হালুয়া। বাদাম বা ছোলা ইত্যাদি সহযোগে চিঁড়ামুড়ি, বা চিঁড়ার মোয়া (গুড় সহযোগে তৈয়ারী), নারকেল বা নারকেল নাড়ু, মুড়ি ইত্যাদি

নৈশ-ভোজন :—ভাত বা রুটি, ডাল, মাছ বা ডিম কিংবা মেটে, যে কোন ভাজা বা আলু, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি, যে কোন সব্জী সিদ্ধ, দুধ, বা পুডিং, মাছ, মাংস। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শিশুদের মতই প্রধান প্রধান খাদ্যগুলি দেওয়া প্রয়োজন, তবে তাহার পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে বাড়াইতে হইবে।

এই সময়ে ছেলেমেয়েরা পরিবারের সাধারণ খাদ্যও হজম করিতে পারে। তবে খাদ্য যাহাতে সুস্বাদু, মনোরম এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হয় সে বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছেলে-মেয়েদের আকৃষ্ট করে এরূপ খাদ্য পরিবেশন করিয়া ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হইবে।

১৩-১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের খাদ্য

প্রাতরাশ :—দুধ এক কাপ, অর্ধসিদ্ধ ডিম, টোস্ট বা রুটি (মাখন বা ঘি সহযোগে), জেলি-টোস্ট, যে কোন ফল, ছানার সন্দেশ, যে কোন হালুয়া, স্যাণ্ডউইচ, খই-চিঁড়া-মুড়ি বাদাম ইত্যাদি সহযোগে বা দই-দুধ সহযোগে।

মধ্যাহ্ন-ভোজন :—ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম বা মেটে, ভাজা বা সিদ্ধ, যে কোন শাকসব্জীর তরকারী, অম্বল বা চাট্‌নী, দুধ অথবা দই। ভেজিটেবল বা ফলের স্যালাড, আইসক্রীম বা পায়েস বা পুডিং।

জলখাবার :—দুধ এক গ্লাস, যে কোন ফল, স্যাণ্ডউইচ, ছানা বা সন্দেশ, রুটি-মাখন বা রুটি-তরকারী, যে কোন হালুয়া বা পায়েস বা

পুডিং, যে কোন সালাড, নারকেল বা নাড়ু সহযোগে চিঁড়া, খই, মুড়ি, খই বা চিঁড়ার মোয়া, ছোলা, বাদাম, কড়াইশুঁটি সহযোগে চিঁড়াভাজা বা মুড়ি, ভেজিটেবল বা মাংসের স্থপ।

নৈশ-ভোজন ঃ—ভাত বা রুটি, ডাল, মাছ বা ডিম, মাংস বা মেটে, যে কোন ভাজা বা সিদ্ধ, যে কোন শাকসব্জীর তরকারী, দুধ বা পুডিং। ভেজিটেবল বা মাংসের বা মাছের স্থপ।

এই বয়সে একটু বেশী শক্তিক্ষয় হয় বলিয়া বেশী খাদ্যের প্রয়োজন। এই সময় মেয়েদের প্রোটীন ও লৌহবহুল খাদ্য এবং রক্তের লালকণিকা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এরূপ খাদ্য অধিক পরিমাণে দেওয়া প্রয়োজন।

গরমের সময় মাঝে মাঝে সকালে বা বিকালে ঘোলের বা লেবুর সরবৎ, টম্যাটো, কমলালেবুর সরবৎ খাওয়া ভাল। খুব বেশী গরমে আম-পোড়ান সরবৎও খুব উপকারী। ফল টাটকা বা শুক্‌না দুই রকমেরই উপকারী। আমাদের দেশে নারকেলের ও ছানার নানা রকম মিষ্টি খাবার তৈয়ারী হয়। খাওয়ার শেষে ঐ জাতীয় কোন খাবার থাকিলে তৃপ্তি হয়।

টম্যাটো-সস বা আপেল-সস্‌ও মুখরোচক। জলখাবারের সহিত মাঝে মাঝে ভেজিটেবিল চপ, কাটলেট বা মাংসের চপ-কাটলেট, সিঙ্গাড়া, কচুরী, নানা রকমের পিঠা ইত্যাদি দিলে মুখ বদলায় ও খাবার আগ্রহ বাড়ে।

এই খাদ্য-তালিকা মোটামুটিভাবে দেওয়া হইল। কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত খাদ্য নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা আছে। একই উপাদান বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায়। কাজেই প্রত্যেকের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করাই বাঞ্ছনীয়।

শিশু জন্মিবার পূর্বে ও পরে মায়ের খাদ্য-ব্যবস্থা

শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন মায়ের নিকট হইতেই শিশু খাদ্য পায়। গর্ভস্থ শিশুর দেহগঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান মায়ের খাদ্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐ সময়ে মায়ের শারীরিক কতগুলি পরিবর্তনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়। সুতরাং মায়ের খাদ্য এমন হওয়া উচিত যাহা মা ও শিশু উভয়ের প্রয়োজন পূরণ করে। দেখা যায়, যে মায়েরা এই সময়ে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের গর্ভপাত বা অকাল-প্রসব হয় না, প্রসবকালীন কষ্ট খুব কম হয় এবং প্রসবান্তে খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য ফিরিয়া আসে। শিশুরাও বেশ সুস্থ সবল হয়। যদি ওজন কম না হয় অর্থাৎ সুস্থ সবল স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় প্রথম ছয় মাস খাদ্যের ক্যালোরি পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, বরং এই সময়ে তাহার খাদ্যে গুরুপাক মিষ্ট দ্রব্য, সুরুয়া (ঝোলজাতীয়) এবং উচ্চ ক্যালোরি-বহুল খাদ্য কমাইয়া আরও দুধ, ফল ও শাকসব্‌জী (যাহাতে ক্যালোরির পরিমাণ না বাড়ে) দেওয়া উচিত।

গর্ভিণীর পক্ষে প্রোটীন অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ ইহা তাহার নিজের শরীরের ক্ষয় পূরণ করে এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। শিশুকে স্তন্যদানের জন্য মায়ের শারীরিক প্রস্তুতি ও স্তন্যসঞ্চারেও প্রোটীনের প্রয়োজন। খাদ্যে প্রোটীন কম হইলে অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্যেরও অভাব হয়, কারণ উচ্চ প্রোটীন-বহুল খাদ্যে দরকারী ভিটামিন ও মিনারেল্‌ও থাকে। এই সময়ে নারীদের অন্ততঃ এক সের দুধ (কিংবা দুধের সমান কিছু), একটি ডিম, এবং প্রচুর মাছ-মাংস প্রতিদিন গ্রহণ করা উচিত। যাহাদের পক্ষে এইগুলি দেওয়া সম্ভব নয় তাহারা ইহার বদলে সস্তা

প্রোটীন খাদ্য—যেমন গুঁড়া বা শুক্‌না দুধ, সয়াবিনচূর্ণ, শুক্‌না মটর, কড়াইশুঁটি, চিনি, শস্যজাতীয় কিছু, রুটি ইত্যাদি প্রতিদিনের খাদ্যে গ্রহণ করিতে পারে। দুগ্ধে প্রোটীন ছাড়া ক্যাল্‌সিয়ামের পরিমাণও প্রচুর। শিশুর হাড়, দাঁত ও অন্যান্য দেহতন্তু (tissues) গঠনে এবং তাহার জীবনী শক্তি ও রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জনের জন্য গর্ভিণীর খাদ্যে যথেষ্ট ক্যাল্‌সিয়াম থাকা অত্যাবশ্যক। জন্মের দুই-তিন মাস আগে শিশু তাহার মায়ের নিকট হইতে প্রধানতঃ ক্যাল্‌সিয়াম আহরণ করে।

প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ মায়ের খাদ্যে না থাকিলে শিশুর জন্য মায়ের প্রয়োজনীয় অংশ ব্যয়িত হইয়া মায়ের রক্তশূন্যতা আসিতে পারে। ক্যালসিয়ামের মত লৌহও শিশুর জন্মের দুই-তিন মাস আগে শিশু মায়ের নিকট হইতে আহরণ করে। কাজেই লৌহের পরিমাণ কম হইলে শিশুরও রক্তশূন্যতা হওয়ার ভয় থাকে। যেসকল প্রোটীনবহুল খাদ্যে লৌহ থাকে সেগুলি ছাড়াও গর্ভিণীর প্রতিদিনের খাদ্যে সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্‌জী এবং অন্যান্য লৌহবহুল খাদ্য থাকা উচিত।

মায়ের খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ কম হইলে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বর্ধিত হইয়া (enlarged) মা ও শিশু উভয়েরই গলগণ্ড রোগ (Goitre) হইতে পারে। এই জন্য গর্ভিণীর খাদ্যে আয়োডাইস্‌ড সল্ট (Iodized salt) কিংবা মাঝে মাঝে সমুদ্রজাত কোন খাদ্যদ্রব্য থাকা ভাল।

গর্ভাবস্থায় ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তাও অত্যন্ত বেশী। ভিটামিন 'এ'-বহুল খাদ্য নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ভিটামিন 'ডি'-র অভাব হইলে হাড় স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে পারে না। অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' (ভিটামিন 'ডি' শরীরকে ক্যাল্‌সিয়াম ও

ফস্‌ফরাস সরবরাহে সাহায্য করে) সরবরাহের জন্য চিকিৎসকগণ মাছের লিভারের তেল বা ঐজাতীয় কিছু ব্যবস্থা দেন।

যথেষ্ট প্রোটীনবহুল খাদ্যে 'বি' ভিটামিন বেশ থাকে। হোলগ্রেন (whole grain) কিংবা এনরিচড্‌ (enriched) রুটি এবং শস্যজাতীয় খাদ্য খাইলে 'বি' ভিটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রচুর পরিমাণে লেবুজাতীয় ফল, টম্যাটো এবং ভিটামিন 'সি'-বহুল খাদ্য প্রতিদিন গর্ভিণীকে দিতে হইবে। কার্বোহাইড্রেটবহুল এবং রাইবোফ্লেবিন, নিয়াসিন ও থিয়ামিনযুক্ত খাদ্যকেই হোলগ্রেন এবং এনরিচ্‌ড খাদ্য বলে। অধিক পরিমাণে খাইলেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ; উপযুক্ত, সহজপাচ্য এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য খাইলে তবেই মায়ের শরীর সুস্থ থাকে।

নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি মা নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন গ্রহণ করিলে আহার্য যথোপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায়।

দুধঃ—গর্ভাবস্থায় এক কোয়ার্ট এবং শিশুর জন্মের পরে দেড় কোয়ার্ট। ইহার কিছুটা রান্না করিয়া বা পনীর অথবা আইসক্রীম (বাড়ীতে তৈয়ারী) হিসাবেও খাওয়া যাইতে পারে।

শাকসব্‌জী ও ফলঃ—ফলের রস দিনে মোটামুটি ছঁয়বার গ্রহণ করা উচিত। ইহার মধ্যে অন্ততঃ একবার সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্‌জী অথবা গাঢ় হলুদ শাকসব্‌জী এবং একবার বা দুইবার ভিটামিন 'সি'-বহুল ফল কিংবা শাকসব্‌জী খাওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

ডিমঃ—একটি।

মাংস, মাছঃ—দুইবার। মাংসের বদলে একবার পনীরও দেওয়া যাইতে পারে।

এনরিচ্‌ড্‌ বা হোলগ্রেন রুটি বা খাদ্যশস্যঃ—চাউল, গম, যব, ময়দা ইত্যাদি এবং রুটি দুইবার বা ততোধিক।

মাখন বা মাখনজাতীয় অন্য কিছু ঃ—রুটির সহিত বা রান্না খাদ্যদ্রব্যের সহিত।

ভিটামিন 'ডি' ঃ—দুধ হইতে, মাছের লিভারের তৈল বা অন্য কোন উপাদান হইতে।

জল ঃ—ছয় হইতে আট গ্লাস। ইহার কিছুটা কফি এবং ফলের রস হইলেও চলিবে। আয়োডিনযুক্ত কোন উপাদান—যেমন আয়োডাইস্‌ড সল্ট। উপযুক্ত শক্তি অর্জন ও বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে ইহার অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উত্তম স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুষম খাদ্য

			আউন্স
শস্যজাতীয়	...	...	১৪
ডাল	...	...	৩
সবুজপাতাসহ শাকসব্‌জী		...	৪
কন্দ জাতীয় শাকসব্‌জী		...	৩
অন্যান্য শাকসব্‌জী		...	৩
ফল	...	...	৩
দুধ	...	...	১০
চিনি	...	...	২
ঘি, তৈল ইত্যাদি	...	...	২
মাছ এবং মাংস	...	...	৩
ডিম	...	...	১টি

ওজন বাড়াইবার জন্য খাদ্য-ব্যবস্থা

১। ফল ও শস্যজাতীয় খাদ্যে যথেষ্ট ক্রীম ব্যবহার।

২। প্রধান খাদ্যের মাঝে মাঝে সকালে, বিকালে ও শোয়ার আগে জলখাবার খাওয়া।

৩। উত্তম প্রাতরাশের ব্যবস্থা।

৪। প্রত্যেক বারের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি।

৫। প্রচুর ঘুম।

৬। সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই একগ্লাস ঠাণ্ডা ফলের রস খাওয়া; ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

৭। দুপুর ও নৈশ-ভোজনে মিষ্টি খাওয়া।

৮। সস, সুরুয়া বা ঝোল (Gravy) ও অধিক পরিমাণে ক্রীম খাওয়া।

কয়েকটি সাধারণ খাদ্যবস্তু ও দৈহিক প্রয়োজনে তাহাদের দান

খাদ্যবস্তু	খাদ্যের কাজ
দুগ্ধ এবং পনীর	
টাট্‌কা দুগ্ধ (অথবা ইহার সমতুল্য শুক্‌না বা গুঁড়া দুধ)	ইহা ক্যাল্‌সিয়াম ও রাইবোফ্লেভিনের প্রধান উৎস। ইহা প্রোটীন, ভিটামিন 'এ', এবং থিয়ামিনও সরবরাহ করে।
সর-তোলা ও মাখন-তোলা টাট্‌কা দুধ (কিংবা ঐ দুধই শুক্‌না বা গুঁড়া)	ভিটামিন 'এ' ছাড়া দুধের অন্য সমস্ত গুণই আছে।
সর	দুধের চেয়ে ভিটামিন 'এ' বেশী, কিন্তু অন্য ভিটামিন কম।
পনীর (দুধ হইতে তৈরী)	বেশ কিছুটা পনীরে এক কাপ দুধের সমান প্রোটীন, ক্যাল্‌সিয়াম ও ভিটামিন 'এ' সরবরাহ করে।

	খাদ্যের কাজ
ফল	
সাধারণভাবে সমস্ত ফল	শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় লৌহ (iron), থিয়ামিন এবং রাইবোফ্লেভিন সাধারণভাবে প্রায় সব ফলেই আছে।
কমলালেবু, আঙ্গুর ফল, স্ট্রবেরী	এই ফলগুলি ভিটামিন 'সি'র প্রধান উৎস। দিনে একবার পরিমাণমত গ্রহণ করিলেই চলে।
আপেল, কলা, পীচফল, নাশপাতি, এবং অন্যান্য সাধারণ টাটকা কাঁচা ফল	এই ফলগুলি কাঁচা প্রচুর পরিমাণে খাইলে কিছুটা ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়।
পীচফল, শুকনো কুল, অ্যাপ্রিকট্ বা খোবানি এবং অন্যান্য হলুদ ফল	হলুদ খোসাযুক্ত ফলে ভিটামিন 'এ' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
অ্যাপ্রিকট, খেজুর, কুল এবং কিস্‌মিস্ ইত্যাদি শুক্‌না ফল	এই সকল শুক্‌না ফল সাধারণ লৌহ অপেক্ষা ভাল।
লবণ	
আয়োডিন্ সংযুক্ত লবণ (iodized salt)	নোনাজলের মাছের অভাবে ইহা আয়োডিন যোগায়।
শাকসব্‌জী	
সাধারণ শাকসব্‌জী	বিভিন্ন মিনারেলস্ এবং ভিটামিনের মূল্যবান উৎস।
পালংশাক, সবুজ শালগম, ওলকপি, হেলেঞ্চা, শুশুনি শাক এবং অন্যান্য সরু ঘন সবুজ পাতাযুক্ত সব্‌জী	সরু, ঘন সবুজ পাতা (কাঁচা খাইলে বা ঠিকমত রান্না করিয়া খাইলে) লৌহ, ভিটামিন 'এ', থিয়ামিন, রাইবোফ্লেভিন এবং নিয়াসিনের মূল্যবান উৎস। এইগুলি কাঁচা যথেষ্ট পরিমাণে খাইলে যথেষ্ট ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। এই সকল সবুজ সব্‌জীর অনেকগুলি শরীরে ক্যাল্‌সিয়ামের প্রয়োজন পূর্ণ করে।

খাদ্যবস্তু	খাদ্যের কাজ
চিনি ও সিরাপ	
শোধন-করা চিনি, সিরাপ, মধু, গুড়	এইগুলি বিশেষভাবে কর্মশক্তি প্রদানকারী। ঘন গুড় ক্যাল্‌সিয়াম ও লৌহ সরবরাহ করে।
স্নেহজাতীয় দ্রব্য (চর্বি ও তৈল)	
মাখন, ঘৃত, চর্বি, ভেজিটেবল ঘি, অলিভ অয়েল এবং অন্যান্য সালাড অয়েল	এইগুলি বিশেষভাবে কর্মশক্তি প্রদান করে। মাখন, ঘি ও মাছের লিভারের তৈল গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন 'এ' যোগায়।
মাছের লিভারের তৈল—যেমন কডলিভার অয়েল ইত্যাদি	মাছের লিভারের তেলে প্রচুর ভিটামিন 'ডি'ও পাওয়া যায়।
পরিপক্ক শিম, মটর এবং অন্যান্য শুঁটি—যেমন মটরদানা, মসুর ইত্যাদি	এইগুলি প্রোটীন, লৌহ, থিয়ামিন, এবং রাইবোফ্লেভিনের উত্তম উৎস। শরীরের ক্যাল্‌সিয়ামের প্রয়োজন মিটায়। ইহা পরিমিত কর্মশক্তি প্রদানকারী খাদ্যও বটে।
ডিম, মাংস, মাছ	
ডিম ; পেশীর মাংস, মুরগী ইত্যাদি পাখীর মাংস, লিভার, কিড্‌নি এবং অন্যান্য অংশ; মাছ, খোলাযুক্ত সামুদ্রিক জন্তু—যেমন, ঝিনুক, কচ্ছপ ইত্যাদি	প্রোটীন, লৌহ, থিয়ামিন রাইবোফ্লেভিন এবং নিয়াসিনের জন্য এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডিম এবং লিভার ভিটামিন 'এ' যোগায়। সমুদ্রের মাছ ও সামুদ্রিক জন্তু আয়োডিন সরবরাহ করে।

খাদ্যবস্তু	খাদ্যের কাজ
শতমূলী, মটর, কড়াইশুঁটি, শিম, বরবটি, রাঙ্গা আলু বা মিষ্টি আলু, গাজর এবং অন্যান্য সবুজ বা ঘন-হলুদ শাকসব্জী	সবুজ শাকসব্জী, ও ঘন-হলুদ শাকসব্জী প্রধানতঃ ভিটামিন 'এ'র জন্য মূল্যবান। রাঙ্গা আলু বা মিষ্টি আলু পরিমিত কর্মশক্তি প্রদানকারী খাদ্য।
বাঁধাকপি	কাঁচা খাইলে ভিটামিন 'সি'র উৎকৃষ্ট উৎস। কিন্তু বাঁধাকপি কাটিয়া টুকরা করিয়া রাখিলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হইয়া যায়।
টম্যাটো—কাঁচা অবস্থায়, রান্না করা, কিংবা উপযুক্তভাবে বায়ুনিরোধক টিনে রাখা	ভিটামিন 'সি'র অত্যুৎকৃষ্ট এবং ভিটামিন 'এ'র উত্তম উৎস।
গোলআলু	আলু খোসাশুদ্ধ রান্না করিলে উত্তম ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায় এবং যথোচিতভাবে লৌহ, থিয়ামিন, রাইবোফ্লেভিন এবং নিয়াসিন সরবরাহ করে। ইহা পরিমিত কর্মশক্তিও প্রদান করে।

শস্যদানা

খাদ্যবস্তু	খাদ্যের কাজ
সাধারণ শস্যাদি	পরিমিত কর্মশক্তি প্রদানকারী খাদ্য। যাহা গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণে প্রোটীন যোগায়।
হোলগ্রেন বা এনরিচ্‌ড রুটি, ছাতু, ময়দা বা আটা এবং খাদ্যশস্যাদি যেমন ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল ইত্যাদি	এইগুলি লৌহ, থিয়ামিন, রাইবোফ্লেভিন এবং নিয়াসিনের প্রয়োজনীয় উৎস।
ভুট্টাচূর্ণ, গুঁড়া ওট্‌স, শাদা ময়দা, কলে-ছাঁটা চাউল।	এই সকল শোধন-করা শস্যাদি আলু ও অন্যান্য শাকসব্জীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

বাদাম

	খাদ্যের কাজ
বাদাম (সাধারণভাবে)	এইগুলি বিশেষভাবে কর্মশক্তি এবং প্রোটীনের উৎস। থিয়ামিনেরও ভাল উৎস।

খাদ্য-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণতঃ আমরা যতটা খাদ্যদ্রব্য পরিবারে প্রয়োজন ততটাই ক্রয় করিয়া থাকি। কিন্তু কোন কোন সময় আমাদের খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় কিংবা একসঙ্গে কিনিয়া রাখিলে পরিশ্রম ও সময় বাঁচে, দামও সস্তা হয়। তা ছাড়া ঋতু বিশেষে কোন কোন জিনিস প্রচুর পাওয়া যায়, অন্য সময় ঐগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়। সেই সব জিনিস সংরক্ষণ করিতে পারিলে অকালেও খাদ্য হিসাবে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কি ভাবে রাখিলে ঐগুলি বহুদিন অবিকৃত রাখা যায়, যাহাতে পচিয়া না যায়, এবং জীবাণু-সংক্রমণ না ঘটে—এই সকল বিষয় খাদ্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। উপযুক্তরূপে খাদ্য সংরক্ষণ করিতে না পারিলে খাদ্যবস্তু জীবাণু সংক্রমিত হইয়া বিষাক্ত হয় এবং নানা প্রকার মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে।

অনেকগুলি খাদ্যবস্তুই বাড়ীতে সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়। প্রধান প্রধান খাদ্য-যেমন চাল, ডাল ইত্যাদি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না এবং সঞ্চয় করিয়া রাখিলে প্রয়োজনের সময় সহজেই পাওয়া সম্ভব হয়। অন্যান্য খাদ্যবস্তুর বেশীর ভাগই খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। সেইজন্য ইহাদের রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। সমস্ত খাদ্যবস্তু ঠিকভাবে রাখিবার জন্য পাত্র এবং রাখিবার উপযুক্ত জায়গা দরকার। এই খাদ্যবস্তুগুলি আচ্ছাদিত পাত্রে, উপযুক্ত

উত্তাপে (temperature) এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় সুশৃঙ্খল-ভাবে রাখা উচিত। খাদ্য সংরক্ষণ করিতে হইলে খাদ্যবস্তু কি ভাবে দূষিত বা নষ্ট হইতে পারে প্রথমে তাহা জানা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে খাদ্য-সংরক্ষণ করা হইত। খাদ্য-সংরক্ষণ-পদ্ধতিগুলির মধ্যে আর্দ্রতা নিবারণ ও খাদ্য নষ্ট হইবার অন্যান্য কারণগুলি দূর করিবার চেষ্টাই প্রধান।

খাদ্যবস্তু নষ্ট হইবার কারণ—(১) খাদ্যের ভিতরের অবস্থা, (২) তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, (৩) উদ্ভিজ্জ ও জান্তব খাদ্যের ভিতরের জারক রস (enzyme) খাদ্যের গঠন পরিবর্তনের জন্য অনেকখানি দায়ী। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ফল পাকানোর জন্য অথবা খাদ্যদ্রব্য গাঁজানোর (fermentation) জন্য জারক রসের প্রয়োজন হয়। তবে বেশী মাত্রায় জারক রস ব্যবহার করিলে খাদ্য অখাদ্য হইয়া উঠে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর (১) তাপের মাত্রা, (২) জীবাণু বা অন্য প্রাণী, (৩) আর্দ্রতা, (৪) আলো এবং (৫) বায়ু অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাণীদের ভিতর ব্যাক্টেরিয়া (bacteria), ঈস্ট (yeast), ছত্রাক বা ছাতা (moulds), কীটপতঙ্গ ও রোডেণ্ট (ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি ছোট দাঁতযুক্ত প্রাণীকে রোডেণ্ট বলে) খাদ্য নষ্ট করে। তাপের মাত্রাধিক্য হইলে স্নেহজাতীয় পদার্থ গলিয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে জারক রসে ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়া বাড়িয়া যায় ; ফলে মাছ, মাংস, ফল নষ্ট করে। আর্দ্রতা হেতু খাদ্যের জলীয় অংশ বাড়িয়া বা কমিয়া যায়। আর্দ্রতায় বিস্কুট অথবা ভাজা জিনিস মিয়াইয়া যায়। জলের স্বল্পতা হেতু তরিতরকারী শুকাইয়া যায়, রুটির রং নষ্ট হয়, মিষ্টদ্রব্য-গুলি শক্ত হইয়া যায়।

আলোর সংস্পর্শে স্নেহজাতীয় পদার্থ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, খাদ্যে

রাইবোফ্লেভিন ও ভিটামিন 'সি'র অপচয় ঘটে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে দুর্গন্ধ বাড়ে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

ছত্রাক বা ছাতা (Moulds)—সাধারণতঃ রুটি, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ছত্রাক দেখা যায়। যে সকল খাদ্যবস্তু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকে কিংবা ভাঙ্গা, কাটা বা থেঁতলাইয়া যায় তাহাতেই ছত্রাক বা ছাতা জন্মে। জলীয় বাষ্পযুক্ত এবং আর্দ্র খাদ্যদ্রব্যেই সাধারণতঃ ছাতা পড়ে। সেইজন্যই আচার, আমসত্ত্ব, জ্যাম, জেলীর উপরই ছাতা বেশী দেখা যায়। ঈস্ট অর্থাৎ গেঁজলা শর্করাযুক্ত খাদ্যে এবং চিনিতে বাস করে এবং গরম, স্যাঁতসেতে জায়গায় তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। ফলে, শাকসব্জীতে সাধারণতঃ ঈস্ট জন্মিয়া ঐগুলি নষ্ট করে, ফলে সেগুলি বিস্বাদ হয়; কারণ ফলে ও শাকসব্জীতে প্রচুর শর্করা (Starch) চিনি ও জলীয় বাষ্প থাকে। খাদ্যদ্রব্যগুলি শুষ্ক অবস্থায় রাখিলে এবং বিশুদ্ধ বায়ু অবাধে চলাচল করে এরূপ জায়গায় রাখিলে ছত্রাক বা ছাতা জন্মিতে পারে না এই উদ্ভিদ জাতীয় ছত্রাকগুলি উগ্র উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়।

একবার খাদ্যে ছাতা পড়িলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খাদ্যবস্তুটিই পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আমাদের দেশে আচার, আমসত্ত্ব, জেলী ইত্যাদি রৌদ্রে দেওয়া হয়।

ঈস্ট বিশেষভাবে চিনির উপরই কাজ করে। এককোষ-যুক্ত ঈস্ট গাছ (Single-cell yeast plant) শর্করাযুক্ত খাদ্যে অতি দ্রুত জন্মায়। ইহার উপস্থিতিতে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং চিনি অ্যালকোহল ও কার্বলিক এসিড গ্যাসে পরিণত হয়। এই পরিণতিরই ফলস্বরূপ খাদ্যে গেঁজলা হয়। তাল, খেজুর প্রভৃতির রস হইতে এই ঈস্টের জন্যই মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। জ্যাম, জেলী

ফল, শাকসব্জীও এই ভাবে ঈস্টের দ্বারাই দূষিত ও নষ্ট হয়। এই ঈস্ট অতি উষ্ণ বা অতি নিম্ন তাপে (Very high or very low temperature) এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়।

জীবাণু (Bacteria) ধ্বংস করা কঠিন। জীবাণুগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর। জীবাণু ধ্বংস করিতে হইলে অতি উগ্র উত্তাপ (temperature) প্রয়োজন। অধিকাংশ খাদ্যের জীবাণু ফুটাইলে (সিদ্ধ করিলে) মরিয়া যায়। কিন্তু কয়েকটি জীবাণু উত্তাপেও সহজে মরে না। সেইজন্য ঐগুলি খুব উগ্র উত্তাপে অনেকদিন ধরিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত। সবুজ শাকসব্জীর—যেমন বীন এবং মটর ইত্যাদির জীবাণুগুলি ধ্বংস করিতেই বিশেষভাবে উষ্ণ উগ্র তাপের প্রয়োজন হয়।

গরম, আর্দ্রতা, এবং অন্ধকারেই এই সব জীবাণু জন্মে। আলো, উত্তাপ এবং সূর্যালোক এইগুলির ধ্বংসসাধন করে। ঠাণ্ডায় জীবাণুগুলি বাড়িতে পারে না বটে কিন্তু মরে না। এইজন্যই আইসক্রীম ইত্যাদি খাদ্য অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমিয়া বরফ অবস্থায় থাকিলেও উহাদের ভিতর টাইফয়েডের জীবাণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে এবং পেটের ভিতর গিয়া বরফ গলিয়া জীবাণু সক্রিয় হইয়া উঠে। পচন নিবারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য বরফে জমানো হইয়া থাকে বা বরফের ভিতরে রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে জীবাণু ধ্বংস হয় না। যত্ন সহকারে সঞ্চয়, বিশুষ্কীকরণ, বায়ুনিরোধক টিনে রক্ষণ (Canning), রাসায়নিক ও সংরক্ষণকারী পদার্থের (Preservatives) ব্যবহার—এই কয়টি উপায় অবলম্বন করিলে খাদ্যে জীবাণু জন্মিতে পারে না।

কীটধ্বংসকারী ঔষধ ও ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি মারার ঔষধের সাহায্যে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সংরক্ষণের

প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাপমাত্রা প্রয়োজনমত বাড়ানো কমানো যাইতে পারে। যেখানে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়, সেই স্থানের আর্দ্রতা দূর করা দরকার অথবা সেই স্থান যাহাতে শুকনো খটখটে হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত আলোর জন্য যে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তাহা অন্ধকার কক্ষে রাখাই শ্রেয়ঃ। সেই কক্ষের ভিতর যাহাতে আলো প্রবেশ করিতে না পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটগুলি অস্বচ্ছ পদার্থের দ্বারা আবৃত করা উচিত। খাদ্যদ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া প্যাকেট ভালভাবে সীল (Seal) করিলে অক্সিজেন দূর হয়।

খাদ্যদ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া জারক রসের আক্রমণ হইতে অনেকাংশে রক্ষা করা যায়। খাদ্যদ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া ঠাণ্ডা করার পর এন্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidcnts) সহযোগে বায়ু নিরোধক পাত্রে রাখিলে জারক রসের ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যে সব রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিতে বাধা দেয় তাহাদিগকে এন্টিঅক্সিডেন্ট বলে। ছোট ছোট জীবাণুগুলি খাদ্যদ্রব্যকে নষ্ট করে। অধিক উত্তাপ অথবা আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে সেই জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করা যাইতে পারে। সংরক্ষণ স্থায়ী করিতে হইলে খাদ্যদ্রব্য জীবাণুশূন্য করা সত্ত্বেও যাহাতে ইহার পুনরাক্রমণ না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খাদ্য-সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

(১) বিশুষ্কীকরণ (Dehydration)।

(২) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার।

(৩) যে সব জীবাণু ধ্বংসের পরিবর্তে খাদ্যদ্রব্যের উপকার সাধন করে এইরূপ জীবাণুর ব্যবহার।

(৪) বায়ুনিরোধক পাত্রে সীল করিয়া রাখা।

(৫) ঠাণ্ডায় জমান।

(৬) যত্ন সহকারে সঞ্চয়।

(১) **বিশুষ্কীকরণ (Dehydration)**—সব চেয়ে প্রাচীনতম পন্থা হইল বিশুষ্কীকরণ। পূর্বে মটরশুঁটি, কড়াইশুঁটি, মাছ, মাংস প্রভৃতি রৌদ্রে শুকাইয়া গরম জায়গায় রাখিয়া দেওয়া হইত। কাঁচা আম কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আমচুর বা আমসি তৈয়ারী হয়। ইহা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। মুখে রুচি আনিবার জন্য এইগুলি অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। সেইরূপে পাকা আম গুলিয়া শুকাইয়া আমসত্ত্ব তৈয়ারী করিয়াও আম সংরক্ষণ করা হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই আমসত্ত্ব পাওয়া যায়। আমসত্ত্বের সাহায্যে অসময়েও অনেক সময় আমের স্বাদ বুঝা যাইতে পারে। ইহাও অনেকদিন রাখা চলে। পুরানো আমসত্ত্ব ভিজানো কোন কোন রোগীর পক্ষে উপকারী।

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে ও ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের কোন কোন জায়গায় মাছ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। এই অবস্থায় মাছ অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। তারপর প্রয়োজনমত সেই মাছ দেশ-বিদেশে চালান করা হয়। এইসব বিশুষ্কীকরণের জন্য লবণ, হলুদ ও অন্যান্য মসলাও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অনেক গোলাঘরে উন্মুক্ত জায়গায় উচ্চস্থানে শুকনো খাদ্য বোঝাই দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁচা, অর্ধসিদ্ধ বা পূর্ণসিদ্ধ খাবারকে শুকানো যাইতে পারে। বিশুষ্কীকরণের ফলে খাদ্যদ্রব্য হইতে সমস্ত জল দূর হইয়া

যায় এবং যে সব জীবাণু খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে তাহাদেরও দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ ও খাদ্যমূল্য অনেকখানি কমিয়া যায়।

(২) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার— বায়ু-নিরোধক পাত্রে আঁটা খাদ্যদ্রব্য ও রেফ্রিজারেটারের প্রবর্তনের ফলে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার অনেক কমিয়া আসিয়াছে। মাছ, মাংস,তরকারী ও ফলের আচারের জন্য এখনও লবণের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশে রাশি রাশি ইলিশ মাছ কাটিয়া হলুদ ও লবণের সংযোগে টিনে সঞ্চিত করা হয়। ইহাকে পরিচ্ছন্নভাবে সংরক্ষণ বলা চলে না। তবুও টিনে ভর্তি মাছ দেশ-বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ইহার ফলে প্রয়োজনমত সব ঋতুতেই ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। কটন অয়েল (Cotton oil) দ্বারা সংরক্ষিত স্যামন, সারডিন প্রভৃতি বিদেশী মাছ টিনের কৌটায় করিয়া দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এদেশের কেহ কেহ ইহার স্বাদও উপভোগ করেন।

আর ফলের আচারের ত কথাই নাই। আমের আচার, তেঁতুলের আচার, কুলের আচার প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বঙ্গের সর্বত্র এখনও প্রচলিত আছে। এই সমস্ত আবার মসলা ও সরিষার তেল সংযোগে সংরক্ষিত হয়। অম্ল-মধুর বলিয়া আচার খুব মুখরোচক। স্নেহপদার্থের সংস্পর্শে যাহাতে বায়ু না আসিতে পারে সেইজন্য অনেক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। লবণ, ভিনিগার, চিনি, নাইট্রেট, লেবু জাতীয় অম্ল রস, অ্যাল্‌কোহল ব্যতীত অন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

লবণ ঃ—যে সব খাদ্যদ্রব্যে জলের পরিমাণ বেশী যেমন—মাংস, মাছ ও শাকসব্‌জী সেগুলি সংরক্ষণ করিবারজন্য সর্বদাই লবণ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। শাকসব্‌জীর মধ্যে কপিই নুনের

সাহায্যে সংরক্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী। কপির আচার, আমচূর ইত্যাদি নুনের জন্যই অনেকদিন থাকে। অনেকে মূলা রোদে শুকাইয়াও রাখিয়া দেন। ইহাও বেশ কিছুদিন রাখা যায়।

মাছে নুন মাখাইয়া রোদে শুকাইয়া রাখিলে অনেকদিন রাখা যায়; যেমন—শুঁটকী মাছ, নোনা মাছ ইত্যাদি। তাহা ছাড়া মাছ একটু বেশী নুন মাখাইয়া রাখিলে না শুকাইয়াও দুই-এক দিন ব্যবহার করা যায়।

তীব্র গন্ধ বা কড়া স্বাদযুক্ত খাদ্যে জীবাণু সহজে জন্মাইতে পারে না বা সহজে ছাতাও পড়ে না। সেই জন্যই জ্যাম, জেলী, কুলের, আমের, তেঁতুলের আচার ইত্যাদি লবণ, চিনি ও তেলের সাহায্যে অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকে। অবশ্য মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয় যাহাতে ছাতা না পড়ে বা নষ্ট না হয়।

ভিনিগার ঃ—ভিনিগারও অনেকদিন হইতেই খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। মধু, তালের রস হইতেই সাধারণতঃ ভিনিগার তৈয়ারী হয়। তা ছাড়া ভাল আঙ্গুর, রাই, বার্লি প্রভৃতি শস্য হইতেও ভিনিগার তৈয়ারী হইয়া থাকে। বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্যই ভিনিগারের সাহায্যে সংরক্ষণ করা যায়। ভিনিগার যদি ভাল হয় তবে খাদ্যবস্তুর স্বাদ ও গন্ধ ভাল হয়। পূর্বে ভিনিগারে কেবল মাত্র ফল সংরক্ষণ করা হইত, কিন্তু আজকাল ফুলকপি, পেঁয়াজ, শশা, টম্যাটো, লঙ্কা সংরক্ষণেও ইহা ব্যবহার করা হয়। স্বাদ এবং গন্ধের জন্যও ভিনিগার ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

চিনি ঃ—চিনিরও অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য সংরক্ষণকারী ক্ষমতা আছে। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে ও ফলে জলীয় অংশ বা রস বেশী আছে এবং যেগুলি চিনি শোষণ করিতে পারে সেই সকল দ্রব্য ও ফল সংরক্ষণেই আজকাল চিনি ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

শতকরা ৪০ বা ৫০ ভাগ চিনির দ্রবণ ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু এবং ছত্রাক বা ছাতা জন্মিতে বাধা দেয়।

খাদ্যদ্রব্য পূর্বে গরম করিবার পরে চিনির দ্রবণে রাখিয়া পাত্রটি যত্নের সহিত সীল (seal) করিয়া রাখিলে অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। যেমন বেলের মোরব্বা, চালকুমড়ার মোরব্বা ইত্যাদি চিনির সাহায্যেই সংরক্ষিত হয়। এইগুলি জলখাবার হিসাবে চলে, আবার উপকারীও। কেক-পেস্ট্রির সহিত চালকুমড়ার মোরব্বা ব্যবহৃত হয়।

ধোঁয়া লাগান (Smoking)—ধোঁয়ার সাহায্যে মাংস-সংরক্ষণ-পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। আদিম মানুষেরা তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাংস গুহার ধোঁয়াপূর্ণ স্থানে ঝুলাইয়া পরের দিন ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিত। সেই মাংস শুধু যে বেশ ভালই থাকিত তাহা নয়—উহার স্বাদ এবং গন্ধও বেশ ভাল হইত।

আধুনিক কালে নানা রকম সুগন্ধযুক্ত কাঠ পোড়াইয়া তাহার সুগন্ধপূর্ণ ধোঁয়ায় মাংস সংরক্ষণ করা হয়।

(৩) জীবাণুর গাঁজন (Fermentation)—প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (Lactic Acid) ব্যাক্‌টেরিয়া পাওয়া যায়। ইহা চিনি জাতীয় পদার্থ গাঁজাইয়া (fermentation) খাদ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ব্যাক্‌টেরিয়া দুধ, ফল, তরিতরকারীতেও থাকে। ফলের রসে ঈস্টের (Yeast) সাহায্যে এক প্রকার গাঁজন ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, যাহার ফলে অ্যালকোহল ও ভিনিগারের সৃষ্টি হয়। দই ও অনেক আচার এক প্রকার গাঁজনের ফলে সংরক্ষিত থাকে। বীটের মূল, শালগম, ওলকপি, বরবটি, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা টম্যাটো, ফুলকপি, কাঁচালঙ্কা, কড়াইশুঁটি এইরূপ গাঁজন-ক্রিয়ার ফলে সংরক্ষিত হয়।

(৪) ক্যানিং (Canning)—বায়ুনিরোধক পাত্রে খাদ্যদ্রব্য সীল (Seal) করিয়া রাখাকে ক্যানিং বলা হয়। পাশ্চাত্য দেশে ইহার প্রচলন বেশী। সেখান হইতে নানা প্রকারের ফল, মাছ, তরিতরকারী কৌটায় করিয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী করা হয়। প্রথমে খাদ্যদ্রব্যকে উত্তপ্ত করা হয়, ইহার ফলে জীবাণুগুলি ধ্বংস হইয়া যায় এবং জারক রসের কর্ম ব্যাহত হয়। জীবাণু ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুনিরোধক পাত্রে এগুলি রাখা উচিত। ইহার ফলে জীবাণুর পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। খাদ্যবস্তু রাখিবার জন্য ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আমাদের দেশ হইতে রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি নানা ধরনের উৎকৃষ্ট মিষ্টি এই প্রণালীর সাহায্যে দেশ-বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

(৫) জমানো (Freezing)—বরফভরা বাক্স বা ঘরই সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশে জমানো পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই ভাবে খাদ্য সংরক্ষণকে কোল্ড স্টোরেজ (Cold storage) পদ্ধতি বলা হয়।

এই ভাবে খাদ্য-সংরক্ষণ করিলে খাদ্যের রূপ, গুণ ও খাদ্যমূল্য বজায় থাকে। এইজন্য ইহাকে খাদ্য-সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় বলা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশেও এই পদ্ধতিতে আলু ও অন্যান্য তরকারী, মাছ প্রভৃতি সংরক্ষণ করা হইতেছে। কোল্ড স্টোরেজের খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতেছি যে এইসব খাদ্যদ্রব্য খাইতে বিস্বাদ লাগে। কাজেই এই সম্বন্ধে গবেষণা করা প্রয়োজন। টাটকা অবস্থায় ফল এবং কোন কোন শাকসবজী চিনি বা সিরাপে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া জমাইয়া রাখিতে পারিলে অনেক দিন পর্যন্ত রাখা যায়। কালোজাম বা জামজাতীয় যে কোন ফল, কুল ও ঐ জাতীয় ফল, চেরিফল সিরাপে ডুবাইয়া রাখিলে বেশ ভাল থাকে।

(৬) খাদ্যবস্তু রাখিবার তাকগুলি রোজ ভিজা (damp) ন্যাকড়ার সাহায্যে ভাল করিয়া মুছিয়া রাখিতে হইবে এবং খাদ্যাগারটি (ভাঁড়ার ঘর) ঝকঝকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুক্‌না হইতে হইবে, নতুবা খাদ্য দাগযুক্ত ও দূষিত হইবে। খাদ্যাগার পরিষ্কার করিবার জন্য স্ক্রাচিং ব্রাশ এবং ভিজা ন্যাকড়া ব্যবহার করিতে হইবে, ঝাঁটা কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ ঝাঁটার ধূলা উড়িয়া খাদ্যদ্রব্যে পড়িবার সম্ভাবনা। খাদ্যাগার পরিষ্কার করার আগে সমস্ত খাদ্যবস্তু ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার পর ঘরের দরজা কিছুক্ষণের জন্য ঈষন্মুক্ত করিয়া রাখা উচিত।

বিভিন্ন খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের পদ্ধতি বলা হইতেছে ঃ

মাখন ঃ— খুব আঁট করিয়া ঢাকা উচিত নয়, কারণ তাহাতে কটু ও দুর্গন্ধ হইতে পারে। মাখন ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হয়। রেফ্রিজারেটারে সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা জলের উপর বসাইয়া পাতলা মসলিন বা মখমলের কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিলেও মাখন কিছুদিন ভাল থাকে। রেফ্রিজারেটারের অভাবে পাথরের বা মার্বেলের তাকে, কাঠের তাক হইলে একখণ্ড পাথর লাগাইয়া মাখন ও দুধ তাহার উপরে রাখা যাইতে পারে।

মাছ ঃ—মাছ টাটকা খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয় তবে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া ও মুছিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে।

গোটা মাছ হইলে লেজের দিকে ঝুলাইয়া রাখা যাইতে পারে। মাছ যদি খুব টাটকা না হয় তবে ভিনিগার-মিশ্রিত জলে কিংবা পটাশ পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত জলে সম্পূর্ণরূপে ধুইয়া লইলে অনেকটা ভাল হয়। রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডায় রাখিলে কয়েক দিন রাখা যায়।

ডিম ঃ—ব্যবহারের পূর্বে ধুইয়া রাখিতে নাই। ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিলে ভাল থাকে।

মাংস ঃ—মাংস খোলা হাওয়ায় ঝুলাইয়া রাখিয়া যখন ইহার কাঠিন্য একটু কমে তখন ভালভাবে রাখিয়া দিতে হয়। মাংস সর্বদা আলতোভাবে তেল লাগে না এইরূপ কাগজ দিয়া ঢাকিয়া রাখা দরকার। প্রতিদিন সকালবেলা মাংস শুকাইয়া রাখিতে হয়। কারণ ইহা স্বেদযুক্ত হয়। শুকাইয়া না রাখিলে ইহা টক হইয়া যাইতে পারে এবং গন্ধও হইতে পারে। গরমের দিনে মাংস সংরক্ষণ করা একটু কষ্টকর। এইজন্য খুব ঠাণ্ডায় রাখিয়া দিতে হয়। মাংস রাখিবার সময় খুব ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি মাছি কোন মাংস স্পর্শ করিয়া থাকে তবে ঐ মাংস কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া বাকী অংশটুকু গরম জল ও ভিনিগারে একটি পরিষ্কার কাপড় ভিজাইয়া নিয়া ভাল করিয়া মুছিয়া দিতে হইবে। মাংসের হাড়ের যেখানে গর্ত আছে সেগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে; কারণ এগুলি পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। রেফ্রিজারেটারের সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা জায়গায় ঢাক্‌নাযুক্ত পাত্রে মাংস রাখা উচিত।

দুধ ঃ—খুব শক্ত করিয়া আটকা পাত্রে ঢাকিয়া রাখিলে ভাল থাকে। দুধ জ্বাল দিয়া অন্ততঃ দুই-এক মিনিট ভাল করিয়া ফুটাইয়া রাখিলে রোগজীবাণু নষ্ট হয়। জ্বাল দেওয়ার পর পাথরের বাটী বা চীনামাটির বাসনে দুধ রাখিয়া পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ঠাণ্ডা অথচ শুকনা জায়গায় রাখা দরকার। খুব গরমের সময় ঠাণ্ডা জলের উপর দুধ পাত্রসহ বসাইয়া রাখিলেও ভাল থাকে। ভাল করিয়া না ঢাকিলে দুধে ময়লা ও জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে। দুধ জীবাণুযুক্ত হইলে অত্যন্ত মারাত্মক হয়। রেফ্রিজারেটারে রাখিলেও দুধ ভাল থাকে। বোতলের দুধ ব্যবহার না করা পর্যন্ত ঐ

ভাবেই বোতলে রাখা ভাল। বোতলের ঢাক্‌না ও বোতলের বাহির দিকটি ভাল করিয়া ধুইয়া রেফ্রিজারেটারের ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত।

সস ও সুপ :—সস ও সুপ মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করাই শ্রেয়ঃ। প্রতিদিন ফুটাইয়া গরম করিয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া তবে আবার তুলিয়া রাখিতে হয়

শাকসব্‌জী :—শীতের সময় শাকসব্‌জী প্রতিদিন হিমে রাখিয়া খুব ভোরে ঘরে আনিয়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিলে ভাল থাকে। বায়ুশূন্য পাথরের মেঝেতে এইগুলি ভাল থাকে।

আপেল :—ধুইয়া ভাল করিয়া মুছিয়া, একটিতে অপরটি না লাগে এই ভাবে খড়ের উপর রাখিলে আপেল ভাল থাকে। কাঠের উপরেই ভাল থাকে।

নাশপাতি :—শুকনা ঠাণ্ডা জায়গায় সূতায় ঝুলাইয়া রাখিলে নাশপাতি ভাল থাকে।

আঙ্গুর :—লম্বা বোঁটা সহ কাটিয়া এক একটি বোঁটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোতলের জলে ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্যন্ত আঙ্গুর ভাল রাখা যায়।

কলা :—কলা রেফ্রিজারেটারে রাখিতে নাই, কারণ ঠাণ্ডায় ঠিকমত পাকিতে পারে না, স্বাদও নষ্ট হয়। সাধারণ উত্তাপে রাখিলেই ভাল।

বিস্কুট :—বিস্কুট বায়ুনিরোধক (air tight) টিনে রাখা উচিত।

রুটি :—মাটির পাত্রে ঢাকনা দিয়া (বায়ু প্রবেশের জন্য ঢাকনায় একটি ছোট ছিদ্র করিয়া) রাখিলে অথবা একটি কাপড় জড়াইয়া ঠাণ্ডা পাথরের উপরে রাখিলে রুটি ভাল থাকে।

শুষ্ক মাংস :—খুব ঠাণ্ডা রেফ্রিজারেটারে রাখিলে ভাল থাকে।

ময়দা ঃ—ময়দা বায়ুনিরোধক টিনে রাখা উচিত। তবে মাঝে মাঝে দেখিতে হইবে ভাল আছে কি না।

জ্যাম, জেলি, আচার ঃ—এইসব দ্রব্য ঠাণ্ডা অথচ শুক্না জায়গায় সীলকরা বোতলে বা বইয়ামে রাখিতে হয়।

কমলালেবু ও লেবু ঃ—জালে ঝুলাইয়া (তাকে না লাগে) রাখিলে এইসব ফল শুকনা থাকে বলিয়া ভাল থাকে।

বিবিধ ফল ঃ—ফুটি, টম্যাটো, শশা ইত্যাদি রেফ্রিজারেটারে ভাল থাকে।

লবণ ঃ—খুব শুক্না জায়গায় বায়ুনিরোধক বোতল বা বইয়ামে (jar) লবণ রাখা উচিত।

মসলা ঃ—কর্ক দিয়া আটক করিয়া ঢাকা বোতলে বা শক্ত করিয়া আঁটা টিনের বাক্সে মসলা রাখা প্রয়োজন।

চিনি ঃ—কাচের বইয়ামে ঢাক্না দিয়া রাখিলে চিনি ভাল থাকে।

চা, কফি—শক্ত করিয়া আটকান ঢাক্নাযুক্ত টিন বা বইয়ামে চা ও কফি রাখা উচিত।

যে সকল ফল অল্পদিনের জন্য রাখার প্রয়োজন সেগুলি যেন খুব পাকা না হয়। অর্ধপক্ক ফল কিনিয়া না ধুইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি অন্ধকার শীতল, বায়ু চলাচল করে এরূপ স্থানে রাখা দরকার। তৈল ও স্নেহজাতীয় পদার্থ খুব শক্ত করিয়া আটকান পাত্রে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত। এমন রেফ্রিজারেটার পাওয়া যায় যাহা প্রায় ৩০° ফাঃ উত্তাপ হ্রাস করিতে সাহায্য করে। গ্রীষ্মকালে খাদ্যদ্রব্য এই রকম রেফ্রিজারেটারের মধ্যে রাখিলে বেশ ভাল থাকে।

চাউল, ডাল ইত্যাদি শস্যজাতীয় খাদ্যবস্তু শক্ত করিয়া আটকান

ঢাক্‌নাযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিলে ভাল থাকে। পাত্র রাখিবার জায়গাটি ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা ড্যাম্প লাগিয়া নষ্ট হইবার, ছাতা পড়িবার ও পোকায় ধরিবার সম্ভাবনা। মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া নাড়িয়া রাখিলে ছাতা পড়া বা পোকায় ধরিবার আশঙ্কা থাকে না। কলে-ছাঁটা চাউলের পরিবর্তে ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল খাওয়া উপকারী।

খাদ্য-সংরক্ষণের স্থান ঠাণ্ডা এবং শুকনা হওয়া দরকার। যেগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় সেগুলি শীতল স্থানে বা মাটির নীচে গর্ত করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল। সেইজন্য ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আলু, মাছ এইগুলি প্রায়ই ভাল থাকিতেছে না। আলু প্রায়ই খারাপ হয়; মাছও বাড়ীতে আনিতে আনিতে অনেকটা নরম হইয়া যায়। যাহা হউক আজকাল কোল্ড স্টোরেজের প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাড়ীতে খাদ্য-সংরক্ষণের জন্য যাহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা বাড়ীতে রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করিতে পারেন। কয়েকদিনের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে রেফ্রিজারেটার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রেফ্রিজারেটার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণু যাহাতে না জন্মিতে পারে ততখানি ঠাণ্ডা হওয়া উচিত। যাহাদের শুষ্ক, ঠাণ্ডা খাদ্যাগার বা জায়গা আছে তাঁহারা ফল ও শাকসব্‌জী সারা শীতকালেই সঞ্চয় করিতে পারেন। আলু, পেঁয়াজ, শালগম, আপেল ইত্যাদি ঠাণ্ডা শুক্‌নো অথচ অন্ধকার জায়গায় নিরাপদে রাখা যাইতে পারে। রেফ্রিজারেটারে রাখা সুবিধাজনক। মনে রাখা দরকার যে শাকসব্‌জী রেফ্রিজারেটারে রাখার পূর্বে ভাল করিয়া ধুইয়া অপ্রয়োজনীয় অংশ ফেলিয়া দিতে হইবে।

কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সব্জী সাধারণভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় সংরক্ষণের প্রণালী

লাউ, কুমড়া গাছে যতদিন রাখা যায় ততই ভাল। বিশেষতঃ পাকা কুমড়া বা চালকুমড়া যতদিন লতার সহিত রাখা সম্ভব রাখিতে পারিলে ভাল। তুলিয়া ঘরে রাখিতে হইলে উহাদের গায়ে পাত্‌লা চুন মাখাইয়া রাখিলে অনেক দিন রাখা যাইতে পারে।

টম্যাটো আজকাল আমাদের সব্জীর মধ্যেই ধরা হইয়া থাকে। পাকা টম্যাটো ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিলে সপ্তাহ খানেক রাখা যায়। যদি কোন কারণে পাকিবার আগেই তুলিতে হয় তবে ছোট একটি বাক্সে শুক্‌না ঘাস বা খড়ের মধ্যে থাকে থাকে সাজাইয়া ভাল করিয়া মুখ আটকাইয়া (প্যাক করিয়া) রাখিলে ভাল থাকে। তবে মাঝে মাঝে বাক্সটি খুলিয়া যেগুলি লাল হইবে সেগুলি সরাইয়া রাখিতে হইবে।

গোল আলু একটি অতি প্রয়োজনীয় সব্জী। কাজেই ইহা কিছুদিন রাখিতে পারিলে খুবই সুবিধা হয়। অল্প পরিমাণে আলু রাখিতে হইলে ব্যাগে ভরিয়া একটি অন্ধকার ঘরে রাখিলে কয়েকদিন ভাল থাকিবে। বেশী পরিমাণে আলু রাখিতে হইলে একটু উঁচু শুক্‌না জায়গায় ৬ ইঞ্চি গভীর ও ৪ ফুট চওড়া গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে স্তূপাকারে আলু রাখিবার পরে উপরে খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। খড়ের উপরে আবার উঁচু করিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে যেন বৃষ্টির জল না জমিয়া ঝরিয়া যাইতে পারে। একেবারে সবচেয়ে উপরে মাটি না দিয়া কিছু খড়-দেওয়া জায়গা রাখিতে হইবে আর্দ্র বাষ্প বাহির হইবার জন্য। যদি জায়গাটি নীচু হয় তবে উপরদিকটায় স্তূপ করিয়া দুইদিকে নালী বা নর্দমা খুঁড়িতে হইবে। প্রয়োজনমত যখনই আলু বাহির করিবে তখনই ভাল

করিয়া গর্তের মুখ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে আলু অনেকদিন রাখা যায়।

• বীট মাটিতে রাখিলেই ভাল থাকে তবে ইঁদুর ইত্যাদির উৎপাত এড়াইবার জন্য অনেকগুলি একসঙ্গে আঁটি বাঁধিয়া কিংবা বাক্সের মধ্যে বালি দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও ভাল থাকে।

গাজর যথাসম্ভব মাটিতে রাখিতে পারিলেই ভাল। গাজর গরম জায়গায় রাখিতে নাই। ঠাণ্ডায় বাক্সে রাখিলে ভাল। বাক্সটি যেন মাটি হইতে উঁচু হয় এবং বাক্সটির তলা দিয়া বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। প্যাক করিয়া রাখিলে সামান্য আর্দ্র অথচ স্যাঁতস্যাঁতে নয় এরূপ জায়গায় রাখিতে হইবে।

শালগম, ওলকপি স্তূপাকারে খড় বা বালু দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ভাল থাকে। বেশী পরিমাণে রাখিতে হইলে আলুর মতই রাখিবে।

সব্জী শুকাইয়া রাখা আমাদের দেশে সহজ ও স্বাভাবিক। রৌদ্র আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ বিনা খরচে করিয়া দেয়। আমাদের দেশে কুল, তেঁতুল শুকাইয়া, আম শুকাইয়া আমচুর বহুদিন হইতেই উপাদেয় খাদ্য হিসাবে চলিতেছে। মূলা গোল গোল চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে অসময়েও খাওয়া চলিতে পারে। ব্যবহার করিবার ঘণ্টা খানেক আগে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া রান্না করিলে খাইতে বেশ লাগে।

শুকাইয়া রাখার সুবিধা এই যে ইহাতে জিনিসগুলি ওজনে হাল্কা ও আয়তনে ছোট হয়, টাটকা জিনিসের গুণ বজায় থাকে।

আলু, গাজর ইত্যাদিও কাটিয়া শুকাইয়া রাখা যায়। তবে এগুলি ভাপে ৮ হইতে ১৫ মিনিট অর্ধসিদ্ধ করিয়া ছোট ছোট গোল চাক করিয়া কাটিয়া খুব কড়া করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। অনেকে এই শুক্‌না আলু, গাজর ইত্যাদি গুঁড়া করিয়া টিনে

মুখ আটকাইয়া রাখিয়া দেন, পরে ইচ্ছামত খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি স্যুপ তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করেন।

ছোট কচি মটর, শিম বা বরবটি ৩ হইতে ৫ মিনিট কাল ভাপ দিয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইতে হইবে। বড়গুলি পাতলা করিয়া সমান টুকরা করিতে হইবে, পরে সূতায় গাঁথিয়া একটু ভাপ দিয়া ছড়াইয়া শুকাইতে হইবে। ইহার পরে ভাল করিয়া রাখিয়া দিলে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাইতে পারে। হয়তো একবারেই সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে না। প্রতিদিন দুই-এক ঘণ্টা করিয়া শুকাইতে দিলেও চলিবে, কিন্তু এই সময়ে ঐগুলিতে যেন আর্দ্রতা (Damp) না লাগে সে বিষয়ে খেয়াল রাখিতে হইবে। যখন কোনরকম আর্দ্রতা থাকিবে না তখনই সম্পূর্ণ শুকাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শাকপাতাও স্বাভাবিক ভাবেই শুকাইয়া রাখা যাইতে পারে। শাকসব্জীগুলি কচি ও টাটকা হওয়া দরকার এবং ময়লা থাকিলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া নেওয়া ভাল। শুক্‌না, ক্ষয়ে-যাওয়া, থেঁতলানো অংশগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর ভাল করিয়া মুছিয়া লইতে হইবে। লতাপাতাগুলি একেবারে পুরা রৌদ্রে রাখিতে নাই। এগুলি কাগজের উপর পাতিয়া যতক্ষণ না শুকাইয়া ভাঙ্গিবার মত হয়, ততক্ষণ ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখিয়া শুকাইতে হইবে। শুকাইবার পরে কাগজের ব্যাগে ভরিয়া শুক্‌না জায়গায় রাখিতে হইবে। প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা চলিবে। নিজের নিজের রুচিমত গুঁড়া করিয়া টিনে রাখিয়াও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইগুলি শুকাইবার সময় যাহাতে ধূলাবালি না পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খাদ্য শুকাইয়া সংরক্ষণ করিলে সহজে ঐ খাদ্যে বীজাণু জন্মাইতে পারে না, ছাতাপড়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং সহজে ঈস্ট

জন্মায় না। রৌদ্রে শুকাইতে হইলে যখন রৌদ্রের তেজ প্রখর হয় এবং বায়ুতে আর্দ্রতা কম থাকে সেই সময় শুকাইলেই ভাল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শীতকালই শুকাইবার শ্রেষ্ঠ সময়।

বাঁধাকপি কিন্তু এই উপায়ে সংরক্ষণ করা যায় না। টাটকা বাঁধাকপির বাহিরের দিকের পাতাগুলি এবং শক্ত ডাঁটাগুলি ফেলিয়া দিয়া চার টুকরা করিয়া ধুইয়া, জল সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ছোট ছোট সরু ফালি করিয়া একটি বোতল বা পাত্রে দুই ইঞ্চির বেশী পুরু না হয় এই ভাবে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। পাঁচ সের পরিমাণ বাঁধাকপিতে দুই ছটাক পরিমাণ লবণ প্রত্যেক থাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই ভাবে পাত্রটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে ভালভাবে চাপ দিবে। সবচেয়ে উপরের থাকটি বড় বড় কপিপাতা দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপরে একটি ভারী তক্তা রাখিয়া চাপ দিতে হইবে যাহাতে লবণের সংস্পর্শে যে জল বাহির হইবে সেই জলে সমস্ত বাঁধাকপি ডুবিয়া যায়। পরে পাত্রটি দুই-তিন সপ্তাহের বেশী না হয় এই ভাবে একটি গরম জায়গায় রাখিতে হইবে। তারপর ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া খুব শক্ত করিয়া মুখ আটকাইয়া রাখিবে যেন বাতাস না ঢুকিতে পারে। যদি লবণজল শুকাইয়া যায় তবে ১ সের লবণ ৯ পাঁইট (প্রায় ৩-৩½ সের) জলে মিশাইয়া বাঁধাকপিগুলি সম্পূর্ণরূপে আবার ঢাকিয়া দিতে হইবে। লবণজল ঐ অনুপাতেই তৈয়ারী করিবে।

খাদ্যের অপচয় নিবারণ

শস্যক্ষেত্রে, ফলের বা তরিতরকারীর বাগানে যেখানে খাদ্য উৎপন্ন হয় সেখান হইতে রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছাইতে বিভিন্ন প্রকারে খাবারের অপচয় ঘটিয়া থাকে।

খাদ্যের এইরূপ অপচয় নিবারণ করিয়া খাদ্য উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিতে হইলে বীজ-বপন, শস্য-উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্যের সঞ্চয়, রপ্তানী, খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতীকরণ ও সুনিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্যের সহযোগে উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। কৃষক, গৃহকর্ত্রী এবং যাঁহারা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল হোস্টেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে খাবার সরবরাহ করিয়া থাকেন তাঁহাদের খাদ্য-সংরক্ষণ ব্যাপারে দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা দরকার।

আমাদের জাতীয় খাদ্য-উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মত চাষের দ্বারা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভূমি ও ভূমির গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করিয়া ফসলের উৎপাদন বাড়ানো হইয়াছে। শস্যের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ নষ্ট করিবার জন্য নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া শস্যের ক্ষতি নিবারণ করা হইতেছে। উন্নত ধরনের সার প্রয়োগে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। কৃষিকর্মের উন্নতিসাধন, কৃষকের জীবনযাত্রার উন্নত মান, ডেয়ারী (Dairy), পশুপালন (Poultry) প্রভৃতির সাহায্যে উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

কৃষি ও গৃহবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে চাষীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে এবং যাহাতে তাহাদের অবস্থা উন্নত হয় সেই বিষয়ে নানা প্রকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তি ও পরিবারের উত্তম খাদ্য সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে।

গৃহ-সংলগ্ন ফলের বাগান ও তরকারীর বাগান পরিবারের খাদ্যের অভাব অনেকখানি মোচন করে। বাজার হইতে ক্রয় না করিয়া গৃহস্থ নিজের বাগানের উৎপন্ন ফল ও তরিতরকারীর সাহায্যে দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্যের কিছুটা অভাব দূর করিতে পারেন। নিজের

বাগানের শাকসব্জী ও ফলমূলাদি টাটকা থাকে বলিয়া অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত। নিজ হাতে বাগান করিলে মনেও আনন্দ লাভ করা যায়। ইহা অবসর বিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা ব্যতীত বাগানের সাহায্যে গৃহস্থের আয়ের মাত্রাও খানিকটা বাড়িতে পারে।

পরিকল্পনা না করিয়া ক্রয় করার ফলে, বৃথা সঞ্চয়ের জন্য, পরিত্যক্ত অংশের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার না করার দরুন, উত্তমরূপে রন্ধন না করার জন্য, অনাবশ্যক ভাবে পরিবেশন করায় ও অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজনে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের বহু অপচয় হয়। নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিলে অপচয়ের হাত হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

(১) ক্রয়ের পরিকল্পনা ঃ

(ক) খাদ্য-তালিকা ও প্রচলিত খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ ও হিসাব গ্রহণ করা দরকার।

(খ) অন্য খাদ্যের সহিত উদ্বৃত্ত খাদ্যের হিসাব রাখিলে ভাল হয়।

(গ) বিনা প্রয়োজনে ফল বা তরিতরকারীতে হাত দেওয়া উচিত নয়।

(ঘ) খাদ্য ক্রয় করিবার পূর্বে খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(২) খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(ক) পাতলা খোসাযুক্ত তরিতরকারী—বিশেষতঃ আলু খোসা না ছাড়াইয়া রান্না করা ভাল। ইহাতে আলুর খনিজ পদার্থ বা ভিটামিনের অপচয় হয় না। আলুগুলি যেন ভাঙ্গিয়া না যায়, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিবে।

(খ) অঙ্কুরিত ছোলা যত বেশী ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

(গ) মূলা, বীট ও গাজরের পাতাগুলি ফেলিয়া না দিয়া শাক হিসাবে, কি তরকারী হিসাবে রান্না করা যাইতে পারে।

(ঘ) বাঁধাকপির বাহিরের পাতাগুলি ভিতরের পাতাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী ভিটামিন-সমৃদ্ধ বলিয়া সেগুলিও রান্না করা উচিত।

(ঙ) চাটনি অথবা অন্যান্য চাটনি-জাতীয় রান্নায় ঘোল বা দই যত কম সম্ভব ব্যবহার করিবে।

(চ) গমের তুঁষ ও চাউলের লাল অংশ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(ছ) কাটা তরকারী জলে ভিজান উচিত নয়।

(জ) খাদ্যের পুষ্টিমূল্য সংরক্ষণের জন্য তেঁতুল দিয়া বাসনপত্র মাজিবে।

(৩) আহারের নিয়ম :

(ক) প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও খাওয়া উচিত নয়।

(খ) অনিচ্ছায় কোন জিনিস খাওয়া উচিত নয়।

(গ) একবারে অল্প খাওয়া ভাল। প্রয়োজনমত পরে আর দুই-চারি বার খাওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) ফেলিতে না হয় এরূপ ভাবে পরিবেশন করিতে হইবে।

শিশুর খাদ্য-পরিকল্পনা

সাধারণ সুস্থ শিশুর জন্য যেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন কোন বিশেষ শারীরিক দুর্বলতা, অসুস্থতা বা অঙ্গবিকৃতিযুক্ত শিশুর জন্য সেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন হয় না—তাহাদের জন্য অন্য বিশেষ ধরনের খাদ্য দরকার। যে শিশু পুষ্টিকর খাদ্য পায়

নাই তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। কঠিন বা দীর্ঘকালস্থায়ী পুরাতন রোগগ্রস্ত শিশু, দৈহিক ত্রুটিযুক্ত শিশু—যাহাদের বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তাহাদিগের জন্য যত্ন ও বিবেচনা সহকারে খাদ্য নির্বাচন করা উচিত। এমন কি অপুষ্টির জন্য তাহাদের শারীরিক অসুস্থতা না হইয়া থাকিলেও ঐ খাদ্য তাহাদের রোগ নিরোধ ও রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

রুগ্‌ণ শিশুর খাদ্য ঃ

রুগ্‌ণ শিশুর পুষ্টির জন্য বিশেষ যত্নের সহিত খাদ্য পরিকল্পনা করা দরকার। ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী খাদ্য ও খাদ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত। খাদ্য এমনভাবে দিতে হইবে যেন রুগ্‌ণ শিশুর খাইতে কোন অসুবিধা না হয় এবং খুশিমনে খাইতে পারে।

কঠিনরোগগ্রস্ত শিশু অনেক সময় খাইতে চায় না এবং অনেক সময় ডাক্তাররাও একবার না খাওয়ার জন্য উদ্বেগ বোধ করেন না। নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ যদি রোগীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয় তবে রোগীর হজমের কোন ব্যাঘাত না হয় বা রোগী অস্বস্তি বোধ না করে এরূপ ভাবে খুব কৌশলে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে পরিবেশন করিতে হইবে। যে কোন রস বা দুধ সরতোলা শুক্‌না দুধের ও ডিমের সহিত মিশাইয়া এবং একটু সুগন্ধযুক্ত করিয়া রোগীকে খাইতে দিলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন, মিনারেলস, ভিটামিন ও শক্তির প্রয়োজন মিটায়। রুগ্‌ণ শিশুকে সর্বদাই মিষ্টি কথায় খাদ্যগ্রহণে উৎসাহিত করিতে হইবে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কখনও কুখাদ্য বা রোগীর পক্ষে অনিষ্টকারী খাদ্য দেওয়ার লোভ দেখাইয়া খাওয়ান উচিত নয়। রোগের তীব্রতা কমিয়া আসিলে একটু বলসঞ্চার হয়

এবং ক্ষুধাও বাড়িতে থাকে। রোগে শরীরের যে সকল মাংসপেশী ও তন্তুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেইগুলি পুনরায় সবল সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য এই সময়ের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন, মিনারেলস ও ভিটামিন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সময়ে ক্ষুধার অতিরিক্ত একটুও খাওয়াইবে না, কারণ ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

আবার ক্ষুধা কমিয়া যাইতে পারে এমন খাদ্য বা মিষ্ট দ্রব্য দিতে নাই। যে সকল খাদ্যে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় উপাদান আছে—যেমন দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, ডিম, ফল, শাকসব্‌জী এবং হোলগ্রেন ও এনরিচ্‌ড রুটি বা খাদ্যশস্য এমন ভাবে রান্না করিতে হইবে যাহাতে শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হয়, শিশু তৃপ্তি পায় এবং সর্বোপরি তাহাতে শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান বেশী থাকে।

দীর্ঘদিনের রুগ্‌ণ কিংবা শারীরিক বিকৃতি বা ত্রুটিযুক্ত শিশুর একটি খাদ্য অনেকদিন ধরিয়া চলে বলিয়া মাঝে মাঝে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া দরকার যাহাতে তাহার শারীরিক প্রয়োজনও মিটিতে পারে, আবার তাহাকে তৃপ্তিও দেয়। তাহার খাদ্যব্যবস্থা করিবার সময় তাহার মানসিক দিকটিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অপরের খাদ্য হইতে তাহার খাদ্য ভিন্ন বলিয়া সে যাহাতে নিজেকে বঞ্চিত মনে না করে বা অযথা গুরুত্ব দিয়া নিজে কুণ্ঠিত না হয়—তাহার অনুভূতি ক্ষুব্ধ না হয় খাদ্যব্যবস্থা করিবার সময় সে কথা বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্বাচন করিতে হইবে।

যাঁহার উপরে শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিবেশনের ভার থাকিবে তাঁহাকে সহানুভূতিশীলা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না হইতে হইবে। উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করার দায়িত্ব তাঁহার। বাড়ীর সকলেরও এই বিশেষ খাদ্যের প্রতি শিশুর সুস্থ মনোভাব গড়িয়া তুলিতে একযোগে কাজ করিতে হইবে।

বিশেষ খাদ্য গ্রহণকারা শিশুর মাতাপিতার ডাক্তার, নার্স, সামাজিক শুশ্রূষাকারী প্রভৃতি সকলের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত্।

অত্যধিক ওজনের শিশুর খাদ্য :

যে শিশুর ওজন স্বাভাবিক শিশুর ওজন অপেক্ষা বেশী, ডাক্তার প্রথমেই সে কি খাদ্য খায় এবং ঐ খাদ্য শিশুর কার্য ও চলাফেরায় কতখানি ব্যয়িত হইতেছে তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন। ত্রুটিযুক্ত গ্ল্যাণ্ডের জন্য অত্যধিক ওজন হয়—সাধারণভাবে লোকের এই ধারণা ; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তাহা সমর্থিত হয় নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় শিশুর প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণই ইহার কারণ। কিন্তু কেন শিশু বেশী খায় ? হয়ত অনেক সময় সে পরিবারের বয়স্কদের খাদ্য গ্রহণ করে কিংবা প্রধান খাদ্যের মাঝে মাঝে সে যে খাবার খায় তাহা উচ্চ ক্যালোরী-যুক্ত। আবার কোন কোন শিশু আনন্দ করার অন্য কোন উপায়ের অভাবে বেশী খাইয়া তৃপ্তি পায়। কাজেই অতিরিক্ত ওজন সংশোধন করিতে হইলে খাদ্য কমাইতে হইবে এবং যে কারণে বেশী খায় সে কারণটি দূর করিতে হইবে।

ওজন কমাইতে হইলে প্রথমে একটি চার্ট রাখিতে হইবে এবং তাহার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ডাক্তারের নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি দিনের উন্নতি লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অতিরিক্ত খাদ্য কমাইলেও অস্থি, রক্ত ও মাংসপেশী গঠনকারী খাদ্যের সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে। যতদিন পর্যন্ত ওজন অতিরিক্ত থাকে, ততদিন ক্যালোরীবহুল ও অন্যান্য সামান্য উপাদান-যুক্ত খাদ্য বাদ দেওয়া যাইতে পারে। পরিমিত ওজন হইবার পরেও

যে শিশুর মোটা হওয়ার প্রবণতা আছে তাহার ঐ সকল খাদ্য পরিমিত পরিমাণ খাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

শিশু বেশী মোটা হওয়ার সূচনাতেই মাতাপিতার দেখিতে হইবে যে শিশুর খাদ্য যেন ক্যালোরীবহুল না হইয়াও সুখাদ্য ও ক্ষুধা-উদ্রেককারী হয় এবং শিশুর মানসিক অনুভূতি প্রকাশের যেন স্বাভাবিক পথ থাকে যাহাতে তাহাকে অতিরিক্ত ভোজনে তৃপ্তি খুঁজিতে না হয়

অপরিপুষ্ট (Malnourished) শিশুর খাদ্য :

অপরিপুষ্ট শিশুকে ডাক্তারের কাছে লইয়া গেলে ডাক্তার প্রথমেই জানিতে চেষ্টা করিবেন শিশুর কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগ অথবা শারীরিক কোন ত্রুটি আছে কিনা যাহা তাহার পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়। তাহার পরে মাতাপিতার নিকট হইতে শিশুর খাদ্য, ঘুমের অভ্যাস ইত্যাদি শিশুর সমগ্র জীবনধারার ইতিহাস জানিতে চাহিবেন। সবকিছু জানিবার পরে মাতাপিতাকে পরামর্শ দিবেন কি ভাবে শিশুর অবস্থা উন্নত করা যায়।

কিন্তু খাদ্যের, ঘুমের ও গতিবিধির অভ্যাস পরিবর্তন করা খুবই কষ্টকর। কাজেই ডাক্তারের নির্দেশমত চলা খুব সহজ নয়। খাদ্য নির্বাচনের ত্রুটির জন্য শিশুর হয়ত খাদ্য সম্বন্ধে কতগুলি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যাহা দূর করিতে সময় ও কৌশল দরকার।

অস্থি ও দাঁতের কয়েকটি বিশেষ ধরনের ত্রুটি ছাড়া অপুরিপুষ্টি-জনিত ক্ষতি শিশুর আহারের অভ্যাস পরিবর্তন দ্বারা সংশোধন করা যায়। অবশ্য যত অল্পবয়সে এই অভ্যাসের উন্নতি করা যায় ততই ভাল। সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে না খাওয়ার জন্যই অপরিপুষ্টি দেখা দেয়।

হয়ত তাহার খাদ্যে যথেষ্ট পুষ্টিকর উপাদান থাকে না, অথবা যে কোন কারণে সে হজম করিতে না পারার জন্য কাজ দেয় না। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও সুস্বাস্থ্যলাভের অভ্যাসগুলি বেশ অনেকদিন ধরিয়া অভ্যাস করিলে অপরিপুষ্ট শিশুও উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারিবে।

বর্ধিষ্ণু শিশুর আদর্শ খাদ্য-পরিকল্পনা ঃ

দুধ ঃ—দিনে আধসের হইতে একসের।

ফল ও শাকসব্জী ঃ—ভিটামিন 'সি'-বহুল খাদ্য, যেমন—কমলালেবু, টম্যাটো ইত্যাদি ; গোল আলু ও অন্যান্য শাকসব্জী ; সবুজ পাতাযুক্ত অথবা গাঢ় হলুদ শাকসব্জী—দিনে অন্ততঃ চার-পাঁচবার খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডিম ঃ—একটি।

মাছ-মাংস, অথবা যে কোন প্রোটীন-বহুল খাদ্য ঃ—দিনে একবার বা দুইবার।

হোলগ্রেন বা এনরিচ্‌ড রুটি ঃ—দিনে দুইবার বা তিনবার।

হোলগ্রেন বা এনরিচ্‌ড খাদ্যশস্য ঃ—দিনে একবার বা দুইবার।

মাছের লিভারের তেল কিংবা ভিটামিন 'ডি' যুক্ত অন্য কিছু ঃ—দুই বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের ভিটামিন 'ডি' সারা বৎসরই প্রয়োজন। শারীরিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের শীতের সময় ও বর্ষাকালে ইহা খাওয়া প্রয়োজন।

কতটা পরিমাণে এবং কি ধরনের ভিটামিন 'ডি' দিতে হইবে তাহা ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিত হইবে।

আইওডাইজ্‌ড সল্ট ঃ—যেখানে অন্য ভাবে আইওডিন পাওয়া যায় না সেখানে ইহা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

শিশুদের ক্ষুধা নিবারণে ও কর্মশক্তি আহরণের জন্য আরও অতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া দরকার। খাদ্যের পরিমাণ শিশুর বয়স ও আকার অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে। এই অতিরিক্ত খাদ্য উপরিউক্ত পরিকল্পনার খাদ্যের পরিবর্তে চলিবে না ; এ খাদ্যের উপর অতিরিক্ত দিতে হইবে।

অনুশীলনী

1. **How can food be preserved ?** (কি ভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা যাইতে পারে ?)
2. **Plan the meals for a child under twelve years of age.** (বার বছরের কম বয়স্ক শিশুর জন্য খাদ্য-তালিকা তৈয়ারী কর।)
3. **What are the points you would consider while planning menu for your home ? What do you understand by the Calorie-value of food ?** (গৃহের জন্য খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে ? খাদ্যের ক্যালোরী-শক্তি বলিতে কি বুঝ ?)
4. **What are the causes of deterioration in food ? What are the means of preventing deterioration ?** (খাদ্য নষ্ট হইবার কারণ কি কি ? কি ভাবে নষ্ট হইবার হাত হইতে খাদ্য রক্ষা করা যায় ?)
5. **Prepare a list of food articles for your morning tea.** (সকালবেলা চায়ের সঙ্গে খাবারের একটি খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত কর।)
6. **What should be the ideal diet for an invalid and sick person ?** (অক্ষম ও রুগ্‌ণ ব্যক্তির জন্য আদর্শ খাদ্য কি হওয়া উচিত ?)

7. Justify your answer that 'Milk is an ideal food'. ('দুগ্ধ আদর্শ খাদ্য'—ইহা যুক্তি সহ বর্ণনা কর।)
8. How would you plan your menu for mid-day meal? (দুপুরের খাদ্য-তালিকা সম্বন্ধে তুমি কিরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে?)
9. What things will you consider in planning your evening meal? (বৈকালিক খাবারের খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে কি কি বিষয় বিবেচনা করা দরকার মনে কর?)
10. What should be the different diets of a child from the age of one month to one year? (একমাস হইতে এক বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্য বিভিন্ন রকমের কিরূপ খাদ্য প্রস্তুত করা উচিত?)
11. Plan a day's diet for an old lady, who is slightly fat, and is suffering from diabetes. (বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন এরূপ স্থূলকায় বৃদ্ধার একদিনের জন্য খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত কর।)
12. What are the causes of deterioration of food? State the precaution which should be taken to prevent souring of milk. (খাদ্যবস্তু বিনষ্ট বা দূষিত হয় কি কি কারণে? দুধ যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবে?)
13. Write short notes on any one of the following:—

    (a) Food preservation, (b) Balanced diet, (c) Planning of meals for morning, mid-day and evening. [নিম্নলিখিত যে কোন একটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা কর:— (ক) খাদ্য সংরক্ষণ, (খ) সুষম খাদ্য, (গ) সকালবেলা, দুপুরবেলা, বিকালের খাদ্য-পরিকল্পনা।]
14. State briefly the function of carbohydrate in human body. Name any other food constituent that can replace carbohydrate. (মানবদেহে শর্করাজাতীয় পদার্থের

কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। শর্করাজাতীয় পদার্থের স্থান গ্রহণ করিতে পারে এরূপ অন্য কোন খাদ্য-উপাদানের নাম কর.।)

(H. S. 1962)

15. Write what you know about the composition of milk. Discuss the importance of milk and milk products in the diet of a child. (দুগ্ধের উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। শিশুর খাদ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।)

(H. S. 1962)

16. To what dietary factors are the following deficiency diseases related—(a) Scurvy, (b) Anaemia, (c) Rickets, (d) Goitre. Name the foods you would recommend to those suffering from the above diseases. [নিম্নলিখিত অভাবজনিত রোগের জন্য খাদ্যের কোন্ উপাদান সম্পর্কযুক্ত—(ক) স্কার্ভি রোগ, (খ) রক্তশূন্যতা রোগ, (গ) রিকেট রোগ, (ঘ) গলগণ্ড রোগ ? উক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত লোকের জন্য অনুমোদিত খাদ্যের নাম কর।]

17. What is food ? State the factors you should consider while planning a day's meal. (খাদ্য কাহাকে বলে ? দৈনিক খাদ্য-তালিকায় কোন্ কোন্ উপাদানের বিষয় বিবেচনা করা উচিত ?)

চতুর্থ অধ্যায়

বস্ত্র ও ব ত

পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের সভ্যতার পরিচায়ক। বিভিন্ন তন্তুর সাহায্যেই পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী হয়। কাজেই কোন্ ঋতুতে কোন্ তন্তুর বস্ত্র উপযোগী সে সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন তন্তুর গুণাগুণ জানা আবশ্যক।

পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ পদার্থ হইতে তন্তুর উৎপত্তি। সেই বিভিন্ন তন্তু হইতেই নানা প্রকারের কাপড় তৈয়ারী করা হয়। রেশম ও পশম প্রাণিজ তন্তু; তূলা, লিনেন ও রেয়ন উদ্ভিজ্জ তন্তু। স্বর্ণ-রৌপ্য হইতে জরি, এবং খনিজ পদার্থ হইতে নাইলন-তন্তু প্রস্তুত হয়। কোন্ কাপড় কিরূপ টেকসই হইবে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তন্তুর শক্তি ও দৃঢ়তার উপরে। সূতার আঁশ ইস্পাতের চিরুনি দ্বারা আঁচড়াইলে দেখিতে অনেকটা পশমের মত হয় এবং ঐরূপ আঁচড়ানো আঁশের সূতার কাপড়কে ফ্লানেলেট বলে। ইহা আসলে সূতার আঁশে তৈয়ারী কিন্তু দেখিতে পশমের মত। মলমল, ভয়েল কাপড় অতি সূক্ষ্ম তূলার আঁশ হইতে তৈয়ারী হয়।

তূলার তন্তু আকারে ছোট, কিন্তু ছোট হইলেও ইহার ভিতরে স্বাভাবিক পাকশক্তি আছে বলিয়া তূলার তন্তুগুলিকে একত্র করিয়া সহজেই শক্ত তন্তুতে পরিণত করা যায়। তূলা খুব তাড়াতাড়ি আর্দ্রতা গ্রহণ করিতে পারে, তাড়াতাড়ি শুকাইতেও পারে। ইহা দামে সস্তা, গ্রীষ্ম, শীত উভয় ঋতুতেই বেশ আরামের সহিত পরিধান করা যায় এবং বার বার ধুইলেও নষ্ট হয় না।

লিনেন-তন্তু ফ্লাক্স নামক এক প্রকার উদ্ভিদের তন্তু হইতে তৈয়ার করা হয়। এই তন্তু বেশ দীর্ঘ, শক্ত ও সরল। অন্য যে কোন উদ্ভিজ্জ তন্তু অপেক্ষা লিনেন তাড়াতাড়ি আর্দ্রতা গ্রহণ করে ও তাড়াতাড়ি শুকায়। লিনেনকে সহজেই বিরঞ্জিত করা যাইতে পারে। ইহার উপরিভাগ বেশ মসৃণ ও কোমল এবং সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ইহা বেশ উজ্জ্বল এবং অতি সহজেই ধৌত করা যায়। লিনেন কাপড় পরিতেও বেশ আরামদায়ক, তবে ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে ইহা খুব দামী। ভালভাবে ব্যবহার না করিলে এই তন্তু ছিঁড়িয়া যায় এবং কাপড় কুঁচকানোর সম্ভাবনা থাকে লিনেন-তন্তু ভালভাবে রঙ গ্রহণ করিতে পারে না।
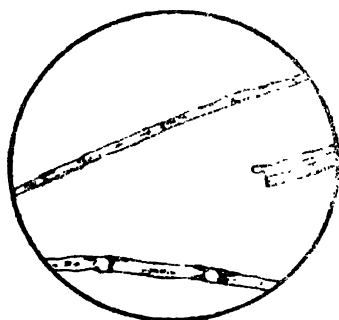
ফ্লাক্স

ভেড়া বা ছাগলের লোম হইতে পশম তৈয়ার করা হয়। একটা পশম-তন্তুর দৈর্ঘ্য ১ হইতে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ইহা শল্কজাতীয় তন্তু; এইজন্য সহজেই ইহার সাহায্যে উৎকৃষ্ট কম্বল জাতীয় বস্ত্র তৈয়ার করা যায়। শল্কজাতীয় পদার্থ থাকার দরুন পশমী কাপড় ধুইবার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার; তাহা না করিলে ইহা কুঞ্চিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। ইহা গন্ধ ও ধূলা আটকায়, এবং খালি গায়ে পরিলে খস্‌খসে লাগে।

পশমের তন্তু বেশ গরম। তন্তুগুলি জটপাকানো। জটপাকানো ও শল্কজাতীয় অবস্থা হওয়ার দরুন, পশম-তন্তুর ভিতর দিয়া অতি ধীরে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, ইহার জন্য পশমী বস্ত্র গরম বলিয়া

অনুভূত হয়। পশমী বস্ত্র তাড়াতাড়ি আর্দ্রতা গ্রহণ করিতেও পারে না, তাড়াতাড়ি শুকায়ও না। পশম প্রচুর পরিমাণ জল শোষণ করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে পরিধানকারী আর্দ্রতা বা ঠাণ্ডা অনুভব করে না। পশম কিয়দংশে অগ্নি-রোধক। পশম-তন্তু টেকসই, হাল্‌কা এবং ইচ্ছামত খুব নরম করা যাইতে পারে। পশম-তন্তু যে কোন প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ তন্তু অপেক্ষা বেশী দিন রঙ ধরিয়া রাখিতে পারে।

রেশম গুটিপোকা হইতে উৎপন্ন খুব সূক্ষ্ম তন্তু; ইহার স্বাভাবিক দ্যুতি আছে। ইহা দীর্ঘ, মসৃণ ও শক্ত। অতিরিক্ত মসৃণ বলিয়া ইহা সহজেই দেহ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেই জন্য রেশমী বস্ত্র সাবধানের সহিত পরিতে হয়। রেশম-তন্তু সহজে কুঁচকায় না; কুঁচকাইলেও ঝুলাইয়া রাখিলে ইহা আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সাদা রেশমী বস্ত্র বার বার ধুইলে বা বেশী দিন ব্যবহার করিলে হল্‌দে রঙ হইয়া যায়। ভাল ও দামী রেশম খুব টেকসই।

রেয়ন কৃত্রিম তন্তু। ইহা তূলা, কাঠমণ্ড ও সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ হইতে তৈয়ারী করা হয়। রেয়ন-তন্তু মসৃণ, সরল ও দীর্ঘ। অনেক সময় রেয়ন-তন্তু দেখিতে তূলা, পশম, রেশম অথবা লিনেন-তন্তুর মত হয়। ইহা সহজেই কুঁচকাইয়া যায়। ইহার ঔজ্জ্বল্যের জন্য ইহাকে শাটীনের (Satin) মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্যান্য বস্ত্রের মত ইহার কড়া রঙকে আংশিক ভাবে বিরঞ্জিত করা যাইতে পারে।

অনেক প্রকারের রেয়ন-তন্তু আছে। প্রায় সবগুলিই দেখিতে এক রকম। তবে এসব বিভিন্ন প্রকারের রেয়ন-তন্তু বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ইস্ত্রি করিলে ট্যাফেটা (Taffeta) রেয়ন-

তন্তু গলিয়া যায় এবং বেশী নিংড়াইলে ইহা স্থায়িভাবে কুঁচকাইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য রেয়ন-তন্তু গরম ইস্ত্রির সাহায্যে ইস্ত্রি করা যাইতে পারে। সমস্ত রেয়নই ভিজা অবস্থায় নরম ও শুষ্ক অবস্থায় শক্ত থাকে। সেইজন্য ভিজা অবস্থায় খুব সাবধানে রেয়ন ব্যবহার করা দরকার।

নাইলন কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তু। ইহা কয়লা, বায়ু এবং জলের সাহায্যে তৈয়ারী। নাইলন-তন্তু দৈর্ঘ্যে যতদূর সম্ভব বাড়ানো যাইতে পারে। ইহা রেশম-তন্তু হইতে বেশী স্থিতিস্থাপক এবং অন্যান্য তন্তু অপেক্ষা টেকসই। ইহা সহজে সংকুচিত হয় না এবং অতি সহজেই রঙানো যায়। ইহা খুব কম আর্দ্রতা গ্রহণ করে, সহজেই ধোওয়া যায় এবং শুকানো যায়। ইহা ইস্ত্রি করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। নাইলন শীতকালে ঠাণ্ডা এবং গরমের দিনে গরম বোধ হয়। বেশী উত্তপ্ত ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

তন্তু চিনিবার সহজ পরীক্ষা

বস্ত্রের তন্তু কি উপাদান দ্বারা গঠিত পরীক্ষা করিতে হইলে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারেঃ (১) ভৌতিক উপায় (Physical method), (২) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য, (৩) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য।

খালি চোখে তন্তুর আকৃতি দেখিয়া অনেক সময়ে তন্তু সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। অনেক সময় হাতে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াও বোঝা যায়। কোন তন্তুকে দাঁতের সাহায্যে ছিঁড়িয়াও ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা যায়। প্রজ্বলিত দেশলাই কাঠির সাহায্যেও তন্তু সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

সাহায্যে ছোট জিনিসকে বড় দেখায় বলিয়া তন্তুর স্বরূপ অনেকটা পুরোপুরি ভাবেই বোধগম্য হইতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তন্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।
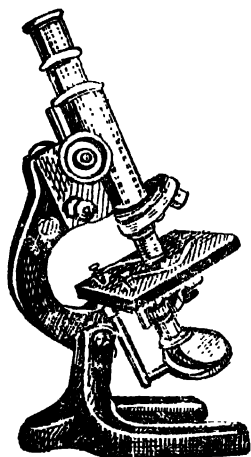
অণুবীক্ষণ যন্ত্র

তন্তু পোড়াইয়া তন্তুর স্বরূপ অতি সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রণালী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ সমস্ত উদ্ভিজ্জ তন্তু পোড়াইলে যেমন একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই রকম সমস্ত প্রাণিজ তন্তু পোড়াইলে তাহাদের পরিণতিও একই হয়। খুব নিশ্চিতভাবে তন্তু সম্বন্ধে জানিতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পরীক্ষা।

তন্তুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিবার পূর্বে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সাহায্যে তন্তুগুলির পাক ছাড়াইতে হইবে। প্রত্যেকটি তন্তুকে সূচ অথবা ধারালো সূচালো যন্ত্রের সাহায্যে পৃথক্ করিতে হইবে। তারপর এই তন্তুগুলিকে একটি কাচের স্লাইডের (slide) উপর রাখিয়া আর একটি কাচের স্লাইড দিয়া ইহা ঢাকিতে হইবে। দ্বিতীয় কাচের স্লাইড দিয়া প্রথম স্লাইডটিকে আবৃত করিবার পূর্বে কাচদণ্ডের সাহায্যে প্রথম স্লাইডে এক ফোঁটা জল দিয়া তারপর দ্বিতীয় স্লাইড চাপা দিলে ভাল হয়। এই জলের সাহায্যে তন্তুগুলি ঠিকভাবে প্রসারিত অবস্থায় কাচের স্লাইডের উপর থাকিতে পারে। সমগ্র তন্তুর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করার দরকার হয় না। বেশী তন্তু একত্রে স্লাইডের উপরে দিলে ইহা জটপাকানো দড়ির মত সংলগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। তন্তু পরীক্ষা করিতে হইলে দুই-তিনটির বেশী তন্তু নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তন্তুগুলি স্লাইডের উপর যাহাতে পৃথক্‌ভাবে থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যদি ভবিষ্যতের জন্য এই সব তন্তু পুনরায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তবে ইহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি ক্ষীণশক্তি গ্লিসারিন এই তন্তুগুলির উপর বিছাইয়া দিয়া স্লাইড চাপা দেওয়া হয় তবে ইহা প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত ভাল থাকিবে আর যদি গ্লিসারিনের পরিবর্তে গ্লিসারিন-বৎ জেলি ব্যবহার করা হয় আর চাপা দেওয়ার গ্লাসটি যদি মোম দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়, তবে ইহা বেশী দিন পর্যন্ত রাখা যাইতে পারে।

তন্তু আড়ভাবে কর্তনের (Cross-sections) ফলেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সব কাজ অনেক সময়সাপেক্ষ হইলেও একবার কর্তন করিয়া স্লাইডে গ্লাস (Cover glass) চাপা দিয়া রাখিলে ইহা দীর্ঘদিন রাখা যায়, এবং সহজে ইহা কোনমতেই নষ্ট হয় না। আড়াআড়ি ভাবে কর্তন করিতে হইলে কতগুলি তন্তু একসঙ্গে করিয়া ছোট আঁটি বাঁধিতে হয়। তারপর বায়ু বিতাড়ন করিবার জন্য ইহাকে বিশুদ্ধ অ্যালকোহলে ভিজাইয়া রাখা দরকার। ইহার পর গলিত প্যারাফিনের সহিত জাইলল (xylol) মিশাইয়া ইহাকে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। তন্তু ও মোম সমেত পাত্রটি কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আস্তে আস্তে উত্তপ্ত করিতে হইবে। ইহার ফলে অ্যালকোহল বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যাইবে এবং গলিত প্যারাফিন বা মোম তন্তুর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। তারপর্ পাত্রের

মধ্যস্থিত দ্রব্যগুলি ছাঁচের ভিতর ঢালিতে হইবে। তন্তুগুলিকে ঘিরিয়া তরল মোমগুলি ধীরে শক্ত হইতে থাকিবে। এই তন্তুগুলি মাইক্রোটোম (Microtome) অথবা ধারালো ব্লেডের সাহায্যে সহজে কাটা যাইতে পারে। মাইক্রোটোম যন্ত্রের সাহায্যে এক মিলিমিটারের $\frac{১}{১৫০০}$ অংশ সরু আড়াআড়ি ভাবে কর্তন করা যায়। এই ভাবে কর্তিত অংশ অ্যালবুমিন ও গ্লিসারিনের দ্রবণের সাহায্যে কাচের স্লাইডে আটকানো হয়। জাইলল মোম দূর করিয়া দেয়। তারপর আর একটি স্লাইড দিয়া ইহা চাপা দেওয়া হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে তন্তুর পরীক্ষা ভালভাবে করা যাইতে পারে। তবে দেখিতে হইবে, যে কাপড় বা তন্তু পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা পরিষ্কার কিনা, ইহার ভিতর তেল, চর্বি বা অন্য কোন পদার্থ আছে কিনা। কারণ ঐগুলি থাকিলে ভাল ভাবে পরীক্ষা করা যায় না। কোন কোন পরীক্ষাতে উষ্ণ চুল্লীতে তন্তুগুলিকে রাখার প্রয়োজন হয়।

দেখা যায় যে, উগ্র ক্ষার—যেমন কস্টিক সোডা প্রাণিজ তন্তুর ক্ষতিসাধন করে, কিন্তু উদ্ভিজ্জ তন্তুর ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না। অম্লজাতীয় পদার্থ (Acid) যদি খুব বেশী উগ্র না হয় তবে প্রাণিজ তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অম্লজাতীয় পদার্থ উদ্ভিজ্জ তন্তুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

রাসায়নিক পরীক্ষায় রেয়নগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মনে রাখিতে হইবে যে ভিস্‌কোজ (Viscose) এবং অ্যাসিটেট (Acetate) এই দুইটি প্রধান শ্রেণীর রেয়নের রাসায়নিক উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। ভিস্‌কোজ সেলুলোজ ধরনের আর অ্যাসিটেট সেলুলোজের যৌগ (compound) অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সমবায়ে গঠিত।

তুলা :—চোখের সামনে ধরিলে তূলার তন্তু অনুজ্জ্বল দেখায়, ইহাতে আলো প্রবেশ করিতে পারে না এবং দেখিতে একেবারে সাদা। যদি তূলার তন্তু দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তবে ইহাদের প্রান্তদ্বয়ের অগ্রভাগ ব্রাশের মত দেখায়। দাঁত দিয়া কামড়াইলে তূলার তন্তু ছিঁড়িয়া যাইবে।

তূলার তন্তু

তূলা পোড়াইলে হলুদ শিখায় জ্বলিয়া উঠে এবং কাগজ-পোড়া গন্ধের মত গন্ধ অনুভূত হয়। ইহাতে ধূসর রঙের ছাই খুব অল্প মাত্রায় থাকে।
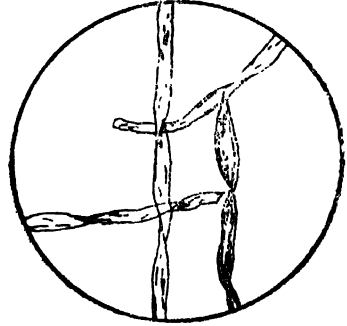
পরীক্ষা—কাপড়ের টানা এবং পোড়েন দুইটি সুতাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করা দরকার। এই সুতা দুইটি মোমবাতির জ্বলন্ত শিখার উপর ধরিবার পর মোমবাতিটি দূরে সরাইয়া লও। শিখার রঙ এবং কি হারে তন্তুটি পুড়িতেছে তাহা লক্ষ্য কর। তূলা পোড়ানোর গন্ধ এবং অবশিষ্ট ছাইটুকুও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে তূলাকে চ্যাপ্টা ফিতার মত দেখায়। ইহার ব্যাস প্রায় সর্বত্রই সমান। উত্তম শ্রেণীর তূলার ভিতর বেশ কয়েকটি পাক থাকে। পাক না থাকিলে তূলা যে কি ধরনের তাহা বলা যায় না। যখন তূলাকে মার্সেরাইজ্‌ড (mercerised) করা হয় তখন অনেকগুলি পাক দূর হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মার্সেরাইজ্‌ড তূলা সাধারণ তূলা অপেক্ষা অনেক বড় দেখায়।

ঘন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডে তূলা দ্রবীভূত হয়। ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা ঘন নাইট্রিক অ্যাসিডে তূলা সহজেই বিশ্লিষ্ট (decomposed) হইয়া যায়। কস্টিক সোডার ৫% দ্রবণে সিদ্ধ করিলে কোন পরিবর্তন হয় না। মার্সেরাইজেশান পরীক্ষা করিতে হইলে তন্তুকে দুই-একটি আয়োডিনের স্ফটিক (crystal) সহ জিঙ্ক ক্লোরাইডের ঘন দ্রবণে ডুবাইতে হইবে। তন্তুগুলি নীলবর্ণ ধারণ করিবে। তারপর জলে ধুইলে ইহা যদি মার্সেরাইজ্‌ড না হয় তবে রঙ ধুইয়া যাইবে, আর মার্সেরাইজ্‌ড হইলে রঙের কোন পরিবর্তন হইবে না।

শিমূল তুলা (Kapok) ঃ—ইহার আকৃতি অনেকটা তূলারই মত। তবে তূলার চেয়ে বেশী নরম ও রেশমী ভাবাপন্ন। ইহার রঙ মাখনের মত। তূলার মত ইহা পুড়িয়া যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ইহা চ্যাপ্টা, মসৃণ, পাকহীন দেখায়। জায়গায় জায়গায় ইহা স্বচ্ছ এবং আকৃতিহীন বলিয়া মনে হয়। শিমূল তূলার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মূলের প্রান্তভাগে ফোলানো বলের মত অংশ আছে। ইহার সাহায্যেই শিমূল তূলার বৈশিষ্ট্য ধরা যায়।

শিমূল তূলার ভিতরে লিগ্‌নো-সেলুলোজ (Ligno-cellulose) থাকে। ইহা ফ্লোরো-গ্লুসিনলের (একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ) এবং ক্ষীণশক্তি অ্যাসিডের সাহায্যে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। লিগ্‌নো-সেলুলোজ থাকিলে এই দ্রবণ তন্তুকে লাল করে। এই দ্রবণের সাহায্যে অন্যান্য তন্তুর কোন পরিবর্তন হয় না।

লিনেন ঃ—লিনেন-তন্তু থোকার মত এবং অসমান। ইহা অধিকতর শক্ত, ভারী এবং উজ্জ্বল। ইহার রঙ মাখনের মত। যদি লিনেন-সূত্রের পাক ছাড়াইয়া তন্তুগুলিকে পৃথক্ করা হয় তাহা

হইলে দেখা যাইবে যে তন্তুগুলির দৈর্ঘ্য বিভিন্ন ধরনের। সুতার ভিতরে তন্তুগুলি সোজা অবস্থায় শায়িত দেখা যায়। লিনেনের টানা-পোড়েন সাধারণতঃ অসমান থাকে। এজন্য লিনেন টানিয়া ছিঁড়িলে অসমান হয়।

লিনেন বস্ত্র স্পর্শ করিলে ঠাণ্ডা বলিয়া অনুভূত হয়। একখণ্ড লিনেন বস্ত্রের উপরে জল দিলে ইহা জল শুষিয়া লইবে, কিন্তু কাপড়ের পরিবর্তন হইবে না। তূলা হইলে কুঁকড়াইয়া নীচে যাইবে অথবা উপরে উঠিবে। আর একটি পরীক্ষা করিতে হইলে বস্ত্রটিকে বিশুদ্ধ তৈলে (যেমন—অলিভ অয়েল) ভিজাইতে হইবে। লিনেন হইলে স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে আর তূলার বস্ত্র হইলে ইহা অস্বচ্ছই থাকিবে। লিনেন পোড়াইলে তূলার মত হল্‌দে শিখা সহ জ্বলে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে জ্বলে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে লিনেন-তন্তুর কোষের পর্বসন্ধি কিছুটা স্ফীত থাকে। লিনেন-তন্তুর আকৃতি কিছুটা বংশদণ্ডের মত। কোন কোন তন্তুতে একটা সরু নালীর মত আকৃতিও দেখা যায়।

সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে লিনেন দ্রবীভূত হইবে, কিন্তু তূলার মত ইহার অত ক্ষতি হইবে না। ৫% ক্ষীণশক্তি সম্পন্ন ফুটন্ত কস্টিক সোডার দ্রবণ লিনেন-তন্তুর বেশী ক্ষতি করিতে পারিবে না।

র‍্যামি ঃ—র‍্যামি ফ্লাক্স বা লিনেন-তন্তু হইতে অনেক বেশী শক্ত। উদ্ভিজ্জ তন্তুর ভিতরে ইহা সব চেয়ে বেশী চওড়া—ইহা লিনেন-তন্তু হইতে দ্বিগুণ চওড়া। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই তন্তুকে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া র‍্যামি-তন্তুর ভিতরে সমান্তরাল নালীশ্রেণী এবং সরল কালো রেখার দাগ দেখা যায়।

র‍্যামি-তন্তু পোড়াইলে লিনেনের মতই হল্‌দে শিখা সমেত জ্বলিয়া উঠে। পোড়ানোর পর খুব অল্প ধূসর বর্ণের ছাই থাকে। লিনেন অপেক্ষা র‍্যামি অ্যাসিডের সংস্পর্শে কম রাসায়নিক বিক্রিয়া করে।
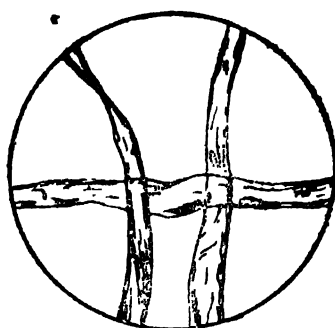
র‍্যামি

পাট ঃ—পাটের ভিতর লিগ্‌নো-সেলুলোজ (Ligno-cellulose) নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ থাকে।

ফ্লোরো-গ্লুসিনল (Phloro-glucinol) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পাটতন্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।

রেশম ঃ—রেশম খুব মোলায়েম তন্তু। ভারতবর্ষে তসর, গরদ, মটকা, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি নানা ধরনের রেশম পাওয়া যায়। রেশম হইতে প্রস্তুত সাটিন একদিকে অত্যন্ত চকচকে, অপর দিকে খস্‌খসে হয়। ভেলভেট জাতীয় কাপড়ে রেশমের মিশ্রণ থাকে। দাঁতের সাহায্যে পরিষ্কার রূপে কাটা যায়, তূলাতন্তুর মত ইহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া যায় না। প্রত্যেকটি রেশম-তন্তু রেয়ন-তন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও হাল্‌কা।

কৃষিজাত রেশম
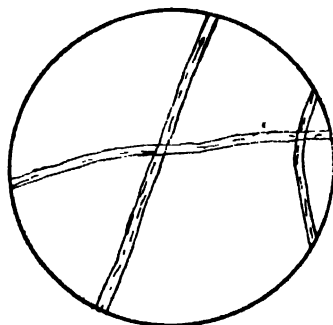
রেশম-তন্তু আগুনে কোন শিখা উৎপন্ন না করিয়া খুব তাড়াতাড়ি জ্বলিয়া যায়। পোড়ার পর ভঙ্গুর ছাইয়ের মালার সৃষ্টি হয়।

ইহা পোড়াইলে পশমের মত, শিং, পাখীর পালক অথবা চুল-পোড়া গন্ধের মত গন্ধের সৃষ্টি করে। যদি রেশম-তন্তু ধাতব লবণের সঙ্গে পোড়ানো হয়, তাহা হইলে এই তন্তু আগুনে না গলিয়া ছাইয়ে পরিণত হইবে। তবে আগুনের শিখায় উত্তাপের সঙ্গে রেশম-তন্তু আলো বিকিরণ করিবে। কৃত্রিম রেশম পোড়াইলে ফর্‌ফর করিয়া জ্বলিয়া যায় এবং কাগজ-পোড়া গন্ধের মত গন্ধ হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে চাষে উৎপন্ন রেশম শক্ত সূক্ষ্ম ব্যাসযুক্ত দণ্ডের মত দেখাইবে, কিন্তু মাঝে মাঝে ইহা অনিয়তাকার ও স্ফীত দেখাইবে। বন্য রেশমের ব্যাসের পরিধি বড় এবং মাঝে মাঝে পাক থাকে এবং তন্তুর দৈর্ঘ্যে মাঝে মাঝে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়।

কস্টিক সোডার ১০% উত্তপ্ত দ্রবণ চাষের রেশমকে ১২ মিনিটে দ্রবীভূত করিয়া ফেলিবে। বন্য রেশমের এই দ্রবণে দ্রবীভূত হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগিবে। কস্টিক পটাশ দ্রবণে কৃত্রিম রেশমে হরিদ্রাভ দাগ পড়ে; আসল রেশমে কোন দাগ পড়ে না।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড চাষের রেশমকে সঙ্গে সঙ্গে দ্রবীভূত করে—বন্য রেশমকে দ্রবীভূত করিতে ইহার প্রায় কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। জিঙ্ক ক্লোরাইড চাষের রেশমকে খুব তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত করে, কিন্তু বন্য রেশম এই দ্রবণে খুব ধীরে দ্রবীভূত হয়। ক্রোমিক অ্যাসিড (Chromic acid)-এর সাহায্যে ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে।

রেয়ন (Rayon):—রেয়ন প্রধানতঃ চারি প্রকারের—(১) ভিস্‌কোজ (Viscose), (২) অ্যাসিটেট (Acetate), (৩) কিউপ্রা (Cupra), (৪) নাইট্রো (Nitro)।

(১) ভিস্‌কোজ (Viscose)—ইহা রেশম-তন্তু অপেক্ষা অনেক বেশী উজ্জ্বল, তবে ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করিলে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল দেখায়। ইহা কিছুটা শক্ত এবং ভিজাইলে ইহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ভিস্‌কোজ তন্তু কাচের দণ্ডের মত দেখায়, কখনও কখনও লম্বালম্বি ভাবে সরল রেখা তন্তুর ভিতর স্পষ্ট দেখা যায়। তন্তুর ভগ্ন অংশ দাঁতযুক্ত কিনারার মত দেখায়।
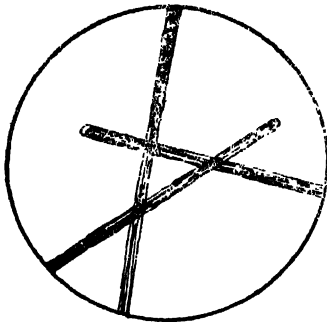
ভিস্‌কোজ রেয়ন

ভিস্‌কোজ তূলার মত উজ্জ্বল শিখার সহিত খুব তাড়াতাড়ি পুড়িয়া যায়। ছাইয়ের অংশ খুব কম থাকে।

১% অ্যামোনিক্যাল সিলভার নাইট্রেটের সহিত ভিস্‌কোজ-তন্তু উত্তপ্ত করা হইলে ইহার রঙ বাদামী হইবে। আয়োডিন ও ঘন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে ভিস্‌কোজ-তন্তু নীলবর্ণ ধারণ করিবে।

(২) অ্যাসিটেট (Acetate)—অ্যাসিটেট-তন্তু ভিস্‌কোজ-তন্তু অপেক্ষা অধিকতর নরম ও সূক্ষ্মতর। ইহার আকৃতি অণুবীক্ষণের নীচে ভিস্‌কোজ রেয়নের তন্তুর মত দেখায়,
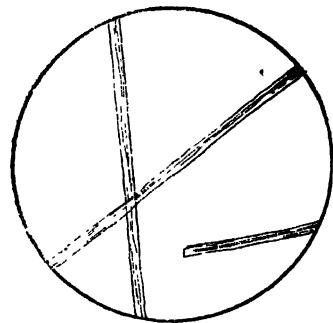
অ্যাসিটেট রেয়ন

লম্বালম্বি ভাবে অনেকগুলি দাগ থাকার পরিবর্তে, ইহার দুইটি

সমান্তরাল রেখা থাকে। আড়াআড়ি ভাবে কাটিলে অ্যাসিটেট-তন্তু বেশ গোল দেখায়।

দহনের সাহায্যে অন্যান্য রেয়ন-তন্তু অপেক্ষা অ্যাসিটেট রেয়ন-তন্তুর পার্থক্য বেশ ভালভাবে বুঝা যায়। অ্যাসিটেট রেশম-তন্তুর মত দাহ্য—প্রথমে উত্তাপে ইহা গলিয়া যায়, তারপর কৃষ্ণবর্ণের ভস্মস্তূপের গোলাকার আকৃতি ধারণ করে। এই গোলাকার পদার্থ রেশম-তন্তুর মত অত ভঙ্গুর নহে, বেশ শক্ত। পুড়িবার সময় অন্যান্য রেয়ন-তন্তু অপেক্ষা ইহা ভিন্ন প্রকার গন্ধের সৃষ্টি করে। এই গন্ধ অনেকটা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের (Acetic acid) মত। একমাত্র অ্যাসিটেট রেয়ন-তন্তুই অ্যাসিটোনে (Acetone) দ্রবীভূত করা যাইতে পারে।

(৩) **কিউপ্রা (Cupra)**—কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম রেয়নের পরিধি খুব সূক্ষ্ম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ইহা কিছু কিছু দাগ সমেত একটি কাচের নলের মত দেখায়। ইহা ভিস্‌কোজ রেয়ন-তন্তুর মত দাহ্য।

আয়োডিন ও ঘন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে কিউপ্রা ফিকে নীল বর্ণ ধারণ করে।

(৪) **নাইট্রো (Nitro)**—নাইট্রো সেলুলোজ রেয়ন ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে অনেকটা কিউপ্রা-তন্তুর মত, তবে ইহার পরিধি বৃহত্তর। নাইট্রো-তন্তু ভিস্‌কোজ-তন্তুর মত পুড়িয়া যায়, তবে ইহা খুব তাড়াতাড়ি পোড়ে না। যদি নাইট্রো-তন্তুর সঙ্গে ডাইফেনিল অ্যামাইন সালফেটের (Diphenyl amine sulphate) দ্রবণ মিশানো হয় তবে নাইট্রো-তন্তু গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করিবে এবং অবশেষে নীল দ্রবণে পরিণত হইবে। অন্যান্য রেয়ন-তন্তুর উপর ডাইফেনিল

অ্যামাইনের কোন প্রভাব নাই। আয়োডিন ও ঘন সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে নাইট্রো-তন্তু লালবর্ণ ধারণ করিবে।

নাইলন (Nylon) :—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে নাইলন-তন্তু কিউপ্রা, নাইট্রো ও অন্যান্য রেয়ন-তন্তুর মত দেখায়। ইহা দাগহীন, স্বচ্ছ, সমান ব্যাসযুক্ত কাচদণ্ডের মত। নাইলন-তন্তু পোড়াইবার ব্যবস্থাই নাইলন-তন্তুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার উৎকৃষ্ট উপায়। নাইলন-তন্তুগুলি আগুনের শিখায় পোড়াইলে গলিয়া যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ইহা শক্ত আকার ধারণ করে না। আগুনে ধরিলে নাইলন-তন্তু শিখা বিস্তার করে না। নাইলন-তন্তুগুলি আঠালো বলিয়া বোধ হয় এবং চাপ দিলে চ্যাপ্টা হইয়া যায়। গলিত নাইলন ঠাণ্ডা করিলে শক্ত আঠার রূপ ধারণ করে এবং রেশমের ছাইয়ের মত হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে ইহাকে ভাঙ্গা তখন দুষ্কর হইয়া উঠে। সেলুলয়েড (Celluloid)-এর মত উগ্র গন্ধ না হইলেও ইহার একটি বিশিষ্ট গন্ধ আছে।

নাইলন অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত হয় না, এইজন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজেই ইহাকে অ্যাসিটেট-তন্তু হইতে পৃথক্ রূপে ধরা যায়। কস্টিক সোডার ১০% দ্রবণ নাইলন-তন্তুর কোন ক্ষতি করে না। খনিজ অ্যাসিডের ঘনীভূত দ্রবণে নাইলন-তন্তু একেবারে তরল পদার্থে পরিণত হয়।

সোডিয়াম পারঅক্সাইড ও সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট নামক দুইটি বিরঞ্জক দ্রব্য পরিমিত ঘনত্বে ও উত্তাপে নাইলনের বিশেষ কোন ক্ষতি করে না। উত্তাপ ও ঘনত্বের পরিমাণের মাত্রার আধিক্য হইলে নাইলন-তন্তু বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

নাইলন ২৫° সে. ফিনল (Phenol), এম্‌-ক্রিসল্‌ (M-cresol),

জাইলিনল (Xylenol) এবং ঘন ফরমিক অ্যাসিড (Concentrated formic acid) দ্রবণে দ্রবীভূত হয়।

নাইলন-তন্তুর গলনাংক ৪৮০° ফা.। এই উত্তাপের অনেক নীচে আমাদের বস্ত্রাদি ধৌত ও ইস্ত্রি করা হয়।

পশম তন্তু :—বিভিন্ন স্থানের ভেড়ার লোমের তারতম্য অনুসারে পশমেরও তারতম্য হয়। পশমের বিভিন্ন রকম আছে। গরম জামা বুনিবার উল বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন তন্তু হইতে উৎপন্ন হয়। এসিয়া-মাইনরের ভেড়ার লোমে উৎপন্ন পশমকে এঙ্গোরা বলে; ইহা একটি উৎকৃষ্ট পশম। আমাদের চির পরিচিত শাল, তুষ, মলিদা প্রভৃতিও বিভিন্ন ধরনের পশম হইতে প্রস্তুত করা হয়। আবার সার্জ, ফ্লানেল এবং কম্বল এইগুলিও পশমী বস্ত্রের অন্তর্গত। আরও নানা রকমের পশমী বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পশম-তন্তু অনেকটা স্প্রীংয়ের মত। এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তন্তুর ভিতরে দেখা যায় না। পশম-তন্তুর সাহায্যে কাপড় বুনিলেও ইহা অন্যান্য বস্ত্রের তন্তুর মত সমানভাবে থাকে না। ইহা বস্ত্রের উপরিভাগ হইতে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ান অবস্থায় থাকে। বুড়ো আঙ্গুল ও অন্যান্য আঙ্গুলের সাহায্যে পশমের শল্কগুলি বেশ ভালভাবে অনুভব করা যায়। পশম-তন্তু তত মসৃণ নয়, এবং দাঁত দিয়া ছিঁড়িলে ইহা বেশ শক্ত বলিয়া বোধ হয়। খালি চোখে বা বিবর্ধক কাচের (Magnifying glass) সাহায্যে পাকানো তন্তু হইতে পশম-তন্তুর পার্থক্য ধরা যাইতে
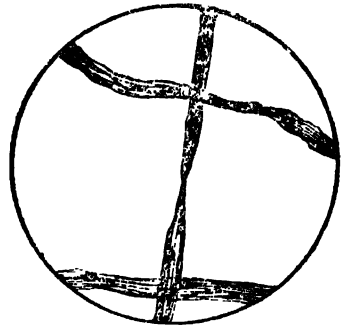
তুষের তন্তু

পারে। ছোট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পশম-সুত্রের তন্তুগুলি সব কোণাকুণি থাকে এবং কিনারা হইতে বাড়ানো থাকে। পাকানো সুতায় এই তন্তুগুলি পরস্পরের সহিত সমান্তরাল অবস্থায় ভালভাবে মোড়ানো থাকে।

পশম খুব ধীরে ধীরে পোড়ে, ইহাতে শিখার উৎপত্তি হয় না। এই তন্তু পুড়িলে বস্ত্রের প্রান্তে বা তন্তুর শেষে গোল দানার সৃষ্টি করে এবং পুড়িবার সময় চুল-পোড়া, পাখীর পালক বা শিং-পোড়া গন্ধের মত গন্ধের সৃষ্টি করে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে শল্কজাতীয় পদার্থের সাহায্যে পশমের বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। পশমের তন্তু অণুবীক্ষণে কতকগুলি কোষের সমষ্টির মত দেখায়। ইহাদের আকৃতি সমান নয়। মাছের আঁইশের মত একটি আর একটির উপরে থাকে। সেই জন্যই পশমের আঁইশের কিনারা সমান ও মসৃণ না দেখাইয়া ফাটা ফাটা খাঁজকাটা মত দেখায়। ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসে সূতীর আঁইশ সোজা ও মোটে উজ্জ্বল নয়। পশমের আঁইশ কুঞ্চিত। অন্যান্য প্রাণিজ তন্তু অপেক্ষা এই শল্কগুলি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মেরিনো উলের তন্তুগুলি আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি ভাবে বিদ্যমান থাকে। ক্রসব্রেড অথবা ইংলিশ উলের তন্তুগুলি ভগ্ন এবং মেরিনো উল অপেক্ষা অধিকতর সমানভাবে থাকে। কাঁচা উল দেখিতে ঢেউ-খেলানো হয়।

কস্টিক সোডার লঘু দ্রবণ পশমকে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে পশমের তন্তুগুলি ফুলিয়া উঠিবে, কিন্তু গলিবে না। নাইট্রিক অ্যাসিড ও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে পশম হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

উটের লোম (Camel hair) :—এই তন্তু নরম, কিন্তু দেখিতে

ঢেউ-খেলানো নয়। দেখিতে বাদামী বাদামী
ফকে বাদামী হইতে গ পশমের
মত পুড়িয়া থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে এই তন্তুর পরিধির বহু তারতম্য দেখা যায়। এই তন্তুগুলির রঙ বেশ উজ্জ্বল। সাধারণতঃ রঙগুলি তন্তুর এক পাশে দেখা যায়। ছোট ছোট লোমগুলি গোলাকার ছিদ্রযুক্ত চালুনির মত দেখায় এবং ইহার ভিতরে রক্তের মত লাল দাগ দেখা যায়।

মোহায়ির (Mohair) :—ইহা উজ্জ্বল ধূসর-শুভ্র বা নীল-ধূসর রঙের ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট একটি নরম তন্তু। এই তন্তু খাঁটি পশমের মত পুড়িয়া থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে শল্ক খুব ভালভাবে দেখা যায় না, তবে মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা দানা দেখা যায়। মোহায়ির-তন্তুর পরিধি মাঝারি হইতে লম্বা ধরনের হয় এবং তন্তু গোড়া হইতে আগার দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে।

খরগোসের লোম (Rabbit Fur) :—ইহা খুব নরম সূক্ষ্ম লোম। ভিজিয়া গেলে সহজেই জমিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সংযুক্ত মেরুরজ্জুর মত অংশ দেখিলে ইহাকে অন্যান্য তন্তু হইতে সহজেই পৃথক্ করা যায়।

কাশ্মীরি (Cashmere) :—ইহা সরল লোম, ঢেউ-খেলানো নয়। এই তন্তুর ভিতরে শল্ক বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহা খুব নরম এবং অন্যান্য পশমের পরিধি হইতে ইহার পরিধি সূক্ষ্মতর।

মিশ্র তন্তুর পরীক্ষা

উলের পরীক্ষা ঃ—পটাশিয়াম প্লাম্বেটের লঘু দ্রবণে যদি এক মিনিট কাল পশম-তন্তু সিদ্ধ করা হয় তবে ইহার রঙ কাল্‌চে বাদামী (dark brown) হইবে।

পশম ও তুলার মিশ্রণ ঃ—একটি বস্ত্রের ভিতরে কি পরিমাণ পশম ও তূলা আছে—ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(১) বস্ত্রের নমুনার অংশের শুষ্ক অবস্থায় ওজন লইয়া তারপর ইহাকে ঘন কস্টিক সোডার দ্রবণে সিদ্ধ করা দরকার। পশম গলিয়া যাইবে, কিন্তু তূলা পড়িয়া থাকিবে। ইহার পর তূলা হইতে জল নিংড়াইয়া, পরে শুকাইয়া ওজন করিয়া বাদ দিলে পশমের পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

(২) যদি শুষ্ক বস্ত্রখণ্ডটি সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয়, তূলা দ্রবীভূত হইবে এবং পশম পড়িয়া থাকিবে। ইহা আবার শুকাইয়া ওজন করিলে পশমের পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

(৩) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘন দ্রবণ তূলাকে ধ্বংস করিবে, কিন্তু পশমের কোন পরিবর্তন সাধন হইবে না।

পশম ও রেশমের মিশ্রণ ঃ—(১) সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণে রেশম বাদামী রঙের বস্তুতে পরিণত হইবে। একটু ট্যানিক অ্যাসিড ঢালিলে এই বাদামী পদার্থ নীচে থিতাইয়া পড়িবে, কিন্তু পশমের কোন ক্ষতি হইবে না।

(২) সোয়েজারের দ্রবণ (Schweitzer's solution) সমস্ত রেশমকে দ্রবীভূত করিবে, কিন্তু পশমের কোন ক্ষতি করিবে না। সোয়েজার দ্রবণ কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের (Cupra-

Ammonium Hydroxide) দ্রবণ, কপার হাইড্রেটকে অ্যামো-নিয়াতে দ্রবীভূত করিলে ইহা পাওয়া যায়। এই দ্রবণ কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম রেয়ন তৈয়ারী করিতে প্রয়োজন হয়। ইহার ভিতর তূলার তন্তু দিলে ফুলিয়া উঠে ও ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইতে থাকে।

(৩) উত্তপ্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রেশম-তন্তুকে দ্রবীভূত করে, পশমের কোন ক্ষতি করে না।

রেশম ও তুলার মিশ্রণঃ—১৫০ সিসি. পাতিত (distilled) জলে ১৬ গ্রাম কপার সালফেট দ্রবীভূত করিয়া, তারপর ১০ গ্রাম বিশুদ্ধ গ্লিসারিন দাও। তাহার পরে বিন্দু বিন্দু কস্টিক সোডার দ্রবণ ঢালিলে ধীরে ধীরে থিতানো পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।

যদি বস্ত্রটি এই মিশ্রণে ডুবানো হয় তবে রেশম দ্রবীভূত হইবে, কিন্তু তূলার কোন পরিবর্তন হইবে না। এই পরীক্ষা রেশম ও পশমের ক্ষেত্রেও করা যাইতে পারে; তাহার কারণ এই মিশ্রণে পশম-তন্তুর কোন পরিবর্তন হয় না।

কাপড়ের গুণাগুণ বিচার

কাপড়ের দোকানে বহু রকমের কাপড় দেখা যায়। এই বহু প্রকার কাপড়ের ভিতর কোন্‌টা টেকসই, কোন্‌টা ভাল ও দামে সুলভ এই সব বিচার করিয়া তবে কাপড় ক্রয় করা উচিত। যে সব কাপড় ধুইলে কুঁচকাইয়া যায় সেই সব কাপড় দিয়া জামা তৈয়ার করিলে জামা ছোট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বাজারে সানফোরাইজ্‌ড (Sanforized) নামে এক প্রকার কাপড় পাওয়া যায়। ইহা অন্যান্য কাপড়ের মত খুব বেশী কুঁচকায় না। প্রথমে দেখিতে হইবে যে কাপড়ের বুনট কি রকম—ঠাসা না

ফাঁকযুক্ত। যে সব বস্ত্রে টানা ও পোড়েনের সুতার ভিতরে বেশী ফাঁক থাকে সেই সব কাপড় ধুইলে সহজেই কুঁচকাইয়া যায়। সুতার আঁইশের দোষেও অনেক সময় বুনটের দোষ ঘটিয়া থাকে। যদি ঘন বুনটের কাপড় কাচিবার পর ছোট হইয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে তন্তুর আঁইশের ভিতরে ভেজাল আছে।

সংকোচনের পরীক্ষা :—যে বস্ত্রের সংকোচন পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার ১২ বর্গ ইঞ্চি মাপের দুইটি টুকরা প্রথমে লইতে হইবে। একটি টুকরা তুলনামূলক পরীক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে; অন্য টুকরাটি দুই মিনিট পর্যন্ত ভালভাবে ধুইতে হইবে। তারপর ইহা শুকাইয়া সমান করিয়া পাতিতে হইবে। তারপর ইহার উপর বারবার গরম ইস্ত্রির চাপ দিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই ঘষার প্রয়োজন হইবে না। ইহার পর দুইটি পাশাপাশি পরীক্ষা করিলে সংকুচিত হইয়াছে কিনা ভালভাবে বোঝা যাইবে।

কাপড়ের স্থায়িত্ব :—কাপড় টেকসই কিনা তাহা হাত দিয়া দেখিলেই অনেক সময় বোঝা যায়। ঘন বুনটের কাপড় শক্ত হয় ও সহজে ছিঁড়িয়া যায় না আর পাতলা বুনটের কাপড় সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। সূর্যের আলোর কাছে ধরিলেও অনেক সময় এইসব ফাঁক দেখা যায়। হাল্‌কা বুনটের কাপড়ে টানা-পোড়েনের সূতার সংখ্যা কম থাকে। এইজন্য সেইসব কাপড় ওজনেও বেশ হাল্‌কা হয়।

তবে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কাপড় চালু করিবার জন্য অনেক সময় কাপড়ের উপর অত্যধিক মাড় দেওয়া হয়। ইহার ফলে কাপড়ের ফাঁক ঢাকা পড়িয়া যায়। এইসব কাপড় চিনিতে হইলে কাপড়ের আঁচলের এক্ কোণা হাতে করিয়া ঘষিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে মাড় উঠে কিনা। মাড় আল্‌গা হইয়া গেলে কাপড়ের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে।

কাপড়ের স্থায়িত্ব সুতার গুণ, ইহার দৈর্ঘ্য ও পাকের উপরে নির্ভর করে। যে বস্ত্রখণ্ডের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা হইতে এক খণ্ড সূতা টানিয়া লইয়া ইহার পাক ছাড়াইতে হইবে। তারপর তন্তুর দৈর্ঘ্য ও পাকের বিচার করিতে হইবে। যদি সূতা সহজেই ছিঁড়িয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে কাপড় বেশী টেকসই হইবে না। হয় এই কাপড়ের সূতা নিকৃষ্ট ধরনের নতুবা ইহা খুব পুরাতন। ঠাস বুনটের কাপড় উত্তম ধরনের ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে কাপড়ে বুনট বেশী ঘন হইলে অনেক সময় কাপড় ধুইয়া আছড়াইবার সময় ইহা ফাটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

স্থিতিস্থাপকতা ঃ—উদ্ভিজ্জ তন্তু সূতা অথবা লিনেন অপেক্ষা প্রাণিজ তন্তু রেশম ও পশমের ভিতর স্থিতিস্থাপকতা গুণটি বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। রেশম-তন্তু খুব আর্দ্রতা-শোষক। ইহা শতকরা ৩০ ভাগ আর্দ্রতা শোষণ করিতে সমর্থ, তবু ইহা ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয়। রেশম-তন্তু তাহার দৈর্ঘ্যের $\frac{১}{৫}$ অংশ বর্ধিত করিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। অকৃত্রিম রেশমের স্থিতিস্থাপকতা গুণ অনেক বেশী. রেশমের মত পশমও আর্দ্রতা-শোষক। আর্দ্রতাপূর্ণ বায়ুস্তরে ইহা শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ জল শুষিয়া লইতে পারে। যদি ক্ষারের সান্নিধ্যে পশমী বস্ত্রগুলিকে আর্দ্র অবস্থায় ঘর্ষণ করা হয় তবে পশম-তন্তুর উপরিস্থিত শল্কজাতীয় পদার্থগুলি পরস্পর জড়াইয়া যাওয়ার ফলে পশম-তন্তুর সংকোচন হয়। এই সংকোচনের প্রবণতা তাপ ও ঘর্ষণের মাত্রার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই স্থিতিস্থাপকতা গুণের দরুন পশম ও রেশম-তন্তু টানিলে লম্বা হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রেশমী ও পশমী বস্ত্রের এই স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকার দরুন, এইগুলি ধুইবার সময় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। বিশেষতঃ ধুইবার আগে মাপ লইয়া কাপড়টি ধুইতে

হয়। যাহাতে রেশম ও পশম-তন্তু জলের ভারে বাড়িয়া না যাইতে পারে এবং কাপড়ের মাপ যাহাতে ঠিক থাকে সেই ভাবে পাতিয়া শুকাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। কাপড় আয়তনে বাড়িয়া গেলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়িতে হয়। আবার যে সব তন্তু সংকুচিত হইবার আশঙ্কা থাকে সেগুলিও প্রসারিত করিয়া মাপ ঠিক করিয়া লইয়া শুকাইতে হয়।

বাহ্যিক চাকচিক্য (Finishing) :—ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাপড় ধৌত বা রঙ করা হয় সেগুলি ভালভাবে বাহ্যিক চাকচিক্য-সম্পন্ন করিয়া পরে খরিদ্দারের কাছে বাজারে ছাড়া হয়। যে সব কাপড় শুষ্ক উপায়ে ধৌত বা রঙ করা হয়, তাহাদের গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। অপরপক্ষে যে সব কাপড় সাধারণভাবে রঙ করা হয়, সেই কাপড়গুলি রঙ করার পরে সর্বশেষ পর্যায়ে চাকচিক্য-সম্পন্ন করিতে হইলে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ এই তন্তুগুলি বেশীক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বাপেক্ষা কিছুটা সংকুচিত হইয়া যায়। তখন কাপড়ের পূর্বাবস্থা ফিরাইবার জন্য ইহার উপর বেশী চাপ দিয়া ইহাকে প্রসারিত করিতে চেষ্টা করা হয়। কাপড় বাজারে বিক্রয় করিবার পূর্বে এই সমস্ত দোষত্রুটিগুলি প্রথমেই সংশোধন করিয়া লওয়া হয়।

গৃহেও কাপড় ধুইবার পর সর্বশেষ পর্যায়ে ইহার চাকচিক্য আনিবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। কাপড় ধোওয়া হইয়া গেলে জলে অল্প নীল গুলিয়া তাহার মধ্যে ধোয়া কাপড় ডুবাইয়া নিয়া পরে শুকাইলে কাপড়ের লালচে আভার পরিবর্তে বেশ উজ্জ্বল শুভ্র রঙ দেখা যায়। টিনোপাল নামক বাজারে প্রচলিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কাপড়ের শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ভাতের ফেনের (মাড়ের) সাহায্যে কলপ দিয়া কাপড় ইস্ত্রি করিলে কাপড়ের উপরকার খস্‌খসে ভাব থাকে না এবং বেশ মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়। ভাতের ফেনের পরিবর্তে অনেকে অ্যারারুটও ব্যবহার করেন। যে সব পোশাকে শক্ত কলপ দেওয়া দরকার—যেমন শার্টের কলার—সেখানে শক্ত কলপ দিয়া তারপর ইস্ত্রি করা উচিত।

যান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন তন্তুর সর্বশেষ পর্যায়

তাঁতবোনা পরিধেয় বস্ত্র বিরঞ্জিত বা রঞ্জিত হইবার পর তাঁত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিলেও ব্যবহারের উপযোগী হয় না। রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসায় বারবার ধোয়ানো ও শুকানোর ফলে, এবং সব সময় হাতড়ানোর ফলে এই সব সূতার প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এইজন্য এই সূতাগুলিকে টানিয়া সোজা করা দরকার, যাহাতে তৈয়ারী কাপড় বেশ মসৃণ, সুন্দর ও সমান দেখায়। যদি কাপড়কে ওয়াটারপ্রুফ্ বা অগ্নির কুপরিবাহক করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা করা হয়। তারপর কাপড় মাপিয়া ওজন করিয়া ভাঁজ করা হয় বা গুটানো হয়। তারপর পার্শেল করিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়।

পশমী বস্ত্রের সর্বশেষ পর্যায়—সর্বশেষ পর্যায়ে পশম-তন্তু সংকুচিত হয়। এই জন্য বস্ত্র প্রস্থে বেশী বয়ন করা দরকার। রঙ-করা সূতায় তৈয়ারী কাপড় সমগ্র কাপড়ে রঙ দেওয়া কাপড় অপেক্ষা কম সংকুচিত হয়। প্রথমোক্ত কাপড় শতকরা ১২½ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত সংকুচিত হয় এবং শেষোক্ত কাপড় শতকরা ২০ ভাগ সংকুচিত হয়। তাঁত হইতে প্রস্তুত কাপড় প্রথমে রোলারের উপর রাখিয়া ইহার বুননের দোষত্রুটি, টানা-পোড়েনের সূতার

অভাব, গিঁট ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দোষত্রুটিগুলি দূর করা হয়। টানা-পোড়েনের সূতার অভাব থাকিলে ইহা পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। কাপড়ের ভিতরে ময়লা, তেল প্রভৃতি পদার্থ থাকিলে, ডলি মেসিনের সাহায্যে এগুলি দূর করা হয়। তারপর সাবানের দ্রবণের সহিত মেসিনের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া ইচ্ছানুযায়ী ওজন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার পর সচ্ছিদ্র রোলারের ভিতর দিয়া বাষ্প চালনা করা হয়। উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে যাহাতে সমস্ত আর্দ্রতা শুকাইয়া না যায় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাপড় আর্দ্র অবস্থায় দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিয়া প্রস্থ প্রসারিত করা হয়। এই ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির ভিতর দিয়া উত্তপ্ত রোলারের সাহায্যে কাপড়ে চাপ দিয়া ইহা সমান করা হয়। কাপড়ের আর্দ্রতার মাত্রা কমিয়া গেলে কিছু আর্দ্রতা দেওয়া হয়; তারপর ভাঁজ করিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়।

কাপড়ের সংকোচন নিবারণের ব্যবস্থা:—পশমী বস্ত্রের সংকোচন নিবারণের জন্য প্রথমে ইহাকে ক্ষীণশক্তি হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডে, পরে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণে রাখা উচিত। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন ক্লোরিন পশমের আঁইশ জাতীয় পদার্থকে দূর করিয়া দেয়। দ্বিতীয় দ্রবণে পশমী বস্ত্র বেশীক্ষণ রাখা উচিত নয়। সাধারণভাবে ব্লিচিং পাউডার এবং ক্যাল্‌সিয়াম হাইপোক্লোরাইটের সাহায্যে সংকোচন-ক্রিয়া নিবারণের চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে পশম-তন্তুর ওজন কমে ও ইহার স্থিতিস্থাপকতা-শক্তি কমিয়া যায়। অ্যামোনিয়ার লঘু দ্রবণ তন্তুর জল শোষণের ক্ষমতা কমাইয়া দেয়।

ওয়াটারপ্রুফিং:—(১) যান্ত্রিক ও (২) রাসায়নিক উপায়ে কাপড়কে ওয়াটারপ্রুফ করা যায়।

যান্ত্রিক উপায়—কাপড় খুব ঘনভাবে বুনিয়া এবং সংকুচিত করিয়া ইহার ফাঁকগুলি দূর করা যাইতে পারে। পশমের বেলায় অতিরিক্ত উত্তাপে বাষ্প ও চাপের সাহায্যে ইহা করা সম্ভব। তুইটি ঘন বুনটের কাপড় একটার উপর আর একটি বিপরীত দিক হইতে স্থাপন করিয়াও ইহা সম্ভব হইতে পারে।

মোমের সাহায্যে—(ক) কাপড়ের উপর মোম বা প্যারাফিন চূর্ণ করিয়া ছড়াইয়া দিয়া মেসিনের সাহায্যে চাপ দিলে, রোলারের উত্তাপে মোম গলিয়া কাপড়ে লাগিয়া থাকিতে পারে।

(খ) কাপড়কে তরল মোমে ডুবাইয়া তারপর শুকাইলে মোম কাপড়ে লাগিয়া থাকে।

(গ) বেন্‌জিন (Benzene) ও তরল মোমের সাহায্যে কাপড় শুকাইলে বেঞ্জিন বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং মোম কাপড়ে লাগিয়া থাকে।

অনেক সময় তন্তুর উপরে রবারের প্রলেপ দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে অ্যাসেটিল সেলুলোজ (Acetyl cellulose)-এর একটি প্রলেপ দেওয়া হয়।

রাসায়নিক উপায় ঃ সকল প্রকার রাসায়নিক পন্থাতেই একটি অদ্রব অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ (Compound) তন্তুর উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

এলাম অ্যাসিটেট (Alum acetate) দ্রবণে কাপড় ডুবাইয়া ১০০° ফা. উত্তাপে শুকাইতে হয়। যাহাতে এলাম অ্যাসিটেট কাপড় হইতে ঝরিয়া যাইতে না পারে সেইজন্য মোম ব্যবহার করা ভাল।

মারসেরাইজ্‌ড পশম ঃ—পশমের মারসেরাইজেশনের প্রচলন বেশী নয়। পশম-তন্তুকে উচ্চ তাপে বাই-সালফেট অব সোডার দ্রবণে পাঁচ মিনিট রাখিতে হয়। ইহার ফলে তন্তুগুলি সংকুচিত হয়।

দ্রবণে থাকা অবস্থায় ইহা স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রসারিত করা প্রয়োজন। ইহার পর এক ঘণ্টা ক্ষীণশক্তি অ্যাসিডে রাখা হয়। পশমের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করার জন্য এই ব্যবস্থার দরকার।

রেশম তন্তুর সর্বশেষ পর্যায়—ক্রেপ ধরনের সমস্ত রেশম-তন্তু সিদ্ধ করিবার সময় টানা ও পোড়েনের সূতার পাক খুলিয়া যাওয়ার ফলে সংকুচিত হইয়া যায়। এই সংকুচিত অবস্থায় ইহা ক্রেপ সিল্কে পরিণত হয়। ক্রেপ-ডি-সিন (Crepe-de-chine) পোড়েনে ৫%-৮% এবং টানাতে ১০%-১৬% সংকুচিত হয়। জর্জেট সিল্ক পোড়েনে ১০%-১৬% এবং টানাতে ১২%-১৮% সংকুচিত
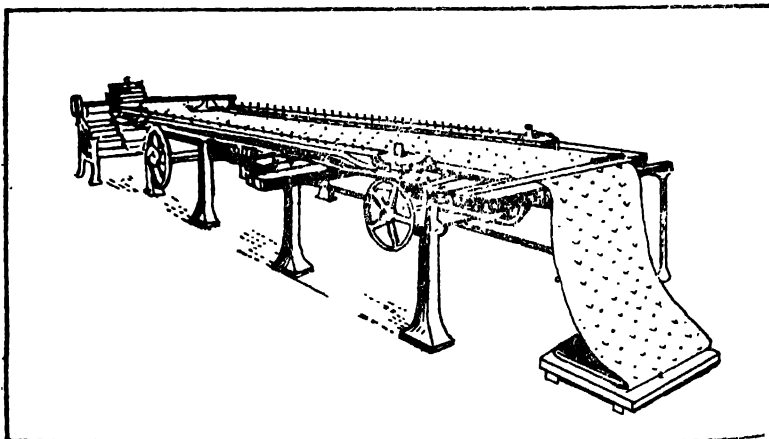
স্টেনটার ফ্রেম

হয়। স্টেনটার ফ্রেমের (Stenter frame) সাহায্যে এই সংকোচ[ন] দূর করা হয়।

নিকৃষ্ট ধরনের হইতে মাঝারি ধরনের অনেক রেশম-তন্তুর র[ং] করিবার পূর্বে প্রথমে ওজন করা হয়। রেশম-তন্তুর সর্বশেষ কা[র্য] সম্পাদনের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

রেশম-তন্তু রঙ করার পর শুকানো হয়, তারপর শেষ মিশ্র দ্রবণের (Finishing mixture) পর রোলারের মধ্যে গুটানো হয়। এই মিশ্রণের ভিতর তৈল, স্নেহজাতীয় পদার্থ, গ্লিসারিন ও অন্যান্য দ্রব্য থাকে। ইহাদের সাহায্যে রেশম-তন্তুকে নরম ও উজ্জ্বল করা হয়। ইহার ফলে রেশম-তন্তুর স্বভাবজাত গুণগুলিও ভালভাবে প্রকাশ পায়। শেষ দ্রবণে থাকাকালীন স্টেনটার ফ্রেমের সাহায্যে রেশম-তন্তুকে প্রসারিত করা হয়; তারপর উত্তাপের সাহায্যে ইহাকে শুকানো হয়। ফ্রেমটি এই ভাবে গঠিত যে, দৈর্ঘ্যে অথবা প্রস্থে যে কোন দিকেই তন্তুকে প্রসারিত করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় রেশমী বস্ত্র কিছু শক্ত থাকে বলিয়া ইহাকে ক্যালেণ্ডার (Calender) রোলার সাহায্যে চাপ দেওয়া হয়। ইহার ফলে শেষকার্য সম্পাদনের দ্রব্যগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং বস্ত্র নরম হইয়া যায়। উদ্দেশ্যানুযায়ী রেশমী বস্ত্রকে শক্ত অথবা উজ্জ্বল করা যাইতে পারে। রেশমী বস্ত্র বয়নের উপরেও ইহার বাহ্যিক রূপ অনেকটা নির্ভর করে। ঘন বুনটের কাপড় পাতলা বুনটের কাপড় অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখাইবে। সাধারণ রেশম ক্রেপ-ডি-সিন রেশমের মত অত কুঁচকায় না।

সিল্ক ওয়েটিং (Silk weighting) বা ভার চাপানো ঃ—বর্তমান যুগে রেশম-তন্তুর ভার চাপানো পদ্ধতি একটি চিরাচরিত প্রথারূপে দাঁড়াইয়াছে। আজকাল নিকৃষ্ট হইতে মাঝারি ধরনের সমস্ত রেশম-তন্তুতেই টিনের সাহায্যে ভার চাপানো হয়। বেশী ভার চাপাইলে রেশমের গুণাবলী নষ্ট হইয়া যায়—রেশম-উৎপাদনকারীরা ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা অতি সতর্কতার সহিত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

প্রণালী—সিল্কের কাপড়কে প্রথমে সাবানের দ্রবণে সিদ্ধ করা

হয়। ইহার ফলে আঠা জাতীয় পদার্থ দূর হইয়া যায়। তারপর এই বস্ত্রকে বাই-ক্লোরাইড অব টিনের দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয়। তারপর বস্ত্রকে জলের ধারার নীচে রাখা হয়; ইহার ফলে বাই-ক্লোরাইড অব টিন টিন-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। তারপর উষ্ণ ফস্‌ফেট অব সোডার দ্রবণে রাখার ফলে টিন-অক্সাইড টিন-ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়। ক্ষীণশক্তি অ্যাসিড টিন-ফস্‌ফেটকে প্রশমিত করিয়া রেশমী বস্ত্রের উপরে টিনকে অধঃক্ষেপ করে। যাহাতে টিন রেশমের উপর লাগিয়া থাকিতে পারে—সেইজন্য ইহাকে সিলিকেট অব সোডার দ্রবণে রাখা হয়। রেশমী বস্ত্র রঙ করিবার সময় কিছু টিন বাহির হইয়া যায়, কিন্তু ইহার পর বার বার ধুইলেও ইহা নষ্ট হয় না। বিশুদ্ধ রেশমের মত ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই জাতীয় রেশম বায়ু, সূর্যের কিরণ বা উত্তাপে কিছুদিনের পর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঘর্ম ও সমুদ্রের বায়ু এই জাতীয় রেশমের উপর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে আধুনিক ফ্যাশান অনুযায়ী অল্প দামে বেশী কিছু দিন ভালভাবে পরার জন্য এই জাতীয় রেশমী বস্ত্রের উপযোগিতা বেশী। টিনের ভার চাপানোর ফলে সুতাগুলি সরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এমব্রয়ডারী করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত রেশম ব্যবহার করা হয়, সেগুলির উপর কম ভার চাপানো দরকার। তাহার কারণ এমব্রয়ডারী করার সময় কাপড়ের উপর হাল্‌কা চাপ পড়ে।

সূতী বস্ত্রের সর্বশেষ পর্যায়—সূতী বস্ত্রের শেষকার্য সম্পাদন খুব জটিল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। কাপড়ের গুণাবলী ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য এইরূপ নানা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সূতী বস্ত্র যাহাতে মজবুত ও ওজনে ভারী হয়, সেই দিকেও শেষ কার্য সম্পাদনে দৃষ্টি রাখা হয়। সস্তা দরের সূতী কাপড়ে শুধু মাড়

দিয়া ও সামান্য ইস্ত্রি করিয়াই শেষকার্য সম্পাদন করা হয়, অন্যান্য দামী কাপড়ের জন্য দীর্ঘ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

কাপড়ের শেষকার্য সম্পাদনের জন্য গম, স্টার্চ, আলু, ভাতের মাড়, চায়না ক্লে (China clay) এবং ট্যালো (Tallow) ব্যবহার করা হয়। সাধারণ লবণ, সোহাগা, ফট্‌কিরিও কোন কোন সময় ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কাপড়ের ঔজ্জ্বল্যের জন্য গ্লবার্স সল্ট (Glauber's Salt) এবং কাপড় নরম করিবার জন্য স্নেহজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। মার্সেরাইজেশান সূতী বস্ত্রকে রেশমের মত চক্‌চকে করিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

লিনেনের সর্বশেষ পর্যায়—সূতী বস্ত্রের মত লিনেন বস্ত্রেরও শেষকার্য সম্পাদন হয়। সূতী অপেক্ষা লিনেনের স্বাভাবিক গুণ বেশী থাকায় শেষকার্য সম্পাদনে অত বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না।

রেয়নের সর্বশেষ পর্যায়—রেশমী বস্ত্রের মত রেয়ন-বস্ত্রের শেষকার্যও কিছুটা সম্পাদন করা হয়, তবে রেশমের মত রেয়ন-তন্তুর উপরে ধাতু জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রতিস্থাপন করা হয়। রেয়ন-তন্তু আর্দ্র অবস্থায় নরম হইয়া যায়, এইজন্য সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বিরঞ্জিত বা রঞ্জিত করিবার পর রেয়ন বস্ত্র শুকানো হয়। তারপর শেষকার্য সম্পাদনের মিশ্রণ—আঠা, তৈল জাতীয় গঁদ, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তারপর স্টেনটার ফ্রেম (Stenter frame)-এর সাহায্যে এই বস্ত্রকে প্রসারিত করিয়া ক্যালেণ্ডার মেসিনের (Calendar Machine) চাপ দেওয়া হয়। বর্তমান কালে শেষকার্য সম্পাদনের ফলে রেয়নের রঙ খুব হাল্‌কা হইতে অতি গাঢ় ও উজ্জ্বল করা সম্ভব হইয়াছে।

রেয়ন-তন্তু অতীব উজ্জ্বল। আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বেশী উজ্জ্বল রঙের পরিবর্তে হাল্‌কা রঙই পছন্দ করেন। সেইজন্য তাঁহারা

উজ্জ্বল রঙের পরিবর্তে হাল্‌কা রঙ ব্যবহার করিবার জন্য নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেন—ফিনলের দ্রবণ, মাঝারি শক্তি সম্পন্ন অ্যাসিটোনের (acetone) দ্রবণ, উচ্চতাপে অ্যাসিটোন ও জাইলিন (xylen)-এর দ্রবণ, লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড (ইহা তন্তুর জোর কমাইয়া দেয়)। খস্‌খসে পদার্থ ঘষিলেও রেয়নের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটে। ইহাতে তন্তুর শক্তি কমিয়া যায়।

কাপড়ের পাকা রঙ (Colourfastness)

সূতী ও লিনেনে সহজেই রঙ ধরে। সাধারণভাবে বাড়ীতে কাপড়ের রঙ করিবার সময় লবণ দিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিলে সূতী কাপড়ের রঙ সহজে উঠে না। ময়লা দূর করিবার জন্য অনেক সময় সাবানের সঙ্গে অ্যামোনিয়া মিশানো হয়। ইহা রঙিন কাপড়ের ক্ষতি সাধন করে।

গত শতাব্দী হইতে বস্ত্র রঙ করিবার পদ্ধতি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। প্রথমে উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থ হইতে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হইত। পতঙ্গের দেহ চূর্ণ করিয়া কোচিনীল (cochineal) নামে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যাইত। এই সব রঙের ভিতর কোন কোনটা বেশী দীর্ঘস্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর ছিল। কিন্তু এগুলি বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যাইত না বলিয়া রঙ সমানভাবে কাপড়ে লাগিত না। ইহা খুব কম পাওয়া যাইত, দামও অত্যন্ত বেশী পড়িত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলকাতরার (Coal tar) রঙের আবিষ্কারের ফলে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

এই রঙগুলিকে কৃত্রিম রঙ বলা হয়। অ্যানিলিনের (Aniline) আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধা হইল। কয়লা

হইতে উপজাত দ্রব্য বেন্‌জিন (Benzene), ক্রিসল্ (Cresol), টলুইন (Toluene), ন্যাপথেলিন (Napthalene), ফিনল (Phenol), অ্যানথ্রাসিন (Anthracene) এইগুলি বর্তমানে রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অ্যানিলিন হইতে এজো (Azo), ডাইস্টাফ (Dyestuff) বহু শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন তন্তুর জন্য বিভিন্ন প্রকার রঙের প্রয়োজন হয়। একই রঙ কার্পাস-তন্তুর পক্ষে উপযোগী হইলেও রেশম-তন্তুর পক্ষে একান্ত নিরর্থক হইতে পারে। দুইটি বিভিন্ন তন্তুর ভিতরে একটিতে রঙ পাকা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য তন্তুতে সেই রঙ ধুইয়া যাইতে পারে। এইজন্য বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা রঙ পাকা করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেসব তন্তু রঙ শুষিয়া লইতে পারে সেসব ক্ষেত্রে রঙ যাহাতে বস্ত্রের ভিতর থাকিতে পারে সেইজন্য রঙ করিবার সময় অথবা তাহার পূর্বে বা পরে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। উদ্ভিজ্জ তন্তুর অধিকাংশই সেলুলোজ—ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। প্রাণিজ তন্তুর ভিতরে এইগুলি ব্যতীত নাইট্রোজেন ও সাল্‌ফার থাকে। অ্যাসিড ও ক্ষারের দ্রবণে উভয় তন্তুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধেও বেশ সচেতন থাকিতে হইবে।

রঙ করিবার পূর্বে বস্ত্রের উপরকার মাড় ও অন্যান্য ময়লা দ্রব্য তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা না করিলে কাপড়ের রঙ সুন্দর হইবে না।

বস্ত্র ও রঞ্জন-শিল্পে নিম্নলিখিত রঙগুলি ব্যবহার করা হয়।

স্বাভাবিক রঙ (Natural dyes)—বর্তমানে কৃত্রিম রঙের প্রচলনের ফলে ইহাদের ব্যবহার রহিত হইয়া যাইতেছে। লগ উড (Log wood) ও ফাস্টিক (Fustic) এখনও ব্যবহৃত হয়।

খনিজ রঙ (Mineral dyes)—এইগুলি ধাতুজনিত রঙ। এইগুলি বিশেষ ব্যবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়।

অ্যাসিড ডাই (Acid dyes)—পশমী ও রেশমী বস্ত্রে এই প্রকার রঙের ব্যবহার দেখা যায়। এইগুলি ব্যবহার করিলে আর অন্য কোন জিনিসের প্রয়োজন হয় না।

বেসিক ডাই (Basic dyes)—এক রকম রঙ আছে যাহা দেখিতে খুব উজ্জ্বল, কিন্তু আলোর সংস্পর্শে বা বেশী ধোওয়ার ফলে রঙ উঠিয়া যায়। এই প্রকার রঙকে বেসিক ডাই বলা হয়। যেসব ক্ষেত্রে রঙের স্থায়িত্ব অপেক্ষা ঔজ্জ্বল্যের প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে বেসিক ডাই ব্যবহার করা হয়। কার্পাস-তন্তুতে ট্যানিক অ্যাসিডের সাহায্যে এই রঙ ব্যবহার করা হয়।

মর্ডেণ্ট ডাই (Mordant dyes)—এই জাতীয় রঙগুলি পশম-তন্তুর পক্ষে বেশ পাকা। কখনও কখনও রেশম-তন্তুর পক্ষেও এইগুলি ভাল। এই জাতীয় রঙের সহিত ক্রোমিয়াম, লৌহ, টিন অথবা তামা মিশ্রিত থাকে। সাধারণতঃ কার্পাস-তন্তুতে এ জাতীয় রঙ ব্যবহার করা হয় না, তবে কাপড়ের দাগের জন্য এইগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে

সূতী বস্ত্রের রঙ (Direct Cotton dyes)—এই জাতীয় রঙ কার্পাস, লিনেন এবং ভিস্‌কোজ রেয়ন-তন্তুতে কোন প্রকার বিশেষ প্রক্রিয়া না করিয়া একেবারেই ব্যবহার করা যায়। এই রঙ ব্যবহার করা বেশ সহজসাধ্য। আলো বা জলের সংস্পর্শে এই পাকা রঙের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু অধিক উত্তপ্ত জলে রাখা হইলে ইহার রঙের পরিবর্তন হয়। পশম ও রেশম-তন্তুতে এই রঙ ব্যবহার করা খুব ভাল।

গন্ধক রঙ (Sulphur Dyes)—ইহা সাধারণতঃ কাল, নীল

অথবা বাদামী রঙের হয়। ইহা খুব পাকা রঙ। প্রথম প্রয়োগে রঙ বর্ণহীন থাকে। বায়ুতে রাখিলে ইহা জারিত (oxidised) হয় এবং ইহার স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসে। রঙ স্থায়িভাবে বস্ত্রের উপরে থাকিয়া যায়।

ভাট ডাই (Vat dyes)—ভাট ডাই খুব পাকা রঙ। ইহা খুব দামী। গন্ধকের রঙের মত ইহা বস্ত্রের উপর জারিত করা হয়। বর্তমানে কার্পাস-তন্তুর উপর ইহার প্রচলন বেশী।

পাকা রঙের পরীক্ষা—রঙিন বস্ত্রের আল্‌গা রঙ পরীক্ষা করিবার জন্য রঙিন বস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশকে নাইট প্রিমরোজ দ্রবণ (Knight Primrose Solution) ও একটি প্রশমিত লবণে (Neutral salt) ডুবানো হইল। তারপর সেই পাত্র অথবা পরীক্ষা-নলটিকে (Test tube) ৫০° সে. উত্তাপে গরম জলে অর্ধঘণ্টা উত্তপ্ত করার পরে সেই পাত্র হইতে কিছুটা দ্রবণ সাদা পোর্সেলিন ডিশে রঙের পরীক্ষা করিবার জন্য ঢালা হইল। রঙ বিবর্ণ হইলে বুঝা যাইবে যে রঙ পাকা নয়। ২৪ ঘণ্টা কলের জলে রাখিয়া রঙের স্থায়িত্ব বিচার করা যায়।

ধৌত প্রণালীতে পাকা রঙ পরীক্ষা—যে বস্ত্রের রঙ পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার ছোট ছোট তিনটি টুকরা প্রথম লইতে হইবে। একটি টুকরা সাদা সূতী বস্ত্রের সঙ্গে, একটি সাদা রেশমের সঙ্গে আর একটি সাদা পশমের কাপড়ের সঙ্গে সেলাই করা হইল। তিনটি নমুনাকে ১½% সাবানের দ্রবণের মধ্যে দুই মিনিট ধুইয়া ফেল। সাদা নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখ যে রঙের কোন পরিবর্তন হইল কিনা। সূতী বস্ত্র, রেশম ও পশম ব্যবহার করার কারণ অজানা রঙের শোষণ পরীক্ষা করা। সূতী বস্ত্র সূতীর রঙ, পশম পশমের এবং রেশম রেশমের রঙ শোষণ করিবে।

ঘর্ষণ পরীক্ষা (Crocking or Rubbing Test)—একটি ক্যালিকো. (Calico) কাপড়ের টুকরাকে ভিজাইয়া ঘষিয়া পরীক্ষা কর। রঙ যদি আল্‌গা হয় তবে কাপড়ের উপর তাহা দেখা যাইবে।

আলোতে রঙ পাকা থাকে কিনা ঃ—জানালার উপর দক্ষিণমুখো করিয়া একটি কাপড়ের নমুনা রাখ। এক সপ্তাহ পর্যন্ত নমুনাকে এই ভাবে রাখ। সূর্যকিরণ প্রখর হইলে আরও বেশী দিন রাখিবে। জানালা হইতে নমুনাটি খুলিয়া অন্ধকার ঘরে দুই দিন রাখ। তারপর সূতী বস্ত্রের পূর্ব নমুনার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ রঙ পাকা কিনা।

ঘামে ভিজিলে পাকা রঙ নষ্ট হইবে কিনা তাহার পরীক্ষা ঃ

(১) এক পাইণ্ট জল, টেবিল-চামচের পাঁচ চামচ লবণ এবং ১০ চামচ ভিনিগারের একটি দ্রবণ কর। নমুনাটিকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত এই দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ। তারপর নমুনাকে তুলিয়া নিয়া শুকাইয়া ফেল। এইরূপ দুইবার করিবে। পূর্বের নমুনার সঙ্গে পরীক্ষা করার পর নমুনাটির তুলনা করিলে যদি দেখা যায় যে, পরের নমুনাটির উপর দাগ পড়ে, তবে বুঝা যাইবে ঘামের দ্বারা এই বস্ত্রের রঙ বিবর্ণ হইবে।

(২) পাকা রঙ পরীক্ষা করিবার বস্ত্রটিকে ১০% অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণে ভিজাইয়া এক ঘণ্টা পর্যন্ত অল্প তাপে গরম করিবে। তারপর সাদা কাপড় উপরে রাখিয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে। আগের কাপড়ের রঙের সহিত ইস্ত্রি করা কাপড়ের রঙের তুলনা করিলেই রঙের পার্থক্য ধরা পড়িবে।

কাদার দাগের পরীক্ষা—বস্ত্রটিকে অ্যামোনিয়া সমেত চূণের দ্রবণে ভিজাইতে হইবে। যখন দাগগুলি শুকাইয়া যাইবে তখন কোন চিহ্ন না রাখিয়া এগুলি পড়িয়া যাইবে।

কৃত্রিম রেশম-তন্তুর স্বরূপ

অতীত যুগে কেবল রেশম-কীট হইতে বিভিন্ন প্রকারের রেশম—তসর, গরদ, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি তৈয়ার করা হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে নানা প্রকার কৃত্রিম রেশম-তন্তুর (Synthetic Fibre) প্রচলন হইয়াছে। তাহার মধ্যে রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন, টরিলিন, ভিনিয়ন প্রভৃতি প্রধান।

রেয়ন—রেয়ন-তন্তুর প্রধান উপাদান সেলুলোজ। এই সেলুলোজ জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ কার্পাস ও কাষ্ঠের মণ্ডের ভিতরেই বেশী পাওয়া যায়। প্রকৃত রেশমকে প্রাণিজ তন্তু বলিলে রেয়নকে উদ্ভিজ্জ তন্তু বলা যাইতে পারে। রেয়ন-তন্তুকে ইচ্ছামত যে কোন দৈর্ঘ্যে ও আকারে তৈয়ারী করা যাইতে পারে। শুধু রেয়ন-তন্তু বা অন্যান্য তন্তু ও রেয়নের সংমিশ্রণের সাহায্যে বর্তমানে সব রকম বস্ত্রই প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই রেয়ন-তন্তুর প্রচলন হইয়াছে। রেশম-তন্তুর ঔজ্জল্য, দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

বহুদিন ধরিয়া রেশম-কীটের স্বাভাবিক তন্তু নির্মাণের কৌশল লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ যান্ত্রিক উপায়ে সেই প্রকার তন্তু প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথমে জিলাটিন (Gelatine) তন্তু দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তারপর নাইট্রো-সেলুলোজ, ভিস্কোজ সিল্ক (Viscose Silk) প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্তমানে রেয়ন-তন্তুর অপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে জাপানে সবচেয়ে বেশী রেয়ন-শিল্পের প্রসার হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও রেয়ন-শিল্পের প্রচলন কম নয়। ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সেও রেয়ন-শিল্প বেশ আদৃত।

আসল রেশম-তন্তুর মত রেয়ন অত মজবুত, স্থিতিস্থাপক, গরম ও টেকসই নয়। জলে অথবা অধিক উত্তাপে রেয়ন-তন্তুর শক্তি হ্রাস হয়। এইজন্য রেয়ন-তন্তু ইস্ত্রি করিবার সময় খুব বেশী তাপ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ফরম্যালডিহাইড এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের সাহায্যে রেয়ন-তন্তুর আর্দ্রতা শুষিবার ক্ষমতা হ্রাস করা যায়। রেয়ন-তন্তুর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস ও বিভিন্ন ধরনের রঙ করিবার জন্য নানা গবেষণা চলিতেছে।

নাইলন—নাইলন-তন্তু কৃত্রিম হইলেও ইহা রেয়নের মত উদ্ভিজ্জ নহে। খনিজ পদার্থের সাহায্যে নাইলন-তন্তু প্রস্তুত করা হইয়াছে। নাইলন-তন্তু খুব বেশী স্থিতিস্থাপক। বৈজ্ঞানিকের মতে নাইলনকে মানবকৃত প্রোটীন সদৃশ রাসায়নিক পদার্থ বলা যায়। এই রাসায়নিক পদার্থকে তন্তুজাত যে কোন বস্ত্রের আকারে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। আর্দ্র অবস্থায় নাইলন-তন্তুর শক্তি রেয়ন-তন্তুর মত হ্রাস পায় না; ইহা ১২$\frac{১}{২}$%—১৫% পর্যন্ত কমিয়া যায়। জলে ভিজাইলে অন্যান্য তন্তু অপেক্ষা নাইলন-তন্তু কম জল শোষণ করে। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে নাইলনকে 'ওয়াটার প্রুফ' করা যায়। শুষ্ক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলির দ্বারা নাইলন-তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না। ইহা ফিনল এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সচরাচর ব্যবহৃত অ্যাসিডের সংস্পর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নাইলন-তন্তু দ্বারা নির্মিত বস্ত্রকে উষ্ণ বাষ্পের সাহায্যে যে কোন আকৃতিতে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। পরে অধিকতর উত্তাপের সাহায্যে ইহার আকৃতি পুনরায় পরিবর্তিত করা যায়। নাইলন-তন্তুর গলনাংক ৪৮০° ফা.। সূক্ষ্ম তন্তুর বস্ত্রকে ইস্ত্রি করিতে যে উত্তাপের দরকার হয় তাহার চেয়ে নাইলনের গলনাংক অনেক বেশী। নাইলন-তন্তু আগুনের সংস্পর্শে সাধারণতঃ শিখায় জ্বলিয়া

উঠে না। উত্তপ্ত শিখায় রাখিলে নাইলন-তন্তু গলিয়া যায়। নাইলন-তন্তুকে পোকায় কাটে না বা ভিজা অবস্থায় ইহার উপর ছাতা (mildew) পড়ে না। রেশম-তন্তু অপেক্ষা ইহা সূর্যকিরণ অথবা সমুদ্রবায়ুর আক্রমণ প্রতিরোধক। শুষ্ক নাইলন-তন্তু বিদ্যুতের অপরিবাহক। সোডিয়াম পারঅক্সাইড, সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইটের মত বিরঞ্জক দ্রব্য নাইলন-তন্তুর উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে না। ঘন খনিজ অ্যাসিডের দ্রবণে নাইলন-তন্তু ডুবাইলে সাধারণ উত্তাপে গলিয়া যাইবে। ৮৫° সেন্টিগ্রেড ১০% ঘন কস্টিক সোডার দ্রবণ নাইলন-তন্তুকে ধ্বংস করে। দুই-তিন দিন মিথানল (Methanol), বেন্‌জিন (Benzene), এসিটোন (Acetone), কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon Tetrachloride) দ্রাবক, ন্যাপথা (Solvent Naptha) দ্রবণে রাখিলে নাইনল-তন্তুর কোন ক্ষতি হয় না।

কৃত্রিম তন্তুর ভিতরে রেয়ন, নাইলন প্রভৃতির প্রচলন আমাদের দেশে বেশী। ডেক্রন ও ভিনিয়ন তন্তু সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান যুগে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য বহু প্রকার গবেষণা চলিতেছে। গ্লাস ফাইবার (Glass fibre), পলিইথিলিন (Polyetheline), ভিনিল রেজিন (Vinyl Resion), টেট্রাফ্লুরো ইথিলিন (Tetrafluroethyline), ক্যাসিন (Caesin), সয়াবিন ফাইবার (Soyabean fibre) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কৃত্রিম রেশম-তন্তুর প্রচলন আজকাল দেখা যায়।

এই নূতন কৃত্রিম রেশম-তন্তুগুলি প্রাকৃতিক রেশম-তন্তু হইতে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মজবুত ও টেকসইর দিক হইতেও কৃত্রিম রেশম-তন্তু অনেক ভাল। পলিইথিলিন তন্তু সবচেয়ে হাল্‌কা ফাঙ্গাই জাতীয় ছত্রাক ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই

তন্তুর সাহায্যে দড়ি প্রস্তুত করাইয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইতে পারা যায়। এক প্রকার নূতন ধরনের রেয়নের তন্তুর শক্তি যে কোন স্বাভাবিক রেশম-তন্তু অপেক্ষা বেশী—এমন কি ইহা সমান ওজনের ইস্পাতের তারের মত সমান শক্ত। ইহার বেশী শক্তি থাকার দরুন গত মহাযুদ্ধে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সব কৃত্রিম তন্তুর রঙ করার সমস্যা এখনও মিটে নাই। ইহার জন্য অনেক গবেষণা এখনও চলিতেছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৃত্রিম রেশম-তন্তু ও তাহার দ্বারা নির্মিত বস্ত্রগুলির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় রজন (Resin) জাতীয় দ্রব্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কার্পাস-তন্তু শক্ত করা যাইতে পারে, পশম-তন্তুর সংকোচন-ক্রিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া এই সব রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এইসব তন্তু আগুন ও জল প্রতিরোধ করিতে পারে।

বর্তমান কালে প্লাস্টিক দ্বারা আবৃত কৃত্রিম রেশম-তন্তুর ভিতরে বহু গুণের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই কৃত্রিম রেশম-তন্তুজাত বস্ত্র এখনও অতি মহার্ঘ। একমাত্র রেয়ন-তন্তুর দাম খুব কম। ব্যাপক ভাবে ইহার প্রচলন করিতে হইলে এইসব তন্তুজাত দ্রব্যের দাম আরও কমানো দরকার।

ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতি (Dry cleaning methods)

উৎকৃষ্ট রেশমী ও পশমী শাড়ী, গরম কোট, প্যাণ্ট প্রভৃতি ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে ধোওয়া ভাল। ইহাতে সাধারণ সাবান-জলে কাচা অপেক্ষা বেশী খরচ পড়ে, তবুও বস্ত্রের ক্ষতি নিবারণ করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। তৈল অথবা চর্বি জাতীয়

পদার্থের সহিত ময়লা কাপড়ে আটকাইয়া থাকে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে তৈল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ যেমন দূর হয় তেমন তাহার সঙ্গে ময়লাও দূর হইয়া যায়। ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে জলের দরকার হয় না। ইহার জন্য সাদা পেট্রোল বা অন্যান্য পরিষ্কার তরল দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে সব রাসায়নিক তরল দ্রব্য চর্বি-দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বা ময়লা শোষণ করিতে পারে তাহাদের সাহায্যেই ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে বস্ত্র ধৌত করা হয়।

যে সব বস্ত্র অল্প ময়লাযুক্ত হয় বা যাহাদের ভিতর খুব অল্প ময়লা জমে সেগুলি সহজ পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা যায়। সাদা ব্রোকেড (Brocade), সাদা শাল, গাঢ় রঙের দস্তানা এই সহজ পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা যাইতে পারে। ময়লা-শোধক হিসাবে ফ্রেঞ্চ চক (French chalk), ফুলার্স আর্থ (Fuller's earth), ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেট (Magnesium Carbonate), মুগের ডাল চূর্ণ (Bran Moog Powder), রুটির টুকরা (Bread Crumbs) এবং ইহা ছাড়া বাজারে কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য আরও নানা রকমের গুঁড়া পাওয়া যায়।

পরিষ্কার করিবার উপায়—(১) পোশাক হইতে আল্‌গা ময়লা ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। (২) পোশাকের উপর শোষক পদার্থের গুঁড়া পুরু করিয়া বিছাইয়া দিতে হইবে। (৩) পোশাকটি এইরূপ অবস্থায় অর্ধঘণ্টা রাখিয়া দিতে হইবে—যাহাতে শোষক পদার্থ তৈল বা চর্বি শোষণ করিতে পারে। (৪) তারপর পাউডারগুলি ব্রাশের সাহায্যে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলা দরকার।

শুষ্ক পদ্ধতিতে তৈল ও চর্বির দ্রাবক—দুই রকমের: (১) দাহ্য (২) কম দাহ্য। দাহ্যবস্তু—পেট্রোল, সলভেন্ট ন্যাপথা (Solvent

Naptha), বেন্‌জিন (Benzene : C_6H_6) আর অদাহ্য বস্তু—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon Tetrachloride : Ccl_4), ট্রাইক্লোরোইথিলীন (Trichloroetheylene), টেট্রাক্লোরোইথেন (Tetrachloroethane)।

পেট্রোল—পেট্রোল খুব দাহ্য পদার্থ। ইহা ঘরের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে—গৃহ হইতে বেশ খানিকটা দূরে ব্যবহার করা উচিত। কোনও প্রকারে যেন পেট্রোল অথবা পেট্রোলের বাষ্প আগুনের শিখার সন্নিকটে না আসিতে পারে। তাহা হইলে যে কোন মুহূর্তে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা থাকে। এই সব দ্রাবক রবার, বোতাম, চামড়া প্রভৃতি জিনিস দ্রবীভূত করিয়া থাকে। এইজন্য শুষ্ক পদ্ধতিতে কাপড় ধুইবার সময় এইসব বস্তু আগেই খুলিয়া রাখা উচিত। পেট্রোল খুবই উদ্বায়ী। উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দিলে অনেকটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতিতে কাপড় পরিষ্কার করা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভালভাবে মনে রাখিতে হইবে।

(১) স্নেহ ও চর্বিজাতীয় পদার্থগুলিকে উত্তমরূপে দ্রবীভূত করার ক্ষমতা।

(২) এই সব দ্রাবক ব্যবহারের ফলে যেন তন্তুর ধর্মের বা রঙের কোন পরিবর্তন সাধিত না হয়।

(৩) কোন বিশ্রী দুর্গন্ধ যেন বাহির না হয়।

(৪) তরল পদার্থ যেন খুব বেশী উদ্বায়ী না হয় যাহাতে বাষ্পীভবনের দ্বারা তরল পদার্থ বেশী উবিয়া না যায়।

(৫) ইহা যেন বেশী ভারী না হয়—ইহাকে যেন পুনরুদ্ধার করা যায়।

(৬) ধৌতকারীর শরীরের উপর দ্রাবকগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে।

(৭) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দিক হইতে ইহারা যেন নিষ্ক্রিয় হয়। ইচ্ছা করিলে পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে ইহাকে সঞ্চিত করা যায়।

সুগৃহিণীকে ড্রাই ক্লিনিং পদ্ধতির ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভালভাবে অবহিত হইতে হইবে।

(১) ধুইবার ময়লা কাপড়টিকে প্রথমে ঝাড়িয়া, ব্রাশ করিয়া কি শুকনা পরিষ্কার করিবার সাবানের সাহায্যে মেলিয়া রাখিতে হইবে। (২) জোরে রগড়াইয়া বা টান দিয়া ময়লা বাহির করিবার জন্য পাত্রে যেন প্রচুর পেট্রোল থাকে। (৩) পরিষ্কৃত হইলে যতদূর সম্ভব পেট্রোল নিংড়াইয়া ফেলিতে হইবে। (৪) তারপর বাহিরে কাপড়কে শুকাইতে দিতে হইবে। (৫) কাপড় শুকাইয়া গেলে তাহার উপর ভালভাবে চাপ দিতে হইবে। (৬) উন্মুক্ত বায়ুতে ধৌত বস্ত্রটিকে রাখা দরকার যাহাতে পেট্রোলের বিশ্রী গন্ধ দূর হইতে পারে। (৭) ব্যবহৃত পেট্রোল একটি পাত্রে রাখা উচিত। প্রয়োজনবোধে সেগুলি পুনরায় শুষ্ক পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভারী পোশাক ধুইবার পদ্ধতি—পোশাক বা বস্ত্র যদি খুব পুরু বা জলে ভারী হয়, কিংবা বড় হয় তবে তাহা পেট্রোলের দ্রবণে ডুবাইলে পেট্রোলের বহু অপচয় হয় এবং খরচ অনেক বেশী পড়ে। সেইজন্য পেট্রোলের দ্রবণে না ডুবাইয়া ইহার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত। একটি টেবিলের উপর তূলার প্যাড কিংবা কয়েকটি পুরু ব্লটিং কাগজের স্তর প্রথমে সাজাইতে হইবে। তাহার উপরে ময়লা কাপড়টি রাখিতে হইবে, তারপর সেই ময়লা কাপড়ের উপর ঠিক সেইরূপ তূলার প্যাড বা ব্লটিং কাগজ পেট্রোলে ভিজাইয়া

রাখিয়া আস্তে আস্তে ঘষিলে ময়লা বা দাগ উঠিয়া যাইবে। ইহা ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে।

বেন্‌জিন (Benzene)—আলকাতরার পাতনের সাহায্যে বেন্‌জিন পাওয়া যায়। বেন্‌জিনের দ্বারা তৈল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ খুব সহজেই দ্রবীভূত হয়। এইজন্য শুষ্ক পদ্ধতিতে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বেন্‌জিনের দাম খুব বেশী বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম বেন্‌জিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় বেন্‌জিনের বাষ্প গ্রহণ করিলে অনেক সময়—বিশেষ করিয়া মেয়েদের রক্তশূন্যতা (Anaemia) রোগ দেখা দিতে পারে।

সল্‌ভেণ্ট ন্যাপথা (Solvent Naptha)—ইহার রঙ জলের মত সাদা এবং ইহা বেশ মিষ্টগন্ধযুক্ত। যদি ইহা বিশ্রী গন্ধযুক্ত হয় এবং ইহার রঙ হল্‌দে দেখায় তবে বুঝিতে হইবে ইহার ভিতর গন্ধক মিশ্রিত আছে। সল্‌ভেণ্ট ন্যাপথার বাষ্প মোটেই ক্ষতিকারক নয়।

কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon Tetrachloride)—ইহা অদাহ্য বস্তু। ইহা ব্যবহার করিবার সময় যেন ইহার ভিতরে ক্লোরোফর্ম না থাকে। বায়ু ও আলোর সংস্পর্শে ইহা বিয়োজিত হইয়া কার্বনিল ক্লোরাইড নামে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সুবিধা—(১) ইহা অদাহ্য পদার্থ। (২) ইহা বাষ্পে পরিণত করিতে কম উত্তাপের প্রয়োজন হয়—ইহার ফলে ইহাকে পাতিত করা বা ঘনীভূত করা সহজ হয়। (৩) ইহার স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) নির্দিষ্ট। (৪) কোন কোন ক্ষেত্রে বেন্‌জিন অপেক্ষা ইহার দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা বেশী—যেমন রজন জাতীয় পদার্থ বেন্‌জিন অপেক্ষা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে বেশী দ্রবীভূত হয়। ইহার অসুবিধা এই যে—(১) বেন্‌জিনের তুলনায় ইহার দাম অনেক বেশী। (২) ইহার

আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী বলিয়া বেন্‌জিন অপেক্ষা দ্বিগুণ ওজন দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। (৩) ইহার স্ফূটনাঙ্ক কম বলিয়া বাষ্পাকারে সহজেই উড়িয়া যায়। (৪) বিশুদ্ধ না হইলে ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

ট্রাইক্লোরোইথিলীন—ইহা জলের মত সাদা, গন্ধও খুব অপ্রীতিকর নয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৪৭ এবং স্ফূটনাঙ্ক ৮৮° সেঃ। জলের সান্নিধ্যে লৌহের উপর ইহার রাসায়নিক বিক্রিয়া খুব কম ঘটে। স্নেহ ও রজন জাতীয় পদার্থ ইহা সহজেই দ্রবীভূত করিতে পারে।

টেট্রাক্লোরোইথেন (Tetrachloroethene)—এই দ্রাবকটি ট্রাইক্লোরোইথিলীন দ্রাবক হইতে বেশী ভারী। ইহার স্ফূটনাঙ্ক ১৪৭° সে. এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৬। জলের সান্নিধ্যে ইহা লৌহের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। সেই জন্য পাত্রে রাখিবার সময় বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইহা স্নেহজাতীয়, তৈলজাতীয়, রজনজাতীয়, পেইণ্ট (paint) জাতীয় পদার্থ খুব সহজেই দ্রবীভূত করে। এইজন্য দাগ উঠাইবার জন্য ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

1. **Name the natural fibres used in the textile industry and indicate their sources.** (বয়নশিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি স্বাভাবিক তন্তুর নাম কর এবং তাহাদের মূল উপাদান কি বল।) (H. S. 1960)

2. **What are the characteristics of silk fibre? Describe briefly the method you would adopt for washing a silk garment.** (সিল্ক তন্তুর বৈশিষ্ট্য কি কি? একটি সিল্কের পোশাক ধৌত করার প্রণালী বর্ণনা কর।) (H. S. 1960)

3. Make a list of necessary equipment for laundry work. How would you take care of the equipment ? (বস্ত্রধৌতির জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের তালিকা দাও। ইহাদের কিরূপে উত্তমরূপে রাখা যাইতে পারে ?) (H. S. 1960)

4. How would you distinguish between pure silk and artificial silk, pure wool and wool mixed with cotton ? (খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের এবং খাঁটি পশম ও সূতামিশ্রিত পশমের পার্থক্য নির্ণয় করিবে কিরূপে ?)

5. State briefly the differences in the finishing process of silk and cotton. Give reasons for your answer. (সূতী বস্ত্রে ও রেশমী বস্ত্রের শেষ পর্যায়ের পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। যুক্তিসহ তোমার উত্তর বর্ণনা কর।)

6. State briefly the difference between natural silk and artificial silk with ragards to their elasticity, shrinkage, colourfastness and durability. (স্থিতিস্থাপকতা, সংকোচন, পাকা রঙ ও টেকসই হিসাবে স্বাভাবিক রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

7. State what you know about silk fibres ? How does it differ from wool ? (রেশম-তন্তু সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। পশমের সহিত ইহার পার্থক্য কি) ?

8. Write short notes on any three of the following :— (a) Washing soda and its uses, (b) Starch and its uses in laundry, (c) Effects of using hot water for silk, (d) Stenter frame, (e) Mordan dyes. [যে কোন তিনটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর :—(ক) ওয়াশিং সোডা এবং তাহার ব্যবহার,

(খ) বস্ত্রধৌতিতে স্টার্চের ব্যবহার, (গ) সিল্কের কাপড়ে গরমজল ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া, (ঘ) স্টেণ্টার ফ্রেম, (ঙ) মর্ডাণ্ট ডাই।]

9. Describe briefly the process of water proofing. (ওয়াটার প্রুফ করিবার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর)।

10. Why dry-cleaning method is used in washing ? Describe briefly the simple process of dry-cleaning method in the home. (বস্ত্রধৌতিতে ড্রাইক্লিনিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় কেন ? গৃহে ড্রাইক্লিনিং পদ্ধতিতে সহজে কাপড় ধুইবার প্রণালী বর্ণনা কর)।

11. Narrate briefly the nature of artificial silk and tests for distinguishing it from real silk. (কৃত্রিম রেশমের প্রকৃতি বর্ণনা কর এবং আসল সিল্কের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করিবে কিরূপে।)

12. Write short notes on any three of the following :—
(a) Dry cleaning, (b) Stiffening agents, (c) Greese absorbent, (d) Alkali, (e) Oxalic Acid, (f) Hard water. [সংক্ষেপে যে কোন তিনটির বর্ণনা কর :—(ক) ড্রাই ক্লিনিং, (খ) স্টিফেনিং এজেণ্ট, (গ) গ্রীজ অ্যাবজরব্যাণ্ট, (ঘ) অ্যালকালি, (ঙ) অক্স্যালিক অ্যাসিড্, (চ) হার্ড ওয়াটার।]

13. Explain with a diagram the structure of a woollen fibre. Discuss fully the effect of using alkali and hot water on woollen fabric. (একটি নকশার সাহায্যে পশম-তন্তুর গঠন বর্ণনা কর। পশমের কাপড়ে ক্ষার ও গরম জল ব্যবহার করিলে কি প্রতিক্রিয়া হয় আলোচনা কর।)

Objective Tests

CLASS IX

Recall Type

এক কথায় উত্তর দাও :

(১) দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে খাদ্যদ্রব্য জমিয়া পচিয়া যাওয়ার ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাহাকে কি রোগ বলে ?

(২) বায়ুতে অক্সিজেনের শতকরা ভাগ কত ?

(৩) কঠোর পরিশ্রমীদের কত ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন হয় ?

(৪) কোন্ জাতীয় জীবাণু মলকে তরল পদার্থে রূপান্তরিত করে ?

(৫) সূর্যকিরণের কোন্ দুই প্রকার রশ্মি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ ?

(৬) কোন্ ক্রিয়ার সাহায্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ জল লাভ করা যায় ?

(৭) ফিল্টার বেডের উপরে যে পাতলা পর্দার সৃষ্টি হয় তাহার নাম কি ?

(৮) পুষ্পস্তবকের উচ্চতা ফুলদানীর উচ্চতা অপেক্ষা কত গুণ হওয়া উচিত ?

(৯) পুষ্পবিন্যাসের মূল নীতি কি কি ?

(১০) আমাদের দেহের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে কি তরল পদার্থ নির্গত হয় ?

(১১) কোন্ প্রকার স্টীল সবচেয়ে মজবুত ও সহজে মরিচা ধরে না ?

(১২) কোন্ প্রকার চুল্লীর সাহায্যে সহজে অল্প সময়ে রান্না করা যায় ?

(১৩) অল্প জলে ধীরে ধীরে রান্না করাকে কি বলে ?

(১৪) ভাজা জিনিসে কোন্ ভিটামিনের অপচয় হয় ?

(১৫) আমাদের দেশে সিন্ধ্রির কারখানায় কোন্ সার ব্যাপকভাবে তৈয়ার হয় ?

(১৬) রেশম-কীটের জীবনে কয়টি অবস্থা এবং তাহা কি কি ?

(১৭) কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে সহজে কাপড় পরিষ্কার করা যায় ?

'Yes' or 'No' Type

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যেগুলি শুদ্ধ তাহার ডান পাশে ✓ এবং যেগুলি অশুদ্ধ তাহার ডান দিকে × চিহ্ন দাও :

(১) উজ্জ্বল গাঢ় রঙ চোখের পক্ষে ভাল।

(২) ভিটামিন 'এ' ও স্নেহপদার্থ চোখের পক্ষে পুষ্টিকর।

(৩) জিহ্বার উপরিভাগ মসৃণ।

(৪) সূর্যকিরণ রোগ-জীবাণুর প্রসার ঘটায়।

(৫) সাধারণ পরিশ্রমী লোকের পক্ষে খাদ্যের মাত্রা ৩০০০ ক্যালোরী হওয়া উচিত।

(৬) গাছের সবুজকণা সূর্যালোকের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করে।

(৭) ক্লোরিন জলের জীবাণু ধ্বংস করে।

(৮) কাশ্মীরী গালিচার ভিতরে রঙ ও কারুকার্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়।

(৯) কাঁসা একটি সংকর ধাতু।

(১০) আলু প্রোটীন জাতীয় পদার্থ।

(১১) পরিমিত জল দ্বারা ভাত সিদ্ধ করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

(১২) দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তূলার চাষ হয়।

(১৩) রেশম-তন্তু বেশ স্থিতিস্থাপক।

(১৪) নাইলন কৃত্রিম তন্তু নহে।

(১৫) পেট্রোল উদ্বায়ী পদার্থ।

Completion Type

অপূর্ণ স্থান পূর্ণ কর :

(১) মানুষের শ্বাসত্যাগের ফলে বায়ুর — বাড়িয়া যায় এবং গৃহের ভিতরের লোকেরা — অনুভব করে।

(২) ব্যায়াম — দীর্ঘদিন করিবার — রাখা উচিত।

(৩) বয়স অনুসারে — আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত।

(৪) — বিভিন্ন নকশা দক্ষিণ ভারতের — প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(৫) — বৈচিত্র্য এবং — বিধান বিদেশী পুষ্পবিন্যাসের একটি প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয়।

(৬) পোর্সেলিন — ও — নামক পদার্থের দ্বারা গঠিত।

(৭) ১৭৭°—২০৪° সি. কে — আঁচ বলা হয়।

(৮) বেশীর ভাগ শিশুই খুব নরম ও ঠাণ্ডা খাবার অপেক্ষা — খাদ্য পছন্দ করে।

(৯) — — প্রভৃতি জৈব পদার্থের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানো হয়।

(১০) — ও — এই দুই উপাদানের সাহায্যে পাটতন্তু গঠিত।

(১১) বেশীক্ষণ জলে ফুটাইলে পশম-তন্তুর — ও — কমিয়া যায়। ইহার ফলে পশম-তন্তুর — বাঁধিবার আশঙ্কাও থাকে।

(১২) নাইলন-তন্তু প্রস্তুত করিবার সময় ইহাকে নিষ্ক্রিয় — গ্যাস দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে।

(১৩) ভ্যাকুয়াম কোনের চারিদিক — ও ইহার নিম্নদেশ — আকৃতি বিশিষ্ট।

(১৪) কাপড়ের রঙের উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতা বাড়াইবার জন্য — দরকার।

True and False Type

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভিতরে যেগুলি সত্য তাহার ডান পাশে T এবং যেগুলি ভুল তাহার ডান পাশে F লিখিবে।

(১) মাছি-পড়া আহার্যবস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়।

(২) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্বারা কান পরিষ্কার করা ভাল।

(৩) বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়া যাইবার ফলে লোকে অস্বস্তি অনুভব করে।

(৪) ব্যায়াম করিলে খাদ্য-তালিকা খুব উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) অত্যধিক আহারের ফলে নিদ্রালুতা, ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

(৬) ক্যাল্‌সিয়াম শরীরের মাংসপেশী গঠনের সহায়তা করে।

(৭) ক্লোরিন জলের জীবাণু ধ্বংস করে।

(৮) প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় গৃহ শীতল রাখিবার জন্য খস্‌খস্‌ টাঙানো উচিত নয়।

(৯) কাশ্মীরেব গালিচা গালিচা-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

(১০) অপ্রচুর খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের পরিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

(১১) ভাতের ফেন গালা যুক্তিসঙ্গত।

(১২) রেশমের মূককীট ধীরে ধীরে গুটি তৈয়ারী করে।

(১৩) অক্সেলিক অ্যাসিডের সাহায্যে কাপড়ের দাগ উঠানো যায় না।

(১৪) পেট্রোল ও বেন্‌জিন উদ্বায়ী পদার্থ।

Multiple Choice Type

নিম্নলিখিত উত্তরগুলির মধ্যে যেটা ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও :

(১) বায়ুর মধ্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া।

(২) ধূলিকণার দ্বারা সৃষ্ট রোগ—যক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা।

(৩) খাদ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ—প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ।

(৪) পশম—উদ্ভিজ্জ, কৃত্রিম, প্রাণিজ তন্তু।

(৫). রেয়ন—কৃত্রিম, প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ তন্তু।

(৬) অ্যাসবেসটস—তাপের কুপরিবাহক, সুপরিবাহক।

(৭) ড্রাই ক্লিনিং পাম্পে—সাবান, বেন্‌জিন, সোডা ব্যবহৃত হয়।

(৮) সেরিসিন—পশম-তন্তু, কার্পাস-তন্তু ও রেশম-তন্তুর ভিতরে থাকে।

(৯) স্নিগ্ধ এবং হাল্‌কা রঙের ফুলের জন্য—কাচের, মাটির, পিতলের ফুলদানী ভাল।

(১০) জল সবচেয়ে বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়—আস্রাবণ, পরিস্রাবণ, পাতন প্রক্রিয়ায়।

CLASS X

Recall Type

এক কথায় উত্তর দাও :

(১) অ্যানোফিলিস মশকীর দংশনে কোন্ রোগের বিস্তার ঘটে ?

(২) যক্ষ্মা রোগের প্রতিরোধে কোন্ টিকা ব্যবহৃত হয় ?

(৩) কিরূপ পদার্থের ভিতর দিয়া কলেরা রোগ সংক্রামিত হয় ?

(৪) রোগীর ঔষধ মাপিবার জন্য কিরূপ গ্লাস ব্যবহার করা হয় ?

(৫) কোন্ প্রকার ব্যাঙ্কে জমা টাকায় সবচেয়ে বেশী সুদ পাওয়া যায় ?

(৬) কোন্ প্রকার চেক্ সব চেয়ে নিরাপদ ও জালজুয়াচুরীর সম্ভাবনা কম ?

(৭) কোন্ ভিটামিনের অভাবে লোক রাতকাণা হয় ?

(৮) কোন্ ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয় ?

(৯) সূর্যকিরণ হইতে কোন্ ভিটামিন পাওয়া যায় ?

(১০) কোন্ খনিজ উপাদানের অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয় ?

(১১) আয়োডিনের অভাবে কোন্ কোন্ রোগ দেখা যায় ?

(১২) রন্ধনের ফলে উদ্ভিদ্-কোষের প্রাচীর হইতে কোন্ অংশ ভাঙ্গিয়া যায় ।

(১৩) কত ডিগ্রী তাপে ডিম জমিয়া যায় ?

(১৪) অস্থায়ী খর জলে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় ?

(১৫) স্থায়ী খর জলে কি কি রাসায়নিক পদার্থ থাকে ?

(১৬) কোন্ দুইটি জিনিসের সাহায্যে সাবান প্রস্তুত হয় ?

(১৭) লোহার দাগ কোন্ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তোলা যায় ?

(১৮) কালির দাগ কিসের সাহায্যে তোলা যায় ?

(১৯) কার্বনযুক্ত কালি কি প্রকারে সহজে তোলা যাইতে পারে ?

(২০) কোন্ ধৌত পদ্ধতিতে পেট্রোল ব্যবহার করা হয় ?

(২১) সেলাইয়ের মেসিনে বার বার তেল দেওয়া দরকার কেন ?

'Yes' or 'No' Type

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির যেগুলি শুদ্ধ তাহার ডান পাশে √ এবং যেগুলি অশুদ্ধ তাহার ডান পাশে × চিহ্ন দাও :

(১) জীবাণু হইতে রোগ-বিষ উৎপন্ন হইয়া খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করে।

(২) মশকীর দংশনে প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium) নামে এক প্রকার পরজীবী রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে।

(৩) জলবসন্ত শরীরে গভীর দাগের সৃষ্টি করে।

(৪) আমাশয় রোগে অতিরিক্ত তেল, ঝাল, মসলা ব্যবহার করা ভাল।

(৫) রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও বাসনপত্র জীবাণুনাশক দ্রবণের সাহায্যে নির্বীজন করা দরকার।

(৬) উকুন এক প্রকার পরদেহাশ্রয়ী প্রাণী।

(৭) জ্বরের তাপমাত্রা মুখের চেয়ে বগলে বেশী হয়।

(৮) চল্‌তি হিসাবে সব চেয়ে বেশী সুদ পাওয়া যায়।

(৯) দেহে প্রোটীনের অভাব হইলে রক্ত বেশী মাত্রায় তরল হয়।

(১০) ফস্‌ফরাস জীবন্ত কোষের একটি অপরিহার্য পদার্থ।

(১১) বৃষ্টির জল সব চেয়ে অশুদ্ধ জল।

(১২) রেশমী ও পশমী কাপড় হাল্‌কা ভাবে রগড়ানো দরকার।

Completion Type

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) বসন্ত রোগ — করিবার জন্য প্রতি বৎসর শীতকালে — লওয়া প্রয়োজন।

(২) কলেরার জীবাণুগুলি দেখিতে — ন্যায়।

(৩) — ইন্‌জেকশন দিলে কলেরা রোগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৪) আইসল্, মেন্থল — ধুইবার লোশন।

(৫) মানবদেহে — হজম হইবার পূর্বে প্রথমে মণ্টোজে পরিণত হয়।

(৬) রাসায়নিক আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে প্রোটীন এক প্রকার — রূপান্তরিত হয়।

(৭) বেশী উত্তাপের ফলে মাছের প্রোটীন অংশ — যায়।

(৮) বাজারে যে নির্বীজক সাবান ব্যবহার করা হয় তাহাতে শতকরা —ভাগ বা — কার্বোলিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়।

(৯) —— জাতীয় পদার্থের সাহায্যে সাবানে —— উৎপত্তি হয়।

(১০) প্যারাফিনের সাহায্যে —— জাতীয় পদার্থ দূর করা যায়।

(১১) ম্যাঙ্গলারের ভিতর দুই-তিন বার চাপ দিলে সমস্ত —— দূরীভূত হয়।

(১২) বেশী ইস্ত্রি করিলে পশম-তন্তুর —— নষ্ট হইয়া যায়।

True or False Type

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যেটা ঠিক তাহার পাশে T ও যেটা ঠিক নয় তাহার পাশে F চিহ্ন দাও :

(১) সিজোগনি প্রক্রিয়ার দ্বারা মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু সংক্রমিত হয়।

(২) অনিচ্ছুক রোগীকে পথ্য বা ঔষধ দেওয়ার সময় অনর্থক উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

(৩) স্নান করাইবার সময় রোগীকে খোলা হাওয়ায় খালি গায়ে রাখিবে।

(৪) রোগীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ ফুটন্ত গরম জলে সিদ্ধ করিলে জীবাণুমুক্ত হয়।

(৫) মিল ফ্যাক্টরীতে যাহারা কাজ করে তাহাদের ঢিলা 'পোশাক ব্যবহার করা উচিত।

(৬) চেক্ বা ব্যাঙ্কের কাগজপত্রে সংক্ষেপে নাম সহি করিতে নাই।

(৭) চামড়ার উপরে বাটিকের কাজ সুন্দর হয়।

(৮) মাছ-মাংসে প্রোটীনের পরিমাণ কম হয়।

(৯) 'ডি' ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

(১০) গাছের ও ফলের ক্যারোটিন সহজেই ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়।

(১১) স্ত্রীলোকদের গর্ভাবস্থায় কম ক্যালোরী গ্রহণ করা দরকার।

(১২) অল্প আঁচে রান্না করিলে মাংস বিস্বাদ ও দুষ্পাচ্য হয়।

(১৩) দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়।

(১৪) ভাল সাবান সহজে ফেনা উৎপন্ন করে না।

(১৫) পুরু ও বড় রেশমী কাপড অতিরিক্ত সূর্যকিরণে ঝুলানো উচিত।

Multiple Choice Type

নিম্নলিখিত উত্তরগুলির মধ্যে যেটা ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও :

(১) দাদ রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ—গন্ধক, কার্বলিক অ্যাসিড, ক্রাইসোফেনিক অ্যাসিড।

(২) মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা— ৯৫°, ৯৮·৪°, ১০০°।

(৩) ভাতের ভিতরে বেশী থাকে—প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ।

(৪) রিকেট রোগের সৃষ্টি হয়—ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন ডি-র অভাবে।

(৫) ঘামের দাগ উঠানো হয়—অ্যামোনিয়া, অক্সেলিক অ্যাসিড, সোডিয়াম কার্বোনেটের সাহায্যে।

(৬) সেলাইয়ের কলে—কেরোসিন, নারিকেল বা সিঙ্গার অয়েল ব্যবহার করা উচিত।

(৭) দাহ্য গ্রীজ দ্রাবক—বেন্‌জিন, পেট্রোল, কার্বন, টেট্রাক্লোরাইড।

CLASS XI

Recall Type

এক কথায় উত্তর দাও :

(১) দরিদ্র লোকেরা মশার কামড় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কি মাখিয়া থাকে ?

(২) মাছির জীবনে কয়টি অবস্থা ও তাহা কি কি ?

(৩) ইঁদুরের গায়ে যাহা রোগ-বাহকের কাজ করে তাহার নাম কি ?

(৪) আরসোলা দূর করিবার জন্য দুইটি ঔষধের নাম কর।

(৫) কাঠ ও আসবাবপত্রে সচরাচর কোন্ পোকা দেখা যায় ?

(৬) কোন্ পোকা দালানের কাঠ, কাঠামো খাইয়া নষ্ট করে ?

(৭) কোন্ প্রকার অস্থিভঙ্গ সবচেয়ে খারাপ ?

(৮) বিষধর সর্পের দংশনের লক্ষণ কি ?

(৯) একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মঠ ব্যক্তির দৈনিক কত ক্যালোরী খাদ্য প্রয়োজন ?

(১০) দার্জিলিং চা-এর বৈশিষ্ট্য কি ?

(১১) মায়ের খাদ্যে আয়োডিনের ভাগ কমিলে কোন্ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে ?

Completion Type

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(১) ঘোলা জলে কিছুটা —— মিশাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পর জলের ময়লা —— পড়িয়া যায়।

(২) পাস্তুর চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টারের চোঙ্গাগুলি —— ও —— তৈয়ারী।

(৩) কোন ভারী কাজ করিতে হইলে সব সময় শক্তিশালী —— প্রয়োগ করা উচিত।

(৪) ভাতের পচন দ্বারা —— জাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়।

(৫) কেক বা প্যাস্ট্রি —— সাথে দেওয়া চলে। টম্যাটো ভিটামিন —— অত্যুৎকৃষ্ট উৎস।

'Yes' or 'No' Type

যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে √ ও যেগুলি অশুদ্ধ তাহাদের পাশে × চিহ্ন দাও :—

(১) দুধ আদর্শ খাদ্য।

(২) কাঠের উপর আলকাতরার প্রলেপ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) কিউলেক্স মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি হয়।

(৪) পরিস্রাবণ-ক্রিয়া দ্বারা জল সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত হয়।

(৫) আগুন লাগা মাত্র সেই ব্যক্তিকে কম্বল দিয়া চাপ দেওয়া উচিত।

(৬) রক্তপাতের দিকে দৃষ্টি না দিয়া প্রথমে শরীরে হাড়ভাঙ্গার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(৭) রেফ্রিজারেটারের খাবার গরমের দিনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৮) প্রেসার কুকারে রান্না হইতে সময় বেশী লাগে।

(৯) গরম ও ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করা হয়।

(১০) শিশুকে ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর দিনে পাঁচ-ছয়বার খাওয়ানো উচিত।

(১১) ভিটামিন 'ডি'-র অভাবে রিকেট রোগ হয়।

(১২) শিশুর দাঁত উঠিলে শুকনা রুটি চিবাইতে দেওয়া দরকার।

(১৩) প্রোটীন ও লৌহবহুল খাদ্য মেয়েদের কম খাওয়া উচিত।

(১৪) দিনে এক আধ গ্লাস জল খাইলেই যথেষ্ট।

Some Important Questions with Hints

[কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তরের সংকেত]

1. 'Health is not merely absence of disease'—Explain what are the factors that produce good physical health? ('নীরোগ হইলেই স্বাস্থ্যবান্ বলা চলে না'—ব্যাখ্যা কর। কি কি উপাদান শরীর সুস্থ রাখে?)

সংকেতঃ—রোগমুক্ত দেহ আদর্শ স্বাস্থ্য নয়,—কর্মের উদ্দীপনা,—আনন্দের সঞ্চার—সুন্দর শারীরিক গঠন, মসৃণ চর্ম,—শরীরের প্রতি অঙ্গের সুস্থতা—স্বাস্থ্যচর্চার অনুশীলনী—ব্যায়ামের অভ্যাস—নিয়মিত অভ্যাস—সূর্যকিরণ সেবন, ভোরের বাতাস গায়ে লাগানো—স্বাস্থ্যগঠনের অঙ্গ।

2. What is personal hygiene? Discuss why fresh air and sunshine are so important for health. (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝ? মুক্তবায়ু ও সূর্যালোক স্বাস্থ্যের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় কেন?)

সংকেতঃ—দেহের বহিরঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—দাঁত ও মাড়ি, চুল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রত্যহ পরিষ্কার রাখা—নিয়মিত ভাবে মলমূত্র ত্যাগ; ঘর্ম নিঃসরণ। মুক্তবায়ু ও সূর্যকিরণ সেবন—বিশুদ্ধ বায়ু ক্লান্ত দেহে

শান্তিদান, ফুস্‌ফুসের সাহায্যে রক্ত ও দেহকোষকে সক্রিয় করে, রোগজীবাণু নষ্ট করে। দূষিত বায়ুর প্রভাবে ক্ষুধামান্দ্য, ফেরিঞ্জাইটিস প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি। সূর্যকিরণ জীবাণুনাশক, দেহবৃদ্ধির সহায়ক, ভিটামিন 'ডি' প্রস্তুতকারক—ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের সমতার নিয়ন্ত্রণ—বহিত্বকের উপর অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব—সৌরস্নান।

3. What is the composition of air ? (বায়ুর উপাদান কি কি ?)

সংকেত ঃ—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য পদার্থ।

4. How air becomes purified by (1) natural means. (2) artificial means. [(১) স্বাভাবিক উপায়ে এবং (২) কৃত্রিম উপায়ে বায়ু বিশুদ্ধ হয় কিরূপে ?]

সংকেত ঃ—

স্বাভাবিক উপায়—সূর্যকিরণ, বৃষ্টি, বৃক্ষলতা, বায়ু সঞ্চালন।

কৃত্রিম উপায়—বায়ু নিষ্কাশন পদ্ধতি, বায়ু বিতাড়ন পদ্ধতি, সুষমপদ্ধতি।

5. What is the effect of overcrowding in a closed room ? (একটি বদ্ধঘরে বেশী লোক থাকার কি ফল ?)

সংকেত ঃ—বায়ু দূষিত হয়, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেন কমে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি হয়। বদ্ধঘরে—মাথাধরা, মাথাঘোরা, বমির ভাব, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি—মনের প্রসারতা হ্রাস, খিট্‌খিটে মেজাজ, বায়ুবাহিত রোগের সংক্রমণ।

6. What part does sunshine play in our life ? (আমাদের জীবনে সূর্যকিরণের প্রভাব কতখানি ?)

সংকেত ঃ—সূর্যকিরণের তিন প্রকার রশ্মি—উত্তাপপ্রদ, আলোকপ্রদ, স্বাস্থ্যপ্রদ—প্রখর সূর্যকিরণে ঘর্ম নির্গমন। শরীরের ক্লেদের নিবারণ হয়; ইহা জীবাণুনাশক এবং দুর্গন্ধ ও আর্দ্রতা-নাশক, ভিটামিন 'ডি'র উৎপাদক—দেহের বৃদ্ধির সহায়ক—ত্বকের স্বাভাবিক মসৃণতা নষ্ট করে। অতিবেগুনী রশ্মি—অর্গোস্টেরলের উপর তাহার প্রভাব—ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভিটামিন 'ডি'র

সাহায্যে অস্থির পুষ্টিসাধন। অবলোহিত রশ্মির স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব। সৌরস্নান শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক।

7. Why should you take regular exercise ? (নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত কেন ?)

সংকেত ঃ—শরীরের পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম আবশ্যক। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার সাহায্যে শরীরের আবর্জনা দূরীকরণ—শরীরের মাংসপেশী বৃদ্ধি—মনের স্ফূর্তি।

৮. What principles should guide you in selecting a site for a house ? (গৃহ নির্মাণের স্থান নির্বাচন করিতে হইলে কোন্ কোন্ আদর্শের দ্বারা তুমি পরিচালিত হইবে ?)

সংকেত ঃ—উঁচু জমি, স্যাঁতস্যাতে না হওয়া বাঞ্ছনীয়,—জমির শোষকগুণ—পুষ্করিণী—জলা জমিতে বাসগৃহ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাড়ীর চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। বাড়ীর উত্তরদিকে ঝাউ, নিম প্রভৃতি গাছ ও পশ্চিমে ফলের গাছ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাড়ীর সীমানার চতুর্দিকে প্রশস্ত রাস্তা—Damp proof course.

9. What is an ideal home ? Name the duties that a mother has to perform in a home. What are your responsibilities at home ? (আদর্শ গৃহ বলিতে কি বোঝ ? গৃহে মাকে কি কি কর্তব্য পালন করিতে হয় উল্লেখ কর। গৃহে তোমাকে কি কি দায়িত্ব বহন করিতে হয় ?)

সংকেত ঃ—আদর্শ গৃহে সর্বপ্রকার সুবিধা—পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—সুন্দর গৃহ-সজ্জা—রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, রুচিসম্মত আসবাবপত্র, চিত্র-সন্নিবেশ—গৃহের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সাহচর্য—ভাব বিনিময়। মায়ের কর্তব্য গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুদের প্রতি নজর, পরিবারের খাওয়া-পরার দিকে দৃষ্টি, গৃহে রুগ্ণ ব্যক্তিদের সেবা—সহনশীলতা, ধৈর্য, সুবিবেচনা, নিষ্ঠা ও দরদ—মেয়েদের মায়ের উপদেশমত কাজ করা—মেয়েরা ভবিষ্যতে গৃহকর্ত্রী হইবেন এই ধারণা লইয়া প্রস্তুত হওয়া উচিত—খাদ্য-বাজেট সম্বন্ধে জ্ঞান—তরিতরকারী উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী পালন করিয়া সংসারের আয় বাড়ানো।

10. "The words beauty, comfort and convenience seem to belong to a happy well-ordered home"—Discuss. ("সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এই কথাগুলি সুখী এবং সুশৃঙ্খল গৃহ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।" —আলোচনা কর।)

সংকেত ঃ—সৌন্দর্যবোধ, রুচিজ্ঞান—রুচি ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আরাম ও আনন্দের সম্মিলন, রুচিজ্ঞান বা সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে আর্থিক সামঞ্জস্য বিধান—আসবাবপত্র নির্বাচন ও তাহার বিন্যাসের কল্পনা।

11. Explain with reasons how any one of the following may be prevented—(a) Rusting of iron; (b) Tarnishing of brass. [নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঠেকাইয়া রাখিতে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহা যুক্তিসহ বুঝাইয়া বল : (ক) লোহার মরিচা; (খ) পিতলের ময়লা দাগ।]

সংকেত ঃ—লোহার মরিচা—অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার রাসায়নিক সংযোগ—ইহার সঙ্গে জল থাকাও প্রয়োজন। হোয়াইট লেডের বার্নিশ, অয়েল পেণ্টের কোটিং। পিতল সংকর ধাতু—তামা ও দস্তার সংমিশ্রণ; ইহার উপর কপার সালফেটের আস্তরণ পড়িলে ব্রাসো ব্যবহার করা উচিত।

12. What points would you consider while selecting furniture and equipment of kitchen ? (রান্নাঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম নির্বাচন করিবার সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিবেচনা করিবে ?)

সংকেত ঃ—রন্ধনগৃহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু—চুল্লী বসানোর স্থান; জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বেসিন, জলের কল—বাসনকোসন, মশলাপাতি রাখিবার স্থান, মিটসেফ প্রভৃতির আয়োজন—আহারকারীর বসিবার স্থানে জানালা—বাহুল্যবর্জিত, লেবেল-আঁটা মশলার শিশি—কীটপতঙ্গের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গামোক্সিন প্রভৃতি ব্যবহার। চামচ, কাঁটা, ছুরি, বঁটি-দা, হাত-দা, চালুনী, বিভিন্ন প্রকারের বাল্‌তি, শিল-নোড়া, খুন্তি প্রভৃতি জিনিসের সমাবেশ।

13. Write short notes on : (a) Smokeless chulah, (b) Kitchen

garden, (c) Food preservation. [টীকা লিখ : (ক) ধূমশূন্য চুল্লী, (খ) সব্‌জী বাগান, (গ) খাদ্য সংরক্ষণ।]

সংকেত : (ক) **ধূমশূন্য চুল্লী :** যাহা হইতে ধূম নির্গত হয় না—গ্যাসের চুল্লী, বৈদ্যুতিক হীটার, প্রেসার কুকার। ইচ্ছামত তাপ নিয়ন্ত্রণ—জ্বালানো বা নিভানো—ঘরে অসুবিধায় সৃষ্টি করে না—প্রাইমাস স্টোভ, সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

(খ) **সব্‌জী বাগান :** মনোমত তরিতরকারী ফলানো, তাজা শাকসব্‌জীর ব্যবস্থা, গৃহস্থের আয় বাড়ানো—বিভিন্ন ঋতুর ফল, প্রয়োজনমত সার, খইল পচা, গোবর পচা, হাড়ের সার ব্যবহার। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী তরকারী ভাল নয়।

(গ) **খাদ্য সংরক্ষণ :** বিভিন্ন প্রকারের—বিশুদ্ধীকরণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার, বায়ু-নিরোধক পাত্রে সীল করিয়া রাখা, ঠাণ্ডায় জমানো, যত্নসহকারে সঞ্চয়, আমচুর, আমসত্ত্ব, লবণ, ভিনিগার, চিনি, জীবাণুর গাজন, ক্যানিং, কোল্ড স্টোরেজ, রান্না করিয়া রেফ্রিজারেটারের ভিতর রাখা।

14. Make a list of equipment that is necessary for laundry work. How would you take care of the equipment? (ধৌতাগারের নিমিত্ত যে সকল সরঞ্জামের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। কি ভাবে এই সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ?)

সংকেত :—ঘরে প্রচুর আলো বাতাস জল দরকার—ট্যাপ, সিঙ্ক, টব ও বালতি, মাটির বা এনামেলের গামলা, উনুন, ভ্যাকুয়াম কোন, ঢেউখেলানো তক্তা, কাপড় শুকাইবার র‍্যাক, ইস্ত্রি, ম্যাঙ্গলার, ড্রাই ক্লিনিং পাম্প।

15. Name the natural fibres used in the Textile Industry and indicate their sources. How would you distinguish the fibres? (বয়ন-কার্যে যে সব তন্তু ব্যবহৃত হয় তাহাদের নাম ও প্রাপ্তির বিষয় লিখ। কিরূপে তন্তুর পার্থক্য করিবে ?)

সংকেত :—

উদ্ভিজ্জ :—কার্পাস, শিমুল, পাট, লিনেন, র‍্যামি, অ্যাগেভ, অ্যালো।

প্রাণিজ :—রেশম, পশম।

কৃত্রিম :—নাইলন, ভিনিয়ন, ট্যারিলিন, ডেক্রন।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা।

16. Milk is an ideal food.—Discuss. (দুগ্ধ আদর্শ খাদ্য—আলোচনা কর।)

সংকেত :—দুগ্ধ—স্নেহজাতীয়, শর্করা-জাতীয়, প্রোটীন-জাতীয়—দেহের তাপ সংরক্ষণ, মাংসপেশী, নার্ভতন্ত্র ও বিভিন্ন তন্তু বৃদ্ধির জন্য দরকার—ল্যাক্টোজ অন্ত্রের হিতকারী জীবাণু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়—সম্পূর্ণ প্রোটীন—ক্যাসিন ও ল্যাক্ট-অ্যালবুমিন—স্নেহপদার্থ ইমালশান।

খনিজ পদার্থ—ক্যাল্‌সিয়াম, লৌহ, ফস্‌ফরাস, ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, অ্যাস্করবিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, রিবোফ্লেবিন। লৌহ-হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

17. What are the duties of a nurse? How should a nurse serve with a patient? (শুশ্রূষাকারিণীর কর্তব্য কি কি? শুশ্রূষাকারিণী রোগীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?)

সংকেত :—শুশ্রূষাকারিণীর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আর্তের সেবার জন্য স্বাভাবিক দরদ, উত্তম স্বাস্থ্য, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ মনোভাব থাকা দরকার। শুশ্রূষাকারিণীর সময়ানুবর্তিতা, রোগীর প্রতি, চিকিৎসকের প্রতি, রোগীর আত্মীয়স্বজনের প্রতি ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি বিভিন্ন কর্তব্য।

18. What are vitamins? How can they be classified? Give the names of some important vitamins. (ভিটামিন কাহাকে বলে? ইহাদের শ্রেণীবিভাগ কি ভাবে করা যাইতে পারে? কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভিটামিনের নাম উল্লেখ কর।)

সংকেত :—দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন দরকার—ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই—ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ ক্যারোটোম্যালশিপ, পেলেগ্রা, বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি রোগ।

ভিটামিনের উৎস কডলিভার অয়েল, মাখন, ঢেঁকিছাঁটা চাল, কাঁচা শাকসব্জী, ফল, চীনাবাদাম, সূর্যকিরণ ইত্যাদি।

19. How foods may be classified ? State what foods are used for repair and growth of body tissues. (কি ভাবে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে ? দেহতন্তুর ক্ষয় ও বৃদ্ধির জন্য কি কি খাদ্য দরকার লিখ।)

সংকেত :—

কার্বোহাইড্রেট :—মনোস্যাকারাইডস, ডাইস্যাকারইডস, পলিস্যাকারাইডস, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যালেক্টোজ, ম্যানেজ।

প্রোটীন :—আর্জিনাইন, হিষ্টিডাইন, আইসোলিউসাইন, লিউসাইন, লাইসাইন, মেসিয়োনাইন, ফেনিল অ্যামাইন, ইত্যাদি।

স্নেহজাতীয় পদার্থ :—ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই।

লবণজাতীয় পদার্থ :—ক্যাল্সিয়াম, ফস্ফরাস্, আয়োডিন, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম ও ক্লোরিন।

প্রোটীন আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে অ্যামানো-অ্যাসিড—দেহ ও তন্তুর বৃদ্ধি—ক্ষয়পূরণের জন্য আবশ্যক। প্রোটাপ্লাজমের সক্রিয় উপাদান জারকরস ও অনুঘটকের জন্য প্রোটীন দরকার।

20. What is hard water and what is soft water ? How can you make hard water soft ? (কঠিন এবং নরম জল বলিতে কি বুঝ ? কি ভাবে কঠিন জলকে নরম করা যাইতে পারে ?)

সংকেত :—কঠিন জল—স্থায়ী, অস্থায়ী। অস্থায়ী—সোডিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সালফেট—ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড ও সালফেট। সিদ্ধ করা, সেডিয়াম পারমুটাইট মিশানো।

21. Give the names of some household pests. What harm do they cause ? (গৃহের কয়েকটি অনিষ্টকর কীটপতঙ্গের নাম কর। তাহারা আমাদের কি ক্ষতি করে ?)

সংকেত :—মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, ইঁদুর, আরসোলা, রূপালী

পোকা, মথ, উই—ঘরের কাঠ, আসবাবপত্র নষ্ট করে, খাদ্যদ্রব্য দূষিত করে—রোগ-সংক্রামক।

22. How would you save a drowning person ? (জলে ডোবা লোককে কি প্রকারে উদ্ধার করিবে ?)

সংকেত ঃ—কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া—শেফার পদ্ধতি, সিলভেস্টার পদ্ধতি, ইভ পদ্ধতি, রোগীর মুখ নীচ দিকে রাখিয়া মাথা একধারে রাখ, হাত দুইটি মাথার উপরে দাও। শুশ্রূষাকারী রোগীর দিকে মুখ করিয়া বসিবে। শুশ্রূষাকারী গোড়ালির উপরে বসিবে, কোন মতেই যেন শুশ্রূষাকারীর ভার রোগীর উপর না পড়ে। তাহার হাত সবসময় রোগীর পিঠের উপরে থাকিবে রোগীর তলপেটে চাপ দিয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু বাহির করা। ১২ হইতে ১৫ বার এইরূপ করিবে। সিলভেস্টার পদ্ধতি—১৫ মিনিট পর্যন্ত করিবে যে পর্যন্ত না রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

23. How would you take precautions against snake bite ? (সর্পদংশনে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ?

সংকেত ঃ—দষ্ট স্থানের উপরে টুনিকেটের বাঁধ—বেশীক্ষণ বাঁধ দেওয় বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার ফলে গ্যাংগ্রিন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। তী অ্যামোনিয়া অথবা স্পিরিট পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইলে বি নষ্ট হয়। রোগীর শক দূর করিবার জন্য গরম কফি বা চা দিতে পারা যায়।

24. Give an account of some labour saving devices: (শ্র লাঘব করিবার কতিপয় দৃষ্টান্ত দাও।)

সংকেত ঃ—শ্রম লাঘব করিবার বিভিন্ন উপায়—ভ্যাকুয়াম ক্লীনার, লম হাতলযুক্ত বুরুশ, কার্পেট সুইপার, স্টীলউল ও স্টীল উলপ্যাড, ডিম ফেটাইবা যন্ত্র, ভেজিটেবল পীলার, টোস্টার, কফিমেকার, কফি পারকোটার, গার্লিক প্রে পট্যাটো ম্যাশার, ফ্রুটজুসার বা স্কুইজার, মীট মিন্সিং মেসিন, রেফ্রিজারেটা ইলেকট্রিক মিকশ্চার, ইলেক্‌ট্রিক ব্লেণ্ডার, গ্যাসের উনুন, প্রেসার কুকার, ওয়াশি মেসিন, রিঙ্গার, সেলাই কল।